আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)
[৭৯১–৮৬৪ হি. / ১৩৮৯–১৪৫৯ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

৫

২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫তম পারা

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা

মূল ❖ আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)

অনুবাদক ❖ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন

প্রকাশক ❖ আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশকাল ❖ ২৬ রবিউছছানী, ১৪৩২ হিজরি
১লা এপ্রিল, ২০১১ ইংরেজি
১১ চৈত্র, ১৪১৭ বাংলা

শব্দবিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া ❖ ৬৫০.০০ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ ـ

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সমধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে একুশ হতে পঁচিশতম পারার [পঞ্চম খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)], তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতু সাবী, তাফসীরে উসমানি, তাফসীরে মাযহারীসহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
লেখক ও সম্পাদক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الحادى والعشرون : একবিংশতম পারা

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الثاني والعشرون : বাইশতম পারা

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الثالث والعشرون : তেইশতম পারা

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء الرابع والعشرون : চব্বিশতম পারা

الجزء الخامس والعشرون : পঁচিশতম পারা

অনুবাদ :

٤٥. اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط شَرْعًا اَىْ مِنْ شَانِهَا ذٰلِكَ مَادَامَ الْمَرْءُ فِيْهَا وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط مِنْ غَيْرِهٖ مِنَ الطَّاعَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

৪৫. আপনি আপনার প্রতি ওহী মারফত প্রেরিত কিতাব কুরআন পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও শরিয়ত মতে গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ নামাজে মগ্ন থাকবে ততক্ষণ নামাজের বৈশিষ্ট্য হলো এই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। অতএব তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দিবেন।

٤٦. وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ اَىْ بِالْمُجَادَلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ كَالدُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ بِاٰيَاتِهٖ وَالتَّنْبِيْهِ عَلٰى حُجَجِهٖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ بِاَنْ حَارَبُوْا وَاَبَوْا اَنْ يَقِرُّوْا بِالْجِزْيَةِ فَجَادِلُوْهُمْ بِالسَّيْفِ حَتّٰى يُسْلِمُوْا اَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقُوْلُوْٓا لِمَنْ قَبِلَ الْاِقْرَارَ بِالْجِزْيَةِ اِذَا اَخْبَرُوْكُمْ بِشَىْءٍ مِمَّا فِىْ كُتُبِهِمْ اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَلَا تُصَدِّقُوْا هُمْ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ فِىْ ذَالِكَ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ مُطِيْعُوْنَ .

৪৬. তোমরা কিতাবীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবেনা কিন্তু উত্তম পন্থায় অর্থাৎ এমন তর্ক-বিতর্ক যা উত্তম যেমন, আল্লাহর দিকে তার নিদর্শনের মাধ্যমে আহ্বান করা ও তার প্রমাণাদির উপর অবগত করা। তবে তাদের সাথে নয় যারা তাদের মধ্যে অত্যাচার করে যুদ্ধের মাধ্যমে ও তারা জিযিয়া আদায়ে অস্বীকার করে অতঃপর তোমরা তাদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা কর যতক্ষণ তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বা কর আদায় না করে এবং বল তাদেরকে যারা কর আদায় করতে সম্মতি দিয়েছে যখন তারা তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যা তাদের কিতাবে আছে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি এবং তাদের এই সংবাদের প্রতি তোমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাস কোনোটাই রেখনা এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ অনুগত।

٤٧. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط الْقُرْاٰنَ اَىْ كَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمُ التَّوْرٰىةَ وَغَيْرَهَا فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ .

৪৭. এভাবেই আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব কুরআন অর্থাৎ যেমন, আমি অবতীর্ণ করেছি তাদের প্রতি তাওরাত ও অন্যান্য কিতাব অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব তাওরাত দিয়েছিলাম।

كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهٖ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ج بِالْقُرْاٰنِ وَمِنْ هٰؤُلَاۤءِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ بَعْدَ ظُهُوْرِهَا اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ وَظَهَرَ لَهُمْ اَنَّ الْقُرْاٰنَ حَقٌّ وَالْجَائِىْ بِهٖ مُحِقٌّ وَجَحَدُوْا ذٰلِكَ .

যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও অন্যান্য তারা তার প্রতি কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদেরও মক্কাবাসীদেরও অনেকে এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর অস্বীকার করে না কেবল কাফেররাই অর্থাৎ ইহুদিগণ এবং তাদের নিকট স্পষ্ট প্রকাশ হলো যে, কুরআন সত্য এবং তার বাহকও সত্য তা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার করেছে।

٤٨. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا اَىْ لَوْ كُنْتَ قَارِئًا كَاتِبًا لَّارْتَابَ شَكَّ الْمُبْطِلُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ فِيْكَ وَقَالُوا الَّذِىْ فِى التَّوْرٰىةِ اِنَّهٗ اُمِّىٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ .

৪৮. আপনি তো এর কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি। এবং স্বীয় হাত দ্বারা কোনো কিতাব লিখেননি যদি আপনি লিখা ও পড়া জানতেন তাহলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করতো। ইহুদিগণ আপনার প্রতি এবং তারা বলতো তাওরাতে যার উল্লেখ রয়েছে তিনি উম্মি তথা মূর্খ হবেন লিখা ও পড়া কিছু জানবেন না।

٤٩. بَلْ هُوَ اَىِ الْقُرْاٰنُ الَّذِىْ جِئْتَ بِهٖ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ط اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَحْفَظُوْنَهٗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ الْيَهُوْدُ وَجَحَدُوْهَا بَعْدَ ظُهُوْرِهَا لَهُمْ .

৪৯. বরং তা কুরআন যা আপনি নিয়ে এসেছেন স্পষ্ট আয়াত তাদের অন্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনদের অন্তরে তারা তা সংরক্ষণ করে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে না কিন্তু জালেমগণ। ইহুদিগণ তাদের নিকট তা স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তা অস্বীকার করে।

٥٠. وَقَالُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰيٰةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ اٰيٰتٌ كَنَاقَةِ صَالِحٍ وَعَصَا مُوْسٰى وَمَائِدَةِ عِيْسٰى قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط يُنْزِلُهَا كَمَا يَشَاۤءُ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ مُظْهِرٌ اِنْذَارِىْ بِالنَّارِ اَهْلَ الْمَعْصِيَةِ .

৫০. তারা মক্কার কাফেরগণ বলে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন? অন্য কেরাতে اٰيٰتٌ যেমন হযরত সালেহ (আ.) -এর উটনি ও হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি ও হযরত ঈসা (আ.)-এর দস্তরখান ইত্যাদি আপনি বলুন, নিশ্চয়ই নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি অবতীর্ণ করেন আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমার সতর্কতা জাহান্নামের গুনাহগারদের প্রতি।

৫১. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ فِيمَا طَلَبُوهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط فَهُوَ اٰيَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَا اِنْقِضَاءَ لَهَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْاٰيَاتِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْكِتَابِ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى عِظَةً لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে যে বিষয়ে তারা তালাশ করেছে আমি আপনার প্রতি কিতাব কুরআন নাজিল করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। তা একটি স্থায়ী নিদর্শন যা কখনো বিলুপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়াতসমূহ যা উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চয়ই এই কিতাবে রয়েছে রহমত ও উপদেশ বিশ্বাসী লোকদের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ : হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনাকে যদি স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্মহীনতার কারণে আফসোস ও চিন্তাক্লিষ্ট করে তবে আপনি কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন। ফলে আপনি একথা জেনে সান্ত্বনা পাবেন যে, হযরত নূহ (আ.) হযরত লূত (আ.) সহ অন্যান্য নবীগণের এ অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল যেমনটি সম্মুখীন আপনি হচ্ছেন। এতদ সত্ত্বেও তারা দাওয়াতি কাজ ও প্রমাণ উপস্থাপনে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও স্বীয় সম্প্রদায়কে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা হতে মুক্তি দিতে অক্ষম হননি। যখন আপনি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উল্লিখিত নবীগণের অবস্থা জ্ঞাত হবেন তখন আপনার এক ধরনের সান্ত্বনা মিলবে।

قَوْلُهُ اَلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ : فُحْش এমন মন্দকর্মকে বলে যাকে সমাজে খারাপ মনে করা হয়। সে ব্যাপারে শরিয়তের বিধান থাক বা না থাক। আর مُنْكَرْ এমন মন্দকর্মকে বলা হয় যাকে শরিয়ত খারাপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সমাজের প্রচলিত রীতি তাকে ভালো মনে করলেও।

قَوْلُهُ مَادَامَ الْمَرْءُ فِيْهَا : এটা একটা উক্তি মাত্র। অন্যথা বিশুদ্ধ কথা হলো অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা নামাজের বৈশিষ্ট্য। তবে শর্ত হলো নামাজের শর্তাবলি ও আদবসহ পাবন্দির সাথে নামাজ আদায় করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি পাবন্দির সাথে নামাজ আদায় করা সত্ত্বেও অশ্লীলতা থেকে বিরত না হয় তবে বুঝে নিবে যে, তার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি রয়েছে; নামাজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ : এটা কলমের ভ্রান্তি মাত্র। কেননা এ সূরাটি হলো মাক্কী সূরা। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর উপমা পেশ করা ঠিক হয়নি। হ্যাঁ, তবে এটা সম্ভব যে আল্লাহ তা'আলা اِخْبَارٌ بِالْغَيْبِ-এর ভিত্তিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর ঈমান গ্রহণের সংবাদ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مِنْ كِتَابٍ : كِتَابٌ টা تَتْلُوْ -এর মাফউল, আর مِنْ হলো অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتَ قَارِئًا كَاتِبًا : এটা لَفٌّ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ اَلْيَهُوْدُ : مُبْطِلُوْنَ -এর তাফসীরে ইহুদিদের নির্দিষ্ট করা সমীচীন হয়নি। কেননা খ্রিস্টানদেরও এ অবস্থাই ছিল। কাজেই যদি يَهُوْد -এর পরিবর্তে كَالْيَهُوْدِ বলতেন তবে বেশি সমীচীন হতো, যাতে করে ইহুদিরা ছাড়া প্রত্যেক কুরআন অস্বীকারকারী এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ : হামযাটা উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে এবং وَاوْ টা হলো عَاطِفَه আর يَكْفِهِمْ -এর عَطْف উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَجَهِلُوْا وَلَمْ يَكْفِهِمْ আর এটা হলো اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخِيْ

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْزَلْنَا : اَنَّ এবং যার উপর اَنَّ প্রবেশ করে তা মাসদারের তাবীলে হয়ে থাকে এবং يَكْفِ -এর فَاعِلْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اِنْزَالُنَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক :

قَوْلُهُ اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন আজাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের জন্য সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধী দলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোনো অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংরক্ষিত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এ পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধাবিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দুটি অংশ আছে, কুরআন তেলাওয়াত করা ও নামাজ কায়েম করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাজকে অন্যান্য ফরজ কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্য বর্ণিত ও হয়েছে যে, নামাজ স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে, নামাজ তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فَحْشَآءُ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দকাজ, যাকে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে। যেমন– ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে مُنْكَرٌ এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোনো এক দিককে مُنْكَرٌ বলা যায় না। فَحْشَآءُ ও مُنْكَرٌ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামাজ যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাজের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে। তবে শর্ত এই যে, শুধু নামাজ পড়লে চলবে না; বরং কুরআনের ভাষা অনুযায়ী اِقَامَتْ صَلٰوة হতে হবে। اِقَامَتْ-এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোনো একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اِقَامَتْ صَلٰوة-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামাজ আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করা অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্ত্র ও নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়া এবং নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্দরভাবে সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ কায়েম করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তাওফীকপ্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজ পড়া সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাজের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ এ আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন– مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهُ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামাজ কিছুই নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাজের আনুগত্য করে না, তার নামাজ কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাজের আনুগত্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, যার নামাজ তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাছীর উপরিউক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে তারা এসব উক্তি করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামাজ তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।

–[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জবাব : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাজের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয় কি?

এর জবাব কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামাজ নামাজিকে গুনাহ করতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু কাউকে কোনো কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরি নয়। কুরআন হাদীস ও যেসব মানুষকে গুনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গুনাহ করতে থাকে। তাফসীরের সারসংক্ষেপে এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, নামাজের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাজের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তৌফিক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাজে কোনো ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামাজ কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে আল্লাহর স্মরণ -এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাজে অথবা নামাজের বাইরে আল্লাহকে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ আল্লাহর এ স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামাজ পড়ার মধ্যে গুনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ স্বয়ং নামাজির দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গুনাহ থেকে মুক্তি পায়।

قَوْلُهُ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا : অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক কর। উদাহরণত কঠোর কথাবার্তার জবাব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জবাব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জবাব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا : কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে– তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জবাব দেওয়া জায়েজ। যদিও তখনও তাদের অসদাচারণের জবাব অসদাচরণ না করা এবং জুলুমের জবাব জুলুম না করাই শ্রেয়। যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ তোরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নাহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য যাতে বলা হয়েছে– আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোনো অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে– قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্কবিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গাম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সাথে বিরোধিতার কোনো কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এ আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এসব কিতাবে যা কিছু নাজিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরি হয় না যে, বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তু প্রতি, যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই : সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করতো এবং মুসলমানদেরকে আরবি অনুবাদ শুনাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল– اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গাম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তাফসীরগ্রন্থসমূহে তাফসীরকারগণ কিতাবধারীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোনো কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

قَوْلُهٗ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ :
অর্থাৎ আপনি কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোনো কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন উম্মী। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কুরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মোজেজা : আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মোজেজা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোনো কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এ অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোনো সময় কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ মক্কায় কোনো কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন ছিল মোজেজা তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোনো কোনো আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাজা (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ লিখে দিলেন।

এ রেওয়ায়েতে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও "সে লিখেছে" বলা হয়ে থাকে। এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এ ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মোজেজা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামাজের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখা জানতেন– বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

অনুবাদ :

٥٢. قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ج بِصِدْقِىْ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمِنْهُ حَالِىْ وَحَالُكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَهُوَ مَا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ مِنْكُمْ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ فِىْ صَفْقَتِهِمْ حَيْثُ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ .

৫২. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আমার সত্যবাদীতার উপর আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে এবং তিনি আমার ও তোমাদের অবস্থা জানেন। আর যারা মিথ্যায় এবং তা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর অর্চনা করা হয় বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর কুফরি করে তারাই তাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত কেননা তারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে খরিদ করেছে।

٥٣. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّهٗ لَجَاۤءَهُمُ الْعَذَابُ ط عَاجِلًا وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ اِتْيَانِهٖ .

৫৩. তারা আপনাকে আজাব দ্রুত করতে বলে। যদি আজাবের সময় নির্ধারিত না থাকত তবে আজাব তাদের এসে যেত দ্রুত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আজাব এসে যাবে এবং তাদের এর আগমনের সময় সম্পর্কে খবরও থাকবে না।

٥٤. يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط فِى الدُّنْيَا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ .

৫৪. তারা আপনাকে দুনিয়াতে আজাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করেছে।

٥٥. يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ فِيْهِ بِالنُّوْنِ اَىْ نَاْمُرُ بِالْقَوْلِ وَبِالْيَاۤءِ اَىْ يَقُوْلُ الْمُوَكَّلُ بِالْعَذَابِ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاۤءَهٗ فَلَا تَفُوْتُوْنَنَا .

৫৫. যেদিন আজাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে আজাবের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ বলবেন, يَقُوْلُ -এর মধ্যে ن ও ى উভয়ভাবে পড়া যায় যদি ن দ্বারা نَقُوْلُ পড়া হয় তখন তার ভাবার্থ হলো, আমরা ফেরেশতাদেরকে নিম্নের উক্তি বলার নির্দেশ দেই। আর ى দ্বারা يَقُوْلُ পড়লে তার অর্থ হলো, আজাবের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ বলবেন তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। অর্থাৎ তার শাস্তি অতঃপর তোমরা আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে না।

٥٦. يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ فِىْ اَىِّ اَرْضٍ تَيَسَّرَتْ فِيْهَا الْعِبَادَةُ بِاَنْ تُهَاجِرُوْا اِلَيْهَا مِنْ اَرْضٍ لَمْ تَتَيَسَّرْ فِيْهَا نَزَلَ فِىْ ضُعَفَاۤءِ مُسْلِمِىْ مَكَّةَ كَانُوْا فِىْ ضَيْقٍ مِنْ اِظْهَارِ الْاِسْلَامِ بِهَا .

৫৬. হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। যে জমিনে ইবাদতের সুযোগ আছে আর যেখানে ইবাদতের সুযোগ নেই সেখান থেকে তোমরা হিজরত কর। উক্ত আয়াতটি মক্কার ঐসব দুর্বল মুসলমানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করতে বাধাগ্রস্ত ছিলেন।

৫৭. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَعْدَ الْبَعْثِ ـ

৫৭. প্রত্যেক জীবনই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা জীবিত হওয়ার পর আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُونَ -এর মধ্যে ى ও ت উভয়ের সংযুক্তিতে পড়া যাবে।

৫৮. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُنْزِلَنَّهُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ النُّوْنِ مِنَ الثَّوٰى الْإِقَامَةُ وَتَعْدِيَتُهُ إِلٰى غُرَفٍ بِحَذْفِ فِيْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا ط نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ هٰذَا الْأَجْرُ هُمْ ـ

৫৮. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে অবতরণ করাব। অন্য কেরাত অনুযায়ী نُبَوِّئَنَّ -এর মধ্যে ن -এর পর ث পড়বে তখন তা الثَّوٰى থেকে নির্গত, যার অর্থ অবস্থান করা এবং তা غُرَفٌ -এর দিকে নিসবত হয় فِيْ -এর বিলুপ্ত হয়ে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে আমরা তাদের জন্য জান্নাতের বালাখানাতে চিরকাল থাকার নির্ধারণ করে দিয়েছি কত উত্তম এই পুরস্কার কর্মীদের পুরস্কার।

৫৯. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلٰى أَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْهِجْرَةِ لِإِظْهَارِ الدِّيْنِ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوْنَ ـ

৫৯. যারা ধৈর্য ধারণ করে দীন প্রকাশ করতে গিয়ে মুশরিকদের নির্যাতনের উপরও হিজরতের কষ্টের উপর ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। ফলে তিনি তাদেরকে এমনভাবে রিজিক দান করবেন যা তারা কল্পনাও করবে না।

৬০. وَكَاَيِّنْ كَم مِنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لِضُعْفِهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ز أَيُّهَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ زَادٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِقَوْلِكُمْ الْعَلِيْمُ بِضَمَائِرِكُمْ ـ

৬০. এবং এমন অনেক জন্তু আছে যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না তাদের দুর্বলতার কারণে আল্লাহই তাদের এবং তোমাদেরকে রিজিক দেন। হে মুহাজিরগণ যদিও তোমাদের সাথে কোনো আসবাব ও অর্থ না থাকে এবং তিনি তোমাদের কথা সর্বশ্রোতা ও তোমাদের অন্তরের ভেদ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

৬১. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَأَلْتَهُمْ أَيِ الْكُفَّارَ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنْ تَوْحِيْدِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِمْ بِذٰلِكَ ـ

৬১. যদি আপনি তাদেরকে কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? لَئِنْ -এর মধ্যে লাম অক্ষরটি শপথের অর্থ বুঝানোর জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে তারা একত্ববাদের স্বীকারের পর একত্ববাদের ধর্ম ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?

٦٢. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ يُضَيِّقُ لَهُ بَعْدَ الْبَسْطِ اَىْ لِمَنْ يَّشَاءُ اِبْتِلَاءً اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ مَحَلُّ الْبَسْطِ وَالتَّضْيِيْقِ.

৬২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন পরীক্ষামূলকভাবে এবং প্রশস্তের পরে তার জন্যে বা যার জন্যে ইচ্ছা পরীক্ষামূলকভাবে হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। এবং সে জ্ঞাত বিষয়ে রিজিক প্রশস্ত ও হ্রাস করার বিষয়ও রয়েছে।

٦٣. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط فَكَيْفَ يُشْرِكُوْنَ بِهِ قُلْ لَهُمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ثُبُوْتِ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ تَنَاقُضَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ.

৬৩. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, لَئِنْ -এর মধ্যে লাম অক্ষরটি শপথের অর্থ প্রদান করে কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। অতঃপর কিভাবে তারা তাঁর সাথে শরিক করে আপনি তাদেরকে বলুন, তোমাদের কাছে প্রমাণাদি প্রমাণ হওয়ায় আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহরই কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা তাদের যুক্তির বৈপরীত্য বুঝে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ صَفْقَةَ : এর অর্থ হলো হাতের উপর হাত মারা [করমর্দন করা], তালি বাজানো, লেনদেন করা। আরবীয়দের অভ্যাস ছিল যে, বেচাকেনা পরিপূর্ণ হওয়াকে বুঝানোর জন্য بَيْع -এর শেষে পরস্পর হাত মিলাতেন। এখানে مُطْلَقًا بَيْع উদ্দেশ্য যাকে ব্যবসায়ের ভাষায় সওদা বলা হয়।

قَوْلُهُ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ : اِيَّاىَ টা তার পূর্বে উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। পরবর্তী ফে'ল তার তাফসীর করছে। উহ্য ইবারত হবে- فَاعْبُدُوْا اِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ

قَوْلُهُ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর تَبْوِئَةٌ মাসদার হতে جَمْع -এর لَام تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة -এর মুতাকাল্লিম -এর সীগাহ। মূলবর্ণ হলো بَوْءٌ অর্থ- ঠিকানা দেওয়া, জায়গা ঠিক করা। অন্য এক কেরাতে রয়েছে لَنُثْوِيَنَّهُمْ অর্থাৎ لَنُقِيْمَنَّهُمْ যা اَلثَّوَاءُ হতে مُشْتَقّ হয়েছে। অর্থ- প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী غُرَفًا টা مَفْعُوْل بِه হবে। نُثْوِىَ টা نُنْزِلُ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হবে। আর প্রথম مَفْعُوْل হলো هُمْ আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো غرفا যা উহ্য فِىْ -এর সাথে হয়েছে। অর্থাৎ فِىْ غُرَفٍ مِنَ الْجَنَّةِ প্রথম কেরাতে غُرَفًا টা দ্বিতীয় مَفْعُوْل আর هُمْ হলে প্রথম মাফউল। কেননা بَوَّأَ টা مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل
আল্লাহ তা'আলা বলেন- تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ এবং কখনো لَام দ্বারাও হয় যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

قَوْلُهُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ : এটা বাক্য হয়ে غُرَفًا -এর صِفَت হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এটা হলো মুবতাদা আর لَنُبَوِّئَنَّهُمْ হলো তার খবর وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب ও হতে পারে। পরবর্তী ফে'লটি যার উপর বুঝাচ্ছে। এ সুরতে এটা بَاب اِشْتِغَال -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ مُقَدِّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, خَالِدِيْنَ টা حَال مُقَدَّرَه হয়েছে অর্থাৎ إِنَّهُمْ حِيْنَ الدُّخُوْلِ يُقَدِّرُوْنَ الْخُلُوْدَ

قَوْلُهُ هٰذَا الْأَجْرُ : এটা হলো مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ আর اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا হলো উহ্য هُمْ মুবতাদার খবর। যেমনটি ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর এটা اَلْعَامِلِيْنَ -এর সিফতও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ : كَاَيِّنْ হলো মুবতাদা مُمَيَّزْ আর مِنْ دَابَّةٍ হলো তার تَمْيِيْز আর لَا تَحْمِلُ হলো دَابَّةٍ -এর সিফত আর اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا জুমলা হয়ে كَاَيِّنْ মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থিদের পথে নানা রকম বাধাবিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধিবিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন : إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ আল্লাহ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারো এ ওজর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহর জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোনো স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর নির্দেশাবলি নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দু প্রকার আশঙ্কা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশঙ্কা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এ আশঙ্কার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হেফাজতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এ সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দু আয়াতে এর উল্লেখ আছে- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا الخ

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশঙ্কা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুজি-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাসপত্রকে রিজিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই রিজিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিজিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে- وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীবজন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোনো ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে; কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি। তারা কোনো কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপারে নয় বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা।

রিজিকের আসল উপায় আল্লাহর দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র সূর্য কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্ট দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জবাবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। আপনি বলুন তাহলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের পূজাপাটি ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজসরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরজ অথবা ওয়াজিব হয়? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসার ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধিবিধান এ সূরারই ৮৯ নং আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরজে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরজই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলাম হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদাতের অনুরূপ। এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরিউক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার ৯৮ নং আয়াতে তথা اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরিউক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ তখন মক্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কুরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরজ হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন–

মাসআলা : যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরিয়তের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব। তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ওজর আইনত গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা : কোনো দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলি পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্য দারুল কুফর হওয়া জরুরি নয়, বরং 'দারুল ফিসক' [পাপাচারের দেশ] যেখানে প্রকাশ্যে শরিয়তের নির্দেশাবলি অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হজর ফতহুল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোনো ধারাই এর পরিপন্থি নয়। মুসনাদে আহমদে আবূ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ حَيْثُمَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহর নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহর বান্দা। কাজেই যেখানেই তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর। –[ইবনে কাসীর]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা (র.) বলেন, কোনো শহরে তোমাকে গুনাহ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও। –[ইবনে কাসীর]

٦٤. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاَمَّا الْقُرَبُ فَمِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ لِظُهُوْرِ ثَمَرَتِهَا فِيْهَا وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ بِمَعْنَى الْحَيٰوةِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا اٰثَرُوا الدُّنْيَا عَلَيْهَا .

٦٥. فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَىِ الدُّعَاءَ اَىْ لَا يَدْعُوْنَ مَعَهُ غَيْرَهُ لِاَنَّهُمْ فِىْ شِدَّةٍ وَلَا يَكْشِفُهَا اِلَّا هُوَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ بِهٖ .

٦٦. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِنَ النِّعْمَةِ وَلِيَتَمَتَّعُوْا قف بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلٰى عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ اللَّامِ اَمْرُ تَهْدِيْدٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ ذٰلِكَ .

٦٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا بَلَدَهُمْ مَكَّةَ حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط قَتْلًا وَسَبْيًا دُوْنَهُمْ اَفَبِالْبَاطِلِ الصَّنَمِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ بِاِشْرَاكِهِمْ .

٦٨. وَمَنْ اَظْلَمُ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِاَنْ اَشْرَكَ بِهٖ اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ النَّبِىِّ اَوِ الْكِتَابِ لَمَّا جَآءَهٗ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَاْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ اَىْ فِيْهَا ذٰلِكَ وَهُوَ مِنْهُمْ .

অনুবাদ :

৬৪. এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া তো কিছুই নয় শুধুমাত্র ইবাদতসমূহ আখেরাতের কর্ম কেননা এর ফলাফল পরকালে প্রকাশ পায় এবং পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন। যদি তারা তা জানত তবে দুনিয়ার জীবনকে কখনো আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতেন না।

৬৫. তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহকে ডাকে তারা তার সাথে অন্য কাউকে ডাকে না কেননা তখন তারা বিপদে, তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে উদ্ধার করবে না। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা শরিক করতে থাকে।

৬৬. যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দেওয়া নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে এবং তারা একত্রে মূর্তিপূজায় লিপ্ত থেকে ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। অন্য কেরাত মতে لِيَتَمَتَّعُوْا -এর মধ্যে লামকে সাকিন সহকারে পড়বে এবং এখানে সীগাহে আমরটি ধমক ও تَهْدِيْد -এর জন্য। সত্বরই তারা এর পরিণাম জানতে পারবে।

৬৭. তারা কি জানে না যে, আমি তাদের শহর মক্কাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বের মানুষদেরকে হত্যা ও বন্দির মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই মূর্তিই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নিয়ামত শিরকের মাধ্যমে অস্বীকার করবে?

৬৮. কে বড় জালেম অর্থাৎ কোনো বড় জালেম নেই তার চেয়ে যে আল্লাহর প্রতি শিরকের মাধ্যমে মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা তার কাছে সত্য নবী বা কিতাব আসার পর তাকে অস্বীকার করে। কাফেরদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নাম নয়? এসব ব্যক্তি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।

٦٩. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا فِيْ حَقِّنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط اَيْ طُرُقَ السَّيْرِ اِلَيْنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ.

৬৯. যারা আমার পথে শুধুমাত্র আমার জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে আমার দিকে আসার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের মুমিনদের সাথে আছেন সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَللَّهْوُ : দুনিয়া উপভোগে ডুবে যাওয়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, অহেতুক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়াকে لَهْو বলা হয়।

قَوْلُهُ حَيَوَانٌ : জিন্দেগি, জন্ম নেওয়া, এটা বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। মূলে ছিল حَيَيَانٌ দ্বিতীয় يَاء -কে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করায় حَيَوَانٌ হয়েছে। এটি حَيَاةٌ থেকে অধিক بَلِيْغ কেননা فَعَلَانٌ -এর ওজনের মধ্যে নড়াচড়া এবং পেরেশানির অর্থ রয়েছে যা حَيَاتٌ -এর জন্য আবশ্যক। এ কারণেই এ স্থানে حَيَاةٌ -এর পরিবর্তে حَيَوَانٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ : ذٰلِكَ হলো يَعْلَمُوْنَ -এর মাফউল لَوْ হলো হরফে শর্ত। আর مَا اٰثَرُوا الدُّنْيَا عَلَيْهَا হলো জবাবে শর্ত।

قَوْلُهُ اَيِ الدُّعَاءَ : এটা অর্থ নির্দিষ্টকরণের জন্য হয়েছে। دِيْن -এর যেহেতু অনেক অর্থ রয়েছে। এখানে اَلدُّعَاءُ -এর মাধ্যমে তাফসীর করে একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ : এটা نَلَمَّا -এর জবাব। উদ্দেশ্য হলো এই যে, ডুবে যাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই শিরক আরম্ভ করে দেয়।

لِيَكْفُرُوْا -এর মধ্যে لَامْ টা হলো لَامِ كَيْ আর لِيَتَمَتَّعُوْا টা لِيَكْفُرُوْا -এর উপর আতফ হয়েছে।

বি. দ্র. এ لَامْ টিকে لَامِ كَيْ -এর পরিবর্তে যদি لَامِ عَاقِبَة ধরা হয় তবে অধিক সমীচীন হতো। (جَمَلْ) এক কেরাতে لَامْ সাকিন রয়েছে। এ সুরতে এটা لَامِ اَمْر হবে উভয় ফে'লের মধ্যেই। কিন্তু এখানে এ সংশয়ের সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহর ফে'ল মন্দকর্মের আদেশ করা আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন হাকীম আর হাকীম মন্দকর্মের নির্দেশ দিতে পারেন না।

اَمْر تَهْدِيْد বলে এর উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ اَمْر দ্বারা اَمْر اِمْتِثَالْ উদ্দেশ্য নয়, বরং ভীতি প্রদর্শন ও ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। আর فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ টা اَمْر تَهْدِيْدِيْ হওয়ার প্রমাণ।

قَوْلُهُ وَيُتَخَطَّفُ : جُمْلَة حَالِيَة -এর পূর্বে هُمْ উহ্য মুবতাদা রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَهُمْ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ الخ

قَوْلُهُ فِيْهَا ذٰلِكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ -এর মধ্যে هَمْزَة টি اِنْكَارْ -এর জন্য হয়েছে। আর এটা اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِيْ এজন্য হয়েছে যে, لَيْسَ হলো حَرْف نَفِيْ যখন তার উপর هَمْزَة اِنْكَارِيْ প্রবেশ করে তখন نَفِيْ এবং نَفِيْ মিলে اِثْبَاتْ হয়ে গেল। কাজেই তাতে تَقْرِيْر -এর অর্থ সৃষ্টি হয়ে গেল। উদ্দেশ্য হলো নিঃসন্দেহে কাফেরদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তা দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরিক মনে করে না কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জবাব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ এখানে حيوان শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন। -[কুরতুবী]

এতে পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়া-কৌতুককের যেমন কোনো স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোনো বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরো একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এ অবস্থায় চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোনো বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং তা নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন এ আশঙ্কা দূর করার জন্য কোনো প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরিক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এ বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা সে مُضْطَرٌ তথা অসহায়। আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন। -[কুরতুবী]

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا الْاٰيَة : উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তাঁর খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তারই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোনো কোনো মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে। কারণ সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। -[রূহুল মা'আনী]

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারাম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সেও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا : جِهَادٌ -এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধাবিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধাবিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভালো মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কূল কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে : এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়েল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই। -[মাযহারী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

٢. غُلِبَتِ الرُّوْمُ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ غَلَبَتْهَا فَارِسُ وَلَيْسُوْا اَهْلَ كِتَابٍ بَلْ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ فَفَرِحَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِذٰلِكَ وَقَالُوْا لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحْنُ نَغْلِبُكُمْ كَمَا غَلَبَتْ فَارِسُ الرُّوْمَ .

٣. فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ اَيْ اَقْرَبَ اَرْضِ الرُّوْمِ اِلٰى فَارِسَ بِالْجَزِيْرَةِ الْتَقٰى فِيْهَا الْجَيْشَانِ وَالْبَادِيْ بِالْغَزْوِ الْفَرْسُ وَهُمْ اَيِ الرُّوْمُ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ اُضِيْفَ الْمَصْدَرُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ اَيْ غَلَبَةُ فَارِسٍ اِيَّاهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ فَارِسَ .

٤. فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ط هُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ اِلَى التِّسْعِ اَوِ الْعَشْرِ فَالْتَقَى الْجَيْشَانِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْاِلْتِقَاءِ الْاَوَّلِ وَغَلَبَتِ الرُّوْمُ فَارِسَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ط اَيْ مِنْ قَبْلِ غَلَبَةِ الرُّوْمِ وَمِنْ بَعْدِهٖ الْمَعْنٰى اَنَّ غَلَبَةَ فَارِسَ اَوَّلًا وَغَلَبَةَ الرُّوْمِ ثَانِيًا بِاَمْرِ اللّٰهِ اَيْ اِرَادَتِهٖ وَيَوْمَئِذٍ اَيْ يَوْمَ تَغْلِبُ الرُّوْمُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ .

অনুবাদ :

১. আলীফ, লাম, মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত রয়েছেন।

২. রোমকরা পরাজিত হয়েছে। তারা আহলে কিতাব ছিলেন আর তাদেরকে পারসিকরা পরাজিত করেছেন এবং পারসিকরা আহলে কিতাব ছিলেন না; বরং তারা মূর্তি পূজা করত। অতএব সে সংবাদে মক্কার কাফেরগণ আনন্দিত হয়েছে এবং তারা মুসলমানদেরকে বলল : আমরা তোমাদের উপর বিজয় হবো যেমন পারস্যরা রুমের উপর বিজয় হয়েছে।

৩. নিকটবর্তী এলাকায় অর্থাৎ রূম ভূখণ্ডের ঐ এলাকায় যা পারস্যের অনেক নিকটবর্তী যেখানে উভয়দলের সৈন্যদল মুখোমুখি হয়েছে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভকারী পারসিকগণ এবং তারা রোমকরা তাদের পরাজয়ের পর এতে মাসদারকে মাফউল -এর দিকে ইজাফত করা হয়েছে অর্থাৎ غَلَبَةَ فَارِسٍ اِيَّاهُمْ তথা পারসিকরা তাদের উপর বিজয় হওয়ার পর অতিসত্বর তারা পারসিকদের উপর বিজয় হবেন।

৪. কয়েক বছরের মধ্যে তা তিন থেকে নয় বা দশ বছরের মধ্যে। অতঃপর প্রথম যুদ্ধের সাত বছর পর উভয় দলের পুনরায় মোকাবিলা ও মুখোমুখি হয় কিন্তু এতে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় হয়েছেন। অগ্র পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। অর্থাৎ রোমকদের বিজয়ের আগে ও পরে, যার অর্থ হলো, নিশ্চয়ই পারসিকদের প্রথম বিজয় হওয়া ও রোমকদের দ্বিতীয়বারে বিজয় হওয়া সবই আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছায় এবং সেদিন যেদিন রোমকগণ বিজয়ী হবেন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।

٥. بِنَصْرِ اللّٰهِ ط اِيَّاهُمْ عَلٰى فَارِسَ وَقَدْ فَرِحُوْا بِذٰلِكَ وَعَلِمُوْا بِهٖ يَوْمَ وُقُوْعِهٖ يَوْمَ بَدْرٍ بِنُزُوْلِ جِبْرَئِيْلَ بِذٰلِكَ فِيْهِ مَعَ فَرَحِهِمْ بِنَصْرِهِمْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

৫. আল্লাহর সাহায্যে পারসিকদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতি এবং মুসলমানগণ এতে আনন্দিত হয়েছেন। সে সাহায্য আসার প্রতি তাদের ধারণা লাভ হয়েছে বদরের দিন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ওহী আনয়নের মাধ্যমে এবং এই আনন্দ মুসলমানদের বদরের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦. وَعْدَ اللّٰهِ ط مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ وَالْاَصْلُ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ النَّصْرَ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ بِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَعْدَهٗ تَعَالٰى بِنَصْرِهِمْ.

৬. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে وَعْدَ শব্দটি মাসদার এবং فعل থেকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর আসল হলো وَعَدَهُمُ اللّٰهُ النَّصْرَ তথা আল্লাহ তাদেরকে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক মক্কার কাফেরগণ মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা জানে না।

٧. يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا صلے اَىْ مَعَايِشَهَا مِنَ التِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ اِعَادَةُ هُمْ تَاكِيْدٌ.

৭. তারা পার্থিবজীবনের বাহ্যিক দিক অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পদ্ধতি তথা ব্যবসা, ক্ষেত, কৃষি, দালান নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। এতে هُمْ সর্বনামকে তাকীদ তথা দৃঢ়তার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

٨. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ﻭﻗﻒ لِيَرْجِعُوْا عَنْ غَفْلَتِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط لِذٰلِكَ تَفْنٰى عِنْدَ انْتِهَائِهٖ وَبَعْدَ الْبَعْثِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ اَىْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

৮. তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, যাতে তারা তাদের উদাসীনতা থেকে ফিরে আসে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পর এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরে উঠবে। কিন্তু অনেক মানুষ মক্কার কাফেরগণ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।

৯. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْأُمَمِ وَهِيَ إِهْلَاكُهُمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً كَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ حَرَثُوهَا وَقَلَّبُوهَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ط بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَهُمْ.

৯. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের সাবেক উম্মতদেরকে কি কি হয়েছে? এবং তা তাদের নবীদের অবিশ্বাস করার কারণে ধ্বংস হওয়া তারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল যেমন আদ ও সামূদ গোত্র এবং তারা জমিন চাষ করতো বৃক্ষ রোপণ ও ক্ষেত করার উদ্দেশ্যে জমিন উলটপালট করতো এবং তারা তাদের মক্কার কাফেরগণের চেয়ে বেশি আবাদ করতো। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশ্য দলিলাদি নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ অন্যায়ভাবে তাদের ধ্বংস করে তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি তাদের নবীদেরকে অস্বীকার করে জুলুম করেছিল।

১০. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ تَانِيثُ الْأَسْوَاءِ الْأَقْبَحِ خَبَرُ كَانَ عَلَى رَفْعِ عَاقِبَةُ وَاسْمُ كَانَ عَلَى نَصْبِ عَاقِبَةَ وَالْمُرَادُ بِهَا جَهَنَّمُ وَإِسَاءَتُهُمْ أَنْ أَيْ بِأَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ الْقُرْآنِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ.

১০. অতঃপর যারা মন্দকর্ম করতো তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। اَلسُّوْاٰى শব্দটি اَسْوَاٰى -এর স্ত্রীলিঙ্গ যার অর্থ اَقْبَحُ তথা মন্দ। যদি عَاقِبَةُ -কে পেশবিশিষ্ট পড়া হয় তবে سُوْاٰى টি كَانَ -এর খবর হবে আর যদি নসববিশিষ্ট হয় তবে سُوْاٰى টি كَانَ -এর اِسْم হবে। আর এখানে মন্দ পরিণাম থেকে উদ্দেশ্য জাহান্নাম। তাদের মন্দ পরিণামের কারণ তারা আল্লাহর কুরআনের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতো এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ غُلِبَتِ الرُّوْمُ : রোম একটি গোত্রের নাম যা তাদের সম্মানিত দাদা রূম ইবনে ঈসু ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম -এর নামে সুপ্রসিদ্ধ। ঈসু স্বীয় ভাই ইয়াকূবের সাথে তার মায়ের উদরে অবস্থান করছিল। যখন তাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলো তখন ঈসু হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে বলল, আমাকে প্রথমে বের হতে দাও। যদি তুমি আমাকে প্রথমে বের হতে না দাও তবে আমি তোমার সমপর্যায়ের হয়ে বের হবো। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) দয়াপরবশ হয়ে পিছে সরে গেলেন। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) اَبُوْ الْاَنْبِيَاءِ হয়েছেন এবং ঈসু اَبُوْ الْجَبَّارِيْنَ [অবাধ্যদের গুরু] তে পরিণত হয়েছে। (جَمَل)

قَوْلُهُ الْجَزِيْرَة : দজলা এবং ফুরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে জাযীরা বলা হয়। এখানে 'জাযীরাতুল আরব' উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ بِالْجَزِيْرَة : এটা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে اَلْاَرْضِ -এর সিফত হয়েছে। অর্থাৎ

أَرْضُ الرُّوْمِ الْكَائِنَةُ بِالْجَزِيْرَةِ وَقَدْ فَرِحُوْا بِذَالِكَ لِيْ

قَوْلُهُ يَوْمَ وُقُوْعِهِ يَوْمَ بَدْرٍ : এখানে يَوْمَ بَدْرٍ টা يَوْمَ وُقُوْعِهِ থেকে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهُ بِنُزُوْلِهِ : এটা عَلِمُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। অর্থাৎ রোমকদের বিজয় সম্পর্কে বদর যুদ্ধের দিন জানা গেছে এবং রোমীয়দের বিজয় সেদিনেই হয়েছে যেদিন মুসলমানগণ বদর রণাঙ্গনে চিরশত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। আর মুসলমান ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত এ সংবাদ জানতে পেরেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের দলিল উল্লিখিত হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী ﷺ রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছিল। অবশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বিগত সূরার শেষে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আর এ সূরায়ও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দান করেন, এরপর সেই বিজয়ীকে আবার পরাজিতও করেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো বিজয় তার সত্যতার দলিল নয়। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার এ জীবনে সম্মান মর্যাদা বা অপমান সবই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন, এ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা কেন আজাবকে ত্বরান্বিত করতে চায় এবং মুসলমানদের সাময়িক দারিদ্র্য দেখে কেন তাদেরকে হেয় মনে করে, কেননা মুসলমানদের এখন একটি ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে, অথচ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের এ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সৈনিকগণ রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের ধনসম্পদ মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসে বিতরণ করবে।

তৃতীয়ত বিগত সূরার শেষে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে হিজরত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। হিজরতের কারণে যে কষ্ট হবে, তার উপর সবর অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর বর্তমান সূরায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে যত পরিবর্তন হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যত ক্ষমতা হাতবদল হচ্ছে, এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

قَوْلُهُ الٓمٓ ـ غُلِبَتِ الرُّوْمُ الخ : সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী : সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহ তা'আলারই সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এ সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারো বিজয় এবং কারো পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনো কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খ্রিস্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন– (تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (الاٰيَة আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই যে, তখনকার মতো পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

এ ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানদের আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।

–[ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম]

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর দুশমন তুই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয় তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো [বলা বাহুল্য, এটা ছিল জুয়া। কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।] একথা বলে হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনের এর জন্য بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রীর বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর (রা.) আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিকে সম্মত হলো।

–[ইবনে জারীর, তিরমিযী]

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর (রা.) তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে উবাই যখন আশঙ্কা করল যে, হযরত আবূ বকর (রা.)ও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবূ বকর (রা.) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকীর বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে– هٰذَا السُّحْتُ تَصَدَّقْ بِهٖ এটা হারাম। একে সদকা করে দাও। –[রূহুল মা'আনী]

জুয়া : কুরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শয়তানি অপকর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়।

এ আয়াতে : قَوْلُهٗ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ مَيْسِرْ ও اَزْلَام বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.) উবাই ইবনে খালফের সাথে যে দু-তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও একপ্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سُحْتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকহবিদগণ এর জবাবে বলেন, এ মাল যদিও তখন হালাল ছিল, কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে এ মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) কখনো মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে سُحْتٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ মেনে নেওয়া হয়, তবে سُحْتٌ শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ এখানে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে سُحْتٌ -এর অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কুরআনে এবং ইবনে আসীর 'নিহায়া' গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকহবিদদের এই জবাব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরি যে, বাস্তবে এ মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেওয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোনো শরিয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ : অর্থাৎ যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বুঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর, বিশেষত যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বুঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কুরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদের একজে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ : অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেঁচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে- এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখন থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলা বাহুল্য, এ সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কুরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ -এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرًا -কে تَنْكِيْر এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না- এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় : কুরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আজাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে শক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-বাসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সামর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কুরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে– জীবনের লক্ষ্য বানায় না। إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا (اَلْاٰيَة) আয়াতের অর্থ তাই।

قَوْلُهٗ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ الخ : উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানায় স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোনো মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এ উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরি। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থি। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভালো অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশি জীবনযাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরি, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভালো ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এ সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়– ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ এ বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে– اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়েমেনে সফর করে– এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তা দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তা দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আজাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আজাবে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আজাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

অনুবাদ :

١١. اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ اَىْ يُنْشِئُ خَلْقَ النَّاسِ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اَىْ خَلْقَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ.

১১. আল্লাহ তা'আলাই প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা। এরপর তোমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ শব্দকে ت ও ى উভয়ের সাথে পড়া যাবে।

١٢. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ يَسْكُتُ الْمُشْرِكُوْنَ لِانْقِطَاعِ حُجَّتِهِمْ.

১২. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। মুশরিকগণ দলিলবিহীন হওয়ার কারণে নিশ্চুপ ও নীরব হয়ে যাবে।

١٣. وَلَمْ يَكُنْ اَىْ لَا يَكُوْنُ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ مِمَّنْ اَشْرَكُوْهُمْ بِاللّٰهِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لِيَشْفَعُوْا لَهُمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا اَىْ يَكُوْنُوْنَ بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ اَىْ مُتَبَرِّئِيْنَ مِنْهُمْ.

১৩. তাদের দেবতাগুলোর যেসব দেবতাকে তারা আল্লাহর সাথে শরিক করতো যাতে এগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করে মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশকারী হবে না। এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ তাদের থেকে নিজেদের পবিত্রতা প্রকাশ করবে।

١٤. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ تَاكِيْدٌ يَّتَفَرَّقُوْنَ اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكَافِرُوْنَ.

১৪. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরগণ বিভক্ত হয়ে পড়বে। يَوْمَئِذٍ শব্দটি পূর্বের يَوْمَ -এর তাকিদ।

١٥. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ جَنَّةٍ يُّحْبَرُوْنَ يُسَرُّوْنَ.

১৫. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে।

١٦. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ.

১৬. আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ কুরআন ও পরকালের সাক্ষাতকারকে তথা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও অন্যান্য মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আজাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

١٧. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ اَىْ سَبِّحُوا اللّٰهَ بِمَعْنٰى صَلُّوْا حِيْنَ تُمْسُوْنَ اَىْ تَدْخُلُوْنَ فِى الْمَسَآءِ وَفِيْهِ صَلَاتَانِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَآءُ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ تَدْخُلُوْنَ فِى الصَّبَاحِ وَفِيْهِ صَلٰوةُ الصُّبْحِ.

১৭. অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর অর্থাৎ এতে سُبْحٰنَ اللّٰهِ টি سَبِّحُوا اللّٰهَ আদেশসূচক ফে'লের অর্থ প্রদান করবে এবং سَبِّحُوا اللّٰهَ অর্থ صَلُّوْا তথা তোমরা নামাজ পড় সন্ধ্যায় তথা যখন তোমরা বিকালের সময়ে প্রবেশ করবে তখন দুটি নামাজ মাগরিব ও ইশার নামাজ এবং সকালে যখন তোমরা সকালের সময়ে উপনীত হবে এবং তখন ফজরের নামাজ।

١٨. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ اِعْتِرَاضٌ وَمَعْنَاهُ يَحْمَدُهُ اَهْلُهُمَا وَعَشِيًّا عَطْفٌ عَلٰى حِيْنَ وَفِيْهِ صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ تَدْخُلُوْنَ فِي الظَّهِيْرَةِ وَفِيْهِ صَلٰوةُ الظُّهْرِ .

১৮. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য তথা جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ যার অর্থ হলো, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা তারই প্রশংসা করে এবং অপরাহ্নে এখানে عَشِيًّا শব্দটি حِيْنَ -এর উপর আতফ হয়েছে এবং অপরাহ্নের নামাজ পড় এবং তা আছরের নামাজ এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নের সময়ে উপনীত হবে। এবং তখন জোহরের নামাজ।

١٩. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالْاِنْسَانِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالطَّائِرَةِ مِنَ الْبَيْضَةِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ النُّطْفَةَ وَالْبَيْضَةَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اَيْ يُبْسِهَا وَكَذٰلِكَ الْاِخْرَاجِ تُخْرَجُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ .

১৯. তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন যেমন মানুষকে এক ফোটা পানি থেকে ও পক্ষিকুলকে ডিম থেকে এবং মৃতকে নুতফা ও ডিমকে জীবিত থেকে বের করেন এবং ভূমিকে শস্য দ্বারা জীবিত করেন তার মৃত্যুর শুকে যাওয়ার পর এবং এভাবে তোমরা উত্থিত হবে কবর থেকে। এখানে تُخْرَجُوْنَ সীগাহকে فِعْلٌ مَعْرُوْفٌ ও فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ উভয় ধরনের পড়া যাবে। কিন্তু পার্থক্য হলো مَعْرُوْف -এর ক্ষেত্রে تَخْرُجُوْنَ তিন হরফবিশিষ্ট بَابُ نَصَرَ থেকে হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ : এখানে تَجَدُّدْ -কে বুঝানোর জন্য مَاضِىْ -এর পরিবর্তে مُضَارِعْ -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন। কেননা بَدَا এবং خَلَقَ প্রতি মুহূর্তেই হতে থাকে। আর যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন تَجَدُّدْও হতে থাকবে يَبْدَؤُا -এর وَاوْ টি جَمْع -এর নয়; বরং مُشَابَهْ جَمْع হওয়ার কারণে তার শেষে اَلِفْ লেখা হয়েছে, কিন্তু এটা পড়া যায় না আর না পড়ার নিদর্শনরূপে ঐ اَلِفْ -এর উপর একটি ছোট গোল রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ يُنْشِئُ : يَبْدَاُ -এর অর্থ বর্ণনা করার জন্য يُنْشِئُ দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। এর অর্থ হলো– প্রকাশ করা, অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা। يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এটা يُبْلِسُ -এর ظَرْف مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَكُوْنُ : لَمْ يَكُنْ -এর তাফসীর لَا يَكُوْنُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَمْ يَكُنْ টা যদিও مَاضِىْ -এর অর্থে কিন্তু এখানে مُضَارِعْ -এর অর্থই উদ্দেশ্য। بِشُرَكَائِهِمْ এটা كَافِرِيْنَ -এর مُتَعَلِّقْ مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ يُحْبَرُوْنَ : এটা বাবে نَصَرَ -এর حَبْرٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ- তাদেরকে খুশি করা হবে, তাদেরকে সম্মানিত করা হবে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى صَلُّوْا : سَبِّحُوْا -এর তাফসীর صَلُّوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, قَلْبِىْ - قَوْلِىْ - فِعْلِىْ এবং তিন পদ্ধতিতেই তাসবীহ হয়ে থাকে। আর صلوة এ সবগুলোকেই একত্র করে থাকে। আর سُبْحٰنَ اللّٰهِ -এর তাফসীর سَبِّحُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَبَرْ টা اَمْر -এর অর্থে হয়েছে। আর سُبْحٰنَ হলো মাসদার এর পূর্বে فِعْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ سَبِّحُوْا سُبْحَانًا

قَوْلُهُ تُمْسُوْنَ : تُمْسُوْنَ এবং تُصْبِحُوْنَ -এর তাফসীর تَدْخُلُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয়টি فِعْل تَامْ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ اِعْتِرَاضٌ : অর্থাৎ مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর মধ্যে جُمْلَة مُعْتَرِضَة হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ : يُحْبَرُوْنَ শব্দটি حُبُوْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতিগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এ শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তু উল্লেখ করেছেন। এগুলো সব এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ

سُبْحَانَ শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে অর্থাৎ سَبِّحُوا اللّٰهَ سُبْحَانًا حِيْنَ تُمْسُوْنَ অর্থাৎ সন্ধ্যায় حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ সকালে وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ বাক্যটি প্রমাণ হিসেবে মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরি। কারণ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষ ভাগে عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরো দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্নে তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামি তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে জোহরের অগ্রে রাখার এক কারণে সম্ভবত এই যে, আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তাসবীহ অথবা নামাজ সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কুরআনে صَلٰوةِ وُسْطٰى তথা আসরের নামাজের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ ... الصَّلٰوةِ উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিবের নামাজ, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামাজ, عَشِيًّا শব্দে আসরের নামাজ এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে জোহরের নামাজ উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে ইশার নামাজের প্রমাণ আছে অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও ইশা উভয় নামাজ ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কুরআন পাকে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে– وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى হযরত ইবরাহীম (আ.) সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবূ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحَانَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এ তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়ে তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেওয়া হয়।

–[রূহুল মা'আনী]

২০. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ تَعَالٰى الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ اَىْ اَصْلَكُمْ اٰدَمَ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ دَمٍ وَّلَحْمٍ تَنْتَشِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ ـ

২১. وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا فَخُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ وَسَائِرُ النِّسَاءِ مِنْ نُّطَفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَتَاْلَفُوْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ جَمِيْعًا مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِىْ صُنْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

২২. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ اَىْ لُغَاتِكُمْ مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَّعَجَمِيَّةٍ وَّغَيْرِهِمَا وَاَلْوَانِكُمْ ط مِنْ بَيَاضٍ وَّسَوَادٍ وَّغَيْرِهِمَا وَاَنْتُمْ اَوْلَادُ رَجُلٍ وَّاحِدٍ وَّامْرَاَةٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِّلْعٰلَمِيْنَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا اَىْ ذَوِى الْعُقُوْلِ وَاُولِى الْعِلْمِ ـ

২৩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِاِرَادَتِهٖ تَعَالٰى رَاحَةً لَّكُمْ وَابْتِغَاؤُكُمْ بِالنَّهَارِ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اَىْ تَصَرُّفُكُمْ فِىْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ بِاِرَادَتِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَّاعْتِبَارٍ ـ

অনুবাদ :

২০. তার নিদর্শনাবলির যা তার কুদরতের প্রমাণ বহনকারী মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের তোমাদের মূল হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমরা এখন রক্ত ও মাংসের গড়া মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।

২১. আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গীনিদের সৃষ্টি করেছেন, অতএব হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর পাজরের হাড় থেকে এবং অন্যান্য সকল নারীদেরকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মিশ্রিত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তাদেরকে ভালোবাস এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে নিদর্শনাবলি রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যারা চিন্তা করে তাদের জন্যে।

২২. তার আরো এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ভাষার বিভিন্নতা কেউ আরবি, কেউ অনারবী ও অন্যান্য ও বর্ণের বৈচিত্র্য। কেউ সাদা, কেউ কালো ও অন্যান্য অথচ তোমরা সবাই এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্ট। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি যা তার কুদরতের উপর প্রমাণস্বরূপ রয়েছে। لِلْعٰلَمِيْنَ শব্দের মধ্যে লামের যের ও যবর উভয় ধরনের পড়া যাবে। যদি যের পড়ে তখন অর্থ হবে 'জ্ঞানীব্যক্তি'।

২৩. তার আরো নিদর্শন রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা তোমাদের আরাম ও আয়েশের জন্যে আল্লাহর ইচ্ছায় এবং দিনের বেলায় তোমাদের তার কৃপা অন্বেষণ। জীবিকা অন্বেষণের জন্যে তোমাদের শ্রম ও মেহনত আল্লাহর ইচ্ছায় নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। চিন্তা ও শিক্ষার জন্য শ্রবণকারীদের।

২৪. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ اَيْ اِرَاءَ تَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الصَّوَاعِقِ وَطَمَعًا لِلْمُقِيْمِ فِى الْمَطَرِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اَىْ يَبْسِهَا بِاَنْ تُنْبِتَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

২৪. তার আরো নিদর্শন তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ ভয় যেমন মুসাফিরদেরকে বিজলী থেকে ও ভরসার মুকীমদেরকে বৃষ্টির প্রতি জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর শুকানো পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এতে শষ্য উৎপন্ন করে নিশ্চয়ই এতে উল্লিখিত বিষয়াবলিতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

২৫. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط بِاِرَادَتِهٖ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ز مِّنَ الْاَرْضِ بِاَنْ يَّنْفُخَ اِسْرَافِيْلُ فِى الصُّوْرِ لِلْبَعْثِ مِنَ الْقُبُوْرِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ مِنْهَا اَحْيَاءً فَخُرُوْجُكُمْ مِنْهَا بِدَعْوَةٍ مِنْ اٰيٰتِهٖ تَعَالٰى.

২৫. তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী কোনো খুঁটিবিহীন প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, কবর থেকে উঠার জন্যে ইসরাফিল (আ.)-এর সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে তখন তোমরা উঠে আসবে। জীবিত অবস্থায় অতঃপর তার ডাকে কবর থেকে তোমাদের বের হয়ে আসা তারই অন্যতম নিদর্শন।

২৬. وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ مُطِيْعُوْنَ.

২৬. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তার মালিকানা, সৃষ্ট ও দাস হিসেবে সবাই তার অনুগত।

২৭. وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ط لِلنَّاسِ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَدْءِ بِالنَّظَرِ اِلٰى مَا عِنْدَ الْمُخَاطَبِيْنَ مِنْ اَنَّ اِعَادَةَ الشَّيْءِ اَسْهَلُ مِنْ اِبْتِدَائِهِ وَاِلَّا فَهُمَا عِنْدَهٗ تَعَالٰى سَوَاءٌ فِى السُّهُوْلَةِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج اَيِ الصِّفَةُ الْعُلْيَا وَهِيَ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ خَلْقِهٖ.

২৭. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে মানুষকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তাদের ধ্বংসের পর তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য সহজ। প্রথমবারের চেয়ে। এখানে এ উক্তিটি শ্রোতাদের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা কোনো বস্তুকে পুনরায় সৃষ্টি করা অতি সহজ প্রথমবার সৃষ্টির চেয়ে। কিন্তু আল্লাহর নিকট উভয়টি [অর্থাৎ প্রথম ও পুনর্বার সৃষ্টি] সহজ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তারই। সর্বোচ্চ গুণটি হলো এই তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। এবং তিনি পরাক্রমশালী, তার রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তার সৃষ্টির মধ্যে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَصْلُكُمْ : اَصْلُكُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, خَلَقَكُمْ -এর মধ্যে كُمْ -এর পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। আর এটাও বলে দিয়েছেন যে, اَصْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আদম (আ.)।

قَوْلُهُ ثُمَّ : এখানে ثُمَّ দ্বারা ব্যক্ত করে تَاخِيْر تَغَيُّرَاتْ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা اِذَا غِذَا প্রথমত نُطْفَةٌ হয় এরপর عَلَقَةٌ এরপর مُضْغَةٌ এ সকল বিবর্তনের ব্যবধান হলো ৪০ দিন পরপর। আর যখন ১২০ দিন হয়ে যায় তখন সেই গোশ্‌তের টুকরায় রূহ ফুকে দেওয়া হয়। আর রূহ ফুঁকে দেওয়ার সাথে সাথেই তা بَشَرٌ [মানুষ]-এ পরিণত হয়ে যায়। اِذَا টা হলো مُفَاجَاتِيَةٌ যদিও اِذَا مُفَاجَاتِيَةٌ অধিকাংশ ক্ষেত্রে فَاء -এর পরে আসে। তবে কোনো কোনো সময় وَاوٌ -এর পরেও আসে। اِذَا مُفَاجَاتِيَةٌ নেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যখন উল্লিখিত তিনটি বিবর্তনই পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন بَشَرٌ [মানুষ] হতে আর বিলম্ব হয় না। একদিকে রূহ ফুকে দেওয়া হয় অপরদিকে মানুষের আকৃতিও তৈরি হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ : يُرِيْكُمْ মূলে ছিল اَنْ يُرِيَكُمْ যার কারণে يُرِيْكُمْ টা اِرَاءَتُكُمْ মাসদারের অর্থে হয়েছে اَنْ مَصْدَرِيَةٌ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির (র.) يُرِيْكُمْ -এর তাফসীর اِرَاءَتُكُمْ দ্বারা করে এই উহ্য اَنْ مَصْدَرِيَةٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর اَنْ مَصْدَرِيَةٌ কে আরবি ভাষায় উহ্য করা বহুল প্রচলিত যেমন– تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ অর্থাৎ اَنْ تَسْمَعَ আর مِنْ اٰيَاتِهٖ হলো خَبَر مُقَدَّمٌ আর يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهُ خَوْفًا وَطَمَعًا : এটা يُرِيْكُمْ -এর مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ : এর مَرْجِعْ হলো اِعَادَةٌ যা يُعِيْدُهٗ হতে বুঝা যায়। هُوَ -এর যমীরকে خَبَرْ -এর প্রতি লক্ষ্য রেখে مُذَكَّرْ নেওয়া হয়েছে। هُوَ اَهْوَنُ হলো মুবতাদা খবর।

قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ اِلٰى مَا عِنْدَ الْمُخَاطَبِيْنَ : মুফাসসির (র.) এই ইবারত দ্বারা একটি সংশয়ের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। সংশয় হলো– আল্লাহ তা'আলার জন্য اِبْتِدَاء এবং اِعَادَةٌ উভয়টাই সমান অর্থাৎ সহজ। কিন্তু عَلَيْهِ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য اِعَادَةٌ [পুনরায় সৃষ্টি করা] اِبْتِدَاء থেকে সহজতর।

উত্তর : জবাবের সারকথা হলো এতে মানুষের হিসেবে একটি মূলনীতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর জ্ঞানের চাহিদাও এটা যে কোনো কিছু প্রথমবার তৈরি করার চেয়ে দ্বিতীয়বার তৈরি করা সহজ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, اَهْوَنُ ইসমে তাফযীল هَيِّنٌ অর্থে হয়েছে। আবার কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন যে, هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ -এর মধ্যে عَلَيْهِ -এর যমীরের مَرْجِعْ মাখলুকের দিকে ফিরেছে আল্লাহর দিকে নয়। আর উদ্দেশ্য হলো যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন সৃষ্টজীবের জন্য ফিরে আসাটা اِبْتِدَاء -এর হিসেবে সহজ হবে। কেননা একদিকে রূহের সম্পর্ক শরীরের সাথে হলো এদিকে اِعَادَةٌ হয়ে গেল। اِبْتِدَاء -এর বিপরীত, কেননা তাতে বিভিন্ন বিবর্তনের পরে প্রাণের স্পন্দন এসে থাকে। যেমন প্রথম ৪০ দিন عَلَقَةٌ [রক্ত পিণ্ড] এরপর দ্বিতীয় ৪০ দিন مُضْغَةٌ [মাংস পিণ্ড] হয়। এমনিভাবে তাতে বিলম্ব ঘটে থাকে। যা عَوْد -এর হিসেবে কঠিন। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারতো, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান।

তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গাম্বরদের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলি' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের প্রথম নিদর্শন : মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টিতে উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ.)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তারই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য উপাদান দ্বারা গঠিত তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন : দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যতো প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কুরআন পাক একটি মাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরিয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু জানোয়ারের ন্যায় সামগ্রিক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি এর পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া জরুরি : আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা। যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কুরআনে সর্বত্র اِتَّقُوْا اللّٰهَ - اِخْشَوْا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে কোনো আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোনো আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোকে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ তা'আলার আরো একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি। বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালোবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। مَوَدَّتْ ও وُدٌّ -এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালোবাসা ও প্রীতি। এখানে আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, এক. مَوَدَّتْ ও দ্বিতীয় رَحْمَتْ। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, مَوَدَّتْ তথা ভালোবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালোবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়। -[কুরতুবী]

এরপর বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয় বহু নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন : তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য। যেমন কোনো বস্তু শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবি, ফারসি, হিন্দি, তুর্কী, ইংরেজি ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভাষা পরস্পর এতো ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা ও এবং বিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ অর্থাৎ এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন : মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিন-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাতে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্য স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোনো কোনো তাফসীরকার সন্দর্ভের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ সংসার-বিমুখতা এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে; এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান। আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে। কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জনে উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিজিকদাতা হিসেবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গাম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যই উপকারী, যারা পয়গাম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়, কোনো হঠকারিতা করে না।

আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন : পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশঙ্কা থাকে এবং এর পশ্চাতে সৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক ও মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাকে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফলফুলের সৃজন যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

আল্লাহ কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন : ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলারই আদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তারই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্য এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى : যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مَثَلٌ বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মতো হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার যে مَثَلٌ আছে, একথা কুরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এ আয়াতে বলা হয়েছে- مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ কিন্তু مَثَلٌ ও مِثَالٌ থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

২৮. ضَرَبَ جَعَلَ لَكُمْ اَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ مَثَلاً كَائِنًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط وَهُوَ هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَىْ مِنْ مَمَالِيْكِكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ لَكُمْ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَغَيْرِهَا فَاَنْتُمْ وَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط اَىْ اَمْثَالَكُمْ مِنَ الْاَحْرَارِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ الْمَعْنٰى لَيْسَ مَمَالِيْكُكُمْ شُرَكَاءَ لَكُمْ اِلٰى اٰخِرِه عِنْدَكُمْ فَكَيْفَ تَجْعَلُوْنَ بَعْضَ مَمَالِيْكِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ لَهٗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ ذٰلِكَ التَّفْصِيْلِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

২৯. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْاِشْرَاكِ اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط اَىْ لَا هَادِىَ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

৩০. فَاَقِمْ يَا مُحَمَّدُ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط مَائِلًا اِلَيْهِ اَىْ اَخْلِصْ دِيْنَكَ لِلّٰهِ اَنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ فِطْرَتَ اللّٰهِ خِلْقَتَهُ الَّتِىْ فَطَرَ خَلَقَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط وَهِىَ دِيْنُهٗ اَىْ اَلْزِمُوْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط لِدِيْنِهٖ اَىْ لَا تُبَدِّلُوْهُ بِاَنْ تُشْرِكُوْا ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق الْمُسْتَقِيْمُ تَوْحِيْدُ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ تَوْحِيْدَ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

২৮. হে মুশরিকগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই তোমাদের আমি যে রিজিক মাল সম্পদ দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যে রূপ নিজেদের লোককে তোমাদের মতো স্বাধীন ব্যক্তিদেরকে ভয় কর? এখানে اِسْتِفْهَام তথা প্রশ্নবোধক অব্যয়টি نَفِىْ বা না বোধক অর্থের জন্যে এসেছে। অর্থাৎ তোমাদের কোনো দাসদাসী তোমাদের সাথে অংশীদার নয় তোমাদের নিকট। اِلٰى اٰخِرِه তথা শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ তোমাদের সম্পদে তোমাদের সাথে তোমাদের কোনো দাসদাসী অংশীদার নেই যেমন তোমাদের মতো অন্য স্বাধীন ব্যক্তি নেই। অতএব তোমরা কিভাবে আল্লাহর অনেক দাসদেরকে তার সাথে অংশীদার বানাও? এমনিভাবে আমি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করি। যাতে তারা সেখানে চিন্তা করে।

২৯. বরং শিরককারী অত্যাচারীগণ অজ্ঞানবশতঃ তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে পথ দেখাবে? অর্থাৎ কেউ তাকে পথের সন্ধানদাতা নেই। তাদের কোনো সাহায্যকারী আজাব থেকে রক্ষাকারী নেই।

৩০. হে মুহাম্মাদ ﷺ ! তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। অর্থাৎ তুমিও তোমার অনুসারীগণ নিজেদের ধর্মকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য খাঁটি কর। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। তা তারই ধর্ম অর্থাৎ তোমরা এর উপর অটল থাক। আল্লাহর সৃষ্টির তার ধর্মের কোনো পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ তোমরা শিরকের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করো না। এটাই সরল ধর্ম। আল্লাহর একত্ববাদ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর তৌহিদ জানে না।

٣١. مُنِيْبِيْنَ رَاجِعِيْنَ اِلَيْهِ تَعَالٰى فِيْمَا اَمَرَ بِهٖ وَنَهٰى عَنْهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ اَقِمْ وَمَا اُرِيْدَ بِهٖ اَىْ اَقِيْمُوْا وَ اتَّقُوْهُ خَافُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৩১. সবাই তার অভিমুখী হও যাতে তিনি আদেশ করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন। এখানে مُنِيْبِيْنَ শব্দটি اَقِمْ -এর ফায়েল ও তা থেকে উদ্দেশ্য অর্থাৎ اَقِيْمُوْا -এর ফায়েল থেকে حَالٌ এবং তাকে ভয় কর, এবং নামাজ কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٣٢. مِنَ الَّذِيْنَ بَدَلٌ بِاِعَادَةِ الْجَارِ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِيْمَا يَعْبُدُوْنَهُ وَكَانُوْا شِيَعًا ط فِرَقًا فِىْ ذٰلِكَ كُلُّ حِزْبٍ مِنْهُمْ بِمَا لَدَيْهِمْ عِنْدَهُمْ فَرِحُوْنَ مَسْرُوْرُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَارَقُوْا اَىْ تَرَكُوْا دِيْنَهُمُ الَّذِىْ اُمِرُوْا بِهٖ.

৩২. যারা তাদের ধর্মে তাদের মাবুদ -এর ব্যাপারে মতানৈক্যের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। مِنَ الَّذِيْنَ শব্দটি হরফে জারের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পূর্বের مُشْرِكِيْنَ থেকে بَدَلٌ হয়েছে। এবং দীনের ব্যাপারে অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত। অন্য এক কেরাতে فَرَّقُوْا -কে فَارَقُوْا পড়া হয়েছে। যার অর্থ– তারা ত্যাগ করে তাদের ঐ ধর্ম যার ব্যাপারে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

٣٣. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ ضُرٌّ شِدَّةٌ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيْبِيْنَ رَاجِعِيْنَ اِلَيْهِ دُوْنَ غَيْرِهٖ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً بِالْمَطَرِ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ.

৩৩. যখন মানুষকে মক্কার কাফেরদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা পালনকর্তাকে আহ্বান করে তারই অন্যান্য ব্যতীত অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ বৃষ্টির মাধ্যমে আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে।

٣٤. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ط اُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدُ فَتَمَتَّعُوْا قف فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ تَمَتُّعِكُمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ.

৩৪. যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। এতে اَمْر -এর সীগাহ দ্বারা ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। অতএব উপভোগ করে লুঠে নাও, স্বত্বরই জানতে পারবে তোমাদের উপভোগ করে নেওয়ার পরিণাম। এখানে গায়েব এর সীগাহ থেকে خِطَابٌ তথা সরাসরি সম্বোধনের দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

٣٥. اَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا حُجَّةً وَكِتَابًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ تَكَلُّمَ دَلَالَةٍ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ اَىْ يَاْمُرُهُمْ بِالْاِشْرَاكِ لَا.

৩৫. এখানে اَمْ অব্যয়টি هَمْزَةُ اِنْكَارٍ তথা অস্বীকার অর্থের হামযার অর্থ প্রদান করে আমি কি তাদের কাছে এমন কোনো দলিল কিতাব বা প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি, যা তাদেরকে আমার শরিক করতে বলে? আমার সাথে শিরক করার নির্দেশ দেয়। এটাকে تَكَلُّمٌ دَلَالَةٍ বলা হয়েছে অর্থাৎ ইঙ্গিতে কথা বলা।

٣٦. وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ كُفَّارَ مَكَّةَ وَغَيْرَهُمْ رَحْمَةً نِعْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ط فَرَحَ بَطَرٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ شِدَّةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ يَيْأَسُوْنَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَمِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَّشْكُرَ عِنْدَ النِّعْمَةِ وَيَرْجُوَ رَبَّهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ.

৩৬. আর যখন আমি মানুষকে মক্কার কাফের ও অন্যান্যদেরকে রহমতের নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয়। অহংকারের আনন্দ এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোনো দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে আর মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো নিয়ামতের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আর দুর্দশার সময় তার প্রভুর রহমতের আশা রাখা।

٣٧. أَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ ط وَيُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِبْتِلَاءً إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بِهَا.

৩৭. তারা কি দেখে জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন পরীক্ষামূলকভাবে এবং যার জন্যে ইচ্ছা পরীক্ষামূলকভাবে হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

٣٨. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى الْقَرَابَةَ حَقَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط الْمُسَافِرِيْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَأُمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ تَبَعٌ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز أَيْ ثَوَابَهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ.

৩৮. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন সদ্ব্যবহার ও সৎ কর্মের মাধ্যমে এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও সদকা দান করার মাধ্যমে। উক্ত আমরের মধ্যে নবী ﷺ -এর উম্মতগণও শামিল। এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্থাৎ তাদের আমলের পুণ্যের কামনা করে, তারাই সফলকাম।

٣٩. وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا بِأَنْ يُّعْطَى شَيْئًا هِبَةً أَوْ هَدِيَّةً لِيَطْلُبَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَسُمِّيَ بِاسْمِ الْمَطْلُوْبِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ لِيَرْبُوَا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ الْمُعْطِيْنَ أَيْ يَزِيْدُ فَلَا يَرْبُوْا يَزْكُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج أَيْ لَا ثَوَابَ فِيْهِ لِلْمُعْطِيْنَ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ صَدَقَةٍ تُرِيْدُوْنَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ثَوَابَهُمْ بِمَا أَرَادُوْهُ فِيْهِ إِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ.

৩৯. মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও তার পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ কোনো জিনিস দান বা হাদিয়া হিসেবে এজন্যে দেওয়া যাতে তার বিনিময়ে অতিরিক্ত নিতে পারে। যাতে বিনিময়কৃত সম্পদে তার মাল বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর দাতাদের জন্য কোনো ছওয়াব নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। তাদের ছওয়াব যা তারা আশা করেছে তার চেয়েও দ্বিগুণ। এখানে সম্বোধন সূচক শব্দ থেকে পরিবর্তন করে غَائِبْ বলা হয়েছে।

٤٠. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِمَّنْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ ط لَا سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

৪০. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অতঃপর রিজিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরিকদের আল্লাহর সাথে তোমরা যাকে শরিক কর মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে পারবে? কক্ষনো না তারা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَائِنًا : كَائِنًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مِنْ اَنْفُسِكُمْ টা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে مَثَلًا -এর সিফত হয়েছে। আর مِنْ টি হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ : এটা مِنْ شُرَكَاءِ থেকে حَالٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে। প্রথম مِنْ টা হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ আর দ্বিতীয়টি হলো تَبْعِيْضِيَّةٌ আর তৃতীয়টি হলো زَائِدَةٌ তথা অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ اَنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَقِمْ وَجْهَكَ -এর মধ্যে সম্বোধন যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মত।

قَوْلُهُ فِطْرَتَ اللّٰهِ : এটা উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে, আর তা হলো اَلْزَمُوْا যেমনটি ব্যাখ্যাকার (র.) উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। فِطْرَتٌ -এর অর্থ জন্মগত যোগ্যতা ও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। লম্বা تَاءٌ -এর সাথে فِطْرَتٌ শব্দটি পূর্ণ কুরআনের মধ্যে শুধু এ জায়গায়ই এসেছে।

قَوْلُهُ لَا تُبَدِّلُوْهُ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لَا تَبْدِيْلَ -এটা خَبَرٌ যা اَمْرٌ -এর অর্থে হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে, نَفْىٌ টা نَهْىٌ অর্থে হয়েছে। فِطْرَةٌ -এর দুটি তাফসীর রয়েছে। এক. জন্মগত যোগ্যতা, দুই. দীন ইসলাম। দ্বিতীয়টির দিকে ব্যাখ্যাকার وَهِىَ دِيْنُهٗ বলে ইঙ্গিত করেছেন। যার কারণে উভয় তাফসীরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তবে যদি وَهِىَ دِيْنُهٗ -এর وَاوْ -কে যদি او অর্থে নেওয়া হয় তবে এই তালগোলের নিরসন হয়ে যায়। (جَمَلْ)

قَوْلُهُ مُنِيْبِيْنَ : এটা اَقِمْ এবং اَقِمْ দ্বারা যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ اَقِيْمُوْا থেকে حَالٌ হয়েছে। কেননা اَقِمْ -এর মধ্যে যদিও রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মত।

قَوْلُهُ لِيَكْفُرُوْا : এর পরে اُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدُ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لِيَكْفُرُوْا -এর মধ্যে لَامٌ হলো اَمْرٌ -এর জন্য। আবার لَامُ عَاقِبَتٍ ও হতে পারে। অর্থ শেষ পরিণামে সে অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে।

قَوْلُهُ تَكَلَّمَ دَلَالَةً : এখানে تَكَلَّمَ দ্বারা রূপকভাবে دَلَالَتْ উদ্দেশ্য অন্যথায় দলিল বা কিতাব তো কথা বলতে পারে না। অবশ্য রূপকভাবে বলা যায়- كِتَابٌ نَاطِقٌ . وَيُقَالُ هٰذَا مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْقُرْاٰنُ

بَطَرٌ অর্থ সীমাহীন খুশির প্রকাশ করা যা অহঙ্কার ও উত্তেজিত হওয়ার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ব্যাখ্যাকার فَرِحَ بَطَرٍ -এর বৃদ্ধি করে এই সংশয়ের জবাব দিয়েছেন যে, আল্লাহর নিয়ামতে আনন্দ প্রকাশ করা কোনো তিরস্কারমূলক বিষয় নয়। বরং اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রশংসনীয়। তখন এর জবাব দিয়েছেন اِظْهَارُ نِعْمَتٍ تَحْدِيْثُ نِعْمَتٍ -এর ভিত্তিতে করা যদিও প্রশংসনীয় কিন্তু অহঙ্কার ও উত্তেজিত হওয়ার ভিত্তিতে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ : اَللّٰهُ হলো মুবতাদা আর اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ মওসূল সেলাহ মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে। আর মুবতাদা ও খবর উভয়টি مَعْرِفَةٌ হওয়ায় বাক্যটি حَصْر -এর ফায়দা দিচ্ছে।

قَوْلُهُ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ : এটা হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতোই মানুষ। আকার-আকৃতি, হাত-পা মনের চাহিদা সব বিষয়ে তোমাদের শরিক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেও অধিকার দাও না। কোনো ক্ষুদ্র ও মামুলী শরিককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগৎ আল্লাহর সৃজিত ও তারই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তার শরিক কিরূপে বিশ্বাস কর?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার, কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোনো জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এখানে فِطْرَةَ اللّٰهِ বাক্যটি পূর্ববর্তী فَأَقِمْ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دِيْن حَنِيْف -এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ دِيْن حَنِيْف হচ্ছে دِيْن فِطْرَتْ। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

এক. ফিতরাত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোনো কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবে পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

দুই. ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে– لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خَلْقِ اللّٰه বলে পূর্বোল্লিখিত فِطْرَةَ اللّٰهِ -কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর এই ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপরে পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। সর্বত্রই মুসলমানদের চেয়ে কাফের বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিজির (আ.) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরি। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থি।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোনো বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের ছওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে? কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই ছওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীসের অনুরূপ কিফহবিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাতা কাফের হলে সন্তানকেও কাফের ধরা হয় এবং কাফন-দাফন ইসলামি নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তূরপুশতী 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারো প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের যোগ্যতা চিনে নেওয়ার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। হযরত খিজির (আ.)-এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরি হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট ছওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতামাতা সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরাতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহপ্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত। কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে লিখিত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেযাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্দারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবকে স্রষ্টা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্দারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

قَوْلُهٗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ : উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিল পন্থিদের সংঘর্ষ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরজ : لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থিদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

قَوْلُهٗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামাজ কায়েম করতে হবে। কেননা নামাজ কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে- وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ যারা শিরক করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে। مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيْعَةٌ -এর বহুবচন। কোনো একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাবধর্ম ছিল তাওহীদ।

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতি এক দল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মাযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিজিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে. তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে তবে এর কারণে রিজিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং হাসান বসরী (র.)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না। বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আত্মীয়স্বজন, **দুই**. মিসকিন, **তিন**. মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরো বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য যা আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোনো অনুগ্রহ নয়।

ذَوِى الْقُرْبٰى বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহরাম হোক বা না হোক। حَقٌّ বলেও ওয়াজিব যেমন পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চেয়ে বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। এমন কি তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরিব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয়। বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য; হযরত হাসান (র.) বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য। -[কুরতুবী]

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকিন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

قَوْلُهٗ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ : এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রতাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপঢৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না। এবং কোনো প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আত্মীয়ের ধন সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে আসবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার দানের কোনো মর্যাদা ও ছওয়াব নেই। কুরআন পাকে এই 'বেশি' কে ربوا [সুদ] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতোই ব্যাপার।

মাসআলা : প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সেও সুযোগ মতো এর প্রতিদান দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কেউ কোনো উপঢৌকন দিলে সুযোগ মতো তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তার অভ্যাস। -[কুরতুবী] তবে এই প্রতিদান এভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে;

অনুবাদ :

٤١. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ أَيِ الْقِفَارِ بِقَحْطِ الْمَطَرِ وَقِلَّةِ النَّبَاتِ وَالْبَحْرِ أَيِ الْبِلَادِ الَّتِي عَلَى الْأَنْهَارِ بِقِلَّةِ مَائِهَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِي لِيُذِيقَهُمْ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَيْ عُقُوبَتَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

৪১. স্থলে অর্থাৎ মাঠে ময়দানে অনাবৃষ্টি ও ক্ষেতের অনবাদির মাধ্যমে ও জলে অর্থাৎ ঐ সমস্ত শহর যা সাগর বা নদীর তীরে অবস্থিত পানির স্বল্পতার মাধ্যমে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের পাপের কারণে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। তওবা করে, এতে نُذِيْقَ শব্দটি نْ ও يَاءْ অর্থাৎ يُذِيْقَ ও نُذِيْقَ উভয় ধরনের পড়া যাবে।

٤٢. قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأُهْلِكُوا بِإِشْرَاكِهِمْ وَمَسَاكِنُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ خَاوِيَةٌ.

৪২. বলুন, মক্কার কাফেরদেরকে তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। অতঃপর তারা তাদের শিরকের কারণে ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের আবাসস্থল ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

٤٣. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ يَتَفَرَّقُونَ بَعْدَ الْحِسَابِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

৪৩. আপনি সরল ধর্মে ইসলাম ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন সে দিবসের পূর্বে যে দিবস আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হওয়ার নয়। তা কিয়ামতের দিবস সেদিন মানুষ হিসাবের পর জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে বিভক্ত হয়ে পড়বে। يَصَّدَّعُوْنَ মূলে يَتَصَدَّعُوْنَ ছিল ت কে ص -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

٤٤. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ج وَبَالُ كُفْرِهِ هُوَ النَّارُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ يُوَطِّئُونَ مَنَازِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ.

৪৪. যে কুফরি করে, তার কুফরের শাস্তির জন্যে তা হলো জাহান্নাম জন্যে সেই দায়ী। এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। তারা জান্নাতে তাদের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

٤٥. لِيَجْزِيَ مُتَعَلِّقٌ بِيَصَّدَّعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهِ ط يُثِيبُهُمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ أَيْ يُعَاقِبُهُمْ.

৪৫. যাতে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন لِيَجْزِيَ -এর হরফে জারের সম্পর্ক يَصَّدَّعُوْنَ-এর সাথে তাদেরকে যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছওয়াব দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি কাফেরদের ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

٤٦. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ تَعَالٰى اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ بِمَعْنٰى لِتُبَشِّرَكُمْ بِالْمَطَرِ وَلِيُذِيْقَكُمْ بِهَا مِنْ رَّحْمَتِهٖ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ السُّفُنُ بِهَا بِاَمْرِهٖ بِاِرَادَتِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا مِنْ فَضْلِهٖ الرِّزْقِ بِالتِّجَارَةِ فِى الْبَحْرِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ هٰذِهِ النِّعَمَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ فَتُوَحِّدُوْنَهُ.

৪৬. তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু مُبَشِّرَاتٍ টি لِتُبَشِّرَكُمْ -এর অর্থে অর্থাৎ যা তোমাদের বৃষ্টির সুসংবাদ দেয় প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তার রহমতে বৃষ্টি ও বৃক্ষরাজিতে তোমাদের আস্বাদন করান। এবং তার নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ নদীতে ব্যবসার মাধ্যমে রিজিক তালাশ কর এবং যাতে তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। এ সমস্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তোমরা তার একত্ববাদে বিশ্বাসী হও। হে মক্কাবাসী।

٤٧. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ عَلٰى صِدْقِهِمْ فِىْ رِسَالَتِهِمْ اِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط اَهْلَكْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْهُمْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِاِهْلَاكِهِمْ وَاِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৪৭. আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি এমন প্রমাণাদি যা রাসূলদের রিসালাতের দাবিতে সত্যবাদীতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু তারা তাদেরকে অস্বীকার করে অতঃপর আমি যারা পাপ করেছে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আমি ধ্বংস করেছি যারা নবীদেরকে অস্বীকার করেছে এবং মুমিনদের কাফেরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের রক্ষা করে আর কাফেরদের ধ্বংস করে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

٤٨. اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا تُزْعِجُهُ فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ قِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَسُكُوْنِهَا قِطَعًا مُتَفَرِّقَةً فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ط اَىْ وَسْطِهٖ فَاِذَا اَصَابَ بِهٖ بِالْوَدْقِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ يَفْرَحُوْنَ بِالْمَطَرِ.

৪৮. আল্লাহ ঐ সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাতে সঞ্চারিত করেন। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা বেশি ও স্বল্প আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। كِسَفًا শব্দটি س -এর মধ্যে যবর ও সাকিন উভয়রূপে পড়া যাবে। এর অর্থ বিভিন্ন টুকরা, খণ্ড বা স্তর। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্যে থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছান। তখন তারা আনন্দিত হয়। তারা বৃষ্টির কারণে আনন্দিত হয়।

٤٩. وَاِنْ وَقَدْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ تَاكِيْدٌ لَمُبْلِسِيْنَ اٰيِسِيْنَ مِنْ اِنْزَالِهِ.

৪৯. তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিরাশ ছিল। مِنْ قَبْلِهِ -এর قَبْلِ শব্দটি পূর্বের قَبْلِ শব্দ থেকে تَاكِيْد ।

٥٠. فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَرِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ اَيْ نِعْمَتِهٖ بِالْمَطَرِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اَيْ يُبْسِهَا بِاَنْ تُنْبِتَ اِنَّ ذٰلِكَ الْمُحْيِي الْاَرْضَ لَمُحْيِي الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

৫০. অতএব, আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির মাধ্যমে তার নিয়ামতের ফল দেখে নাও, اَثَرْ শব্দটি অন্য কেরাতে اٰثَارِ পড়বে। কিভাবে তিনি মৃত্তিকায় মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। অর্থাৎ তা শুকে যাওয়ার পর ক্ষেত জন্মানোর মাধ্যমে নিশ্চয় তিনি মৃত্তিকা জীবিতকারী মৃতদেরকে জীবনদানকারী। এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

٥١. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَرْسَلْنَا رِيْحًا مُضِرَّةً عَلٰى نَبَاتٍ فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوْا صَارُوْا جَوَابُ الْقَسَمِ مِنْ بَعْدِهٖ اَيْ بَعْدَ اِصْفِرَارِهٖ يَكْفُرُوْنَ يَجْحَدُوْنَ النِّعْمَةَ بِالْمَطَرِ.

৫১. আমি যদি এমন বায়ু যা শস্যের জন্য ক্ষতিকর প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। বৃষ্টির নিয়ামতের কথা অস্বীকার করে। উক্ত আয়াতে لَئِنْ -এর ل শপথসূচক অব্যয় আর لَظَلُّوْا জবাবে কসম।

٥٢. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.

৫২. অতএব আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। উক্ত আয়াতে اِذَا শব্দকে উভয় হামযাকে হামযার সাথে বা দ্বিতীয় হামযাকে হামযা ও يَاءْ -এর মধ্যখানে তাসহীল করে পড়া যাবে।

٥٣. وَمَآ اَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ مَا تُسْمِعُ سَمَاعَ اِفْهَامٍ وَقَبُوْلٍ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ مُخْلِصُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ.

৫৩. আপনি অন্ধদেরকে তাদের গুমরাহী থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি শুনাতে পারবেন না বুঝা ও গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুনা আর এখানে اِنْ অব্যয়টি مَا না বোধকের অর্থ প্রদান করে। কিন্তু তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহ কুরআন বিশ্বাস করে। কারণ তারা মুসলমান। যারা আল্লাহর একত্ববাদে খালেস বিশ্বাসী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قِفَارٌ : نَفْر -এর বহুবচন। অর্থ– জনশূন্য প্রান্তর। قِفَارٌ। قَافْ -এর যবরযোগে অর্থ এমন রুটি যাতে তরকারি নেই।

بِمَا كَسَبَتْ -এর بَاءْ হলো سَبَبِيَّةْ আর مَا হলো مَصْدَرِيَّةْ অর্থাৎ بِسَبَبِ كَسْبِهِمْ

لِيُذِيْقَهُمْ -এর لَامْ টি হলো عَاقِبَتْ -এর জন্য এবং এটা ظَهَرَ الْفَسَادُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ عُقُوْبَتَهُ : এখান থেকে উহ্য مُضَافٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ عُقُوْبَةَ مَا عَمِلُوْا রূপক হিসেবে سَبَبٌ -এর ইতলাক مُسَبَّبٌ -এর উপর করা হয়েছে। যেহেতু اِعْمَالٌ হলো মন্দ পরিণামের কারণ। কাজেই سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ اللّٰهِ : مِنَ اللّٰهِ -এর সম্পর্ক হলো يَاْتِىَ -এর সাথে।

قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ : يَوْمَئِذٍ -এর তানভীনটি বাক্যের পরিবর্তে হয়েছে। অর্থাৎ يَوْمَ اِذَا يَاْتِىْ هٰذَا الْيَوْمُ

قَوْلُهُ يَصَّدَّعُوْنَ : এটা مُضَارِعٌ -এর جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ -এর সীগাহ, মূলে ছিল يَتَصَدَّعُوْنَ তারপর تَاء -কে صَاد দ্বারা পরিবর্তন করে صَادٌ কে صَادٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে। বাবে تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّصَدُّعُ অর্থ– বিক্ষিপ্ত হওয়া, কোনো শক্ত বস্তু ফেটে যাওয়া।

وَبَالُ كُفْرِهِ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُوَطِّئُوْنَ : অর্থ– পরিপাটি করা, সুসজ্জিত হওয়া, তৈরি করা। وَطَّا تَوْطِئَةً অর্থ– ঠিক করা, বিছানো।

قَوْلُهُ لِيَجْزِىَ : এটা يَصَّدَّعُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ يَصَّدَّعُوْنَ لِيَجْزِىَ هُمْ তথা তারা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দেন।

قَوْلُهُ يُثِيْبُهُمْ : এটা দ্বারা لِيَجْزِىَ -এর তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى لِتُبَشِّرَكُمْ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা। প্রশ্ন হলো– لِيُذِيْقَكُمْ -এর عَطْفٌ হয়েছে مُبَشِّرَاتٍ -এর উপর, আর এটা বৈধ নয়। কেননা তখন فِعْلٌ -এর عَطْفٌ ইসিম এর উপর হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। ব্যাখ্যাকার -এর জবাব দিয়েছেন যে, مُبَشِّرٌ টা تُبَشِّرُ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ : এ আয়াতটি اٰيَاتٌ مُفَصَّلَةٌ অর্থাৎ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ يُرْسِلَهُ এবং اٰيَاتٌ مُفَصَّلَةٌ অর্থাৎ اَللّٰهُ الَّذِىْ -এর মাঝে مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, وَمِنْ اٰيَاتِهٖ হলো مُفَصَّلٌ আর اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ তার تَفْصِيْلٌ আর وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ আয়াতে مُعْتَرِضَةٌ আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া।

قَوْلُهُ فَانْتَقَمْنَا : এর আতফ হয়েছে উহ্যের উপর। ব্যাখ্যাকার فَكَذَّبُوْا দ্বারা উহ্য مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ فَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ : كَانَ হলো فِعْلٌ نَاقِصٌ আর حَقًّا হলো তার خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ হলো اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ আর عَلَيْنَا টা حَقًّا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ وَقَدْ : শারেহ (র.) اِنْ -এর তাফসীর قَدْ দ্বারা করে আল্লামা বাগাবী (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। এই সুরতে وَاو টা হলো حَالِيَةٌ আর অন্যান্যরা اِنْ -কে مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ বলেছেন। আর তার ইসিম هُمْ যমীরে শান উহ্য মেনেছেন। আর বাক্যকে اِنَّ -এর خَبَرٌ বলেছেন। আর لَمُبْلِسِيْنَ -এর মধ্যে لَامٌ টি فَارِقَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَظَلُّوْا : এটা جَوَابُ قَسَمٍ যা جَوَابُ شَرْطٍ -এর স্থলাভিষিক্ত। কেননা কায়দা আছে যে, যখন قَسَمٌ এবং شَرْطٌ উভয়টি একত্রিত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে প্রথমটির জবাব উল্লেখ হয়ে থাকে। আর অপরটি উহ্য থাকে। আর প্রথমটির জবাবই দ্বিতীয়টির জবাবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। এখানে لَئِنْ -এর মধ্যে قَسَمٌ এবং شَرْطٌ উভয়টি একত্রিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ : অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিপর্যয় বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া। উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও কু-কর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচেয়ে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহ আসে। অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গুনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গুনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহের কারণেই বিপদ আসে না; বরং অনেক গুনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো গুনাহের কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গুনাহের কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না; বরং অনেক গুনাহ তো আল্লাহ তা'আলাই মাফ করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে- لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে কু-কর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফিল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্য উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে : তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ তার গুনাহের কারণে অনাবৃষ্টিও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এবং সবাই গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না, বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। -[রূহুল মা'আনী]

কারণ প্রথম একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যাদ্বারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জবাব : সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত। কাফেরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরো বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে- أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ অর্থাৎ দুনিয়াতে পয়গাম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায়, মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গুনাহের কারণে হতো, তবে ব্যাপার উল্টা হতো।

জবাব এই যে, আয়াতে গুনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারো উপর কোনো বিপদ এলে তা একমাত্র গুনাহের কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হয়ে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনো অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণেই প্রভাব জাহের হয় না। যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ঔষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ঔষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গুনাহের কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গুনাহের আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো গুনাহ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ আয়াতে বলা হয়নি যে, গুনাহ না করলে কেউ কোনো বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোনো কারণেও বিপদাপদে আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গাম্বরও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গুনাহ নয়; বরং তাদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কুরআন পাক সব বিপদাপদকেই গুনাহের ফল সাব্যস্ত করেনি; বরং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেসব বিপদাপদকে সাধারণত গুনাহের এবং বিশেষত প্রকাশ্য গুনাহের ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়; বরং এ ধরনের বিপদ কখনো পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মসিবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গুনাহগার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুজুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকারের বিপদাপদ– যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গুনাহ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভালো-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার। এক. বাহ্যিক ও দুই. আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বুঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, [মৌসূমী বায়ু] যা উপরের বায়ুস্তে পৌছে বরফে পরিণত হয় এবং অতঃপর সূর্য কিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রকৃত-বৈষয়িক, যা সৎ অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওজন বিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারো জন্য সুখবর হয় এবং কারো জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালোমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণ মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ড বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে; কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোনো কোনো সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোনো উচ্চস্তরের নবী-রাসূল ও ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকূল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আজাবের মধ্যে পার্থক্য : বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয়। এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ তার অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ঔষধ খেতে অথবা অপারেশনে করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মতো সন্তুষ্ট থাকে; বরং এর জন্য সে টাকা পয়সাও ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসেবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরি বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানি এবং কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকর্মে অধিক উৎসাহী হয়, তবে বিপদ আল্লাহ তা'আলার গজব ও আজাবের আলামত। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা কৃপা বশত মুমিনদের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কোনো সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জবাব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে জিহাদ করে, তাদের বুঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোনো কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে। যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনে আছে- إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন- যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তা-ই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলির অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গুনাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে কি না? সূরা নামলের তাফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

٥٤. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ مَاءٍ مَهِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ اٰخَرَ وَهُوَ ضُعْفُ الطُّفُوْلِيَّةِ قُوَّةً اَىْ قُوَّةَ الشَّبَابِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَ شَيْبَةً ضُعْفَ الْكِبَرِ وَشَيْبَ الْهَرَمِ وَالضَّعْفُ فِى الثَّلَاثَةِ بِضَمِّ اَوَّلِهٖ وَفَتْحِهٖ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ مِنَ الضُّعْفِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّبَابِ وَالشَّيْبَةِ وَهُوَ الْعَلِيْمُ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهٖ الْقَدِيْرُ عَلٰى مَا يَشَاۤءُ.

٥٥. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ يَحْلِفُ الْمُجْرِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ مَا لَبِثُوْا فِى الْقُبُوْرِ غَيْرَ سَاعَةٍ ط قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ الْبَعْثِ كَمَا صُرِفُوْا عَنِ الْحَقِّ الصِّدْقِ فِىْ مُدَّةِ اللُّبْثِ.

٥٦. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ وَغَيْرِهِمْ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ فِيْمَا كَتَبَهٗ فِىْ سَابِقِ عِلْمِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ الَّذِىْ اَنْكَرْتُمُوْهُ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وُقُوْعَهٗ.

٥٧. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ فِىْ اِنْكَارِهِمْ لَهٗ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُمُ الْعُتْبٰى اَىِ الرُّجُوْعُ اِلٰى مَا يَرْضَى اللّٰهُ.

অনুবাদ :

৫৪. আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে দুর্বল এক ফোটা নিকৃষ্ট পানি থেকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর দুর্বলতার জন্য দুর্বলতা অর্থাৎ শিশুত্বের দুর্বলতার পর শক্তি যৌবনের শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য বার্ধক্যের দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কারণে চুলের সাদা হওয়া। এখানে ضُعْفٌ শব্দকে তিন স্থানে ض -এর মধ্যে যবর ও পেশ উভয় হরকত দিয়ে পড়া যাবে। তিনি যৌবনের শক্তি ও বার্ধক্যের দুর্বলতা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এবং তিনি তার সৃষ্টের সৃষ্টির উপর সর্বজ্ঞ তিনি যা ইচ্ছা করেন তার উপর সর্ব শক্তিমান।

৫৫. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কাফেররা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশি কবরে অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্য বিমুখ হতো। যেমনিভাবে তারা কবরের অবস্থানের সত্যতা অস্বীকার করেছে তেমনি তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা অস্বীকার করতো।

৫৬. ফেরেশতা ও অন্যান্যদের মধ্যে যাদের ঈমান ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব মতে ঐ লিখিত মতে যা আল্লাহ তা'আলার ইলমে বিদ্যমান পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ এটাই পুনরুত্থান দিবস যা তোমরা অস্বীকার করতে কিন্তু তোমরা তা সংঘটিত হওয়ার কথা জানতে না।

৫৭. সেদিন জালেমদের ওজর আপত্তি তাদের তা অস্বীকার করার ব্যাপারে তাদের কোনো উপকারে আসবে না تَنْفَعُ -কে ت ও ى উভয়ের সাথে পড়া যাবে। এবং তাদের থেকে তওবা তলব করা হবে না। তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না

৫৮. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تَنْبِيْهًا لَهُمْ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ جِئْتَهُمْ يَا مُحَمَّدُ بِاٰيَةٍ مِثْلَ الْعَصَا وَالْيَدِ لِمُوْسٰى لَيَقُوْلَنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى النُّوْنَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ مَا اَنْتُمْ اَيْ مُحَمَّدٌ وَاَصْحَابُهُ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ اَصْحَابُ اَبَاطِيْلَ.

৫৮. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য তাদের সজাগ করার জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি ও হস্তের নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে তাদের মধ্যে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মুহাম্মদ ও তার সাথীগণ মিথ্যাপন্থি বাতিলপন্থি।

৫৯. كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ التَّوْحِيْدَ كَمَا طَبَعَ عَلٰى قُلُوْبِ هٰؤُلَاءِ.

৫৯. এমনিভাবে আল্লাহ তাওহীদের জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। যেমন ঐ সমস্ত লোকদের অন্তরসমূহ।

৬০. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِنَصْرِكَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ اَيْ لَا يَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْخِفَّةِ وَالطَّيْشِ بِتَرْكِ الصَّبْرِ اَيْ لَا تَتْرُكَنَّهُ.

৬০. অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় তাদের বিপক্ষে আপনাকে সাহায্য করার ব্যাপারে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। আপনাকে উত্তেজিত করে দ্রুত রাগান্বিত না করে অর্থাৎ তারা কখনো আপনাকে ধৈর্যের বাঁধন থেকে বের করতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَاءٍ مَهِيْنٍ : এটা ضُعْفٌ -এর তাফসীর দ্বারা একটি আপত্তির নিরসন করা উদ্দেশ্য। আপত্তি এই যে, ضُعْفٌ হলো صِفَتٌ এর থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হতে পারে না।

উত্তর. উত্তরের সার সংক্ষেপ হলো ضُعْفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَصْلٌ ضَعِيْفٌ যেমন نُطْفَةٌ হলো اَصْلٌ ضَعِيْفٌ অর্থাৎ ضُعْفٌ মাসদারটা ذُوْ ضُعْفٍ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ : এই বাক্যটি মুবতাদা এবং খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ شَيْبَةً : চুলের শুভ্রতা, যা সাধারণত ৪৩ বৎসরে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর এটাই বার্ধক্যের সূচনা করে থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الضُّعْفِ وَالْقُوَّةِ : এটা مَا -এর بَيَانٌ হয়েছে- قَوْلٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ اَيِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ

قَوْلُهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ الخ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর اِسْتِعْتَابٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ তাদের থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করা হবে না। কতিপয় মুফাসসির অনুবাদ করেছেন যে, তাদের ওজর গ্রহণ করা হবে না। আল্লামা মহল্লী (র.) এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন لَا يُطْلَبُ مِنْهُمُ الْعُتْبٰى অর্থাৎ اَلرُّجُوْعُ اِلٰى مَا يُرْضَى اللّٰهَ এই জালেমদের থেকে তওবা চাওয়া হবে না। অর্থাৎ এরূপ আমলের দিকে ফিরে আসার জন্য বলা হবে না। যার দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ইমাম বগভী (র.) مَعَالِمٌ -এ লিখেছেন لَا يُكَلَّفُوْنَ اَنْ يُرْضُوْا رَبَّهُمْ لِاَنَّ الْاٰخِرَةَ لَيْسَتْ بِدَارِ التَّكْلِيْفِ কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহকে সন্তুষ্টর করার مُكَلَّفٌ হবে না। কেননা পরকাল دَارُ تَكْلِيْفٍ নয়। বরং প্রতিদান

পাওয়ার স্থান। صَاوِىْ বলেছেন اَلْعُقْبٰى হলো اَلرُّجْعٰى -এর মতো ওজন ও অর্থের ক্ষেত্রে। আর لَا يُسْتَعْتَبُوْنَ অর্থ হলে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হবে না। অন্যান্য আয়াতেও এ বিষয় বস্তুটি উল্লিখিত হয়েছে যে, কাফের মুশরিকরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করবে যে, আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে একটু সুযোগ দিন। যাতে অতীতের কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ করতে পারি।

قَوْلُهُ لَيَقُوْلَنَّ : এর পরের ইবারত ব্যাখ্যাকারের কলমের পদস্খলন মাত্র। সম্ভবত جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ মনে করে উল্লিখিত تَعْلِيْل করেছেন। অন্যথা সকল কারীগণের ঐক্যমত্যে لَيَقُوْلَنَّ -এর لَامْ বর্ণে যবর হয়েছে আর اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا হলো فَاعِلْ

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ : এটা شَرْط مَحْذُوْف -এর جَزَاءْ হয়েছে। অর্থাৎ اَىْ اِذَا عَلِمْتَ حَالَهُمْ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ فَاصْبِرْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোনোভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যুক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির জমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

قَوْلُهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ : বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও কতটুকু দুর্বল; বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বলতা ছিলে। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরো বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোনো বিশাল ওয়ার্কশপে নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা না খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ : এরপর আল্লাহ তা'আলার তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার অবর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দুটি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারো এরূপ করার শক্তি ছিল না। এতো এক ক্ষীণ শিশু। একটা বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোনো প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোনো কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবনকাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নমুনা সামনে আসবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ ضَعْفٍ قُوَّةً : এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে। এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً [আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে?] এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তার বিধানাবলির অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন- ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয় নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাব্বুল ইজ্জতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছে وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলিতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাসের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরজখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উল্টা হয়ে গেছে। আমরা বরজখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাজির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আজাব ভোগ করবে, কিন্তু কিয়ামতের আজাবের তুলনায় সেই আজাব আজাব-ই নয়, সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহ তা'আলার সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশি থাকি না। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে- وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোনো বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হবে এবং তার হস্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোনো প্রমাণ আবশ্যক হবে না। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الخ আয়াতের অর্থ তা-ই। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে, মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন- ইরশাদ হয়েছে- لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না : এর বিপরীতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে? তখন সে বলবে هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ অর্থাৎ হায়, হায় আমি কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে আমার পালনকর্তা আল্লাহ, বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনোরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهٖ ـ

٢. تِلْكَ اَيْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ذِي الْحِكْمَةِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ هُوَ ـ

٣. هُدًى وَّرَحْمَةً بِالرَّفْعِ لِلْمُحْسِنِيْنَ وَفِيْ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالنَّصْبِ حَالًا مِنَ الْاٰيَاتِ الْعَامِلُ فِيْهَا مَا فِيْ تِلْكَ مِنْ مَعْنَى الْاِشَارَةِ ـ

٤. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ بَيَانٌ لِلْمُحْسِنِيْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ هُمُ الثَّانِيْ تَاكِيْدٌ ـ

٥. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ ـ

٦. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ اَيْ مَا يُلْهِيْ مِنْهُ عَمَّا يَعْنِيْ لِيُضِلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَرِيْقِ الْاِسْلَامِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يُضِلَّ وَبِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى يَشْتَرِيْ هُزُوًا ط مَهْزُوًّا بِهَا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ اِهَانَةٍ ـ

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত রয়েছেন।

২. এগুলো অর্থাৎ এই আয়াতসমূহ প্রজ্ঞাময় কিতাব কুরআনের আয়াত। এতে اٰيٰتُ الْكِتٰبِ -এর ইজাফতটি اِضَافَتْ بِمَعْنٰى مِنْ তথা مِنْ -এর অর্থ প্রদানকারী ইজাফত।

৩. হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। رَحْمَةٌ টি পেশবিশিষ্ট এবং অধিকাংশ কেরাত মতে তা নসব পড়বে তখন তা اٰيَاتٌ থেকে حَالٌ তথা অবস্থাবোধক পদ হবে। তখন এতে আমলকারী পদ তথা عَامِلٌ হলো تِلْكَ ইসমে ইশারা থেকে অর্থগতভাবে সৃষ্ট ক্রিয়া বা فِعْلٌ অর্থাৎ اُشِيْرُ।

৪. যারা সালাত কায়েম করে, তা مُحْسِنِيْنَ -এর بَيَانٌ বা স্পষ্টকারী পদ জাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এতে দ্বিতীয় هُمْ সর্বনামটি তাকিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. এসব লোকই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম।

৬. এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ইসলামের পথ থেকে গুমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা অর্থাৎ ঐ সমস্ত বস্তু যার কারণে মানুষ মূল উদ্দেশ্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। সংগ্রহ করে মূর্খতার কারণে لِيُضِلَّ -এর ى -এর মধ্যে যবর ও পেশ উভয়টা পড়া যায়। এবং তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে يَتَّخِذَ -এর ذ -এর মধ্যে যবর পড়লে يُضِلَّ -এর উপর আতফ হবে আর পেশ পড়লে يَشْتَرِيْ -এর উপর আতফ হবে। ... রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

٧. وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا مُتَكَبِّرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ج صَمَمًا وَجُمْلَتَا التَّشْبِيْهِ حَالَانِ مِنْ ضَمِيْرِ وَلّٰى اَوِ الثَّانِيَةُ بَيَانٌ لِلْاُوْلٰى فَبَشِّرْهُ اَعْلِمْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ . مُؤْلِمٍ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ بِهٖ وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ كَانَ يَأْتِي الْحِيْرَةَ يَتَّجِرُ فَيَشْتَرِيْ كُتُبَ اَخْبَارِ الْاَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا اَهْلَ مَكَّةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُكُمْ اَحَادِيْثَ عَادٍ وَثَمُوْدَ وَاَنَا اُحَدِّثُكُمْ اَحَادِيْثَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ فَيَسْتَمْلِحُوْنَ حَدِيْثَهٗ وَيَتْرُكُوْنَ اِسْتِمَاعَ الْقُرْاٰنِ .

৭. যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা অহংকারের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির। এখানে তাশবীহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত উভয়টি বাক্য অর্থাৎ كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ও كَاَنَّ فِيْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا - وَلّٰى -এর সর্বনাম থেকে حَالٌ বা দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের জন্য بَيَانٌ হবে। সুতরাং তাদেরকে কষ্টদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। এখানে তাদের সাথে বিদ্রূপমূলক শাস্তির সংবাদকে বাশারাত তথা সু-সংবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সে হলো, নযর ইবনে হারেস তিনি ব্যবসায়িক কাজে হিয়ারাহ যেত এবং সেখান থেকে আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনত এবং মক্কার অধিবাসীদের নিকট তা পাঠ করে শুনাতো এবং বলতেন, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, ছামূদ সম্প্রদায়ের কাহিনী শোনায় এবং আমি তোমাদেরকে পারস্য ও রূমের কাহিনী শোনাব। এবং তারা তা পছন্দ করল ও কুরআন শোনা থেকে বিরত থাকল।

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ .

৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত।

٩. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَيْ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا اِذَا دَخَلُوْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط اَيْ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ وَحَقَّهٗ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الَّذِيْ لَا يَغْلِبُهٗ شَيْءٌ فَيَمْنَعُهٗ عَنْ اِنْجَازِ وَعْدِهٖ وَ وَعِيْدِهٖ الْحَكِيْمُ الَّذِيْ لَا يَضَعُ شَيْئًا اِلَّا فِيْ مَحَلِّهٖ .

৯. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এখানে خَالِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের সর্বদা জান্নাতে অবস্থান করা নির্ধারণ হয়ে গেছে যখন তারা সেখানে প্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যথার্থ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যথার্থ ওয়াদা করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী কেউ তাকে পরাজয় করতে পারে না। অতএব কেউ তাকে তার ওয়াদা পূরণ করতে বাধা দিতে পারবে না। ও প্রজ্ঞাময় যিনি প্রত্যেক বস্তু তার উপযুক্ত স্থানেই রাখে।

١٠. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اَيْ الْعَمَدَ جَمْعُ عِمَادٍ وَهُوَ الْاُسْطُوَانَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَّا عَمَدَ اَصْلًا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالًا مُرْتَفِعَةً اَنْ لَّا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ صِنْفٍ حَسَنٍ .

১০. তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। اَلْعَمَدُ শব্দটি عِمَادٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ খুঁটি। যখন কোনো খুঁটি হয় না তখন বাক্যটি বলা হয়। যেমন তোমরা তা দেখছ! তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন উঁচু উঁচু পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে নড়াচড়া না করে। এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি এখানে غَائِبٌ থেকে مُتَكَلِّمٌ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।

١١. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ اَىْ مَخْلُوْقُهٗ فَاَرُوْنِىْ اَخْبِرُوْنِىْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط غَيْرِهٖ اَىْ اٰلِهَتُكُمْ حَتّٰى اَشْرَكْتُمُوْهَا بِهٖ تَعَالٰى وَمَا اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ مُبْتَدَأٌ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِىْ بِصِلَتِهٖ خَبَرُهٗ وَاَرُوْنِىْ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ وَمَا بَعْدَهٗ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ بِاِشْرَاكِهِمْ وَاَنْتُمْ مِنْهُمْ -

১১. এটা আল্লাহর সৃষ্টি অর্থাৎ তার মাখলুক, মাসদার خَلْق مَفْعُوْل -এর অর্থে। অতঃপর হে আহলে মক্কা তোমরা আমাকে দেখাও খবর দাও তিনি ব্যতীত অন্যরা অর্থাৎ তোমাদের মাবুদগণ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক কর যা সৃষ্টি করেছে। এখানে مَا শব্দটি অস্বীকারমূলক প্রশ্নবোধক শব্দ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ হয়ে মুবতাদা আর ذَا শব্দটি الَّذِىْ অর্থে اِسْمُ مَوْصُوْل অতঃপর اِسْمُ مَوْصُوْل তার পরবর্তী صِلَةٌ সহ খবর। এবং اَرُوْنِىْ তার আমল থেকে বিরত রয়েছে। আর পরবর্তী বাক্য দুটি মাফঊলের স্থলাভিষিক্ত। বরং জালেমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। এখানে بَلْ ইনতিকাল এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ : تِلْكَ ইসমে ইশারা بَعِيْد -এর তাফসীর هٰذِهٖ ইসমে ইশারা قَرِيْب দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, সূরাসমূহের আয়াত আল্লাহ তা'আলর নিকট মর্যাদার দিক থেকে উচ্চ মর্যাদাশীল। যদিও মেধা থেকে নিটবর্তী হয়। هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, هُدًى وَّرَحْمَةٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। আর যদি هُدًى এবং رَحْمَةً মানসূব হয় তবে আয়াত থেকে حَالٌ হবে। আর تِلْكَ টা يُشِيْرُ -এর অর্থে হয়ে আমেল হবে।

قَوْلُهٗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ : এর পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মুমিনদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে تَقَابُلٌ -এর ভিত্তিতে বদকার মুশরিকদের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নেককারদের গুণাবলির উল্লেখ ছিল। আর এই আয়াতে মুশরিকদের গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে। وَمِنَ النَّاسِ -এর মধ্যস্থ مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ শানে নুযূলের ভিত্তিতে যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি নজর ইবনে হারেছ ইবনে কালদাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু শব্দ ব্যাপক যাতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর সাথে সম্পর্কশীল প্রত্যেক ব্যক্তিই এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ لَهْوَ : এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এরূপ অহেতুক কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে উপকারী কর্ম ছুটে যায়। এখানে মাসদারটা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সেই বেহুদা কথাবার্তা গাফেল করে দেয়। لَهْوَ الْحَدِيْثِ এটা اِضَافَتْ مِنِيَّةْ -এর অন্তর্গত। যেমনটি ব্যাখ্যাকার مِنْهُ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন মূলে لَهْوًا مِنَ الْحَدِيْثِ ছিল।

قَوْلُهٗ مَا يُلْهِىْ : এটা বাবে سَمِعَ -এর مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهٗ عَمَّا : অর্থাৎ সেই বস্তু যা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখন لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর অর্থ হবে ঐ বস্তু যা ফলদায়ক ও কার্যকর বিষয় হতে গাফেল করে দেয়।

قَوْلُهٗ لِيُضِلَّ : لِيَضِلَّ এবং لِيُضِلَّ উভয় কেরাতই প্রচলিত রয়েছে। لِيَضِلَّ -এর সুরতে অনুবাদ হবে যে, সে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -কে এইজন্য ক্রয় করে যে, বাজে কথা ও বেহুদা কিসসা কাহিনীতে সর্বদা লিপ্ত থেকে পথভ্রষ্ট থাকবে। আর দ্বিতীয় সুরতে অর্থ হবে– যাতে সে অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। অর্থাৎ নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও ভ্রষ্টকারী।

قَوْلُهٗ صَمَمًا : এটা وَقْرًا -এর তাফসীর। وَقْر বধিরকে বলে যা অনুভূত ও খারেজী বস্তু। এখানে مَعْنَوِىْ বধিরতা উদ্দেশ্য। আর তা হলো ভাবত্ব এবং বধিরতা শ্রবণ না করা বা শ্রবণ করে আমল না করাকে وَقْر দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْهُ اَىْ اَعْلِمْهُ : بَشِّرْهُ -এর তাফসীর اَعْلِمْهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে সুসংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা عَذَابٍ اَلِيْمٍ -এর সুসংবাদের কোনো অর্থই হতে পারে না। কেননা সুসংবাদ ভালো সংবাদেরই হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো مُطْلَقًا সংবাদ দেওয়া।

قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ : এটা بَشِّرْهُ -এর দ্বিতীয় তাফসীর। ব্যাখ্যাকার (র.) -এর জন্য উচিত ছিল এখানে وَاوْ -এর পরিবর্তে اَوْ বলা। দ্বিতীয় তাফসীরের সার হলো এই যে, এখানে সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুসংবাদই তবে এটা বিদ্রূপাত্মক হবে।

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا : এটা جَنّٰتٌ অথবা لَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। কেননা حَالْ এবং ذُو الْحَالِ -এর জমানা এক হওয়া জরুরি।

قَوْلُهُ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ : এই তাফসীর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَعْدًا হলো মাসদার স্বীয় ফে'লের স্থানে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ ফে'ল কে ফেলে দিয়ে মাসদারকে তার জায়গায় রেখে দিয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- وَعَدَ هُمُ اللّٰهُ وَعْدًا আর وَعْدًا মাসদার مُوَكِّدٌ لِنَفْسِهٖ হয়েছে। কেননা আল্লাহর বাণী لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ অর্থের ক্ষেত্রে وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ আর حَقًّا হলো মাসদার مُوَكِّدٌ لِغَيْرِهٖ কেননা প্রতিটি ওয়াদা সত্য হয় না।

قَوْلُهُ اُسْطُوَانَةٌ : একবচন; বহুবচনে اَسَاطِيْنُ অর্থ- স্তম্ভ, খুঁটি, পিলার।

قَوْلُهُ هُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَّا عَمَدَ اَصْلًا : ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারত দ্বারা بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَ -এর দুটি অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা আসমানকে এমন স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা তোমরা দেখতে পাও না। এর অপর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আসমানকে কোনো স্তম্ভ ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন যাকে তোমরা দেখ না। আর এর তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো আকাশকে স্তম্ভবিহীন সৃষ্টি করেছেন। কেননা যখন আকাশের খুঁটিই নেই তখন দৃষ্টিতে কোথা থেকে আসবে? কেননা سَالِبَةٌ বাক্য যেভাবে مَوْضُوْعٌ -এর জন্য مَحْمُوْلٌ -কে প্রমাণিত না হওয়ার সুরতে صَادِقٌ আসে তেমনিভাবে مَوْضُوْعٌ শুরু থেকেই বিদ্যমান না হওয়ার সুরতেও صَادِقٌ আসে। যায়দ যদি বসা হয় তাহলে زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ বলা বৈধ। আর যদি জায়েদ পৃথিবীতে না-ই থাকে তবুও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ সাদেক আসে।

قَوْلُهُ لِاَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ : মুফাসসির (র.) لَامْ تَعْلِيْلٌ এবং لَائِے نَافِيَةٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর কম্পন রোধ করা।

قَوْلُهُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ : غَيْرَهٗ হলো دُوْنَهٗ -এর তাফসীর। আর اٰلِهَتُكُمْ হলো اَلَّذِيْنَ -এর তাফসীর। আর مَاذَا -এর মধ্যস্থ مَا টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ এবং মুবতাদা আর ذَا হলো اَلَّذِىْ অর্থে। اَلَّذِىْ স্বীয় صِلَةٌ সহ খবর হয়েছে। আর عَائِدٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مَا الَّذِىْ خَلَقَهٗ আর اَرُوْنِىْ হলো শাব্দিকভাবে مَمْنُوْعُ الْعَمَلِ কেননা مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ এর প্রথমে পতিত হয়েছে। যদি اَرُوْنِىْ -কে আমল দেওয়া হয় তবে مَانِعِ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর صَدَارَتْ كَلَامْ [বাক্যের শুরুতে হওয়া] বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ مَا بَعْدَهٗ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ : এটা সেই সুরতে বৈধ হবে যখন اَرُوْنِىْ কে مُتَعَدِّىْ بِهٖ مَفْعُوْلٌ মানা হবে। এই সুরতে প্রথম মাফউল হলো اَرُوْنِىْ -এর ى আর পরের বাক্য দু'মাফউলের স্থলাভিষিক্ত হবে। কিন্তু এটা তার বিপরীত যা বর্ণনা করা হয়েছে। আর اَرِىْ যখন اَخْبِرْ -এর অর্থে হবে তখন مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْلٌ হবে। যেমনটি এখানে হয়েছে। কাজেই এই সুরতে ব্যাখ্যাকারের سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ বলা সমুচিত মনে হয় না, বরং سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ বললে উত্তম হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরার নামকরণ :

এ সূরায় লোকমান হাকীমের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই সূরাটির এ নামকরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত লোকমান অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। শুধু ইকরিমার অভিমত উদ্ধৃত করা হয় যে, তিনি নবী ছিলেন। তবে এর সূত্র অত্যন্ত দুর্বল। তিনি সুদানের অধিবাসী ছিলেন। তার পেশা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক অভিমত পোষণ করেছেন। কেউ বলেন, তিনি জীবনের সূচনায় কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দর্জী। আর কেউ বলেন, তিনি বকরি চরাতেন। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নেয়। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ূব (আ.)-এর খালাতো ভাই। আর তিনি হযরত আইয়ূব (আ.)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তিনি সুদীর্ঘ বয়স পেয়েছেন। এমনকি তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর জমানা পেয়েছেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বনী ইসরাঈলের কাজী এবং মুফতি ছিলেন। যখন হযরত দাউদ (আ.) প্রেরিত হলেন তখন তিনি ফতোয়া প্রদান পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, নবীর বর্তমান থাকাই যথেষ্ট অর্থাৎ নবীর বর্তমানে অন্যেরা ফতোয়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের হেদায়েতের জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী সূরার শেষ আয়াতে .... وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং অলৌকিকত্বের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। এ মর্মে যে, এই কিতাব কুরআনে কারীম হলো, রহমতের কিতাব, হেদায়েতের কিতাব এবং এর প্রত্যেকটি কথা হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। অতএব, এই গ্রন্থকে গ্রহণ করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা সৌভাগ্যের লক্ষণ।

পক্ষান্তরে এই কিতাব গ্রহণ না করা এবং গান-বাজনা, নভেল-নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হওয়া দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

- আল্লাহ পাক এ সূরায় লোকমান হাকীমের মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ করেছেন এবং তাতে তৌহীদের সত্যতা, শিরকের বাতুলতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং নেক আমলের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং মন্দ কাজ পরিহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী সূরায় আখেরাতের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আখেরাতের উল্লেখের পাশাপাশি তার কিছু দলিল প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে।
- পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে সে সব লোকের কথার উল্লেখ ছিল যারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর আস্থা স্থাপন করে। আর এই সূরার শুরুতে সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা রক্ষা করে।
- পূর্ববর্তী সূরার শেষে কিয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ সূরার শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, কিয়ামত সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা।

মোটকথা, এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা নেককার বদকারের অবস্থা এবং পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যেহেতু এ সূরা মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর নাজিল হওয়ার সময় মক্কা শরীফে উভয় দল উপস্থিত ছিল। তাই নেককার হলেন সে যুগের মুহাজিরগণ, আর বদকার হলো যারা ইসলামে সেদিন বাধা দিয়েছিল।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে মরদবিয়া, বায়হাকী দালায়েলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরায়ে লোকমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য অন্য সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আর একটি কথাও বর্ণিত হয়েছে সে সূরায়ে লোকমানের তিনটি আয়াত ব্যতীত সবই মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য সূরায় ৪ রুকূ, ৩৪ আয়াত, ৭৪৮ বাক্য ও ২১১০খানি অক্ষর রয়েছে।

قَوْلُهُ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ : মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে জাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল জাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় সনে জাকাতের বিধান কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, জাকাতের নিসাব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরি দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

সূরা মুজ্জাম্মিলের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতের অধীনে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ বক্তব্যই সপ্রমাণ করেছেন। কেননা সূরা মুজ্জাম্মিল কুরআন অবতরণের প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কুরআন পাকের আয়াতসমূহ যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাজ ও জাকাত একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি এগুলো ফরজও সাথে সাথেই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ : اِشْتِرَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোনো কোনো সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اِشْتِرَاءٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। اِشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে সফর করতো। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে আদ, ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়। বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখতো এবং গোপনে শুনতও তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুঁতা পেয়ে গেল।

-[রূহুল মা'আনী]

দূররে মানসূর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শুনাবার জন্য সে বাঁদীকে আদেশ করতো ও বলতো মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্‌সা কাহিনী অথবা গায়িকা বাদী ক্রয় করা। শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اِشْتِرَاءٌ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اِشْتِرَاءٌ শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ বাক্যটিতে حَدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা, কিস্‌সা-কাহিনী গাফেল হওয়া, যেসব মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয়, সেগুলোকে لَهْوٌ বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لَهْوٌ বলা হয়, যার কোনো উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর অর্থ ও তাফসীর কি এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এর তাফসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা। -[হাকিম, বায়হাকী]

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْثِ বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন- لَهْوَ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهٗ অর্থাৎ لَهْوَ الْحَدِيْثِ বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বুঝানো হয়েছে [যা আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়]। বায়হাকীতে আছে- لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي আয়াত নাজিল হয়েছে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, অপমানজনক শাস্তি বলার কারণে মু'মিন এবং কাফেরদের শাস্তির পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। আখেরাতে গুনাহগার মু'মিনদেরও শাস্তি হবে, তবে তা হবে তাদেরকে পবিত্র করার জন্য, অপমান করার জন্যে নয়, আর কাফেরদের শাস্তি হবে অপমানজনক, অর্থাৎ তারা শুধু শাস্তিই ভোগ করবে না; বরং অপমানিতও হবে।

নাফরমানির শাস্তি দুনিয়াতেও হয় : আলোচ্য আয়াতে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা শুধু যে আখেরাতে হবে তাই নয়, দুনিয়াতেও উপরোল্লিখিত অন্যায় অনাচারের শাস্তি হতে পারে। হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদ্য পান করবে এবং মদের অন্য কোনো নাম দিয়ে দেবে; তাদের সম্মুখে বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেবেন, তাদের কিছু কিছু লোককে বানর এবং শুকরেও পরিণত করবেন। –[ইবনে মাজাহ]

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আমার উম্মত পনেরোটি কাজ করবে তখন তাদের উপর বালা-মুসিবত নাজিল হবে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ঐ কাজগুলো কি কি? তিনি ইরশাদ করলেন–

১. যখন গণিমতের মালকে সম্পদ মনে করা হবে। [অর্থাৎ অর্থ–সম্পদ রোজগারের জন্যে জিহাদ করা হবে।]

২. যখন আমানতের মালকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মনে করা হবে।

৩. যখন জাকাতকে বোঝা মনে করা হবে।

৪. যখন স্বামী স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে।

৫. সন্তান তার মায়ের অবাধ্য হবে।

৬. বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।

৭. নিজের পিতার উপর জুলুম করবে।

৮. যখন মসজিদে শোরগোল হবে।

৯. যখন সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

১০. মন্দ ও দুষ্ট লোকের সম্মান এজন্যে করা হবে যেন তার দুষ্টুমি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

১১. মদ্য পান করা হবে।

১২. রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে। [অর্থাৎ পুরুষেরা রেশমী কাপড় পরবে]।

১৩. গায়িকাদেরকে রাখা হবে।

১৪. বাজনা, ঢোল, তবলা ব্যবহার করা হবে।

১৫. পরবর্তী কালের লোকেরা পূর্ব কালের লোকদেরকে লা'নত দিবে, এমন সময় ঝড়-তুফান এবং জমিন ধ্বসিয়ে দেওয়ার শাস্তি আপতিত হতে পারে।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আখেরাতের সকল আজাবই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে তবে উপরোল্লিখিত অন্যায়কারীদের শাস্তি কঠোর হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত অপমানজনকও হবে যে বা যারা সারা জীবন ইসলামের অবমাননা করেছে, সত্য দীনের প্রতি উপহাস করেছে তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা থাকাই যুক্তিযুক্ত।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহের প্রকৃত শাস্তি তো আখেরাতেই হবে তবে দুনিয়াতেও এসব লোকদের জন্যে কঠিন-কঠোর শাস্তি রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূরারোগ্য ব্যাধি, মহামারীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। –[তাফসীরে মাজেদী]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে বহু হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা তন্মধ্যে থেকে এ পর্যায়ে দু'একখানি উদ্ধৃতি দেওয়া জরুরি মনে করি।

ইবনে আবিদদুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত নাফে'র কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। পথে পথে একস্থানে একটি বাজনার আওয়াজ শ্রুত হলো। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তার দুই কানে দুটি আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এরপর অন্য পথে চললেন। তখন একথা জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, "হে নাফে' এখন সেই বাজনার আওয়াজ শুনা যায়? আমি যখন না সূচক জবাব দিলাম তখন তিনি তার কান থেকে অঙ্গুলি বের করলেন, এবং বললেন, আমি স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি তিনিও এমনিভাবে কর্ণ কুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে ব্যক্তির সম্পর্কে যে একটি গায়িকা ক্রয় করে, আর ঐ গায়িকা দিন রাত গান গাইতো। [অর্থাৎ নজর ইবনে হারেছ]।

হযরত রাফে ইবনে হাবসুল মাদানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারজন মহিলার দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না, তন্মধ্যে জাদুকর ও গায়িকা রয়েছে। –[তাফসীরে আদ্ দুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ১৭৪]

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া। –[রূহুল মা'আনী, কাশশাফ]

আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلٰثَةً اِنْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَادِيْبُكَ لِفَرَسِكَ وَمُلَاعَبَتُكَ لِأَهْلِكَ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. অর্থাৎ পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল। কিন্তু তিনটি বাতিল নয়– ১. তীরধনুক নিয়ে খেলা, ২. অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং ৩. নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল, সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোনো উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত আছে। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলে দেওয়া হয়েছে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলাই নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যত সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরূহ তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনোটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর হাদীসে একথা পরিষ্কার ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসের ভাষ্য এরূপ–

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلَاثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَةُ اَهْلِهِ وَرَمْيَةٌ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ.

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতঃপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

১. যে খেলা দীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্টর করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

২. যে খেলা মানুষকে ইসলামি বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোনো হারাম কাজে ও গুনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়। কিন্তু হারাম ও কঠোর গুনাহ, যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামাজ রোজা ইত্যাদি ফরজ কর্মের অন্তরায় হয়।

অশ্লীল ও বাজে নভেল, অশ্লীল কবিতা এবং বাতিল পন্থিদের পুস্তক পাঠ করাও নাজায়েজ : বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অশ্লীল নভেল, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরিউক্ত হারাম খেলার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিল পন্থিদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় নাজায়েজ তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জবাব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তি নেই।

৩. যে সব খেলায় কুফর নেই কোনো প্রকার গুনাহ নেই, সেগুলো মাকরূহ। কারণ এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান : উপরিউক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজসরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো ক্রয় বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় ও পার্থিক উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরিয়ত অনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে ছওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে, তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ অর্থাৎ মুমিনের শ্রেষ্ঠ সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা।

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারতো না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন, কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।

–[আবূ দাউদ]

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীলন কল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে নিজের পশ্চাতে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন- اِلْهُوْا وَالْعَبُوْا অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। –[বায়হাকী, কানয]

কতক রেওয়ায়েতে আরো আছে- فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يُرٰى فِيْ دِيْنِكُمْ غِلْظَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক। এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কতক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তারা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً **অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।** –[আবূ দাউদ] **এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হলো।**

এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো لَهْوٌ তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন– দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলে হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। –[নসবুররায়াহ]

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। –[আবূ দাউদ, কান্‌য]

এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরি কাজকর্ম এমনকি নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেলা বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়। তাঁদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কুরআন পাকের لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেম زُوْرٌ শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান বর্ণিত হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يَعْزِفُ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ. আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি-বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরো বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। –[আহমদ, আবূ দাউদ]

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ بَعْضُهٗ بَعْضًا.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন জিহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, জাকাতকে জরিমানার মতো কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমি ধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেমন কোনো মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র। যেসব গুনাহ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ কররছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপীদের উপর আসমানি আজাব নাজিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা- তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতদভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও নাজায়েজ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় : অপর পক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোনো কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোনো নারী বা কিশোর না হয়, তবে জায়েজ।

কোনো কোনো সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাদের শরিয়তের অনুসরণ ও রাসূল ﷺ -এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا : এই একই বিষয়ে পূর্ব আলোচিত সূরায়ে রাদের প্রথমদিকে এক আয়াত রয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ব্যাকারণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে-

১. تَرَوْنَهَا -কে عَمَدَ -এর صِفَتْ [বিশেষণ] রূপে পরিগণিত করে এর ضَمِيْرٌ [সর্বনাম]-কে عَمَدْ -এর প্রতি ধাবিত করা তখন অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপে এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এ তাফসীর হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) কৃত। -[ইবনে কাছীর]

২. تَرَوْنَهَا-এর ضَمِيْرٌ [সর্বনাম] سَمٰوٰتٌ -এর দিকে ধাবিত। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে। অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ স্তম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত, সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও; সেগুলো অদৃশ্য বস্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র.) কৃত তাফসীর। -[ইবনে কাছীর]

সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোনো স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তার অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুকে সাধারণত কোনো স্তম্ভ থাকে না। তা হলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বিশেষত্ব আছে?

এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, কুরআনে কারীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে, যা বাহ্যত গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই কুরআনে কারীম একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মতো পরিদৃষ্ট হয় যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণতভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে কাছীর এবং কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কুরআন হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না; বরং কুরআনের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বুজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌঁছে সিজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ ও পূর্ণ গোলাকার না হলে পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর ঊর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে। পরিপূর্ণ গোলকের কোনো দিককে উপর বা নিচ বলা চলে না।

١٢. وَلَقَدْ أٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإِصَابَةُ فِى الْقَوْلِ وَحِكْمَةٌ كَثِيْرَةٌ مَاثُوْرَةٌ كَانَ يُفْتِىْ قَبْلَ بِعْثَةِ دَاوُد وَادْرَكَ زَمَنَهُ وَاَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمَ وَتَرَكَ الْفُتْيَا وَقَالَ فِىْ ذٰلِكَ اَلَا اَكْتَفِىْ اِذَا كُفِيْتُ وَقِيْلَ لَهُ اَىُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ الَّذِىْ لَا يُبَالِىْ اَنْ رَاٰهُ النَّاسُ مُسِيْئًا اَنْ اَىْ وَقُلْنَا لَهُ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط عَلٰى مَا اَعْطَاكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج لِاَنَّ ثَوَابَ شُكْرِهٖ لَهُ وَمَنْ كَفَرَ النِّعْمَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ خَلْقِهٖ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ فِىْ صُنْعِهٖ.

অনুবাদ :

১২. আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা ইলম, দিয়ানত ও সত্যবাদিতা দান করেছি। তার অনেক প্রজ্ঞাময় কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত দাউদ (আ.) -এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে ছিলেন ও তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, আমি কি পরিসমাপ্তি হব না যখন আমাকে পরিসমাপ্ত করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি? তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট যে এর পরোয়া করে না যে, লোকেরা তাকে মন্দ বলবে। এই মর্মে যে, অর্থাৎ আমি তাকে বলেছি তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও তিনি তোমাকে যা হিকমত দান করেছেন তার উপর এবং যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। কেননা তার কৃতজ্ঞতার ছওয়াব তার জন্যেই আর যে অকৃতজ্ঞ হয় নিয়ামতের উপর নিশ্চয় আল্লাহ তার সৃষ্ট থেকে অভাবমুক্ত, প্রশংসিত তার কর্মের উপর।

١٣. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ تَصْغِيْرُ اِشْفَاقٍ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ بِاللّٰهِ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ فَرَجَعَ اِلَيْهِ وَاَسْلَمَ.

১৩. তুমি উল্লেখ কর যখন হযরত লোকমান (আ.) উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! اِبْنَ بُنَىَّ টি -এর তাসগীর দয়া ও অনুগ্রহমূলক তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা মহা অন্যায়। অতঃপর সে হযরত লোকমান (আ.)-এর কথা গ্রহণ করল এবং ইসলাম কবুল করল।

١٤. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج اَمَرْنَاهُ اَنْ يَبَرَّهُمَا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ فَوَهَنَتْ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ اَىْ ضَعُفَتْ لِلْحَمْلِ وَضَعُفَتْ لِلطَّلْقِ وَضَعُفَتْ لِلْوِلَادَةِ وَفِصٰلُهٗ فِطَامُهٗ فِىْ عَامَيْنِ وَقُلْنَا لَهُ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ اَىِ الْمَرْجِعُ.

১৪. আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে অর্থাৎ গর্ভধারণের কষ্ট, জন্ম দেওয়ার কষ্ট ও স্তন্যদানের কষ্ট গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

١٥. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز اَيْ بِالْمَعْرُوْفِ اَلْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ طَرِيْقَ مَنْ اَنَابَ رَجَعَ اِلَيَّ ج بِالطَّاعَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. فَاُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَجُمْلَةُ الْوَصِيَّةِ وَمَا بَعْدَهَا اِعْتِرَاضٌ.

১৫. পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক করতে বাধ্য করে যার জ্ঞান অর্থাৎ বাস্তবসম্মত জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব مَعْرُوْفٌ অর্থাৎ কল্যাণ ও সদ্ব্যবহার সহ অবস্থান করবে। এবং তুমি অনুসরণ কর তাদের যে আমার অভিমুখী হয় অনুগত হয়। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব। আমি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেব এবং আলোচ্য আয়াতের অসিয়ত সংক্রান্ত আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াতসমূহ স্বতন্ত্র বাক্য তথা جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ।

١٦. يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اَيِ الْخَصْلَةُ السَّيِّئَةُ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ اَيْ فِيْ اَخْفٰى مَكَانٍ مِنْ ذٰلِكَ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط فَيُحَاسِبُ عَلَيْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ بِاسْتِخْرَاجِهَا خَبِيْرٌ بِمَكَانِهَا.

১৬. হে বৎস! নিশ্চয়ই কোনো বস্তু মন্দ কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে জমিনের গোপনীয় স্থানে তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন অতঃপর তার হিসাব নেওয়া হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বের করার গোপন ভেদ জানেন ও সবকিছুর জায়গার খবর রাখেন।

١٧. يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط بِسَبَبِ الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ اِنَّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ اَيْ مَعْزُوْمَاتِهَا الَّتِيْ يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوْبِهَا.

১৭. হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর, এবং আদেশ ও নিষেধ করতে গিয়ে তোমার কাছে যে বিপদাপদ আসবে তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা উল্লিখিত বিষয় সাহসিকতার কাজ। এই ধৈর্য ঐ সমস্ত কাজের মধ্যে যা আবশ্যক হওয়ার কারণে তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

١٨. وَلَا تُصَعِّرْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لَا تُمِلْ وَجْهَكَ عَنْهُمْ تَكَبُّرًا وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ط اَيْ خُيَلَاءَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ مُتَبَخْتِرٍ فِيْ مَشْيِهٖ فَخُوْرٍ عَلَى النَّاسِ.

১৮. তুমি মানুষকে অহংকারবশে অবজ্ঞা করো না। অন্য কেরাতে تُصَاعِرْ রয়েছে। অর্থাৎ অহংকারমূলক তাদের থেকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে নিও না। এবং পৃথিবীতে খুশিতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক চলার মধ্যে অহংকারকারী অহংকারী মানুষের উপর কে পছন্দ করেন না।

١٩. وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ تَوَسَّطْ فِيْهِ بَيْنَ الدَّبِيْبِ وَالْإِسْرَاعِ وَعَلَيْكَ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ وَاغْضُضْ اَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ اَقْبَحَهَا لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ اَوَّلُهُ زَفِيْرٌ وَاٰخِرُهُ شَهِيْقٌ.

১৯. তোমার পদচারণায় মধ্যবর্তিতা ধীরগতি ও দৌড়ানোর মধ্যবর্তী অবলম্বন কর। এবং তোমাদের উচিৎ শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পন্থায় চলা এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। যার প্রথম স্বর যাফীর ও শেষাংশ শাহীক তথা বিকট ও শ্রুতিকটু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ : হযরত লোকমান (র.) সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা عُجْمِىْ শব্দ عَلَمِيَّةٌ এবং عُجْمَةٌ -এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা আরবি শব্দ عَلَمِيَّتٌ এবং اَلِفْ وَنُوْن زَائِدَتَان -এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। হযরত লোকমান (আ.)-এর বংশ সূত্রের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, লোকমান ইবনে বাঙর ইবনে নাখূর ইবনে তারেখ। আর তারেখ আযরেরই নাম। এই বংশসূত্র হিসেবে হযরত লোকমান (র.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাইপো হন। আবার কেউ কেউ হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নে বলেছেন, আবার কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খালাতো ভাই বলেছেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান (আ.) এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগ পেয়েছেন। জমহুর এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত লোকমান হাকীম ছিলেন, নবী ছিলেন না। তবে ইকরিমা এবং শা'বী তিনি নবী ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ اَىْ وَقُلْنَا لَهُ : শারেহ (র.) এই তাফসীরী ইবারত দ্বারা যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, প্রথম হলো اَنْ টি تَفْسِيْرِيَّةٌ দ্বিতীয় হলো এই যে, উহ্য قُلْنَا -এর মাধ্যমে اَنِ اشْكُرْ -এর আতফ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ -এর উপর হয়েছে। হযরত লোকমান (আ.)-এর সন্তানের নামের ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। কেউ কেউ ثَارَانْ বলেছেন আর কালবী مَشْكَمْ বলেছেন। আর কেউ কেউ اَنْعَمْ বলেছেন, বলা হয় যে, হযরত লোকমানের স্ত্রী ও সন্তান কাফের ছিল। তার উপদেশ দানের ফলে মুসলমান হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ فَرَجَعَ وَاَسْلَمَ : এটা হলো عَطْف تَفْسِيْرِىْ

قَوْلُهُ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ : এই দুই আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর এই দুই আয়াত হযরত লোকমানের কথার মাঝে مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ।

قَوْلُهُ وَهَنَتْ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ : মুফাসসির (র.) وَهْنًا -এর পূর্বে وَهَنَتْ ফে'ল উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَهْنًا হলো উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ আর عَلٰى وَهْنٍ এটা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে وَهْنًا -এর সিফত হয়েছে। অর্থাৎ وَهْنًا كَائِنًا عَلٰى وَهْنٍ আর صَاوِىْ বলেছেন যে, অতি উত্তম হলো اُمُّهٗ থেকে حَالْ স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ ذَاتَ وَهْنٍ

قَوْلُهُ مُوَافَقَةٌ لِلْوَاقِعِ : ব্যাখ্যাকার (র.) مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ -এর ব্যাপারে বলতেছেন যে, ঘটনার বর্ণনার জন্য এই قَيْد বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষেই তার কোনো শরিক নেই। এরপরও তার عِلْم এবং دَلِيْل কোথা থেকে হবে। এটা قَيْد اِحْتِرَازِىْ নয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য এই হলো যে, যার শরিক হওয়ার তোমার নিকট কোনো দলিল নেই তাকে শরিক করো না। আর যার শরিক হওয়ার দলিল বিদ্যমান রয়েছে তার সাথে শরিক করতে পার। এটা তার مَفْهُوْم مُخَالِفْ হবে। যা ধর্তব্য নয়/গ্রহণযোগ্য নয়। এটাকেই বলা হয় لَا مَفْهُوْمَ لَهٗ অর্থাৎ তার مَفْهُوْم مُخَالِفْ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ : এখান থেকে দুই আয়াত হযরত লোকমানের বক্তব্যের মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হিসেবে হয়েছে। এর দ্বারা হযরত লোকমানের উক্তির تَاكِيْد করা উদ্দেশ্য।

يَا بُنَيَّ এটা হযরত লোকমানের স্বীয় সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার দিকে ফিরবে।

قَوْلُهُ فِيْ صَخْرَةٍ : صَخْرَةٌ সাধারণত পাথরের কঙ্করময় ভূমিকে বলা হয় এবং সপ্ত জমিনের নিচে যেই শক্ত পাথর রয়েছে সেটাকেও বলা হয়।

قَوْلُهُ لَا تُصَعِّرْ : فِعْل نَهِيْ অর্থ তুমি বক্রতা করো না। এখানে অহংকারের কারণে মুখ ফিরানো হতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তার খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। বায়যাবী ও অন্যান্য তাফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একথা অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিত যে, মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ.)-এর কালেও বর্তমান ছিলেন।

তাফসীরে দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন, কাঠ চেরার কাজ করতেন। [ইবনে আবী শায়বাহ, আহমদ, জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ যুহদ্ নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন।] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর নিকটে তার [লোকমান] অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাক বিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। -[ইবনে কাছীর]

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে কোনো মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে হাজির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকূলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত; হযরত বিলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত হামজা এবং লোকমান (আ.)।

প্রাচীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত লোকমান কোনো নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন : ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, প্রাচীন ইসলামি মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সূত্র [সনদ] দুর্বল। ইমাম বাগাবী (র.) বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। -[মাযহারী]

ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত লোকমান (আ.)-কে নবুয়ত ও হিকমত [প্রজ্ঞা] দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিকমতই [প্রজ্ঞা] গ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরজ করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনি হিকমতকে [প্রজ্ঞা] নবুয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোনো একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। -[ইবনে কাছীর]

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তার প্রতি কুরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ اَنِ اشْكُرْ لِىْ [আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর] তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে, যা আল্লাহর ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরিয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদানকার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (র.) বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চেয়েও বেশি অধ্যায় অধ্যায়ন করেছি। -[কুরতুবী]

একদিন হযরত লোকমান (আ.)-কে বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কি সেই ব্যক্তি যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যাঁ, আমি সে লোকই। অতঃপর লোকটি বলল, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহর গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শুনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে জমায়েত হয়? প্রতি উত্তরে হযরত লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ- ১. সর্বদা সত্যকথা বলা, ২. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান (আ.) বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই, নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা। নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।

-[ইবনে কাছীর]

হযরত লোকমান (আ.)-কে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? : حِكْمَتْ শব্দটি কুরআনে কারীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বিদ্যা, বিবেক, গাম্ভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুদ্ধতা।

আবূ হাইয়ান বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যদ্দারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকট পৌঁছায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হিকমত অর্থ- বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোনো প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা [হিকমত] প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে- اَنِ اشْكُرْ لِىْ [আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর] এতে এক সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا [আমরা বললাম] শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি [আল্লাহ] লোকমানকে প্রজ্ঞা [হিকমত] প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন যে, اَنِ اشْكُرْ لِىْ স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশে, যা সে কার্যে পরিণত করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণাবলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত। অতঃপর এ বিষয় অবহিত করে দেন যে, আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম তা আমার কোনো নিজস্ব লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতঃপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কুরআন কারীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো, কোনো প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ তা'আলাকে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মতো গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন– يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর অংশী স্থির করো না। অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম।] পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য উপদেশ্য ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন. শিরক যে গুরুতর অপরাধ। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরজ কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েজ নয় : আল্লাহ তা'আলা ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকিদ রয়েছে এবং নিজের [আল্লাহর] প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েজ হয়ে যায় না। যদি কারো পিতামাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েজ নয়।

এখানে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং একারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরিয়তে মায়ের স্থানও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে– وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম তাই। অতঃপর وَاِنْ جَاهَدَاكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন বিষয়ে পিতামাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি : যদি পিতামাতা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহর নির্দেশ হলো তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবত সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাদেরকে অপমানিত করার আশঙ্কা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক, প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে– صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ দান সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবাযত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়; বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করবে। তাদের প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিও না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক কুফরির ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারগতা হেতু বরদাশত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনো কষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাল যে দু'বছর বলা হয়েছে তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী। এখানে এর কোনো ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, এর চেয়ে অধিকতর দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাসআলার ব্যাখ্যা ও বিবরণ সূরায়ে আহকাফ এর حَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াতে ইনশাআল্লাহ করা হবে।

মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে : অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানের আওতাধীন; এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোনো বস্তু যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোনো বস্তু যতো দূরই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোনো বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন মহান আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোনো বস্তুকে যখন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে পারেন- يٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ (الاية)-এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহর জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মহাত্মা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে : অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিশুদ্ধির কারণ ও মাধ্যমও বটে। যেমন নামাজ সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছে- إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।] এজন্য অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাজের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ হে বৎস! নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামাজ পড়ে নেওয়া নয়; বরং যাবতীয় অঙ্গসমূহ ও নিয়মাবলি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা এসবই নামাজ প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে : ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম। ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন ও জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এজন্য নামাজের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধি, দ্বিতীয়. গোটা মানবকূলের পরিশুদ্ধি এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকূলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ অর্থাৎ এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে : وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ - لَا تُصَعِّرْ-এর উৎপত্তি صعر ধাতু থেকে যার অর্থ- উটের এক প্রকার ব্যাধি, যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের 'লাকওয়া' নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থি। وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا - مَرَحٌ শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সাথে বিচরণ করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ আল্লাহ তা'আলা কোনো অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

قَوْلُهُ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ : অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড় ধাপসহও চলো না, যা ভব্যতা ও শালীনতার পরিপন্থি। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুত গতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর [জামে সগীরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।] এরূপভাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যাধিক মন্থর গতিতেও চলো না। যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চেয়ে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যাধিক লজ্জা সংকোচের দরুন দ্রুত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না জায়েজ। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ফরমান যে সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদিদের মতো দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রিস্টানদের ন্যায় ধীরে গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকের নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে তারা বলল যে, সে কারীগণের একজন; সে যুগে যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন, সাথে সাথে কুরআনের আলেমও ছিলেন তাদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা সে একজন আলেম ও কারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর চেয়ে অনেক উন্নতমানের কারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন। [কিন্তু এমন দ্রুত নয় যেমন দ্রুত চলা নিষেধ।] তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়। এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতামণ্ডলীর তা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়।]

قَوْلُهُ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ : অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারূকে আজম (রা.) সম্পর্কে বলা হতো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোনো প্রকারের অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে– إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চিৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ১. লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। ২. ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। ৩. মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৪. উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আচার আচরণের এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রা.) ইরশাদ করেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মানুষের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশার কালে রাসূল ﷺ -এর আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন–

كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مُشَاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيبُ فِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَالْإِكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيهِ .

অর্থাৎ নবীজী ﷺ -কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো, তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তার স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপূত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু [সেগুলো হালাল হলে এবং তার কারো আকর্ষণ থাকলে] তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না এবং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না। [বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন], তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে [চিরতরে] বর্জন করেছিলেন। ১. ঝগড়া-বিবাদ, ২. অহংকার, ৩. অপ্রয়োজনীয়ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

লোকমান হাকীমের আরো কিছু উপদেশ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, লোকমান হাকীম বলতেন যে, কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তা হেফাজত করেন। –[আহমদ]

অতএব, মুসলমান মাত্রই কর্তব্য হলো তার ঈমান এবং ইসলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আমানত রাখা যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে তা সংরক্ষিত থাকে।

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- লোকমান তার পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, হে বৎস! তুমি যখন কোনো মজলিসে যাও তখন তাদেরকে সালাম দাও এবং এক কোণে নীরব অবস্থায় বসে পড় এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যদি তারা আল্লাহ তা'আলার জিকির সম্পর্কে কথা বলে তবে তুমিও তাতে অংশগ্রহণ কর, আর যদি তারা জিকরে ইলাহী ব্যতীত অন্য কথায় মশগুল হয়, তবে তুমি অন্যত্র চলে যাও।

খতিবে শারবিনী তার "তাফসীরে সিরাজে মুনীরে" লোকমান হাকীমের আরো কয়েকটি উপদেশের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. হে বৎস! তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন কর, তাহলে পুঁজি ব্যতীত ব্যবসায় যেমন লাভ হয়, তেমনি তুমি লাভবান হবে।

২. হে বৎস! জানাযায় হাজির হও, তবে বিয়ের মজলিসে নয়, কেননা জানাযার কারণে তুমি আখেরাতকে স্মরণ করবে, আর বিয়ের মজলিশে তুমি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে।

৩. হে বৎস! পেট পুরে আহার করো না, তোমার উচ্ছিষ্ট কুকুরের সামনে রেখে দাও।

৪. হে বৎস! মোরগের প্রতি লক্ষ্য কর, সে ভোরে উঠে আজান দেয়, আর সে সময় তুমি বিছানায় নিদ্রিত থাক, অতএব, মোরগের চেয়ে অধিকতর অসহায় হয়ো না।

৫. হে বৎস! তওবা করতে বিলম্ব করো না, কেননা মৃত্যু হঠাৎ আসে, খবর দিয়ে আসে না।

৬. হে বৎস! কখনো মূর্খ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, তোমাকে যে দেখবে সে উপলব্ধি করবে যে, তুমিও ঐ মূর্খ লোকের কথায় ও কাজে সন্তুষ্ট, এভাবে লোকেরা তোমার ব্যাপারে প্রতারিত হবে।

৭. হে বৎস! সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তাকওয়ার পরহেজগারীকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর, কিন্তু এভাবে জীবন যাপন কর যেন মানুষের নিকট তোমার পরহেজগারী প্রকাশ না পায়, মানুষ মনে করে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এজন্য তারা তোমাকে সম্মান করে, আর এ অবস্থায় এমন যেন না হয় যে তুমি মন্দ কাজে লিপ্ত হও।

৮. হে বৎস! নীরবতা পালন কর, নীরবতার কারণে কখনো তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না। যদি তোমার কথা রৌপ্য হয় তবে নীরবতা হলো খাঁটি স্বর্ণ।

৯. হে বৎস! মন্দ কাজ থেকে দূরে থাক, একটি মন্দের পর আরেকটি মন্দ আসে।

১০. হে বৎস! অতি ক্রোধ থেকে বিরত থাক, কেননা ক্রোধের আধিক্য মন খারাপ করে, এর দ্বারা মনের আলো দূরীভূত হয়।

১১. হে বৎস! সর্বদা ওলামায়ে কেরামের মজলিসে হাজির থাকবে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা শুনবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা হেকমতের নূর দ্বারা মৃত অন্তরকে জীবিত করে দেন, যেমন বৃষ্টি দ্বারা মৃত শুষ্ক জমিনকে জীবিত করেন, আর যে মিথ্যা কথা বলে তার চেহারার রৌশনী বিদায় হয়ে যায়। চরিত্রহীন লোককে অনেক সময়ই বিপদগ্রস্ত হতে হয়। পাহাড় থেকে পাথর তুলে আনা সহজ, কিন্তু নির্বোধ লোককে বোঝানো সহজ নয়।

১২. হে বৎস! কোনো নির্বোধ লোককে দূতরূপে প্রেরণ করো না, যদি কোনো বুদ্ধিমান লোক না পাও তবে নিজেই চলে যাও।

১৩. হে বৎস! কখনো কোনো বাঁদীকে বিয়ে করো না, [যদি তা কর] তবে তোমার সন্তাদেরকে তুমি চির গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবে।

১৪. হে বৎস! এমন সময় আসবে, যখন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নয়ন মন শান্তি পাবে না।

১৫. হে বৎস! এমন মজলিসে অংশগ্রহণ করবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার জিকির হয়। কেননা ঐ মজলিসের লোকদের প্রতি যখন আল্লাহ তা'আলার রহমত হবে তখন তুমিও তার কিছু অংশ পাবে। আর এমন মজলিসে বসবেনা যেখানে আল্লাহর জিকির না হয়। কেননা যদি তাদের উপর আল্লাহর কোনো গজব আসে, তবে তাতে তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৬. হে বৎস! তোমার খাবার যেন শুধু মোত্তাকী পরহেগারী লোক খায়, মন্দ লোকেরা যেন তোমার খাবার গ্রহণ না করে।

১৭. হে বৎস! জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর।

১৮. হে বৎস! দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র, যাতে বহুলোক নিমজ্জিত হয়ে গেছে, যদি তুমি এর থেকে নাজাত পেতে চাও, তবে আল্লাহর ভয়কে তোমার নৌকারূপে তৈরি কর, আর ঈমানের আসবাবপত্র দ্বারা ঐ নৌকাকে পরিপূর্ণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসাকে তার লঙ্গর বানাও। এভাবে হয়তো এই সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে তুমি বাঁচতে পার।

১৯. হে বৎস! আমি বড় বড় পাথর এবং বড় বড় লোহা বহন করেছি, কিন্তু মন্দ প্রতিবেশির চেয়ে কঠিন এবং ভারি কোনো বোঝা দেখিনি।

২০. হে বৎস! আমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছি কিন্তু দরিদ্র এবং পরমুখাপেক্ষীতা থেকে কষ্টকর কোনো কিছু দেখিনি।

২১. হে বৎস! জ্ঞান গুণ এবং বুদ্ধি অনেক ফকির মিসকিনকেও রাজা বাদশাহের আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

২২. হে বৎস! তুমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের প্রশংসার প্রার্থী হয়।

২৩. হে বৎস! যখন তুমি ইলম হাসিল কর, তখন তার উপর আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা কর।

২৪. হে বৎস! ওলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের সংসর্গে থাকা অবশ্য কর্তব্য মনে কর এবং তাদের নিকট শিখতে চেষ্টা কর।

২৫. হে বৎস! যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা হয় তখন তাকে পরীক্ষা করে নাও এবং তাকে রাগান্বিত কর এবং দেখ রাগান্বিত অবস্থায় সে তোমার সাথে কি ব্যবহার করে, যদি তখন সুবিচার করে, তবে সে বন্ধুত্বের যোগ্য, আর যদি সে সুবিচার না করে তবে তার নিকট থেকে আত্মরক্ষা করা তোমার কর্তব্য।

২৬. ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করবে, কেননা ঋণ দিনের বেলা অবমননা আর রাতের বেলা দুশ্চিন্তা।

২৭. হে বৎস! মনে রেখ, যখন তুমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েছ তখন থেকে তোমাকে পৃষ্ঠদেশ দুনিয়ার দিকে রয়েছে, আর তোমার মুখমণ্ডল আখেরাতের দিকে অতএব, যে ঘরের দিকে তুমি যাচ্ছ, তা এই ঘর থেকে অনেক নিকটবর্তী যে ঘর থেকে তুমি বিদায় হবে।

٢٠. اَلَمْ تَرَوْا تَعْلَمُوْنَ يَا مُخَاطَبِيْنَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ لِتَنْتَفِعُوْا بِهَا وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنَ الثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ وَالدَّوَابِّ وَاَسْبَغَ اَوْسَعَ وَاَتَمَّ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَهِىَ حُسْنُ الصُّوْرَةِ وَتَسْوِيَةُ الْاَعْضَاءِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ وَّبَاطِنَةً ط هِىَ الْمَعْرِفَةُ وَغَيْرُهَا وَمِنَ النَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى مِنْ رَسُوْلٍ وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ بَلْ بِالتَّقْلِيْدِ .

অনুবাদ :

২০. হে সম্বোধিত ব্যক্তিগণ! তোমরা কি দেখ না জান না আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডলে যেমন, সূর্য চন্দ্র ও তারকাসমূহ ও ভূমণ্ডলে যেমন ফলমূল, নদীনালা ও পশুপাখি ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা তা থেকে উপকৃত হও এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য নিয়ামত যেমন সুন্দর চেহারা, অবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ যথা– জ্ঞানবুদ্ধি ইত্যাদি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অনেক লোক মক্কার কাফেরগণ যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন ছাড়াই নবী ও কুরআন ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বাক বিতণ্ডা করে। বরং তাকলীদের কারণেই ঝগড়া করে।

٢١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط قَالَ تَعَالٰى اَيَتَّبِعُوْنَهٗ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ اَىْ مُوْجِبَاتِهٖ لَا .

২১. তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা নাজিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর তখন তারা বলে বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি তার অনুসরণ করবে? শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির শাস্তি ওয়াজিবকারী কর্ম দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি?

٢٢. وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗ اِلَى اللّٰهِ اَىْ يُقْبِلْ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط بِالطَّرْفِ الْاَوْثَقِ الَّذِىْ لَا يُخَافُ اِنْقِطَاعُهٗ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ مَرْجِعُهَا .

২২. যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ একত্ববাদের বিশ্বাসী হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে জীবন পরিচালনা করে সে এক মজবুত হাতল মজবুত হাতল যা ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় নেই ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ তা'আলার দিকে।

٢٣. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ يَا مُحَمَّدُ كُفْرُهٗ لَا تَهْتَمَّ بِكُفْرِهٖ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَىْ بِمَا فِيْهَا كَغَيْرِهٖ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ .

২৩. যে ব্যক্তি কুফরি করে হে মুহাম্মদ ﷺ! তার কুফরি যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। তুমি তার কুফরিতে চিন্তা করো না। আমার দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। অতএব এর প্রতিদান দেওয়া হবে।

٢٤. نُمَتِّعُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَلِيلًا أَيَّامَ حَيٰوتِهِمْ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ إِلٰى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ لَا يَجِدُونَ عَنْهُ مَحِيصًا.

২৪. আমি তাদেরকে দুনিয়াতে স্বল্পকালের জন্যে তাদের দুনিয়ার হায়াত পরিমাণ ভোগবিলাস করতে দেব। অতঃপর তাদেরকে আখেরাতে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি জাহান্নামের আগুন যা থেকে তারা কখনো মুক্তি পাবে না ভোগ করতে।

٢٥. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ط حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي الْأَمْثَالِ وَ وَاوُ الضَّمِيرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط عَلٰى ظُهُوْرِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْحِيدِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِمْ.

২৫. আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। لَيَقُولُنَّ -এর মধ্যে نُون إِعْرَابِي ও وَاو جَمْع উভয়টি বিলোপ করা হয়েছে লাগাতার কয়েকটি نُون ও দুটি সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে তা আসলে لَيَقُولُونَنَّ ছিল। বলুন, আল্লাহ তাদের উপর তাওহীদের সকল প্রমাণাদি প্রকাশ করার কারণে সকল প্রশংসাই আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশ তাদের উপর আল্লাহর তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন ওয়াজিব হওয়ার জ্ঞান রাখে না।

٢٦. لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ فِيهِمَا غَيْرُهُ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ خَلْقِهِ الْحَمِيدُ الْمَحْمُودُ فِي صُنْعِهِ.

২৬. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর মাখলুক, সৃষ্ট ও দাস হিসেবে অতএব উভয় জগতে তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের হকদার নয় নিশ্চয় আল্লাহ তার মাখলুক থেকে অভাবমুক্ত ও তার কর্মে প্রশংসিত।

٢٧. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ عَطْفٌ عَلٰى إِسْمِ أَنَّ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مِدَادٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط الْمُعَبَّرُ بِهَا عَنْ مَعْلُومَاتِهِ بِكَتْبِهَا بِتِلْكَ الْأَقْلَامِ بِذٰلِكَ الْمِدَادِ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لِأَنَّ مَعْلُومَاتِهِ تَعَالٰى غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ حَكِيمٌ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ.

২৭. পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্রযুক্ত কালি হয় اَلْبَحْرُ শব্দটি أَنَّ -এর ইসমের উপর আতফ তবুও তার বাক্যাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। كَلِمَاتُ اللّٰهِ থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহর জ্ঞান ও মালুমাত এবং উক্ত কলম দ্বারা লিখতে গেলে সাগরের পানি পরিমাণ কালি বা এর চেয়ে অধিক কালি শেষ হয়ে যাবে কেননা আল্লাহ তা'আলার মালুমাত ও জ্ঞান অসীম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী তাকে কোনো বস্তু দুর্বল করতে পারে না প্রজ্ঞাময় অর্থাৎ তার জ্ঞান থেকে কোনো বস্তু বের হতে পারে না।

২৮. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ خَلْقًا وَبَعْثًا لِاَنَّهُ بِكَلِمَةِ كُنْ فَيَكُوْنُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ يَسْمَعُ كُلَّ مَسْمُوْعٍ بَصِيْرٌ يُبْصِرُ كُلَّ مُبْصَرٍ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ـ

২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। কেননা সকল বস্তু তার كُنْ অর্থাৎ হও বাক্যের সাথে সাথে হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শুনেন ও দেখেন। কোনো কিছু তাকে কোনো কিছু থেকে ফিরাতে পারে না।

২৯. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ يَا مُخَاطَبُ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ يُدْخِلُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ يُدْخِلُهُ فِى الَّيْلِ فَيَزِيْدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاٰخَرِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ مِنْهُمَا يَّجْرِىْ فِىْ فَلَكِهِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

২৯. হে শ্রোতা! তুমি কি দেখ জান না যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? অতএব দিন ও রাতে প্রত্যেকটি এতটুকু বৃদ্ধি হয় যতটুকু অন্যটি থেকে হ্রাস পায়। তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করে। এবং নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার খবর রাখেন।

৩০. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ الزَّائِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ عَلٰى خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ الْكَبِيْرُ الْعَظِيْمُ ـ

৩০. এটাই উল্লিখিত দলিলসমূহ প্রমাণ যে, আল্লাহই হক সত্য ও চিরস্থায়ী এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সবই বাতিল মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী تَدْعُوْنَ সীগাহটি يَدْعُوْنَ ও পড়া যাবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সৃষ্টির উপর বিজয়ী হিসেবে সর্বোচ্চ মহান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ : এটা رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ-এর পূর্বের مَضْمُوْن-এর দিক থেকে رُجُوْع করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَا مُخَاطَبِيْنَ : এটা مُنَادٰى مُفْرَدْ হওয়ার কারণে কিয়াসের চাহিদা ছিল يَا مُخَاطَبُوْنَ হওয়া। কেননা مُنَادٰى مُفْرَدْ টা ضَمَّة-এর উপর مَبْنِىْ হয়ে থাকে। তবে হতে পারে نَكِرَة غَيْر مَقْصُوْدَة হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقْبِلُ عَلٰى طَاعَتِهِ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, وَجْه দ্বারা মুখমণ্ডল উদ্দেশ্য নয় বরং ذات উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مُوَحِّدٌ : مُحْسِنٌ-এর তাফসীর مُوَحِّدْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِحْسَانٌ দ্বারা اِحْسَان كَامِلْ উদ্দেশ্য নয়, যা اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ-এর মর্যাদায়। এখানে তো একত্ববাদের প্রবক্তা মুসলমান উদ্দেশ্য। যাতে করে সাধারণ মুসলমান ও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ : এই বাক্যটি উহ্য قَسَم-এর جَوَابٌ আর جَوَاب شَرْط কায়দা অনুযায়ী উহ্য রয়েছে। اَللّٰهُ শব্দটি যেহেতু উহ্য ফে'লের فَاعِلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো خَلَقَهُنَّ اللّٰهُ আর এই উহ্য হওয়ার قَرِيْنَة হলো خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ অথবা উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হলো اَلْخَالِقُ لَهُنَّ اللّٰهُ

قَوْلُهُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ : এই পূর্ণ বাক্যটি أَنَّ-এর إِسْم হয়েছে। আর أَقْلَامٌ হলো তার খবর

قَوْلُهُ وَالْبَحْرُ : এটা إِسْم أَنَّ-এর উপর عَطْف হয়েছে। এটা اَلْبَحْرُ নসবযুক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকার (র.) رَفْع-এর বিশ্লেষণ ছেড়ে দিয়েছেন। رفع হওয়ার ব্যাখ্যা এটা হতে পারে যে, اَلْبَحْرُ-এর আতফ أَنَّ এবং তার إِسْم ও خَبَرْ মিলে পঠিত বাক্যের উপর হয়েছে। এই জন্য যে, বাক্যটি উহ্য ফে'লের فَاعِلٌ হওয়ার কারণে رَفْع-এর مَحَلّ-এ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- لَوْ ثَبَتَ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ

অথবা اَلْبَحْرُ হলো মুবতাদা আর يَمُدُّهُ হলো তার খবর আর বাক্যটি হলো جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ

قَوْلُهُ مِدَادٌ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অর্থাৎ اَلْجَمِيعُ مِدَادٌ এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا نَفِدَتْ الخ : এটা لَوْ-এর জবাব। তবে لَوْ টা এখানে তার প্রসিদ্ধ অর্থ অর্থাৎ إِنْتِفَاء شَرْط-এর কারণে إِنْتِفَاء جَزَاء-এর জন্য হয়নি।

قَوْلُهُ بِكَتْبِهَا بِتِلْكَ الْأَقْدَامِ الخ : এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, বাক্যের মধ্যে حَذْف রয়েছে। আর كَلِمَاتُ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার كَلَامٌ نَفْسِيٌّ قَدِيْمٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ-এর مَدْلُوْلَاتٌ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ : এখানে ذٰلِكَ হলো মুবতাদা بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ হলো তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরুতে তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরপর লোকমান হাকীমের উপদেশের উল্লেখ রয়েছে, আর তাতেও সর্বপ্রথম তাওহীদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখন এ আয়াত থেকে পুনরায় মূল বক্তব্য তাওহীদে সম্পর্কেই আলোচনা শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম দানের উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে- أَلَمْ تَرَوْا .... অর্থাৎ হে মানবজাতি! তোমরা কি দেখনা যে যা কিছু আসমানে আছে, যথা চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র-পুঞ্জ সবই তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত করে রেখেছি। আর যা কিছু জমিনে আছে তাও তোমাদের কল্যাণার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে দান করেছেন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি। এমনিভাবে তোমাদের হেদায়েতের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন, ইসলামকে জীবন-বিধান রূপে তোমাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, তোমাদেরকে বিচার-বুদ্ধি দান করেছেন, এককথায় হে মানব জাতি! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জৈবিক, বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তার নিয়ামতসমূহের জন্যে শুকর গুজার হওয়া।

একখানি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে বনী আদম! তোমাদের এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে, অতএব তোমাদের নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই আখেরাতের জন্যে আমল কর। হে বনী আদম! আমি তোমার এমন কোনো অঙ্গ সৃষ্টি করিনি যার জন্যে আমি রিজিক সৃষ্টি করিনি। হে বনী আদম! যদি আমি তোমাকে মূক করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি বাকশক্তির জন্যে আক্ষেপ করতে, আর যদি আমি তোমাকে অন্ধ করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি চক্ষুষ্মান হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করতে, আর যদি আমি তোমাকে বধির করে সৃষ্টি করতাম, তবে তুমি শ্রবণ শক্তির জন্যে দুঃখ করতে। অতএব তুমি আমাদের নিয়ামতের কদর কর এবং আমার শুকরগুজার হও, অবাধ্য নাফরমান হয়োনা, নিমক হারামী করো না, অবশেষে তোমাদের সকলকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

-[আল আহাদীসুল কুদসিয়্যাহ, কৃত ইউনুস আস শেখ ইবরাহীম আস সামরাঈ, পৃ. ৮১]

মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলি অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরিতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত

মু'মিনগণের প্রশংসা স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলিও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তার অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তাওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে। سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অনুগত করে দেওয়ার অর্থ কোনো বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মার্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تَسْخِيْر অর্থ কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেওয়া হয়েছে তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে তা মানব সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত; কিন্তু প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টিবাদন প্রভৃতি, যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলির বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো। অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু মানব সেবায় নিয়োজিত অবশ্যি রেখেছেন। কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্ব করণই বটে।

قَوْلُهُ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً : اِسْبَاغ অর্থ পরিপূর্ণ করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামতকেই বুঝায় মানুষ যা পঞ্চন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অঙ্গ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোনো প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন সম্পদ, জীবন যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেওয়া, আল্লাহ-রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তাওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নিয়ামত সেগুলো যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যথা- ঈমান, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ এবং জ্ঞানবুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিত শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ : এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তার ক্ষমতার ব্যবহার এবং তার নিয়ামত [কৃপা ও দয়াসমূহ] যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত কোনো ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোনো কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তার ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবুও তার অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্র ও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمَاتُ اللّٰهِ -এর ভাবার্থ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলি। -[রূহ ও মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলার মহিমা, কৃপা ও করুণাবলিও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং এর অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তা সত্ত্বেও এগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াত যেখানে বলা হয়েছে- قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا অর্থাৎ আল্লাহ মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয় অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে بِمِثْلِهٖ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা, অনুরূপ চতুর্থটা মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে, সমুদ্র সাতটি কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাবদ্ধ শেষ অবশ্যই হবে কিন্তু كَلِمَاتُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাক্যাবলি অসীম ও অনন্ত, কোনো সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদি পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদি পাদ্রী হাজির হয়ে কুরআনের আয়াত وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, আপনি [নবীজী] বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বললেন, আমার উদ্দেশ্যে সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদি খ্রিস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বলল, আমাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা তাওরাত প্রদান করেছেন যা تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর [রহস্য] বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তাওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ اَلْاٰيَة -[ইবনে কাসীর]

٣١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ السُّفُنَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ يَا مُخَاطَبِيْنَ بِذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ عِبَرًا لِكُلِّ صَبَّارٍ عَنْ مَعَاصِى اللّٰهِ شَكُوْرٍ لِنِعَمِهٖ.

٣٢. وَاِذَا غَشِيَهُمْ اَىْ عَلَا الْكُفَّارَ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ كَالْجِبَالِ الَّتِىْ تُظِلُّ مَنْ تَحْتَهَا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج اَىِ الدُّعَاءَ بِاَنْ يُنْجِيَهُمْ اَىْ لَا يَدْعُوْنَ مَعَهٗ غَيْرَهٗ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ وَمِنْهُمْ بَاقٍ عَلٰى كُفْرِهٖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا وَمِنْهَا الْاِنْجَاءُ مِنَ الْمَوْجِ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ غَدَّارٍ كَفُوْرٍ لِنِعَمِ اللّٰهِ.

٣٣. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ يُغْنِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ فِيْهِ شَيْئًا وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ فِيْهِ شَيْئًا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا عَنِ الْاِسْلَامِ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ فِىْ حِلْمِهٖ وَاِمْهَالِهِ الْغَرُوْرُ الشَّيْطَانُ.

অনুবাদ :

৩১. তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে হে শ্রোতাগণ যাতে তিনি তা দ্বারা তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পাপ থেকে বিরত থাকার উপর সহনশীল, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩২. যখন তাদেরকে কাফেরদেরকে মেঘমালা সদৃশ এমন পাহারের ন্যায় যা তার নিচে ছায়া দান করে তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাটি মনে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে থাকে। যাতে তিনি তাদেরকে মুক্তি দেয় অর্থাৎ তখন তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে ডাকে না। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যম পথে অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের মধ্যপন্থি রাস্তায় চলে, আবার কেউ কেউ কুফরের উপর অবিচল থাকে কেবল মিথ্যাচারি, অকৃতজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলি যেমন তাদেরকে তরঙ্গ থেকে মুক্তি দেওয়া ইত্যাদি অস্বীকার করে।

৩৩. হে মানব জাতি! মক্কাবাসী তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না পিতাপুত্রের থেকে কোনো আজাব সরাতে পারবে না এবং পুত্র ও তার পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুনরুত্থান সত্য, অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ইসলাম থেকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

٣٤. إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج مَتٰى تَقُوْمُ وَيُنَزِّلُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ الْغَيْثَ ج بِوَقْتٍ يَعْلَمُهٗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ط اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى وَلَا يَعْلَمُ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ وَيَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط وَيَعْلَمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرٌ بِبَاطِنِهٖ كَظَاهِرِهٖ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسَةٌ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ ـ

৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছেই কিয়ামতের কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান আছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের সময় জানেন। يُنَزِّلُ -এর زاء তে তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়টা পড়া যাবে। এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। ছেলে না মেয়ে তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এই তিনটি কেউ জানেন না। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে ভালো না মন্দ এবং তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন এবং জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহই জানেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ের জাহির ও বাতিন সম্যক জ্ঞাত। ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسَةٌ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ الخ : উল্লিখিত উভয় বাক্য يَوْمًا -এর صِفَتٌ হয়েছে। আর عَائِدٌ উহ্য রয়েছে। যেমনটি ব্যাখ্যাকার فِيْهِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ وَلَا مَوْلُوْدٌ : এটা হলো প্রথম মুবতাদা আর هُوَ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর جَازٍ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। এরপর বাক্য হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রশ্ন. مَوْلُوْدٌ হলো نَكِرَةٌ এটা মুবতাদা হওয়া বৈধ হলো কিভাবে?

উত্তর. نَكِرَةٌ যখন تَحْتَ النَّفْيِ হয় তখন সেটা মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়ে যায়। আর এখানেও مَوْلُوْدٌ টা لَا -এর অধীনে হয়েছে। বিধায় مولود টা মুবতাদা হতে পেরেছে।

قَوْلُهٗ شَيْئًا : এটা تَنَازُعِ فِعْلَانِ -এর অন্তর্গত। شَيْئًا কে يَجْزِيْ এবং جَازٍ উভয় ফে'ল مَفْعُوْل বানাতে চায়। অতঃপর দ্বিতীয় ফে'ল তথা جَازٍ কে আমল করতে দেওয়া হয়েছে। এবং يَجْزِيْ -এর জন্য مَفْعُوْل উহ্য মেনে নিয়েছেন। যেমনটি শারেহ (র.) شَيْئًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ غُرُوْرٌ : এটা صِفَتٌ صِيْغَة অর্থ- প্রতারক, মিথ্যা আশাদানকারী শয়তান।

قَوْلُهٗ بِاللّٰهِ : بَاء টি سَبَبِيَّةٌ আর مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِسَبَبِ حِلْمِ اللّٰهِ যেমনটি শারেহ (র.) উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ : এই আয়াত হারেছ ইবনে ওমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ : এটা عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ -এর উপর عَطْف হয়েছে। যা اِنَّ -এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ بِوَقْتٍ : অর্থাৎ فِيْ وَقْتٍ

قَوْلُهُ وَاحِدًا : এটা لَا يَعْلَمُ -এর مَفْعُوْل مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর غَيْرُ اللّٰهِ হলো এর فَاعِلٌ

قَوْلُهُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا : এখানে مَا টি হলো اِسْتِفْهَامِيَةْ মুবতাদা। আর ذَا হলো اِسْم مَوْصُوْلَه আর تَكْسِبُ غَدًا হলো সেলাহ। এখন সেলাহ ও মওসূল মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা সম্পর্কে। সে মক্কা থেকে পলায়ন করে সমুদ্র পথে রওয়ানা হয়েছিল। তখন তাদের তরী ঝড়ের সম্মুখীন হয়। ইকরিমা অত্যন্ত বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ ফরিয়াদ করেছিল, হে আল্লাহ! যদি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, তাহলে আমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তার হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করবো। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম কবুল করেছিলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ২৬৩]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا الخ : উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার মূল বা অন্য কোনো গুণবাচক নামের স্থলে 'রব' [পালনকর্তা] বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে সেরূপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদের পালনকর্তা, সুতরাং তার সম্পর্কে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এ স্থলে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাদের মানমর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শত্রু বা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও উস্তাদের অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে যেন আল্লাহ তা'আলার মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তার অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

قَوْلُهُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا : অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কোনো পিতাও স্বীয় পুত্রের উপকার সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোনো পুত্রও স্বীয় পিতার কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারবে না। এখানে ঐ শ্রেণির পিতা-পুত্রকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মুমিন অপরজন কাফের। কেননা মুমিন পিতা স্বীয় কাফের পুত্রের শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোনো উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে মুমিন পুত্র কাফের পিতার কোনো কাজে আসবে না।

এরূপ নির্দিষ্ট করণের কারণ, কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতসমূহে এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পিতামাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবেন। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কুরআনে কারীমে রয়েছে- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে। আমি এ সন্তান সন্ততিদেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলি এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার স্তরে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে যদিও কাজকর্মে কোনো ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে– جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসেবে প্রতিপন্ন পিতামাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্তুতি অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণিভুক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোনো পিতা সন্তানের বা কোনো সন্তান পিতার কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না, তা শুধু সে ক্ষেত্রেই যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে। –[মাযহারী]

ফায়েদা : এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোনো উপকার সাধন রতে পারবে না এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. এখানে وَلَدٌ শব্দের পরিবর্তে مَوْلُوْدٌ শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনামূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চেয়ে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালোবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোনো উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর وَلَدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُوْدٌ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, مَوْلُوْدٌ বলতে শুধু সন্তানকেই বুঝানো হয় আর وَلَدٌ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং ঔরশজাত পুত্রও পিতার কোনো কাজে আসবে না। তাহলে পৌত্র ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোনো সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে [অর্থাৎ কোন বছর কোন তারিখে সংঘটিত হবে] এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন [অর্থাৎ কন্যা না পুত্র, কোন আকৃতি-প্রকৃতির] এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোনো ব্যক্তি জানে না [অর্থাৎ ভালো মন্দ কি লাভ করবে] অথবা কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই; কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বুঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আন'আমের আয়াতে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ, বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে– مَفَاتِحُ ও مَفَاتِيْحُ ـ مِفْتَاحٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَاٌ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ خَبَرٌ اَوَّلُ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَبَرٌ ثَانٍ .

٣. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ج مُحَمَّدٌ لَا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا مَّآ نَافِيَةٌ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ بِاِنْذَارِكَ .

٤. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ اَوَّلُهَا الْاَحَدُ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط وَهُوَ فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ مَا لَكُمْ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ مِنْ دُوْنِهٖ غَيْرِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ اِسْمُ مَا بِزِيَادَةِ مِنْ اَيْ نَاصِرٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يَدْفَعُ عَنْكُمْ عَذَابَهٗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ هٰذَا فَتُؤْمِنُوْنَ .

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত রয়েছেন।

২. এ কিতাবের কুরআন অবতরণ বিশ্ব পালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ মুবতাদা আর لَا رَيْبَ فِيْهِ প্রথম খবর ও مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ টি দ্বিতীয় খবর।

৩. বরং তারা বলে, এটা সে মুহাম্মদ ﷺ মিথ্যা রচনা করেছে। না বরং এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। এখানে مَا টি نَافِيَةٌ তথা নাবোধক সম্ভবতঃ এরা আপনার সতর্কতায় সুপথ প্রাপ্ত হবে।

৪. আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন এর প্রথম দিন শনি আর শেষ দিন শুক্রবার অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। আভিধানিক অর্থে আরশ বলা হয় বাদশাহর সিংহাসনকে। তিনি এতে তার শান মুতাবেক বিরাজমান ছিলেন। তিনি ব্যতীত হে মক্কার কাফেরগণ তোমাদের কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী, এখানে مِنْ وَّلِيٍّ টি مِنْ হরফে জারসহ مَا -এর ইসিম। ও সুপারিশকারী যিনি তোমাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করবেন নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? অর্থাৎ তোমরা ঈমান গ্রহণ কর।

৫. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مُدَّةَ الدُّنْيَا ثُمَّ يَعْرُجُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ وَالتَّدْبِيرُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فِي الدُّنْيَا وَفِي سُورَةِ سَأَلَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لِشِدَّةِ أَهْوَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكَافِرِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَكُونُ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلٰوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার সময় পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর তা সমস্ত বস্তু ও তদবীর তার কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। এবং সূরায়ে সাআলায় (سُوْرَةُ سَأَلَ) পঞ্চাশ বছরের উল্লেখ রয়েছে এবং কিয়ামতের দিবস, সেদিনটি কাফেরদের নিকট অত্যন্ত ভয়াবহের কারণে অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের নিকট সেদিনটি দুনিয়ার মধ্যে আদায়কৃত এক ওয়াক্তের নামাজের চেয়েও কম মনে হবে। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

٦. ذٰلِكَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَيْ مَا غَابَ عَنِ الْخَلْقِ وَمَا حَضَرَ الْعَزِيزُ الْمَنِيعُ فِي مُلْكِهِ الرَّحِيمُ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ.

৬. তিনিই সেই স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী দৃশ্য ও অদৃশ্যের অর্থাৎ যা সৃষ্টির মধ্যে অনুপস্থিত ও উপস্থিত জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, আপনার রাজত্বে পরম দয়ালু তার আনুগত্যকারীদের উপর।

٧. الَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ بِفَتْحِ اللَّامِ فِعْلًا مَاضِيًا صِفَةً وَبِسُكُوْنِهَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ اٰدَمَ مِنْ طِيْنٍ.

৭. যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন خَلَقَهُ -এর মধ্যে লামে যবর পড়লে তখন فِعْلِ مَاضِي হিসেবে বাক্য হয়ে كُلَّ شَيْءٍ -এর সিফত আর লামের মধ্যে সাকিন পড়লে তখন তা كُلَّ شَيْءٍ থেকে بَدَلِ اشْتِمَالٍ হবে। এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির হযরত আদম (আ.)-এর সূচনা করেছেন।

٨. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ عَلَقَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيْنٍ ضَعِيْفٍ هُوَ النُّطْفَةُ.

৮. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির বীর্য নির্যাস থেকে।

٩. ثُمَّ سَوّٰهُ أَيْ خَلْقَ اٰدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ أَيْ جَعَلَهُ حَيًّا حَسَّاسًا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ أَيِ الذُّرِّيَّةِ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط الْقُلُوْبَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ مَا زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلْقِلَّةِ.

৯. অতঃপর তিনি তাকে সুষম সৃষ্টি করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন অর্থাৎ তাকে জীবিত ও অনুভূতিশীল বানিয়েছেন তা জড় পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং তোমাদেরকে আদম সন্তানদেরকে দেন কর্ণ, এখানে سَمْعٌ টি أَسْمَاعٌ -এর অর্থে চক্ষু ও অন্তরসমূহ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত ও قَلِيْلًا -এর তাকীদের জন্য আনা হয়েছে।

١٠. وَقَالُوْٓا اَىْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ غِبْنَا فِيْهَا بِاَنْ صِرْنَا تُرَابًا مُخْتَلِطًا بِتُرَابِهَا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ تَعَالٰى بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ كٰفِرُوْنَ.

১০. তারা কিয়ামতের অস্বীকারকারীগণ বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও অর্থাৎ আমরা মাটি হয়ে মাটির সাথে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হবে কি? এখানে اِسْتِفْهَامُ টি অস্বীকারমূলক প্রশ্ন আর উভয় স্থানে ءَاِذَا -এর উভয় হামযাকে হামযার সাথে বা দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল করে বা উভয়ের মধ্যে আলিফ এনে উচ্চারণ করা যাবে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

١١. قُلْ لَهُمْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ اَىْ يَقْبِضُ اَرْوَاحَكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ اَحْيَاءً فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ.

১১. বলুন, তাদেরকে তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। জীবিত অবস্থায় অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

তাহকীক ও তারকীব

সূরা সাজদাহ মক্কী, এতে ত্রিশ আয়াত রয়েছে। তবে কারো কারো নিকট ২৯ আয়াত। তবে তিনটি আয়াত মদনী এটা কালবী এবং মুকাতিলের অভিমত। অন্যদের মতে পাঁচটি আয়াত মদনী। যার শুরু হলো– تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ হতে আর শেষ হলো اَلَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

اَلٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে বিভিন্ন ধরনের তারকীব হতে পারে। তবে উত্তম এবং সহজটি ব্যাখ্যাকার বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো– تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ হলো মুবতাদা আর لَا رَيْبَ فِيْهِ হলো প্রথম খবর। আর مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো দ্বিতীয় খবর। মুবতাদা আর উভয় খবরকে নিয়ে خَبَرٌ হলো الم মুবতাদার।

قَوْلُهٗ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ : এখানে اَمْ হলো مُنْقَطِعَة যা بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ অর্থে হয়েছে। এতে هَمْزَة হলো اِنْكَارِىْ মুফাসসির (র.) শুধু بَلْ লিখেছেন। সম্ভবত কাতেব থেকে هَمْزَة রয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, এতে মুশরিকদের সেই দাবির অস্বীকার রয়েছে যে, কুরআন শরীফ রাসূল ﷺ -এর স্বরচিত গ্রন্থ। এটা রহিত ও অস্বীকার করে বলেছেন যে, বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা এ ধরনের কালাম রচনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহিত্যিকগণ এর সমকক্ষ উপস্থাপনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আজও কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে, ছোট থেকে ছোট তিন আয়াত সম্বলিত কোনো সূরা রচনা করে উপস্থাপন করুক দেখি!

قَوْلُهٗ بَلْ هُوَ الْحَقُّ : اِفْتِرَاء -এর نَفْى করার পরে বাস্তবতা কে সুপ্রমাণিত করার জন্য এটা اِضْرَاب اِنْتِقَالِىْ হয়েছে। এটা اِضْرَاب اِبْطَالِىْ -ও হতে পারে। অর্থাৎ মুশরিকদের উক্তি اِفْتِرَاء.কে বাতিল করে বলা হয়েছে। এই সুরতে উহ্য ইবারত হবে– كُلُّ مَا فِى الْقُرْاٰنِ مِنَ الْاِضْرَابِ اِنْتِقَالِىْ لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالُوْا بَلْ هُوَ الْحَقُّ এখন এই مَقُوْلَه থাকল যে, তবে এটা ছাড়া অন্যের উপরও محمول হবে। [সাবী] আয়াতের অর্থ হবে যে, কুরআনে যা কিছু আছে তা সত্য। আর এই বাক্য সীমাবদ্ধ করণ (بَلْ هُوَ الْحَقُّ) مُسْتَفَادْ مَعْرِفَةُ الطَّرَفَيْنِ থেকে হবে।

قَوْلُهُ لِتُنْذِرَ قَوْمًا : تُنْذِرَ দুই মাফউলকে نَصْب দেয়। প্রথম মাফউল হলো قَوْمًا আর দ্বিতীয়টি উহ্য রয়েছে, যাকে মুফাসসির (র.) স্বীয় উক্তির দ্বারা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় মাফউল اَلْعِقَابَ কে উহ্য মেনেছেন। উহ্য ইবারত হবে لِتُنْذِرَ قَوْمًا الْعِقَابَ আর مَا أَتَاهُمْ الخ এটা قَوْمًا-এর সিফত হবে।

قَوْلُهُ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ : এই تَرَجِّيْ রাসূল ﷺ -এর হিসেবে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সম্প্রদায়ের হেদায়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে ভয় করতে থাকুন এবং নিরাশ হবেন না।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ الخ : বাক্যটি মুবতাদা এবং খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ : مِنْ دُوْنِهِ হলো مَا-এর اِسْم আর مِنْ হলো অতিরিক্ত। এই ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا হলো حِجَازِيَّة আর مِنْ وَلِيٍّ হলো اِسْم مُؤَخَّرْ আর مِنْ دُوْنِهِ হলো خَبَر مُقَدَّمْ তবে তাতে এই প্রশ্ন হবে যে, مَا টি عَامِلْ হওয়ার জন্য তার اِسْم ও خَبَرْ -এর মধ্যে তারতীব জরুরি। অথচ এখানে তারতীব ঠিক নেই?

এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, নাহুবিদদের দুর্বল মতানুযায়ী আমল করেছে। কেননা দুর্বল মতানুযায়ী مَا -এর আমল করার জন্য তারতীব শর্ত নয়। উত্তম হলো مَا-কে تَمِيْمِيَّة মানা। আর مِنْ دُوْنِهِ কে خَبَر مُقَدَّمْ এবং وَلِيّ কে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ মানা। কেননা কুরআনের ক্ষেত্রে قَوْل ضَعِيْف -এর উপর حَمْل করা অনুচিত।

قوله اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ : هَمْزَة উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে। আর فَاء হলো عَاطِفَة উহ্য ইবারত হলো اَغَفَلْتُمْ فَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ هٰذَا এখানে هٰذَا হলো تَتَذَكَّرُوْنَ -এর মাফউল।

قَوْلُهُ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যিনি সৃষ্টিকর্তা ও সকল কর্মবিধায়ক তিনি স্বীয় ইচ্ছা এবং عِلْم أَزَلِيْ অনুযায়ী মাখলুকের মধ্যে تَصَرُّفْ করেন অর্থাৎ প্রতিটি সময়েই তার একটি شَانٌ রয়েছে তথা كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَانٍ প্রত্যেক জিনিস তারই ফয়সালার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مُدَّةُ الدُّنْيَا : বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। আর রাসূল ﷺ -এর প্রেরণ হয়েছে ষষ্ঠ হাজারের শুরুতে। আবার কতিপয় اٰثَارْ এটার উপর বুঝাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ-এর উম্মতের বয়স হাজার বছর হতে বেশি হবে তবে এই বৃদ্ধি পাঁচশত বছরের বেশি হবে না।

قَوْلُهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ : এখানে يَوْم দ্বারা প্রসিদ্ধ يَوْم উদ্দেশ্য নয়। যা দুই রাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। বরং সুদীর্ঘ সময় ও যুগ উদ্দেশ্য। কেননা আরবগণ সুদীর্ঘ সময়কে يَوْم দ্বারা ব্যক্ত করতো। نُحَاسْ বলেছেন অভিধানে মুতলাক সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাজেই এখন দ্বন্দ্বের সেই প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল যা সূরায়ে سَأَلَ তে خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ এবং এখানে اَلْف سَنَة এসেছে, নিম্নোক্ত কবিতায় يَوْم টি মুতলাক সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَّاَنْدِيَةٍ * وَيَوْمُ سَيْرٍ اِلَى الْاَعْدَاءِ تَادِيْبُ (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা মুবতাদা। আর عَالِمُ হলো প্রথম খবর। আর اَلْعَزِيْزُ হলো দ্বিতীয় খবর। আর اَلرَّحِيْمُ তৃতীয় খবর এবং اَلَّذِيْ اَحْسَنَ হলো চতুর্থ খবর।

قَوْلُهُ خَلَقَهُ : ফে'লে মাযীর সুরতে জুমলা হয়ে شَيْءٍ-এর صِفَتْ হলে مَحَلًّا مَجْرُوْر صِفَتْ হবে। আর যদি كُلَّ-এর صِفَتْ হয় তবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। আর যদি خَلْقَهُ তথা لَامٌ টি سُكُوْن সহকারে হয় যেমনটি কোনো কোনো কেরাতে রয়েছে তবে كُلَّ হতে بَدَل اِشْتِمَالْ হবে।

قَوْلُهُ بَدَأَ : এর আতফ হয়েছে اَحْسَنَ -এর উপর। আর اَلْاِنْسَانُ হলো مَفْعُوْل بِهٖ এবং مِنْ طِيْنٍ টা خَلْقَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। اِنْسَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আদম (আ.) এবং ، যমীরের مَرْجِع হলেন হযরত আদম (আ.)। نَسْل ও মারজি হতে পারে অর্থাৎ نَسْل اٰدَمْ কে মায়ের গর্ভে ঠিক করেছেন।

قَوْلُهُ مِنْ رُوْحِهِ : এর মধ্যে ইযাফতটা تَشْرِيْف -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمْ : এতে غَائِبْ হতে خِطَابْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে। কেননা مُضْغَةْ -কে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর مُخَاطَبْ হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

قَوْلُهُ اِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ : এখানে وَتَرْكِهَا শব্দটি ছুটে গেছে। এভাবে মোট চারটি কেরাত হবে।

قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ : اَلْمَوْضِعَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَضَلَلْنَا اَاِذَا এবং اَاِنَّا

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُوْنَ : এটা اِنْكَار بَعْث থেকে اِنْكَار لِقَاء -এর দিকে اِضْرَابْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা সাজদা প্রসঙ্গে : ইমাম বুখারী (র.) 'কিতাবুল জুমা'য় হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজে এ সূরা এবং সূরা দাহর পাঠ করতেন।

অন্য একখানা হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে সূরা সাজদা এবং সূরা মূলক পাঠ করতেন। –[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী]

এ সূরার ফজিলত : তাবারানী এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের পর চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করে এবং তার প্রথম দু রাকাতে সূরা কাফেরুন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে আর শেষ দু'রাকাতে সূরা মূলক এবং সূরা সাজদা পাঠ করে, এতে এমন ছওয়াব হয় যেন সে লাইলাতুল কদরে চার রাকাত নামাজ আদায় করলো।

ইবনে মারদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরায়ে মূলক এবং সূরা সাজদা মাগরিব এবং ইশার মধ্যে পাঠ করে, সে যেন লাইলাতুল কদরে নামাজ আদায় করল।

ইবনে মারদবিয়া হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা সাজদা, সূরা ইয়াসিন এবং সূরা কমর পাঠ করে, তার জন্যে তা নূর হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তার মরতবা বুলন্দ হবে।

হযরত ইবনে রাফে (রা.) বর্ণিত অন্য একখানা হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সূরায়ে সাজদা এভাবে আসবে যে, তার দুটি ডানা থাকবে এবং এ সূরা ঐ ডানা দ্বারা তার পাঠকদেরকে ছায়া দেবে।

–[তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ১৮৫, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২১, পৃ. ১১৬]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। এরপর তাওহীদের দলিল প্রমাণ ও হাশর নাশরের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর তাওহীদ এবং হাশর নাশরের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর নেককার ও বদকারদের জীবন-ধারা ও তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়, সূরা লোকমানে আসমান জমিন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সূরায় বিশ্বসৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا اَتٰهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ : এখানে نَذِيْر ভয়প্রদর্শক বলে রাসূল ﷺ কে বুঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বে মক্কার কুরাইশগণের নিকট কোনো নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এর দ্বারা একথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি। কেননা কুরআন কারীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে- وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার মাঝে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোনো ভয়প্রদর্শক এবং তার পক্ষ থেকে কোনো দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِيْرٌ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বানকারী চাই তিনি রাসূল ও পয়গাম্বর হোন বা তাদের কোনো প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে

তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবূ হাইয়্যান (র.) বলেন যে, তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোনো কালে, কোনো স্থানে এবং কোনো সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রাসূল প্রেরিত হতেন। এ দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবত তাওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই অবশ্য পৌঁছেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোনো নবী বা রাসূল বহন করে এনেছিলেন, হতে তাদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে পৌঁছেছিল। সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসীন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরাইশ গোত্রে তার পূর্বে কোনো نَذِيْر [ভয়প্রদর্শক] আগমন করেননি, তখন نَذِيْر বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রাসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্প্রদায়ে আপনার পূর্বে কোনো রাসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌঁছেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর দীনের [জীবন বিধান] উপর অবস্থিত ছিলেন। তাওহীদের [একত্ববাদ] প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কুরবানি করতে তারা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মূসা বিন ওকবা হতে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর বিন নফায়েল যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কুরাইশগণ বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করেন এবং এটা তার নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। মূসা বিন ওকবাহ তার সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কুরবানি করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতেন না।

আবূ দাউদ তায়ালীসী ওমর বিন নুফায়েল তনয় হযরত সাঈদ ইবনে ওমর (রা.) হতে [যিনি আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবী ছিলেন] এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজির খেদমতে আরজ করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে তিনি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান যে হ্যাঁ, তার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েজ। তিনি কিয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। –[রূহুল মা'আনী]

অনুরূপভাবে ওরাকা বিন নাওফল যিনি হুজুর ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন, তিনি তাওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তা বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ তিন আয়াত কুরআন যে সত্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য : فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং সূরায়ে মা'আরিজের আয়াতে রয়েছে– فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

এর এক সহজ উত্তর তো এই– যা 'বয়ানুল কুরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমল অনুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে। আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনোটাই কুরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ– তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাদের জানা নেই, একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْلَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ অর্থাৎ এ দুদিন এমন যা আল্লাহ তা'আলা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি [এটা আব্দুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।]

দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণে : اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব জগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ প্রতিটি বস্তুই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যত যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, ভাগ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণত দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলো কোনোটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। জনৈক কবি বলেন– نہی ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں * کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

অর্থাৎ বিশ্বমাজারে পাবে না কিছু অকেজো অসার, অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেত্রে আল্লাহর।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষাঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَىْءٍ -এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা– প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষাঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা– স্বভাব-চরিত্র ও আমরসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুণ এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়। যথাস্থানে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনোটই খরাপ ও অমঙ্গলজনক নয়। কিন্তু এ দ্বারা এসব বস্তুর সৃষ্টিগত দিকই উদ্দেশ্য যা নিঃসন্দেহে শুভ ও সুন্দর কিন্তু আমলের অপর দিক মানব কর্তৃক তা সাধন ও অর্জন অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পর্কে নিজের ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়। আল্লাহ তা'আলা যেগুলো করতে অনুমতি দেননি সেগুলো সুন্দর ও কল্যাণকর নয়। অশ্লীল ও অপকৃষ্ট।

قَوْلُهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ : ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম সেরা সৃষ্টি করে তৈরি করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়; বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু– বীর্য। অতঃপর তার অন্য ক্ষমতাও অসাধারণ সৃষ্টি কৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

قَوْلُهٗ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুঅন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময় তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে কামেলা ও অন্যান্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে। এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে হযরত আজরাঈল (আ.)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণীজগতের মৃত্যু তার উপর ন্যস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে। এখানে مَلَكُ الْمَوْتِ একবচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায় এখানে مَلٰٓئِكَةٌ বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আজরাঈল (আ.) একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না বহু ফেরেশতা তার অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মাউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ : প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ (র.) বলেন, মালাকুল মাউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোনো ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায় তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক 'মারফূ' হাদীসেও আছে [ইমাম কুরতুবী 'তাযকিরা'তে এটা বর্ণনা করেছেন]। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী ﷺ একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মাউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল মাউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন– আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে– আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি এজন্য এদের ছোট বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ তা'আলার হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত আমি কোনো মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল মাউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণবিয়োগ ঘটান? : উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল-মাউতই ঘটায়। ইমাম মালেক (র.)ও এক প্রশ্নের উত্তরে এরকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট, কেবল তা মান-মর্যাদা রক্ষার্থে অন্যান্য জীবন-জন্তু আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করবে। –[কুরতুবীর বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন]

এ বিষয়ই আবুশশায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা স্তুতিতে মগ্ন [এ-ই এগুলোর জীবন]। যখন এদের গুণ কীর্তন বন্ধ হয়ে যায় তখনই আল্লাহ তা'আলা এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মাউতের উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আজরাঈল (আ.)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি [হযরত আজরাঈল (আ.)] আরজ করেন, হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্বজগত ও গোটা মানবজাতি আমাকে তর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসঙ্গ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে হক তা'আলা বললেন, আমি এর সুরাহা এরূপভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। –[কুরতুবী]

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে এসবই মৃত্যুর দূত মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল মউত মৃত্যুপথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহর বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোনো সংবাদ প্রদানকারী বা কোনো দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক। –[মাযহারী]

মাসআলা : কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল মাউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। –[আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত। মাযহারী]

١٢. وَلَوْ تَرٰى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط مُطَاطِئُوْهَا حَيَاءً يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا مَا أَنْكَرْنَا مِنَ الْبَعْثِ وَسَمِعْنَا مِنْكَ تَصْدِيْقَ الرُّسُلِ فِيْمَا كَذَّبْنَاهُمْ فِيْهِ فَارْجِعْنَا إِلَى الدُّنْيَا نَعْمَلْ صَالِحًا فِيْهَا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ الْآنَ فَمَا يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ وَلَا يُرْجَعُوْنَ وَجَوَابُ لَوْ لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيْعًا.

١٣. قَالَ تَعَالٰى وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا فَتَهْتَدِيْ بِالْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ ط وَهُوَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

١٤. وَتَقُوْلُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ إِذَا دَخَلُوْهَا فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا أَيْ بِتَرْكِكُمُ الْإِيْمَانَ بِهِ إِنَّا نَسِيْنٰكُمْ تَرَكْنَاكُمْ فِي الْعَذَابِ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ الدَّائِمِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ.

١٥. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيٰتِنَا الْقُرْآنِ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا مُتَلَبِّسِيْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَيْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنِ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

অনুবাদ :

১২. যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা কাফেররা তাদের পালনকর্তার সামনে লজ্জায় নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম পুনরুত্থানকে যা আমরা অস্বীকার করেছি ও শ্রবণ করলাম আপনার পক্ষ থেকে রাসূলদের ঐ সমস্ত কথার সত্যতা যা আমরা অস্বীকার করেছি। এখন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সেখানে সৎকর্ম করব। এখন আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি। কিন্তু তাদের এই স্বীকারোক্তি কোনোই উপকারে আসবে না; বরং তাদেরকে দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হবে না। এবং لَوْ -এর জবাব لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيْعًا উহ্য রয়েছে।

১৩. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে তাদের সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম অতএব তারা ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণ করে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।

১৪. যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে জাহান্নামের প্রহরী তাদেরকে বলবে অতএব এই দিবসকে ভুলে যাওয়ার এর প্রতি ঈমান না আনার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম অর্থাৎ তোমাদেরকে আজাবে ছেড়ে দিলাম তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম কুফর ও মিথ্যাবাদীতা এর কারণে স্থায়ী আজাবে ভোগ কর।

১৫. কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের কুরআনের প্রতি ঈমান আনে যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকার মুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে। অর্থাৎ তারা বলে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ এবং তারা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অহংকার করে না।

١٦. تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ تَرْتَفِعُ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَوَاضِعِ الْاِضْطِجَاعِ بِفُرُشِهَا لِصَلَاتِهِمْ بِاللَّيْلِ تَهَجُّدًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ وَطَمَعًا فِىْ رَحْمَتِهِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ يَتَصَدَّقُونَ ـ

১৬. তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। অর্থাৎ তারা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য শয়নকক্ষে বিছানা শয্যা রাতের বেলায় ত্যাগ করে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে আজাবের ভয়ে ও রহমতের আশায় এবং তারা ব্যয় করে সদকা করে আমি তাদরেকে যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে।

١٧. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ خُبِئَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج مَا تَقَرُّبِهِ اَعْيُنُهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْيَاءِ مُضَارِعٌ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১৭. কেউ জানেনা তার জন্যে তার কৃতকর্মের প্রতিদানে কি কি নয় প্রীতিকর যা তার চক্ষুকে শীতল ও শান্ত করে প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। ভিন্ন কেরাতে اُخْفِىَ -এর يْ -এর মধ্যে সাকিনের সাথে مُضَارِعٌ -এর সীগাহ পড়বে।

١٨. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَا يَسْتَوٗنَ اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْفَاسِقُوْنَ ـ

১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা অর্থাৎ মুমিন ও কাফের সমান নয়।

١٩. اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًا وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلضَّيْفِ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। نزلا অর্থাৎ যা মেহমানের জন্য তৈরি করা হয়।

٢٠. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا بِالْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ـ

২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয় কুফরি ও মিথ্যার মাধ্যমে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আজাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

٢١. وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى عَذَابِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَالْجَدْبِ سِنِيْنَ وَالْاَمْرَاضِ دُوْنَ قَبْلَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ لَعَلَّهُمْ اَىْ مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ ـ

২১. বড় শাস্তির পরকালের আজাবের পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি হত্যা, বন্দি, দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধির দ্বারা আস্বাদন করাব, যাতে তারা তাদের মধ্যে যারা বাকি রয়েছে প্রত্যাবর্তন করে। ঈমানের দিকে।

٢٢. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اَىْ لَا اَحَدُ اَظْلَمَ مِنْهُ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ اَىِ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ـ

২২. যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালেম আর কে? অর্থাৎ কেউ তার চেয়ে বড় জালেম নেই। আমি অপরাধীদেরকে মুশরিকদেরকে শাস্তি দেব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ : কিয়ামতের দিন অপরাধীদেরকে সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করার জন্য এই বাক্যটি مُسْتَأْنِفَة রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অথবা প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয়েছে যার সম্বোধিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। এই আয়াতে অপরাধীদেরকে এ কিয়ামতের দিনের অব্যক্ত অবস্থার চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। এবং তাদের مَعْنَوِىْ অবস্থাকে مَحْسُوْس এবং مُجَسَّمْ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। لَوْ এবং اِذْ যদিও مَاضِىْ -এর জন্য হয়ে থাকে কিন্তু এখানে مُضَارِعْ -এর উপর এসেছে। কেননা অপরাধীদের উল্লিখিত অবস্থাতে নিপতিত হওয়া সুনিশ্চিত এ কারণে এটার مُضَارِعْ -এর উপর আসা বৈধ হয়েছে। আর আবুল বাকা বলেছেন যে, اِذْ টা اِذَا -এর স্থানে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمُجْرِمُوْنَ : এটা মুবতাদা আর نَاكِسُوْا رُؤُوْسِهِمْ তার খবর। جُمْلَة فِعْلِيَّة -এর স্থানে جُمْلَة اِسْمِيَّة নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদের অবনত মস্তক ও লজ্জিত অবস্থার دوام -এর উপর দালালত করা।

قَوْلُهُ تَرَى : تَرَى -এর মাফউল উহ্য রয়েছে। কেননা رُؤْيَتْ দ্বারা رُؤْيَت بَصَرْ উদ্দেশ্য। উহ্য ইবারত হলো– لَوْ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ - لَوْ -এর জবাব উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَرَأَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا لَايُمْكِنُ وَصْفُهٗ আর আল্লামা যমখশরী (র.) -কে لَوْ - تَمَنِّىْ -এর জন্য বলেছেন। এই সুরতে جَوَابٌ -এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : মুফাসসির (র.) يَقُوْلُوْنَ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَبَّنَا টা قَوْلٌ উহ্য থাকার সাথে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ قَائِلِيْنَ يَا رَبَّنَا

قَوْلُهُ اَبْصَرْنَا : এটা فِعْلٌ এবং فَاعِلٌ আর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَبْصَرْنَا صِدْقَ وَعْدِكَ وَوَعِيْدِكَ

قَوْلُهُ سَمِعْنَا : এর আতফ اَبْصَرْنَا -এর উপর হয়েছে। سَمِعْنَا -এর مَفْعُوْل ও উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ سَمِعْنَا مِنْكَ تَصْدِيْقَ رَسُوْلِكَ মাফউল উহ্য না মানাও যেতে পারে। অর্থাৎ صِرْنَا مِمَّنْ يُبْصِرُ وَيَسْمَعُ وَكُنَّا مِنْ قَبْلُ صُمًّا وَعُمْيَانًا

قَوْلُهُ نَعْمَلْ : এটা جَوَابِ اَمْرٍ হওয়ার কারণে جَزْم যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَهْتَدِىْ : এটা لَوْ -এর জবাব যাকে ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِتَرْكِكُمْ : মুফাসসির (র.) نِسْيَانٌ -এর তাফসীর تَرْك দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয় স্থানেই نِسْيَانٌ দ্বারা لَازِمْ অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা نِسْيَانٌ -এর জন্য تَرْك আবশ্যক। অন্যথায় نِسْيَانٌ -এর উপর ধরপাকর নেই। আর আল্লাহ তা'আলার দিকে نِسْيَانٌ -এর নিসবত করা অসম্ভব। اِسْتِعَارَه বা مَجَاز مُرْسَلْ -এর ভিত্তিতেই হতে পারে।

قَوْلُهُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ : এর তাকরার প্রথম ذُوْقُوْا -এর মাফউল উহ্য হওয়া বুঝানোর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا كُنْتُمْ : এর মধ্যে بَاء হলো سَبَبِيَّه আর مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ হলো مَا -এর بَيَانْ

قَوْلُهُ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ : تَجَافٰى হতে مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থ– দূরে থাকে, পৃথক থাকে। এটা جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة ও হতে পারে। আর يَسْتَكْبِرُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ ও হতে পারে। এমনিভাবে يَدْعُوْنَ -এর মধ্যেও এই দুই সম্ভাবনা রয়েছে। يَدْعُوْنَ -কে حَالٌ বলার সুরতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, حَال ثَانِيَة হবে। এবং এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, جُنُوْبُهُمْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হবে।

قَوْلُهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا : এই উভয়টিই مَفْعُوْل لَهٗ এবং حَالٌও হতে পারে এবং উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْও হতে পারে অর্থাৎ جُوْزُوْا جَزَاءً এবং اُخْفِىَ -এর مَفْعُوْل لَهٗও হতে পারে। অর্থাৎ اُخْفِىَ لِاَجْلِ جَزَائِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا : মুমিনদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মুমিনদের অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে।

১. মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার কথাকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

২. যখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা দরবারে ইলাহীতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

অর্থাৎ মুমিনের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

৩. আর সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার হামদ, তাসবীহ তাহলীলে মুমিনের রসনা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এভাবে শিরক থেকে পবিত্রতা অর্জন করা হয়।

৪. আর তারা অহংকার করে না; বরং বিনয়ী হয়।

৫. মুমিনদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই- تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ তাদের পাঁজর বিছানা থেকে পৃথক থাকে।' অর্থাৎ তারা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে রাত অতিবাহিত করে না; বরং রাত্রিকালে তারা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে।

قَوْلُهُ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুমিনগণের বিশেষ গুণাবলি ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তার করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে জিকির ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজ্জুদের নামাজ : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। [এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, মালেক ও আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্যও ঠিক একই রূপ] এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তাঁর [নবীজীর] সন্নিকটে গেলাম এবং আরজ করলাম' ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোজখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যার তরে তা সহজ লভ্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে, রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, [তা এই যে,] রোজা ঢাল স্বরূপ। [যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়] এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামাজ। এই বলে কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কাতাদাহ (র.) ও যাহহাক (রা.) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ الخ যারা ইশার নামাজের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে ইশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাজ আদায় করে করে কাটান [মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।] এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে, বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উম্মিলনের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার জিকিরে লিপ্ত হন, তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে কাছীর ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাজই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 'বয়ানুল কুরআনও' এটাই গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন, হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ [যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে] এরূপ গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহ্বান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন, যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। -[ইবনে কাসীর]

এই রেওয়াতেরই কোনো কোনো শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ : أَدْنَى অর্থ নিকটতম عَذَابُ الْأَدْنَى [নিকটতম শাস্তি] বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (عَذَابُ الْأَكْبَرُ) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমত স্বরূপ : এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ- যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসবাধনতা থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত না হয়- তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, একটা দুনিয়াতেই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ- যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায় : إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণির অপরাধকারী مُجْرِمِينَ শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালের- উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। ১. ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, ২. পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, ৩. অত্যাচারীর সহযোগিতা করা [হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে হযরত ইবনে জারীর (রা.) বর্ণনা করেছেন]।

২৩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ التَّوْرٰةَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْ لِقَائِهٖ وَقَدِ الْتَقَيَا لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ وَجَعَلْنٰهُ اَىْ مُوْسٰى اَوِ الْكِتَابَ هُدًى هَادِيًا لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ج

২৪. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً قَادَةً يَّهْدُوْنَ النَّاسَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا عَلٰى دِيْنِهِمْ وَعَلَى الْبَلَاءِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَّتِنَا يُوْقِنُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ ـ

২৫. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ ـ

২৬. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ اَىْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اِهْلَاكُنَا كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ بِكُفْرِهِمْ يَمْشُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ لَهُمْ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط فِىْ اَسْفَارِهِمْ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ط دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِنَا اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَاتِّعَاظٍ ـ

অনুবাদ :

২৩. আমি মূসাকে কিতাব তাওরাত দিয়েছি, অতএব আপনি তার সাথে সাক্ষাতের কোনো সন্দেহ করবেন না। এবং তারা উভয়ের মাঝে [হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হযরত মূসা (আ.)-এর মাঝে] মেরাজের রাত্রে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং আমি একে হযরত মূসা (আ.) বা তাওরাত বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম।

২৪. তারা তাদের ধর্মের আনুগত্যে ও তাদের শত্রুদের অত্যাচারে সবর করতো বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। أَئِمَّةً শব্দটি শুরুতে দুই হামযা বা দ্বিতীয় হামযাকে يَ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া যাবে অর্থ– নেতা এবং তারা আমার আয়াতসমূহে যা আমার কুদরত ও একত্ববাদের উপর প্রমাণস্বরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। لَمَّا ভিন্ন কেরাতে لِمَا অর্থাৎ লামের মধ্যে যের ও মীমের মধ্যে তাশদীদবিহীন।

২৫. তারা যে বিষয়ে ধর্মের ব্যাপারে মতবিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তা সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দিবেন।

২৬. এতেও কি তাদের হেদায়েত হয়নি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকটে কি প্রকাশ হয়নি যে, পূর্বেকার অনেক সম্প্রদায়কে তাদের কুফরির কারণে আমি ধ্বংস করেছি যাদের বাড়ি ঘরে এরা বিচরণ করে যেমন, তারা সিরিয়া ও অন্যান্য এলাকায় ভ্রমণ করে, অতএব তোমরা তা থেকে শিক্ষা নাও অবশ্যই এতে আমার কুদরতের নির্দেশনাবলি রয়েছে। তারা কি শোনে না। উপদেশ গ্রহণ ও চিন্তার জন্য শোনা।

২৭. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ الْيَابِسَةِ الَّتِي لَا نَبَاتَ فِيهَا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ط أَفَلَا يُبْصِرُونَ . هٰذَا فَيَعْلَمُونَ أَنَّا نَقْدِرُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ .

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে শুষ্ক ভূমি যেখানে কোনো শষ্য নেই পানি প্রবাহিত করে শষ্য উদগত করি। যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা ও এবং তারা। তারা কি এটা দেখে না অতএব তারা তাদের পুনরুত্থানের ব্যাপারে জানে।

২৮. وَيَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَتَى هٰذَا الْفَتْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ .

২৮. তারা বলে মুমিনদেরকে কবে হবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই ফয়সালা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৯. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ بِهِمْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ يُمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ .

২৯. আপনি বলুন! ফয়সালার দিনে তাদের নিকট আজাব অবতরণের মাধ্যমে কাফেরদের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে তওবা ও আপত্তি পেশ করার জন্য কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না।

৩০. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنْزَالَ الْعَذَابِ بِهِمْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بِكَ حَادِثَ مَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ فَيَسْتَرِيحُونَ مِنْكَ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ .

৩০. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের উপর আজাব অবতরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারাও তাদের মৃত্যু ও হত্যার অপেক্ষা করছে। যাতে তারা আপনার থেকে শান্তিতে মুক্তি পায়। এই নির্দেশটি জিহাদের নির্দেশের পূর্বের হুকুম।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ مِرْيَةٍ : এটা إِسْم مَصْدَرٌ অর্থ- সন্দেহ, সংশয়।

قَوْلُهُ لِقَائِهِ : এর যমীরের مَرْجِعٌ -এর ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে-

১. হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ফিরেছে এবং لِقَاء মাসদার স্বীয় مَفْعُوْل -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- مِنْ لِقَائِكَ مُوْسٰى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

২. কিতাবের দিকে ফিরেছে। এ সময় মাসদারের ইযাফত فَاعِلٌ এবং مَفْعُوْلٌ উভয়ের দিকেই বৈধ হবে। فَاعِلٌ -এর দিকে ইযাফতের সুরতে উহ্য ইবারত হবে- مِنْ لِقَاءِ الْكِتَابِ لِمُوْسٰى এবং مَفْعُوْل -এর দিকেও বৈধ। উহ্য ইবারত হবে مِنْ لِقَاءِ مُوْسٰى الْكِتَابَ এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, لِقَائِهِ-এর যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরবে অর্থাৎ مِنْ لِقَاءِ مُوْسٰى لِقَاء اللّٰهِ এই সুরতে মাসদারের ইযাফত মাফঊলের দিকে হবে এবং এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, لِقَائِهِ -এর যমীর হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ফিরবে। এই সুরতে ইযাফত فَاعِلٌ -এর দিকে হবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। অথবা আল্লাহ তা'আলার হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। (إِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِأَبِي الْبَقَاءِ) এসকল উক্তি ছাড়াও আরো কিছু উক্তি রয়েছে কিন্তু সেগুলো দুর্বলতামুক্ত নয়।

قَوْلُهُ اَئِمَّةً : এতে একটি কেরাত রয়েছে يَاء -কে هَمْزَة দ্বারা পরিবর্তন করে অর্থাৎ اَيِمَّة আর এই কেরাত عَرَبِيَّتْ হিসেবে قِرَاءَت سَبْعَة -এর হিসেবে নয়। শরহে আকায়েদে রয়েছে اَيِمَّةٌ মূলে اَئْمِمَةٌ ছিল। কেননা এটা اِمَامٌ -এর বহুবচন দুই مِيْم একত্রিত হওয়ার কারণে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে। এবং হরকতকে পরিবর্তন করে হামযাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং দুই হামযা একত্রিত হওয়ায় যের যুক্ত হামযাকে يَا দ্বারা পরিবর্তন করায় اَيِمَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ قَادَةً : এটা قَائِدٌ -এর বহুবচন যেমন سَادَةٌ টা سَيِّدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পথ প্রদর্শক, রাহবর।

قَوْلُهُ وَلَمَّا صَبَرُوْا : জমহুরে কেরাত হলো لَامْ যবরের সাথে এবং مِيْم টি তাশদীদযুক্ত। حِيْنَ অর্থে হয়েছে। এবং لَمَّا জুমলায়ে শর্তিয়া হয়েছে অর্থাৎ جَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً حِيْنَ صَبَرُوْا এখানে صَبَرُوْا -এর যমীর اَئِمَّة -এর দিকে ফিরেছে। আর جملة جزائية -এর জবাব উহ্য রয়েছে। যার উপর جَعَلْنَا مِنْهُمْ বুঝাচ্ছে। উহ্য ইবারত হলো– لَمَّا صَبَرُوْا جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً হামযা এবং কিসায়ীর কেরাতে لَامْ টি যের যুক্ত ও مِيْم টি তাশদীদ বিহীন। এই সুরতে لَامْ টি تَعْلِيْلِيَّة হবে। আর مَا হলো মাসদারিয়া অর্থাৎ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ عَلٰى دِيْنِهِمْ وَعَلَى الْبَلَاءِ مِنْ عَدُوِّهِمْ

قَوْلُهُ بَيْنَهُمْ : হয়তো এর দ্বারা নবীগণ এবং তাদের উম্মত উদ্দেশ্য অথবা মুমিনগণ ও মুশিরকরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : এর আতফ হয়েছে উহ্যের উপর অর্থাৎ اَغَفَلُوْا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ অথবা اَلَمْ يَتَّعِظُوْا

قَوْلُهُ يَهْدِ لَهُمْ : এর ফায়েল হলো مَضْمُوْن جُمْلَة যেমনটি মুফাসসির (র.) هَلَاكُنَا বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। যদি فَاعِلٌ উহ্য থাকার উপর قَرِيْنَة বিদ্যমান থাকে তবে فَاعِلٌ কে উহ্য করা জায়েজ।

قَوْلُهُ فِيْ ذٰلِكَ : অর্থাৎ فِيْ كَثْرَةِ اِهْلَاكِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ

قوله الجرز : الجرز এমন ভূমিকে বলে যার ঘাস ইত্যাদি কেটে মসৃণ করে ফেলা হয়েছে। يَابِسَة হলো এর لَازِمِيْ অর্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا تَكُنْ مِنْ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ : لِقَاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ। এ আয়াতে কার সাথে কার সাক্ষাৎ বুঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لِقَائِهِ -এর 'যমীর' [সর্বনাম] কিতাব অর্থাৎ কুরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاِنَّكَ لَتُلَقّٰى যে, لِقَائِهِ -এর যমীর [সর্বনাম] হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ধাবিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মিরাজের রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। অতঃপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরূপভাবে মানুষ তাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিন্ত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দুটি শর্ত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম। যারা তাদের পয়গাম্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– ১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবি ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালনে অটুট ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরিয়তের যাবতীয় নির্দেশই এর অন্তর্গত– যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন– আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করা এবং অনুধাবনান্তে তা উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন– করা উভয়েই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ স্থলে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবত কর্মের পূর্বে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই।

ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তা এই– بِالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا : অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দারা নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। جُرُزٌ শুষ্ক ভূমিকে বলা হয়, যেখানে কোনো বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা : শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহের অনন্তর সেখানে নানাবিদ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এরূপভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোনো ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান কোঠা বিধ্বস্ত হবে, গাছপালা মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। যেমন মিসরের ভূমি। কিছু সংখ্যক তাফসীরকার ইয়েমেনের ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হতে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে, সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীগণ সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানিও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ : অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? আমরা তো এর কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ফরমান– قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুত্তরে একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো, সেদিন তোমাদের জন্য তা সমূহ বিপদ বহন করে আনবে। কেননা যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না। ইবনে কাছীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বিজ্ঞজন مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ -এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

১. يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ دُمْ عَلٰى تَقْوَاهُ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط فِيْمَا يُخَالِفُ شَرِيْعَتَكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِمَا يَكُوْنُ قَبْلَ كَوْنِهِ حَكِيْمًا فِيْمَا يَخْلُقُهُ.

২. وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط اَيِ الْقُرْاٰنُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ.

৩. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط فِيْ اَمْرِكَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا حَافِظًا لَكَ وَاُمَّتُهُ تَبَعٌ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ.

৪. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ج رَدًّا عَلٰى مَنْ قَالَ مِنَ الْكُفَّارِ اَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ يَعْقِلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اَفْضَلُ مِنْ عَقْلِ مُحَمَّدٍ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِيْ بِهَمْزَةٍ يَاءٍ وَبِلَا يَاءٍ تُظٰهِرُوْنَ بِلَا اَلِفٍ قَبْلَ الْهَاءِ وَبِهَا وَالتَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ مُدْغَمَةٌ فِي الظَّاءِ مِنْهُنَّ.

অনুবাদ :

১. হে নবী আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভীতির উপর অটল থাকুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না যা আপনার শরিয়তের পরিপন্থি নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বে থেকে সৃষ্টের উপর সর্বজ্ঞ, তার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রজ্ঞাময়।

২. আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ কুরআন আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে খবর রাখেন। অন্য কেরাতে يَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যে ت -এর সাথে অর্থাৎ تَعْلَمُوْنَ

৩. আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন তোমার কাজের মধ্যে কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট তিনি তোমার রক্ষক এবং আপনার উপম্মতগণ এতে আপনার অনুগত।

৪. আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। এটা অনেক কাফেরদের জবাবে বলা হয়েছে। যারা বলে, নিশ্চয়ই তার বক্ষে দুটি অন্তর রয়েছে যার সাহায্যে তিনি মুহাম্মদের জ্ঞানের চেয়ে বেশি বুঝে। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার কর' تُظٰهِرُوْنَ -এর মধ্যে ه -এর পূর্বে আলিফ ব্যতীত অথবা আলিফ সহ এবং এটা تَتَظٰهِرُوْنَ ছিল দ্বিতীয় 'তা' কে ظ -এর সাথে পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে। এবং اَلّٰئِيْ -এর মধ্যে দুই কেরাত হামযা ও ইয়া অথবা শুধুমাত্র হামযার সাথে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি।

بِقَوْلِ الْوَاحِدِ مَثَلًا لِزَوْجَتِهِ اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ اُمَّهٰتِكُمْ ج اَىْ كَالْاُمَّهَاتِ فِىْ تَحْرِيْمِهَا بِذٰلِكَ الْمُعَدِّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ طَلَاقًا وَاِنَّمَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ بِشَرْطِهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ الْمُجَادَلَةِ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ جَمْعُ دَعِيٍّ وَهُوَ مَنْ يُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ اِبْنًا لَهُ اَبْنَاۤءَكُمْ ط حَقِيْقَةً ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط اَىِ الْيَهُوْدِ وَالْمُنَافِقِيْنَ قَالُوْا لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِىْ كَانَتْ اِمْرَاَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الَّذِىْ تَبَنَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالُوْا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ اِمْرَاَةَ اِبْنِهِ فَاَكْذَبَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ فِىْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ سَبِيْلَ الْحَقِّ .

যেমন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে বলল, اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ [অর্থাৎ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো] অর্থাৎ যিহারের কারণে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয় না, জাহেলী যুগে এটাকে তালাক গণ্য করা হতো। এবং যিহারের কারণে কাফফারা তার শর্ত মতে ওয়াজিব হবে যেমন সূরায়ে মুজাদালাতে উল্লেখ হয়েছে। এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। اَدْعِيَاۤءَ শব্দটি دَعِىٌّ -এর বহুবচন। এবং এটা ঐ ব্যক্তি যাকে তার পিতা ছাড়া অন্যের দিকে পুত্রের নিসবত করা হয় তথা পালক সন্তান। এগুলো তাদের অর্থাৎ ইহুদি ও মুনাফিকদের মুখের কথা মাত্র। যখন মহানবী ﷺ যায়নব বিনতে জাহাশকে যিনি হুজুর ﷺ -এর পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার স্ত্রী ছিলেন বিবাহ করলেন তখন ইহুদি ও মুনাফিকরা বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ তার সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে ন্যায় কথা বলেন এবং তিনি সত্যের পথ প্রদর্শন করেন।

٥. لٰكِنْ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ اَعْدَلُ عِنْدَ اللّٰهِ ج فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَاۤءَهُمْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ط بَنُوْ عَمِّكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ فِىْ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ فِىْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ فِيْهِ وَهُوَ بَعْدَ النَّهْىِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِمَا كَانَ مِنْ قَوْلِكُمْ قَبْلَ النَّهْىِ رَّحِيْمًا بِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ .

৫. তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ তা'আলার কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে চাচাতো ভাই গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো ত্রুটি হলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তবে নিষেধের পরে তোমাদের অন্তরসমূহ যা ইচ্ছাকৃত করেছে। তাতে গুনাহ হবে আল্লাহ তা'আলা নিষেধের পূর্বে তোমাদের মিথ্যা অপবাদসমূহের গুনাহ ক্ষমাশীল, এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦. اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فِيْمَا دَعَاهُمْ اِلَيْهِ وَدَعَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ اِلٰى خِلَافِهٖ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ط فِيْ حُرْمَةِ نِكَاحِهِنَّ عَلَيْهِمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ ذَوُوا الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِي الْاِرْثِ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اَيْ مِنَ الْاِرْثِ بِالْاِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ الَّذِيْ كَانَ اَوَّلَ الْاِسْلَامِ فَنُسِخَ اِلَّآ لٰكِنْ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط بِوَصِيَّةٍ فَجَائِزٌ كَانَ ذٰلِكَ اَيْ نَسْخُ الْاِرْثِ بِالْاِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ بِاِرْثِ ذَوِي الْاَرْحَامِ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا وَاُرِيْدَ بِالْكِتَابِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ.

৬. নবী মুমিনদের উপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক দয়ালু ঘনিষ্ঠ ঐ বিষয়ে যার দিকে তিনি তাদের ডাকেন এবং তাদের নফসসমূহ তার বিপরীত দিকে ডাকে এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। তাদের সাথে তাদের বিবাহ করা হারাম হওয়া হিসেবে মুমিন ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা আত্মীয় আল্লাহ তা'আলার বিধান মতে ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের ঈমান ও হিজরতের কারণে উত্তরাধিকার হওয়া যেতো কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যদি বন্ধুদের প্রতি অসিয়তের মাধ্যমে দান করতে চাও। তবে তা জায়েজ এটা অর্থাৎ ঈমান ও হিজরতের কারণে উত্তরাধিকার হওয়ার বিধান রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মিরাস পাওয়ার বিধান দ্বারা রহিত হওয়া। কিতাবের মধ্যে লিখিত আছে। এখানে উভয়স্থানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফূজ।

٧. وَ اذْكُرْ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ حِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ كَالذَّرِّ جَمْعُ ذَرَّةٍ وَهِيَ اَصْغَرُ النَّمْلِ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص بِاَنْ يَّعْبُدُوا اللّٰهَ وَيَدْعُوا النَّاسَ اِلٰى عِبَادَتِهٖ وَذَكَرَ الْخَمْسَةَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا شَدِيْدًا بِالْوَفَاءِ بِمَا حُمِّلُوْهُ وَهُوَ الْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ اَخَذَ الْمِيْثَاقَ.

৭. তুমি উল্লেখ কর যখন যখন তাদেরকে আদমের পিঠ থেকে ছোট পিপীলিকার মতো বের করা হয়েছে। আমি পয়গাম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.)-এর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম তারা যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে ও মানুষকে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। এখানে বিশেষ করে পাঁচজন নবীর নাম উল্লেখ করা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ তথা ব্যাপকতার পর বিশেষ ব্যক্তির আতফ এর নিয়ম অবলম্বনে এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার। তারা যেন তাদের ওয়াদা ও অর্পিত দায়িত্ব পুরা করে এবং এটা [illegible] তা'আলার [illegible] শপথ।

٨. لِيَسْئَلَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ فِيْ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ تَبْكِيْتًا لِلْكَافِرِيْنَ بِهِمْ وَاَعَدَّ تَعَالٰى لِلْكٰفِرِيْنَ بِهِمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا هُوَ عَطْفٌ عَلٰى اَخَذْنَا .

৮. অতঃপর তিনি অঙ্গীকার নিয়েছেন সত্যবাদীদেরকে রেসালতের দায়িত্ব আদায়ে তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে তাদের ব্যাপারে কাফেরদেরকে নিরুত্তর করার জন্যে তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। এখানে اَعَدَّ ফে'লের আতফ اَخَذْنَا -এর উপর হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ : আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -কে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় সম্বোধন করেননি। অন্যান্য নবীগণকে হে মূসা, হে ঈসা, হে দাউদ বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ কোনো সন্দেহ সংশয় ব্যতীতই সকল সৃষ্টির সেরা মহামানব। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করেছেন যেমন বলেছেন– يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ [হে নবী!] يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ [হে রাসূল!] যদি কোথাও তাঁর নাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তবে তার সাথে সম্মানসূচক শব্দ যোগ করেই তা উল্লেখ করেছেন। যেমন– وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ . مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ دُمْ عَلٰى تَقْوَاهُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَحْصِيْلُ حَاصِلٌ -এর সংশয়ের জবাব প্রদান করা। কেননা তিনি তো প্রথম থেকেই تَقْوٰى -এর উপর ছিলেন এরপরও তাকে তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়াই তো تَحْصِيْلُ حَاصِلٌ আবশ্যক হওয়া।

জবাবের সার হলো– উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা اِنْشَاءُ تَقْوٰى উদ্দেশ্য নয়। অথবা যদিও রাসূল ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মতে মুহাম্মদী।

قَوْلُهُ كَفٰى بِاللّٰهِ : এতে اَللّٰهُ শব্দটি كَفٰى -এর ফায়েল হওয়ায় رَفْع -এর مَحَلّ -এ হয়েছে। ফায়েলের উপর بَاءٌ টি অতিরিক্ত হলে تَمْيِيْز وَكِيْلًا বা حَالٌ

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ : এই আয়াত হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা বিন শুরাহবীল -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। دَعِيٌّ অর্থ হলো– مَدْعُوٌّ অর্থাৎ فَعِيْلٌ টা مَفْعُوْلٌ অর্থে হয়েছে। دَعِيٌّ মূলত ছিল دَعِيْوٌ এখন وَاوْ এবং يَاءٌ একত্রিত হয়েছে এবং يَاءٌ সাকিন তাই وَاوْ কে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করে يَاءٌ কে يَاءٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে, ফলে دَعِيٌّ হয়েছে। তবে دَعِيٌّ -এর বহুবচন اَدْعِيَاءُ এটা খেলাফে কিয়াস হয়েছে। কেননা فَعِيْلٌ - مُعْتَلُ لَامْ -এর বহুবচন اَفْعِلَاءُ সেই সময় আসে যখন فَاعِلٌ -এর অর্থে হয়। যেমন تَقِيٌّ -এর বহুবচন اَتْقِيَاءُ - غَنِيٌّ -এর বহুবচন اَغْنِيَاءُ । دَعِيٌّ টা যদিও مُعْتَلُ لَامْ কিন্তু مَفْعُوْلٌ অর্থে হয়েছে। কাজেই কিয়াসের দাবি ছিল এর বহুবচন فَعْلٰى -এর ওজনে اَدْعٰى হওয়া। যেমন– قَتِيْلٌ -এর বহুবচন قَتْلٰى এবং جَرِيْحٌ -এর বহুবচন جَرْحٰى আসে। কাজেই এটা شَاذٌّ

قَوْلُهُ بَنُوْ عَمِّكُمْ : مَوَالِيْكُمْ -এর তাফসীর بَنُوْعَمِّكُمْ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থ নির্দিষ্ট করা। কেননা مَوْلٰى -এর অনেক অর্থ রয়েছে এবং তন্মধ্যে اِبْنُ عَمٍّ ও অন্তর্ভুক্ত। হযরত জাকারিয়া (আ.) বলেছেন– فَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ এখানে مَوَالِيْ দ্বারা بَنُوْعَمٍّ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَا تَعَمَّدَتْ : এতে مَا টি পূর্বের مَا -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে। অথবা اِبْتِدَاءٌ -এর কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর খবর উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হবে এরূপ– وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُؤَاخِذُوْنَ بِهٖ

قَوْلُهُ اَرْحَامٌ : এটা رَحِمٌ -এর বহুবচন অর্থ– আত্মীয়তা, নৈকট্যতা।

اَوْلٰى بِبَعْضٍ অর্থাৎ بِاِرْثِ بَعْضٍ ব্যাখ্যাকার (র.) فِي الْاِرْثِ বৃদ্ধি করে উহ্য مُضَافٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

هٰذِهِ الْاَوْلَوِيَّةُ ثَابِتٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ এটা فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ مُتَعَلِّقٌ হয়েছে -এর সাথে اَوْلٰى

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -এর সম্পর্ক اَوْلٰى -এর সাথে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا : শারেহ (র.) اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ تَفْعَلُوْا : এটা بِتَاوِيْلِ مَصْدَرٌ মুবতাদা হয়েছে, তার খবর উহ্য রয়েছে। শারেহ (র.) نَجَائِزٌ উহ্য মেনে খবর উহ্য হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। تَفْعَلُوْا যেহেতু تُوَاصِلُوْا -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী কাজেই এর সেলাহ اِلٰى নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاِرْثِ ذَوِى الْاَرْحَامِ : এটা نَسْخ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذْنَا : এটা উহ্য اُذْكُرْ -এর কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب ও হতে পারে। আবার এটা فِى الْكِتَابِ -এর مَحَلّ -এর উপর আতফ হওয়াও জায়েজ আছে। সে সময় আমেল হবে مَسْطُوْرًا অর্থাৎ كَانَ هٰذَا الْحُكْمُ مَسْطُوْرًا فِيْ كِتَابٍ وَقْتَ اَخَذْنَا

قَوْلُهُ وَاَعَدَّ : এর عَطْف হয়েছে اَخَذْنَا -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহযাব প্রসঙ্গে : বায়হাকী দালায়েলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে সূরায়ে আহযাব মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মারদবিয়া ইবনে যোবায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২১, পৃ. ১৪২, তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ১৯৫]

নামকরণ : আহযাব শব্দটি হিযবুন -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো জামাত বা দল। যেহেতু কাফেররা পঞ্চম হিজরিতে যুক্তফন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, আর এই সূরায় ঐ যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে। এ জন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুল আহযাব'। আল্লাহ তা'আলা এই জিহাদে প্রিয়নবী ﷺ -কে বাতাস এবং ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এই জিহাদের আরেকটি নাম হলো 'খন্দক' অর্থাৎ পরীখা, কেননা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের সমতল পথে প্রিয়নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরীখা খনন করেছিলেন। এভাবে মুসলমানগণ হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেন।

-[নূরুল কুরআন খ. ২১, পৃ. ৩১৬]

মদীনায়ে মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ ৭৩ আয়াতের এ সূরাতে আল্লাহ তা'আলা সত্যসাধক ও নেককারদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আর মুনাফিকদেরকে বিভিন্নধর্মী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, হানাদার দুশমনদের আক্রমণের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রাখুন।

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি স্বরূপ, পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের উপর সবর অবলম্বনের নির্দেশ ছিল এবং মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতির দেওয়া হয়েছিল। তখন কাফের মুনাফেকরা বলেছিল, এ বিজয় কবে আসবে? আল্লাহ তা'আল সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন। আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছিল, আর তা হয়েছিল প্রকাশ্য উপকরণ ব্যতীত এক আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্যে। আর এ সাহায্য ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর মোজেজা যা তাঁর নবুয়ত ও রেসালাতের দলিল ছিল।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়নবী ﷺ -কে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ তা'আলা তরফ থেকে বিজয় এবং সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত ছিল। যেমন–

১. তাকওয়া পরহেজগারীর গুণ অর্জন করা।

২. সবর অবলম্বন করা।

৩. আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা।

৪. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে ভয় না করা।

৫. আর অন্য কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করা।

৬. আর শুধু আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশের অনুসরণ করা। কাফের মুনাফেকদের কথা না মানা। কেননা কাফের মুনাফেকদের পরামর্শ মেনে চলা ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী সূরার শুরু এবং শেষে প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের বর্ণনা রয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরার প্রারম্ভে এবং পরিসমাপ্তিতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ -কে যে কষ্ট দেবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্ত হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কাফেরদেরকে দুনিয়ার আজাব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ সূরায় আহযাবের যুদ্ধে তাদের যে শাস্তি হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলবী(র.) খ. ৫, পৃ. ৭৫৮]

এ সূরার ফজিলত :

যে ব্যক্তি সর্বদা এই সূরা পাঠ করবে ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর উপাধী হবে শাকুর অর্থাৎ অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

শানে নুযূল : এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরিফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশেপাশে কুরায়জা, নযীর, বনূ কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইহুদি গোত্র বসবাস করতো। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদির মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজী ﷺ -এর খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী ﷺ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোনো অশালীন ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী]

ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন রাবীয়াহ মদীনায় পৌঁছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদিগণ এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবি ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়। -[রূহুল মা'আনী]

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফেরগণ ও নবীজী ﷺ -এর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান, ইকরিমা বিন আবূ জেহেল ও আবূ আওয়ার সালামী মদীনায় পৌঁছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল একথা বলুন যে, [পরকালে] এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। -[রূহুল মা'আনী]

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনাও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে। প্রথম. اِتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর. দ্বিতীয় لَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা, চুক্তিভঙ্গের শামিল– যা সম্পূর্ণ হারাম। আর কাফেরদের কথা অনুসরণ না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনা সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কুরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন- يَا اٰدَمُ . يَا اِبْرَاهِيْمُ . يَا مُوْسٰى . يَا نُوْحُ প্রভৃতি; বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন ﷺ -কে কুরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে– তাঁর উপাধি নবী ও রাসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রাসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা একান্ত জরুরি ছিল।

এস্থলে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লঙ্ঘন করা না হয়। ২. মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদিদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তি ভঙ্গ করা মহাপাপ [কবীরা গুনাহ] এবং উপরে শানে নুযূল প্রসঙ্গে কাফের মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ। আর তিনি [নবীজী ﷺ] এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা, যেমনিভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন। আর اِتَّقِ اللّٰهَ-এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। সুতরাং চুক্তি লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اِتَّقِ اللّٰهَ-এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোনো মুসলমান মুশরিক কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত। তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণের কোনো আশঙ্কাই ছিল না কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার রাসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে কোনো মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ না করেন, তাদেরকে অত্যধিক উঠা বসা, মেলা-মেশার সুযোগ না দেন। কেননা এদের সাথে অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজী ﷺ -কে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এ ক্ষেত্রে اِطَاعَتْ [অনুসরণ করা] শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এ স্থলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোনো সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরিয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থি উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফিকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোনো ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না। পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোনো উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযূল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে তো কোনো কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদি কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে মহানবী ﷺ বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا বলে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্বে বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল তার পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফিকদের কোনো কোনো কথা এমনও ছিল যদ্দারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও মঙ্গলের পরিপন্থি বলে আল্লাহ তা'আলা নবীজী ﷺ -কে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

قَوْلُهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا : এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশে, যেন আপনি কাফের ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন; বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُوْنَ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا : এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোনো কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জন কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরে ভরসা করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করাও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমত বর্বর যুগে আরববাসীগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করতো। দ্বিতীয়ত নিজ পত্নীগণ সম্পর্কে এ প্রথা বিরাজমান ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তা মার পিঠ বা অন্য কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় যিহার' বলা হতো, তবে 'যিহার'কৃত সে স্ত্রী তার কাছে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظِهَارٌ -এর উৎপত্তি ظَهْرٌ থেকে যার অর্থ– পিঠ।

তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো; এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো। এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা– তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মিরাশের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম এ পোষ্য পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন– বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামি শরিয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দুটি অন্তকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানষের বক্ষ মাঝে দুটি অন্তরকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতাও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'জিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দুটি বিষয়, যিহার ও পালকপুত্রের হুকুম, এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কুরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজী ﷺ -এর উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'ব্যাপারে বর্বর আবরগণ নিজেদের খেয়াল খুশি মতো হালাল হারাম ও জায়েজ না জায়েজ সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য, তা উদঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল তাই বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِي تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ্য বলে ঘোষণা করে তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহারের দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে আর এরূপ বলার ফলে শরিয়তের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফফারা আদায় করে, তবে স্ত্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মুজাদালায়' জিহারের কাফফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে–

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট : এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ - أَدْعِيَاءُ - دَعِيٌّ-এর বহুবচন, যার পালক ছেলে আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোনো মানুষের দুটি অন্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না। অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না অর্থাৎ অন্য সন্তানদের ন্যায় সে মিরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনিভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। [কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

قَوْلُهُ اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الخ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 'সূরায়ে আহযাবের' অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জ্বালা যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রাসূলুলাহ ﷺ -কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেননা কাফেরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নাব (রা.)-এর সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরযুগের এই পোষ্য পুত্র জনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে এরূপ অপবাদ দেওয়া যে, তিনি নিজ ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজী ﷺ -কে যন্ত্রণা প্রদান সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকূলের চাইতে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে– اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ

أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এরসারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপনার ﷺ নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতামাতার নির্দেশের চেয়েও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতামাতার হুকুম তাঁর ﷺ হুকুমের পরিপন্থি হয় তবে তা পালন করা জায়েজ নয়। এমনকি তার ﷺ নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়েও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .

অর্থাৎ এমন কোনো মুমিনই নেই, যার পক্ষে আমি ﷺ ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নেই। যদি তোমাদের মনে চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত– اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ পাঠ কর।

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানদের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের চেয়ে অধিক স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজী ﷺ -এর প্রতি প্রত্যেক মুমিনের ভালোবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ . (بُخَارِيْ . مُسْلِم مَظْهَرِيْ) অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালোবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। –[বুখারী ও মুসলিম, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ : তার পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ– ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা ছেলের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা– পরস্পর বিয়েশাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মিরাশে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আর নবীজী ﷺ -এর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠানে হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া বা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরি নয়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজী ﷺ -এর পুণ্যবতী বিবিগণের (রা.) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বেআদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তারা উম্মতের মা। উপরন্তু তাদেরকে দুঃখ দিলে নবীজী ﷺ কেও দুঃখ দেওয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

قَوْلُهُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ : وَأُولُوا الْأَرْحَامِ শব্দগত অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয় স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত, চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ফকীহগণ 'আসবাত' (عَصَبَاتٌ) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী 'আসাবাতে'র মোকাবিলায় أُولُوا الْأَرْحَامِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কুরআনি আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকহের এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চেয়েও উন্নতর ও অগ্রস্থানীয় কিন্তু মিরাশের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্থান নেই; বরং মিরাশ বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মিরাশের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং কুরআনে কারীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে اَلْمُؤْمِنِيْنَ এর পরে আবার اَلْمُهَاجِرِيْنَ এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে এ স্থলে মুমিনীন (مُؤْمِنِيْنَ) বলে আনসারগণকে বুঝানো হয়েছে। এখানে 'মুমিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মোকাবিলায় মুমিনীন শব্দ ব্যবহার থেকে বুঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মিরাশের অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী [নাসেখ] বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী ﷺ হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংশ্লিষ্ট সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوْفًا : অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাবে। কোনো অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্বজনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

قَوْلُهُ وَإِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ الخ : সূরার শুরুতে নবী করীম ﷺ -কে তার উপর অবতারিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَاتَّبِعْ مَا يُوحٰى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ আপনার উপর আপনার পালনকর্তা পক্ষ হতে যে ওহী অবতারিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর মাধ্যমে মু'মিনগণের উপর সাহেবে ওহী পয়গাম্বর ﷺ -এর নির্দেশাবলি পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অথাৎ সাহেবে ওহীর পক্ষে তার উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ : উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকূল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে–

خُصُّوْا بِمِيْثَاقِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ (الاية) অর্থাৎ রিসালাত ও নবুয়ত সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার নবী ও রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা– আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ (الْاٰيَة).

নবীগণ ﷺ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালাত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের ﷺ এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তারা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল তার পরে কোনো নবী আসবেন না।

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আমল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল। –[রুহুল বায়ান ও মাযহারী]

قَوْلُهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ (الْاٰيَة) : সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা ﷺ উল্লেখের পর পাঁচজনের নাম আবার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকূলের মধ্যে তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মাঝে রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও مِنْكَ শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে– كُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ . (رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ) অর্থাৎ আমি [নবীকুলের মাঝে] সৃষ্টিগতভাবে সকলের আগে, কিন্তু আবির্ভাবগতভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে। –[মাযহারী]

٩. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ مُتَحَزِّبُوْنَ اَيَّامَ حَفْرِ الْخَنْدَقِ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا ط مَلَائِكَةً وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ مِنْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ وَبِالْيَاءِ مِنْ تَخْرِيْبِ الْمُشْرِكِيْنَ بَصِيْرًا -

১০. اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلِ مِنْكُمْ مِنْ اَعْلَى الْوَادِيْ وَاَسْفَلِهِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ مَالَتْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰى عَدُوِّهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ جَمْعُ حَنْجَرَةٍ وَهِيَ مُنْتَهَى الْحُلْقُوْمِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا الْمُخْتَلِفَةَ بِالنَّصْرِ وَالْيَاْسِ -

১১. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ اُخْتُبِرُوْا لِيَتَبَيَّنَ الْمُخْلِصُ مِنْ غَيْرِهِ وَزُلْزِلُوْا حُرِّكُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ -

১২. وَ اذْكُرْ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بِالنَّصْرِ اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا -

অনুবাদ :

৯. হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যখন শত্রু বাহিনী কাফেরগণ খন্দকের যুদ্ধের সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর যেমন পরিখা খনন, এটা تَعْمَلُوْنَ পড়ার ক্ষেত্রে; আর يَعْمَلُوْنَ পড়লে তখন অর্থ হবে তারা যা করে যেমন মুশরিকদের আক্রমণ আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন।

১০. যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্ন ভূমি থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে উচ্চ ও নিম্নাঞ্চল এলাকা থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টি ভ্রম হচ্ছিল প্রত্যেকদিক থেকে আগত শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল অধিক ভয়ের কারণে, حَنَاجِرُ শব্দটি حَنْجَرَةٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ কণ্ঠের শেষভাগ এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা যেমন সাহায্য করা ও নৈরাশ্য হওয়া পোষণ করতে শুরু করেছিলে।

১১. সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল যাতে তাদের মধ্য হতে মুখলিস বান্দাগণ অন্যান্যদের থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল অধিক ভয়ঙ্কর অবস্থার দরুন।

১২. এবং তুমি স্মরণ কর যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ দুর্বল বিশ্বাস ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

١٣. وَإِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَىِ الْمُنَافِقِيْنَ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ هِىَ أَرْضُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ تَنْصَرِفْ لِلْعَلَمِيَّةِ وَ وَزْنِ الْفِعْلِ لَا مُقَامَ لَكُمْ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا أَىْ لَا إِقَامَةَ وَلَا مَكَانَةَ فَارْجِعُوْا ج إِلٰى مَنَازِلِكُمْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا خَرَجُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ إِلٰى سَلْعٍ جَبَلٍ خَارِجِ الْمَدِيْنَةِ لِلْقِتَالِ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ فِى الرُّجُوْعِ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط غَيْرُ حَصِيْنَةٍ يُخْشٰى عَلَيْهَا قَالَ تَعَالٰى وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ج إِنْ مَّا يُرِيْدُوْنَ إِلَّا فِرَارًا مِنَ الْقِتَالِ.

১৩. এবং যখন তাদের মুনাফিকদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিব বাসী يَثْرِبُ মদীনা শরীফকে বলা হয় এবং এটা عِلْم ও وَزْن فِعْل -এর কারণে গায়রে মুনসারিফ এটা তোমাদের জায়গা অবস্থানের জায়গা নয়। مُقَامَ শব্দের প্রথম মীমে যবর ও পেশ উভয় কেরাতে পড়া যাবে অর্থাৎ অবস্থান ও স্থান অতএব তোমরা ফিরে চলো। তোমাদের বাড়ি মদীনার দিকে। এবং তারা নবী ﷺ -এর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়ে সালা পাহাড় পর্যন্ত গিয়েছিল। তাদেরই একদল নবীর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি ঘর খালি পাহারাদারবিহীন, আমরা আমাদের ঘর বাড়িতে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা করছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, অথচ সেগুলো খালি ছিল না যুদ্ধ থেকে পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।

١٤. وَلَوْ دُخِلَتْ أَىِ الْمَدِيْنَةُ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا نَوَاحِيْهَا ثُمَّ سُئِلُوْا أَىْ سَأَلَهُمُ الدَّاخِلُوْنَ الْفِتْنَةَ الشِّرْكَ لَاٰتَوْهَا بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ أَىْ أَعْطَوْهَا وَفَعَلُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا إِلَّا يَسِيْرًا.

১৪. যদি শত্রু পক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করতে অতঃপর তারা ফিতনায় জিজ্ঞাসিত হতো প্রবেশকারীগণ তাদেরকে শিরকের প্রতি আহ্বান করতো তবে তারা অবশ্যই তা মেনে নিত لَاٰتَوْهَا এর মধ্যে মাদ্দ ও মাদ্দবিহীন উভয়টি পড়া যাবে অর্থাৎ তারা তা মেনে নিতে ও করতো এবং তারা ঘরে খুব কম সময় অবস্থান করেছিল।

١٥. وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْأَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ.

১৫. অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে

١٦. قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا إِنْ فَرَرْتُمْ لَّا تُمَتَّعُوْنَ فِى الدُّنْيَا بَعْدَ فِرَارِكُمْ إِلَّا قَلِيْلًا بَقِيَّةَ آجَالِكُمْ.

১৬. বলুন তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন যদি তোমরা পলায়ন কর তোমাদের সামান্যই তোমাদের অবশিষ্ট জিন্দেগী ব্যতীত ভোগ করতে দেওয়া হবে না দুনিয়ায় তোমাদের পলায়নের পর।

١٧. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ يُجِيرُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا هَلَاكًا أَوْ هَزِيمَةً أَوْ يُصِيبُكُمْ بِسُوءٍ إِنْ أَرَادَ اللّٰهُ بِكُمْ رَحْمَةً ط خَيْرًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلِيًّا يَنْفَعُهُمْ وَلَا نَصِيرًا يَدْفَعُ الضَّرَّ عَنْهُمْ.

১৭. বলুন কে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ধ্বংস বা হত্যা ইচ্ছা করেন অথবা কে তোমাদের ক্ষতি করবে যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমতের ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক যিনি তাদের সাহায্য করবেন ও সাহায্যদাতা যিনি তাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন পাবে না।

١٨. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ الْمُثَبِّطِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ تَعَالَوْا إِلَيْنَا ج وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ الْقِتَالَ إِلَّا قَلِيلًا رِيَاءً وَسُمْعَةً.

১৮. আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। এবং তারা যুদ্ধে আসে না কিন্তু খুবই কম সংখ্যক মানুষদেরকে দেখানো ও শুনানোর জন্য।

١٩. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ج بِالْمُعَاوَنَةِ جَمْعُ شَحِيحٍ وَهُوَ حَالٌ مِّنْ ضَمِيرِ يَأْتُونَ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي كَنَظَرِ أَوْ كَدَوَرَانِ الَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج أَيْ سَكَرَاتِهِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ وَحِيزَتِ الْغَنَائِمُ سَلَقُوكُمْ آذَوْكُمْ أَوْ ضَرَبُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط أَيِ الْغَنِيمَةِ يَطْلُبُونَهَا أُولٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَقِيقَةً فَأَحْبَطَ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ الْإِحْبَاطُ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا بِإِرَادَتِهِ.

১৯. সাহায্য করার ব্যাপারে তারা তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ কৃপণ। أَشِحَّةً শব্দটি شَحِيحٌ -এর বহুবচন এবং এটা يَأْتُونَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন, তারা আপনার প্রতি তাদের চোখ উল্টিয়ে তাকায় মৃত্যুর ভয়ে অচেতন ব্যক্তির চোখ উল্টিয়ে তাকানোর ন্যায়। অতঃপর তারা যখন বিপদ চলে যায় ও গনিমতের মাল একত্রিত হয় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তোমাদেরকে কষ্ট দেয় তারা বাস্তবিকই মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা নিষ্ফল করে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার জন্যে সহজ তার ইচ্ছাধীন।

২০. يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ج اِلٰى مَكَّةَ لِخَوْفِهِمْ مِنْهُمْ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ كَرَّةً اُخْرٰى يَوَدُّوْا يَتَمَنَّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ اَىْ كَائِنُوْنَ فِى الْبَادِيَةِ يَسْئَلُوْنَ عَنْ اَنْبَآئِكُمْ ط اَخْبَارِكُمْ مَعَ الْكُفَّارِ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ هٰذِهِ الْكَرَّةَ مَا قٰتَلُوْآ اِلَّا قَلِيْلًا رِيَاءً وَخَوْفًا مِنَ التَّعْيِيْرِ .

২০. তারা মনে করে শত্রুবাহিনী কাফেরগণ চলে যায়নি মক্কার দিকে, তাদের ভয়ের কারণে যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করতো এবং কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধের সংবাদ জেনে নিত, তবেই ভালো হতো যদি তখনই তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করতো। লোক দেখানোর জন্য ও লজ্জার ভয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جُنُوْدٌ : جُنُوْدٌ শব্দটি جُنْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সৈন্য সামন্ত। কুরাইশ, গাতফান, ইহুদি বনূ নযীর ইত্যাদি সৈন্য উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اِذْ جَاءَتْكُمْ : এটা نِعْمَةَ اللّٰهِ থেকে بَدَل হয়েছে। ظُنُوْنَا -এর মধ্যে নাফে ইবনে আমের এবং আবূ বকর (রা.) মাসহাফে উসমানীর রেওয়ায়েতে ওয়াকফ এবং ওয়াসাল উভয় অবস্থায়ই اَلِفْ -এর সাথে পড়েছেন। আর আবূ আমর এবং হামযা উভয় অবস্থায় اَلِفْ বিহীন পড়েছেন।

قَوْلُهُ بِالنَّصْرِ وَالْيَاسِ : সাহায্যের আশা পোষণকারীগণ খাটি মুমিন ছিলেন। আর নৈরাশ্য পোষণকারীগণ মুনাফিক ছিল।

قَوْلُهُ زِلْزَالًا : زَاءٌ বর্ণে যের দিয়ে এটা হলে عَامٌ تِرَاءَتْ আবার কেউ কেউ زَاءٌ বর্ণে যবর দিয়ে পড়েছেন। কেননা فِعْلَال উভয় মাসদার আসে। যেমন– زِلْزَالٌ . قَلْقَالٌ . صَلْصَالٌ কখনো زَلْزَالٌ [زَاءٌ যবর সহ] اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থেও আসে যেমন زَلْزَالٌ অর্থ مُزَلْزِلٌ

قَوْلُهُ يَثْرِبُ : হাদীসে মদীনাকে ইয়াসরিব বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা يَثْرِبُ শব্দটি ثَرْبٌ থেকে নির্গত যার অর্থ– ভর্ৎসনা, তিরস্কার। বর্ণিত আছে যে, আমালেকা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম يَثْرِبُ ছিল ঐ স্থানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। একারণেই এই স্থানের নাম يَثْرِبُ হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ -এর নাম طَيْبَةٌ . طَابَةٌ . قُبَّةُ الْاِسْلَامِ এবং দারুল হিজরত রেখেছেন।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَتِ الْمُنَافِقُوْنَ : এর قَائِلٌ হলো মুনাফিক আউস ইবনে কায়যী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

لَا مُقَامَ হাফসের কেরাত অনুপাতে مِيْمٌ বর্ণে পেশসহ হবে। আর অন্যদের নিকট যবরের সাথে হবে। ব্যাখ্যাকারের উক্তি لَا اِقَامَةَ অর্থ অবস্থান করা এটা مُقَامٌ [مِيْمٌ বর্ণে পেশযোগে] এর তাফসীর। এবং لَا مَكَانَةَ অর্থ– অবস্থানের স্থান এটা مَقَامٌ بِالْفَتْحَةِ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ سَلْعٌ : মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। আর শারেহ (র.)-এর উক্তি جَبَلٌ خَارِجَ الْمَدِيْنَةِ হলো سَلْعٌ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ فَارْجِعُوْا : এতে فَاءٌ টি হলো نَصِيْحَةٌ অর্থাৎ اِنْ سَمِعْتُمْ نُصْحِىْ فَارْجِعُوْا যদি তুমি আমার উপদেশ শোন তবে ফিরে আসো।

وَيَسْتَأْذِنُ -এর আতফ قَالَ -এর উপর হয়েছে حِكَايَتْ حَالْ مَاضِيَةْ -এর ভিত্তিতে مُضَارِعْ -এর সীগাহ নেওয়া হয়েছে। يَقُوْلُوْنَ হলো جُمْلَةْ حَالِيَةْ বা مُفَسِّرَةْ যা يَسْتَأْذِنُ -এর তাফসীর করতেছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَوْ دُخِلَتِ الْمَدِيْنَةَ : অর্থাৎ لَوْ دَخَلَتِ الْاَحْزَابُ الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوْا اَىِ الْمُنَافِقُوْنَ

قَوْلُهُ الْفِتْنَةَ : অর্থাৎ اَلْكُفْرُ وَالرِّدَّةُ

قَوْلُهُ لَاٰتَوْهَا : এর মধ্যে لَامْ টি جَوَابُ قَسَمْ -এর উপর প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ কুফর এবং رِدَّة -কে কাল বিলম্ব না করে মঞ্জুর করে নিবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, كُفْر এবং رِدَّة -এর চাহিদা পূরণের পর মদীনাতে বেশি সময় অবস্থান করবে না তাৎক্ষণিকভাবেই বহিষ্কার করা হবে কিংবা হত্যা করা হবে। –[বায়যাভী, জুমাল]

قَوْلُهُ لَا يُوَلُّوْنَ : এটা جَوَابُ قَسَمْ কেননা عَاهَدُوْا টা اَقْسَمُوْا -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ فَرَرْتُمْ : এটা শর্ত, তার জবাব لَنْ يَنْفَعَكُمْ টা مُقَدَّمْ হয়েছে। অথবা পূর্বের দালালতের কারণে উহ্যও হতে পারে।

قَوْلُهُ الْمُعَوِّقِيْنَ : এটা مُعَوِّقٌ ইসমে ফায়েলের বহুবচন। এর অর্থ হলো– বাধা প্রদানকারী।

قَوْلُهُ هَلُمَّ اَىْ تَعَالَوْا : বনূ তামীম এবং হেজাজীদের নিকট هَلُمَّ টি فِعْلُ اَمْرٍ তবে পার্থক্য হলো এই যে, বনূ তামীমের নিকট তাতে تَثْنِيَةْ . جَمْعْ এবং مُذَكَّرْ এবং مُؤَنَّثْ -এর আলামতযুক্ত হয়। অর্থাৎ هَلُمَّا . هَلُمُّوْا . هَلُمِّىْ ইত্যাদি সংযুক্ত হতে পারে। আর বনূ হিজাজীদের নিকট শুধু মাত্র وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাই ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকার هَلُمَّ -এর তাফসীর اَعْطُوْهَا দ্বারা করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি هَلُمَّ -এর ব্যাপারে হেজাজীদেরই অনুসারী।

قَوْلُهُ اَشِحَّةً : এটা شَحِيْحٌ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো حَرِيْصٌ مَعَ الْبُخْلِ - اَشِحَّةً টা مَنْصُوْبٌ بِالذَّمِّ হয়েছে অথবা حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। কেউ কেউ هُمْ উহ্য মুবতাদার কারণে مَرْفُوْعْ পড়েছেন।

قَوْلُهُ رَاَيْتَهُمْ اِلَيْكَ : এটা মুনাফিকদের ভীরুতাও তাদের ভীতির অবস্থার বিবরণ। ভীরুতা ও ভয়ের দুটি কারণ ছিল। প্রথম মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ভয়, দ্বিতীয় হলো– রাসূল ﷺ -এর বিজয় লাভ করার ভয়।

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ خَوْفًا مِنَ الْقِتَالِ -এর সম্পর্ক প্রথম সূরতের সাথে আর تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় সূরতের সাথে।

قَوْلُهُ يَنْظُرُوْنَ : এটা جُمْلَةْ حَالِيَةْ কেননা উদ্দেশ্য হলো– رُؤْيَتْ بَصَرِيَّةْ

قَوْلُهُ كَنَظَرِ اَوْ دَوَرَانٍ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর এই ইবারত দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ -এর মধ্যে দুটি সূরত রয়েছে। এক. এটা يَنْظُرُوْنَ -এর উহ্য মাসদারের صِفَتْ হবে। অর্থাৎ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرًا كَنَظَرِ الَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ দুই. এটা تَدُوْرُ -এর উহ্য মাসদারের صِفَتْ হবে। অর্থাৎ تَدُوْرُ دَوَرَانًا كَدَوَرَانِ عَيْنِ الَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ

قَوْلُهُ سَلَقَ : এটা বাবে ضَرَبَ -এর سَلْقًا মাসদার হতে অর্থ হলো রসনা দ্বারা তার কথা বলা। سَلَقَهُ بِالْكَلَامِ অর্থ– তাকে তীব্র কথা বলেছে, ভর্ৎসনা দিয়েছে।

قَوْلُهُ بَادُوْنَ : এটা بَادٍ -এর বহুবচন, অর্থ– গ্রাম্য, গ্রামের অধিবাসী। অর্থাৎ হায় যদি সে গ্রামের অধিবাসী হতো। يَسْئَلُوْنَ টা جُمْلَةْ হয়ে بَادُوْنَ -এর খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণে ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাবের [সম্মিলিত বাহিনী] যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কুরআন পাকের এ দু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার নানাবিধ অনুগ্রহরাজি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিভিন্ন মোজেজার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও নির্দেশাবলি রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলির দরুন বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ আহযাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তাফসীরকার। তাই এখানে সেসব নির্দেশাবলি সমেত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ : حِزْبٌ اَحْزَابٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ পার্টি বা দল। এ যুদ্ধে কাফেরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও করেছিল বলে এর নাম আহযাবের [সম্মিলিত বাহিনীর] যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শত্রুদের আগমন পথে নবীজী ﷺ -এর নির্দেশানুযয়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক [পরিখার] যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেহেতু বনূ কুরায়জার যুদ্ধও সংঘটিত হয়- উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এ যুদ্ধও আহযাব যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফেরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চেয়ে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঙ্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মতো ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র ছিল তিন হাজার তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রহীন- তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কুরআনে কারীমে ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে- زَاغَتِ الْاَبْصَارُ [চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল।] وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ [হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত] وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا [এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়।]

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সংকটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য সাহায্য সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহুদি ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরিতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবীজী ﷺ ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনূ নাযীর ও আবূ ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশজন ইহুদি মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে করতো যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূজাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণাও ঠিক একই রকম। সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদিদেরকে প্রশ্ন করলো যে, মুহাম্মদ ﷺ ও আমাদের মাঝে ধর্মের ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন- আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের [মুসলমানদের] ধর্ম।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয় : সেসব ইহুদিরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচ ও উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্মের চেয়ে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করলো। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন ইহুদি পঞ্চাশজন কুরাইশ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর দেয়ালে নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য : আল্লাহ তা'আলার ঘরে- সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার শত্রুরা তদীয় রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহুদিরা মক্কায় কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোত্র বনূ গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসেবে এ প্রস্তাবও পেশ করলো যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু কোনো কোনো বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরিউক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মুতাবিক আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সহ তিনশ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরাইশ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনূ আসলাম, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনূ ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোনো সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোনো সূত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোনো সূত্রানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ : বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফের সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চেয়ে অনেক বেশি। সাজ সরঞ্জামও প্রচুর আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদি গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি ১. আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা। ২. পারস্পরিক পরামর্শ। ৩. সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখনিঃসৃত সর্বপ্রথম বাক্যটি ছিল- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক। অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই, তিনি সরাসরি বিধাতার ইঙ্গিত ও অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করেন। কিন্তু পরামর্শে দু-ধরনের লাভ রয়েছে- ১. উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, ২. মুমিনগণের অন্তঃকরণে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্জাগরণ। উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। যিনি সদ্য জনৈক ইহুদির দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খেদমতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্য পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন : শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নকশা নবীজী ﷺ স্বয়ং অঙ্কন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকাও 'রাতুনা' উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোনো রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শত্রু সৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরিখা খনন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যেক পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন। -[মাযহারী] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা : এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬টি।

পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনের বছর নির্দিষ্ট হয় : মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পনের বছরের চেয়ে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবূ সাঈদ খুদরী, বারা ইবনে আযেব (রা.) প্রমুখ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথ্যা ওজর পেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এসব মুনাফিকের প্রসঙ্গ কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী]

সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ ইসলামি ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থি নয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে এবং আনসারদের পতাকা হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদাহ (রা.)-কে প্রদান করেন। এ সময় মুহাজির ও আনসারের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পস্পর ভাই ভাই ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ইসলামি ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থি নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিখা খননের দায়িত্বভার বণ্টন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিশ গজ পরিমাণ খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী ﷺ এই মীমাংসা করলেন- سَلْمَانُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ অর্থাৎ সালমান আমার পরিবারভুক্ত।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্য : অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরজনক বলে মনে করতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) হযরত হুযায়ফা (রা.) প্রমুখ মুহাজির ও সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মোজেজা : পরিখার যে অংশ হযরত সালমান (রা.) প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন মসৃণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হযরত সালমান (রা.)-এর সহকারী হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) বলেন যে, এ প্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতঃপর আমি হযরত সালমান (রা.)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্কিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত : এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোনো খননকারীই কোনো দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান (রা.) স্বয়ং। আল্লাহ তা'আলা এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তার সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরজ। কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মুমিনের কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হযরত সালমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবীজী ﷺ -এর শরীর ধূলো বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তা পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় হযরত সালমান (রা.)-কে কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা না দিয়ে নবীজী ﷺ স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে হযরত সালমান (রা.)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন- تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا [অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে।] প্রথম আঘাতেই পাথরের এক তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ

করেন অর্থাৎ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا দ্বিতীয়বারের আঘাতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায় ও পাথর থেকে আরেক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্শ্বে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা.) আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইয়েমেন ও কিসরার [পারস্য] বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী ﷺ -এর এই ইরশাদ শুনে মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্ষপাত : সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগলো, তোমাদের কি মুহাম্মদ ﷺ -এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক [ভবিষ্যদ্বাণী শুনাচ্ছেন] যে, মদীনার পরিখা গহ্বরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে। নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও। তোমাদের নিজ শরীরের খবর নওয়ার মতো হুঁশজ্ঞান নেই। পায়খানা প্রস্রাব করার মতো সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হয়- إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ বাক্যে সেসব কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষে পরিখা খননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থাবান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ পরিস্থিতি বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ -এর ইরশাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শঙ্কা দ্বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ : একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবীজী ﷺ -এর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন। তারা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সসমভাবে অংশ নেন। নবীজী ﷺ -এর জন্য তা সাহাবায়ে কেরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তার অনন্য ও অনুপম গুণাবলি এবং নবুয়ত ও রিসালাতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণসমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখ কষ্টে পুরোপুরি শরিক থাকতেন, শাসক শাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোনো ধারণাও সেখানে ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে। নানাবিধ অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার আমোঘ বিধান : উল্লিখিত ঘটনায় নবীজী ﷺ এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কুরআনের আয়াত- تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ পাঠ করেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ আয়াত যে কোনো কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের এক আমোঘ ব্যবস্থাপত্র ও অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কেরামের অনন্য ত্যাগ : উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাদের খনন কার্যের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেতো তারা তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না; বরং যাদের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। -[কুরতুবী, মাযহারী]

দীর্ঘ পরিখা ছ'দিনে সমাপ্ত হয় : সাহাবায়ে কেরামের শ্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো। এই সুদীর্ঘ প্রশস্ত গভীর পরিখা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল। -[মাযহারী]

হযরত জাবের (রা.)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মোজেজা : এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবের (রা.) নবীজী ﷺ -কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, রান্না করার মতো কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা' [সাড়ে তিন সের] পরিমাণ যব আছে তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে গেলেন। বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবের (রা.) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ডেকে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজী ﷺ -এর সাথে তো সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী ﷺ -কে চুপে চুপে একা ডেকে আনবেন। সাহাবায়ে কেরামের এই বিশাল জামাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত জাবের (রা.) নবীজী ﷺ -এর নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাতকে সম্বোধন করে বললেন, হযরত জাবের (রা.)-এর বাড়িতে দাওয়াত, সবাই চলো। হযরত জাবের (রা.) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবীজী ﷺ -কে খাবারের পরিমাণ জ্ঞাত করেছেন কিনা? হযরত জাবের (রা.) বললেন যে, হ্যাঁ, তা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই। নবীজী ﷺ স্বয়ংই এখন মালিক; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তারে বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন এবং জমাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খান। হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, এই বিশাল জামাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশত বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্য পেট পুরে খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বণ্টন করে দিলাম।

এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শত্রু সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী এসে পড়লো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সালা' (سَلْعٌ) পর্বত পর্যন্ত নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরায়জা গোত্রের ইহুদিদের চুক্তি লঙ্ঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বন : এসময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মোকাবিলা যুক্তি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোত্রপতি হুইয়াই ইবনে আখতাব যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল, মদীনা পৌছে ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়জাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বনূ কুরায়জা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বনূ কুরায়জার নেতা ছিল কা'ব ইবনে আসাদ। হুইয়াই ইবনে আখতাব তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল যাতে হুইয়াই সে পর্যন্ত পৌছতে না পারে। কিন্তু হুইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কা'ব দুর্গের ভিতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তাঁরা চুক্তির শর্তাবলি পুরোপুরি পালন করে আসছে। চুক্তির পরিপন্থি কোনো আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুইয়াই ইবনে আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগলো, কিন্তু কা'বকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেওয়ায় অবশেষে সে দরজা খুলে হুইয়াইকে ভিতরে ডেকে নিল, হুইয়াইর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল ও সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করলো। কিন্তু কা'ব যখন গোত্রের অন্য নেতৃবৃন্দের নিকট একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ

করে মারাত্মক ভুল করেছ। কা'বও তাদের কথায় নিজের ভুল অনুধাবন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলো। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লঙ্ঘনই বনূ কোরায়জার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যার বিবরণ পরে আসছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সংকটময় মুহূর্তে বনূ নাযীরের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করেছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কুরআন কারীমে কাফেরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে– مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিশিষ্ট তাফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, فَوْقِ তথা উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনূ কুরায়জাকে এবং أَسْفَلَ তথা নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ (রা.)-এবং খাজরাজ গোত্রের নেতা হযরত সাদ ইবনে ওবায়দা (রা.)-কে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে। আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতে বলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে পৌছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশ মতো আকার ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হুজুর ﷺ -কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়জা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করেছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ আবার কত মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো। যার বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ الخ বাক্যে রয়েছে।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় একমাস কেটে যায়, খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোনো যুদ্ধও হচ্ছিল না আবার কখনো নিশ্চিন্তে শঙ্কামুক্ত থাকাও যাচ্ছিল না। দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত থাকছেন যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে শরিক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কেরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত নবীজী ﷺ -এর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি যুদ্ধ কৌশল : হুজুর ﷺ এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোত্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহুদির সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনূ গাতফানের অপর দুটি গোত্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল, চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অভ্যাস মুতাবেক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ ও সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-কে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর ঈমান জোশ : উভয় নেতাই আরজ করলেন যে, হুজুর আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই, তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদের পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করেছেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয়; বরং তোমাদের দুঃখ কষ্টের কথা বিবেচনা করে এপথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষদলের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যে সময়ে প্রতিমা পূজারী ছিলাম মহান আল্লাহ তা'আলাকে চিনতাম না, তার উপাসনা আরাধনাও করতাম না সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোনো ফলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেতো না অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে আসতো এবং মেহমান হিসেবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম অথবা খরিদ করে নিতো। আজ যখন আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানিপূর্বক তার পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব। তাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দ (রা.)-এর সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা যা চাও তাই করতে পার। হযরত সা'দ (রা.) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে তার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাতফান গোত্রপতি হারিস ও উয়াইনা যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কেরামের শৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান হয়ে পড়লো।

আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মা'আজের দোয়া : এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ (রা.) মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তার মায়ের নিকটে যান। হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাজিল হয়নি। আমি হযরত সা'দ (রা.)-কে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম, যার মধ্য থেকে তার হাত বের হয়ে পড়েছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে চলে যাও। আমি তার মাকে বললাম যে, বর্মটা আরো কিছুটা বড় হলে ভালো হতো। তার বর্ম বহির্ভূত হাত পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মা বললেন, কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ তা'আলা যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হযরত সা'দ ইবনে মাআজ (রা.) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতঃপর হযরত সা'দ (রা.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ভবিষ্যতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যদি কুরাইশদের আরো কোনো আক্রমণ নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজী ﷺ -এর প্রতি নানাভাবে নির্যাতন করেছে, মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে এবং তার আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বনূ কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন। আহযাবের এ যুদ্ধকেই কাফেরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়, প্রথমে খায়বার, অতঃপর মক্কা মুকাররামাহ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর অধিকারভুক্ত হয়। এবং বনূ কুরায়জার ঘটনা যা পরবর্তী মীমাংসার ভার হযরত মা'আজ (রা.)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণিকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

আহযাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোনো সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোনো দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন হতো যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরিফ আনতেন এবং কোনো শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে আরামের জন্য শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোনো শব্দ পেয়েই বাইরে তশরিফ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা (রা.) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে– যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু তিনি অন্য কোনো যুদ্ধে খন্দকের পরিখার যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হননি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়, প্রচণ্ড শীতের কারণে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়, তদুপরি খাওয়া দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রী ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। –[মাযহারী]

এই জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায় : একদিন বিপক্ষ কাফেররা স্থির করলো যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোনো প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নামাজ পড়ার পর্যন্ত সুযোগ পাননি। সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত নামাজ একই সাথে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া : যখন দুঃখ যন্ত্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তখন নবীজী ﷺ সম্মিলিত কাফের বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাতহের ভিতরে সোম, মঙ্গল ও বুধ একাধারে এই তিনদিন বিরামহীনভাবে দোয়া করতে থাকেন। তৃতীয় দিন জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে সাহাবায়ে কেরামের নিকটে তশরিফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, এরপর থেকে কোনো মুসলমানের কোনো প্রকারের কষ্ট হয়নি। –[মাযহারী]

সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনা : গাতফান গোত্র ছিল শত্রুপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কুদরতে এ গোত্রভুক্ত 'নুয়াইম ইবনে মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তরে ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হুজুর ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি। এখন আমাকে মেহেরবানি করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খেদমত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তুমি একা মানুষ এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই করো। নুয়াইম (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভালো বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হুজুর ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন।

বনূ কুরায়জার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন, হে বনূ কুরায়জা! তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু। তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) বনূ কুরায়জার নেতৃবৃন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সূরে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের গাতফান গোত্র হোক বা অন্যান্য ইহুদি গোত্র হোক এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ অংশগ্রহণ কর পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে জিম্মি হিসেবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না, যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তার এ পরামর্শ বনূ কুরায়জার বেশ মনঃপূত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) কুরাইশ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম, আপনাদের একান্ত সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনূ কুরায়জা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তারা মুহাম্মদ ﷺ -কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাকে হত্যা করবেন, অতঃপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। মুহাম্মদ ﷺ তাদের এ প্রস্তাব তাদের নিকট সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছেন। এখন আপনাদের ব্যাপার নিজেরা ভালোভাবে ভেবে চিন্তে দেখুন।

অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদেরকেও এ সংবাদই শোনালেন : এর সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ান কুরাইশদের পক্ষ থেকে ওয়ারাকা ইবনে গাতফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কুরায়জার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে। আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত উত্তরে বনূ কুরায়জা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে জিম্মি হিসেবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরিমা ও ওয়ারাকা এ সংবাদ আবূ সুয়িানের নিকট পৌছালে পর গাতফান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইব ইবনে মাসুদ (রা.)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বনূ কুরায়জার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোনো লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা হবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের উপর বনূ কুরায়জার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হলো। এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাবুগুলো ভূলুণ্ঠিত করে দিল, চুলোর হাঁড়ি পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তদীয় ফেরেশতা মণ্ডলীকে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে– فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো পথ ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা : অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে হযরত নুয়াইম (রা.) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শত্রু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলির সংবাদ পৌছলে পর তিনি নিজেদের কোনো লোক পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলামনগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রাত্রিকালে সাহাবায়ে কেরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শত্রুর মোকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, শত্রু পক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সমাবেশ– কিন্তু অবস্থা এমন অপারগ করে রেখেছিল যে, কেউ দাড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রাসূল ﷺ নামাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামাজে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, শত্রু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি? প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, এবার গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেউ দাঁড়ালেননা। হুজুর ﷺ আবার নামাজে দাঁড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য সকলের মতোই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তার হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন, শত্রু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। অতঃপর তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। যুদ্ধে অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোনো গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শত্রু সৈন্যদের মাঝে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাবু উৎপাটিত হয়ে গেছে, হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে। আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করবে না। আবূ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু হুজুর ﷺ -এর ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। আবূ সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। নিথর স্তিব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোনো গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুশিয়ারী প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়, যাতে বহিরাগত কোনো লোক আমাদের পরামর্শ শুনতে না পায়।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, এখন আমি প্রমাদ গুণতে লাগলাম যে, যদি আমার সম্মুখবর্তী লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তবে হয়তো আমি ধরা পড়ে যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের সম্মুখস্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক সে হাওয়াযিন গোত্রের লোক ছিল। আল্লাহ তা'আলা এভাবে হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবূ সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজস্ব লোকদেরই অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলি, বনূ কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি বিবৃত করে বললেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চলছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং সবাই ফিরে চলল।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা করলাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোনো গরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। ফিরে গিয়ে হুজুর ﷺ -কে নামাজরত দেখতে পেলাম। সালাম ফেরানোর পর আমি তার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেসে ফেললেন। এমনকি রাতের আঁধারেও তাঁর দাঁতগুলো চমকে উঠছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন قُمْ يَا نَوْمَانُ "হে ঘুমকাতুর উঠ"!

আগামীতে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার সুসংবাদ : বুখারী শরীফে হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান (بُخَارِىْ) اَلْآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহসী হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো। এরূপ ইরশাদ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সহ মদীনায় ফিরে আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তারা নিরস্ত্র হন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : হযরত হুযায়ফা (রা.) সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ। নানাবিধ উপদেশাবলি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশ কিছুসংখ্যক মোজেজা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনূ কুরায়জার যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় পৌঁছার পর পরই হঠাৎ করে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত দাহইয়ায়ে কালবী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করে তশরিফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন, ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে বনী কুরায়জার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী ﷺ -কে প্রেরণ করেন যে, لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ অর্থাৎ কোরায়জা গোত্রে না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামাজ না পড়ে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কুরায়জা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম নবীজী ﷺ -এর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আছরের নামাজ আদায় করলেন না; বরং নির্দিষ্ট স্থল বনূ কুরায়জা পর্যন্ত পৌঁছে আদায় করলেন। আবার কতক সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুজুর ﷺ -এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনূ কুরায়জায় পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামাজ আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌঁছে যাই তবে হুজুর ﷺ -এর হুকুম অমান্য করা হবে না। তাই তারা আসরের নামাজ যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোনো পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎসনা পাওয়ার যোগ্য নন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোনো পক্ষকেও তর্ৎসনা করেননি। উভয় পক্ষই সঠিক পন্থি বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যারা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা রয়েছে তাদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনোটাই ভ্রান্ত ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

বনূ কুরায়জার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন। বনূ কুরায়জা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দূর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়জা গোত্রপতি কা'বের বক্তৃতা : কুরায়াজা গোত্রপতি কা'ব যে নবীজী ﷺ -এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে–

১. তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি ﷺ সত্য নবী যা তোমরাও জান এবং তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন প্রাণ ও সন্তান সন্তুতিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও শান্তিময় হবে।

২. অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।

৩. তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সেদিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গোত্রপতি কা'বের এ বক্তৃতার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাব অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা আমরা তাওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে আমরা তাদেরকে হত্যা করব। অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হলো এটা স্বয়ং তাওরাতের হুকুম ও আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থি। তাই এটাও আমরা করতে পারি না।

অতঃপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই রাযি থকবো। আনসারদের মধ্যে যারা আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন, তারা প্রাচীনকাল থেকেই বনূ কুরায়জার সাথে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোত্রভুক্ত সাহাবায়ে কেরাম হুজুর ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে রাজি আছ কি না? তারা এতে রাজি হয়ে গেলে পর নবীজী ﷺ বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সা'আদ ইবনে মুআজ এর নিকট আমি এই মীমাংসার ভার ন্যাস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ ইবনে মুআজ (রা.) বিশেষভাবে ক্ষত বিক্ষত হন। তার সেবা যত্নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাবু টানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ মুতাবিক বনূ কুরায়জাভুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হযরত সা'আদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিতর পরেই হযরত সা'আদ (রা.)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো এবং এর ফলেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তার তিনটি দোয়াই কবুল করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুরাইশ আর যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর আক্রমণ করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয় বনূ কুরায়জা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন পেয়ে যায় যা আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদী মৃত্যুবরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাজী (রা.)-ও এঁদের অন্যতম। হযরত যুবায়ের ইবনে বাতাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিকটে দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাঁকে হত্যা না করে তার মাথার চুল কেটে মুক্ত করে দেয়।

অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দুটি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণ : হযরত সাবেত ইবনে কায়েস যুবায়ের ইবনে বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলে তারই প্রতিদান হিসেবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যুবায়ের বলল, সম্ভ্রান্তজন অপর সম্ভ্রান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে ব্যক্তির পরিবার পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? একথা শুনে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) হুজুর ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। যুবায়ের আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোনো মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত ইবনে কায়েস পুনরায় হযরত নবী কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মুমিনের শালীনতা ও কৃতজ্ঞতা বোধের উদাহরণ হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতঃপর যখন যুবায়ের ইবনে বাতা স্বীয় পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হলো তখন সে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর নিকট ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হুকায়েক, কুরায়জা গোত্রপতি কা'ব ইবনে কুরায়জা ও আমর ইবনে কুরায়জার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা শুনে যুবায়ের ইবনে বাতা হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াষয় জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হযরত সাবেত (রা.) তাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তার পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে। -[কুরতুবী]

এটাই ছিল জনৈক কাফেরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ যে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। একজন মুমিন ও অপর কাফেরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারকরূপে বিদ্যমান থাকবে।

বনূ কুরায়জার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরিতে জিলকদ মাসের শেষে ও জিলহজ মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। -[কুরতুবী]

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : আহযাব [সম্মিলিত বাহিনী] ও বনূ কুরায়জার যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কুরআনেও এর সবিস্তারে বর্ণনা দু'রুকু ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট মোজেজাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। এখানে কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

১. এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয় যেমন মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য, বাঁচার আর কোনো উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছাবহির্ভূত ধারণাও কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

২. মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো- اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের এসব অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরির বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যত বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল তাদের দু'শ্রেণির বর্ণনা রয়েছে। প্রথম শ্রেণি যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগলো, যারা বলতে লাগলো يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসীগণ! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণি যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। যাদের অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ [অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজী ﷺ -এর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিতাবস্থায় রয়েছে।] কুরআন কারীম এদের ছলচাতুরী স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু মিথ্যা, আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়। اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি ও অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা, অতঃপর এদের করুণ ও মর্মন্তুদ পরণতির বর্ণনা রয়েছে।

অনুবাদ :

٢١. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا حَسَنَةٌ اِقْتِدَاءٌ بِهٖ فِى الْقِتَالِ وَالثَّبَاتِ فِىْ مَوَاطِنِهٖ لِمَنْ بَدَلٌ مِنْ لَكُمْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ يَخَافُهُ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ.

২১. তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অটল থাকার মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে اُسْوَةٌ শব্দটি হামযার মধ্যে যের ও পেশ উভয়ভাবে পড়া যায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য পক্ষান্তরে যারা এর ব্যতিক্রম তাদের জন্য নয়। এখানে لِمَنْ শব্দটি পূর্বের لَكُمْ থেকে بَدَلٌ।

٢٢. وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ لَا مِنَ الْكُفَّارِ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنَ الْاِبْتِلَاءِ وَالنَّصْرِ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز فِى الْوَعْدِ وَمَا زَادَهُمْ ذٰلِكَ اِلَّا اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا بِوَعْدِ اللّٰهِ وَتَسْلِيْمًا لِاَمْرِهٖ.

২২. যখন মুমিনরা কাফের শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদেরকে সাহায্য ও পরীক্ষার ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল ওয়াদাতে সত্য বলেছেন। এতে তাদের কিছুই বৃদ্ধি পেল না কিন্তু ঈমান। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি সত্যতা ও তার হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ।

٢٣. مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج مِنَ الثَّبَاتِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ مَاتَ اَوْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ ز ذٰلِكَ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا فِى الْعَهْدِ وَهُمْ بِخِلَافِ حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ.

২৩. মুমিনদের মধ্যে কতক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। রাসূলের সাথে যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকার মাধ্যমে তাদের কেউ কেউ তাদের নজর পূর্ণ করেছে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প পূর্ণ করার ক্ষেত্রে মোটেই পরিবর্তন করেনি। পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ ওয়াদা রক্ষা করেনি।

٢٤. لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ بِاَنْ يُّمِيْتَهُمْ عَلٰى نِفَاقِهِمْ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنْ شَاءَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا لِمَنْ تَابَ رَحِيْمًا بِهٖ.

২৪. এটা এজন্য যাতে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন তাদের মুনাফিকীর কারণে মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের প্রতি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

٢٥. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىْ الْاَحْزَابَ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط مُرَادَهُمْ مِنَ الظَّفَرِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط بِالرِّيْحِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَلٰى اِيْجَادِ مَا يُرِيْدُهُ عَزِيْزًا غَالِبًا عَلٰى اَمْرِهِ.

২৫. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে শত্রুবাহিনীকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ পায়নি তাদের উদ্দেশ্যে তথা মুমিনদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন হয়নি যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। বাতাস ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তার উদ্দেশ্যে অর্জনে শক্তিধর, তার হুকুম প্রতিষ্ঠায় পরাক্রমশালী।

٢٦. وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اَىْ قُرَيْظَةَ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ حُصُوْنِهِمْ جَمْعُ صِيْصِيَةٍ وَهُوَ مَا يَتَحَصَّنُ بِهِ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ الْخَوْفَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ مِنْهُمْ وَهُمُ الْمُقَاتِلَةُ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا مِنْهُمْ اَىْ الذَّرَارِىْ.

২৬. যে সমস্ত কিতাবী অর্থাৎ বনী কুরাইযা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন। صَيَاصِىْ শব্দটি صِيْصِيَةٍ -এর বহুবচন যার অর্থ– দুর্গ তথা ঐ নির্মাণ যার দরুণ হেফাজত করা হয়। এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যাকৃতদেরকে হত্যা করেছ এবং একদলকে বন্দীদেরকে বন্দী করেছ।

٢٧. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَئُوْهَا ط بَعْدُ وَهِىَ خَيْبَرُ اُخِذَتْ بَعْدَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا.

২৭. তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি, ধনসম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা অভিযান করনি। তাহলো খায়বরের ভূমি যা বনূ কুরাইযার পরে মুসলমানগণ দখল করে আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٨. يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَهُنَّ تِسْعٌ وَطَلَبْنَ مِنْهُ مِنْ زِيْنَةِ الدُّنْيَا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ اَىْ مُتْعَةَ الطَّلَاقِ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا اُطَلِّقْكُنَّ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ.

২৮. হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তারা নয়জন এবং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট পার্থিব সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। যা তার নিকট ছিল না। তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগের অর্থাৎ তালাকের মুতা দিয়ে ব্যবস্থা করে দেই। এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তালাক দিয়ে দেই।

٢٩. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ اَىِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ بِاِرَادَةِ الْاٰخِرَةِ اَجْرًا عَظِيْمًا اَىِ الْجَنَّةَ فَاخْتَرْنَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا .

২৯. পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ তাঁর রাসূল ও পরকাল জান্নাত কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তারা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

٣٠. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اَىْ بُيِّنَتْ اَوْ هِىَ بَيِّنَةٌ يُّضٰعَفْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفْ بِالتَّشْدِيْدِ وَفِىْ اُخْرٰى نُضَعِّفْ بِالنُّوْنِ مَعَهُ وَنَصْبِ الْعَذَابِ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط ضِعْفَىْ عَذَابِ غَيْرِهِنَّ اَىْ مِثْلَيْهِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا .

৩০. হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে مُبَيِّنَةٍ -এর মধ্যে ى তে যবরর ও যের উভয়ভাবে পড়া যাবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে অন্য নারীদের চেয়ে অর্থাৎ অন্যদের দ্বিগুণ। يُضٰعَفْ শব্দকে অন্য কেরাত মতে يُضَعَّفْ পড়া যাবে ও অন্য কেরাতে نُضَعِّفْ এবং اَلْعَذَابَ -এর মধ্যে যবর এর সাথে পড়বে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُسْوَةٌ : আমলের নমুনা اِسْمٌ মাসদার অর্থে। اَلْاِئْتِسَاءُ অনুসরণ করা। ব্যাখ্যাকার اِقْتِدَاءُ বৃদ্ধি করার দ্বারা ইঙ্গিত করেছে যে, اُسْوَةٌ ইসিমটি মাসদার অর্থে হয়েছে। যেমন قُدْوَةٌ যা اِقْتِدَاءٌ অর্থে হয়েছে। বলা হয় اِئْتَسٰى فُلَانٌ بِفُلَانٍ অর্থাৎ اِقْتَدٰى بِهِ

قَوْلُهُ فِى الْقِتَالِ وَالثَّبَاتِ : এই উভয় قَيْدٌ টি اِتِّفَاقِىٌّ -এর مَفْهُوْمُ مُخَالِفْ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো এই যে, আপনার জীবন চরিত সর্বাবস্থায় সর্বোত্তম আমলের নমুনা। চাই যুদ্ধরত অবস্থায় হোক অথবা নিরাপত্তার অবস্থায় হোক অথবা রণাঙ্গনে সুদৃঢ়পদ থাকার অবস্থায়ই হোক অথবা বীরত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্রেই হোক।

قَوْلُهُ فِىْ مَوَاطِنِهِ : অর্থাৎ مَوَاطِنِ تِبَالٌ ; কোনো আরেফ কতইনা সুন্দর বলেছেন–

وَخَصَّكَ بِالْهُدٰى فِىْ كُلِّ اَمْرٍ * فَلَسْتَ تَشَاءُ اِلَّا مَا يَشَاءُ .

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ لَكُمْ : অর্থাৎ لِمَنْ টা لَكُمْ হতে হরফে জারের পুনরাবৃত্তি সহ بَدَلُ الْبَعْضِ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ : আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ উদ্দেশ্য। এবং قَوْلُ رَسُوْلٍ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর বাণী– اِنَّ الْاَحْزَابَ سَائِرُوْنَ بَعْدَ تِسْعِ لَيَالٍ اَوْ عَشْرٍ এবং রাসূল ﷺ -এর বাণী سَيَشْتَدُّ الْاَمْرُ بِاِجْتِمَاعِ الْاَحْزَابِ عَلَيْكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ صَدَقَ اللّٰهُ : অর্থাৎ ظَهَرَ صِدْقُهُ

قَوْلُهُ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ : ইসমে যমীরের স্থানে اِسْمٌ ظَاهِرٌ নিয়েছেন।

প্রশ্ন. উপরে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এখানে যমীর নেওয়া অর্থাৎ صَدَقَا বলাই যথেষ্ট ছিল। তদুপরি اِسْمٌ ظَاهِرٌ নেওয়ার কি কারণ?

উত্তর. ১. আল্লাহর নামের ইজ্জত ও সম্মানের কারণে আল্লাহ তা'আলার নামকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যমীরের নেওয়ার সুরতে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের নাম একই শব্দে একত্রিত হয়ে যায়। কেননা উভয়ের জন্য দ্বিবচনের শব্দ صِدْقًا নেওয়া হয়, যা থেকে শিরকের গন্ধ পাওয়া যায়। তা ছাড়া রাসূল ﷺ উভয় নামকে একই শব্দে একত্রিত করতে বারণ করেছেন। যে খতীব مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى বলেছিল তাকে তিরস্কার করে রাসূল ﷺ বলেছিলেন بِئْسَ خَطِيْبُ الْقَوْمِ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

قَوْلُهٗ نَحْبَهٗ : نَحْبٌ অর্থ নজর। মান্নত, এটা দ্বারা মৃত্যু থেকে كِنَايَةٌ করা হয়ে থাকে। কেননা প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মানতের মতো মৃত্যুও আবশ্যক।

قَوْلُهٗ صِيْصِيَةٍ وَهُوَ مَا يُتَحَصَّنُ بِهٖ : অর্থাৎ যার দ্বারা হেফাজত করা হয় চাই তা দুর্গ হোক বা অন্য কোনো বস্তু যেমন শিং, মোরগের কাটা ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ : নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মুসলিম নারীদের ইসলামি অবস্থান বর্ণনা করার জন্য এটি كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَتَعَالَيْنَ : তোমরা এসো, এটা تَعَالٰى হতে اَمْرٌ-এর جَمْعُ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ -এর সীগাহ, যা سُكُوْنٌ -এর উপর مَبْنِىٌّ হয়েছে। এই বাক্যটি অধিক ব্যবহারের কারণে اِقْبَلْ [শোন] অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।

قَوْلُهٗ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ : আম কেরাতে এই উভয় সীগাহ جَزْمٌ -এর সাথে রয়েছে। مَجْزُوْمٌ হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত جَوَابُ شَرْطٍ হওয়ার কারণে مَجْزُوْمٌ হয়েছে। আর كُنْتُنَّ হলো شَرْطٌ এবং শর্ত ও جَوَابُ شَرْطٍ -এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, فَتَعَالَيْنَ জবাবে শর্ত এবং اُمَتِّعْكُنَّ জবাবে اَمْرٌ হবে।

قَوْلُهٗ مِنْكُنَّ : এখানে مِنْ টি بَيَانِيَّةٌ কেননা সমস্ত স্ত্রীগণই مُحْصَنَاتٌ এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের একটি দলের শানে অবতীর্ণ হয়। যাদের মধ্যে অনেকে কোনো অসুবিধার দরুন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি কিন্তু তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি সামনে আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তাহলে আমরা যুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে দিব। যেমন তাদের মধ্যে নজর বিন আনাস অন্যতম। পরিশেষে তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তার শানে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। আবার অনেকে প্রতীক্ষা করছে তাদের শানে বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ [তাফসীরে খাজেন]

اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বনূ কুরাইযার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বনূ কুরায়যার যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ছিল। এটা ৫ম হিজরির জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফজরের নামাজের পর ফিরে এসে সকল সাহাবীসহ নিজের হাতিয়ার খুলে রাখলেন। ঐদিন জোহরের সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি হুজুর ﷺ -কে পুনরায় অস্ত্র পরিধান করে বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ কুরাইযাকে তাদের দুর্গতে প্রায় ২৫ দিন বন্দী করে রাখলেন অতঃপর বিজয় বেশে তাদের দুর্গ দখল করে নিলেন।

-[সীরাতে মুস্তাফা থেকে সংক্ষেপিত]

শানে নুযূল : يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ নিম্নের ঘটনা উল্লেখ করেন। ১. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

২. বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ হাইয়্যান উল্লেখ করেছেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যার বিজয় এবং গনিমতের মাল বণ্টনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) ভাবলেন যে, মহানবী ﷺ হয়তো এসব গনিমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তারা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন যে, আপনি আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাজিল হয়। অতএব উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে নবীজী ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ যেন তাদের কোনো কথা ও কাজের দ্বারা হুজুর ﷺ -এর প্রতি দুঃখ যন্ত্রণা না পৌঁছে সে দিকে যখন তারা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন।

قَوْلُهُ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا : উক্ত আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা.) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তারা নবীজী ﷺ -এর বর্তমান দারিদ্র পীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাবরণ করে হয় তাঁর ﷺ সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে স্বসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে। তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আমার নিকট অধিকার প্রদানের আয়াত শুনালেন ও এ ব্যাপারে আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করতে বারণ করলেন। এবং এ আয়াত শোনার সাথে সাথে আমি বললাম যে, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। অতঃপর আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা.) কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো এবং তারা সবাই আমার মতো একই মত ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দ জেনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না যদিও আরবি ভাষায় فَاحِشَةٌ শব্দটি অশ্লীলতা, ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী পত্নীকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত নবীদের স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দের সাথে مُبَيِّنَةٌ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেননা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয়না; বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ -এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কষ্ট দেওয়া। -[জালালাইন]

অনুবাদ :

৩১. وَمَنْ يَّقْنُتْ يُطِعْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اَىْ مِثْلَىْ ثَوَابِ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ فِىْ تَعْمَلْ وَنُؤْتِهَا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا فِى الْجَنَّةِ زِيَادَةً

৩১. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব অর্থাৎ অন্য মহিলাদের ছওয়াবের দ্বিগুণ দেব এবং অন্য কেরাত মতে يَعْمَلْ ও يُؤْتِهَا পড়বে এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিজিক জান্নাতে অতিরিক্ত রিজিক প্রস্তুত রেখেছি।

৩২. يٰنِسَاءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ كَجَمَاعَةٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ اللّٰهَ فَاِنْ كُنَّ اَعْظَمُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ لِلرِّجَالِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ نِفَاقٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا مِنْ غَيْرِ خُضُوْعٍ .

৩২. হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো সাধারণ নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তোমরা বড় সম্মানী হবে অতএব তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি [নিফাক] রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা কোমল ব্যতীত সঙ্গত কথা বলবে।

৩৩. وَقَرْنَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنَ الْقَرَارِ وَاَصْلُهُ اِقْرِرْنَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مِنْ قَرِرْتُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا نُقِلَتْ حَرَكَةُ الرَّاءِ اِلَى الْقَافِ وَحُذِفَتْ مَعَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَلَا تَبَرَّجْنَ بِتَرْكِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنْ اَصْلِهِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى اَىْ مَا قَبْلَ الْاِسْلَامِ مِنْ اِظْهَارِ النِّسَاءِ مَحَاسِنَهُنَّ لِلرِّجَالِ وَالْاِظْهَارُ بَعْدَ الْاِسْلَامِ مَذْكُوْرٌ فِىْ اٰيَةِ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

৩৩. তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। [قَرْنَ শব্দটি ق-এর মধ্যে যবর ও যের অর্থাৎ قَرْنَ ও قِرْنَ উভয় ধরনের পড়া যাবে। এটা قَرَارٌ থেকে নির্গত; এটা মূলে اِقْرِرْنَ বা اِقْرَرْنَ [رَاءٌ-এর মধ্যে যবর ও যের দ্বারা] ছিল। رَاءٌ-এর হরকতকে তার পূর্বে ق-এর মধ্যে দিয়ে হামযাকে সহ رَاءٌ বিলুপ্ত করা হয়েছে।] মূর্খতা যুগের অনুরূপ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষদের জন্য নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। ইসলামের ধর্মমতে সৌন্দর্য প্রদর্শনের বিধান لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْاِثْمَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ اَىْ نِسَاءَ النَّبِىِّ وَيُطَهِّرَكُمْ مِنْهُ تَطْهِيْرًا ج

তোমরা নামাজ কায়েম করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ অর্থাৎ হে নবীপত্নীগণ আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা পাপসমূহ দূর করতে এবং তোমাদেরকে তা থেকে পূর্ণরূপ পূত পবিত্র রাখতে।

٣٤. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَالْحِكْمَةِ ط السُّنَّةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا بِاَوْلِيَائِهٖ خَبِيْرًا ـ بِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ .

৩৪. আল্লাহর আয়াত কুরআন ও জ্ঞানগর্ভ কথা হাদীস যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তার বন্ধুদের প্রতি সূক্ষ্মদর্শী, তার সমস্ত সৃষ্টের প্রতি খবর রাখেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ اِنْ : হলো হরফে শর্ত اِتَّقَيْتُنَّ হলো শর্ত مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে। جَوَابِ شَرْط উহ্য রয়েছে। যেমনটি শারেহ (র.) فَاَنْتُنَّ اَعْظَمُ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। কতিপয় মুফাসসির فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ -কে جَوَابِ شَرْط বলেছেন। অর্থাৎ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تُكَلِّمْنَ كَلَامًا لَيِّنًا خَاضِعًا مَعَ الرِّجَالِ كَكَلَامِ الْمُرِيْبَاتِ .

قَوْلُهٗ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ : ফার্সিতে এর অর্থ হলো ارا مر بگرید درخانہائے خویش অর্থাৎ স্বীয় ঘরে শান্তিতে অবস্থান কর। وَقَرْنَ -এর মধ্যে وَاوْ টি হলো عَاطِفَه আর قَرْنَ হলো اَمْر حَاضِرْ -এর جَمْع مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ মূলে ছিল اِقْرَرْنَ (رَاء বর্ণে যবরযুক্ত) বা اِقْرِرْنَ (رَاء বর্ণে যের যুক্ত) اِقْرَرْنَ -এর رَاء -এর হরকতকে قَافْ -এর উপর দিয়ে رَاء এবং هَمْزَه কে ফেলে দেওয়ার ফলে قَرْنَ গঠিত হয়েছে। অর্থ– তোমরা অবস্থান কর।

বায়যাবী, যমখশারী এবং নিশাপুরী লিখেছেন قَارَ يَقَارُ এটা خَافَ يَخَافُ -এর ওজনে হয়েছিল। অর্থাৎ তোমরা জমে বসে থাকো। কেউ কেউ وَاوْ কে মূল অক্ষর ধরে নিয়ে وَقَرَ يَقِرُ থেকে مُشْتَقْ বলেন। অর্থ– শান্তির সাথে অবস্থান করতে থাকো। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ) تَبَرَّجْنَ মূলে ছিল تَتَبَرَّجْنَ অর্থ–গর্ব অহঙ্কারের সাথে চলা। স্বীয় রূপ সৌন্দর্য পরপুরুষের জন্য ফুটিয়ে তোলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মোমিন জননীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণের পাশাপাশি তাঁদের উচ্চমর্যাদার ঘোষণাও ছিল। আর এ আয়াতে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا অর্থাৎ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে ও নেক আমল করবে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবো, আর তার জন্য আমি রেখেছি সম্মানজনক উপজীবিকা'।

এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ -এর জীবন সঙ্গীনীগণের বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন, যেন তাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাকওয়া পরহেজগারী ও অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের অন্তর সমূহকে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রাখেন এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির জন্যে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও প্রকাশ করা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে যে আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তাঁরা যেন দুনিয়া অথবা আখেরাত-এর যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে। তাঁরা দুনিয়ার স্থলে আখেরাতকেই বেছে নেয় এবং চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েও প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে। এজন্যে আল্লাহ পাক সরাসরি তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাঁর মহান বাণী প্রেরণ করেছেন, যেমন পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ الخ

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়ত : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে এমন দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (اَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتٌ) জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে ﷺ বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহকাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ দ্বারা এ বিশেষত্বই বোঝানো হয়েছে।

নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলি দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এর দ্বারা হযরত মরিয়ম (আ.) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফিরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া (আ.)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আযওয়াজে মুতাহহারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যদার কথা বলা হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায় নবী-পত্নী হিসাবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর দ্বারা সর্বদিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না- যা অনান্য কুরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থি। -[তাফসীরে মাযহারী]

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ এরপর اِنِ اتَّقَيْتُنَّ আল্লাহ পাক তাঁদের নবী-পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর পত্নী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাকওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।

-[তাফসীরে কুরতুবী]।

এরপর আযওয়াজে মুতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত : নারীদের পর্দা সম্পর্কিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন- এরপরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ অর্থাৎ এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বভাবিক। কিন্তু কোনো লোক খাঁটি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য; কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই [নিফাকের] শাখা বিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি ঈমান বিশিষ্ট লোক কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।- [তাফসীরে মাযহারী]

প্রথম হেদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ [illegible] পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোনো [illegible] উদ্রেক হতে পারবেই না; বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধর্মিণীগণের বিশেষ হেদায়েতসমূহের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন–যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন।

–[তাফসীরে তাবারানী-মাযহারী]

মাস'আলা : এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ শুনতে পায়, নারীদেরকে এমন উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাজের সময় ইমাম কোনো ভুল করলে মুকতাদিদের মৌখিকভাবে লুকমা দেওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদের মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত করবে মুখে কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় হেদায়েত : পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অন্ধযুগ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে–যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোনো অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় এই প্রকার নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত এ যুগের অজ্ঞতাই যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে [অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয়]। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجٌ শব্দের মূল অর্থ– প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে]। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য–গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরিয়তকাম্য আসল পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তর অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে– এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন সামনে সূরা আহযাবেরই وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় : قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। এর মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়; বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, এই সূরায়ে আহযাবেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোনো প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) অর্থাৎ "প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এতদ্ভিন্ন পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ ও ওমরার সময় হুজুর পাক ﷺ -এর সাথে তাঁর সহধর্মিণীগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল।

শুধু হুজুর পাক ﷺ -এর সাথেও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) ব্যতীত অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-ও কোনো আপত্তি তোলেন নি; বরং ফারুকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদের হজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা.) ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) -কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হুজুর ﷺ -এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহশের হজ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সাথে সহধর্মিণীগণকে হজ সমাপনান্তে ফেরার পথে বলেন هٰذِهٖ ثُمَّ لُزُوْمُ الْحُصُرِ -এখানে هٰذِهٖ দ্বারা হজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং حُصُرٌ - حَصِيْرٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ চাটাই। হাদীসের মর্ম এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই আঁকড়ে ধরবে-সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা.) ও যয়নাব (রা.) হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজের জন্যই বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েজ নেই। বাকি অন্য সহধর্মিণীগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েজ। অন্যথায় গৃহেই অবস্থান করা অবশ্যই কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কুরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ-ওমরাহও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো-অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের আসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য:

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুরআন পাকের ইঙ্গিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইজমা [সর্বসম্মত রায়] দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের আওতাবহির্ভূত হজ ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রা.) হজ উপলক্ষে মক্কায় তশরিফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নোমান বিন বশীর, হযরত কা'ব বিন আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা.) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌঁছেন।

কেননা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরিক হতে পারেননি; বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর খিদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলী (রা.)-কে পরিবেষ্টন করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু তিনি তাদের প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীন পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃঙ্খলা বিধান করতে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাবৃন্দ এ কথায় রাজি হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ তথায় যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খেদমতে আরজ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর শরিয়তী শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগাতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারি করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) একদিকে আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন যে, সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর মজলিস-সমূহে সশরীরে শরিক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোনো অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল মু'মিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ -অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি (হযরত আয়েশা সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্যে স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন (রা.)–হযরত কা'কার (রা.) নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মু'মিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনি খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর স্বীয় মুহরিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরার গমনকে কেন্দ্র করে "তিনি কুরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন" বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে তবে তার কোনো যৌক্তিকতা ও সারবত্ত আছে কি?

মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কোনো ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তাফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উষ্ট্র যুদ্ধের [জঙ্গে জামাল] সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র।

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব -কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থা সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুষ্মান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ গাফেল ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম সমেত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুষ্টকৃতকারীরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর সমীপে বিবৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা (রা.)-কে এ পরামর্শ দেন যে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই হল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা.)ও এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এঁরা বসরার সন্নিকটে পৌছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে হযরত কা'কা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে আরজ করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা.) বলেন أَيْ بُنَيَّ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস! মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কেও হযরত কা'কা (রা.)-এর আলোচনা সভায় ডেকে আনা হলো। হযরত কা'কা (রা.) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কা'কা (রা.)- তাঁদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, যে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হযরত কা'কা (রা.) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত যুবরায়ের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাতকারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপুত ছিল না। তাই তারা এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি [হযরত আয়েশা সিদ্দীকা] ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হলো। হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হলো, তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তুদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেল إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ; তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (رُوْحُ الْمَعَانِيْ)

মোটকথা দুষ্কৃতকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কূট-কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরাপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্তু ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তুদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা (রা.) -এর স্মরণ হলে তিনি এমন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.) ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। ফিতনা ও দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তাশরিফ নেন তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভালো হতো।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা.) যখন কুরআনের আয়াত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। ফলে তাঁর দোপাট্টা অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। [রূহুল মা'আনী]

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ [এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তাফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে সংগৃহত হয়েছে]

নবীজীর সহধর্মিণীগণের প্রতি কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েত :

وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ কর। দু'-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার, বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হলো সর্বমোট পাঁচ হেদায়েত যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচ হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য : উপরিউক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো মুসলিম নারী-পুরুষই নামাজ, জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা বহির্ভূত নয়। বাকি রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু-হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হুকুম। এখন কথা হলো এসব হেদায়েত বর্ণনার পূর্বেই কুরআনে পাকে বলা হয়েছে যে, لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ যদি তাকওয়া ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এদ্বারা বাহ্যত এ হেদায়েতসমূহ নবী-পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জওয়াব এই যে, এ নির্দিষ্টকরণ আহকামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন; বরং এঁদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের প্রতি ফরজ, এগুলোর প্রতি এঁদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ্ মহীয়ান গরিয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত।

قَوْلُهٗ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যদিও তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই এসব হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কলুষতা বিমুক্ত করে দেওয়া رِجْس শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় رِجْس প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আজাব অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় رِجْس প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আজাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থেই বোঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

আয়াতে আহলে বায়তের মর্ম কি? উপরিউক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহলে বায়তের (أَهْل بَيْت) অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ وَيُطَهِّرَكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে আহলে বায়ত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুকাতিল এ মতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহলে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ পেশ করেছেন [ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন] এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা.) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই নাজিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা [পুত্র-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ] করে বললে বলতেও প্রস্তুত আছি।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হুসায়নও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি থেকে বাইরে তশরিফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা.) এঁরা সবাই একের পর এক তশরিফ আনেন। নবীজী ﷺ এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ [অর্থাৎ হে আল্লাহ এরাই আমার আহলে বায়ত।

-[তাফসীরে ইবনে জারীর]

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলির মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। যারা একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাজিল হয়েছে এবং আহলে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অন্যান্যগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থি নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে বায়তের অন্তর্গত। কেননা এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মুতাবিক হযরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হুসায়ন (রা.) আহলে বায়তের অন্তর্গত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ শিরোনামে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى -তেও স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্রম করে পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ ও يُطَهِّرَكُمْ -এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا দ্বারা স্পষ্টত একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এসব হেদায়েতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আহলে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দেবেন। মোটকথা এখানে শরিয়তগত পবিত্র করণকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বুঝানো হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা একথা বুঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ এবং নবীগণ -এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপরই নয়। জন্মগত শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহলে বায়ত শব্দ কেবল রাসূলের সন্তান-সন্ততিদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এদের হেত থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত : উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিষ্কলুষতা বলে মন্তব্য করে আহলে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহযাব অধ্যায়ে রয়েছে, যাতে নিষ্কলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ী প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন, সাধারণ লোকের জন্য তা নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ : اٰيٰتِ اللّٰهِ অর্থ কুরআন আর حِكْمَةٌ অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নতও আদর্শ যেমন অধিকাংশ তাফসীরকার حِكْمَةٌ -এর তাফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اُذْكُرْنَ শব্দের দুটি ভাবার্থ হতে পারে (১) এসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রাখা যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কুরআন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে তাঁদের সামনে নাজিল হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া।

অনুবাদ :

٣٥. اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ الْمُطِيْعَاتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ فِى الْاِيْمَانِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْخٰشِعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ الْمُتَوَاضِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصّٰٓائِمِيْنَ وَالصّٰٓمِٕمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ عَنِ الْحَرَامِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً لِلْمَعَاصِىْ وَّاَجْرًا عَظِيْمًا عَلَى الطَّاعَاتِ.

৩৫. নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, ঈমানে সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজাপালনকারী পুরুষ, রোজাপালনকারী নারী, হারাম কর্ম থেকে যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ, ও জিকিরকারী নারী, আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন পাপসমূহ থেকে ক্ষমা ও আনুগত্যের উপর মহা পুরস্কার।

٣٦. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ تَكُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهُمُ الْخِيَرَةُ الْاِخْتِيَارُ مِنْ اَمْرِهِمْ خِلَافَ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ نَزَلَتْ فِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ وَاُخْتِهٖ زَيْنَبَ خَطَبَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَعَنٰى لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَكَرِهَا ذٰلِكَ حِيْنَ عَلِمَاهُ لِظَنِّهِمَا قَبْلُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَهَا لِنَفْسِهٖ ثُمَّ رَضِيَا لِلْاٰيَةِ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

৩৬. আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের পরিপন্থি ভিন্ন ক্ষমতা নেই আলোচ্য আয়াতটি আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ও তার বোন যয়নব -এর শানে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নব বিনতে জাহশকে যায়েদ বিন হারেসার নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান তখন তারা উভয়ে এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কেননা তারা প্রথমে মনে করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য প্রস্তাব দেন। অতঃপর উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর তারা সম্মতি দেন। এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ لِزَيْدٍ ثُمَّ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ حِيْنٍ فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ حُبُّهَا وَفِي نَفْسِ زَيْدٍ كَرَاهَتُهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُرِيْدُ فِرَاقَهَا فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى.

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যায়েদের সাথে যয়নবকে বিবাহ দেন। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত যয়নবের সাথে যায়েদের মনোমালিন্য দেখা দেয় ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যয়নবের মহব্বত সৃষ্টি হয় অতঃপর যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ রাখ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৭. وَإِذْ مَنْصُوْبٌ بِاذْكُرْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالْإِعْتَاقِ وَهُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ كَانَ مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ اِشْتَرَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ فِيْ أَمْرِ طَلَاقِهَا وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ مُظْهِرُهُ مِنْ مَحَبَّتِهَا وَأَنْ لَوْ فَارَقَهَا زَيْدٌ تَزَوَّجْتَهَا وَتَخْشَى النَّاسَ ج أَنْ يَقُوْلُوْا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ زَوْجَةَ ابْنِهِ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰهُ ط فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَتَزَوَّجُكَهَا وَلَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَيْدٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا حَاجَتَهُ زَوَّجْنٰكَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَقْضِيُّهُ مَفْعُوْلًا.

৩৭. আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, ইসলামের দ্বারা আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আজাদের মাধ্যমে এবং তিনি হলেন যায়েদ বিন হারেসা, তিনি জাহেলী যুগে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওতের পূর্বে তাকে ক্রয় করেন এবং মুক্তি দিয়ে নিজের পালকপুত্র হিসেবে সম্বোধন করেন তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, এখানে إِذْ শব্দটি উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের মাফঊল হিসেবে মানসূব তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং তালাকের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। তোমার অন্তরে যয়নবের মহব্বত ও যায়েদ তাকে তালাক দেওয়ার পর আপনি তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন এবং আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন, লোকেরা বলবে মুহাম্মদ ﷺ তার পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছে অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত প্রত্যেক বিষয়ে, অতএব তিনি তোমাকে তার সাথে বিবাহ দেবেন এবং এতে লোকনিন্দায় তোমার কোনো ক্ষতি নেই। অতঃপর যায়েদ তাকে তালাক দিলেন এবং যয়নব ইদ্দতের সময় পুরা করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে অনুমতি বিহীন [আকদ ও মহর ব্যতীত] বাসর রাত সম্পন্ন করলেন ও মুসলমানদেরকে রুটি ও গোস্ত দ্বারা ওলীমার দাওয়াত আপ্যায়ন করালেন যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।

٣٨. مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ أَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ ط سُنَّةَ اللّٰهِ أَيْ كَسُنَّةِ اللّٰهِ فَنُصِبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيْ ذٰلِكَ تَوْسِعَةً لَهُمْ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ فِعْلُهُ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا مَقْضِيًّا.

৩৮. আল্লাহ্ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ (হালাল) করেন, তাতে তার কোনো বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। (এখানে سُنَّةَ اللّٰهِ টি كَسُنَّةِ اللّٰهِ-এর অর্থে যা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ যেরদানকারী আমেলকে বিলুপ্ত করে এটাকে নসবের স্থলে রাখা হয়েছে এবং তাদের বিবাহের বিধান ব্যাপক হওয়ার জন্য এতে তাদের কোনো বাধা নেই এবং আল্লাহর নির্দেশ নির্ধারিত, অবধারিত।

٣٩. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ لِلَّذِيْنَ قَبْلَهُ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ط فَلَا يَخْشَوْنَ مَقَالَةَ النَّاسِ فِيْمَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَهُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا حَافِظًا لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ وَمُحَاسِبِهِمْ.

৩৯. সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাকে ভয় করতেন। اَلَّذِيْنَ শব্দটি তার صِلَه সহ মিলে পূর্বের اَلَّذِيْنَ-এর সিফত তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধকৃত বিষয়ে মানুষের নিন্দাকে ভয় করতেন না হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তার সৃষ্টের কর্মের হেফাজত কারী ও হিসাবকারী

٤٠. مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ فَلَيْسَ أَبَا زَيْدٍ أَيْ وَالِدَهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّزَوُّجُ بِزَوْجَتِهِ زَيْنَبَ وَلٰكِنْ كَانَ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط فَلَا يَكُوْنُ لَهُ ابْنٌ رَجُلٌ بَعْدَهُ يَكُوْنُ نَبِيًّا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ كَآلَةِ الْخَتْمِ أَيْ بِهِ خُتِمُوْا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا مِنْهُ بِأَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا نَزَلَ السَّيِّدُ عِيْسٰى يَحْكُمُ بِشَرِيْعَتِهِ.

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন তিনি যায়েদের পিতা নন অতএব তার জন্য যায়েদের স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ করা হারাম নয়; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। অতএব তার কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে নেই যাতে সে তার পরে নবী হয়। خَاتَمَ শব্দটি অন্য কেরাত মতে ت-এর মধ্যে যবর দ্বারা অর্থাৎ মোহর তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্বারা নবুয়তের ধারাবাহিকতা মোহর করা হয়েছে আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ জানেন তার পরে কোনো নবী আসবে না। যখন হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় আগমন করবেন তখন তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর শরিয়ত মুতাবেক ফয়সালা করবেন

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. اَلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ-এর আতফ হয়েছে اَلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-এর উপর অথচ শরিয়তের দৃষ্টি উভয়টি একই আর عَطْف -এর জন্য مُغَايَرَتْ জরুরি।

উত্তর. مَفْهُوْم-এর হিসেবে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা রাসূল ﷺ যা সহ প্রেরিত হয়েছেন সেগুলোকে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে شَهَادَتَيْن কে মুখে উচ্চারণ করার নাম হলো ইসলাম। আর ঈমান বলা হয় نُطْق بِاللِّسَانِ-এর শর্তের সাথে اِذْعَان قَلْبِىْ -এর নাম। আর عَطْف-এর জন্য اَدْنٰى مُغَايَرَتْ যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَالْحَافِظَاتِ : এর মাফউলকে পূর্বের দালালতের কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَالْحَافِظَاتِ فُرُوْجَهُنَّ

قَوْلُهُ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ : আল্লাহর নাম সম্মানার্থে এবং এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ -এর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা। কেননা রাসূল ﷺ নিজের পক্ষ হতে কোনো সমাধান দেন না।

قَوْلُهُ وَلِمُؤْمِنٍ : এটা كَانَ -এর خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে। এবং وَلَا مُؤْمِنَةٍ-এর উপর আতফ হয়েছে। اِذَا হলো ظَرْفِيَّه আর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। যার উপর نَفِى مُقَدَّمْ দালালত করতেছে اِذَا টা ظَرْفِيَّه مُتَضَمِّنْ بِمَعْنَى الشَّرْط-এর জন্য হতে পারে। এই সুরতে উহ্য اِسْتَقَرَّ -এর مَعْمُوْل হবে যার সাথে كَانَ -এর খবর টা مُتَعَلِّقْ হয়েছে। مُخَصَّصَة উহ্য ইবারত হবে وَمَاكَانَ مُسْتَقِرًّا لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَقْتَ قَضَاءِ اللّٰهِ كَوْنُ خِيَرَةٍ لَهُ فِىْ اَمْرِهٖ

قَوْلُهُ اَلْاِخْتِيَارُ : اَلْخِيَرَةُ-এর তাফসীর اَلْاِخْتِيَارُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَلْخِيَرَةُ টা غَيْر قِيَاسِىْ মাসদার হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَافَ اَمْرِ اللّٰهِ : এটা اَلْخِيَرَةُ -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَمْرِهِمْ : এটা اَلْخِيَرَةُ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ مَحَبَّتِهَا : এটা হলো مَا اَبْدَاهُ -এর বয়ান।

قَوْلُهُ سُنَّةَ اللّٰهِ : এটা মাসদার হওয়ার কারণে ও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ قَدَرًا مَقْدُوْرًا : مَقْدُوْرًا হলো قَدَرًا-এর تَاكِيْد যেমন- ظِلًّا ظَلِيْلًا এবং وَلَيْل اللَّيْل

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ : জমহুরের কেরাত কিন্তু تَخْفِيْف-এর সাথে আর উহ্য كَانَ-এর খবর হওয়ার কারণে رَسُوْلَ মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে উম্মাহাতুল মুমিনীনের সম্পর্কে বিশেষ সুসংবাদের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে সাধারণভাবে সুসংবাদ রয়েছে, সমস্ত মুসলিম নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে , আল্লাহ পাক তাদেরকে মাগফেরাত দান করবেন এবং তাদের জন্যে অনেক নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন।

শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর কোনো কোনো স্ত্রী তাঁর খেদমতে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! পবিত্র কুরআনে পুরুষদের সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা রয়েছে, কিন্তু নারীদের সম্পর্কে কি এমন কোনো ভালো কথা আছে? অথবা নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো কল্যাণ নেই। আমাদের আশঙ্কা হয়, হয়তো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমাদের কোনো ইবাদত কবুল হয় না', তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

তাবারানী এবং ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে যে, নারীদের একটি দল প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! পবিত্র কুরআনে ঈমানদার পুরুষদের কথা রয়েছে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তো কোনো কথা নেই; তখন এ আয়াত নাজিল হয়'।

ইবনে জারীর কাতাদার (র.) সূত্রেও একথা বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)-এর কথার বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারের হাজির হয়ে আরজ করলেন "পবিত্র কুরআনের সব কিছু পুরুষদের ব্যাপারেই লক্ষ্য করছি, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে ভালো কিছুর উল্লেখ নেই, এর কারণ অনুধাবন করতে পারছি না; তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) মোকাতেল (র.)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া এবং হযরত আসিয়া বিনতে কাব আনসারিয়া হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের প্রতিপালক [পবিত্র কুরআনে] পুরুষদের উল্লেখ করেন, কিন্তু নারীদের কোনো উল্লেখ থাকে না, আমরা আশঙ্কা করি যে নারীদের মধ্যে হয়তো কোনো কল্যাণ নেই', তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[মারেফুল কুরআন আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৫. পৃ. ৫০০]

কুরআনে পাক সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য : যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কুরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলির আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত সর্বত্র يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কুরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীলোকের নাম কুরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা- اِمْرَاَةُ نُوْحٍ ও اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোনো পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকেই সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর (মরিয়মের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কুরআন করীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এ মর্মে আরজ করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি- আল্লাহ পাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোনো প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। [পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত করেছেন] এবং তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে। আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎ কার্যাবলি, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের ই[illegible] যথা– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কুরআনে এর মধ্যে থেকে কোনো ইবাদত অধিক পরিমাণে কর[illegible] নির্দেশ নেই। কিন্তু কুরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহর জিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূর[illegible] আনফাল, সূরায়ে জুমু'আ এবং এই সূরায় وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ [অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ [illegible] স্মরণকারিণীগণ] বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, প্রথমত আল্লাহর জিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযর[illegible] মা'আজ বিন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগ[illegible] মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও ছওয়াবের অধিকারী কোন ব্যক্তি হবে? তিনি [রাসূলে কারীম ﷺ] বললেন, যে সবচেয়ে বে[illegible] আল্লাহর জিকির করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোজাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ বেশি করবে। এরূপভাবে নামাজ, জাকাত, হজ, সদকা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকি[illegible] করবে, সেই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে [ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন]।

দ্বিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (জিকির) সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরিয়তও কোনো শর্ত আরোপ করে[illegible] অজুসহ বা বিনা অজুতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহর জিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না, কোনো অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি [ধর্ম] ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি ফিরে আসার দোয়া, কোনো কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত দোয়া– প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোনো সময়েই আল্লাহ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোনো কাজ না করে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয় তবে পার্থিব কাজ দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ -এর শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতটি যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ের শানে নাজিল হয়। হযরত যায়েদ বিন হারেসা জন্মসূত্রে আরবী ছিলেন কিন্তু পাচারকারী দল তাকে বাল্য অবস্থায় অপহরণ করে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ বন্ধনের পূর্বে হযরত খাদীজার ভাতিজা হাজমি ইবনে হিজাম হযরত খাদীজার জন্য যায়েদকে ক্রয় করেন। হযরত খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহের পরে তিনি যায়েদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপহার দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আজাদ করে দিলেন ও নিজের পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। আরবের লোকেরা তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকত। কুরআনে কারীমে জাহেলী যুগের সে কুধারণাকে খণ্ডন করে বলেছে, اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ অর্থাৎ তোমরা পালকপুত্রকে তাদের প্রকৃত পিতার নামে ডাক। অতএব সাহাবায়ে কেরাম উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর যায়েদ ইবনে হারেছা নামে ডাকতে লাগলেন। যায়েদ যৌবনে পদার্পণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ফুফাতোবোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশকে (রা.) তার নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তার ভ্রাতা আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ হযরত যয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মোহর দশটি লাল দীনার [প্রায় চার তোলা স্বর্ণ] ও ষাট দেরহাম [প্রায় আঠারো তোলা রূপা] একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থলী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। অপরদিকে নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দিবেন অতঃপর যয়নব (রা.) হুজুর পাক ﷺ -এর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। যাতে আরববাসীর বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী পালকপুত্রের স্ত্রী বিবাহ করা হারাম হওয়ার কুধারণাটি রহিত হয়। সে প্রেক্ষিতেই ঘটনা তেমনিভাবে ঘটল। আল্লাহ তা'আলা সে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নাজিল করেন لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ الخ

قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا : সমগ্র কুরআনে নবীগণ ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ ইবনে হারেসার (রা.) নাম রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকারক এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরআনের নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ -এর সাথে তার পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ তার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখনই তিনি [রাসূলে কারীম] যায়েদ বিন হারেসাকে কোনো সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ, শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ : আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে (রা.) নবীজির সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা.)-কে তালাক দেওয়ার পর নবীজির সাথে তার বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তার প্রতি পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করতো। এ ভ্রান্তি ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রাসূলুল্লাহ নন; বরং তার পিতা হারেসা (রা.) কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকিদ দিয়ে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোনো পুরুষ নেই তার প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তি সঙ্গত হতে পারে যে, তার পুত্রবধু রয়েছে।

বিয়ে শাদীতে কুফূ বা সমতা রক্ষা করা জরুরি : বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, পরস্পর কলহ বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরিয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উভয়পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকার কারণে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ (রা.) প্রথমে যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে যয়নবের বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। যে অসম্মতির কারণ সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত। বিয়ে শাদীতে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ বলেন, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে করা সঙ্গত নয়। লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অন্যান্য অবিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আসারে লিখেন যে, হযরত ফারুকে আযম (রা.) বলেন, আমি এ মাসে ফরমান জারি করে দেব যেন, কোনো সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেওয়া না হয়। তেমনিভাবে হযরত আয়েশা ও আনাস (রা.)-এর প্রতি বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন, যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অতএব বিয়ে শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা শরিয়তের বিশেষভাবে কাম্য যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মান-মর্যাদার মূল ভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্ম পরায়ণতা। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে বিয়ে শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলির উত্তরের সূচনা : سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্যে নিহিত ছিল? ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ -এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) -এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ

-এর বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়েসহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাকওয়া পরহিজগারীর পরিপন্থিও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এসব কিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী (আ.)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আ.) সবাই আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ় তত্ত্ব : সম্ভবত এতে নবীগণ (আ.)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এঁদের (আ.) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌঁছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহী নাজিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী ﷺ যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোনো কাজ করেছেন এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল। পৌঁছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতামুক্ত নয়। তাই নবীগণ (আ.)-এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপরেখা সাধারণত উম্মত পর্যন্ত পৌঁছা সহজতর হবে।

নবীগণ (আ.)-এর যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ এসব মহাত্মা আল্লাহ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোনো কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোনো পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে যখন সমগ্র নবীরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে تَخْشَى النَّاسَ [অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন]– এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ (আ.)-এর আল্লাহ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা এটা কেবল রিসালত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তাবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব কাজ। তাবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তাবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত অদ্যাবধি ও এ সম্পর্কেও বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

অনুবাদ :

٤١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ

৪১. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

٤٢. وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهُ ـ

৪২. এবং তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সকাল ও বিকালে দিনের প্রথম ও শেষ প্রান্তে তথা সব সময়।

٤٣. هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ اَيْ يَرْحَمُكُمْ وَمَلٰئِكَتُهُ اَيْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُدِيْمَ اِخْرَاجَهُ اِيَّاكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اَيِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ ط اَيِ الْاِيْمَانِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ـ

৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন তোমাদেরকে অন্ধকার কুফর থেকে আলোর ঈমানের দিকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٤٤. تَحِيَّتُهُمْ مِنْهُ تَعَالٰى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ ج بِلِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ ـ

৪৪. যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অভিবাদন হবে ফেরেশতাদের শ্লোগানে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন।

٤٥. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ اُرْسِلْتَ اِلَيْهِمْ وَمُبَشِّرًا مَنْ صَدَّقَكَ بِالْجَنَّةِ وَّنَذِيْرًا لا مُنْذِرًا مِنْ كَذَّبَكَ بِالنَّارِ ـ

৪৫. হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী উম্মতের উপর সু-সংবাদ দাতা জান্নাতের আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর এবং আপনার মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি।

٤٦. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ اِلٰى طَاعَتِهٖ بِاِذْنِهٖ بِاَمْرِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا اَيْ مِثْلَهُ فِي الْاِهْتِدَاءِ بِهٖ

৪৬. এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে তার আনুগত্যের দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং হেদায়েতের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় প্রেরণ করেছি।

٤٧. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا هُوَ الْجَنَّةُ ـ

৪৭. আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ জান্নাত রয়েছে।

٤٨. وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ فِيْمَا يُخَالِفُ شَرِيْعَتَكَ وَدَعْ اُتْرُكْ اَذٰهُمْ لَا تُجَازِهِمْ عَلَيْهِ اِلٰى اَنْ تُؤْمَرَ فِيْهِمْ بِاَمْرٍ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط فَهُوَ كَافِيْكَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا مُفَوَّضًا اِلَيْهِ ـ

৪৮. আপনি শরিয়তের পরিপন্থি বিষয়ে কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতনের কোনো প্রতিশোধ নিবেন না যতক্ষণ আল্লাহর কোনো আদেশ না হয় ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন কেননা তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট।

৪৯. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تُمَاسُّوْهُنَّ أَيْ تُجَامِعُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا تُحْصُوْنَهَا بِالْأَقْرَاءِ أَوْ غَيْرِهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ أَعْطُوْهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ أَيْ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُنَّ أَصْدِقَةٌ وَإِلَّا فَلَهُنَّ نِصْفُ الْمُسَمّٰى فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا خَلُّوْا سَبِيْلَهُنَّ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ .

৪৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও অন্য ক্বেরাত মতে تَمَسُّوْهُنَّ শব্দটি تُمَاسُّوْهُنَّ পড়বে তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। ইদ্দত মাসিক ঋতুস্রাব বা অন্যান্য পদ্ধতিতে তোমরা গণনা কর অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে সামান্য সম্পদ যা দিয়ে তারা উপকৃত হয়। অর্থাৎ এটা যখন আক্বদের সময় মোহরানা ধার্য না হয়। নতুবা অর্ধেক মোহর দেবে। এটাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়া এবং ইওমাম শাফেয়ী তা গ্রহণ করেছেন এবং উত্তম পন্থায় কোনো কষ্ট দেওয়া ব্যতীত বিদায় দেবে।

৫০. يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِيْ أٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالسَّبْيِ كَصَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَّةَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْنَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ز يَطْلُبُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ .

৫০. হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে কাফেরদের মধ্যে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন যেমন সাফিয়্যাহ ও জুয়াইরিয়াহ এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি মামাতো ভগ্নি, ও খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। পক্ষান্তরে যারা হিজরত করেনি তারা বৈধ নয় কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে মোহরানা ব্যতীত বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা মোহরানা ব্যতীত হেবার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করা বিশেষ করে আপনারই জন্য বৈধ, অন্য মুমিনদের জন্য বৈধ নয়।

قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ اَىْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ مِنَ الْاَحْكَامِ بِاَنْ لَا يَزِيْدُوْا عَلٰى اَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَلَا يَتَزَوَّجُوْا اِلَّا بِوَلِيِّ وَشُهُوْدٍ وَمَهْرٍ وَ فِىْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ مِنَ الْاِمَاءِ بِشِرَاءٍ اَوْ غَيْرِهٖ بِاَنْ تَكُوْنَ الْاَمَةُ مِمَّنْ تَحِلُّ لِمَالِكِهَا كَالْكِتَابِيَةِ بِخِلَافِ الْمَجُوْسِيَّةِ وَالْوَثْنِيَةِ وَاَنْ تَسْتَبْرَأَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِكَيْلَا مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَ ذٰلِكَ يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط ضِيْقٌ فِى النِّكَاحِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا فِيْمَا يَعْسِرُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ رَّحِيْمًا بِالتَّوْسُعَةِ فِىْ ذٰلِكَ

আমি মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে তাদের উপর মুমিনদের উপর যা আহকাম নির্ধারিত করেছি যেমন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে একত্রে চারের অধিক স্ত্রী না রাখা ও মোহর, অভিভাবক ও সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ না করা ও দাসীদের ক্ষেত্রে দাসী এমন হওয়া যা মালিকের জন্য বৈধ হয় যেমন কিতাবী আর মাজূসী ও মূর্তিপূজারী হালাল নয় এবং মালিক সহবাসের পূর্বে দাসীকে ইদ্দতের মাধ্যমে পরিষ্কার করা ইত্যাদি তা আমার জন্য আছে। যাতে বিবাহের ক্ষেত্রে আপনার অসুবিধা না হয়। لِكَيْلَا -এর সম্পর্ক পূর্বের اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ -এর সাথে আল্লাহ এ বিষয়ে যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর ক্ষমাশীল, এটাতে ব্যাপক সুবিধা দেওয়া হিসেবে দয়ালু।

٥١. تُرْجِىْ بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ بَدْلَهٗ تُؤَخِّرُ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ اَىْ اَزْوَاجِكَ عَنْ نَوْبَتِهَا وَتُـْٔوِىْٓ تَضُمُّ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ فَتَاتِيْهَا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ طَلَبْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ مِنَ الْقِسْمَةِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ط فِىْ طَلَبِهَا وَضَمِّهَا اِلَيْكَ خُيِّرَ فِىْ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ كَانَ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ذٰلِكَ التَّخْيِيْرُ اَدْنٰٓى اَقْرَبُ اِلٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ مَا ذُكِرَ الْمُخَيَّرُ فِيْهِ كُلُّهُنَّ تَاكِيْدٌ لِلْفَاعِلِ فِىْ يَرْضَيْنَ.

৫১. আপনি তাদের মধ্যে আপনার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সময় দেওয়া হিসেবে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। تُرْجِىْ শব্দটির শেষে ى ও ء উভয়ভাবে পড়া যাবে। অর্থ হলো তুমি দূরে রাখবে আপনি ভাগ দেওয়া হিসেবে যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে অতঃপর তাতে দূরে রাখা ও কামনা করা আপনার কোনো দোষ নেই। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর স্ত্রীদের অধিকার অংশ মতো আদায় করা ওয়াজিব ছিল অতঃপর তা হুজুরে পাক ﷺ -এর নিজের ইচ্ছাধীন করে দেওয়া হয় এতে উক্ত স্বাধীনতাতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা দুঃখ পাবেনা এবং আপনি আপনার ইচ্ছা স্বাধীন যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। كُلُّهُنَّ শব্দটি يَرْضَيْنَ ফেলের فَاعِلْ থেকে تَاكِيْد স্ত্রীদের বিষয়ে এবং কেউ কেউ এর প্রতি অধিক ভালোবাসার আকর্ষণে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط مِنْ اَمْرِ النِّسَاءِ وَالْمَيْلِ اِلٰى بَعْضِهِنَّ وَاِنَّمَا خَيَّرْنَاكَ فِيْهِنَّ تَيْسِيْرًا عَلَيْكَ فِىْ كُلِّ مَا اَرَدْتَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَلِيْمًا عَنْ عِقَابِهِمْ .

তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ জানেন। অর্থাৎ আপনার সুবিধার্থে স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনাকে ইচ্ছাধীন স্বাধীনতা দিয়েছি আল্লাহ তার মাখলুকের প্রতি সর্বজ্ঞ তাদের শাস্তির ব্যাপারে সহনশীল।

٥٢. لَا تَحِلُّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ بَعْدَ التِّسْعِ اللَّاتِىْ اخْتَرْنَكَ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِتَرْكِ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الْاَصْلِ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ بِاَنْ تُطَلِّقَهُنَّ اَوْ بَعْضَهُنَّ وَتَنْكِحَ بَدَلَ مَنْ طَلَّقْتَ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط مِنَ الْاِمَاءِ فَتَحِلُّ لَكَ وَقَدْ مَلَكَ بَعْدَهُنَّ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ وَوَلَدَتْ لَهُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَاتَ فِىْ حَيٰوتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا حَفِيْظًا .

৫২. আপনার জন্য এই নয় স্ত্রী যাদের ব্যাপারে আপনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তা ব্যতীত কোনো নারী হালাল নয়। لَا تَحِلُّ -এর মধ্যে ت ও ي উভয়ভাবে পড়া যাবে এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও অর্থাৎ তাদের সবাইকে তালাক দিয়ে বা কাউকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্যকে গ্রহণ করা হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে। تَبَدَّلَ মূলে تَتَبَدَّلَ ছিল একটি ت বিলোপ করা হয় তবে দাসীর ব্যাপারে ভিন্ন [অর্থাৎ দাসী তোমার জন্য হালাল, এপর তিনি মারিয়্যাহ কিবতীয়ার মালিকানা গ্রহণ করেন ও এটার ঔরসে ইবরাহীম জন্ম নেয় ও হুজুরের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ সর্ব বিষেয়র উপর সজাগ নজর রাখেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হয়েছে এবং জিকির ও তাসবীহ -এর নির্দেশের عِلَّتْ হয়েছে। অর্থাৎ যখন জিকির ও তাসবীহ -এর হুকুম দেওয়া হলো তখন প্রশ্ন উত্থিত হলো যে, জিকির এর তাসবীহ কেন করা হবে? তখন উত্তর দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু তিনি তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

قَوْلُهُ اَنْ يَرْحَمَكُمْ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো একথা বর্ণনা করা যে, صَلٰوة-এর নিসবত যখন আল্লাহর দিকে হয় তখন রহমত নাজিল হওয়া উদ্দেশ্য হয়।

قَوْلُهُ مَلَائِكَتُهُ : এর আতফ হয়েছে يُصَلِّىْ -এর উহ্য যমীরের উপর কিন্তু এখানে এই اِعْتِرَاضْ হবে যে, ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ-এর উপর عَطْف করার জন্য ضَمِيْر مُنْفَصِلْ দ্বারা تَاكِيد নেওয়া জরুরি হয়। যা এখানে হয়নি।

উত্তর. উত্তর হচ্ছে এই যে, যেহেতু عَلَيْكُمْ -এর فَاصِلْ বিদ্যমান রয়েছে এ কারণে যমীরের মাধ্যমে تَاكِيْد নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আর مَلَائِكَتُهُ -এর পরে يَسْتَغْفِرُوْنَ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো এই যে, صَلٰوة-এর নিসবত যখন ফেরেশতার দিকে হয় তখন উদ্দেশ্য হয় اِسْتِغْفَارْ তথা ক্ষমা প্রার্থনা।

قَوْلُهُ لِيُخْرِجَكُمْ : এর তাফসীর لِيُدِيْمَ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া :

প্রশ্ন. ঈমানদারদের কুফরের অন্ধকার হতে বের হওয়া نَفْسِ إِيْمَانْ দ্বারাই প্রমাণিত। এরপর পুনরায় বের করার কি উদ্দেশ্য? এটা তো تَحْصِيْلِ حَاصِلْ হয়ে গেল।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো একথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, خُرُوْجْ দ্বারা دَوَامْ এবং إِسْتِقْرَارْ উদ্দেশ্য। কেননা যখন খালেক থেকে গাফলত অধিক হয়ে যায় তখন ঈমান থেকে বের হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

প্রশ্ন. اَلظُّلُمَاتُ কে বহুবচন এবং اَلنُّوْرُ কে একবচন নেওয়ার কি কি কারণ?

উত্তর. কুফরের প্রকার যেহেতু বিভিন্ন হয়ে থাকে যার কারণে তার ظُلُمَاتٌও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর ঈমান যেহেতু شَئٌ وَاحِدٌ এতে تَعَدُّدْ হয়ে না, যারা تَعَدُّدْ-এর প্রবক্তা তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বহির্ভূত।

قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ : بِإِذْنِهِ এর তাফসীর بِأَمْرِهِ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন. আনুমতি তো إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا দ্বারাই বুঝা যায় এরপর পুনরায় অনুমতির কি প্রয়োজন?

উত্তর. এখানে إِذْنٌ দ্বারা أَمْرٌ (হুকুম) উদ্দেশ্য। আর إِذْنٌ এবং أَمْرٌ -এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ دَعْ أَذَاهُمْ : إِضَافَتُ مَصْدَرٍ إِلَى الْفَاعِلِ-এর অন্তর্ভুক্ত। উহ্য ইবারত হলো دَعْ أَذِيَّتَهُمْ إِيَّاكَ অর্থাৎ আপনি তাদের কষ্ট দেওয়াকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। তাদের থেকে তাদের কষ্ট দেওয়ার প্রতিশোধ নেবেন না। অথবা এরপর এটা إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُوْلِ-এর অন্তর্গত অর্থাৎ أُتْرُكْ أَذِيَّتَكَ لَهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ত্বরা করবেন না। যতক্ষণ না আপনি অনুমতি পেয়ে যান। সুতরাং যুদ্ধের আয়াতের মাধ্যমে অনুমতি পেয়ে গেছেন। এবং ক্ষমা করার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ : مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ-এর উদাহরণে মুফাসসির (র.) সফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব এবং জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ আল খুযাইয়াহ কে উপস্থান করেছেন। এর চাহিদা হলো مَلَكَتْ-এর আতফ آتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ-এর উপর হবে। তবে এটা জাহিরের খেলাফ। জাহির হলো এর আতফ أَزْوَاجَكَ-এর উপর হবে। তবে এই সুরতে مَامَلَكَتْ-এর উপমাতে সফিয়া এবং জুয়াইরিয়াকে উপস্থাপন করা বৈধ নয়। কেননা এরা مَلَكَتْ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা হলেন পুণ্যবতী রমণীগণের অন্তর্ভুক্ত। সফিয়া এবং জুয়াইরিয়ার পরিবর্তে মারিয়া কিবতিয়া এবং রায়হানাকে উপস্থাপন করা উচিত। যেহেতু এরা দু'জন রাসূল ﷺ -এর বাদী ছিলেন।

قَوْلُهُ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ : مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ হলো مَامَلَكَتْ-এর কারণ مَامَلَكَتْ টা قَيْدِ إِحْتِرَازِىْ নয়; বরং تَغْلِيْبِىْ যেহেতু তাঁর অধিকাংশ বাদী গনিমতের সম্পদের মাধ্যমে তিনি পেয়েছিলেন− এই জন্য مَامَلَكَتْ-এর قَيْد লাগানো হয়েছে। অন্যথায় ক্রয়কৃত বাদীরও সেই বিধান যে বিধান গনিমতের মাধ্যমে অর্জিত বাদীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ হালাল হওয়া।

قَوْلُهُ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً : এর আতফ ও أَحْلَلْنَا لَكَ-এর مَفْعُوْل তথা أَزْوَاجَكَ-এ উপর হয়েছে। উদ্দেশ্যে হলো আপনার জন্য মুমিন নারী বৈধ, কাফেরাহ নারী নয়।

قَوْلُه إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ : এটা وَهَبَتْ نَفْسَهَا-এর শর্ত অর্থাৎ বিবাহ পূর্ণ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র নারীর নিজেকে দান করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তাঁর কবুল করাও শর্ত।

قَوْلُهُ خَالِصَةً لَّكَ : এখানে خَالِصَةً টা مَنْصُوْب হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে−

১. وَهَبَتْ-এর فَاعِلْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهَا خَالِصَةً لَكَ دُوْنَ غَيْرِكَ

২. اِمْرَأَةً থেকে حَالْ হওয়ার কারণে। উভয় সুরতে একই অর্থ হবে।

৩. উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ هِبَةً خَالِصَةً لَكَ دُوْنَ غَيْرِكَ

قَوْلُهُ لِكَيْلَا : এটা তার পূর্বের অর্থাৎ خَالِصَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ

قَوْلُهُ تُرْجِىْ : এটা إِرْجَاءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر-এর সীগাহ্। অর্থ– তুমি ঢিল দাও, তুমি বিলম্ব কর।

قَوْلُهُ تُؤْوِىْ : এটা إِيْوَاءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। অর্থ তুমি জায়গা দাও, তুমি সাথে রাখ, তুমি মিলিয়ে দাও।

قَوْلُهُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ : এখানে مَنْ হলো شَرْطِيَّه এটা اِبْتَغَيْتَ -এর مَفْعُول مُقَدَّمٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে فَلَا جُنَاحَ হলো جَوَاب شَرط আবার এটাও হতে পারে যে, مَنْ মওসূলাহ এবং মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ হলো মুবতাদার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ الخ :

আল্লাহর জিকির এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরজ এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ পাক জিকির ব্যতীত এমন কোনো ফরজই আরোপ করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামাজ, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক নামাজের রাকাত নির্দিষ্ট, রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ ও বিশেষস্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম ক্রিয়ার নাম। জাকাতও বছরে একবারই ফরজ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর জিকির এমন ইবাদত যার কোনো সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ানো বা বসার কোনো বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অজুসহ থাকারও কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর জিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে, সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই এটা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোনো কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা তা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু জিকরুল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোনো শর্ত আরোপ করেন নি। তাই তা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফজিলত-বরকতও অগণিত। ইমাম আহমদ (রা.) হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদাত বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটা কি বস্তু! কোন আমল? রাসূলুল্লাহ ফরমান ذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ পাকের জিকির।"–(ইবনে কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফরমান : আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি, যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ (اِبْن كَثِيْر) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার অধিক পরিমাণে তোমার জিকির করার এবং তোমার অসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।-[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর জিকিরের তাওফীক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলো যে, ইসলামের আমল সমূহ, ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংরক্ষিত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান- لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ. اِبْنُ كَثِيْرٍ) অর্থাৎ "তোমার কণ্ঠ সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।" -[মুসনদ আহমদ, ইবনে কাছীর]। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন। اُذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ. اِبْنُ كَثِيْرٍ) অর্থাৎ "তুমি আল্লাহর জিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।" -[মুসনাদে আহমদ, ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি এমন কোনো আসরে বসে যেখানে আল্লাহর জিকির নেই, তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।

-[আহমদ, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا : অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকিদ রয়েছে বলে আয়াতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহর জিকির কোনো বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ : অর্থাৎ "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় জিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহর নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে "صَلٰوة" শব্দটি আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে উহার অর্থ এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর "صَلٰوة" অর্থ তিনি রহমত নাজিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ তো নিজের তরফ থেকে কোনো কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁদের "صَلٰوة" অর্থ এই যে, তাঁরা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পক্ষে صَلٰوة অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া। صَلٰوة এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যারা عُمُوْمِ مُشْتَرَكْ তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে "صَلٰوة" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ বিধি অনুসারে عُمُوْمِ مُشْتَرَكْ যাদের নিকট বৈধ নয় তাদের মতে عُمُوْمِ مَجَازْ অর্থাৎ বিশেষ অর্থবোধক হিসেবে আলোচ্য সকল অর্থেই এটার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلَامٌ : এটা এই صَلٰوة এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্‌সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে। আবার কোনো কোনো মুফাসসির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল -মউত যখন কোনো মু'মিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তাঁর প্রতি এ সুসংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لِقَاء শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে। -[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

মাস'আলা : এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পাস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্‌সালামু আলাইকুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি গুণ ব করা হয়েছে। অর্থাৎ دَاعِي، نَذِير، مُبَشِّر، شَاهِدٌ إِلَى اللَّهِ، سِرَاج مُنِير অর্থ : তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য স প্রদান করবেন। যেমন সহীহ বুখারী, মুসলিমন নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়দাংশ হলো এই : কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন কি? তিনি আরজ করবেন যে, আমি যথার্থ পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি তাদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছিয়েছেন। অতঃ হযরত নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি? তিনি আরজ করবেন যে, মুহা ﷺ এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করা এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমার ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে সে সময় এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উম্মতের মুহাম্ম নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে শুনেছি, যার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাব রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরা এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-ম আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যায় অ রেওয়ায়েতে সপ্তাহে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলে মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের সাক্ষী স্থির করা হবে [সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনু মোবারক রেওয়ায়েত করেছেন।– [তাফসীরে মাযহারী]।

আর "مُبَشِّر" অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্যে থেকে সৎ ও শরিয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং "نَذِير" অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আজাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করবেন।

قَوْلُهُ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ : -এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ -কে بِإِذْنِهِ -এর সংঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য যা আল্লাহর অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سِرَاج অর্থ প্রদীপ مُنِير জ্যোতিষ্মান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سِرَاج مُنِير এর মর্মার্থ কুরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনে পাকের বর্ণনাধারা প্রকাশভঙ্গি দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, এটাও হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাসসির কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে-মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি রাসূলে কারীম তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক দিয়ে دَاعِيْ إِلَى اللهِ [আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। এর অভ্যন্তরীণ ভাবে হৃদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সামগ্র মুমিনের হৃদয় তাঁর অন্তর রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে-কেরাম যারা ইহজগতে নবী করীম ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। কেননা তাদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোনো মাধ্যমে ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে-কেরামের মাধ্যম পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্নবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরুদ পাঠ করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ যে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌঁছানো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কুরআনে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই গুণাবলি কুরআনের ন্যায় তাওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (র.) নকল করেছেন যে, হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা.) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসের (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানিপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর শপথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব গুণের বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, তা তাওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ أَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِى الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ لَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عَمْيَاءَ أٰذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا .

অর্থাৎ হে নবী ﷺ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম مُتَوَكِّلٌ [আল্লাহর উপর ভরসাকারী] রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী; বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।

قَوْلُهُ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুটি কয়েক অনন্যগুণাবলি এবং তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হুকুম : কোনো মহিলার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস (خِلْوَتْ صَحِيْحَة) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোনো কারণে তাকে তালাক দেওয়া হয়; তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম। শরিয়ত অনুমোদিত সহবাস (صُحْبَتْ حُكْمِىْ) যথার্থ নির্জন বাস (خِلْوَتْ صَحِيْحَة)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হুকুম : তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন প্রদানপূর্বক বিদায় করা মোস্তাহাব এবং কোনো কোনো অবস্থায় ওয়াজিব। যার বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে বাক্কারার আয়াত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে গেছে। এস্থলে কুরআনের বাক্যে مَتَاعٌ শব্দটি গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, 'মাতা' مَتَاعٌ শব্দটি অর্থগতভাবে অত্যন্ত ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোনো বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্যই প্রাপ্য(حُقُوقٌ) (وَاجِبَةٌ) মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি অদ্যাবধি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য যথা– তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া মোস্তাহাব। [মাবসূত, মুহীত, রূহ] এ প্রেক্ষিতে مَتِّعُوهُنَّ নির্দেশবাচক ক্রিয়া (صِيغَةُ أَمْرٍ) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বাহির্ভূত উভয় শ্রেণিই এর অন্তর্গত। –[রূহ] প্রতিযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে مَتَاعٌ প্রদান করা মোস্তাহাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস] خَلْوَتْ صَحِيحَةٌ হয়ে থাকে বা না থাকে, তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ : بَدَائِعُ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেয় مُتْعَةٌ ঐ পোশাক যা স্ত্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে– পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র শরীর আবৃত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভুক্ত আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক-শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা আপাদমস্তক আবৃত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে- ।] যেহেতু পোশাক উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণিরই হয়, সুতরাং ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হয় তবে উত্তম শ্রেণির পোশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্ন মানের, আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরিব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে [নাফাকাত نَفَقَاتٌ অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের (خَصَّافٌ) উক্তি]।

ইসলামে সদাচারের নজিরবিহীন শিক্ষা : গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শত্রুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকিদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিদ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে পুঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো [বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের] রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্বার্থ ভাবে নয়। অবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধ হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোনো এলাকায় কেবল তখনই পৌঁছে যখন সে এলাকা কোনো সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ যন্ত্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশ্রুতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশবলি প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তা থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক।

কিন্তু কুরআনে কারীম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি ফরজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকিদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচপত্র বহন স্বামীর উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ তাকিদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্বামীর প্রতি অধিক তাকিদ রয়েছে। এরই তৃতীয় হুকুম এই যে, سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর যাতে এরূপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন মৌখিকভাবে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোনো প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে।

বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে পারে, যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الخ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট খাটো শর্তাবলি রয়েছে, যা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন।

প্রথম হুকুম : اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে নবী করীম ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয়; বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবী করীম ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবী করীম ﷺ তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। নবী করীম ﷺ -এর স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম : وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ মালিকানাধীন যেসব নারী রয়েছে তাঁর জন্য তা হালাল। এ আয়াতে اَفَاۤءَ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فَيْءٌ ধাতু থেকে, পারিভাষিক অর্থে فَيْءٌ সে সব মালকে বুঝায় যা কাফেরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো فَيْءٌ শব্দ সাধারণ গনিমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোনো শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল যেসব দাসীই হালাল যা 'ফায়' (فَيْءٌ) বা গনিমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো স্বাতন্ত্র বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনিমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রুহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহীয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েজ নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে রোম সম্রাট মাকুকাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে নবী করীম ﷺ -এর পরে মহীয়সী স্ত্রীগণের কারো কারো সাথে বিয়ে জায়েজ ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

হযরত হাকীমুল উম্মত (র.) 'বয়ানুল কুরআনের' মাঝে আরো দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট

প্রথমত : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনিমতের মাল বন্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোনো জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা নবী করীম ﷺ বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় صَفِيُّ النَّبِيِّ [নবীজীর পছন্দ] বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বর যুদ্ধের গনিমত থেকে হুজুর ﷺ হযরত সাফিয়া (রা.)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা কেবল নবী করীম ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোনো হাদিয়া [উপঢৌকন] মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না; বরং শরিয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ -এর জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন- মারিয়া কিবতিয়ার (রা.) ঘটনা যাকে সম্রাট মাকুকাস হাদিয়া রূপে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করার পর তিনি নবী করীম ﷺ -এর মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

তৃতীয় হুকুম : (الآيَةَ) بِنَتِ عَمِّكَ وَبَنَتِ عَمَّتِكَ এ আয়াতে عَمٌّ ও خَالٌ একবচন এবং عَمَّاتٌ ও خَالَاتٌ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবি পরিভাষায় এরূপ আরবি কবিতাই এর প্রমাণ যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃবংশীয় সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য।

সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোনো শর্ত ছাড়াই হালাল হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল যারা তাঁর সাথে হিজরত করে। 'সাথে হিজরত' করার জন্য সফরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরি নয়; বরং যে কোনো প্রকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোনো কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রা.) বলেন, আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে 'তোলাকা' বলা হতো।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, জাসসাস]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরিউক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃবংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারে মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহর পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের বিবাহ করার বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের মক্কা থেকে হিজরত করতে হবে।

চতুর্থ বিধান : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ যদি কোনো মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে দেনমোহর ব্যতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

উপরিউক্ত বিধান যে একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোনো নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোনো পুরুষ বলে, দেন মোহর দেব না এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরিয়তের আইনে অসার হবে এবং 'মোহরে মিছাল' ওয়াজিব হবে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

জ্ঞাতব্য : উপরিউক্ত বিধান অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ দেনমোহর ব্যতিরেকে কোনো বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এই উক্তির সারকথা এই যে, তিনি কোনো মহিলাকে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তাফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হলো। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হতো। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান : আয়াতের مُؤْمِنَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়ার শর্ত। রাসূলে করীম ﷺ -এর উপরিউক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরজ করেছি, তা আমি জানি উদাহরণত সাধারণত মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদি নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহের জন্য জরুরি সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেওয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলো আপনার আত্মিক পেরেশানিও মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরও দুটি বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ বিধান : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ - تُرْجِي শব্দটি إِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- পেছনে রাখা এবং تُؤْوِي শব্দটি إِيْوَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে কম বেশি করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন,

ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থ তাই। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রীতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) বলেন, হাদীস থেকে একথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতঃপর ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قِسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, [অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন] কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না [অর্থাৎ আন্তরিক ভালোবাসা কারও প্রতি বেশি এবং কারও প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই]।

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পত্নীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোনো পত্নীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ওজর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময় تُؤْوِيْ اِلَيْكَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্ণাবস্থায় প্রত্যহ পত্নীগণের গৃহে গমন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পয়গম্বরগণ বিশেষত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হতো, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেসব কাজে 'আযীমত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা দানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীদের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হলো? এর জবাব হচ্ছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোনো পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য জরুরি নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহের সাথে কোনো না কোনো দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোনো সম্পর্ক রাখে না। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য চারের অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানি কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ : ইসলামের শত্রুরা সব সময় বহু বিবাহ বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করে ইস[illegible] তার [illegible] পেয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালতের বিপ[illegible] অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) [illegible] ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীরূপে আগমন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপরে নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে নি। তাঁকে জাদুকর বলেছে, উন্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখ থেকেও কোনো সময় এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আল্লাহভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে।

পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত সওদা (রা.) তাঁর স্ত্রীরূপে আসেন তিনিও বিধবা ছিলেন। মদিনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নববধূ বেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে আগমন করেন। এর এক বছর পর হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে খুযায়মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজরিতে সন্তানের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর অন্তঃপুরে আসেন। পঞ্চম হিজরিতে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্পর্কে সূরা আহযাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়ঃক্রম ছিল আটান্ন বছর। অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পত্নী তাঁর হেরেমে প্রবেশ করেন। পয়গম্বরের পারিবারিক জীবন আচার-আচরণের সাথে অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে। এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই যথেষ্ট যে, একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে তিনশ আটষট্টি টি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম "ই'লামুল মুকেয়ীন" গ্রন্থে লিখেন এগুলো একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কেরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শিষ্য ছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন।

অনেক পত্নীকে নবী কারীম ﷺ -এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রাসূলে করীম ﷺ -এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বহুবিবাহ কোনো মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল? এরূপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বেছে নেওয়া হলো? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ এবং শরিয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা নিসায় তৃতীয় আয়াতের তাফসীরে করা হয়েছে।

সপ্তম বিধান : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ অর্থাৎ অতঃপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীদের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দু'রকম তাফসীর হতে পারে- ১. সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। কতক সাহাবী ও তাফসীরবিদ থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন, সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর স্ত্রী ত্যাগ করা অথবা দুঃখ কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্নীত্বে থাকাকেই বেছে নেন। এরই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে।

২. অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তাফসীর مِنْ بَعْدِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যারা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হালাল রাখা হয়নি। অনুরূপভাবে مُؤْمِنَةً তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে। কেবল তাঁদের মধ্যে আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোনো নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকিদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি; বরং মু'মিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। অবশিষ্ট নারীগণকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতও এই দ্বিতীয় তাফসীর সমর্থন করে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

قَوْلُهُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ : আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েজ, কিন্তু এটা জায়েজ নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোনো বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তাফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোনো মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবে না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবে না।

٥٣. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ فِي الدُّخُوْلِ بِالدُّعَاءِ اِلٰى طَعَامٍ فَتَدْخُلُوْا غَيْرَ نٰظِرِيْنَ مُنْتَظِرِيْنَ اِنٰىهُ نَضْجَهُ مَصْدَرُ اَنٰى يَانِيْ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا تَمْكُثُوْا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط مِنْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ الْمَكْثُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ ز اَنْ يُّخْرِجَكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ط اَنْ يُّخْرِجَكُمْ اَيْ لَا يَتْرُكُ بَيَانَهُ وَقُرِئَ يَسْتَحِيْ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ اَيْ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط سَتْرٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط مِنَ الْخَوَاطِرِ الْمُرِيْبَةِ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِشَيْءٍ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ ذَنْبًا عَظِيْمًا .

অনুবাদ :

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা দাওয়াতবিহীন নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু যদি তোমাদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে খাওয়ার জন্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তোমরা আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে প্রবেশ কর اِنٰىهُ শব্দটি اَنٰى يَانِيْ -এর মাসদার তবে তোমরা আহূত হলে প্রবেশ কর অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো। একে অপরের সাথে কথা-বার্তায় মশগুল হয়োনা। দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করোনা নিশ্চয় এটা দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদেরকে বের করার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্যকথা তোমাদের বের করার কথা বলতে সংকোচ করেন না অর্থাৎ এর বর্ণনা তিনি বাদ দেননি يَسْتَحْيِيْ শব্দটি অন্য ক্বেরাত মতে يَسْتَحِيْ পড়বে তোমরা তাঁদের পত্নীগণের নবী পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে কোনো কু-ধারণা সৃষ্টি হওয়া থেকে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তার ওফাতের পর তার পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদরে জন্য কখনো বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

٥٤. اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ مِنْ نِكَاحِهِنَّ بَعْدَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ .

৫৪. তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ নবী করীম ﷺ -এর পরে তার পত্নীদের ব্যাপারে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ অতএব তিনি এর প্রতিদান দেবেন।

৫৫. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ اَىْ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ مِنَ الْاِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ اَنْ يَّرَوْهُنَّ وَيُكَلِّمُوْهُنَّ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط فِيْمَا اُمِرْتُنَّ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ .

৫৫. নবী কারীম ﷺ -এর পত্নীগণের জন্যে তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র সহধর্মিণী নারী অর্থাৎ মুমিন নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গুনাহ নেই। তারা তাদেরকে দেখবে ও তাদের সাথে কথা বলবে পর্দাবিহীন তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলিতে আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর কাছে কোনো জিনিস লুক্কায়িত নয়।

৫৬. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَىْ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ .

৫৬. আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দোয়া কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ বল

৫৭. اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَهُمُ الْكُفَّارُ يَصِفُوْنَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ مِنَ الْوَلَدِ وَالشَّرِيْكِ وَيُكَذِّبُوْنَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَبْعَدَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ذَا اِهَانَةٍ وَهُوَ النَّارُ .

৫৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় [কাফেরগণ তাঁরা আল্লাহকে বিশেষিত করে এমন গুণাবলির সাথে যা থেকে তিনি পবিত্র যেমন সন্তান হওয়া, অংশীদার হওয়া এবং তারা তাদের নবীকে অস্বীকার করেন আল্লাহ তাঁদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। রহমত থেকে দূরে রাখেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি জাহান্নাম।

৫৮. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا يَرْمُوْنَهُمْ بِغَيْرِ مَا عَمِلُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا تَحَمَّلُوْا كِذْبًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا .

৫৮. যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় অর্থাৎ তাদের প্রতি বিনা অপরাধে অপবাদ দেয়। তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ : এটা عُمُوْمِ اَحْوَال থেকে اِسْتِثْنَاء হয়েছে অর্থাৎ لَا تَدْخُلُوْهَا فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ إِلَّا حَالَ كَوْنِكُمْ مَاذُوْنًا لَكُمْ

قَوْلُهُ إِلٰى طَعَامٍ : يُؤْذَنَ টা يَدْعُوْنَ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে إِلٰى طَعَامٍ-এর تَعَلُّقْ হয়েছে يُؤْذَنَ-এর সাথে। ব্যাখ্যাকার بِالدُّعَاءِ-কে এ কারণে বৃদ্ধি করেছেন যে, يُؤْذَنَ টা يَدْعُوْنَ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যথায় يُؤْذَنَ-এর সেলাহ إِلٰى আসে না। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই আয়াত হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর অলিমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَاهُ : এটা أَنٰى يَأْنِىْ-এর মাসদার رَمٰى يَرْمِىْ ওযনে অর্থ পেকে যাওয়া, তৈরি হওয়া। (بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ) أَنِي এটা أَنٰى يَأْنِىْ (ض)-এর মাসদার অর্থ পাকা এবং সময় আসা أَنٰى মাসদার হলো يَسَاعِىْ আর أَنٰى মাসদার হলো قِيَاسِىْ হবে এটা শোনা যায় নি।

قَوْلُهُ فَانْتَشِرُوْا : এটা إِذَا طَعِمْتُمْ-এর جَوَابٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ : এর আতফ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ-এর উপর হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন। উহ্য حَالْ -এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ لَا تَدْخُلُوْهَا هَاجِمِيْنَ وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন مُسْتَأْنِسِيْنَ টা نَاظِرِيْنَ-এ উপর مَعْطُوْفْ হওয়ার কারণে مَجْرُوْرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَسْتَحْيِىْ : এর তাফসীর لَا يَتْرُكُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَسْتَحْيِىْ অর্থ হলো لَا يَتْرُكُ যা لَازِمْ অর্থ। কেননা حَيَا -এর নিসবত আল্লাহর দিকে বৈধ নয়।

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ : ذٰلِكُمْ-এর مَرْجِعْ হলো অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করা এবং কথা বার্তায় মন লাগিয়ে জমে বসে না থাকা। এবং পর্দার বাইর থেকে মাল সামানা না চাওয়া। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয় গুলো তুহমত এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা প্রতিহত করার জন্য খুবই উপকারী।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لَكُمْ : অর্থাৎ مَا صَحَّ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا ; اَنْ تُؤْذُوْا হলো كَانَ-এর ইসিম আর لَكُمْ হলো তাঁর খবর وَاَنْ تَنْكِحُوْا-এর আতফ كَانَ -এর ইসিমের উপর হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَرَوْهُنَّ وَيُكَلِّمُوْهُنَّ : এর বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে হলো এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যে, فِىْ اٰبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَائِهِنَّ الخ মুযাফ উহ্যের সাথে হয়েছে অর্থাৎ সে সকল লোকদের দেখা ও তাদের সাথে বাক্যালাপের মধ্যে কোনো গুনাহ নেই।

قَوْلُهُ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ : এর আতফ হয়েছে উহ্যের উপর অর্থাৎ امتثلن مَا اُمِرْتُنَّ بِهٖ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ

قَوْلُهُ صَلٰوةٌ : এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে- রহমত, দোয়া, সম্মান, প্রশংসা। এগুলো একই সময় উদ্দেশ্য নেওয়াকে عُمُوْمْ مُشْتَرَكْ বলা হয়। কতিপয়ের নিকট এখানে এটা জায়েজ নেই। এ কারণে এটা বলা হবে যে, শব্দের এই স্থানে একই অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁর সম্মান ও প্রশংসা। যখন এই অর্থ আল্লাহর দিকে مَنْسُوْبْ হবে তখন রহমত উদ্দেশ্যে হবে। আর ফেরেশতাদের দিকে নিসব হলে দোয়া ও ইস্তেগফার উদ্দেশ্য হবে। আর সাধারণ মুমিনের দিকে নিসব হলো দোয়া, প্রশংসা ও সম্মান সমষ্টিগতভাবে উদ্দেশ্য হবে। سَلَامٌ শব্দটি মাসদার অর্থ শান্তি, যেমন مَلَامٌ অর্থ তিরস্কার ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা তার সাথেই রয়েছে। আরবি রীতি অনুযায়ী এটা عَلٰى -এর স্থান নয়। কিন্তু যেহেতু سَلَامٌ শব্দটি প্রশংসার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই عَلَيْكَ বা عَلَيْكُمْ বলা হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্কে এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতিনীতি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

এ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بُيُوْتَ النَّبِيِّ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী কারীম ﷺ -এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না! বলা হয়েছে।

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ

দ্বিতীয়রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ - نَاظِرٌ শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং اِنَى শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوْا নিষেধাজ্ঞা থেকে দুটি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে– একটি اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ -এর اِلَّا শব্দ দ্বারা এবং অপরটিকে غَيْرَ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ কর। বলা হয়েছে وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পর কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে– فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

মাসআলা : এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়; যেমন সে একাজ সেরে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। আয়াতেও পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে–

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দর মহলে করা হতো। সেখানে মেহমানদের বেশিক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

মাস'আলা : এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা : وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

এতে শানে-নুযূলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরি হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব : এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ আয়াত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোনো অনিষ্টের কারণ হবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ : এসব আয়াতের শানেনুযূলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলির সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুযূল এই যে, এই আয়াত এমন তারি ও পরতোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

ইমাম আবদে ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত। অতঃপর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরিক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত নির্দেশ তাঁদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানেনুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার কাছে সৎ-অসৎ বিভিন্ন ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাজিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আজম (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْتَ فِيْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ حَجَبْتَهُنَّ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ وَقُلْتُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا تَمَالَأْنَ عَلَيْهِ فِي الْغَيْرَةِ عَسٰى رَبُّهٗ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهٗ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ .

"আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌছেছি ১. আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ নাজিল করলেন, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নাও। ২. আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। ৩. নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষাই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য : হযরত ফারূকের আজম (রা.)-এর কথার শিষ্টাচার লক্ষণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালকে তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌছেছেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বিবাহের পর বধূবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিথিদের জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা.) ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন পূর্ববৎ বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এলো এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। [তিরমিযী]

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় :
وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ -এর পূর্বের বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলি সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মু'মিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তাঁরা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এ রূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোনো জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপারাপর বিধবা নারীদের মতো হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রা.) তাঁর পত্নীকে অসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে। -[কুরতুবী]

তাই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন। এছাড়া কোনো স্বামী স্বাভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের আইনে জরুরি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, উপরিউক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকহবিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোনো কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে ফিকহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলার কাছে গুরুতর পাপ।

قَوْلُهُ إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا : আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোনো কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহর সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পর্দার বিধানাবলি, অশ্লীলতা দমনে ইসলামি ব্যবস্থা : অশ্লীলতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলির ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়; বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুণ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোনো নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাঁদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোনো অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্তু এর কুফলেও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যাবৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি স্তূপীকৃত করল, অতঃপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উত্থিত হতে লাগল, তখন এর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করত ও একে নিবৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলির উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়ে, তাঁর জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোনো পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেছে। তাদের বিস্তারিত জওয়াব আলেমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোনো অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভ জনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোনো ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন এক উপকারী বলা কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান : তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল পয়গম্বরের শরিয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলি প্রত্যেক শরিয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোনো অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ত এগুলো হারাম ছিল না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকারী শরিয়ত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এর হেফাজতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম তো হারাম আছেই, সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণাদিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরি করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকহবিদগণ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কুরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সূর্যের উদয় অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব সময়ের নামাজ পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতঃপর এই সাদৃশ্য কোনো সময় নামাজি ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরিয়ত এসব সময়ের নামাজ ও সিজদা হারাম ও নাজায়েজ করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিত্র মূর্তিপূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরি হারাম এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েজ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে শরিয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকটবর্তী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোনো বেগানা নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের জেনা, তার কথা শুনাকে কানের জেনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের জেনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের জেনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ হাদীসে তদ্রূপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলি অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরিয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শরিয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরি হয় না; কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখলে আছে, শরিয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরূহ ও গর্হিত সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব বিরল, শরিয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। ফলে শরিয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোনো বেগানা নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ জেনা না হলেও ও জেনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরিয়ত একে জেনার ন্যায় হারাম করেছে।

দ্বিতীয় কারণে উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের অনুরূপ হারাম না হলে মকরূহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই লেনদেনের সময় যদি জানা যায় যে, গৃহটি নাজায়েজ কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েজ।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরিয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় মোবাহ ও বৈধ। এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে, শরিয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক এখন তা শরিয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ পর্দা না করা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। উদাহরণত কোনো যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাবৃত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতোই। তাই শরিয়তের আইনে এটাই জেনার অনুরূপ হারাম। কারণ শরিয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্ম-সংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তব অনর্থের কারণ হলে নাজায়েজ এবং যে ক্ষেত্রে অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েজ। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোনো অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আবৃত হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামাজ পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে নামাজপড়া তাদের জন্য অধিক ছওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামাতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনি যেসব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কুরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহযাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম সম্বলিত সত্তরটির অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ : নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত কোনো যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরিয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবার সমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের সময় দুজন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তাঁরা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছিল। আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁরা গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে وَهِىَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا اِلَى الْحَائِطِ অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কুরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ [জাহিলিয়াতে উলা] এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা [তাবাররুজ] বর্ণিত আছে, তাও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহেও নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা একে দূষণীয় মনে করত। আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে ঐ ক্লাবসমূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মনস্তিষ্কে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আবৃত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোনো শরিয়তসম্মত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বাইরে যেতে হবে নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরিতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলেমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহ ও তাঁর পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'ইসাবা' গ্রন্থে এবং ইবনে আব্দুল বার 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে তৃতীয় হিজরি অথবা পঞ্চম হিজরি উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরির উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা.) থেকেও পঞ্চম হিজরি বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতক রেওয়ায়েত থেকেও তাই জানা যায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোনো কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কুরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে চারটি সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ আয়াতটি পর্দা সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহযাবে وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াত যদিও কুরআনের ক্রমিকে প্রথমে; কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল যখন নবী কারীম ﷺ -এর স্ত্রীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ এ দু'য়ের যে কোনো একটি বেছে নেওয়া ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিনতে জাহশও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াতসমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল, যা বনী মুস্তালিক অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত যয়নব (রা.)-এর বিবাহে আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য : পুরুষ ও নারীদের সেই অংশ যাকে আরবিতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরিয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরজ। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফরজ হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরজ এবং সকল পয়গম্বরের শরিয়তে তা ফরজ ছিল, বরং শরিয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও হযরত আদম (আ.) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেন নি। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ আয়াতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগমনের পর হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী রাসূলে কারীম ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ নির্দিষ্টকরণের মতভেদ হতে পারে; কিন্তু আসল ফরজ সকল শরিয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরজ, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়ে, তবে এ নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে না। [বাহরুর রায়েক] অনুরূপভাবে কেউ দেখে না এরূপ নির্জন জায়গায় নামাজ পড়লে যদি গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়, তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

নামাজের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যে ফরজ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই; কিন্তু নির্জনতায় শরিয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েজ নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি। –[বাহ্‌র]

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে ফরজ এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও সমান ফরজ।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপারেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কুরআনে উল্লিখিত হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরিয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরি হয়, এমন কোনো কাজেই নারীদেরকে সোর্পদ করা হতো না। মোটকথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরিতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরজ করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা চিরন্তন ফরজ এবং পর্দা পঞ্চম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরজ এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরজ এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে ফরজ। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কুরআনের বিধানাবলি বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গুপ্তাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাজে এগুলো খোলা থাকলে নামাজ সকলের মতেই জায়েজ। এ দু'টি অঙ্গ কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যতিক্রমভুক্ত। ফিকহবিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালা ব্যতিক্রম ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নূরের لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শরিয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলির বিবরণ : পর্দা সম্পর্কে কুরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরিয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা। এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরিয়তের আসল কাম্য এবং যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আবৃত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলেম ও ফিকহবিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আবৃত থাকে। পর্দার এই স্তরত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা : কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরও উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ সূরারই শুরুর আয়াত। وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ এসব আয়াতের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে সামনে এসে যায়।

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত যয়নব (রা.) -এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জ্ঞাত আছি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙ্গিয়ে হযরত যয়নব (রা.)-কে তাঁর ভেতরে আবৃত করে দেন, বোরকা অথবা চাদরে আবৃত করেন নি। শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত ওমর (রা.)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল নবী কারীম ﷺ -এর পত্নীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে অন্দর মহলে থাকুক। তাঁর يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ বাক্যের মর্ম তাই।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত মূতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.)– এই বিপত্তির সময়ও বোরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি; বরং দরজার ছিদ্র দিয়ে সতাস্থল পরিদর্শন করেন।

'বুখারী কিতাবুল মাগাযী' 'ওমরাতুল কাযা' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.) ভগ্নীপুত্র ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। ইবনে ওমর (রা.) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর মেসওয়াক করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের তিতর থেকে শুনতে পেলাম। এ রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী কারীম ﷺ -এর পত্নীগণ গৃহে থেকে পর্দা করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির এক পাত্রে কুলি করে আবূ মূসা আশআরী ও বেলাল (রা.) -কে তা পান করতে ও মুখমণ্ডলে লাগাতে দিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর [অর্থাৎ আমার] জন্যও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা অবতরণের পর নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ গৃহে এবং পর্দার অভ্যন্তরে থাকতেন।

জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণও অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে অবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ স্বাভাবতই অসম্ভব।

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়ই মাটিতে পড়ে গেলেন। হযরত আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যেয়ে বললেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কোনো আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা.)-এর খবর নাও। হযরত আবূ তালহা (রা.) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করেছেন, অতঃপর হযরত সাফিয়া (রা.)-এর কাছে পৌঁছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবূ তালহা (রা.) তাঁকে পর্দাবৃত অবস্থায়ই উটে সওয়ার করে দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবায়ে কেরাম এবং নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণের পর্দার সযত্ন প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। তিরমিযী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ নারী যখন গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় [অর্থাৎ অনিষ্ট সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে]।

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন وَاَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। [প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ فِي الْخُرُوْجِ اِلَّا مُضْطَرَّةً অর্থাৎ নিরুপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, اَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْاَةِ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর আমি গৃহে পৌছে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকেও দেখবে না। আমি তার এই জবাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোচরীভূত করলে তিনি বললেন, صَدَقَتْ اِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّيْ অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমরাই অংশ বিশেষ।

নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না; বরং তাঁরা সফরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হতো এবং এমনিভাবে নামানো হতো।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা.) হাওদায় আছেন এই মনে করে খাদেমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না; রবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) জঙ্গলে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পত্নীগণ পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কতটুকু গুরুত্ব হবে।

দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দা : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের হলে কোনো বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ .

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যদ্দারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্যে তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকহবিদগণের ঐকমত্যে জায়েজ। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকহবিদগণের মতভেদ রয়েছে : সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে, কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ মণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যের তাফসীর করেন, তাঁদের মতে এগুলো খোলা রাখা জায়েজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যাঁরা বোরকা চাদর ইত্যাদি দ্বারা তাফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েজ মনে করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। যাঁরা জায়েজ বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশঙ্কা না থাকা শর্ত। নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশঙ্কা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা জায়েজ নয়।

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এই তিনজন প্রথম মাযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোনো অবস্থাতেই অনুমতি দেননি অনর্থের আশঙ্কা হোক বা না হোক। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) অনর্থের আশঙ্কা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মাযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকহবিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশঙ্কায় নিষেধাজ্ঞার বিধান সম্বলিত হানাফী মাযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

اِعْلَمْ اَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ عَوْرَةً وَجَوَازُ النَّظَرِ اِلَيْهِ فَحِلُّ النَّظَرِ مَنُوْطٌ لِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ اِنْتِفَاءِ الْعَوْرَةِ وَلِذَا حَرُمَ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْاَمْرَدِ اِذَا شَكَّ فِى الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ ـ

কোনো অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হয়ে যাবে না। কেননা দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা কোনো শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাবে হওয়ার আশঙ্কা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় [ফতহুল কাদীর]

এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশঙ্কার তাফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কামপ্রবৃত্তি থাকা জরুরি নয়; বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়; বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুযে' এই করা হয়েছে যে, মনে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা উপরিউক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত আছে? শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন, وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ فَاِنْ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهُ اِنْ نَظَرَ اِشْتَهٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ اِلٰى شَيْءٍ مِنْهَا মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, দেখলে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নয়। [মবসূত]

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লেখেন–

فَاِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ اَوْ شَكَّ اِمْتَنَعَ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهَا فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَاِلَّا فَحَرَامٌ وَهٰذَا فِىْ زَمَانِهِمْ وَاَمَّا فِىْ زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنَ الشَّابَّةِ اِلَّا النَّظَرَ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُ وَاَيْضًا قَالَ فِىْ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ وَتُمْنَعُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِاَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ـ

যদি কামভাবের আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোনো পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোনো ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাজের শর্তাবলি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যুবতী নারীদের বেগনা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; বরং অনর্থের আশঙ্কার কারণে।

এই আলোচনা ও ফিকহবিদগণের মতভেদের সারসংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরিয়তের অনেক বিধানে এ নজির পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোনো ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাজের কসর ও রোজার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার অজু ভেঙ্গে যাবে বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেন নি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশঙ্কা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েজ হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাফী ফিকহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে। **এক.** নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। **দুই.** বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া প্রয়োজনের সময় ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাস'আলা : পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলিতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহরাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণত বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الخ : সালাত ও সালামের অর্থ : আরবি ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাজিল করেন। 'ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন' কথার অর্থ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তাফসীরবিদগণ এ অর্থেই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার সালাতের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আজান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরিয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরিয়তের হেফাজতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোনো পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 'মাকামে মাহমূদা' বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহর সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরিক করা যায়? এর জওয়াব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসা কীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু'মিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এক. সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ– রহমত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় عُمُوْمِ مُشْتَرَكٌ বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েজ নয়। কাজেই এ স্থলে 'সালাত' শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও ইস্তিগফার এবং সাধারণ মু'মিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

'সালাম' শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্যে ত্রুটি দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। 'আসসালামু আলাইকা' বাক্যের অর্থ এই যে, দোষত্রুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা عَلٰى অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে عَلٰى অব্যয় যোগে عَلَيْكَ অথবা عَلَيْكُمْ বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে 'সালাম' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর সত্তা। কেননা এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব 'আসসালামু আলাইকুম' বাক্যের অর্থ– এই হবে যে, আল্লাহর হেফাজত ও দেখাশোনার জিম্মাদার।

দরূদ ও সালামের পদ্ধতি : হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কাব ইবনে আজরা (রা.) বলেন, [আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন, দরূদের জন্য তোমরা এ কথাগুলো বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সালাম করার পদ্ধতি তাদেরকে নামাজের তাশাহহুদে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা। তাই সালাতের ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি; বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দরূদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোনো ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে সেই ভাষা হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরি নয়। বরং যে কোনো বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতিপালিত ও দরূদের ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও ছওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মাসআলা : নামাজের বৈঠক উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ ও সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা উচিত; যেমন– তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হতো। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র রওযার সামনে সালাম আরজ করা হলেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; যথা– صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হাদীসবিদগণের কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য : দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্যে ছিল আমরা স্বয়ং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করব; কিন্তু এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরি করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

দরূদ ও সালামের বিধানাবলি : নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব।

মাস'আলা : অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সে দরূদ পাঠ করে না।

একই মজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মোস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে, তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোটখাটো হাদীসে দু' এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনে একাধিক বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম আসে কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেননি।

✪ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'সা' লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মোস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাতে কোনো গুনাহ নেই। ইমাম নববী একে মাকরূহ বলেছেন। হযরত ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ মাকরূহ তানযীহী। আলেমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোনো একটি পাঠ করেন।

পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্য সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন। لَا يُصَلِّي عَلَىٰ اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لٰكِنْ يَدْعِيْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْاِسْتِغْفَارِ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম আযম (র.) -এর মাযহাবও তাই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী অথবা মুমিনগণকে শরিক করায় কোনো দোষ নেই।

ইমাম জুওয়াইনী (র.) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা জায়েজ ও সুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলাইহিস সালাম বলা জায়েজ নয়। -[খাসায়েস কুবরা]

কাজী আয়াজ (র.) বলেন, অনুসন্ধানী আলেমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ তাই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরূদ ও সালাম পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্য, অপরের জন্য জায়েজ নয়; যেমন সুবহানাহু তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন- কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ جَمْعُ جِلْبَابٍ وَهِيَ الْمِلْحَفَةُ الَّتِيْ تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ اَيْ يُرْخِيْنَ بَعْضَهَا عَلَى الْوُجُوْهِ اِذَا خَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنَّ اِلَّا عَيْنًا وَاحِدَةً ذٰلِكَ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ بِاَنَّهُنَّ حَرَائِرُ فَلَا يُؤْذَيْنَ بِالتَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِخِلَافِ الْاِمَاءِ فَلَا يُغَطِّيْنَ وُجُوْهَهُنَّ وَكَانَ الْمُنَافِقُوْنَ يَتَعَرَّضُوْنَ لَهُنَّ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِمَا سَلَفَ مِنْهُنَّ مِنْ تَرْكِ السَّتْرِ رَحِيْمًا بِهِنَّ اِذَا سَتَرْهُنَّ . ٥٩

৫৯. হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের জিলবাব নিজেদের উপর টেনে নেয়। অর্থাৎ চাদরের কিয়দাংশ মাথার নিচে ঝুলিয়ে দেয়। جَلَابِيْبُ শব্দটি جِلْبَابٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। যা দ্বারা মহিলারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং কেবল এক চোখ খোলা রাখবে এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। তারা হলো আজাদ রমণীগণ ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করে কষ্ট দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে দাসীগণ মুখমণ্ডল ঢাকবে না এবং মুনাফিকগণ তাদেরকে উত্যক্ত করে আল্লাহ পর্দার বিষয়ে পূর্বের তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমাশীল, যখন তারা পর্দা করবে তাদের উপর পরম দয়ালু।

لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ عَنْ نِفَاقِهِمْ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ بِالزِّنَا وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِقَوْلِهِمْ قَدْ اَتَاكُمُ الْعَدُوُّ وَسَرَايَاكُمْ قُتِلُوْا اَوْ هُزِمُوْا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ يُسَاكِنُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ . ٦٠

৬০. যদি বিরত না হয় মুনাফিকরা তাদের নিফাক থেকে এবং যাদের অন্তরে ব্যভিচারের রোগ আছে এবং মদিনায় মুমিনদের মাঝে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করবে, তোমাদের সৈন্যরা হত্যা হয়েছে বা পরাজয় হয়েছে বলে গুজব রটনাকারীরা, তবে তাদের অপকর্ম থেকে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অবস্থান করবে না কিন্তু অল্প সময়। অতঃপর তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে।

مَلْعُوْنِيْنَ ج مُبْعَدِيْنَ عَنِ الرَّحْمَةِ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا وُجِدُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا اَيِ الْحُكْمُ فِيْهِمْ هٰذَا عَلٰى جِهَةِ الْاَمْرِ بِهِ . ٦١

৬১. অভিশপ্ত অবস্থায় রহমত থেকে বিতাড়িত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে এই আদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে।

٦٢. سُنَّةَ اللّٰهِ اي سَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِىْ مُنَافِقِيْهِمُ الْمُرْجِفِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا مِنْهُ.

৬২. যারা অতীত হয়ে গেছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে যে সমস্ত মুনাফিকরা মুমিনদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবে না।

٦٣. يَسْئَلُكَ النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ ط مَتٰى تَكُوْنُ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط وَمَا يُدْرِيْكَ يُعْلِمُكَ بِهَا اَىْ اَنْتَ لَا تَعْلَمُهُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ تُوْجَدُ قَرِيْبًا.

৬৩. লোকেরা মক্কাবাসী আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছে। আপনি কি জানেন? [অর্থাৎ আপনার জানা নেই।] সম্ভবত কিয়ামত নিকটে।

٦٤. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ اَبْعَدَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا نَارًا شَدِيْدَةً يَدْخُلُوْنَهَا.

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন রহমত থেকে দূর করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি। প্রচণ্ড আগুন সেখানে তারা প্রবেশ করবে।

٦٥. خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا اَبَدًا ج لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا يَحْفَظُهُمْ عَنْهَا وَّلَا نَصِيْرًا يَدْفَعُهَا عَنْهُمْ.

৬৫. তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোনো অভিভাবক যিনি তাদেরকে এটা থেকে রক্ষা করবে ও সাহায্যকারী যিনি তাদের থেকে আজাব দূর করবে পাবে না।

٦٦. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا.

৬৬. যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম। يٰلَيْتَنَا-এর মধ্যে يَا অব্যয়টি সজাগ করার অর্থে।

٦٧. وَقَالُوْا اَيِ الْاَتْبَاعُ مِنْهُمْ رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ سَادَاتِنَا جَمْعُ الْجَمْعِ وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا طَرِيْقَ الْهُدٰى.

৬৭. তারা তাদের মধ্যে অনুসারীগণ আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম। ভিন্ন ক্বেরাতে سَادَاتَنَا এবং এটা বহুবচনের বহুবচন অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।

٦٨. رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اَىْ مِثْلَىْ عَذَابِنَا وَالْعَنْهُمْ عَذِّبْهُمْ لَعْنًا كَثِيْرًا عَدَدُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْمُوَحَّدَةِ اَىْ عَظِيْمًا.

৬৮. হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে আমাদের আজাবের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। ভিন্ন ক্বেরাত মতে كَبِيْرًا অর্থাৎ মহান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُدْنِيْنَ : এটা إِدْنَاءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ– সে নিচু করে দেবে মূলবর্ণ হলো, دُنُوٌ : يُدْنِيْنَ -এর মধ্যে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা قَوْل -এর مَقُوْلَه হবে এবং, خَبَرْ টা أَمْر অর্থে হবে এবং এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, جَوَاب أَمْر হবে যেমন– قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

قَوْلُهُ لَا يُؤْذَيْنَ : এটা إِيْذَاءٌ মাসদার থেকে نَفِى فِعْل مُضَارِعٌ مَجْهُوْل -এর جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ -এর সীগাহ ; তাদের সকল নারীকে কষ্ট দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ الْمُرْجِفُوْنَ : এটা إِرْجَاف মাসদার থেকে إِسْم فَاعِل যা رَجْفَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ– নড়াচড়া দেওয়া। মিথ্যা সংবাদ এবং মুখে মুখে প্রচারিত বিষয় কে ও رَجْفَةٌ বলতে থাকে। কেননা মৌখিক প্রচারিত কথার মাধ্যমেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مَلْعُوْنِيْنَ : উহ্য ফেলের فَاعِلْ থেকে حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ يَخْرُجُوْنَ مَلْعُوْنِيْنَ ব্যাখ্যাকার (র.) يَخْرُجُوْنَ উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَا يُدْرِيْكَ : এখানে مَا হলে মুবতাদা আর يُدْرِيْكَ জুমলা হয়ে খবর হয়েছে; إِسْتِفْهَام إِنْكَارِىْ ব্যাখ্যাকার أَنْتَ لَا تَعْلَمُهَا দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ : এটা يَقُوْلُوْنَ -এর ظَرْف مُقَدَّم হয়েছে। خَالِدِيْنَ এবং نَصِيْرًا-এর ظَرْف ও হতে পারে। (مَحَلْ)

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব রয়েছে যা পূর্বের বাক্যের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে যখন জাহান্নামীদের গোপন অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তখন প্রশ্নের সৃষ্টি হলো যে, তখন তারা কি করবে? তখন যা ছুটে গেছে তার উপর আফসোসের ভঙ্গিতে বলবে يَا لَيْتَنَا [হায় আফসোস] এবং وُجُوْهُهُمْ -এর যমীর نَفْس وُجُوْه থেকে حَالْ ও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হতো; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুঁশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হতো। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী কারীম ﷺ -এর স্ত্রীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হতো। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রভাব গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবত পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সর্বকিছুর কর্তা আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু কাফেররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম করা।

অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রাসূলের পক্ষে আল্লাহকে কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তাফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ পূর্বেও রাসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্টই যে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট, একথা আব্দুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (র.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা আর যে তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণে তাদেরকে ভালোবাসে আর যে, তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন। -[মাযহারী]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্টের কারণে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোনো সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের দিনগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন, লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। -[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সাফিয়া (রা.)-এর সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রূপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত সফিয়া (রা.)-এর বিবাহের কারণে বিদ্রূপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া কুফরি : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলিতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোনো দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও। -[তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোনো একজন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোনো অপকর্মে জড়িত হওয়ারও আশঙ্কা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরিয়তের আইনে জায়েজ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরিউক্ত শর্তযুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কোনো মুসলমানকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম :

اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরিয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ কেবল সেই মুসলমান, যার হাত মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কষ্ট পায় না। কেবল সে-ই মু'মিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে। -[তাফসীরে মাযহারী]

অনুবাদ :

٦٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا مَعَ نَبِيِّكُمْ كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا مَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلَّا اَنَّهُ اٰدَرُ فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ط بِاَنْ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ لِيَغْتَسِلَ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِهٖ حَتّٰى وَقَفَ بَيْنَ مَلَاٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَاَدْرَكَهُ مُوْسٰى فَاَخَذَ ثَوْبَهُ وَاسْتَتَرَ بِهٖ فَرَأَوْهُ لَا اُدْرَةَ بِهٖ وَهِىَ نَفْخَةٌ فِى الْخُصْيَةِ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ذَاجَاهٍ وَمِمَّا اُوْذِىَ بِهٖ نَبِيُّنَا ﷺ اَنَّهُ قَسَمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ هٰذِهٖ قِسْمَةٌ مَا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَغَضِبَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৬৯. হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নবীদের সাথে এমন হয়োনা যেমন যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে; যেমন- তারা হযরত মূসা (আ.) -কে বলেছিল, তাকে আমাদের সাথে উলঙ্গ গোসল করা থেকে বিরত রাখে না কিন্তু তার অণ্ডকোষ স্ফীত রোগে তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। একদা হযরত মূসা (আ.)- গোসল করার জন্যে কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন অতঃপর পাথরটি তার কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল অবশেষে বনী ঈসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল এবং হযরত মূসা (আ.) তাকে পেলেন ও কাপড় নিয়ে তাঁর সতর ঢাকলেন। এখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে দেখল যে, তার কোনো একশিরা রোগ নেই অর্থাৎ এক অণ্ডকোষ স্ফীত রোগ নেই এবং তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। যে সমস্ত কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছেন তাদের মধ্যে একটি হলো যে, একদিন তিনি গনিমতের মাল বণ্টন করতে লাগলেন তখন এক ব্যক্তি বললেন যে, এটা এমন বণ্টন যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য নয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহ মূসাকে রহম করুন। এর চেয়ে অধিক কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছে তবুও তিনি সহ্য করেছেন। উক্ত ঘটনা বুখারী শরীফে বর্ণিত।

٧٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا لا صَوَابًا

৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

٧١. يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ يَتَقَبَّلُهَا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا نَالَ غَايَةَ مَطْلُوْبِهٖ.

৭১. তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন কবুল করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। শেষ সাফল্যে উপনীত হবে।

৭২. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرَهَا مِمَّا فِيْ فِعْلِهَا مِنَ الثَّوَابِ وَتَرْكِهَا مِنَ الْعِقَابِ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ بِاَنْ خَلَقَ فِيْهَا فَيْهِمًا وَنُطْقًا فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ خِفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط أٰدَمُ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا لِنَفْسِهِ بِمَا حَمَلَهُ جَهُوْلًا بِهِ.

৭২. আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত নামাজ ও নামাজের পুণ্য ও নামাজ না পড়ার শাস্তি ইত্যাদি পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল আল্লাহ তাদের নিকট বুঝা ও বলার শক্তি সৃষ্টি করেন এবং এতে ভীত হলো কিন্তু মানুষ আদম তাঁর নিকট পেশ করার সাথে সাথে তা বহন করল। নিশ্চয় সে তাঁর নিজের উপর তা বহন করার কারণে জালেম, অজ্ঞ। আমানত বহনের পরিণাম সম্পর্কে।

৭৩. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ اللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَرَضْنَا الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ حَمْلُ أٰدَمَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الْمُضَيِّعِيْنَ الْأَمَانَةَ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ الْمُؤَدِّيْنَ الْأَمَانَةَ وَكَانَ غَفُوْرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا بِهِمْ.

৭৩. যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ যারা আমানত নষ্ট করে মুশরিক নারীদের শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। لِيُعَذِّبَ এর লামের সম্পর্কে عَرَضْنَا ফেলের সাথে। যার সাথে আদমের আমানত বহনের মর্মার্থ সম্পৃক্ত আল্লাহ মুমিনদের জন্যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا أُدْرَةَ بِهٖ : أُدْرَةٌ এক ধরনের রোগ যাতে مَادَّةٌ غَلِيْظٌ অথবা رِيْحٌ غَلِيْظٌ অণ্ডকোষে নেমে আসে। যার কারণে অণ্ডকোষ অনেক ফুলে যায়। এরূপ ব্যক্তিকে آدَرُ বলে যা آدَمُ -এর ওযনে আসে।

قَوْلُهُ مِمَّا قَالُوْا : এখানে مَا টা হয়তো মাসদারিয়া হবে। তখন উহ্য ইবারত হবে بَرَّأَهُ اللّٰهُ مِنْ قَوْلِهِمْ অথবা مَا মাওসূলা مَوْصُوْلَة হবে তখন উহ্য ইবারত হবে بَرَّأَهُ اللّٰهُ اَىْ مِنَ الَّذِىْ قَالُوْا

قَوْلُهُ بِهٖ : অর্থাৎ بِالثَّوَابِ

قَوْلُهُ مِمَّا : এখানে مِنْ টা مَعَ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ مَعَ مَافِىْ فِعْلِهَا

قَوْلُهُ مِنَ الثَّوَابِ : এটা مَا-এর বয়ান হয়েছে।

قَوْلُهُ اَبَيْنَ : এটা اِبَاءٌ মাসদার হতে فِعْل مَاضِىْ -এর جَمْع مُؤَنَّث غَائِبٌ-এর সীগাহ।

প্রশ্ন. اَبَيْنَ ، يَحْمِلْنَ এবং اَشْفَقْنَ এই তিনটিই جَمْع مُؤَنَّث -এর সীগাহ। আর এগুলোর مَرْجِعٌ হলো سَمٰوٰتٌ ، اَرْضٌ এবং جِبَالٌ এবং اَرْضٌ হলো مُؤَنَّثٌ আর جِبَالٌ হলো مُذَكَّرٌ এতে বুঝা যায় যে, مُؤَنَّثٌ -এর প্রাধান্য দিয়ে -এর যমীর নেওয়া হয়েছে। অথচ مُذَكَّر দেওয়া উচিত ছিল।

উত্তর. যেহেতু سَمٰوَات এবং جِبَال হলো جَمْعِ تَكْسِيْر غَيْر عَاقِل কাজেই তাদের জন্য مُؤَنَّث-এর যমীর নেওয়া জায়েজ হয়েছে। حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ : এর مَعْطُوْف عَلَيْه উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো تَعَرَّضْنَاهَا فَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় উক্তি بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ ظَلَمُوْا مَا لِنَفْسِه : অর্থাৎ أَتْعَبَهُ إِيَّاهَا অর্থাৎ নিজেই নিজেকে কষ্টে ফেলে দেওয়া। ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় উক্তি جُمْلَة দ্বারা এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, আর এই জুলুম প্রশংসনীয়। আর যারা এর বর্ণনা করা থেকে تَوَقَّفْ করেছেন তারা ظُلْم দ্বারা হাকীকী জুলুম বুঝেছেন। আর এটা শরিয়তের সীমালঙ্ঘন।

قَوْلُهُ بِه : অর্থাৎ بِعَاقِبَتِه [শেষ পরিণাম]

قَوْلُهُ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ : এখানে لَامْ টা عَاقِبَت -এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ بَعْضَ أَفْرَادِ الَّذِيْنَ لَمْ يُرَاعُوْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا الخ : পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

হযরত মূসা (আ.) -এর সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এর জন্য জরুরি নয় যে, মুসলমানরা এরূপ কোনো কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কতক সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেননি যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোনো সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এরূপ আশঙ্কা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায়। হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত মূসা (আ.) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোনো খুঁত আছে হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। [অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।] নতুবা তিনি অন্য কোনো ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন হযরত মূসা (আ.) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি [আল্লাহর আদেশে] নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে 'আমার কাপড়, আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না, যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সে সব লোক হযরত মূসা (আ.)-কে আপাদমস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল। এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। [এতে তাদের বর্ণিত কোনো খুঁত বিদ্যমান ছিল না।] এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ.)-এর আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরআনের এই আয়াতের এটাই অর্থ। কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এ আয়াতের তাফসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে তাফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান ছিলেন। আল্লাহর কাছে কারও মর্যাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। হযরত মূসা (আ.) যে এরূপ ছিলেন, তাঁর প্রমাণ কুরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে পয়গাম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রিসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না। -[ইবনে কাসীর]

পয়গাম্বরগণকে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা আল্লাহর রীতি : এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং হযরত মূসা (আ.) নিরুপায় অবস্থায় মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে হাজির হয়েছেন। এ গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গাম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গাম্বরকেই উচ্চবংশে জন্ম দান করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গাম্বরগণের ইতিহাসে কোনো পয়গাম্বরের অন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা আল্লাহর রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ .... ذُنُوْبَكُمْ : قَوْل سَدِيْدًا -এর তাফসীর কেউ কেউ সত্য কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। কুরআন পাক এস্থলে مُسْتَقِيْم - صَادِقْ ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سَدِيْد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেমী রূহুল-বয়ানে বলেন, قَوْل سَدِيْد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে ঠাট্টা ও রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায় : এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহভীতির এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আল্লাহভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে; যেমন এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ -এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কুরআনি বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব : কুরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোনো কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নজির। এর পূর্বের আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহভীতি সহজ হয়ে যাবে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এতে আল্লাহভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহর ওলী। আরও এক আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের সাথে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে আগামীকল্য অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা আল্লাহভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয় : হযরত শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (র.)-এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনও মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষত্রুটি মুক্ত কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হযরত শাহ সাহেবের অনুবাদ এই: সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্যে তোমার কর্ম।

قَوْلُهٗ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : সমগ্র সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এ আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলি পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে বর্ণিত হবে।

আমানতের উদ্দেশ্য কি : এস্থলে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরিয়তের ফরজ কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাজত, ধনসম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এ আমানতের মধ্যে দাখিল আছে। -[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আবূ হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন, اَلظَّاهِرُ اِنَّهَا كُلُّ مَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْيٍ وَشَاْنٍ وَدِيْنٍ وَدُنْيَا وَالشَّرْعُ كُلُّهٗ اَمَانَةٌ وَهٰذَا قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরিয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের বিধানাবলি দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আজাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানাবলির ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এ বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতেও হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দুটি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আমরা চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাজিল করা হয়েছে, অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, ফলে মুমিনগণ কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় হাদীস এই যে, [এক সময় আসবে যখন] মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহ্নমাত্র থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল। [অঙ্গার তো দূরে সরে গেল কিন্তু] তার চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির কোনো অংশ নেই........... মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের হক কেউ আদায় করবে না। [আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে,] মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে। এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরিয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অর্জিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তু অর্জিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই– আমানতের হেফাজত, সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য। –[ইবনে কাসীর]

আমানত কিরূপে পেশ করা হবে : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তাঁরা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হলো?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কুরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে– لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি এ কুরআন পর্বতের উপর নাজিল করলে আপনি দেখতেন যে, পবর্তও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহর ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এ উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। إِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কুরআন পাক لَوْ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না। তবে তা কুরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ কুরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই– وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহকে চেনা এবং তাকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এ উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোনো অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পবর্তমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোনো উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলক নয় : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হলো? আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কুরআনের আয়াত أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাজি হও অথবা না হও, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে কাসীর ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষ পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হলো, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলি পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, ছওয়াব এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলি পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আজাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা ছওয়াবও চাই না এবং আজাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনময়ে এ আমানত বহন করতে সম্মত আছ? হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হলো, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে [যা আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে]। পক্ষান্তরে যদি এ আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পবর্তমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এ আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

বাহ্যত বোঝা যায় যে, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এ আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এ অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরি ছিল : আল্লাহ তা'আলা আদি তাকদিরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আল্লাহর বিধানাবলি মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা এ প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর বিধানাবলির আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আ.) এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا : ظَلُوْم অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جَهُوْل-এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এ অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কুরআনি বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আ.) বুঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গাম্বর। তিনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে

আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বুঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গাম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহর আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কুরআন পাক মানব জাতিকে 'আশরাফুল মখলুকাত' আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত আদম (আ.) ও সমগ্র মানব জাতি কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তাফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরিউক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ জালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে, তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে জালিম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরিয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের বসরী (র.) প্রমুখ থেকে একই তাফসীর বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন ظَلُوْمٌ ও جَهُوْلٌ শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও হতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) ও অন্যান্য সুফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ : এখানে لَامْ অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لَامْ عَاقِبَتْ বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবি কবিতায় এই لَامْ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্যে এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

قَوْلُهُ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ : এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দুদলে বিভক্ত হয়ে যাবে- এক. কাফের, মুনাফিক ইত্যাদি, যাঁরা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। দুই. মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যাঁরা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظَلُوْمٌ ও جَهُوْلٌ শব্দদ্বয়ের এক তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরিউক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তাফসীরের সমর্থন রয়েছে।
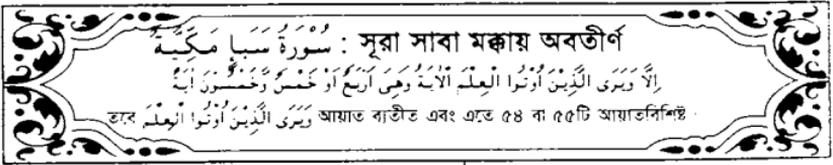
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. اَلْحَمْدُ حَمِدَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَفْسَهُ بِذٰلِكَ وَالْمُرَادُ بِهِ الثَّنَاءُ بِمَضْمُوْنِهِ مِنْ ثُبُوْتِ الْحَمْدِ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ كَالدُّنْيَا يَحْمَدُهُ اَوْلِيَاؤُهُ اِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِيْ فِعْلِهِ الْخَبِيْرُ بِخَلْقِهِ

٢. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ يَدْخُلُ فِي الْاَرْضِ كَمَاءٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَنَبَاتٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَعْرُجُ يَصْعَدُ فِيْهَا ط مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الرَّحِيْمُ بِاَوْلِيَائِهِ الْغَفُوْرُ لَهُمْ.

٣. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط الْقِيَامَةُ قُلْ لَهُمْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ج بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفْعُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَلَّامُ بِالْجَرِّ.

অনুবাদ :

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল্লাহ তা'আলা এ বাক্য দ্বারা তার প্রশংসা করেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর ভাবার্থ দ্বারা প্রশংসা প্রমাণের মাধ্যমে তারীফ করা এবং এটা আল্লাহর গুণাবলির দ্বারা গুণান্বিত করা যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক অধিকার সৃষ্টি ও দাস হিসেবে এবং তারই প্রশংসা পরকালে যেমন দুনিয়াতে, আল্লাহর বন্ধুগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তার প্রশংসা করবে। তিনি তার তার কর্মে প্রজ্ঞাময় তার সৃষ্টিজীবের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

২. তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যেমন পানি ও অন্যান্য যা সেখান থেকে নির্গত হয় যেমন, শস্য ও অন্যান্য এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় রিজিক ও অন্যান্য এবং যা আকাশে উত্থিত হয় মানুষের আমল ইত্যাদি তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তার বন্ধুদের প্রতি।

৩. কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ অবশ্যই তোমাদের উপর কিয়ামত আসবে। তিনি গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। عَالِمُ الْغَيْبِ শব্দের মীমের মধ্যে যের পড়লে رَبِّيْ -এর সিফত হবে আর পেশ পড়লে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অন্য কেরাত মতে عَلَّامُ الْغَيْبِ মীমের মধ্যে যেরের সাথে।

لَا يَعْزُبُ يَغِيبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَزْنُ ذَرَّةٍ أَصْغَرُ نَمْلَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ لَا بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ.

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তার অগোচরে নেই অণু পরিমাণ কিছু ذرة অর্থ পিপড়ার চেয়ে ছোট বস্তু না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ সমস্তই কিছু আছে সুস্পষ্ট কিতাবে লাওহে মাহফূযে।

٤. لِّيَجْزِيَ فِيهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ حَسَنٌ فِي الْجَنَّةِ.

৪. তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।

٥. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيْٓ إِبْطَالِ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ مُعٰجِزِينَ وَفِي قِرَاءَةٍ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مُعَاجِزِينَ أَيْ مُقَدِّرِينَ عَجْزَنَا أَوْ مُسَابِقِينَ لَنَا فَيَفُوتُونَنَا لِظَنِّهِمْ أَنْ لَا بَعْثَ وَلَا عِقَابَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ سَيِّئِ الْعَذَابِ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ صِفَةٌ لِرِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ.

৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে কুরআন বাতিল করে রাসূলকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায় অন্য কেরাত মতে এখানে ও পরবর্তীতে مُعَاجِزِيْنَ পড়বে। مُعَاجِزِيْنَ অর্থ আমাকে অপারগ গণ্য করে, আমাকে পরাজিত মনে করে আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে অথবা তাদের ধারণা কোনো আজাব বা শাস্তি হবে না তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। اَلِيْمٌ অর্থ مُؤْلِمٌ এর মীমের মধ্যে যের না পেশ পড়বে এবং এটা তারকীবে رِجْزٍ বা عَذَابٌ -এর সিফত হবে।

٦. وَيَرَى يَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مُؤْمِنُو أَهْلِ الْكِتَابِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ أَيِ الْقُرْاٰنِ هُوَ فَصْلُ الْحَقَّ لا وَيَهْدِيٓ إِلٰى صِرَاطِ طَرِيقِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أَيِ اللّٰهِ ذِي الْعِزَّةِ الْمَحْمُودَةِ.

৬. যারদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে কিতাব প্রাপ্তদের মধ্যে ঈমানদারগণ যেমন– আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তার সাথীগণ তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কুরআনকে সত্য মনে করে এবং তারা জানে এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে। هُوَ সর্বনামটি يَرٰى -এর দুই মাফঊলের মধ্যে পৃথককারী ضَمِيرِ فَصْلٍ

٧. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ عَلٰى جِهَةِ التَّعَجُّبِ لِبَعْضٍ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ هُوَ مُحَمَّدٌ يُّنَبِّئُكُمْ يُخْبِرُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ قُطِّعْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ لا بِمَعْنٰى تَمْزِيقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.

৭. আর কাফেরগণ অর্থাৎ আশ্চর্য করে একে অপরকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির মুহাম্মদের সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে, তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। مُمَزَّقٍ অর্থ تَمْزِيْقٍ

৮. أَفْتَرٰى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَاسْتَغْنٰى بِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فِي ذٰلِكَ أَمْ بِهٖ جِنَّةٌ جُنُوْنٌ تَخَيَّلُ بِهٖ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ فِي الْعَذَابِ فِيْهَا وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ مِنَ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا.

৮. সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, أَفْتَرٰى এর হামযা যবর বিশিষ্ট প্রশ্নবোধক তথা هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ অর্থ প্রশ্নবোধক হামযার কারণে হামযায়ে ওছলকে বিলুপ্ত করা হয়েছে না হয় সে উন্মাদ যার কারণে সে মনগড়া কথা-বার্তা বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বরং বাস্তবে যারা পরকালের ও তার সংশ্লিষ্ট হাশর ও হিসাবের প্রতি অবিশ্বাসী তারা আজাবে ও দুনিয়াতে ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

৯. أَفَلَمْ يَرَوْا يَنْظُرُوْا إِلٰى مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مَا فَوْقَهُمْ وَمَا تَحْتَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط إِنْ نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا بِسُكُوْنِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا قِطْعَةً مِّنَ السَّمَاءِ ط وَفِيْ قِرَاءَةٍ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ بِالْيَاءِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَرْئِيِّ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ رَاجِعٍ إِلٰى رَبِّهٖ تَدُلُّ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَى الْبَعْثِ وَمَا يَشَاءُ.

৯. তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? ভূমি ধ্বসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোনো খণ্ড তাদের উপর পতিত করব كِسَفًا -এর সীনের মধ্যে সাকিন ও যবর উভয়ভাবে পড়া যাবে। অন্য কেরাত মতে পূর্বের তিন ফে'লে يَا -এর সাথে পড়বে নিশ্চয় আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দাদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে। যা আল্লাহ পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়ের উপর সক্ষম হওয়ার প্রমাণ করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا : يَعْرُجُ -এর সেলাহ إِلٰى আসে فِيْ নয়। যেহেতু يَعْرُجُ টা اِسْتِقْرَاء -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে এজন্য فِيْ দ্বারা এটাকে مُتَعَدِّيْ করা বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ لَهُمْ بَلٰى : بَلٰى টা نَفِيْ কে রদ করার জন্য এবং مَنْفِيْ কে اِثْبَات করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মুশরিকরা বলেছিল لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ তাদের উক্তিকে প্রতিহত করে বলেছেন بَلٰى কেন নয়? নিশ্চিত রূপে কিয়ামত আসবেই। অর্থাৎ لَيْسَ الْأَمْرُ إِلَّا اِتْيَانُهَا

قَوْلُهُ وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ : এতে وَاو টি হলো قَسَمِيَّة جَارَّة এটা اِثْبَات نَفِيْ-এর تَاكِيْد-এর জন্য হয়েছে لَا হলো جَوَاب قَسَم-এর জন্য। تَاْتِيَنَّكُمْ হলো فِعْل مُضَارِع مَبْنِي بِفَتْحَةٍ بِاَنُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة এটা তৃতীয় তাকিদ। এবং كُمْ হলো مَفْعُوْل بِه

قَوْلُهُ عَالِمِ الْغَيْبِ : جَرّ সুরতে رَبِّ -এর صِفَتْ বা بَدَلْ হবে عَالِمُ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হতে পারে। অর্থাৎ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ : عَالِمُ الْغَيْبِ হলো মুবাতাদা لَا يَعْزُبُ হলো তার খবর। يَعْزُبُ শব্দটি জমহুরের কেরাত অনুপাতে زَا. তে ضَمَّه সহ পঠিত রয়েছে। আর কেসায়ীর নিকট زا. বর্ণে যের হবে। বাবে ضَرَبَ ও نَصَرَ হতে মাসদার عُزُوْبًا অর্থ– গুপ্ত হওয়া, দূর হওয়া।

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এটা لَتَاْتِيَنَّكُمْ-এর ইল্লত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আসবে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিদান দান করেন।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ : এটা মুবতাদা لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর مَغْفِرَةٌ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ এ উভয়টি মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে اُولٰئِكَ মুবতাদার খবর হয়েছে। رِزْقٌ كَرِيْمٌ এটা মওসূফ সিফত মিলে مَغْفِرَةٌ-এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا : মওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। আর اُولٰئِكَ এবং তার পরবর্তী অংশ হলো খবর। অন্য তারকীব এভাবেও হতে পারে যে, وَالَّذِيْنَ سَعَوْا -এর আতফ হলো পূর্বের وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর উপর। অর্থাৎ سَعَوْا এই সুরতে পরবর্তী اُولٰئِكَ টা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে। এবং পূর্বের اُولٰئِكَ দুই مَعْطُوْف এবং মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَة হবে।

قَوْلُهُ فِيْمَا يَاْتِيْ : অর্থাৎ فِيْ اٰخِرِ السُّوْرَةِ

قَوْلُهُ مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا اَوْ مُسَابِقِيْنَ لَنَا : এতে لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ হয়েছে مُقَدِّرِيْنَ হলো প্রথম কেরাতে ব্যাখ্যা। আর مُسَابِقِيْنَ لَنَا হলো দ্বিতীয় কেরাতের ব্যাখ্যা। مُقَدِّرِيْنَ-এর উদ্দেশ্যে হলো مُعْتَقِدِيْنَ

قَوْلُهُ مُعَاجِزِيْنَ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُسَابِقِيْنَ ; مُسَابَقَه-এর উপর مُعَاجَزَه -এর اِطْلَاقْ এ জন্য করে দিয়েছেন যে, মুসাবাকাত কারী- পরস্পর একে অপরকে অক্ষম করতে চেষ্টা করে থাকে। তবে এখানে বাবে مُفَاعَلَة স্বীয় অর্থে হয়নি। কেননা আল্লাহকে অক্ষম করা সম্ভব নয়। কাজেই এই অক্ষম করা স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত; বাস্তবে নয়।

قَوْلُهُ وَيَرَى الَّذِيْنَ : এটা হয়তো يَجْزِيْ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে। يَرٰى টা يَعْلَمُ -এর অর্থে হয়েছে। আর اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ হলো يَرٰى -এর ফায়েল। আর اَلَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ হলো প্রথম মাফউল আর اَلْحَقَّ হলো দ্বিতীয় মাফউল এবং هُوَ টা মাফউলদ্বয়ের মাঝে فَصْل হয়েছে। আর يَهْدِيْ -এর আতফ হয়েছে। اَلْحَقَّ -এর উপর অর্থাৎ يَرَوْنَهُ حَقًّا وَهَادِيًا

প্রশ্ন. এই সুরতে فِعْل -এর আতফ ১. اِسْم-এর উপর হওয়া আবশ্যক হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

উত্তর. فِعْل টা যখন اِسْم-এর تَاوِيْل এ হবে তখন عَطْف বৈধ হয়। এখানে يَهْدِيْ টা هَادِيًا অর্থে হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقَّ وَهَادِيًا

يَرٰى টা يَجْزِيْ -এর উপর আতফ হওয়ার সুরতে এই প্রশ্ন হয় যে, يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের জন্য পৃথিবীতে عِلْم প্রমাণিত করা। আর يَجْزِيْ -এর উপর عَطْف -এর চাহিদা হলো এই যে, عِلْم পরকালে সাব্যস্ত হওয়া যা উদ্দেশ্য বহির্ভূত। এর দ্বারা জানা যায় যে, اِسْتِيْنَافْ ওয়ালা তারকীব সহীহ।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى تَمْزِيْقٍ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اِسْم فَاعِلْ টা মাসদারের অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثِ بِالْيَاءِ : অর্থাৎ نَشَأْ . نَخْسِفْ . نُسْقِطْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সাবা প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু একটি আয়াত সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল বলেছেন যে, এটি মদিনায়ে মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি হলো وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ....وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ; আর এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের আরেক দল উপরিউক্ত আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। আর اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ বাক্য দ্বারা 'আহলে কেতাবের আলেমদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মোকাতেল (র.) এ মত পোষণ করতেন। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এর দ্বারা সকল মোমেন বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কুরতুবী, খ.- ৪, পৃ-২৫৮, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ-৫৫৫]

নামকরণ : এ সূরার নাম সাবা। এটি একটি স্থানের নাম। সাবা এলাকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তারা ছিল অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল। ইতিপূর্বে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনায় রাণী বিলকিসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিলকিস এ সাবারই রাণী ছিলেন। সাবা এলাকাবাসীর সমৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হওয়া ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু এ কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। পরিণামে তারা হয়েছিল অভিশপ্ত, ভাগ্য বিড়ম্বিত। এ সূরায় তাদের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তাদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে 'আমানতের' উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আমানতের খেয়ানতকারীদের শোচনীয় পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন সাবা জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছিল, কিন্তু নাফরমানি, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা এবং অহংকার তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণে অবহেলা করবে, সেই মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে আজাব দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে 'সাবা' জাতির মুশরিক ও মুনাফিকদের শাস্তির ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

সাবা জাতির ঘটনার পূর্বে এ সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের এ দুজন মনোনীত বান্দা কিভাবে তাঁদের প্রতি অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণ করেছেন, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে এ সূরায়। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.) শুধু নবীই ছিলেন না; বরং সে যুগের বাদশাহও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। আর সে ক্ষমতা সাধারণ রাজা বাদশাহ ক্ষমতার আনুরূপ নয়; বরং অসাধারণ ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। জিন জাতি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অনুগত ছিল, পশু-পক্ষী তাঁর তাবেদার ছিল, আল্লাহ পাক বাতাসকেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত থাকতেন, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা মশগুল থাকতেন, তাঁর শোকরগুজারীতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।

আলোচ্য সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনার পরই 'সাবা' জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ-৫, পৃ. -৫৫৫-৫৭]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী 'দালায়েলে' এর উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ.-৫, পৃ-২৪৫]

আল্লামা আলূসী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একবার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা আলূসী (র.) আরো লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে ইরশাদ হয়েছে। يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ কাফেররা বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেয়ামত হবে'? আর এ সূরায় ইরশাদ হয়েছে وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ। অর্থাৎ কাফেররা কিয়ামতকে সরাসরি অস্বীকার করে বলতো যে, 'কিয়ামত আমাদের নিকট আসবেনা' তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে এ সূরায়।

শানে নুযূল : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াত لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ যখন নাজিল হলো [আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিক নারী পুরুষকে শাস্তি দেবেন] একথা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার অন্যান্য কাফেররা বলল, হযরত মোহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে যে, 'আমাদের মৃত্যু হবে এবং এরপর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হাজির করা হবে এবং আমাদের শাস্তি হবে, অথচ কিয়ামত কখনও আমাদের নিকট আসবেনা', তারই জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন। قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, 'কেন নয়' অবশ্যই আসবে' শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে' এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর দ্বারাও উভয় সূরার মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবন করা যায় -[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ ২২, পৃ. -১০২-০৩]

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ : 'যিনি আসমান জমীনের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি যাঁর কৃত্বাধীন, তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা'।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সূরা সাবা আরম্ভ করা হয়েছে اَلْحَمْدُ দ্বারা তথা 'প্রশংসা মাত্রইও এক আল্লাহ পাকের জন্যে' একথা দ্বারা। পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরা মধ্যে পাঁচটি সূরা 'আলহামদু' বাক্য দ্বারা শুরু করা হয়েছে ১. সূরা ফাতেহা, ২. সূরা আনআম, ৩. সূরা কাহাফ, ৪. সূরা সাবা। ৫. সূরা ফাতের।

মূলত : মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামত অনন্ত অসীম। এ নিয়ামতের উল্লেখ যেখানে করা হয়েছে সেখানে আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে হয়েছে এবং ২. যে নিয়ামত অব্যাহত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত নিয়ামত ইতিপূর্বে ছিলনা, তা সৃষ্টি করা হয়েছে, আর শেষোক্ত নিয়ামত ইতিপূর্বে ছিল আর অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ নিয়ামত সমূহ পুনরায় দু'প্রকার ১. দুনিয়ার নিয়ামত ২. আখেরাতের নিয়ামত। এমনিভাবে, আরো দু' প্রকার নিয়ামত রয়েছে ১. দৈহিক, ২. আধ্যাত্মিক।

যে পাঁচটি সূরা 'আলহামদু' দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকটিতে কোন এক প্রকার নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতের জন্যে শোকর আদায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন এ সূরা শুরু করা হয়েছে 'আলহামদু' দ্বারা এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান জমিনের যাবতীয় নিয়ামত ও সকল রহমত আল্লাহ পাকেরই দান। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার একচ্ছত্র মালিকানা শুধু আল্লাহ পাকেরই। সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত কার্যকর রয়েছে এবং সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই। আর শুধু যে আসমান জমিনের নিয়ামত সমূহই আল্লাহই পাকের তাই নয়; বরং আখেরাতের নিয়ামত সমূহও শুধুমাত্র, এজন্যে আখেরাতের সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারীও তিনিই।

عَالِمِ الْغَيْبِ : এটা رب শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিরর মধ্য থেকে এ স্থলে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সকল মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্র করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কিরূপে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোনো বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোনো কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারও এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণা সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী لَتَاْتِيَنَّكُمْ বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য মুমিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিজিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীতে اَلَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে এবং মানুষকে তা থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে। مُعٰجِزِيْنَ অর্থাৎ তারা যেমন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার জন্য। اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ মর্মন্তুদ শাস্তি।

قَوْلُهُ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ : এতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিয়ামতে বিশ্বাসী মুমিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।

قَوْلُهٗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ الخ : এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা ও উপহাসের ছলে বলত, এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতঃপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি বলে এখানে নবী কারীম ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ : শব্দটি مَزَّقَ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। كُلَّ مُمَزَّقٍ -এর অর্থ– মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতঃপর কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

قَوْلُهٗ اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ : উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনে শুনে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, না হয় সে উন্মাদ, যার কথার কোনো সঠিক ভিত্তি থাকে না।

قَوْلُهٗ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ : এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশালকায় সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আজাবে রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

অনুবাদ :

١٠. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط نُبُوَّةً وَكِتَابًا وَقُلْنَا يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ رَجِّعِىْ مَعَهٗ بِالتَّسْبِيْحِ وَالطَّيْرَ ط بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلٰى مَحَلِّ الْجِبَالِ اَىْ وَدَعَوْنَاهَا لِلتَّسْبِيْحِ مَعَهٗ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ فَكَانَ فِىْ يَدِهٖ كَالْعَجِيْنِ .

১০. আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ নবুয়ত ও কিতাব দান করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যে, হে পর্বতমালা তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর ওহে পক্ষীসকল তোমরাও طَيْرَ শব্দটি নসববিশিষ্ট جِبَالُ -এর অবস্থার উপর আতফ অর্থাৎ তাদেরকেও দাউদের সাথে তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছি এবং আমি তার জন্যে লৌহকে নরম করেছিলাম অতএব লৌহ তার হাতে ভেজানো ময়দার মতো হয়ে যেত।

١١. وَقُلْنَا اَنِ اعْمَلْ مِنْهُ سٰبِغٰتٍ دُرُوْعًا كَوَامِلَ يَجُرُّهَا لَابِسُهَا عَلَى الْاَرْضِ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ اَىْ نَسْجِ الدُّرُوْعِ قِيْلَ لِصَانِعِهَا سَرَّادٌ اَىْ اِجْعَلْهُ بِحَيْثُ تَتَنَاسَبُ حَلَقُهٗ وَاعْمَلُوْا اَىْ اٰلَ دَاوٗدَ مَعَهٗ صَالِحًا ط اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَاُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

১১. এবং আমি তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, পূর্ণ লোহার পোষাক যার পরিধানকারী ভূমিতে হামাগুড়ি দেয় কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর লোহার জামার কারিগরকে سَرَّادٌ বলা হয় অর্থাৎ এমন জামা তৈরি কর যাঁর কড়া যথাযথ সংযোগ হয় এবং হে দাউদ পরিবার তোমরা তাঁর সাথে সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখি অতএব তোমাদের এর প্রতিদান দেব।

١٢. وَ سَخَّرْنَا لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ تَسْخَرُ غُدُوُّهَا سَيْرُهَا مِنَ الْغُدْوَةِ بِمَعْنَى الصَّبَاحِ اِلَى الزَّوَالِ شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا سَيْرُهَا مِنَ الزَّوَالِ اِلَى الْغُرُوْبِ شَهْرٌ ج اَىْ مَسِيْرَتُهٗ وَاَسَلْنَا اَذَبْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ط اَىِ النُّحَاسِ فَاُجْرِيَتْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ كَجَرْيِ الْمَاءِ وَعَمَلُ النَّاسِ اِلَى الْيَوْمِ مِمَّا اُعْطِىَ سُلَيْمَانُ .

১২. আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে অন্য কেরাত মতে اَلرِّيْحُ -এর মধ্যে পেশ পড়বে تَسْخَرُ ফে'লের সাথে যা সকালে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক মাসের পথ আর বিকালে সূর্যাস্ত থেকে ডুবা পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। غُدُوٌّ শব্দটি اَلْغُدْوَةُ থেকে নির্গত যার অর্থ সকাল আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। অতএব তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবহমান ছিল সুলায়মানকে মোজেজা স্বরূপ দান করা হয়েছে এবং লোকেরা আজ পর্যন্ত তা ব্যবহার করেছে।

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ بِأَمْرِ رَبِّهِ ط وَمَنْ يَّزِغْ يَعْدِلْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَهُ بِطَاعَتِهِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ وَقِيْلَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَضْرِبَهُ مَلَكٌ بِسَوْطٍ مِنْهَا ضَرْبَةً تُحْرِقُهُ.

কতক জিন তার সামনে তার পালনকর্তার নির্দেশে কাজ করত। তাদের যে কেউ আমার আদেশ সুলায়মানের আনুগত্যে অমান্য করবে, আমি তাদের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির আস্বাদন করাব। পরকালে জাহান্নামের আগুন দ্বারা, আর বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াতে তাদেরকে একজন ফেরেশতা আগুনের লৌহ দিয়ে আঘাত করবে অতঃপর আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দেবে।

١٣. يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ أَبْنِيَةٍ مُرْتَفِعَةٍ يُصْعَدُ إِلَيْهَا بِدُرُجٍ وَتَمَاثِيْلَ جَمْعُ تِمْثَالٍ وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ مَثَّلْتَهُ بِشَيْءٍ أَيْ صُوَرٌ مِنْ نُحَاسٍ وَزُجَاجٍ وَرُخَامٍ وَلَمْ يَكُنْ اِتِّخَاذُ الصُّوَرِ حَرَامًا فِي شَرِيْعَتِهِ وَجِفَانٍ جَمْعُ جَفْنَةٍ كَالْجَوَابِ جَمْعُ جَابِيَةٍ وَهِيَ حَوْضٌ كَبِيْرٌ يَجْتَمِعُ عَلَى الْجَفْنَةِ أَلْفُ رَجُلٍ يَأْكُلُوْنَ مِنْهَا وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ ثَابِتَاتٍ لَهَا قَوَائِمُ لَا تَتَحَرَّكُ عَنْ أَمَاكِنِهَا تُتَّخَذُ مِنَ الْجِبَالِ بِالْيَمَنِ يُصْعَدُ إِلَيْهَا بِالسَّلَالِمِ وَقُلْنَا اِعْمَلُوْا يَا آلَ دَاوٗدَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ شُكْرًا لَهُ عَلَى مَا آتَاكُمْ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ الْعَامِلُ بِطَاعَتِيْ شُكْرًا لِنِعْمَتِيْ.

১৩. তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী নির্মাণ করত মাহারিব তথা দুর্গ উঁচু দালান যেখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠা হয় তামাছীল তথা ভাস্কর্য تَمَاثِيْلَ শব্দটি تِمْثَالٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ কোনো বস্তুর চিত্র নির্মাণ করা তামা বা সিসা বা মরমর পাথর দ্বারা এবং তার শরিয়তে ফটো বা ছবি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র جِفَانٍ শব্দটি جَفْنَةٌ-এর বহুবচন আর جَوَابِ শব্দটি جَابِيَةٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ বড় হাউজ যেখানে পাত্রসহ হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে সেখান থেকে আহার করে এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ এমন বড় ডেগ যার খুটি থাকত ও নিজ স্থান থেকে সরানো যেত না। এটা ইয়েমেনের পাহাড়ে নির্মাণ করা হতো এবং এতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো এবং আমরা বললাম, হে দাউদ পরিবার তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত আল্লাহর আনুগত্য কর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

١٤. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ عَلَى سُلَيْمَانَ الْمَوْتَ أَيْ مَاتَ وَمَكَثَ قَائِمًا عَلَى عَصَاهُ حَوْلًا مَيِّتًا وَالْجِنُّ تَعْمَلُ تِلْكَ الْأَعْمَالَ الشَّاقَّةَ عَلَى عَادَتِهَا لَا تَشْعُرُ بِمَوْتِهِ حَتَّى أَكَلَتِ الْأَرَضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ مَيِّتًا.

১৪. যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম অর্থাৎ সোলায়মান মৃত্যুবরণ করলেন এবং তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে এক বৎসর পর্যন্ত মৃত্যু অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। জিনরা তাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজে মশগুল ছিল। তারা সোলায়মানের মৃত্যুর বিষয়ে অবগত হয়নি। শেষ পর্যন্ত উই পোকা তার লাঠিখানা খেয়ে ফেলে অতএব তিনি মৃত্যু অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন।

مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مَصْدَرُ أُرِضَتِ الْخَشَبَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَكَلَتْهَا الْأَرَضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ط بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهِ بِالْفٍ عَصَاهُ لِأَنَّهَا تُنْسَأُ أَيْ يُطْرَدُ وَيُزْجَرُ بِهَا فَلَمَّا خَرَّ مَيْتًا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ انْكَشَفَ لَهُمْ أَنْ مُخَفَّفَةٌ أَيْ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَمِنْهُ مَا غَابَ عَنْهُمْ مِنْ مَوْتِ سُلَيْمَانَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ الْعَمَلِ الشَّاقِّ لَهُمْ لِظَنِّهِمْ حَيَاتَهُ خِلَافَ ظَنِّهِمْ عِلْمَ الْغَيْبِ وَعُلِمَ كَوْنُهُ سَنَةً بِحِسَابِ مَا أَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ مِنَ الْعَصَا بَعْدَ مَوْتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَثَلًا .

তখন ঘুন পোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। الْأَرْضِ শব্দটি أُرِضَتِ الْخَشَبَةُ থেকে مَصْدَر مَجْهُوْل অর্থাৎ ঘুন পোকা তা খেয়ে ফেলে তারা সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল مِنْسَأَة শব্দটি হামযা ও হামযাবিহীন আলিফ দ্বারা مِنْسَاة অর্থাৎ তার লাঠি এবং তিনি উক্ত লাঠি দ্বারা কোনো কিছু সরাতেন, দূর করতেন ও ধমকাতেন। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন মৃত্যু অবস্থায় তখন জিনেরা বুঝতে পারল। যদি জিনেরা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখত তাহলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। এবং তাদের ইলমে গায়েব জানার দাবি এটা দ্বারা খণ্ডন হয়। তাদের কাছে সোলায়মানের মৃত্যু অজানা ছিল অর্থাৎ তারা ইলমে গায়েবের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও হযরত সোলায়মানকে জীবিত মনে করে কঠিন কাজে মগ্ন থাকতেন না। এক বছর কাজে মগ্ন থাকার পরিমাণ, তার মৃত্যুর পর একদিনে রাতে ঘুন পোকার লাঠির পরিমাণ খাওয়া হিসাবে করে বের করা হয়। উল্লেখ্য যে, হযরত সোলায়মানের যুগে জিন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, জিনরা ইলমে গায়েব রাখত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধারণা খণ্ডন করার জন্য সোলায়মানের মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত করলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أَوِّبِي : এটা تَأْوِيْبٌ মাসদার হতে أَمْر -এর وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ تَرْجِيْع অর্থে তথা বার বার দোহরানো, পুনরাবৃত্তি করা, তাকরার করা। أَوِّبِي মূলত أَوِّبِيْنَ ছিল। أَمْر-এর কারণে শেষের نُوْن টি পড়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا : এখানে وَاو টি إِسْتِئْنَافِيَه এবং لَام টি উহ্য কসমের জবাবের উপর প্রবেশ করেছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, وَعِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا لَقَدْ آتَيْنَا مِنَّا ; আর مِنَّا টা آتَيْنَا-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। অথবা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে حَال হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো كَائِنًا مِنَّا فَضْلًا ; আর كَائِنًا مِنَّا মূলত فَضْلًا -এর সিফত হয়েছে। مُقَدَّم হওয়ার কারণে حَال হয়ে গেছে। فَضْلًا হলো দ্বিতীয় মাফউল এবং دَاوُد হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ قُلْنَا يَا جِبَالُ : يَاجِبَالُ হলো قُلْنَا উহ্য ফে'লের مَقُوْلَه -এবং آتَيْنَا -এর উপর এর আতফ হয়েছে। وَالطَّيْرَ -এর আতফ جِبَالُ -এর مَحَل -এর উপর হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা مُنَادٰى مُفْرَدْ টা مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়ে থাকে। অথবা مَفْعُوْل مَعَهُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর جِبَالُ শব্দের উপর عَطْف হওয়ার কারণে مَرْفُوْع রূপেও পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهُ دُرُوْعًا : ব্যাখ্যাকার (র.) دُرُوْعًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন سَابِغَاتٍ হলো সিফত دُرُوْعًا তার মওসূফ যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ سَرْدٍ : এটা লৌহবর্মকে বলা হয়। বর্ম নির্মাণকারীকে سَرَّاد বলা হয়।

قَوْلُهُ لِسُلَيْمَانَ : মুফাসসির (র.) سَخَّرْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, جَار مَجْرُوْر-এর সম্পর্ক سَخَّرْنَا-এর সাথে হয়েছে। আর رِيْحٌ টা مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর رَفْع-এর সুরতে رِيْحٌ টা উহ্য মুযাফের সাথে হয়েছে। আর لِسُلَيْمَانَ হলো خَبَر مُقَدَّمْ উহ্য ইবারত হলো لِسُلَيْمَانَ كَائِنَةٌ وَتَسْخِيْرُ الرِّيْحِ مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ মুযাফকে ফেলে দিয়ে مُضَاف اِلَيْه কে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنَ الْجِنِّ : مِنَ الْجِنِّ উহ্য ফে'লের مُتَعَلِّقْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَسَخَّرْنَا لَهُ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ আর مَنْ يَّعْمَلُ উহ্য ফে'লের مفعول به হবে। আবার এটাও জায়েজ যে, مِنَ الْجِنِّ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর مَنْ يَّعْمَلُ হলে مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ قُدُوْر : এটা قِدْرٌ-এর বহুবচন, অর্থ হাঁড়ি পাতিল, رَاسِيَاتٍ অর্থাৎ ثَابِتَاتٍ

قَوْلُهُ اِعْمَلُوْا : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হয়েছে اٰل دَاوٗد হলো مُنَادٰى আর حَرْف نِدَاء উহ্য রয়েছে এবং شُكْرًا হলো مَفْعُوْل لَهُ

قَوْلُهُ قَلِيْل : এটা خَبَر مُقَدَّمْ আর مِنْ عِبَادِيْ তার সিফত এবং اَلشَّكُوْرُ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ مِنْسَاةَ : এটা مِفْعَلَةٌ-এর ওজনে এক কেরাতে اَلِف সহ রয়েছে। অর্থ লাঠি, প্রতিহত করার যন্ত্র।

قَوْلُهُ دَابَّةُ الْاَرْضِ : সাদা পিঁপড়া, পিপড়া বিশেষ যা কিতাব ও কাঠ নষ্ট করে ফেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান ও জমিন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিল যে, এ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমিনের সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের কুদরতের, তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের বহু বিস্ময়কর জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। অবশ্যই এ নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার সে বান্দাদের জন্যে যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার এমন দুজন বান্দার আলোচনা স্থান পেয়েছে, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম নিয়ামত দান করেছিলেন, একদিকে তাঁদেরকে দান করেছিলেন নবুয়ত, অন্যদিকে দুনিয়ার রাজত্ব বা ক্ষমতাও দান করেছিলেন। দীন ও দুনিয়ার এতসব নিয়ামত লাভের পরও তাঁরা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হননি; বরং সর্বদা আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শোকর গুজার থাকতেন। যদি রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন ও জটিল দায়িত্ব পালনের কারণে কখনও কোনো ভুল-ত্রুটি বা গাফলত হয়ে থাকে, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সেজদারত হতেন এবং এস্তেগফার করতেন। আর এটিই হলো প্রকৃত বান্দার বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত : এ ঘটনার শেষ বিচারের দিন বা কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কথার জবাবও রয়েছে। আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দার জন্যে কোনো পাহাড় পর্বতকে অনুগত করে দেন এবং লৌহকে কোমল করে দেন, তখন তিনি কি মৃত মানুষের হাড় অস্থিকে একত্রিত করে তাঁকে পুনর্জীবন দান করতে পারেন না? তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا : অর্থাৎ দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فَضْل-এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলি যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কতক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলি দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ গুণাবলি এই ছিল যে, তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহর জিকির অথবা যাবুর তিলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুল ও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মোজেজা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ يَاجِبَالُ اَوِّبِيْ : শব্দটি تَاْوِيْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বারবার করা। আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ.) আল্লাহর জিকির ও তাসবীহ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেই সব বাক্য বারবার আবৃত্তি কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ শব্দের তাফসীর তাই করেছেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পবর্তমালার এই তাসবীহ পাঠ সেই সাধারণ তাসবীহ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে; وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ জগতের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তাসবীহ হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মোজেজার মর্যাদা রাখে। তাই এ তাসবীহ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মোজেজা হতো না।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোনো গম্বুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কুরআন পাক একে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফেরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالطَّيْرَ : এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়াপদের مَفْعُوْل হয়ে مَنْصُوْب হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী] অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরূপ তাশবীহ পাঠ করত। অন্য এক আয়াত আছে, اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

قَوْلُهٗ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ : অর্থাৎ আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মোজেজা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মোজেজারূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মতো নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোনো কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হতো না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোনো হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী قَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। قَدِّرْ শব্দটি تَقْدِيْرٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা। سَرْد-এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তাঁর কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[ইবনে কাসীর]

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ-এর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফজিলত : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরূপভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহবী রচিত 'আত্তিব্বুন্নবী' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা নেওয়া যার জন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ : আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোনো শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হতো না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হতো না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথার শিকড় গেড়ে বসেছে।

হযরত দাউদ (আ.)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য : তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে হযরত দাউদ (আ.) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হতো, সেই হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা গুণকীর্তন ও ন্যায়বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন। হযরত দাউদ (আ.) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হলো। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুবক ভালো লোক। নিজের জন্য এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারি ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোনো হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মতো নরম করে দেওয়া হলো, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

قَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ : হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলেন। হযরত সোলায়মার (আ.)- তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, একটি কর্মের প্রতিদানে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামাজ কাযা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানি করে দিলেন। কেননা তাঁর শরিয়তে গরু-মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানিও জায়েজ ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারি ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কুরবানি করার কারণে নিজের ধনসম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর আরোহণের জন্য কুরবানি করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরোও উত্তম বস্তু দান করলেন। -[কুরতুবী]

غُدُوٌّ শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رَوَاحٌ শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ.) সকালে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌঁছে আহার করতেন। অতঃপর সেখান থেকে জোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিতে কাবুল পৌঁছতেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ : অর্থাৎ আমি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হতো এবং উত্তপ্ত ছিল না। অনায়াসেই এর পাত্র ইত্যাদি তৈরি করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইয়েমেনে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়েমেনের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قِطْر শব্দের অর্থ গলিত তামা। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ : এ বাক্যটিও উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়া-পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কতক জিনকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যাঁরা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আ.)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-নওকরের মতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন অধীন করা কিরূপ : এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল যা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও অজিফার কোনো প্রভাব ছিল না। আল্লামা শরবিনী 'সিরাজুল মুনীর' তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবূ হুরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবূ আইউব আনসারী, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্তু আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলেমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরিয়তে জায়েজ কি না, তা চিন্তার বিষয় বটে। অষ্টম শতাব্দীর আলেম কাজী বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে "আ-কামুল মারজান ফী আহকামিল জান" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহর আদেশক্রমে মোজেজারূপে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বরখিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলি খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাত আবূ নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা গ্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলি এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরও লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরি কলেমা ও জাদুকে কাজে লাগায়। কাফের জিন ও শয়তান এ গুলো খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এতটুকুই যে, তারা আলেমদের কুফরি শিরকি আমলে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলেমরা কুরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাফের জিন ও শয়তান খুশি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলিফা মু'তাযিদ বিল্লাহর আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোনো শরিয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

সারকথা এই যে, যদি কোনো ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর মেহেরবানিতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন হযরত সোলায়মান (আ.) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মোজেজা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমলের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরি বাক্য অথবা কুফরি কর্ম থাকে, তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গুনাহ সম্বলিত আমল হলে কবিরা গুনাহ হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও ফিকহবিদগণ নাজায়েজ বলেছেন। কারণ এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গুনাহ থাকা বিচিত্র নয়। কাজী বদরুদ্দীন আ-কামুল মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবলির ব্যবহারকেও নাজায়েজ লেখেছেন।

বশীকরণের আমল যদি আল্লাহর নামসমূহ অথবা কুরআনি আয়াতের মাধ্যমে হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারের মতো গুনাহ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েজ যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই, উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসাবে এরূপ আমল করা নাজায়েজ। কারণ এতে إِسْتِرْقَاقٌ অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরি হয়ে পড়ে, যা হারাম।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ : অর্থাৎ কোনো জিন যদি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহান্নামের আজাব বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুন দ্বারা সৃজিত। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্তু তাকে মৃত্তিকা ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান অগ্নি। কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَيَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ : এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা হযরত সোলায়মান (আ.) জিনদের দ্বারা করাতেন। مَحَارِيْبَ শব্দটি مِحْرَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকের নিজেদের জন্য যে, সরকারি বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও مِحْرَابٌ বলা হয়। এ শব্দটি حَرْبٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে مِحْرَابٌ বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই مِحْرَابٌ বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই مَحَارِيْبَ শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে مَحَارِيْبُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ এবং ইসলাম যুগে مَحَارِيْبُ صَحَابَةٍ বলে তাঁদের মসজিদ বুঝানো হতো।

মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রবর্তন করেন। আরও একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায়। নামাজিদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দাঁড়াবার স্থান কিবলার দিকস্থ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সকল কাতার নামাজিদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরানিব ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, নামাজিদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং যারা এর খেলাফ করে তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'আত বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ جِفَانٌ : শব্দটি جَفْنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন তসলা, টব ইত্যাদি। جَوَابٌ শব্দটি جَابِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সামনে পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قُدُوْرٌ শব্দটি قِدْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

رَاسِيَاتٌ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এমন বড় ও ভারি ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবত এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হতো, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তাফসীরবিদ যাহহাক এ তাফসীরই করেছেন।

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান : কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নিয়ামত দাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেওয়া নিয়ামতকে তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবূ আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, নামাজ কৃতজ্ঞতা, রোজা কৃতজ্ঞতা এবং প্রত্যেক সৎকর্ম কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী বলেন, আল্লাহভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা। -[ইবনে কাসীর]

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ করার জন্য اُشْكُرُوْنِيْ সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اِعْمَلُوْا شُكْرًا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত ইঙ্গিত করেছে যে, হযরত দাঊদ (আ.)-এর পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সে মতে হযরত দাঊদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোনো মুহূর্ত যেত না, যাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে হযরত দাঊদ (আ.)-এর জায়নামাজ কোনো সময় নামাজি থেকে খালি থাকত না। -[ইবনে কাসীর]

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাঊদ (আ.)-এর নামাজ অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদতের দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাঊদ (আ.)-এর রোজাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোজা রাখতেন। -[ইবনে কাসীর]

হযরত ফুযায়েল (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাঊদ (আ.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরজ করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? আমার উক্তিগত অথবা কর্মগত শোকর তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, اَلْاٰنَ شَكَرْتَنِيْ يَا دَاوُدُ অর্থাৎ হে দাঊদ! এখন তুমি আমার শোকর আদায় করেছ। কেননা যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তরিমিযী ও ইমাম জাসসাস হযরত আতা ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। اعملوا ال داود شكرا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে হযরত দাঊদ (আ.)-এর পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সে তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, ১. সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং ৩. গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। [কুরতুবী, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস]

قَوْلُهُ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ : শোকরের আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মু'মিনদেরকে শোকরে উৎসাহিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ : আয়াতে مِنْسَاةٌ শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবি শব্দ نَسَأٌ শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেওয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে مِنْسَاةٌ অর্থাৎ সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথ নির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ.) অদ্বিতীয় ও অনুপম সম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয়; বরং জিন জাতি, বিহঙ্গকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর আদেশ কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত দাঊদ (আ.) শুরু করেছিলেন এবং হযরত সোলায়মান (আ.) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহর নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো তিনি ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তাঁরা জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে লাগল। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজও সমাপ্ত হয়ে গেল। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর লাঠিতে আল্লাহ তা'আলা উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফারসিতে দেওক, উর্দুতে দীমকে বলা হয়। কুরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খেয়ে ফেলল। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আ.)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনরা জানতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়েবের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব [অদৃশ্য জ্ঞানী] নয়। কারণ তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে হযরত সোলায়মান (আ.) -এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عَذَابٌ مُهِينٌ বলে সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য হযরত সোলায়মান (আ.) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষা অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্ত্বেও হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ সমাপ্ত করিয়ে নেওয়া হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তিও বাহ্যত গায়েবি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলি দেখে এ বিষয়ের আশঙ্কা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশঙ্কার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে হযরত সোলায়মান (আ.) দুটি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ১. বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং ২. মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশঙ্কা না থাকে। -[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত সোলায়মান (আ.) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাজের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে [অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না।] মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে হযরত সোলায়মান (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল কুরবানি করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর 'ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন– হে আল্লাহ, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে এই নিয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েতপ্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোনো বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি।

১. গোনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন।
২. যে ব্যক্তি কোনো ভয় ও আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিন।
৩. রুগ্ণ ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন।
৪. নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন।

৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোনো অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়। -[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজ বাকি ছিল। এর জন্য হযরত সোলায়মান (আ.) উপরিউক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর হযরত সোলায়মান (আ.) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। -[কুরতুবী] কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, হযরত সোলায়মান (আ.) অনেক পূর্বেই মারা গেছেন কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, হযরত সোলায়মান (আ.) -এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়েসে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছর বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। -[মাযহারী, কুরতুবী]

অনুবাদ :

১৫. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ قَبِيْلَةٌ سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدٍّ لَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ فِيْ مَسْكَنِهِمْ بِالْيَمَنِ اٰيَةٌ ج دَالَّةٌ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ جَنَّتٰنِ بَدَلٌ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ عَنْ يَمِيْنِ وَادِيْهِمْ وَشِمَالِهِ وَقِيْلَ لَهُمْ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط عَلٰى مَا رَزَقَكُمْ مِنَ النِّعْمَةِ فِيْ اَرْضِ سَبَا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ لَيْسَ بِهَا سَبَاخٌ وَلَا بَعُوْضَةٌ وَلَا ذُبَابَةٌ وَلَا بَرْغُوْثٌ وَلَا عَقْرَبٌ وَلَا حَيَّةٌ وَيَمُرُّ الْغَرِيْبُ بِهَا وَفِيْ ثِيَابِهٖ قَمْلٌ فَيَمُوْتُ لِطِيْبِ هَوَائِهَا وَ اللّٰهُ رَبٌّ غَفُوْرٌ.

১৫. সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ইয়েমেনে ছিল এক নিদর্শন যা আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ বহন করে দুটি উদ্যান ডানদিকে ও বামদিকে অর্থাৎ তাদের ময়দানের ডান ও বাম দিকে। سَبَأٌ শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفٌ ও مُنْصَرِفٌ উভয়টি পড়া যাবে। একটি গোত্রের নাম। তাদের আরব পূর্বপুরুষের নামে নাম রাখা হয়। جَنَّتَانِ শব্দটি اٰيَةٌ থেকে بَدَلٌ তাদেরকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিজিক খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদের প্রতি সারা ভূমিতে দেওয়া রিজিক ও নিয়ামত সমূহের উপর এটা স্বাস্থ্যকর শহর অর্থাৎ উক্ত শহরে কোনো দূষিত শব্দ ছিলনা ও এতে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ -বিচ্ছুর মতো ইতর প্রাণীর নাম গন্ধও ছিলনা বাইরে থেকে কোনো মুসাফির শরীরে ও কাপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে আসলে সেগুলো শহরে মুক্ত আবহাওয়ার কারণে মরে যেত এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পালনকর্তা।

১৬. فَاَعْرَضُوْا عَنْ شُكْرِهٖ وَكَفَرُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ جَمْعُ عَرِمَةٍ وَهُوَ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهٖ اِلٰى وَقْتِ حَاجَتِهٖ اَىْ سَيْلَ وَادِيْهِمُ الْمَمْسُوْكِ بِمَا ذُكِرَ فَاَغْرَقَ جَنَّتَيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ تَثْنِيَةُ ذَوَاتٍ مُفْرَدٍ عَلَى الْاَصْلِ اُكُلٍ خَمْطٍ مُرٍّ بَشِعٍ بِاِضَافَةِ اُكُلٍ بِمَعْنٰى مَاْكُوْلٍ وَتَرْكِهَا وَيُعْطَفُ عَلَيْهِ وَاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ.

১৬. অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে ও তারা কুফরি করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা। عَرِمٌ শব্দটি عَرِمَةٌ এর বহুবচন, ঐ দালান ও প্রাচীরকে বলা হয়, যেখানে প্রয়োজনের স্বার্থে পানি আটকিয়ে জমা রাখা হয় অর্থাৎ সেই উদ্যানের স্টককৃত পানি সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়, অতঃপর সে পানি দ্বারা তাদের উদ্যান ও সম্পদসমূহ ডুবিয়ে দেয় এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল ذَوَاتَىْ শব্দটি ذَوَاتٌ একবচনের তাছনিয়্যাহ। اُكُلٍ শব্দটি ইযাফত দ্বারা অর্থ مَاْكُوْلٌ বা ইযাফতবিহীন ব্যবহৃত হয়েছে : اُكُلٍ -এর উপর اَثْلٍ কে আতফ করা হয়েছে। ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ।

١٧. ذٰلِكَ التَّبْدِيْلُ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ط بِكُفْرِهِمْ وَهَلْ نُجْزِيْ اِلَّا الْكَفُوْرَ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مَعَ كَسْرِ الزَّاىِ وَنَصْبِ الْكَفُوْرِ اَىْ مَا يُنَاقِشُ اِلَّا هُوَ.

১৭. এটা এই পরিবর্তন ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেইনা। نُجَازِىْ ফে'লকে يُجَازِىْ ও نُجَازِىْ -زَاءٌ-এর মধ্যে যের ও اَلْكَفُوْرِ কে নসব দ্বারা পড়বে অর্থাৎ কাফেরকেই শাস্তি দিই।

١٨. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ سَبَا وَهُمْ بِالْيَمَنِ وَبَيْنَ الْقُرٰى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا بِالْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَهِىَ قُرَى الشَّامِ الَّتِىْ يَسِيْرُوْنَ اِلَيْهَا لِلتِّجَارَةِ قُرًى ظَاهِرَةً مُتَوَاصِلَةً مِنَ الْيَمَنِ اِلَى الشَّامِ وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط بِحَيْثُ يَقِيْلُوْنَ فِىْ وَاحِدَةٍ وَيَبِيْتُوْنَ فِىْ اُخْرٰى اِلٰى اِنْتِهَاءِ سَفَرِهِمْ وَلَا يَحْتَاجُوْنَ فِيْهِ اِلٰى حَمْلِ زَادٍ وَمَاءٍ وَقُلْنَا سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فِىْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ.

১৮. আমি তাদের সবাবাসীদের তারা ইয়েমেনে থাকা অবস্থায় ও যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি পানি ও গাছপালা দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলাম সিরিয়ার ঐ সমস্ত এলাকা যেখানে তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেত সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম। যা ইয়েমেন ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে খুব কাছাকাছি ছিল। এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারণ করেছিলাম তারা একগ্রামে বিশ্রাম নিত এবং অন্য গ্রামে রাত্রিযাপন করত এমনিভাবে তাদের সফরের সময় অতিক্রম করত। এবং সফর কালে কোনো পানি ও সরঞ্জামাদি বহন করতে হতো না আমি বললাম, তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। অর্থাৎ রাতে ও দিনে কোনো ভয় নেই।

١٩. فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا اِلَى الشَّامِ اِجْعَلْهَا مَفَاوِزَ لِيَتَطَاوَلُوْا عَلَى الْفُقَرَاءِ بِرُكُوْبِ الرَّوَاحِلِ وَحَمْلِ الزَّادِ وَالْمَاءِ فَبَطَرُوا النِّعْمَةَ وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ط فَرَّقْنَاهُمْ بِالْبِلَادِ كُلَّ التَّفْرِيْقِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ عِبَرًا لِكُلِّ صَبَّارٍ عَنِ الْمَعَاصِىْ شَكُوْرٍ عَلَى النِّعَمِ.

১৯. অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর সিরিয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে দাও। অন্য কেরাত মতে بَاعِدْ পড়বে, অর্থাৎ এ সমস্ত জনপদকে মরুভূমি বানিয়ে দিন যাতে তারা সফরের সরঞ্জামাদি ও সাওয়ারি নিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের পরিবর্তে গৌরবের সাথে ভ্রমণ করতে পারে। অতঃপর তারা নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করল তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল কুফরি দ্বারা ফলে আমি তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্যে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। তাদের এলাকাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলাম নিশ্চয় এতে উল্লিখিত ঘটনাবলির মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল গুনাহের উপর কৃতজ্ঞ ব্যক্তির নিয়ামতের প্রতি জন্যে নিদর্শনাবলি উপদেশ রয়েছে।

২০. وَلَقَدْ صَدَّقَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ اَىْ الْكُفَّارِ مِنْهُمْ سَبَا اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ اِنَّهُمْ بِاِغْوَائِهِ يَتَّبِعُوْنَهُ فَاتَّبَعُوْهُ فَصَدَقَ بِالتَّخْفِيْفِ فِىْ ظَنِّهِ اَوْ صَدَّقَ بِالتَّشْدِيْدِ ظَنَّهُ اَىْ وَجَدَهُ صَادِقًا اِلَّا بِمَعْنٰى لٰكِنْ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْبَيَانِ اَىْ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَمْ يَتَّبِعُوْهُ

২০. আর তাদের কাফেরদের যেমন, সাবা উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ও অনুগত বানিয়ে ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। صَدَّقَ ফে'লটি তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদ বিহীন উভয় কেরাতে পড়বে। صَدَقَ তাশদীদ বিহীন হলে অর্থ হবে, তার ধারণা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। صَدَّقَ তাশদীদযুক্ত হলে অর্থ হবে, সে তর ধারণা সত্য করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর اِلَّا টি لٰكِنْ -এর এবং مُؤْمِنِيْنَ টি فَرِيْقًا এর بَيَانْ অর্থাৎ সে সমস্ত মুমিনগণ তার অনুসরণ করেনি।

২১. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ تَسْلِيْطٍ مِنَّا اِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ ط فَنُجَازِىْ كُلًّا مِنْهُمَا وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ رَقِيْبٌ .

২১. তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত শয়তানের কোনো ক্ষমতা ছিল না যে, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যাতে আমি প্রত্যেককে প্রতিদান দেই] আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُكُلْ : এর অর্থ ফল, خَمْطٍ অর্থ পিলুবৃক্ষের ফল, প্রত্যেক টক ও তিক্ত বস্তু।

قَوْلُهُ بَشِعٌ : বিস্বাদ ও তিক্ত বস্তু।

قَوْلُهُ اَثْلٍ : ঝাঁউ গাছ, বহুবচনে اَثْلَاتٌ ,اَثَالٌ , اُثُوْلٌ

قَوْلُهُ ذَوَاتَىْ : এটা হলো ذُوْ-এর مُؤَنَّثْ যা দ্বিবচন, একবচনে ذَوَاتٌ মূলে ছিল ذَوَيَةٌ এতে ; হলো عَلَامَةُ تَانِيْث এখন يَا مُتَحَرِّكْ এবং তার পূর্বে مَفْتُوْحٌ হওয়ার কারণে يَا কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করায় ذَوَاتٌ হয়ে গেছে। এরপর সহজ করণার্থে وَاوْ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে ذَاتُ হয়েছে। وَاحِدْ مُؤَنَّثْ এর সুরত দুটি ১. ذَاتٌ ২. ذَوَاتٌ মুফাসসির (র.)-এর উক্তি ذَوَاتَىْ আসলে ذَوَاتٌ-এর দ্বিবচন এর অর্থ হলো وَاوْ কে ফেলে দেওয়ার পূর্বের অবস্থার দ্বিবচন। যদি واو ফেলে দেওয়ার পরের দ্বিবচন হয় তা হলে হতো ذَاتَىْ

قَوْلُهُ بَشِعٌ : এটা كَتِفْ -এর ওজনে অর্থ বিস্বাদ, স্বাদহীন اُكُلِ خَمْطٍ এটা اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ -এর অন্তর্গত। এবং ইযাফত বিহীনও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ اُكُلِ خَمْطٍ এই সুরতে اُكُلِ মাওসূফ এবং خَمْطٍ সিফত হবে।

قَوْلُهُ يَعْطِفُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ اُكْلٌ ;عَلٰى اُكُلٍ -এর كَافٌ -এ সাকিন ও পেশ উভয়টি قِرَاءَتِ سَبْعَة-এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ : এখানে ذٰلِكَ টা جَزَيْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল যা مُقَدَّمْ হয়েছে। প্রথম মাফউল হলো هُمْ অর্থাৎ جَزَيْنٰهُمْ ذٰلِكَ التَّبْدِيْلُ

قَوْلُهُ بِكُفْرِهِمْ : অর্থাৎ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ : এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত অর্থাৎ প্রথম দান جَنَّتَيْنِ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উল্লিখিত تَبْدِيْل-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ سِيْرُوْا فِيْهَا : অর্থাৎ فِيْ هٰذِهِ الْمَسَافَةِ এটা أَمْر যা خَبَرْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিরাপত্তার সাথে সফর করত لَيَالِيْ এবং أَيَّامًا টা حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ إِلَّا بِمَعْنٰى لٰكِنْ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ কেননা মুমিনগণ কাফেরদের جِنْس -এর অন্তর্গত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রিসালত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মোজেজা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আজাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতরাজি : ইবনে কাসীর বলেন, ইয়েমেনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় নেতা। সূরা নমলে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সাথে নারী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন।' কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বন্যার আজাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা ছারখার হয়ে যায়। -[ইবনে কাসীর]

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল। কুরআনে উল্লিখিত 'সাবা' কোনো পুরুষের নাম না নারীর, না কোনো ভূ-খণ্ডের নাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়েমেনে এবং চারজন শামদেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়েমেনে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদহাজ, কেন্দা, ইযদ, আশআরী, আনমার, হিমইয়ার, [তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে] এবং শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাসসান [তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত]। এ রেওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আব্দুল বারও তাঁর "আলকাসদু ওয়াল উমামু বিমারেফতে আস সাবিল আরবে ওয়াল আজম" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষ আলেমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা দশজন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না; বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়েমেনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শামস। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বুঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লিখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইঞ্জীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে সে কয়েক লাইন আরবি কবিতাও বলেছিল। এ সব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

সাবার সন্তানদের ইয়েমেনে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আজাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। –[ইবনে কাসীর] কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ আরবি অভিধানে عَرِم শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তাফসীরকারকগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়ে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। কিন্তু কামূস, সেহাহ, জওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে عرم এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও عرم এর অর্থ বাঁধ বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই : ইয়েমেনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে মাআরেব শহর অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ [তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।] উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরি করে দিল। পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে লাগল। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হলো যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃঙ্খলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হতো। উপরের পানি শেষ হয়ে গেল মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হতো। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নিচে একটি সুবৃহৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হতো এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমূলের বাগান নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হতো। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কুরআন পাক جَنَّتَانِ অর্থাৎ দুই বাগান বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ এক সারির সমস্ত বাগানকে পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। কাতাদাহ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নারী মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত। হাত লাগানোরও প্রয়োজন হতো না। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ : আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মতো ইতর প্রাণীর নামগন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি শরীর ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। –[ইবনে কাসীর]

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ-এর সাথে رَبٌّ غَفُوْرٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং শোকর আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে। কারণ এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শোকর আদায়ে ঘটনাক্রমে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

قَوْلُهُ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সুবিস্তৃত নিয়ামত ও পয়গাম্বরগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহর আদেশ পালনে বিমুখ হলো, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাজত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মসিবতের কারণ করে দিলেন। তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধভাঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টি মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত গৃহ বিধ্বস্ত হলো এবং বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল লালন-পালন করল, যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তাকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। -[ইবনে কাসীর]

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়েমেনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদিনার বসতিও তাদের কতক। গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে-

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে خَمْط -এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবূ ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটা বিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمْط বলা হয়। اَثْل শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোনো ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন اَثْل এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটা বিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سِدْر -এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্পষ্ট সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদগত ও কাঁটা বিশিষ্ট ঝাড়ে হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশি ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْر শব্দের সাথে قَلِيْل যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদগত ছিল যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا : অর্থাৎ আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম। كُفْر শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গাম্বরকে মিথ্যারোপও করেছিল।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তা'আলা তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে فَتْرَت-এর কাল বলা হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে এ সময়ে কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরি হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাজিল করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَهَلْ نُجَازِيْ اِلَّا الْكَفُوْرَ : كَفُوْر শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকেই শাস্তি দেইনা, এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থি, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গুনাহগারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে, যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোনো শাস্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আজাব বুঝানো হয়েছে। এরূপ আজাব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট মুসলমানদের উপর এরূপ আজাব আসে না। -[রূহুল মা'আনী]

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খায়রাহর উক্তিতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, جَزَاءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهَنُ فِى الْعِبَادَةِ وَالضِّيْقُ فِى الْمَعِيْشَةِ وَالتَّعَسُّرُ فِى اللَّذَّةِ قَالَ لَا يُصَادِفُ لَذَّةً حَلَالًا اِلَّا جَاءَهُ مَنْ يُنَغِّصُهُ অর্থাৎ গুনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, যখন সে কোনো হালাল ভোগ্যবস্তু পায়, তখন কোনো-না কোনো কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয়। –[ইবনে কাসীর] এতে জানা গেল যে, মুসলমান গুনাহগারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোনো খোলাখুলি আজাব আসে না। এরটা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقَبُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ اِلَّا الْكَفُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না। –[ইবনে কাসীর] মু'মিনকে তার গুনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসাবে শাস্তি কেবল কাফেরকেই দেওয়া যায় মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোনো মু'মিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হয়।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ .... وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ : এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আরও একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। اَلْقُرَى الَّتِىْ بَارَكْنَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হতো। মা'আরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মা'আরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোনো মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোনো জনপদে পৌঁছে নিয়মত খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতঃপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তিতে পৌঁছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পৌঁছা যেত।

قَوْلُهُ فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ .... وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ : অর্থাৎ জালিমরা আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক। যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনোরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিজিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারি দান করুন। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বাঁধভাঙ্গা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

مَزَّقْنَاهُمْ শব্দটি تَمْزِيْق থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ মা'আরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলত تَفَرَّقُوْا اَيَادِيْ سَبَا অর্থাৎ তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আজাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ব হয়ে গেলে সে তাঁর সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বন্যা ও আজাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা নামক স্থানে গিয়ে বসবার কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদিনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইযদ গোত্র আম্মানে, গাসসান গোত্র বসরায় এবং আউস, খাযরাজ ও বনূ উসমান মদিনায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। বাতনেমুর নামক স্থানে পৌঁছে বনূ উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়া। আউস ও খাযরাজ মদিনায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করল। ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা مَزَّقْنَاهُمْ বাক্যে বিধৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : অর্থাৎ সাবা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোনো নিয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহর শোকর আদায় করে। এভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই উপকার লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে আদেশই জারি করেন, সব মঙ্গলেই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোনো নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তাঁর পরকালের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোনো কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও ছওয়াব সে পায়। ফলে বিপদেও তাঁর জন্য উপকারী হয়ে যায়। -[ইবনে কাসীর]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ صَبَّارٌ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী মুমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

অনুবাদ :

২২. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَىْ زَعَمْتُمُوْهُمْ اٰلِهَةً مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج اَىْ غَيْرِهٖ لِيَنْفَعُوْكُمْ بِزَعْمِكُمْ قَالَ تَعَالٰى فِيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ وَزْنَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ شِرْكَةٍ وَمَا لَهٗ تَعَالٰى مِنْهُمْ مِّنَ الْاٰلِهَةِ مِنْ ظَهِيْرٍ مُّعِيْنٍ .

২২. হে মুহাম্মদ! মক্কার কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা তাঁদেরকে আহ্বান কর যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা মাবুদ মনে করতে, তোমাদের ধারণা মতে তোমাদেরকে উপকার করার জন্যে। আল্লাহ বলেন, তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোনো কিছুর ভালো ও মন্দের মালিক নয়। এতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মাবুদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।

২৩. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ تَعَالٰى رَدًّا لِقَوْلِهِمْ اَنَّ اٰلِهَتَهُمْ تَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا لَهٗ ج فِيْهَا حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ عَنْ قُلُوْبِهِمْ كُشِفَ عَنْهَا الْفَزَعُ بِالْاِذْنِ فِيْهَا قَالُوْا قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِسْتِبْشَارًا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ط فِيْهَا قَالُوا الْقَوْلَ الْحَقَّ ج اَىْ قَدْ اَذِنَ فِيْهَا وَهُوَ الْعَلِىُّ فَوْقَ خَلْقِهٖ بِالْقَهْرِ الْكَبِيْرُ الْعَظِيْمُ .

২৩. যার জন্যে অনুমতি হয় সে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। তাদের উক্তি "নিশ্চয় তাদের মাবুদসমূহ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে" খণ্ডন করা হয়েছে। اَذِنَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়ভাবে পড়াবে যা যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হবে তখন তারা পরস্পর বলবে فُزِّعَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়ভাবে পড়া যাবে। অর্থাৎ যখন অনুমতি দানে তাদের অন্তর থেকে সংকোচ দূর হবে তখন তারা সুসংবাদের আশায় পরস্পরে বলবে তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন ? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন অর্থাৎ সুপারিশের অনুমতি প্রদান করেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান। তার সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান হিসেবে।

২৪. قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ الْمَطَرِ وَالْاَرْضِ ط النَّبَاتِ قُلِ اللّٰهُ ط اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهٗ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ اَىْ اَحَدَ الْفَرِيْقَيْنِ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ فِى الْاِبْهَامِ تَلَطُّفٌ بِهِمْ دَاعٍ اِلَى الْاِيْمَانِ اِذَا وُفِّقُوْا لَهٗ .

২৪. বলুন! নভোমণ্ডল সৃষ্টি ও ভূমণ্ডল শষ্য থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দান করেন? যদি তারা উত্তর না দেয় তাহলে আপনি নিজেই উত্তর দিন বলুন, আল্লাহ। কেননা এটা ব্যতীত অন্য কোনো উত্তর নেই আমরা অথবা তোমরা দুদল থেকে কোনো একদল সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ। এখানে বাক্যটি অস্পষ্ট হিসেবে তাদের প্রতি নরমসুর ও ঈমানের দিকে আহ্বান উদ্দেশ্য, যখন তাদের ঈমানের তাওফীক হয়।

٢٥. قُلْ لَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا اَذْنَبْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ لِاَنَّا بَرِيْئُوْنَ مِنْكُمْ.

২৫. বলুন, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না। কেননা আমরা তোমাদের কৃতকর্ম থেকে পবিত্র।

٢٦. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفْتَحُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط فَيُدْخِلُ الْمُحِقِّيْنَ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلِيْنَ النَّارَ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْحَاكِمُ الْعَلِيْمُ بِمَا يَحْكُمُ بِهٖ.

২৬. বলুন, আমাদের পালনকর্তা কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। অতএব মুমিনদেরকে জান্নাতে আর কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তিনি ফয়সালাকারী, তার বিচারকার্যে সর্বজ্ঞ।

٢٧. قُلْ اَرُوْنِيَ اَعْلِمُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۤءَ فِي الْعِبَادَةِ كَلَّا ط رَدْعٌ لَهُمْ عَنْ اِعْتِقَادِ شَرِيْكٍ لَهٗ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهٖ الْحَكِيْمُ فِيْ تَدْبِيْرِهٖ لِخَلْقِهٖ فَلَا يَكُوْنُ لَهٗ شَرِيْكٌ فِيْ مُلْكِهٖ.

২৭. বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে ইবাদতে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। কখনো না, এটা কাফেরদের প্রতি তাদের শিরকের আক্বীদার উপর ধমক বরং তিনিই ইনশাআল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় অতএব তার রাজত্বে কেউ তার সাথে শরিক হতে পারে না।

٢٨. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً حَالٌ مِنَ النَّاسِ قُدِّمَ لِلْاِهْتِمَامِ بِهٖ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا مُبَشِّرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا مُنْذِرًا لِلْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ.

২৮. আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা মুমিনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কাফেরদের জন্যে আজাবের সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি [كَاۤفَّةً শব্দটি النَّاسَ থেকে حَالٌ বিশেষ গুরুত্বের জন্য حَالٌ কে আগে নেওয়া হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কার কাফেরগণ তা জানে না।

٢٩. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ.

২৯. তারা বলে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হও, তবে বল, এ আজাবের ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে?

٣٠. قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ.

৩০. বলুন! তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্ত ও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। এটাই হলো কিয়ামতের দিবস।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ زَعَمْتُمُوْهُمْ اٰلِهَةً : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, زعمتم -এর উভয় মাফউল مَوْصُوْل بَاصِلَه দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে উহ্য রয়েছে। প্রথম মাফউলকে ফেলে দিয়েছে আর দ্বিতীয় মাফউল তথা اٰلِهَةٌ কে صِفَتْ অর্থাৎ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ফেলে দিয়েছে। প্রথম মাফউল হলো هُمْ আর দ্বিতীয় মাফউল হলো اٰلِهَةٌ

قَوْلُهُ لِيَنْفَعُوْكُمْ : এটা اُدْعُوْا -এর مُتَعَلِّقْ অর্থাৎ اُدْعُوْا لِيَكْشِفُوْا عَنْكُمُ الضُّرَّ

قَوْلُهُ وَمَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ : এখানে مَا হলো نَافِيَهْ আর لَهُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ , مِنْ হলো অতিরিক্ত شِرْك হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ শাব্দিকভাবে مَجْرُوْرْ তবে مَحَلًّا مَرْفُوْعْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فُزِّعَ مَبْنِىْ لِلْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের ভয় দূর করে দিয়েছেন تَضْعِيْف টা سَلْب-এর জন্য হয়েছে। বলা হয় قَرَّدْتُ الْبَعِيْرَ অর্থাৎ اَزَلْتُ قِرَادَهُ আমি উটের রক্ত খেকো কীট দূর করে দিয়েছি।

قَوْلُهُ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فِيْهَا : অর্থাৎ فِى الشَّفَاعَةِ

قَوْلُهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْحَقَّ হলো উহ্য মাসদারের সিফত।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ : এখানে اَللّٰهُ হলো মুবতাদা يَرْزُقُنَا হলো তার খবর যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَرُوْنِىَ اَعْلِمُوْنِىْ : এতে একটি কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رُؤْيَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো رُؤْيَتْ قَلْبِيَّهْ এবং مُتَعَدِّىْ بِدُوْمَفْعُوْل হয়েছে। যখন তার শুরুতে هَمْزَهْ নেওয়া হয়েছে তখন مُتَعَدِّىْ بِسِه مَفْعُوْل হয়ে গেছে। প্রথম মাফউল হলো اَرُوْنِىْ -এর ى দ্বিতীয় মাফউল اِسْمِ مَوْصُوْل আর তৃতীয় হলো شُرَكَاءُ صِلَهْ -এর ضَمِيْرِ عَائِدْ যা উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَلْحَقْتُمُوْهُمْ

قَوْلُهُ كَافَّةً : অর্থাৎ جَمِيْعًا টা اَرْسَلْنٰكَ -এর كَاف থেকে حَالْ হয়েছে অর্থাৎ اَرْسَلْنٰكَ جَامِعًا لِلنَّاسِ فِى الْاِنْذَارِ وَالابلاغِ আর ة হলো মুবালাগার জন্য যেমন عَلَّامَةٌ -এর মধ্যে ة মুবালাগার জন্য হয়েছে। আর لِلنَّاسِ থেকে كَافَّةً حَالْ مُقَدَّمْ হতে পারে অর্থাৎ كَافَّةً لِلنَّاسِ এটা হলো সে সকল লোকদের নিকট যারা حَالْ -এর جَارْ مَجْرُوْرْ -এর উপর مُقَدَّمْ করা জায়েজ মনে করেন। তা ছাড়া উহ্য মাসদারের صِفَتْও হতে পারে অর্থাৎ اِرْسَالَهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ

قَوْلُهُ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا : এই দুটি اَرْسَلْنٰكَ -এর كَاف থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ : -এর মধ্যে لَكُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مِيْعَادُ يَوْمٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সাবা জাতির অবাধ্যতা এবং শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে মুশরিকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বলে তৌহীদের যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদমুহূর্তে এক আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে শরিক করছো, তারা তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। ইরশাদ হয়েছে, ...قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাক, আসমান জমিনে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়; আসমান জমিনে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ সহায়কও নেই। অতএব এরা কখনো তোমাদের কোনো উপকার আসতে পারবে না, কেননা তাদের নিকট সামন্যতম ক্ষমতাও নেই। তাই তারা তোমাদের কোনো প্রকার উপকারে আসবেনা, কোনো প্রকার ক্ষতি থেকেও তারা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। কেননা আসমান জমিনের কোনো কিছুর উপর তাদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই। তারা কারো সহায়কও হতে পারেনা; তারা নিজেরাই অসহায়, অতএব তারা কারো উপাস্য হতে পারেনা। এমন অবস্থায় তাদেরকে 'উপাস্য' মনে করে ডাকা এবং তাদের নিকট কোনো প্রকার আশা পোষণ করা নিতান্ত বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মূলত : এ আয়াতে কাফের মুশরিক বেদ্বীনদেরকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যে সব হীন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মনে কর তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ তারা জবাব দেয় কি না? তোমাদের কোনো উপকারে আসে কিনা? তাদেরকে ডাকলে তোমরা উপলব্ধি করবে যে, তারা সম্পূর্ণ অসহায়, আসমান জমিনে কোথাও তাদের সামান্যতম ক্ষমতাও নেই, অতএব কোন যুক্তিতে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শরিক কর? যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর কোনো শরিক নেই, যাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যাঁর কোনো উজির নেই, যাঁর কোনো পরামর্শদাতা নেই, যিনি কোনো সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী নন। অতএব, পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর উদ্ধৃত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোনো আদেশ জারি করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে [এবং সংজ্ঞাহীনের মতো হয়ে যায়।] অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতার ও তয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারি করেছেন।

মুসলিম উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যখন কোনো আদশে দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তাসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তাসবীহ শুনে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করে। এ ভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠে রত হয়ে যায়। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়। –[মাযহারী]

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা :

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এতে মুশরিক ও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কুরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তাবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোনো সমঝদার ব্যক্তি তাওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তাওহীদপন্থি ও শিরকপন্থি উভয়কে সত্যপন্থি আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল ভ্রান্ত পথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাকে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।

–[কুরতুবী, বয়ানুল কুরআন]

আলেমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতের্কর পন্থাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও তাদের পথভ্রষ্টতা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের এবং আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

قَوْلُهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ : كَافَّةً শব্দটি আরবি বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে শামিল করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি حَالٌ বিধায় لِلنَّاسِ كَافَّةً বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে প্রেরিত পয়গাম্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষ নবী রাসূলে কারীম ﷺ -এরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রাসূল। তাঁর রিসালত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলিল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরিয়ত ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শরিয়ত ও স্বীয় কিতাব কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোনো নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো পয়গাম্বরকে দান করা হয়নি। এক. আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে। দুই. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। [পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়ত ইবাদতে নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হতো; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হতো না। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামাজ আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূপৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা অজুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।] তিন. আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না। [তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফেরদের যে সম্পদ হস্তগত হবে, তা একত্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দিবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুরআন বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বণ্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েজ করা হয়েছে।] চার. আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে [অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোনো পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে]। পাঁচ. আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে। —[ইবনে কাসীর]

অনুবাদ :

٣١. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اَيْ تَقَدَّمَهُ كَالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ الدَّالَّيْنَ عَلَى الْبَعْثِ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ قَالَ تَعَالٰى فِيْهِمْ وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ اِۨلْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الْاَتْبَاعُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا الرُّؤَسَاءُ لَوْلَا اَنْتُمْ صَدَدْتُمُوْنَا عَنِ الْاِيْمَانِ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ بِالنَّبِيِّ .

৩১. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলে, আমরা কখনো এ কুরআনে বিশ্বাস করব না, এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। যেমন তাওরাত ও ইঞ্জিল যা পুনরুত্থানের প্রমাণ বহন করে কেননা তারা এটার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন, হে মুহাম্মদ আপনি যদি পাপিষ্ট কাফেরদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো অনুগত ব্যক্তি তারা অহংকারীদেরকে নেতাদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই নবীর প্রতি মুমিন হতাম। তোমরা আমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছ।

٣٢. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاۤءَكُمْ لَا بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ .

৩২. অহংকারীরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? [না] বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী নিজেদের প্রতি।

٣٣. وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَيْ مَكْرٌ فِيْهِمَا مِنْكُمْ بِنَا اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا ؕ شُرَكَاءَ وَاَسَرُّوْا اَيِ الْفَرِيْقَانِ النَّدَامَةَ عَلٰى تَرْكِ الْاِيْمَانِ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ اَيْ اَخْفَاهَا كُلٌّ عَنْ رَفِيْقِهِ مَخَافَةَ التَّعْيِيْرِ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ فِي النَّارِ هَلْ مَا يُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فِي الدُّنْيَا .

৩৩. দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি আমাদের প্রতি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তার অংশীদার সাব্যস্ত করি। যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন উভয়দল তাদের ঈমান না আনার কৃতকর্মের অনুতাপ অন্তরে গোপন করবে। প্রত্যেক দলেই তার বিপক্ষের কাছে লজ্জা পাওয়ার ভয়ে নিজের অনুতাপ নিজের অন্তরে রাখবে। বস্তুত : আমি কাফেরদের গলায় জাহান্নামে বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা দুনিয়াতে তারা করত।

٣٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا رُؤَسَاءُ هَا اَلْمُتَنَعِّمُوْنَ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ.

৩৪. কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী নেতাগণ বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।

٣٥. وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا مِمَّنْ اٰمَنَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

৩৫. তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ ঈমানদার থেকে সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না।

٣٦. قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِبْتِلَاءً وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ.

৩৬. বলুন! আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন পরীক্ষামূলক এবং যাকে ইচ্ছা পরিমিত দেন পরীক্ষার জন্যে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কার কাফেরগণ তা বোঝেনা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى : لَوْ -এর জবাব এবং تَرٰى মাফঊল উহ্য রয়েছে উহ্য ইবারত হলো- وَلَوْتَرٰى حَالَ الظّٰلِمِيْنَ وَقْتَ وُقُوْفِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَرَاَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا এখানে حَالَ হলো মাফঊল আর لَرَاَيْتَ الخ হলো جَوَابُ لَوْ

قَوْلُهُ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ : এটা تَرٰى -এর ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ : এটা مَوْقُوْفُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا : এটা يَرْجِعُ -এর তাফসীর হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا : এটা মুবতাদা, এর খবর উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার স্বীয় উক্তি صَدَدْتُمُوْنَا দ্বারা উহ্য খবরের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ হলো لَوْلَا -এর জবাব।

قَوْلُهُ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ : এর পরে ব্যাখ্যাকার ٧ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَنَحْنُ -এর মধ্যে হামযাটা اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ : এখানে مَكْر টা উহ্য ফে'লের ফায়েল হয়েছে উহ্য ইবারত হলো بَلْ صَدَّنَا مَكْرُكُمْ بِنَا মুযাফ ইলাইহিকে حَذْفٌ করে দিয়েছেন এবং اِتِّسَاعًا যরফকে مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ; مَكْرُكُمْ -এর كُمْ

قَوْلُهُ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا : এটা مَكْر-এর যরফ হয়েছে অর্থাৎ مَكْرُكُمْ وَقْتَ اَمْرِكُمْ لَنَا

قَوْلُهُ اِلَّا قَالُوْا مُتْرَفُوْهَا : এটা قَرْيَةٌ হতে حَالٌ হয়েছে قَرْيَةٌ যদিও نَكِرَةٌ যেহেতু এটা سِيَاقُ نَفِىْ তে পতিত হয়েছে তাই ذُوالْحَالِ হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مُتْرَفُوْهَا : মূলে ছিল مُتْرَفُوْنَ بِهَا ইযাফতের কারণে نُوْن টি পড়ে গেছে, এটা اِتْرَافٌ মাসদার থেকে اِسْمُ مَفْعُوْل -এর جَمْعُ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। অর্থ পরিতৃপ্ত, স্বচ্ছন্দশীল ব্যক্তিবর্গ।

قَوْلُهُ بِمَآ اُرْسِلْتُمْ : এটা كَافِرُوْنَ থেকে مُتَعَلِّقْ হয়েছে, গুরুত্ব এবং رِعَايَتْ فَوَاصِلْ -এর কারণে مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– كَافِرُوْنَ بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ : অর্থাৎ যারা কাফের তাদেরকে যখন কিয়ামতের দিনের কথা, হিসাব নিকাশের কথা বলা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এই কিতাব কুরআনে কারীমকে মানিনা, এ কিতাবে আখেরাতের এবং কিয়ামতের দিনের কথা রয়েছে। শুধু এ কিতাবই নয়; বরং ইতিপূর্বে যে সব আসমানি গ্রন্থ নাজিল হয়েছে যেমন, তৌরাত ও ইঞ্জিল, সেগুলোও আমরা মানিনা। আর কখনো মানবো না বলে তারা সংকল্প করে। কেননা এসব গ্রন্থে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা রয়েছে, শিরকের নিন্দা রয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআন বা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সব আসমানি গ্রন্থই আমাদের নিকট সমান।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা শুধু যে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতকে অস্বীকার করতো তাই নয়; বরং তারা কারো নবুয়তকেই মেনে নিতে রাজি ছিলনা। এর পাশাপাশি তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও তাহীদেও বিশ্বাস করতো না। পবিত্র কুরআনের সত্যতার অগণিত দলিল প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না। আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে তাদের এ চরমে ধৃষ্টতার জবাব এভাবে ইরশাদ করেছেন– وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ ۚ [হে রাসূল!] যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন এ জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে'।

কাফেরদের চিৎকার এবং আস্ফালন দুনিয়ার এ জীবন পর্যন্তই সীমিত। এরপর শুরু হবে তাদের চরম দুর্গতি। হে রাসূল! আপনি তাদের সে অসহায় অবস্থা দেখতেন, যখন এ পাপীষ্ঠদেরকে হিসাব নিকাশের জন্যে কিয়ামতের কঠিন দিনে তাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো মানুষ যদি নিরাশ এবং অসহায় হয়ে পড়ে তখন সে তাদের নিজের দোষ অপরের উপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চায়, কিয়ামতের কঠিন দিনে কাফেররাও অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করবে অর্থাৎ তাদের নিজেদের দোষের জন্যে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকবে। নিজেদের পাপাচারের জন্যে অন্যকে দায়ী করতে থাকবে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা দুর্বল ছিল এবং ছোট বলে পরিগণিত ছিল, তাদেরকে বড়দের কথা মেনে চলতে হতো, তারা তাদের মাতব্বর এবং সমাজপতিদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, 'শুধু তোমাদের জন্যেই আজ আমাদের এ দুর্দশা, তোমাদের কারণেই আমাদের এই বিপদ, দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের কথা মেনেছিলাম, তাই আজ তাঁর প্রতি ঈমান এনে তথা মুমিন হয়ে জীবনকে ধন্য করতাম'।

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ................ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ : অর্থাৎ তথাকথিত নেতারা তাদের অনুসারীদের কথার জবাবে বলবে, 'দুনিয়ার জীবন তোমাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও তোমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছো, তোমরা ইচ্ছা করলেই তা গ্রহণ করতে পারতে, সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমরা তোমাদেরকে কখনও বাধ্য করিনি, তোমরা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে সত্যকে বর্জন করেছ এবং আজ আমাদের প্রতি দোষারোপ করছো, আমাদেরকে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা তোমরা ইচ্ছা করলেই আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর অনুসরণ করতে পারতে, কিন্তু তা করনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমরা আদতেই ছিল অপরাধী। আর সে অপরাধের শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে'।

قَوْلُهُ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো এবং কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করতো। আর এ আয়াতে সে সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা অর্থ-সম্পদের মোহ মায়ায় মুগ্ধ থাকার কারণে সত্যকে প্রত্যাখান করতো। অর্থ সম্পদ এবং ক্ষমতার কারণে তারা অহংকার করতো এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার গর্বে এতটা মেতে থাকতো যে, তারা আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতো না, তারা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অহংকারে এত অন্ধ হয়ে পড়তো যে, সমাজের দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বসতেও রাজি হতো না।

শানে নুযূল : ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম সুফিয়ান আসেমের সূত্রে আবু রাযীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কা শহরে দু'ব্যক্তি [ব্যবসা-বাণিজ্যে] অংশীদার ছিল। একজন সিরিয়া গমন করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মক্কায় রয়ে গেল। যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি তার সিরিয়াগামী অংশীদারকে এ খবর লিখে জানিয়ে দেয়। ঐ ব্যক্তি সিরিয়া থেকে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে লিখল, যিনি নবুয়তের দাবি করেছেন, তাঁর কি অবস্থা হয়েছে? তখন মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি লিখল যে, নিচু শ্রেণির দারিদ্র্য-প্রপীড়িত কিছু লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র সে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে অনতিবিলম্বে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল এবং তার বন্ধুকে বলল, 'আমাকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানা দাও'। এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব পাঠ করেছিল। এরপর সে রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো এবং জিজ্ঞাসা করল যে আপনি কি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে জবাব দিলেন। ঐ ব্যক্তি জবাব শ্রবণ মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, 'আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ পাকের রাসূল', রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিভাবে এ সত্য অবগত হলে'? তখন তিনি বললেন, 'ইতিপূর্বে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন নিচু এবং দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়েছেন', তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু) , পারা . পৃ. ৬০ তাফসীরে মাযহারী , খ. ৯. পৃ. ৪৮০,২৯-২২]

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে প্রিয়নী ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এ মর্মে যে [হে রাসূল!] মক্কার সমৃদ্ধশালী লোকেরা আপনার বিরোধিতা করছে , এজন্যে আপনি ব্যথিত, মর্মাহত হবেননা। কেননা এটি নতুন কিছু নয়, ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক যখনই কোনো নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তখনই সমৃদ্ধশালী লোকেরা এবং সমাজপতিরা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার গর্বে তারা এমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলে, তখন সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির লোকেরাই নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সমৃদ্ধশালী কাফেররা তাদের স্বপক্ষে যে বক্তব্য পেশ করতো, পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ 'আর তারা আরো বলেছে, 'আমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি, এবং কখনো আমাদেরকে আজাব দেওয়া হবেনা, অর্থাৎ তারা বলতো, যদি আমরা পথভ্রষ্ট হতাম, আল্লাহ পাকের অপ্রিয় হতাম, তবে তিনি আমাদেরকে কখনও এত ধন-সম্পদ, এত সন্তান-সন্ততি এবং এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করতেন না, তাঁর এসব নিয়ামত একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আমরা ভুল পথে নেই; বরং আমরা সঠিক পথেই রয়েছি। আমরা তাঁর প্রিয় এবং পছন্দনীয়, আমাদের সম্মান এবং মর্যাদা একথারই প্রমাণ যে, আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা অতি সম্মানিত, আর এ কারণেই আখেরাতে আমাদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, কেননা আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যাকে সম্মানিত করেছেন, আখেরাতে তাকে অপমানিত করবেন না।

ধনবল বা জনবল বড় কথা নয় : আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে দুরাত্মা কাফের মুশরিকরা মানুষের ধনবল এবং জনবলকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বড় বিষয় মনে করতো, শুধু তাই নয়; তারা ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতাকে আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হওয়ার মানদণ্ড মনে করতো। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা, এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই।

নবী রাসূলগণ আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয়জন, অথচ, দু' একজন ব্যতীত তাঁদের কেউই ধন-সম্পদের অধিকারি ছিলেন না, একই অবস্থা আউলিয়ায়ে কেরামেরও, তাঁদের মধ্যে অতি সামন্য সংখ্যক লোক ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও পছন্দ করতেন না। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নবী কারীম ﷺ যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন তিনি কি ধনী ব্যক্তি ছিলেন? তাঁর স্ত্রী উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এ ইন্তেকাল হয়েছে অথচ তাঁর পরিবারবর্গ কখনও একাধারে দু'বেলা উদরপূর্ণ করে আহার করেননি'। অতএব, অর্থ সম্পদ আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হওয়ার মানদণ্ড নয়, স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ 'হে রাসূল! আপনার চক্ষু দ্বয় কখনো সেই সম্পদের দিকে প্রসারিত করবেন না, যা আমি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ তাদেরকে দান করেছি, এর দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করতে চাই, আর আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিজক উত্তম এবং স্থায়ী'।

আরো ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ -[সূরা তওবা, ১০, ৮৫]

'আর হে রাসূল! তাদের ধনশক্তি এবং জনশক্তি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহ পাক এর দ্বারা পার্থিব জীবনে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, আর কাফের অবস্থায় যেন তাদের প্রাণ বের হয়'। এমনিভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ -[সূরা আলে ইমরান ৪, ১৯৬-৯৭]

'[হে রাসূ!] কাফেরদের দেশে বিদেশে অবাধে বিচরণ যেন কোনোভাবেই আপনাকে প্রতারিত না করে, এতো অত্যন্ত সামান্য সম্পদ, এরপর দোজখই হবে তাদের আবাসস্থল এবং কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল'।

অতএব, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কারো ধনবল বা জনবল আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হবার প্রমাণ নয়; বরং এটি বিপদেরও কারণ হতে পারে। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 'হে রাসূল! আপনি বলুন আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার রিজিক স্বচ্ছল করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত আকারে জীবিকা দান করে থাকেন, তবে অনেক লোকেই তা জানেনা'।

বস্তুত : কারো রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিজিক বাড়িয়ে দেন আর যাকে ইচ্ছা তার রিজিক কমিয়ে দেন, তবে উভয় অবস্থাই হলো পরীক্ষামূলক। যার রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে পরীক্ষা করা হয় যে সে কৃতজ্ঞ হয় কি অকৃতজ্ঞ, আর যার রিজিক কমিয়ে দেওয়া হয় তাকে পরীক্ষা করা হয় যে সে সবর অবলম্বন করে কি-না।

নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম : এ পৃথিবী মানুষের জন্যে পরীক্ষাগার। প্রতিটি কথা ও কাজে মানুষের পরীক্ষা হয়। এ পৃথিবী মানুষের কর্মস্থল, তবে কর্মফল আখেরাতে, এখানে নয়। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম হলো ঈমান ও নেক আমল, যাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যাবে, তারা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে, আর যার মধ্যে ঈমান ও নেক আমল যত বেশি হবে, সে আল্লাহ পাকের দরবারে ততবেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে। ধনী বা নির্ধন হওয়া কখনও কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপকরণ নয়।

قَوْلُهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ : 'কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা', তথা এ সত্য উপলব্ধি করেন, এজন্যে তারা ধনবল ও জনবলকে সম্মানের কারণ মনে করে এমনকি, আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হওয়ার দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা এবং অর্থ-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে লক্ষ্য রাখেন'। -[মুসলিম শরীফ]

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহর প্রিয়পত্র হওয়ার দলিল মনে করা ধোকা : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদায় সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সৎ লোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থিদের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলিলও উপস্থাপন করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কুরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলিলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

مُتْرَفٌ শব্দটি تَرَفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। مُتْرَفِيْنَ বলে বিত্তশালী সরদারকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মধ্যমে তাঁর মোকাবিলা করেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে : نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ অর্থাৎ আমরা ধনেজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আজাবে পতিত হবো না। [বাহ্যত তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?

অনুবাদ :

৩৭. وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى قُرْبٰى اَىْ تَقْرِيْبًا اِلَّا لٰكِنْ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا اَىْ جَزَاءُ الْعَمَلِ الْحَسَنَةِ مَثَلًا بِعَشْرٍ فَاَكْثَرَ وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِنُوْنَ مِنَ الْمَوْتِ وَغَيْرِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَلْغُرْفَةِ وَهِىَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ ـ

৩৭. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে। অর্থাৎ সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ বা এর অধিক এবং তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। মৃত্যু ইত্যাদি থেকে, অন্য ক্বেরাতে اَلْغُرْفَةُ একবচন যা বহুবচনের অর্থ প্রদান করে।

৩৮. وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِالْاِبْطَالِ مُعٰجِزِيْنَ لَنَا مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا وَاَنَّهُمْ يَفُوْتُوْنَنَا اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ـ

৩৮. যারা আমার আয়াতসমূহকে কুরআনকে বাতিল করেব ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় তারা মনে করে তারা আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে তাদেরকে আজাবে উপস্থি করা হবে।

৩৯. قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهٗ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ يُضَيِّقُهٗ لَهٗ ط بَعْدَ الْبَسْطِ اَوْ لِمَنْ يَّشَآءُ اِبْتِلَاءً وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فِى الْخَيْرِ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ يُقَالُ كُلُّ اِنْسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهٗ اَىْ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ ـ

৩৯. বলুন! আমার পালনকর্তা তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন পরীক্ষামূলক এবং বাড়ানোর পর তাকে সীমিত পরিমাণে দেন অথবা যাকে ইচ্ছা সীমিত পরিমাণ দেন পরীক্ষার জন্যে তোমরা যা কিছু ব্যয় কর সৎপথে, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিজিকদাতা বর্ণিত আছে যে, মানুষ আল্লাহর রিজিক থেকে তার পরিবার পরিজনকে রিজিক দেয়।

৪০. وَاذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا اَلْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الْاُوْلٰى يَاءً وَاِسْقَاطِهَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ـ

৪০. তুমি উল্লেখ কর যেদিন তিনি তাদের মুশরিকদের সবাইকে একত্রিত করবেন অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? اَهٰٓؤُلَاءِ - اِيَّاكُمْ -এর মধ্যে দুই হামযার বা প্রথম হামযা ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে বা বিলুপ্ত করে পড়বে।

٤١. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الشَّرِيْكِ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ج اَىْ لَا مُوَالَاةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِنْ جِهَتِنَا بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ج الشَّيَاطِيْنَ اَىْ يُطِيْعُوْنَهُمْ فِىْ عِبَادَتِهِمْ اِيَّانَا اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ مُصَدِّقُوْنَ فِيْمَا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ ۔

৪১. ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র শিরক থেকে আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয় অর্থাৎ আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বরং তারা জিনদের শয়তানদের পূজা করত অর্থাৎ তারা আমার ইবাদতে শয়তানের আনুগত্য করত তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী অর্থাৎ শয়তান যা বলে তাতে বিশ্বাস করে।

٤٢. قَالَ تَعَالٰى فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ اَىْ بَعْضُ الْمَعْبُوْدِيْنَ لِبَعْضِ الْعَابِدِيْنَ نَفْعًا شَفَاعَةً وَّلَا ضَرًّا ط تَعْذِيْبًا وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۔

৪২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের এক মাবুদ অন্য মাবুদের কোনো উপকার ও অপকার সুপারিশ ও শাস্তি করার অধিকারী হবে না। আর আমি জালেমদেরকে কাফেরদের বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

٤٣. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ بِلِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ ج مِنَ الْاَصْنَامِ وَقَالُوْا مَا هٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنُ اِلَّا اِفْكٌ كَذِبٌ مُّفْتَرًى ط عَلَى اللّٰهِ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ الْقُرْاٰنِ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ ۔

৪৩. যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মদের ভাষায় আয়াত কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার মূর্তিসমূহ ইবাদত করত এ লোকটি তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এই কুরআন আল্লাহর নামে মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর সত্য কুরআন অস্বীকার কারীগণ বলে, যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করে এতো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছুই না।

٤٤. قَالَ تَعَالٰى وَمَا اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ فَمِنْ اَيْنَ كَذَّبُوْكَ ۔

৪৪. আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেনি। অতএব, তারা কিভাবে আপনাকে অস্বীকার করবে?

٤٥. وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لا وَمَا بَلَغُوْا اَىْ هٰؤُلَاءِ مِعْشَارَ مَا اٰتَيْنٰهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَطُوْلِ الْعُمُرِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ نف اِلَيْهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ اِنْكَارِىْ عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوْبَةِ وَالْاِهْلَاكِ اَىْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ.

৪৫. তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম শক্তি, সম্পদের প্রাচুর্যতা ও অধিক হায়াত ইত্যাদি এরা তার এক দশমাংশ ও পায়নি। এরপরও তারা তাদের প্রতি প্রেরিত আমার রাসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি। অর্থাৎ আমার শাস্তি উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যে হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى : وَمَا اَمْوَالُكم হলো جُمْلَه مُسْتَانِفَه যা পূর্বের اِسْم مَعْطُوْف সহ তার স্বীয় اَمْوَالُكُمْ আর مُشَابَه بِلَيْسَ হলো مَا আর تَقْرِيْر -এর জন্য নেওয়া হয়েছে। আর تَحْقِيْق এবং تَقْرِيْر আর بِالَّتِىْ মওসূল সেলাহ মিলে اَمْوَال এবং اَوْلَادٌ এর সিফত। যদি صِفَتْ ও مَوْصُوْف-এর মধ্যে প্রকাশ্য ও কোনো مُطَابَقَتْ নেই কিন্তু যেহেতু جَمْع تَكْسِيْر চাই তা ذَوِى الْعُقُوْل হোক বা غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ - এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর হুকুমে হয়ে থাকে। এই দিক থেকে মওসূফ-সিফতের মাঝে مُطَابَقَتْ রয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, بِالَّتِىْ উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো بِالْاَحْوَالِ الَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ মুফাসসির (র.) زُلْفٰى-এর তাফসীর قُرْبٰى দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, زُلْفٰى হলো تُقَرِّبُكُمْ-এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ مِنْ غَيْرِ لَفْظِه অর্থাৎ تُقَرِّبُكُمْ تَقْرِيْبًا

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ : এটা اِسْم اِشَارَه মুবতাদা আর مَنْ اٰمَنَ -এর مَنْ হলো مُشَارٌ اِلَيْه আর اُولٰئِكَ হলো مَنْ -এর বহুবচনের অর্থের হিসেবে। উভয় ফে'লকে مَنْ শাব্দিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করে مُفْرَدْ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ : لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর جَزَاءُ الضِّعْفِ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে اُولٰئِكَ মুবতাদার খবর হয়েছে। اَلْغُرْفَةُ এক কেরাতে لَهُمُ الْجَزَاءُ الْمُضَاعَفُ অর্থাৎ اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত এটা جَزَاءُ الضِّعْفِ রয়েছে, اَلِف لَامْ টা جِنْس-এর হওয়ার কারণে جَمْع-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ مُقَدِّرِيْنَ عَجْزَنَا : অর্থাৎ مُتَعَقِّدِيْنَ اِنَّنَا عَاجِزُوْنَ فَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِمْ

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ الخ : এই আয়াতের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতটি مُكَرَّرْ পূর্বের تَاكِيْد-এর জন্য হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা প্রথমটার বিপরীত। প্রথমটি বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের জন্য অর্থাৎ কারো জীবিকায় প্রশস্ততা, কারো সংকীর্ণ করেন। আর এই আয়াত এক ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ একই ব্যক্তির জীবিকা এক সময় প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং এক সময় সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ فَهُوَ يَخْلُفُهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর বদল এবং বিনিময় দান করেন।

قَوْلُهُ يُقَالُ كُلُّ اِنْسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهُ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. হলো- رَازِقِيْنَ বহুবচন নেওয়া হয়েছে এর দ্বারা জানা যায় যে, رَازِقْ [জীবিকা দাতা] অনেক। অথচ رَازِقْ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

উত্তর. প্রকৃত রিজিক দাতা তো আল্লাহ। তা'আলাই যেহেতু বাহ্যত বান্দা আল্লাহর দেওয়া জীবিকা হতে স্বীয় পরিবার-পরিজন, চাকর বাকদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকেন এই জন্য বান্দাকেও রূপকভাবে رَازِقْ বলে দেওয়া হয়। একারণেই বান্দাকে رَازِقْ বলা যেতে পারে رَزَّاقْ নয়। কেননা رَزَّاقْ টা হলো اَسْمَاءِ حُسْنٰى مُخْتَصَّه-এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ : اَكْثَرُهُمْ হলো মুবতাদা مُؤْمِنُوْنَ তার খবর بِهِمْ টা مُؤْمِنُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে এবং اَكْثَرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كُلّ

قَوْلُهُ نَقُوْلُ : এর عَطْف হলো لَا يَمْلِكُ -এর উপর

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে যমীর নেওয়াও যথেষ্ট হতো। কেননা কাফের ও মুশরিকদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর পরিবর্তে وَقَالُوْا বলত। যেহেতু এতে তাদের صِفَتْ كُفْر কে প্রকাশ করার কারণে قَبَاحَتْ এবং شَنَاعَتْ বেশি এ কারণে اِسْمِ ضَمِيْر -এর পরিবর্তে اِسْمِ ظَاهِرْ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ الْمِعْشَارَ : অর্থাৎ দশম অংশ এখানে সীমাবদ্ধকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বল্পতার বিবরণ উদ্দেশ্য, যদি فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ -এর আতফ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ হয় তবে مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَا اٰتَيْنَاهُمْ মাতূফ ও মা'তূফ আলাইহি এর মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَه হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ এবং مَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ الْاٰيَة এখানে পূর্বের نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا الخ আয়াতে উত্থিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলিল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলিল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! [কখনই নয়।] বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বেখবর। [অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ]

অন্য এক আয়াতে আছে : فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ অর্থাৎ কাফেরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফের অবস্থায়ই বের হয়ে যাবে, যার ফলে হবে পরকালের চিরস্থায়ী আজাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে, নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আজাব। অনেক ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আজাব তো এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। -[আহমদ, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ : এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহর প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ضِعْف অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিন ও সৎকর্মদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাতাশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে; বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غُرْفَةٌ বলে। এরই বহুবচন غُرُفَاتٌ –[মাযহারী]

قَوْلُهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ الخ : এ আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যত এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, এখানে مَنْ يَشَاءُ শব্দের পরে مِنْ عِبَادِهِ এবং يَقْدِرُ শব্দের পরে لَهُ অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادِهِ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনগণ যেন ধনসম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলিল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিজিক বণ্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিজিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে يَقْدِرُ শব্দের পরে বর্ণিত لَهُ সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তারা বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্তু অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তৎস্থলে অন্য খাদ্য সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোটকথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহর নীতির পরিপন্থি নয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে ব্যয় করে, তাকে তার বিনিময় দান করে এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট করে। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, আপনি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব।

যে ব্যয় শরিয়তসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজেরও পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবের (রা.)-এর শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা। -[কুরতুবী]

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদন ও হ্রাস পায় : এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরবকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো জবাই করে গোশত খাওয়া হয়। কুরবানি, কাফফারা, মান্নত ইত্যাদিতে জবাই করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ তা'আলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নিচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু-ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই জবাই করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা জবাই না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে সওয়ারী ও মালপত্র পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কুরবানির মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশঙ্কা ব্যক্ত আজকাল যে, বিধর্মীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ : কারও মতে مِعْشَارَ শব্দের অর্থ عُشْر অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عُشْرُ الْعُشْرِ অর্থাৎ একশ' ভাগের এক ভাগ এবং কারও মতে عُشْرُ الْعُشَيْرِ অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ। বলা বাহুল্য, শব্দটি عُشْر এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গাম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আজাবে পতিত হয়েছিল এবং সেই আজাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোনো কাজেই আসেনি।

অনুবাদ :

٤٦. قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج هِيَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ اَيْ لِاَجْلِهِ مَثْنٰى اَيْ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَفُرَادٰى اَيْ وَاحِدًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا تت فَتَعْلَمُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مُحَمَّدٍ مِّنْ جِنَّةٍ ط جُنُوْنٍ اِنْ مَا هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ قَبْلَ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فِي الْاٰخِرَةِ اِنْ عَصَيْتُمُوْهُ ـ

৪৬. বলুন! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, এটা হলো তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর জন্যে দু'জন ও একজন করে দাঁড়াও অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর অতএব তোমরা জানতে পারবে যে, তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ মধ্যে কোনো উম্মাদনা নেই। তিনিতো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র। আখেরাতে যদি তোমরা তার নাফরমানি কর।

٤٧. قُلْ لَهُمْ مَا سَاَلْتُكُمْ عَلَى الْاِنْذَارِ وَالتَّبْلِيْغِ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط اَيْ لَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ مَا ثَوَابِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ مُطَّلِعٌ يَعْلَمُ صِدْقِيْ ـ

৪৭. তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের কাছে এই দাওয়াত ও সতর্কতার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; বরং তা তোমরাই রাখ। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটার পারিশ্রমিক চাইব না আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। তিনি প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত তিনি অবগত ও আমার সত্যতা তিনি জানেন।

٤٨. قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج يُلْقِيْهِ اِلٰى اَنْبِيَائِهِ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا غَابَ عَنْ خَلْقِهِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

৪৮. বলুন! আমার পালনকর্তা সত্য দীন তার নবীদের প্রতি অবতরণ করেছেন। তিনি আসমান জমিনের সৃষ্টিজীবের সকল অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন।

٤٩. قُلْ جَآءَ الْحَقُّ الْاِسْلَامُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ الْكُفْرُ وَمَا يُعِيْدُ اَيْ لَمْ يَبْقَ لَهُ اَثَرٌ ـ

৪৯. বলুন, সত্য ইসলাম আগমন করেছে এবং অসত্য কুফর পারে না নতুন কিছু সৃজন করতে এবং পারে না পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে। অর্থাৎ তার কোন নিশানা থাকবে না।

٥٠. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ عَنِ الْحَقِّ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ج اَيْ اِثْمُ ضَلَالِيْ عَلَيْهَا وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ط مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ لِّلدُّعَاءِ قَرِيْبٌ ـ

৫০. বলুন! যদি আমি হক্ব থেকে পথভ্রষ্ট হই তাহলে নিজের ক্ষতির জন্যেই পথভ্রষ্ট হব। অর্থাৎ আমার পথভ্রষ্টতার পাপ আমার জন্য আর যদি আমি সৎপথ প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্যে যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী কুরআন ও হিকমত প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি দোয়ার সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী।

৫১. وَلَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدُ إِذْ فَزِعُوا عِنْدَ الْبَعْثِ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا فَلَا فَوْتَ لَهُمْ مِنَّا أَيْ لَا يَفُوتُونَنَا وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ أَيِ الْقُبُورِ .

৫১. হে মুহাম্মদ যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে পুনরুত্থানের সময়, তখন আপনি ভয়াবহ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন অতঃপর তারা আমার কাছ থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান কবর থেকে ধরা পড়বে।

৫২. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ج أَيْ بِمُحَمَّدٍ أَوِ الْقُرْآنِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ بِالْوَاوِ وَبِالْهَمْزَةِ بَدَلَهَا أَيْ تَنَاوُلَ الْإِيمَانِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْ مَحَلِّهِ إِذْهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَمَحَلُّهُ الدُّنْيَا .

৫২. তারা বলবে, আমরা সত্যের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ বা কুরআন বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এতদূর থেকে তার ঈমানের নাগাল পাবে কেমন করে? অর্থাৎ তারা যখন আখেরাতে আর ঈমানের স্থান দুনিয়াতে। اَلتَّنَاؤُشُ ও اَلتَّنَاوُشُ উভয়ভাবে পড়া যাবে।

৫৩. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ج فِي الدُّنْيَا وَيَقْذِفُونَ يَرْمُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أَيْ بِمَا غَابَ عِلْمُهُ عَنْهُمْ غَيْبَةً بَعِيدَةً حَيْثُ قَالُوا فِي النَّبِيِّ سَاحِرٌ شَاعِرٌ كَاهِنٌ وَفِي الْقُرْآنِ سِحْرٌ شِعْرٌ كَهَانَةٌ .

৫৩. অথচ তারা পূর্ব থেকে দুনিয়াতে সত্যকে অস্বীকার করেছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। অর্থাৎ এমন মন্তব্য করতে যার জ্ঞান সম্পর্কে তারা অনেক দূরে। যেমন তারা নবী কারীম ﷺ সম্পর্কে বলত, তিনি জাদুকর, কবি ও গণক ইত্যাদি এবং কুরআন সম্পর্কে বলত, এটা জাদু, কবিতা ও গণনা ইত্যাদি।

৫৪. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنَ الْإِيمَانِ أَيْ قَبُولِهِ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ أَشْبَاهِهِمْ فِي الْكُفْرِ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ مُوقِعِ الرِّيبَةِ لَهُمْ فِيمَا آمَنُوا بِهِ الْآنَ وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِدَلَائِلِهِ فِي الدُّنْيَا .

৫৪. তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে ঈমান গ্রহণের প্রতি অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন এর পূর্বে কুফরের মধ্যে তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত। যার উপর এখন তারা ঈমান এনেছে এতে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে অথচ দুনিয়াতে এটার ঈমানের প্রতি তারা কোনো লক্ষ্য ও করেনি।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِوَاحِدَةٍ : এটা উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ بِخَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ এবং উহ্যের উপর قَرِينَه হলো أَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ আর أَنْ تَقُومُوا এটা بِتَأْوِيلِ مَصْدَرٍ হয়ে هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে, যেমনটি শারেহ (র.) هِيَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অথবা أَنْ تَقُومُوا টা بِتَأْوِيلِ مَصْدَرٍ হয়ে بِوَاحِدَةٍ-এর عَطْف بَيَانٌ অথবা بَدَلٌ হয়েছে। এই দুই সুরতে أَنْ تَقُومُوا টা مَحَلًّا مَجْرُورٌ হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا : ثُمَّ হলো حَرْف عَطْف যা تَاخِيْر এবং تَرْتِيْب -এর জন্য হয়েছে আর تَتَفَكَّرُوْا -এর আতফ اَنْ تَقُوْمُوْا-এর উপর হয়েছে আর مَثْنٰى এবং فُرَادٰى টা حَال হওয়ার কারনে مَنْصُوْب হয়েছে بِصَاحِبِكُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর مِنْ جِنَّةٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر যা مَرْفُوْع مَحَلاًّ হয়েছে এবং শাব্দিকভাবে مَجْرُوْر হয়েছে। আর مِنْ হলো অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ : مَا হলো شَرْطِيَّة আর سَاَلْتُكُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল مُقَدَّمْ হয়েছে। আর مِنْ اَجْرٍ হলো مَا -এর بَيَان আর فَهُوَ لَكُمْ হলো جَوَاب شَرْط আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, مَا হলো مَوْصُوْل যা মুবতাদা আর فَهُوَ لَكُمْ তার খবর। আর যেহেতু مَوْصُوْل টা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী এজন্য فَهُوَ-এর فَا টা رَابِطَه-এর জন্য হয়েছে اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ একথার উপর বুঝাচ্ছে যে, তিনি ভীতি প্রদর্শন ও তাবলীগের বিনিময়ে কিছুই প্রার্থনা করেন নি।

قَوْلُهُ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ : يقذف-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَقْذِفُ الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ দ্বিতীয় তারকীব। যেভাবে ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন, এটা হতে পারে যে, بَا টা مُلَابَسَتْ -এর জন্য এবং মাফউল উহ্য হবে। উহ্য ইবারত হলো– يَقْذِفُ الْوَحْىَ اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

قَوْلُهُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : এটা اِن-এর দ্বিতীয় খবর অথবা উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর এবং يَقْذِفُ -এর যমীর থেকে بَدَل ও হতে পারে।

قَوْلُهُ مَا غَابَ عَنْ خَلْقِهٖ : আল্লাহর তা'আলা অদৃশ্য বিষয়াবলি খুব ভালো করেই জানেন مَا غَابَ-এর উপর مَغِيْبَاتْ-এর اِطْلَاقْ মাখলুকের হিসেবে হয়েছে। অন্যথায় তার নিকট مَاضِىْ،حَالْ সবই উপস্থিত। এই প্রশ্নের উত্তর দান কল্পেই ব্যাখ্যাকার (র.) مَا غَابَ عَنْ خَلْقِهٖ -এর বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ فَبِمَا يُوْحِىْ اِلَىَّ رَبِّىْ : مَا টা মাসদারিয়াও হতে পারে এবং بَا، হলো سَبَبِيَّه অর্থাৎ بِسَبَبِ اِيْحَاءِ رَبِّىْ এবং مَوْصُوْل ও হতে পারে অর্থাৎ بِسَبَبِ الَّذِىْ يُوْحِيْهِ اِلَىَّ الْحَقُّ

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى : এতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, تَرٰى-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো لَوْ تَرٰى حَالَهُمْ وَقْتَ نَزْعِهِمْ

قَوْلُهُ لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا : উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَوْ-এর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تَنَاوُشُ : এতে দুটি কেরাত রয়েছে وَاوْ তে পেশ দিয়ে এবং وَاوْ কে হামযা দ্বারা বদল করে تَفَاعُلْ -এর ওজনে; نَاشَ يَنُوْشُ বাবে نَصَرَ হতে মাসদার نَوْشًا অর্থ–নেওয়া, ধরা।

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে অবস্থা হলো এই যে, তারা দুনিয়াতে কুফরি করেছিল।

قَوْلُهُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ : এটা حِكَايَتْ حَالْ مَاضِيَة -এর ভিত্তিতে قَدْ كَفَرُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَشْيَاعِهِمْ : অর্থাৎ اَشْبَاهِهِمْ فِى الْكُفْرِ; اَشْيَاعٌ টা شِيَاعٌ -এর এবং شِيَعٌ টা شِيْعَةٌ -এর বহুবচন, এমনিভাবে اَشْيَاعٌ টা شِيْعَةٌ এর جَمْعُ الْجَمْعِ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَحِيْلَ : এটা مَاضِىْ مَجْهُوْل -এর সীগাহ اِسْتِقْبَالْ-এর অর্থে হয়েছে। مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য اِسْتِقْبَالْ ও مَاحَصَلْ -এর অর্থে হয়ে থাকে। ظَرْف হলো نَائِب فَاعِلْ কেউ কেউ বলেছেন নায়েবে ফায়েল সেই যমীর যা فِعْل থেকে বুঝা যায় মাসদারের দিকে ফিরেছে كَاَنَّهٗ قِيْلَ وَحِيْلَ هُوَ اَيِ الْحَوْلُ এবং ظَرْف টা حِيْلَ-এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ قَبْلُ : এটা اَشْيَاعٌ -এর সিফত।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْتَنُوْا : এটা اٰمَنَّا -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরু থেকে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। এখন একটি উপদেশ দিয়ে সূরা শেষ করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, যে সব মৌলিক বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা মর্দে মুমিনের একান্ত কর্তব্য, তন্মধ্যে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত বিশেষ গুরুত্বের অধিকারি। এ সূরায় এ তিনটি বিষয় এ পর্যন্ত বিস্তারিভাবে বর্ণিত হয়েছে, এরপর ইরশাদ হয়েছে– قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ '[হে রাসূল!] আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি নসিহত করছি, তোমরা দু'জন, এক একজন করে আল্লাহ পাকের নামে উঠে দাঁড়াও, এরপর চিন্তা করে দেখ যে, তোমার সঙ্গী উন্মাদ নন, তিনি তো তোমাদেরকে এক আসন্ন ভয়ঙ্কর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন মাত্র। কাফের মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা ক্ষণিকের জন্যে হলেও হিংসা-বিদ্বেষ, জেদ, শত্রুতা ও হঠকারিতা পরিহার কর এবং ইনসাফের ভিত্তিতে আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের নামে একটি বিষয় চিন্তা করার জন্যে উঠে দাঁড়াও, অর্থাৎ প্রস্তুত হও আর তা একা একাও করতে পারে, অথবা দু'জন দু'জন একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে পার।

'চিন্তার বিষয়টি হলো এই যে, তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ যিনি অতি শৈশব থেকে বিগত চল্লিশটি বছর তোমাদের সঙ্গেই অতিবাহিত করেছেন, তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্বস্ততায় তোমরা সকলেই ইতিপূর্বে মুগ্ধ ছিলে, তাঁর প্রশংসায় তোমরা ছিলে পঞ্চমুখ, তাঁকে তোমরাই 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত বলে উপাধি দিয়েছিলে, জীবনে কখনো তাঁর মধ্যে তোমরা স্বার্থপরতা বা অসাধুতা লক্ষ্য করনি। এমতবস্থায় তোমরাই বল, তাঁর ন্যায় এমন মহান ব্যক্তি কি উন্মাদ হতে পারেন? তোমরা সারা জীবন যার প্রশংসা করেছ আজ যখন তিনি আল্লাহ পাকের নবুয়ত লাভ করেছেন, তোমাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন, তোমাদের কল্যাণার্থেই তোমাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন, এমন অবস্থায় কিভাবে তোমরা তাঁকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে? মূলত : যে তাঁকে উন্মাদ বলে, সে নিজেই উন্মাদ।

মানুষ দু'টি উদ্দেশ্যে কাজ করে, কোনো বিষয়ে উপকৃত হবার লক্ষ্যে, অথবা কোনো প্রকার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। সাধারণত : এ দু'টি জাগতিক উদ্দেশ্যেই মানুষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ এ দু'টি জাগতিক উদ্দেশ্যের কথা পূর্বাহ্নেই অস্বীকার করেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন আমার এই কাজের জন্যে আমি কোনো বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহ পাকের কাছেই রয়েছে।

অতএব, দীন ইসলামের প্রচারে প্রিয়নবী ﷺ -এর জাগতিক কোনো স্বার্থ নেই। এমনকি, কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও তিনি এ কাজ করছেন না, কেননা তিনি যখন আরববাসীকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন, তখন সারা আরব তথা সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু তিনি যেহেতু এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে আশা করতেন না এবং এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করতেন না, তাই মানুষের শত্রুতারও তিনি পরোয়া করতেন না।

মক্কার কাফেদের প্রতি দাওয়াত : إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ এতে মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশে সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দু'জন ও এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে "আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোনো কাজের জন্য তৎপর হওয়া। এখানে لِلَّهِ [আল্লাহর উদ্দেশ্যে] শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু'দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তাভাবনা করা যায়, এক. একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা এবং দুই, বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমতো যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বন কর।

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا এটা أَنْ تَقُومُوا বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য না মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই তা কর অথবা অন্যান্যের সাথে পরামর্শক্রমেই কর।

অতঃপর এই চিন্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগ যুগ ব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে যাতে তারা একমতও বটে কোনো ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েই সম্ভব। এক. হয় ঘোষণাকারী বদ্ধপাগল ও উন্মাদ হবে। ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে। দুই. তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য। কারণ তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই আল্লাহর আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচারণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কুরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থি পায়নি। কেবল এক কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোনো কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী وَمَا بِصَاحِبِكُمْ الخ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। صَاحِبِكُمْ [তোমাদের সঙ্গী] শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোনো বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোনো অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর নির্ভীক রাসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ অর্থাৎ তিনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ علام الغيوب অর্থাৎ আমার আলিমুল-গায়েব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ : قَذَفَ শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি قَذَفَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোনো ভারি বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ অর্থাৎ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোনো বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

قَوْلُهُ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাফের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহবল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না। দুনিয়াতে কোনো অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্ব-স্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন,। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্ব-স্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ : تَنَاوُشٌ অর্থ হাত বাড়িয়ে কোনো কিছু উঠানো। বলা বাহুল্য, যে বস্তু বেশি দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে উঠানো যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কুরআনের প্রতি অথবা রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকালে কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোনো কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ : تَقْذِفُ অর্থ কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবি বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে رَجْمٌ بِالْغَيْبِ অথবা قَذْفٌ بِالْغَيْبِ বলে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চলায়, যার কোনো লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ-এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে, মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

قَوْلُهُ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ : অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কিয়ামতে তারা মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ : اَشْيَاعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের অভীষ্ট ও ঈপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতোই কুফরি কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত এবং কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয় তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمِدَ تَعَالٰى نَفْسَهٗ بِذٰلِكَ كَمَا بُيِّنَ فِىْ اَوَّلِ سَبَا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَالِقُهُمَا عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اِلَى الْاَنْبِيَاءِ اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ فِى الْمَلٰئِكَةِ وَغَيْرِهَا مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

٢. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ كَرِزْقٍ وَّمَطَرٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ج وَمَا يُمْسِكْ مِنْ ذٰلِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ اِمْسَاكِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ فِعْلِهٖ.

٣. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط بِاِسْكَانِكُمُ الْحَرَمَ وَمَنْعِ الْغَارَاتِ عَنْكُمْ.

অনুবাদ :

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল্লাহ তা'আলা উক্ত বাক্য দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন যেমন সূরায়ে সাবার প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা উভয়ের স্রষ্টা কোনো পূর্বের নমুনা ব্যতীত এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক নবী-রাসূলের নিকট তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম।

২. আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্যে থেকে যা খুলে দেন, যেমন, বৃষ্টি ও রিজিক ইত্যাদি তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি তার হুকুম ও কর্মে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৩. হে মানুষ মক্কাবাসী! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ নিরাপদ স্থানে তোমাদেরকে বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে তোমাদেরকে লুটতরাজ থেকে হেফাজত রাখা স্মরণ কর।

هَلْ مِنْ خَالِقٍ مِنْ زَائِدَةٌ وَخَالِقٍ مُبْتَدأٌ غَيْرُ اللّٰهِ بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ نَعْتٌ لِخَالِقٍ لَفْظًا وَمَحَلًّا وَخَبَرُ الْمُبْتَدَإِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ الْمَطَرَ وَمِنَ الْاَرْضِ النَّبَاتَ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَىْ لَا خَالِقَ رَازِقَ غَيْرُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ مِنْ اَيْنَ تَصْرِفُوْنَ عَنْ تَوْحِيْدِهٖ مَعَ اِقْرَارِكُمْ بِاَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ.

আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি? مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত আর خَالِقٍ মুবতাদা এবং غَيْرِ اللّٰهِ শব্দটি রফা ও জর উভয় অবস্থায় خَالِقٍ থেকে সিফত যে তোমাদেরকে আসমান বৃষ্টি ও জমিন শস্য থেকে রিজিক দান করেন। يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ পূর্বের خَالِق মুবতাদার খবর। প্রশ্নবোধক পদটি প্রমাণ করার জন্যে যে, তিনি ব্যতীত কোনো স্রষ্টা ও রিজিকদাতা নেই তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? অর্থাৎ আল্লাহ স্রষ্টা ও রিজিকদাতা হওয়ার প্রতি তোমাদের স্বীকারোক্তির পরও তার তাওহীদ ছেড়ে তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

٤. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ يَا مُحَمَّدُ فِىْ مَجِيْئِكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ط فِىْ ذٰلِكَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِى الْمُكَذِّبِيْنَ وَيَنْصُرُ الْمُرْسَلِيْنَ.

৪. হে মুহাম্মদ! আপনার তাওহীদ, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তির দাওয়াতের ব্যাপারে তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে এতে আপনার পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদেরকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। অতএব, আপনি সবর করুন যেমন তারা সবর করেছে আখেরাতে আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। অতএব তিনি মিথ্যুকদের শাস্তি দিবেন ও নবীগণকে সাহায্য করবেন।

٥. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا نف عَنِ الْاِيْمَانِ بِذٰلِكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ فِىْ حِلْمِهٖ وَاِمْهَالِهِ الْغَرُوْرُ الشَّيْطَانُ.

৫. হে মানুষ, নিশ্চয় পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক শয়তান যেমন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। এই বলে। যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

٦. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَلَا تُطِيْعُوْهُ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ اَتْبَاعَهٗ فِى الْكُفْرِ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ النَّارِ الشَّدِيْدَةِ.

৬. তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব আল্লাহর আনুগত্যে তাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর। অতএব তার অনুসরণ করিওনা সে তার দলবলকে তার অনুগতদেরকে কুফরির দিকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।

٧. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ فَهٰذَا بَيَانُ مَا لِمُوَافِقِي الشَّيْطَانِ وَمَا لِمُخَالِفِيْهِ وَنَزَلَ فِيْ اَبِيْ جَهْلٍ وَغَيْرِهِ.

৭. যারা কুফরি করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আজাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। এটা ঐ প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা যা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণকারী ও অনুগামীদের জন্যে রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

সূরায়ে ফাতিরের অপর নাম সূরায়ে মালাইকা।

قَوْلُهُ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ : অর্থাৎ خَالِقُهَا عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ - فِطْر-এর মূল অর্থ হলো مُطْلَقًا شَقٌّ

وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) مَاكُنْتُ اَدْرِىْ مَا فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى اِخْتَصَمَ اِلَىَّ اَعْرَابِيَّانِ فِىْ بِئْرٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَنَا فَطَرْتُهَا اَىْ اَبْتَدَأْتُهَا وَابْتَدَعْتُهَا

প্রশ্ন. فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর মধ্যে اِضَافَة لَفْظِىْ হয়েছে। কাজেই এটা تَعْرِيْف এর ফায়দা দেয় না। অথচ এই জুমলা اَللّٰهُ শব্দের صِفَتْ হয়েছে যা মা'রেফা।

উত্তর. যেহেতু فَاطِرٌ ফে'লে মাযীর অর্থে হয়েছে যার কারণে এই ইযাফত مَعْنَوِىْ হয়েছে। কাজেই اَللّٰهُ -এর সিফত হওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ : এটা اَللّٰهُ শব্দের দ্বিতীয় সিফত হয়েছে।

প্রশ্ন. جَاعِلِ এটা مَاضِىْ -এর অর্থে হয়েছে অথবা حَالٌ বা اِسْتِقْبَالٌ অর্থে। যদি مَاضِىْ -এর অর্থে হয় তবে তার আমেল হওয়া বৈধ নয় অথচ এটা رُسُلًا-এর মধ্যে عَامِلٌ হয়েছে। যদি حَالٌ বা اِسْتِقْبَالٌ অর্থে হয় তবে اِضَافَتْ لَفْظِىْ হবে যা مَعْرِفَة -এর ফায়দা দেয় না। এই সুরতে اَللّٰهُ শব্দের সিফত হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. এখানে جَاعِلِ টা اِسْتِمْرَارِىْ-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই مَاضِىْ -এর অর্থে হওয়ার কারণে اِضَافَتْ مَعْنَوِىْ হবে এবং مَعْرِفَة এর ফায়দা দিবে। যার ফলে اَللّٰهُ শব্দের সিফত হওয়া বৈধ হবে। আর যেহেতু حَالٌ এবং اِسْتِقْبَالٌ -এর অর্থেও হয়েছে কাজেই তার عَامِلٌ হওয়াও বৈধ হয়েছে। এখন আর কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ اُوْلِىْ : এটা حَالَتْ نَصَبِىْ এবং جَرِّىْ তে হয়েছে, حَالَتْ رَفْعِىْ তে اُوْلُوْ ব্যবহৃত হয় অর্থ ওয়ালা, ধারী। এটা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একবচন আসেনা, কেউ কেউ এর একবচন ذُوْ বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ : এটা جَنَاحٌ -এর বহুবচন। এটা رُسُلًا-এর সিফত উভয়টি যেহেতু শব্দের হিসেবে نَكِرَة তাই مُطَابَقَتْ ও বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তাতে এই সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে পর/পাখা হওয়া সেই ফেরেশতার জন্য নির্দিষ্ট যারা নবী রাসূলগণের নিকট প্রেরিত হতেন। অথচ সকল ফেরেশতারই পর রয়েছে। কাজেই একে مَلٰئِكَة-এর সিফত বা حَالٌ বলা বেশি উপযোগী হবে।

قَوْلُهُ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ : এটা اَجْنِحَةٍ হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে اِنَّ-এর نَتْحَه টা غَيْر مُنْصَرِفٌ -এর কারণে হয়েছে। কেননা এই তিন কালিমাতে وَصْفِيَّتْ এবং عَدْلٌ হওয়ার কারণে كَسْرَه-এর نِيَابَتْ হয়েছে। এই কালিমাগুলো تَكْرَارٌ থেকে عُدُوْلٌ করে এসেছে যেমন- مَثْنٰى টা اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ থেকে مَعْدُوْلٌ হয়ে। এমনিভাবে অন্যগুলোও।

قَوْلُهُ وَيَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ : এটা مُسْتَانِفْ বাক্য যা পূর্বের তাকিদের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا : এর মধ্যে لَهَا এবং فَلَا مُرْسِلَ لَهُ -এর মধ্যে لَهُ উভয়টির مَرْجِعْ হলো مَا ; لَهَا -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এবং لَهُ -এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ هَلْ مِنْ خَالِقٍ : هَلْ টা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ -এর জন্য এবং تَوْبِيْخ -এর জন্যও হতে পারে, আর مِنْ হলো অতিরিক্ত। আর خَالِقٍ হলো مُبْتَدَأ যা শব্দগতভাবে مَجْرُوْر হয়েছে এবং مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর غَيْرُ اللّٰهِ এটা رَفْع -এর সাথে خَالِقٍ -এর সিফত হয়েছে مَحَلّ -এর হিসেবে غَيْرُ اللّٰهِ সিফত হয়েছে শব্দের হিসেবে خَالِقٍ মুবতাদার খবর হলো يَرْزُقُكُمْ; কেউ কেউ বলেন, لَكُمْ হলো তার খবর যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تُؤْفَكُوْنَ : এটা اَفْكٌ [হামযা যবরযুক্ত] থেকে নির্গত এর অর্থ– পথভ্রষ্ট হওয়া এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিকে ওদিক ঘোরা ফেরা করা। আর اِفْكٌ [হামযা যের যুক্ত] অর্থ মিথ্যা ও অপবাদ।

تُؤْفَكُوْنَ এটা مُضَارِعْ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُوْلِ আর وَاوْ হলো نَائِبِ فَاعِلْ অর্থ তোমরা কোথায় চক্কর দিচ্ছ, আবর্তন করছ।

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا : এটা মূলত اِنْ يُكَذِّبُوْا -এর جَزَاء হয়েছে। আর فَا হলো جَزَائِيَّه কিন্তু جَزَاء -এর سَبَبْ কে যা হলো تَكْذِيْبْ তাকে جَزَاء -এর স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : 'ফাতের' শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। এ সূরার শুরুতেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথা রয়েছে, তাই এ সূরার নাম 'ফাতের' হয়েছে।

এ সূরাকে 'সূরাতুল মালায়েকা'ও বলা হয়। কেননা এ সূরায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। সূরায়ে সাবা-এর শেষের দিকে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা মনে করে [না'উজুবিল্লাহি মিন জালিক]।

মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে স্বস্থানে। এ সূরায় ফেরেশতাদের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি যারা আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, সর্বক্ষণ তারা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল এবং তাঁর হুকুম পালনে ব্যস্ত। এ সূরাটি সেই পাঁচটি সূরার অন্যতম যা আরম্ভ করা হয়েছে হামদ দ্বারা। যিনি বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি রিজিকদাতা, ভাগ্য নিয়ন্তা যাঁর এক আদেশে বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর আরেক আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগত লয় প্রাপ্ত হবে, আমরা যার অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। যারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার এবং নেককার হয়, তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে এ সূরায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুশরিকদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিরাট নিয়ামত। তাই এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের ইঙ্গিত করে এ সূরাকে হামদ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করে শোকরগুজারীর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী. খ. ২২, পৃ. ১৬১]

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতে তৌহীদের প্রমাণ এবং শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের উল্লেখ করে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের বিরোধিতা এবং নানা চক্রান্তের কারণে প্রিয়নবী ﷺ কোনো কোনো সময় চিন্তিত হয়ে পড়তেন, তাই তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

এ সূরাকে আল্লাহ পাক হামদ এবং শোকরের কথা দ্বারা শুরু করেছেন। প্রথমত এ সূরায় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত এবং অসাধারণ কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে। এতে তাওহীদের প্রমাণ রয়েছে। এপর প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের ঘোষণা রয়েছে এবং অবশেষে কিয়ামতের কঠিন দিনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সূরায়ে ফাতের' মক্কায় নাজিল হয়েছে।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সূরায়ে ফাতেরকে 'সূরাতুল মালায়েকা' ও বলা হয়, আর এটি মক্কায় অবতীর্ণ।

আবদ ইবনে হোমায়েদ, ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি এ সূরার فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ বাক্যটির فَاطِرِ শব্দটির অর্থ জানতাম না, ঘটনাক্রমে দু'জন বেদুইন ব্যক্তিকে একটি কূপের মালিকানা নিয়ে কলহরত দেখলাম, তন্মধ্যে একজন বলল أَنَا فَطَرْتُهَا অর্থাৎ 'এ কূপটি প্রথমে আমিই তৈরি করেছিলাম', অতএব, এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে কোনো প্রকার নমুনা না দেখে প্রথম সৃষ্টি করা।

–[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ২৬৫, তাফসীরে ইবন কাসীর (উর্দু), পারা ২২, পৃ. ৬৮]

قَوْلُهُ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا : ফেরেশতাগণকে রাসূল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহর দূত নিযুক্ত করে পয়গাম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহকাম পৌঁছে দেয়। রাসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকে সৃষ্টির মধ্যে পয়গাম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত অথবা আজাব পৌঁছানোর কাজেও ফেরেশতাগণই মাধ্যম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ أُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্দ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে।
–[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পৌঁছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং কখনও চার চার করে আগমন করে। এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বুঝায় না; বরং একটা উদাহরণ মাত্র। কেননা কুরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও বেশিসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে। –[বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যত বেশি ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যত এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের পাখা দু'চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশিও হতে পারে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলির সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হাইয়ান বাহরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তাফসীর করেছেন। এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ তা'আলার দান ও নিয়ামত। এজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا : এখানে রহমত বলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বুঝানো হয়েছে। যেমন– ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিজিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ, ইজ্জত -আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যার জন্য স্বীয় অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণবশত কোনো বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।

-[আবূ হাইয়ান]

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। একবার হযরত মু'আবিয়া (রা.) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) -কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রাসূল ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছ। এরূপ কোনো হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হযরত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে বস্তু আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোনো চেষ্টা কার্যকর হতে পারে না। -[মুসনাদে আহমদ]

মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরিউক্ত বাক্যগুলো তিনি রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহর উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহর প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস (রা.) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কুরআন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ দ্বিতীয় আয়াত এরই সমর্থবোধক- اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ তৃতীয় আয়াত سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا এবং চতুর্থ আয়াত وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -[রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ অতঃপর مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ مِنْ رَّحْمَةٍ আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। -[মুয়াত্তা মালেক]

قَوْلُهٗ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ : غَرُوْر শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে, তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গুনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়' এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে লোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গুনাহ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না। -[কুরতুবী]

٨. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْءُ عَمَلِهٖ بِالتَّمْوِيْهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ط مَنْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ كَمَنْ هَدَاهُ اللّٰهُ لَا دَلَّ عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ز فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُزَيَّنِ لَهُمْ حَسَرٰتٍ ط بِاغْتِمَامِكَ اَنْ لَا يُؤْمِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

৮. আগত আয়াতটি আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি তার সমান যাকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন? না এতে مَنْ মুবতাদা এবং তার খবর হলো উহ্য كَمَنْ هَدَاهُ যার উহ্যতার উপর প্রমাণ বহন করে পরবর্তী আয়াত فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি যাদেরকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে তাদের জন্যে এই মর্মে তারা ঈমান আনে না কেন? অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তারা যা করে। অতএব তিনি তাদেরকে এর উপর শাস্তি দিবেন।

٩. وَاللّٰهُ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ اَيْ تُزْعِجُهٗ فَسُقْنٰهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ لَا نَبَاتَ بِهَا فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ مِنَ الْبَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهَا ط يُبْسِهَا اَيْ اَنْبَتْنَا بِهِ الزَّرْعَ وَالْكَلَاَ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ اَيِ الْبَعْثُ وَالْاِحْيَاءُ.

৯. আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন অন্য কেরাত মতে اَلرِّيْحَ অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। এখানে مُضَارِعْ-এর ব্যবহার অতীত কালের অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্যে অর্থাৎ বায়ু মেঘকে নাড়া দেয় অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। سُقْنَا গায়েব থেকে পরিবর্তন করে مُتَكَلِّمْ বলা হয়েছে। مَيِّتٌ শব্দটি তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পড়বে। অর্থাৎ শস্য বিহীন ভূমি অতঃপর তাদ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। অর্থাৎ তাতে শস্য ও ঘাস ইত্যাদি উৎপন্ন করি এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবনদান।

١٠. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط اَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا تُنَالُ مِنْهُ اِلَّا بِطَاعَتِهٖ فَلْيُطِعْهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يَعْلَمُهٗ وَهُوَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَحْوُهَا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ يَقْبَلُهٗ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ الْمَكَرَاتِ السَّيِّاٰتِ بِالنَّبِيِّ فِيْ دَارِ النَّدْوَةِ مِنْ تَقْيِيْدِهٖ اَوْ قَتْلِهٖ اَوْ اِخْرَاجِهٖ كَمَا ذُكِرَ فِي الْاَنْفَالِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَمَكْرُ اُولٰۤئِكَ هُوَ يَبُوْرُ يَهْلِكُ.

১০. কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুক, সমস্ত সম্মান আল্লাহর জন্যে। দুনিয়াতে ও আখেরাতে অতএব তার অনুসরণ ব্যতীত সম্মান অর্জন হয় না। অতএব তুমি তারই অনুসরণ কর তারই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য অর্থাৎ তিনি তা জানেন এবং এটা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এ জাতীয় বাক্য এবং সৎকর্ম, তিনি তাকে তুলে নেন। অর্থাৎ কবুল করে যারা মন্দকার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে দারুন নদওয়ায় নবীকে বন্দী, হত্যা বা দেশান্তর করার জন্যে চক্রান্তমূলক পরামর্শ করেছিল, যেমন– সূরায়ে আনফালে বর্ণিত তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

১১. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ اَىْ مَنِيٍّ بِخَلْقِ ذُرِّيَّتِهٖ مِنْهَا ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط ذُكُوْرًا وَّاِنَاثًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط حَالٌ اَىْ مَعْلُوْمَةً لَّهٗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ اَىْ مَا يُزَادُ فِىْ عُمْرِ طَوِيْلِ الْعُمُرِ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اَىْ مِنْ ذٰلِكَ الْمُعَمَّرِ اَوْ مُعَمَّرٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ط هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ هَيِّنٌ ۔

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টির মাধ্যমে অতঃপর বীর্য থেকে আদম সন্তানকে বীর্য থেকে সৃষ্টির মাধ্যমে তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল নারী ও পুরুষ কোনো নারী গর্ভ ধারণ করেনা এবং সন্তান প্রসব করেনা কিন্তু তার জ্ঞাত অনুসারে এখানে اِلَّا بِعِلْمِهٖ বাক্যটি جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ তথা অবস্থাবোধক বাক্য অর্থাৎ بِعِلْمِهٖ অর্থ مَعْلُوْمَةً لَّهٗ কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায়না। অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যক্তির বয়সে বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার বয়স হ্রাস পায়না, কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে তথা লাওহে মাহফুযে নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

১২. وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعُذُوْبَةِ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ شُرْبُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ط شَدِيْدُ الْمُلُوْحَةِ وَمِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا هُوَ السَّمَكُ وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ مِنَ الْمِلْحِ وَقِيْلَ مِنْهُمَا حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج هِىَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وَتَرَى تُبْصِرُ الْفُلْكَ السُّفُنَ فِيْهِ فِىْ كُلٍّ مِّنْهُمَا مَوَاخِرَ تَمْخُرُ الْمَاءَ اَىْ تَشُقُّهٗ بِجَرْيِهَا فِيْهِ مُقْبِلَةً وَّمُدْبِرَةً بِرِيْحٍ وَّاحِدَةٍ لِتَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا مِنْ فَضْلِهٖ تَعَالٰى بِالتِّجَارَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ ۔

১২. দু'টি সমুদ্র সমান হয়না একটি অধিক মিঠা ও তৃষ্ণা নিবারক এবং অপরটি অধিক লোনা, উভয়টি থেকে তোমরা তাজা গোশত মাছ আহার কর এবং লবণাক্ত পানি থেকে বা উভয়টি থেকে পরিধানে ব্যবহার্য গয়না মণি-মুক্তা ও মারজান আহরণ কর। তুমি তাতে উভয় সাগরে জাহাজসমূহ দেখ, যা পানি চিরে চলে। অর্থাৎ একই বাতাসের মাধ্যমে তা পানিকে চিরে সামনে ও পশ্চাতে চলে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ কর ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٣. يُوْلِجُ يُدْخِلُ اللّٰهُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ فَيَزِيْدُ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ يُدْخِلُهُ فِى اللَّيْلِ فَيَزِيْدُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَجْرِىْ فِى فَلَكِهِ لِأَجَلٍ مُسَمًّى ط يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ لِفَافَةِ النَّوَاةِ .

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন অতঃপর তা দীর্ঘ হয় এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন অতঃপর তা দীর্ঘ হয় এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি তারা নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট মেয়াদে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। ইনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক যে সমস্ত মূর্তির উপাসনা কর তারা তুচ্ছ খেজুর আটির ও অধিকারী নয়।

١٤. اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا فَرْضًا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط مَا اَجَابُوْكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ط بِاِشْرَاكِكُمْ اِيَّاهُمْ مَعَ اللّٰهِ اَىْ يَتَبَرَّؤُوْنَ مِنْكُمْ وَمِنْ عِبَادَتِكُمْ اِيَّاهُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ بِاَحْوَالِ الدَّارَيْنِ مِثْلُ خَبِيْرٍ عَالِمٍ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনেনা। যদিও মেনে নিলাম শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। বরং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে তোমরা আল্লাহর সাথে তাদেরকে অংশীদার করা থেকে নিজেদের পবিত্রতার দাবি করবে বস্তু আল্লাহর ন্যায় উভয় জাহানের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। অর্থাৎ একমাত্র অবহিতকারী আল্লাহই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَمَنْ زُيِّنَ : এটা جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ পূর্বে যেই দুই দলের পরিণামের ব্যাপারে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে এর تَاْيِيْد হয়েছে। مَنْ মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلِّ رَفْعِ তে হয়েছে। এর খবর উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ كَمَنْ لَمْ يُزَيَّنْ لَهُ কেসায়ী বলেন, ذَهَبَتْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ হলো খবর যা উহ্য রয়েছে। আর আল্লাহর বাণী فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ টা এর উপর প্রমাণবহ। আর ইমাম যুজাজ كَمَنْ هَدَاهُ اللّٰهُ কে উহ্য খবর [মেনেছেন। প্রথম সুরত শব্দও অর্থের ক্ষেত্রে مُطَابَقَتْ-এর কারণে উত্তম।

قَوْلُهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ : অর্থাৎ عَمَلِهِ السَّيِّئ এটা اِضَافَتُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ لَا : لَا বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ-এর দিকে ইঙ্গিত করার জন্য।

قَوْلُهُ حَسَرَاتٍ : এটা فَلَا تَذْهَبْ-এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে এবং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে অধিক পেরেশানি বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ : এটা تَذْهَبْ -এর صِلَةٌ হয়েছে যেমন– বলা হয় مَاتَ عَلَيْهِ حُزْنًا ; عَلَيْهِمْ-এর تَعَلُّقْ -টা حَسَرَاتٍ-এর সাথে বৈধ নয়। কেননা মাসদারের مَعْمُول মাসদারের উপর مُقَدَّمْ হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَنْ لَّايُؤْمِنُوْا : অর্থাৎ عَلٰى اَنْ لَّا يُؤْمِنُوْا

قَوْلُهُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ : এটা মূলত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন এই যে, এর পূর্বে ارسل মাযীর সীগাহ ব্যবহার করেছেন এবং এই বিষয়েই তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তীতে تُثِيْرُ মুযারের সীগাহ ব্যবহার করেছেন। এতে ফায়দা কি?

এই প্রশ্নের জবাবের সার হলো এই যে, মুযারের সীগাহ যা حَالْ -এর উপর দালালত করে, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা সেই عَجِيْب وَغَرِيْب সুরতের উপস্থিত করতে চেয়েছেন যা তার পূর্ণ ক্ষমতা ও হিকমত কে বুঝায়। কোনো সুরতে হাল অথবা ঘটনা এমনভাবে উপস্থাপন করা যার দ্বারা বিগত ঘটনা চোখের সামনে এমনভাবে ফুটে উঠে যে, মনে হয় যেন এই ঘটনা এরখনই সংঘটিত হচ্ছে, এটাকেই حِكَايَت حَال مَاضِيَة বলা হয়।

قَوْلُهُ تُثِيْرُ : এটা إِشَارَةٌ থেকে مُضَارِعْ-এর وَاحِد مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ অর্থ– উত্তেজিত করে উঠায়, নড়াচড়া দেয়। اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَتِ اِلَى التَّكَلُّمِ -এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা اَرْسَلَ টা غَائِبْ -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন এবং سُقْنَا -এর মধ্যে مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন, عَظْمَتْ -এর ভিত্তিতে جَمْع -এর ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ بَلَدٍ : স্ত্রী লিঙ্গ ও পুং লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই بَلَدٌ -এর ব্যবহার হয়ে থাকে। بَلَدٌ এবং بَلْدَةٌ আবাদি ও অনাবাদি উভয় প্রকার জমির ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। এখানে بَلَدٍ مَيِّتٍ দ্বারা সেই ভূমি উদ্দেশ্য যাতে লতা পাতা কিছুই জন্মায় না, মৃত ভূমি দ্বারা শুষ্ক পানিহীন প্রান্তর উদ্দেশ্য। ভূমিকে জীবিত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে সবুজ শ্যামল করে তোলা।

قَوْلُهُ مِنَ الْبَلَدِ : এতে مِنْ টি بَيَانِيَه হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذَالِكَ النُّشُوْرُ : এতে মুর্দাদের কে শুষ্ক ভূমির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এবং মুর্দাদেরকে জীবিত করাকে ভূমিকে সবুজ শ্যামল করার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلْيَطْلُبْهُ : ব্যাখ্যাকার এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন مَنْ كَانَ-এর মধ্যে مَنْ টি شَرْطِيَه আর فَلْيَطْلُبْهُ এর জবাব উহ্য রয়েছে। আল্লাহর বাণী فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا -এটা جَوَاب شَرْط -এর ইল্লত।

قَوْلُهُ يَعْلَمُه : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَلَام এর মধ্যে مَجَازْ হয়েছে আর عِلْم টা صُعُوْد অর্থে হয়েছে عِلْم কে صُعُوْد দ্বারা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য হলো قَبُوْلِيَتْ -এর দিকে ইঙ্গিত করা। কেননা مَوْضِع ثَوَابْ হলো উপরে আর مَوْضِع عَذَابْ হলো নিচে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ : كَلِمَات طَيِّبَة বর্ণনা করার পর এটা كَلِمَات خَبِيْثَة -এর بَيَانْ

قَوْلُهُ وَالسَّيِّئَاتِ : এটা উহ্য মাফউলে মুতলাকের সিফত। উহ্য ইবারত যেমনটি শারেহ (র.) اَلْمَكْرَاتِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ يَمْكُرُوْنَ الْمَكْرَاتِ السَّيِّئَاتِ ; اَلسَّيِّئَاتِ টা مَفْعُول بِهٖ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হওয়া বৈধ নয়। কেননা يَمْكُرُوْنَ হলো فِعْل لَازِم যা مَفْعُول به কে নসব দিতে পারে না। কেউ কেউ বলেন يَمْكُرُوْنَ টা يَكْسِبُوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে তা مُتَعَدِّي কাজেই তার اَلسَّيِّئَاتِ কে مَفْعُول بِهٖ হিসেবে نَصَب দেওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ : তারকীবের ইবাফী মুবতাদা। আর يَبُوْرُ হলো তার খবর। আর هُوَ হলো ضَمِيْر فَصَل খবরের পূর্বে ضَمِيْر فَصَل হওয়ার জায়েজ না জায়েজের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। জায়েজ হওয়ার মতই প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

يَبُوْرُ হলো مُضَارِعْ -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ-এর সীগাহ বাবে نَصَرَ মাসদার بَوَارًا, بُوْرًا অর্থ– ধ্বংস হওয়া।

قَوْلُهُ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعُذُوْبَةِ : অর্থ অত্যন্ত মিষ্ট পানি।

قَوْلُهُ اُجَاجٌ شَدِيْدُ الْمُلُوْحَةِ : অর্থ খুবই লবণাক্ত।

قَوْلُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ : مَا হলো نَافِيَه আর يُعَمَّرُ হলো فِعْل مُضَارِعْ আর مِنْ হলো অতিরিক্ত আর مُعَمَّرٍ হলো نَائِب فَاعِلْ

قَوْلُهُ قِطْمِيْرٍ : সেই পাতলা ঝিল্লিকে বলে যা খেজুরের দানার উপর পেচানো থাকে। আবার কেউ কেউ সেই লম্বা সূক্ষ্ম সূত্রকে বলেছেন যা দানার লম্বালম্বিতে হয়ে থাকে। কেউ কেউ ঐ তন্তুকে বলেছেন যা সেই গর্তে/ ছিদ্রে হয়ে থাকে যা দানার পিঠে হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো যাদেরকে তোমরা ডাকো এবং যাদের থেকে সাহায্যের আশা রাখা এটা তো একটি সামান্য ও মামুলি জিনিসেরও ক্ষমতা রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ : আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ওমর ইবনুল খাত্তাব বা ওমর বিন হিশাম [আবূ জাহল] দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এবং এ দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করেন। -[রূহুল মাআনী]

قَوْلُهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছেন, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরিয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (র.) 'মুযিহুল কুরআনে' বলেন, সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর জিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই জিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌঁছায়। اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তাফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তাফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক শহর ইবনে হাওশাব প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কালেমায়ে তাওহীদ হোক অথবা অন্য কোনো জিকির-তাসবীহ হোক কোনোটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' কিংবা অন্য কোনো জিকির মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার জিকির ও কালেমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আজাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়াত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আজাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোনো কথা ও কাজকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না। -[কুরতুবী]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, যে কোনো কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মুতাবিক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার উপরিউক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, يَرْفَعُهُ শব্দের ضَمِيْر فَاعِلْ হচ্ছে كَلِم طَيِّبْ এবং ضَمِيْر مَفْعُوْل হচ্ছে عَمَل صَالِحٌ অতএব অর্থ এই যে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায়। অর্থাৎ কবুল যোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহর জিকিরও তার এই জিকির করে তার কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে।

বাস্তব সত্য এই যে, কালেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও জিকির ব্যতীত ফুটে উঠে না; প্রচুর জিকিরই সৎ কর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

قَوْلُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফূজে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফূযে লিবিপদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং গোটা মানব জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহহাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায় তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তাফসীর শা'বী, ইবনে জুবায়র, আবূ মালিক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে। -[রূহুল মা'আনী] এ বিষয়বস্তুটি নিম্নোক্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا * مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا اِنْتَقَصَتْ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুনতি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম। কাজেই যখনই একটি শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালিকের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَ فِىْ اِثْرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "যে ব্যক্তি চায় যে তার রিজিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, [বয়স তো আল্লাহ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত] নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। [অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।] সারকথা, যেসব হাদীসে কোনো কোনো কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

قَوْلُهُ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا : অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত একে জবাই করার প্রয়োজন হয় না। স্থলভাগের অন্যান্য জন্তু এর বিপরীত। সেগুলো জবাই না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশত। حِلْيَةً শব্দের অর্থ গয়না। এখানে মোতি বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমিন মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কুরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

تَلْبَسُوْنَهَا : শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যবহার করা পুরুষের জন্যও জায়েজ। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররূপে ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ : অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কত নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমত তারা শুনতেই পারবেনা। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নন এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপরিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়।

অনুবাদ :

١٥. يَآَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ج بِكُلِّ حَالٍ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ خَلْقِهٖ الْحَمِيْدُ الْمَحْمُوْدُ فِيْ صُنْعِهٖ بِهِمْ ۔

১৫. হে মানুষ, তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তিনি মাখলুক থেকে অভাবমুক্ত, সৃষ্টিজীবের তার অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত।

١٦. اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ بَدَلَكُمْ ۔

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন।

١٧. وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ شَدِيْدٍ ۔

১৭. এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।

١٨. وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَّازِرَةٌ اٰثِمَةٌ اَيْ لَا تَحْمِلُ وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ نَفْسٌ مُّثْقَلَةٌ بِالْوِزْرِ اِلٰى حِمْلِهَا مِنْهُ اَحَدًا لِّيَحْمِلَ بَعْضَهٗ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْكَانَ الْمَدْعُوْ ذَا قُرْبٰى ط قَرَابَةٍ كَالْاَبِ وَالْاِبْنِ وَعَدَمُ الْحَمْلِ فِي الشِّقَّيْنِ حُكْمٌ مِّنَ اللّٰهِ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اَيْ يَخَافُوْنَهٗ وَمَارَاَوْهُ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِالْاِنْذَارِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اَدَامُوْهَا وَمَنْ تَزَكّٰى تَطَهَّرَ مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهٖ فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط فَصَلَاحُهٗ مُخْتَصٌّ بِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ فَيُجْزٰى بِالْعَمَلِ فِي الْاٰخِرَةِ ۔

১৮. কোনো পাপী ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না, এবং যদি কেউ তার পাপের গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না, যদি সে আহবানকৃত ব্যক্তি নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। যেমন, পিতা, ছেলে-সন্তান ইত্যাদি। উভয় অবস্থায় বোঝা বহন না করা আল্লাহর নির্দেশ। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে, অর্থাৎ তারা আল্লাহকে ভয় করে অথচ তারা তাকে দেখেনি কেননা তারা সতর্কবাণী থেকে উপকৃত হয় এবং নামাজ কায়েম করে সর্বদা। যে কেউ নিজের সংশোধন করে নিজেকে শিরক ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখে অর্থাৎ তার সংশোধনের উপকারীতা তার জন্যই নির্দিষ্ট আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতএব পরকালে কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

١٩. وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ ۔

১৯. দৃষ্টিমান মুমিন ও দৃষ্টিহীন কাফের সমান নয়।

٢٠. وَلَا الظُّلُمٰتُ الْكُفْرُ وَلَا النُّوْرُ الْإِيْمَانُ.

২০. অন্ধকার কুফর ও আলো ঈমান সমান নয়।

٢١. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ.

২১. ছায়া জান্নাত ও তপ্তরোদ জাহান্নাম সমান নয়।

٢٢. وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ط الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَزِيَادَةُ لَا فِى الثَّلٰثَةِ تَاكِيْدٌ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ج هِدَايَتَهُ فَيُجِيْبُهُ بِالْإِيْمَانِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ اَىِ الْكُفَّارَ شَبَّهَهُمْ بِالْمَوْتٰى فَلَا يُجِيْبُوْنَ.

২২. আরও সমান নয় জীবিত মুমিন ও মৃত কাফের, উক্ত তিন বাক্যে অতিরিক্ত ۷ তাকীদের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার হেদায়েত শ্রবণ করান অতঃপর সে ঈমানের উপর লাব্বায়েক বলে আপনি কবরে শায়িতদেরকে কাফেরদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। অর্থাৎ কাফেরদেরকে মৃত্যুব্যক্তির সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা দাওয়াত কবুল করে না

٢٣. إِنْ مَا أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُنْذِرٌ لَّهُمْ.

২৩. আপনি তো কেবল তাদের জন্য একজন সতর্ককারী।

٢٤. إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بِالْهُدٰى بَشِيْرًا مَنْ أَجَابَ إِلَيْهِ وَنَذِيْرًا ط مَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَيْهِ وَإِنْ مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا سَلَفَ فِيْهَا نَذِيْرٌ نَبِىٌّ يُنْذِرُهَا.

২৪. আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা যারা গ্রহণ করে তাদের জন্য ও সতর্ককারীরূপে যারা কবুল করে না তাদের জন্য এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী এমন নবী যিনি তাদেরকে সতর্ক করে আসেনি।

٢٥. وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ اَىْ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ وَبِالزُّبُرِ كَصُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ هُوَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا.

২৫. তারা আহলে মক্কা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, মুজিজা সমূহ সহীফা, যেমন, ইবরাহীমের সহিফাসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসমূহ তাওরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে এসেছিলেন। অতএব তুমি ধৈর্য ধর যেমন তারা ধরেছে।

٢٦. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِتَكْذِيْبِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ إِنْكَارِىْ عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوْبَةِ وَالْإِهْلَاكِ اَىْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ.

২৬. অতঃপর আমি কাফেরদেরকে তাদের মিথ্যার কারণে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল তাদের প্রতি আমার আজাব। তা উপযুক্ত স্থানেই পতিত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ : আয়াতে মানুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে অথচ প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এর কারণ হলো এই যে, মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টি এরূপ নয় যারা . غِنَا এবং . اِسْتِغْنَا -এর দাবি করে এজন্যই বিশেষভাবে আয়াতে মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে– يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ اَشَدُّ اِفْتِقَارًا وَاِحْتِيَاجًا اِلَى اللّٰهِ فِيْ اَنْفُسِكُمْ وَعِيَالِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَفِيْمَا يُعْرَضُ لَكُمْ مِنْ سَائِرِ الْاُمُوْرِ فَلَا غِنًى لَكُمْ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ

মানুষ স্বীয় সত্তা, সিফত, পরিবার পরিজনে, সম্পদে মোটকথা সকল ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে মুখাপেক্ষী, যার যতটুকু প্রয়োজন হয় সে সে পরিমাণই মুখাপেক্ষী হয়। সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে মানুষের প্রয়োজন বেশি হওয়ায় তার মুখাপেক্ষীতা সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ইরশাদ করেছেন خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا আর এ হতেই হযরত আবূ বকর (রা.) এর উক্তি مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ অর্থাৎ যে নিজের দারিদ্রতা, প্রয়োজন, লাঞ্ছনা ও অক্ষমতাকে জানতে পারল সে আল্লাহর ইজ্জত, অমুখাপেক্ষীতা, ক্ষমতাকেও জানতে পারল।

قَوْلُهُ اِلَى اللّٰهِ : এটা فُقَرَاءُ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে فُقَرَاءُ হলো فَقِيْرٌ -এর বহুবচন صِيْغَه صِفَتْ কাজেই এর সাথে مُتَعَلِّقْ হওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন. ফকিরের মোকাবিলায় غَنِيٌّ নেওয়ার পর কোনো উদ্দেশ্যে اَلْحَمِيْدُ কে বৃদ্ধি করা হয়েছে?

উত্তর. বান্দার ফকির হওয়া এবং আল্লাহর ধনী হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তবে غَنِيٌّ টা ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী হয় না যতক্ষণ সে দানবীর না হয়। আর যখন غَنِيّ , سَخِيْ এবং جَوَادٌ হয় مُنْعِمٌ عَلَيْهِمْ তার হামদ ও ছানা করে থাকে এবং অনুদান দাতা اَلْحَمِيْدُ مُنْعِمُ عَلَيْهِمْ -এর প্রশংসার অধিকারী হয়। কাজেই আল্লাহ সে غَنِيٌّ এবং نَافِعٌ এ কথার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য اَلْحَمِيْدُ শব্দটির বৃদ্ধি করেছেন। (جَمَل)

قَوْلُهُ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ : এটা আল্লাহ তা'আলা مُطْلَقْ . غِنَا -এর بَيَانْ অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস তাঁর ইচ্ছার উপর এবং বেচে থাকা তার অনুগ্রহের উপর মওকূফ। এতে অন্য কারো হাত নেই, আর স্বীয় উক্তি وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ দ্বারা অতিরিক্ত . اِسْتِغْنَا -এর বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যেন এটা না বুঝে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে ধ্বংস করে দেন তবে তার كَمَالِ مُلْك-এর মধ্যে ক্ষতি হবে। কেননা তিনি সে বিষয়ে সক্ষম যে, নতুন মাখলূক সৃষ্টি করে দিবেন। যারা এদের থেকেও উত্তম ও সুন্দর হবে।

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ اِذْهَابْ এবং اِتْيَانْ তার জন্য কোনো কঠিন বিষয়ই নয়।

قَوْلُهُ وَازِرَةٌ : এটা تَزِرُ -এর فَاعِلْ -এর মওসূফ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) স্বীয় উক্তি نَفْس দ্বারা উহ্যের দিকে ইশারা করেছেন। অর্থাৎ কোনো গুনাহগার ব্যক্তি কোনো গুনাহগারের ভার বহন করবে না [কিয়ামতের দিন]

প্রশ্ন. এই আয়াতে لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى এবং وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। تَطْبِيْق -এর কি সুরত হবে?

উত্তর. এই আয়াত ضَالِّيْن এবং مُضِلِّيْن-এর ব্যাপারে উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল লোকেরা ضَالْ এবং اِضْلَالْ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হওয়া ও পথভ্রষ্ট করার বোঝা উঠাবে। এই পদ্ধতিতে নিজেই নিজের গুনাহের বোঝা বহনকারী হবে।

قَوْلُهُ عَدَمِ الْحَمْلِ فِى الشِّقَّيْنِ : شِقَّيْن দ্বারা حَمْل اِجْبَارِىْ যা وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এবং حَمْلِ اِخْتِيَارِىْ হয় যা وَاِنْ تَدْعُ ذَا قُرْبٰى -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে তা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এবং حَمْل اِجْبَارِىْ -এর অনুমতি না হওয়া আল্লাহর হুকুমেই হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِالْإِنْذَارِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্ন হলো اِنَّمَا যা كَلِمَه حَصْر -এর দ্বারা اِنْذَارْ কে اَهْل خَشْيَتْ -এর সাথে خَاص করার কি কারণ? অথচ প্রত্যেক مُكَلَّفْ -এর জন্যই اِنْذَار রয়েছে।

জবাবের সার হলো− যেহেতু উপদেশ ও اِنْذَارْ দ্বারা اَهْل خَشْيَتْ ই উপকৃত হয় তাই اَهْل خَشْيَتْ কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেমন এরূপ চলেছেন যে, اِنَّمَا يَنْفَعُ اِنْذَارُكَ اَهْلَ الْخَشْيَةِ

قَوْلُهُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ : এটা মুমিন ও কাফেরের উদাহরণ, প্রথমে مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ দ্বারা মুমিন এবং কাফেরদের সত্তার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত : وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ দ্বারা উভয়ের সিফতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ দ্বারা পরকালে উভয়ের ঠিকানার মধ্যে পার্থক্য কে বর্ণনা করেছেন। তিনটি বাক্যেই تَاكِيْد نَفِىْ -এর জন্য لا বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা نَفْس نَفِىْ তো مَا نَافِيَه দ্বারা বুঝা যায়।

قَوْلُهُ اَنَّ يُسْمِعُ : থেকে فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ পর্যন্ত রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ : এতে কাফেরদেরকে اَثَرْ [প্রতিক্রিয়া] কবুল না করার মধ্যে মুর্দাদের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا يُجِيْبُوْنَ : এর বহুবচনের যমীর অর্থের হিসেবে مَنْ-এর দিকে ফিরেছে। এ কারণে মুফাসসির (র.) مَنْ-এর তাফসীর كُفَّارْ দ্বারা করেছেন। কোনো কোনো নুসখায় فَيُجِيْبُوْنَ রয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ : উদ্দেশ্য হলো এই যে, আপনার দায়িত্ব শুধু মাত্র তাবলীগ করা। হেদায়েত আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করে থাকেন।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : এটা اَرْسَلْنٰكَ -এর كَاف থেকে حَالْ হয়েছে এবং حَقّ টা هِدَايَتْ অর্থে হয়েছে আর هِدَايَتْ টা هَادِيًا অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ اَرْسَلْنٰكَ حَالَ كَوْنِكَ هَادِيًا

قَوْلُهُ اَجَابَ اِلَيْهِ : اِلَيْهِ-এর যমীর هِدَايَتْ -এর দিকে ফিরেছে। আর اَجَابَ اِلَيْهِ অর্থ জবাব দেওয়া। কবুল করা اَجَابَ اِلَيْهِ অর্থ হলো قَبِلَهُ আর لَمْ يُجِبْ اِلَيْهِ অর্থ হলো لَمْ يَقْبَلْهُ

قَوْلُهُ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ-এর মধ্যে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ হয়েছে। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ : এটা কাফেরদের দ্বিতীয় তাশবীহ প্রথমটি থেকে اَبْلَغْ; প্রথম তাশবীহ কাফেরদেরকে عَدَمِ نَفْع -এর ক্ষেত্রে অন্ধের সাথে দেওয়া হয়েছিল। আর এতে মুর্দাদের সাথে দেওয়া হয়েছে। অন্ধের মধ্যে কিছুনা কিছু نَفْع থাকে, মুর্দাদের বিপরীত। যে, তাকে কোনোরূপ উপকারই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে; বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে। কিন্তু পথভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্য পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে।

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى বাক্যের অর্থ তাই। কুরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ সে দিন কোনো পিতা তার পুত্রকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোনো পুত্র পিতাকে বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানো অর্থ এই যে, সে আশঙ্কা করবে, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোনো পুণ্য চেয়ে বসে। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهٗ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ : এ আয়াতের শুরুতে কাফেরদেরকে মৃতদের সাথে এবং মু'মিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَنْ فِى الْقُبُوْرِ [কবরস্থ লোক] -এর অর্থ হবে কাফের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফেরদেরও বুঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফেরদেরকে সর্বদাই শোনানো হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়, তেমনি কাফেরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বুঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পর্কিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে কিনা, তা পৃথক এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নমলে করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٧. أَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ج فَأَخْرَجْنَا فِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهٖ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا كَأَخْضَرَ وَ أَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَغَيْرِهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ جَمْعُ جُدَّةٍ طَرِيْقٌ فِي الْجَبَلِ وَغَيْرِهٖ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ وَصُفْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا بِالشِّدَّةِ وَالضُّعْفِ وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ عَطْفٌ عَلٰى جُدَدٌ أَيْ صُخُوْرٌ شَدِيْدَةُ السَّوَادِ يُقَالُ كَثِيْرًا أَسْوَدُ غِرْبِيْبٌ وَقَلِيْلًا غِرْبِيْبٌ أَسْوَدُ .

২৭. তুমি কি দেখনি জাননি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের সবুজ, লাল হলুদ ইত্যাদি ফলমূল উদগত করি। أَخْرَجْنَا ফেয়েল দ্বারা গায়েব থেকে মুতাকাল্লিমের দিকে اِلْتِفَاتْ করা হয়েছে পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ এর বহুবচন অর্থাৎ পাহাড়ের গিরিপথ যেমন, সাদা, লাল ও হলুদ, হালকা ও গাঢ় রংয়ের ও নিকষ কালোকৃষ্ণ। غَرَابِيْبُ এর আতফ جُدَدٌ -এর উপর, অর্থাৎ গাঢ় কালো বর্ণের মরুভূমি। অধিকাংশ সময় أَسْوَدُ غَرَابِيْبُ ব্যবহৃত হয় এবং কখনো غَرَابِيْبُ أَسْوَدُ ব্যবহৃত হয়।

٢٨. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط كَاخْتِلَافِ الثِّمَارِ وَالْجِبَالِ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط بِخِلَافِ الْجُهَّالِ كَكُفَّارِ مَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ فِيْ مُلْكِهٖ غَفُوْرٌ لِذُنُوْبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

২৮. অনুরূপভাবে বিভিন্ন ফলমূল ও পাহাড়ের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। পক্ষান্তরে জাহেলগণ যেমন মক্কার কাফের আল্লাহকে ভয় করে না নিশ্চয় আল্লাহ তার রাজত্বে পরাক্রমশালী ও তার ঈমানদার বান্দাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমাশীল।

٢٩. إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ أَدَامُوْهَا وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً زَكٰوةً وَغَيْرَهَا يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ تَهْلِكَ .

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও সর্বদা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে জাকাত ইত্যাদি ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না।

٣٠. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمُ الْمَذْكُوْرَةِ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط إِنَّهٗ غَفُوْرٌ لِذُنُوْبِهِمْ شَكُوْرٌ لِطَاعَتِهِمْ .

৩০. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রতিদান তাদের উল্লিখিত কর্মের ছওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমাশীল, তাদের আনুগত্যে গুণগ্রাহী।

٣١. وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ط تَقَدَّمَهُ مِنَ الْكُتُبِ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ عَالِمٌ بِالْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ ـ

৩১. আমি আপনার প্রতি যে কিতব কুরআন প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে জাহের ও বাতেন সব জানেন, দেখেন।

٣٢. ثُمَّ اَوْرَثْنَا اَعْطَيْنَا الْكِتَابَ الْقُرْاٰنَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج وَهُمْ اُمَّتُكَ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج بِالتَّقْصِيْرِ فِي الْعَمَلِ بِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ج يَعْمَلُ بِهٖ فِيْ اَغْلَبِ الْاَوْقَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ يَضُمُّ اِلَى الْعَمَلِ بِهِ التَّعْلِيْمَ وَالْاِرْشَادَ اِلَى الْعَمَلِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاِرَادَتِهٖ ذٰلِكَ اَىْ اِيْرَاثُهُمُ الْكِتَابَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ـ

৩২. অতঃপর আমি কিতাবের কুরআনের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি এবং তারা হলো আপনার উম্মত তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী উক্ত কিতাব মতে আমল করতে অবহেলা করার কারণে কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন কারী অধিকাংশ সময় কিতাব মতে আমল করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ যারা কুরআনের উপর আমল করার পাশাপাশি তালীম ও দাওয়াতের কাজ করেছেন এটাই তাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকার বানানো মহা অনুগ্রহ।

٣٣. جَنّٰتُ عَدْنٍ اِقَامَةٍ يَّدْخُلُوْنَهَا اَيِ الثَّلَاثَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ خَبَرُ جَنّٰتٍ الْمُبْتَدَأُ يُحَلَّوْنَ خَبَرٌ ثَانٍ فِيْهَا مِنْ بَعْضِ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ج مُرَصَّعٍ بِالذَّهَبِ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ

৩৩. তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে অর্থাৎ এই তিন দলই জান্নাতে প্রবেশ করবে। يَدْخُلُوْنَ সীগাহটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়ভাবে পড়বে। এবং يَدْخُلُوْنَهَا টি جَنّٰتِ মুবতাদার খবর তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত মোতিখচিত কঙ্কণ দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। يُحَلَّوْنَ দ্বিতীয় খবর সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের।

٣٤. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ جَمِيْعَهُ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ لِلذُّنُوْبِ شَكُوْرٌ لِلطَّاعَاتِ ـ

৩৪. এবং তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সকল দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা পাপসমূহের ক্ষমাশীল, আনুগত্যের উপর গুণগ্রাহী।

٣٥. اَلَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ اَىِ الْاِقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ج لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ اِعْيَاءٌ مِنَ التَّعَبِ لِعَدَمِ التَّكْلِيْفِ فِيْهَا وَذِكْرُ الثَّانِى التَّابِعُ لِلْاَوَّلِ لِلتَّصْرِيْحِ بِنَفْيِهٖ .

৩৫. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। জান্নাতে কষ্ট না হওয়ার কারণে কষ্টের কোনো ধরনের ক্লান্তি থাকবেনা। দ্বিতীয় لُغُوْبٌ প্রথম نَصَبٌ এর তাবে হিসেবে উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে ক্লান্তিকে নফী করা হয়েছে।

٣٦. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ج لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ فَيَمُوْتُوْا يَسْتَرِيْحُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط طَرْفَةَ عَيْنٍ كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ كَافِرٍ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ الْمَفْتُوْحَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاىِ وَنَصَبِ كُلَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج يَسْتَغِيْثُوْنَ بِشِدَّةٍ وَعَوِيْلٍ يَقُوْلُوْنَ .

৩৬. আর যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে অতঃপর আরাম উপভোগ করবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও সামান্য সময়ের জন্যও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই যেমন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি শাস্তি দিয়ে থাকি। نَجْزِىْ সীগাহটি ى ও ن অর্থাৎ نَجْزِىْ - يَجْزِىْ - زَاء তে যের এবং كُلَّ-এর মধ্যে যবর দ্বারা পড়বে। সেখানে তারা আজাবের ভয়াবহতার কারণে আর্ত চীৎকার করে বলবে, রক্ষা চাইবে

٣٧. رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط فَيُقَالُ لَهُمْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا وَقْتًا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط الرَّسُوْلُ فَمَا اَجَبْتُمْ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْهُمْ .

৩৭. হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে এখান থেকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা চিন্তা করব না তাদেরকে বলা হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স সময় দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় তা চিন্তা করতে পারতে? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারী রাসূলও আগমন করেছিল। তবুও তোমরা সাড়া দাওনি অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের কাফেরদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই যিনি তাদের থেকে আজাব প্রতিহত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَلَمْ تَرَ : এটা كَلَام مُسْتَانِفٌ এটা غَالِب قُدْرَتْ এর كَمَال حِكْمَتْ এবং عَجِيْب صَنْعَتْ কে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। আর رُؤْيَتْ দ্বারা رُؤْيَتْ قَلْبِىْ উদ্দেশ্য যেমন মুফাসসির (র.) تَرٰى -এর তাফসীর تَعْلَمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। اَنَّ তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে تَرٰى যা تَعْلَمْ অর্থে হয়েছে তার দুই মাফঊলের قَائِم مَقَام হয়েছে। আর مُخَاطَبْ হলেন রাসূল ﷺ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিও مُخَاطَبْ হতে পারে যার মধ্যে مُخَاطَبْ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَيْ بِالْمَاءِ : فَأَخْرَجْنَا -এর মধ্যে غَيْبَتْ থেকে تَكَلُّمْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে। এবং اِخْرَاجْ -এর মধ্যে অধিক اِحْسَانْ এবং صَنْعَتْ بَدِيْع হয়েছে। এই اِلْتِفَاتْ نُكْتَه -এর মধ্যে صَنْعَتْ بَدِيْع -এর দিকে عِنَايَتْ এর প্রকাশ। কেননা اِنْزَالْ -এর মোকাবিলায়

قَوْلُهُ جُدَدٌ : এটা جُدَّةٌ -এর বহুবচন অর্থ রাস্তা। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, جُدَّةٌ টা قِطْعَةٌ অর্থে হয়েছে। বলা হয় جَدَدْتُ الشَّيْءَ أَيْ قَطَعْتُهُ এবং জওহারী বলেছেন যে, ঐ রেখা সমূহ কে বলা হয় যা জঙ্গলী গাধার পিঠে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا : أَلْوَانُهَا হলো مُخْتَلِفٌ -এর فَاعِلْ এরপর جُمْلَه হয়ে جُدَدٌ-এর সিফত। আর غَرَابِيْبُ -এর আতফ جُدَدٌ এর উপর হয়েছে, سُوْدٌ টা غَرَابِيْبُ -হতে بَدَلْ হয়েছে। অর্থাৎ খুবই কালো কঙ্করময় ভূমি غِرْبِيْبٌ أَسْوَد -এর تَاكِيْد বা صِفَتْ যেমন– اَلْاَحْمَرُ الْقَانِيْ-এর মধ্যে قَانِيْ টা اَحْمَر -এর সিফত হয়েছে। অথবা تَاكِيْد মুবালাগার জন্য صِفَتْ কে অর্থাৎ تَاكِيْد কে مُقَدَّمْ কে مُؤَكَّدْ টা تَاكِيْد করে দিয়েছেন। অন্যথায় সাধারণত صِفَتْ মওসূফের পরে এবং غِرْبِيْبٌ أَسْوَد -এর পরে হয়ে থাকে এবং এটা আসলের অনুযায়ী হয়েছে। এ কারণেই أَسْوَدُ غِرْبِيْبٌ বহুল ব্যবহৃত। এবং খেলাফে কেয়াস হওয়ার কারণে কম ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ : এটা خَبَرِ مُقَدَّمْ হয়েছে مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ صِنْفٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ مِنَ النَّاسِ

قَوْلُهُ كَذَالِكَ : উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে অর্থাৎ اِخْتِلَافًا كَذَالِكَ

قَوْلُهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ : যেহেতু خَشْيَتْ -এর تَعَلُّقْ টা شَيْء، مَعْرِفَتْ এর উপর মওকুফ থাকে। যার যতটুকু مَعْرِفَتْ অর্জিত হবে সে সেই পরিমাণই ভীতু হবেন। কাজেই হাদীসে এসেছে أَنَا أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ এবং شَاذْ কেরাতে اَللّٰهُ কে رَفْع দিয়ে এবং عُلَمَاء কে নসব দিয়ে পড়া হয়েছে। তবে সেই সুরতে يَخْشٰى টা يُعَظِّمُ অর্থে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রতি ভীতুদেরকে মর্যাদা দান করেন।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ : এই وُجُوْب টা خَشْيَتْ-এর ইল্লত। উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মানুষের তাকে এই জন্য ভয় করা উচিত যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান এবং গুনাহগারদের ক্ষমাকারী।

قَوْلُهُ يَرْجُوْنَ تِجَارَةً : এটা اِنَّ-এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً : এটা نَزْعِ خَافِضْ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ এবং حَالْ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ مُسِرِّيْنَ وَمُعْلِنِيْنَ আর لَنْ تَبُوْرَ টা فِعْلِ مُضَارِعْ যা لَنْ এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে এবং جُمْلَه হয়ে تِجَارَةً -এর সিফত হয়েছে। আর مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَرْجُوْنَ ثَوَابَ تِجَارَةٍ لَنْ تَبُوْرَ আর تَبُوْرَ বাবে نَصَرَ হতে بَوَارٌ মাসদার অর্থ ধ্বংস হওয়া, মিটে যাওয়া। تَبُوْرُ অর্থ হলো সে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিনিষ্ট হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ : এর মধ্যে لَامْ টি عَاقِبَه -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ : اَلَّذِيْ হলো মওসূল أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ বাক্য হয়ে সেলাহ, মওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা مِنَ الْكِتَابِ -এর مِنْ টি হলো هُوَ بَيَانِيَه হলো মুবাতাদা اَلْحَقُّ হলো খবর, মুবাতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে اَلَّذِيْ মুবতাদার খবর হয়েছে। কেউ কেউ هُوَ কে ضَمِيْر فَصَل বলেছেন আর اَلْحَقُّ কে اَلَّذِيْ মুবতাদার খবর বলেছেন। (جَمَل)

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا : এটা اَلْكِتَابِ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا أَعْطَيْنَا : ثُمَّ টা بُعْدِ رُتْبِيْ কে বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। আর أَوْرَثْنَا -এর তাফসীর أَعْطَيْنَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, যেমনিভাবে কোনো কষ্ট ক্লেশ বিহীনভাবে মিরাশ অর্জন হয়। এমনিভাবে কুরআন ও উম্মতের কষ্ট কষ্ট ক্লেশ ছাড়াই অর্জিত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ عِبَادِنَا : এর মধ্যে مِنْ টা بَيَانِيَه এবং تَبْعِيْضِيَه উভয়ই হতে পারে।

قَوْلُهُ أَوْرَثْنَا : এটা فِعْل এবং فَاعِل আর الْكِتَابَ হলো مَفْعُول بِه ثَانِي যা مُقَدَّمْ হয়েছে এবং اَلَّذِيْنَ হলো প্রথম মাফঊল যা مُؤَخَّرْ হয়েছে। আর اِصْطَفَيْنَا বাক্য হয়ে اَلَّذِيْنَ-এর সেলাহ হয়েছে। আর مِنْ عِبَادِنَا হলো حَالْ

قَوْلُهُ مُقْتَصِدٌ : এটা اِقْتِصَادٌ মাসদার হতে اِسْم فَاعِلْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ অর্থ– সঠিক রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। মধ্যম পন্থা।

قَوْلُهُ مُرَصَّع بِالذَّهَبِ : এই তাফসীর لُؤْلُؤٍ যেরের সাথের কেরাতের সুরতে আর لُؤْلُؤًا নসবের সাথে হলে مِنْ أَسَاوِرَ -এর مَحَلّ -এর উপর আতফ হবে يَدْخُلُوْنَ এবং يُحَلَّوْنَ এটা تَغْلِيْبًا হয়েছে। অন্যথায় নারীদেরও এই একই বিধান।

قَوْلُهُ الْحَزَنَ : এটা বাবে سَمِعَ -এর মাসদার অর্থ চিন্তা, পেরেশানি এবং চিন্তিত হওয়া । ব্যাখ্যাকার جَمِيْعَه বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রত্যেক ধরনের চিন্তা পেরেশানি দূর করা উদ্দেশ্য, চাই এটা غَمِّ مَعَاشْ হোক বা غَمِّ مَعَادْ হোক। মোটকথা জান্নাতে কোনো ধরনের চিন্তা থাকবে না।

قَوْلُهُ قَالُوْا : মাযীর সীগাহ وُقُوْع يَقِيْنِيْ -এর কারণে নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ أَحَلَّنَا : এটা حَلَّ يَحِلُّ حُلُوْلًا থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো প্রবেশ করা।

قَوْلُهُ الْمُقَامَة : এটা বাবে اِفْعَالْ থেকে مَصْدَرمِيْمِي অর্থ– সর্বদা অবস্থান।

قَوْلُهُ نَصَبٌ : ক্লান্তি, কষ্ট।

قَوْلُهُ لُغُوْبٌ : لُغُوْبٌ মাসদার এর اِسْم مَصْدَرْ অর্থ অলসতা, কাপুরুষতা, মন্থরতা ক্লান্তি, শান্তি, অসুস্থতা।

قَوْلُهُ وَذِكْرِ الثَّانِي التَّابِعِ لِلْأَوَّلِ : এই ইবারত দ্বারা মুফাসসিরের উদ্দেশ্যে একটি সংশয়ের অপনোদন করা। সংশয় : সংশয় হলো نَصَبٌ (ক্লান্তি) হলো سَبَبْ আর لُغُوْب (অলসতা) আর مُسَبَّبْ আর اِنْتِفَاء سَبَبْ টা اِنْتِفَاء مُسَبَّبْ আবশ্যক করে। আর لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ -এর মধ্যে سَبَبْ এর نَفِيْ হয়েছে। কাজেই لُغُوْب -এর ও نَفِيْ হয়ে গেছে। পুনরায় لُغُوْب -এর نَفِيْ -এর কি প্রয়োজন?

উত্তর. উত্তরের সার হলো যদিও سَبَبْ -এর نَفِيْ টা مُسَبَّبْ -এর نَفِيْ কে আবশ্যক করে তবে এই نَفِيْ টা ضِمْنًا এবং تَبْعًا হয়ে থাকে। لُغُوْب-এর نَفِيْ করে مُسْتَقِلًّا نَفِيْ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَصْطَرِخُوْنَ : এটা اِصْطِرَاخٌ হতে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ তারা চিৎকার করবে। اِصْطِرَاخٌ এটা বাবে اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার। تَا কে طَا দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَوِيْل : رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ অর্থাৎ জোরে জোরে কান্নাকাটি করা।

قَوْلُهُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ : এই বাক্যটি উহ্য قَوْل-এর مَقُوْلَه হয়েছে অর্থাৎ فَيُقَالُ لَكُمْ আর هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ টা اِنْكَارِيْ যা تَوْبِيْخ -এর জন্য হয়েছে। وَاو আতেফার মাধ্যমে উহ্যের উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ أَلَمْ نُمْهِلْكُمْ وَنُؤَخِّرْكُمْ عُمْرًا আর مَا হলো نَكِرَه مَوْصُوْفَه যা وَقْت অর্থে হয়েছে। আর يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ বাক্য হয়ে صِفَتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا أَجَبْتُمْ : এই ইবারত বৃদ্ধি করণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা। সংশয় হলো–প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, اِذَاقَتْ عَذَابْ -এর تَرَتُّبْ রাসূল আসার উপর مُرَتَّبْ অথচ এটা বাস্তবতার বিপরীত।

জবাবের সার হলো اِذَاقَتْ عَذَابْ টা উহ্যের উপর مُرَتَّبْ হয়েছে। রাসূল আসার উপর নয়; আর উহ্য হলো فَمَا أَجَبْتُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে তাওহীদের একাধিক প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের যে অনন্ত মহিমা রয়েছে তা দেখে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নানা বর্ণের মানুষ, নানা রং এর ফল-মূল সাদা, কালো, লাল নানা প্রকৃতির কীট-পতঙ্গ, বিচিত্র অবস্থায় পাহাড় পর্বত বর্তমান রয়েছে। এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বহু নির্দশন রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا 'তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ পাক আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এরপর আমি এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে সাদা লাল এবং গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ তথা বিচিত্র বর্ণের অঞ্চল।

আসমান জমিন আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় আসমান থেকে জমিনে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পানি বর্ষণ করেছেন। লক্ষ্যণীয়, বৃষ্টির পানি একই, আর ঐ এক পানি দ্বারাই সারা পৃথিবীতে যে ফলমূল উৎপন্ন হচ্ছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তার বর্ণ ভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন, কোথাও আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। এর দ্বারাই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে মানুষ, কীট-পতঙ্গ এবং চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, একই প্রকার প্রাণীর মধ্যে কত বর্ণ এবং কত আকৃতি রয়েছে। এ সবই মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত মহিমা। এর কোনো শেষ নেই, নেই কোনো সীমা। মূলত আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। সমগ্র বিশ্ব ভুবন তাঁর কুদরত হেকমতে পরিপূর্ণ।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, ইতিপূর্বে মুমিন ও কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর এ আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির বিচিত্র রূপের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। যেভাবে সৃষ্টির মধ্যে রূপ ও প্রকৃতিতে পার্থক্য রয়েছে, যদিও সব কিছু এক পানি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে মানুষের মধ্যেও কেউ মুমিন আর কেউ কাফের রয়েছে, মুমিনের গন্তব্যস্থল জান্নাতে মুমিন আল্লাহ তা'আলার অনুগত, কৃতজ্ঞ, আর কাফের আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ। -[তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৮৭৭]

তাফসীরকার আবূ হাইয়ান (র.) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদের বর্ণনা রয়েছে। মানব জাতিকে বিশ্ব সৃষ্টির অপরূপ রূপ দেখে বিশ্ব স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। রং বেরংয়ের ফল ফুল, সাদা কালো লাল, আর এ অবস্থা শুধু ফল ফুলে নয়; বরং মানব জাতির মধ্যেও একই অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। আর এ বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গেও পরিলক্ষিত হয়। এ সবই এক আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন।

আবদ ইবনে হোমায়েদ, ইবনে জারীর, কাতাদা (র.)- থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২২, পৃ. ১৮৮-৮৯]

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তাওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে বিষয়রই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ব্যাপার। এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে।

قَوْلُهُ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا : ফলমূলের اِخْتِلَافُ أَلْوَانٍ তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مُخْتَلِفًا শব্দটিকে مَنْصُوبٌ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির اِخْتِلَافٌ তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صِفَتٌ -এর আকারে مُخْتَلِفٌ অর্থাৎ مَرْفُوعٌ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফলমূলের বর্ণ-বৈচিত্র এক অবস্থায় স্থির থাকে না প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তুর বর্ণ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جَادَّةٌ ও বলা হয়। কেউ কেউ جُدَّةٌ এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কালো রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি সাদা ও কালো। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয়।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে كذلك শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিসয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, كَذٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। −[রূহুল মা'আনী]

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ এতে নবী কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচ্য اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। اِنَّمَا শব্দটি আরবিতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়া প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, اِنَّمَا শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে আল্লাহভীতি না থা জরুরি হয় না। −[বাহরে-মুহীত, আবূ হাইয়ান]

আয়াতে عُلَمَاءُ বলে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবি ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারেফত উপরিউক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْعِلْمَ بِكَثْرَةِ الْخَشْيَةِ অর্থাৎ অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইলম নয়; বরং সে জ্ঞানই ইলম যা আল্লাহর ভয়সমৃদ্ধ।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়। −[ইবনে কাসীর]

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (র.) বলেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, সে আলেম নয়। −[মাযহারী]

প্রাচীন মনীষীগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলেম নয়। মুজাহিদ (র.) বলেন اِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللّٰهَ অর্থাৎ কেবল সেই আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদিনায় সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন, اَتْقَاهُمْ لِرَبِّهٖ অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মূর্তযা (রা.) ফকীহ ও আলেমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন إِنَّ الْفَقِيْهَ حَقَّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِيْ مَعَاصِي اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْاٰنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلٰى غَيْرِهِ إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيْهَا وَلَا عِلْمَ لَا فِقْهَ فِيْهِ وَلَا قِرَاءَةَ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا . অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গুনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ আজাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং কুরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই, ফিকহ ব্যতীত ইলমের কোনো কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কুরআন পাঠ করার মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই। -[কুরতুবী]

আল্লাহর ভয় নেই: এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায় উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবি জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কুরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয়ে কোনো সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরিয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরিয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপারে হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্য জরুরি। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম জরুরি নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী এক আয়াতে আল্লাহ তত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলেমগণের একটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্কে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করে। مُضَارِعٌ পদবাচ্যে يَتْلُوْنَ ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কুরআনের অনুশ্রবণ করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য। তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নির্দিষ্ট যে, সে তেলাওয়াত ধর্তব্য যা কুরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তেলাওয়াত শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই ধর্তব্য হবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, هٰذِهِ اٰيَةُ الْقُرَّاءِ অর্থাৎ এ আয়াতটি কারীগণের জন্য যারা কুরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় গুণ নামাজ কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরি হয়ে যায়। যেমন- মিনারে আজান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জামাতে নামাজ আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহর পথে প্রকাশ্য দান করা জরুরি হয়ে যায়। নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ বলেন, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামাজ ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরিউক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর যারা বলা হয়েছে- يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ : تَبُوْرَ শব্দটি بَوَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশঙ্কা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য কোনো সৎকাজে ছওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহর মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানি অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোনো মন্দ কর্মেও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার কারও নেই বেশি চেয়ে বেশি আশাই করতে পারে। [রূহুল মা'আনী]

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে : এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন– অন্য এক আয়াতে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এই– هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশঙ্কা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَنْ تَبُورَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসানে ও ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মতো কোনো ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। 'তারা প্রার্থী' একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষা বেশি দান করবেন। বলা হয়েছে–لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَنْ تَبُورَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপবন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও ছওয়াব পুরোপুরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহ তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দেবেন।

এই বেশির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ গুণ বরং যা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে। [মাযহারী]

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য হতে পারবে, কাফেরের জন্য সুপরিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

قَوْلُهُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا : ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে বুঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্নগুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু আগে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বুঝায়। অতঃপর এই আগপাছ কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কুরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআন ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কুরআনের অধিকারী করার অর্থ ও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গম্বরগণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম বা জ্ঞান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলেম ও জ্ঞানীগণকে পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরিউক্ত অগ্র-পশ্চাৎকালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি। অতঃপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে । একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোনো কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কুরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোনো কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলেমগণের মধ্যস্থতা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। [অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সহজ ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানি কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া।] অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ এ উম্মতের জালিমদেরকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে মধ্যপন্থিদের হিসাবে সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। -[ইবনে কাসীর]

আয়াতের اِصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কুরআন পাকে পয়গাম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ অন্য এক আয়াতে আছে اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে اِصْطِفَاء অর্থাৎ মনোনয়নে পয়গাম্বরগণের সাথে শরিক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়নের উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার : فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে মনোনীত করে কুরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিম, মধ্যপন্থি ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাছীর এই প্রকারত্রয়ের তাফসীর এভাবে করেছেন জালিম সে ব্যক্তি যে কোনো কোনো ফরজ ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থি সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোনো কোনো মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোনো কোনো মোবাহ বিষয় ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। -[ইবনে কাসীর]

অন্যান্য তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। রূহুল মা'আনীতে তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উক্তির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : উল্লিখিত তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, জালেমও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যত অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اِصْطَفَيْنَا গুণের বাইরে নয়। এটি হলো উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যত ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাছীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا তে বর্ণিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই স্তরভুক্ত এবং জান্নাতী। [ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর]

অর্থাৎ মাগফেরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

ইবনে জারীর আবূ সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি [আবূ সাবেত] মসজিদে পৌঁছে হযরত আবুদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। তিনি তাঁর বরাবর গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেন اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ وَارْحَمْ غُرْبَتِيْ وَيَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার আন্তরিকতা পেরেশানী দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে একজন সৎ কর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। [এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গ গণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারি বিষয় বলে গণ্য হতো। তারা সৎসঙ্গীকে প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানির প্রতিকার মনে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।] আবূদ্দারদা (রা.) এই দোয়া শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার মতো সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।] তিনি আরও বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনেছি। এ পর্যন্ত কারও কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হাদীসটি এই রাসূলে করীম ﷺ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا আয়াতখানি তেলাওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যম পন্থিদের কাছ থেকে হালকা হিসেবে নেওয়া হবে এবং জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে। অবশেষে সেও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে তার দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।

তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, وَكُلُّهُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে।

আবূ দাউদ ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- বৎস! এ প্রকার লোকই জান্নাতী। তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানার প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন। মিত্যাচারী বা মধ্যপন্থি তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতঃপর আমাদের ও তোমাদের মতো লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নতুবা সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের প্রথম সারির একজন।

ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিথ্যাচারী জান্নাতী এবং সৎকাজে অগ্রগামী দলে আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের (রা.) জালিমের তাফসীরে বলেন اَلَّذِيْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সংমিশ্রিণ ঘটায় সে জালিম পর্যায়ভুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাবও রাসূল ﷺ -এর শিক্ষার উত্তরাধিকারী হচ্ছে ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ -এর সারমর্ম এই যে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্য রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ ভীতির রঙ্গে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুলত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফিরাত তোমাদের জন্য অবধারিত। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাশরে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন, অতঃপর আলিমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন, إِنِّيْ لَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ إِلَّا لِعِلْمِيْ بِكُمْ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ اِنْطَلِقُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্য রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম [ও যে, তোমাদের এই আমানতের হক আদায় করবে।] তোমাদের আজাব দেওয়ার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। -[তাফসীরে মাযহারী]

জ্ঞাতব্য : আয়াতে সর্বপ্রথম জালিম, অতঃপর মিথ্যাচারী বা মধ্যপন্থি ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবত এই যে, আলিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিথ্যাচারী-মধ্যপন্থি এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছিল। তারপর বলেছেন, ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ। অর্থাৎ এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কঙ্কণ এবং মুক্তার অলঙ্কার পরানো হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার ও রেশমী পোশাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলঙ্কার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত হবে। -[তাফসীরে মাযহারী]

তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কঙ্কণ থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তাফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোন-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরি বরতনে আহার করো না। কারণ এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে।
-[বুখারী, মুসলিম]

হযরত ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে; সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না। -[বুখারী, মুসলিম]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধানকারী পুরুষ পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। -[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهٗ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ : অর্থাৎ জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

درین دنیا کسے غم نبا شد

وگر باشد بنی ادم نباشد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই নিস্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'দারুল-আহযান' দুঃখ-কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়ত কিয়ামত ও হাশর-নাশরের দুঃখ-কষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথায়ও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে। [তাফসীরে তাবারাবীন, মাযহারী]

উপরে বর্ণিত হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালিম শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা এই উক্তি করবে। কেননা হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষ জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা জালিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিথ্যাচারী ও জালিম সকল শ্রেণির জান্নাতিই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া অবান্তর নয়।

ইমাম জাস্সাস (রা.) বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মু'মিনের শান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাঁদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্শ দেখা যেত।

اَلَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। এক. জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। দুই. সেখানে কেউ কোনো দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে। জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোনো কোনো হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে।−[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهٗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ : অর্থাৎ জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আজাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠারো বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরিয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালোমন্দ বুঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরিউক্ত কথাটি বলা হবে তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গাম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যে পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আজাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহর প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গুনাহ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মূর্তযা (রা.) বলেন আল্লাহ তা'আলা যে বয়সে গুনাহগার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতেও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সতের আঠারো বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরিয়তের বিধানাবলি পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওজর আপত্তি করার কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে : أَعْمَارُ أُمَّتِىْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে। খুব কম লোকই এই সীমা অতিক্রম করবে।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য ভীতি-প্রদর্শনকারী ও প্রেরণ করেছেন। 'নাযীর' শব্দের অর্থ ভীতি-প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নাযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে আপন লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কুরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গাম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বুঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্য আমি জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত نَذِيْرٌ [সতর্ককারীর] অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য, পয়গাম্বর ও আলেমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোনো বিরোধ নেই।

সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্তার ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ককারী ভূমিকা পালন করে।

অনুবাদ :

٣٨. إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ فَعِلْمُهُ بِغَيْرِهِ أَوْلٰى بِالنَّظَرِ إِلٰى حَالِ النَّاسِ .

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞাত। অতএব অন্তরের বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের জ্ঞানতো থাকবেই। অবশ্যই হওয়ার হুকুম মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

٣٩. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط جَمْعُ خَلِيْفَةٍ أَىْ يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ط أَىْ وَبَالُ كُفْرِهِ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ج غَضَبًا وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا لِلْاٰخِرَةِ .

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। خَلٰٓئِفَ শব্দটি خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজন আরেকজনের স্থলাভিষিক্ত হওয়া অতএব তোমাদের থেকে যে কুফরি করবে তার কুফরি তার কুফরের পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের জন্য তাদের কুফর তাদের পালনকর্তার নিকট বৃদ্ধি করে না ক্রোধ ব্যতীত অন্য কিছু এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে আখেরাতে।

٤٠. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط أَىْ غَيْرِهِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى أَرُوْنِىْ أَخْبِرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ شَرِكَةٌ مَعَ اللّٰهِ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ج أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ حُجَّةٍ مِّنْهُ بِأَنَّ لَهُمْ مَعِىْ شَرِكَةً لَا شَىْءَ مِنْ ذٰلِكَ بَلْ إِنْ مَا يَعِدُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا بِقَوْلِهِمُ الْاَصْنَامُ تَشْفَعُ لَهُمْ .

৪০. বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরিকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত তোমরা ডাক পূজা কর এবং ঐ সমস্ত মূর্তিসমূহ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরিক বলে মনে কর তোমরা আমাকে দেখাও খবর দাও যা তারা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে। না আসমান সৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলিলের উপর কায়েম রয়েছে আমার সাথে তাদের অংশ রয়েছে এতে তাদের কোনো দলিল নেই বরং জালেমরা কাফেরগণ একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। তাদের ওয়াদা যে, মূর্তিসমূহ তাদের সুপারিশ করবে

٤١. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ج اَيْ يَمْنَعُهُمَا مِنَ الزَّوَالِ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ زَالَتَا اِنْ مَا اَمْسَكَهُمَا يُمْسِكُهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اَيْ سِوَاهُ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا فِيْ تَاْخِيْرِ عِقَابِ الْكُفَّارِ .

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন যাতে টলে না যায় অর্থাৎ উভয়কে টলে যাওয়া থেকে বিরত রাখে যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? لَئِنْ -এর মধ্যে ل শপথ এর অর্থ প্রদান করে তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল কাফেরদের শাস্তি বিলম্ব করতে।

٤٢. وَاَقْسَمُوْا اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَيْ غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا لَئِنْ جَاۤءَهُمْ نَذِيْرٌ رَسُوْلٌ لَيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج اَلْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَغَيْرِهِمَا اَيْ اَيَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا لَمَّا رَاَوْا مِنْ تَكْذِيْبِ بَعْضِهَا بَعْضًا اِذْ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ نَذِيْرٌ مُحَمَّدٌ ﷺ مَا زَادَهُمْ مَجِيْئُهٗ اِلَّا نُفُوْرًا تَبَاعُدًا عَنِ الْهُدٰى .

৪২. তারা মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর নামে জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী রাসূল আগমন করলে তারা অন্য যে কোনো সম্প্রদায় ইয়াহুদি, নাসারা ও অন্যান্য অর্থাৎ যে কোনো সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের পথিক হতো। অর্থাৎ তাদের এই উক্তি যখন তারা দেখে ইহুদি ও নাসারা একে অপরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে। ইহুদিরা বলে নাসারা সত্যের উপর নেই আর নাসারাগণ বলে ইহুদিরা সত্যের উপর নেই অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী মুহাম্মদ ﷺ আগমন করলেন, তখন তার আগমন তাদের ঘৃণাই হেদায়েত থেকে পলায়ন কেবল বাড়িয়ে দিল।

٤٣. اِسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ عَنِ الْاِيْمَانِ مَفْعُوْلٌ لَهٗ وَمَكْرَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهٖ وَلَا يَحِيْقُ يُحِيْطُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ط وَهُوَ الْمَاكِرُ وَوَصْفُ الْمَكْرِ بِالسَّيِّئِ اَصْلٌ وَاِضَافَتُهٗ اِلَيْهِ قَبْلُ اِسْتِعْمَالٌ اٰخَرُ قُدِّرَ فِيْهِ مُضَافٌ حَذَرًا مِنَ الْاِضَافَةِ اِلَى الصِّفَةِ .

৪৩. পৃথিবীতে ঈমান থেকে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের শিরক ইত্যাদি বদ আমলের কারণে। اِسْتِكْبَارًا শব্দটি نُفُوْرًا থেকে مَفْعُوْلٌ لَهٗ। পরিণাম কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। মূল ব্যবহার অনুযায়ী اَلسَّيِّئُ টি مَكْرٌ -এর সিফত। আয়াতের মধ্যে اَلسَّيِّئُ এর দিকে مَكْرٌ -এর اِضَافَتْ বিকল্প ব্যহার। এবং এতে اِضَافَتُ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ থেকে বিরত থাকার জন্যে একটি مُضَافٌ اِلَيْهِ অতিরিক্ত করা হয়েছে। যেমন, مَكْرَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ج سُنَّةَ اللّٰهِ فِيْهِمْ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا اَىْ لَا يُبْدَلُ بِالْعَذَابِ غَيْرُهُ وَلَا يُحَوَّلُ اِلٰى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ.

তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই তারা নবীদেরকে অস্বীকার করার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি নীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। অর্থাৎ আজাবকে অন্য কিছু তথা শাস্তি দিয়ে ও আজাবের উপযুক্তকে আজাবের অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিবর্তন করে না।

٤٤. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً فَاَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ يَسْبِقُهُ وَيَفُوْتُهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بِالْاَشْيَاءِ كُلِّهَا قَدِيْرًا عَلَيْهَا.

৪৪. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? যাতে তারা দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল তবুও আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন তাদের নবীদের অস্বীকার করার কারণে আকাশ ও জমিনে কোনো কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। অতএব কেউ তার কাছ থেকে বাঁচতে ও অগ্রসর হতে পারবে না নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

٤٥. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مِنَ الْمَعَاصِىْ مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَىِ الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ نَسَمَةٍ تَدُبُّ عَلَيْهَا وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى ج اَىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا فَيُجَازِيْهِمْ عَلٰى اَعْمَالِهِمْ بِاِثَابَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعِقَابِ الْكَافِرِيْنَ.

৪৫. যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের পাপের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্টে চলমান কোনো প্রাণী ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহর সব বান্দা তার দৃষ্টিতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের কর্মপ্রতিদান মুমিনদেরকে পুণ্যের মাধ্যমে আর কাফেরদেরকে শাস্তির মাধ্যমে দিবেন

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : এটা عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর ইল্লত, অর্থাৎ যেই সত্তা অন্তরের ভেদ সম্পর্কে অবগত তিনি তো তা ব্যতীত সম্পর্কেও অবগত اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এটা হলো দাবি। আর اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ হলো দাবির দলিল, فَعِلْمُهُ بِغَيْرِهٖ اَوْلٰى এটা নতীজা।

قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ اِلٰى حَالِ النَّاسِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো আল্লাহর ইলমে اَوْلَوِيَّتْ এবং اَدْنَوِيَّتْ -এর হিসেবে কোনো পার্থক্য হয় না; বরং তার সামনে সকল জিনিসই সমানভাবে প্রস্ফুটিত। আল্লাহর عِلْمٌ حُضُوْرِىْ তে এ কথার দ্বারা কোনো পার্থক্য পড়েনা; যাতে করে কিছু জিনিস মানুষের জন্য অস্পষ্ট হয় এবং কিছু জিনিস প্রকাশ্য হয়।

উত্তর. আল্লাহর দিকে اَوْلَوِيَّتْ -এর নিসবত মানুষের অভ্যাসের হিসেবে যে, মানুষ যখন গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় তখন প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে তো আরো ভালোভাবেই অবগত হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ الخ : এটা কুফরের শাস্তি ও তার পরিণামের বর্ণনা।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتُمْ : এতে اِعْرَابْ -এর হিসেবে দুটি সুরত হতে পারে

১. হামযাটা হলো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ আর قَوْلُهُ اَرُوْنِىْ টা اَمْرِ تَعْجِيْزْ-এর জন্য جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ -এই সুরতে এটা تَنَازُعْ فِعْلَانِ থেকে হবেনা, আর اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ এটা اَرَاَيْتُمْ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। অর্থাৎ اَخْبِرُوْنِىْ টা اَرُوْنِىْ اَىَّ شَيْءٍ خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ حَتّٰى يَسْتَحِقُّوا الْاِلٰهِيَّةَ وَالشَّرِكَةَ عَنْ شُرَكَائِكُمْ কেউ কেউ বলেন اَرَاَيْتُمْ থেকে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে। তবে আবূ হাইয়ান بَدَلْ কে নাজায়েজ বলেছেন। তার বক্তব্য হলো এই যে, যখন مُبْدَلْ مِنْهُ -এর উপর هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ আসে তখন بَدَلْ -এর উপরও هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ হওয়া জরুরি। আর এখানে এরূপ হয়নি। তাছাড়া اِبْدَالُ جُمْلَةٍ عَنِ الْجُمْلَةِ তার ভাষায় مَعْهُوْدْ নয়। তাছাড়া بَدَلْ টা تَكْرَارُ عَامِلٍ -এর নিয়তে নিয়ে থাকে। আর এখানে مُبْدَلْ مِنْهُ অর্থাৎ اَرَاَيْتُمْ -এর মধ্যে কোনো আমেলই নেই। [رُوْحُ الْمَعَانِىْ]

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো এই যে, এই বাক্যটি تَنَازُعْ فِعْلَانِ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সুরতে اَرَاَيْتُمْ বাবে اِفْعَالْ থেকে হবে আর اَخْبِرُوْنِىْ-এর অর্থে হয়ে مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْلْ হবে, প্রথম মাফঊল হলো نِىْ আর তার দ্বিতীয় মাফঊলের প্রয়োজন। দ্বিতীয় ফে'ল হলো اَرُوْنِىْ এটাও مُتَعَدِّىْ بِدُوْمَفْعُوْلْ হয়েছে। একটা মাফঊল হলো তার সাথে মিলিত نِىْ আর দ্বিতীয়টির প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় মাফঊল যাতে تَنَازُعْ হয়েছে, আর তা হলো مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ যার মধ্যে اَرَاَيْتُمْ এবং اَرُوْنِىْ টা تَنَازُعْ করতেছে। বসরীদের পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয় ফে'ল اَرُوْنِىْ কে আমল করতে দিয়েছে।

قَوْلُهُ شُرَكَائُهُمْ : এই ইযাফত اَدْنٰى مُنَاسَبَتْ -এর কারণে হয়েছে। কেননা মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছিল। অথবা اِضَافَتْ এ কারণে যে, মুশরিকরা মূর্তিদেরকে বাস্তবিক পক্ষে স্বীয় সম্পদে শরিক করে নিয়েছিল। এবং নিয়মিত স্বীয় সম্পদে মূর্তিদের অংশ রাখত এবং তাদের নামে কুরবানি করত।

قَوْلُهُ اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ : هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিকরা। কেউ কেউ বলেন যে, شُرَكَاءْ উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমি কি মুশরিকদের বা شُرَكَاءْ কে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যে, যাতে এটা লিখা আছে যে, আমার ক্ষমতায় আমার সাথে কোনো শরিক রয়েছে?

قَوْلُهُ لَا شَيْءَ مِنْ ذٰلِكَ : দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ আর এই বাক্যটি উল্লিখিত তিনটি اِسْتِفْهَامْ -এর জবাবও।

قَوْلُهُ شِرْكَةٌ : شِرْكٌ -এর তাফসীর شِرْكَةٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, شِرْكٌ মাসদারটা شِرْكَةٌ ইসিমের অর্থে হয়েছে (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ : এটা ظَالِمُوْنَ থেকে بَدَلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنَ الزَّوَالِ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَنْ تَزُوْلَا হরফে জার مِنْ -এর اِسْتِفْهَامْ -এর সাথে হয়ে يُمْسِكُ -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর يُمْسِكُ টা يَمْنَعُ -এর অর্থে হয়েছে। এবং যুজাজ (র.) বলেছেন যে, مَفْعُوْلُ لَهٗ হয়েছে অর্থাৎ مُفَارَقَةِ أَنْ تَزُوْلَا بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ

قَوْلُهُ وَلَئِنْ زَالَتَا : এতে قَسَمْ এবং شَرْطْ উভয়টি একত্রিত হয়েছে إِنْ أَمْسَكَهُمَا হলো جَوَابُ قَسَمْ আর প্রসিদ্ধ নীতিমালার দৃষ্টি কোণ থেকে شَرْطْ উহ্য রয়েছে। যার উপর جَوَابُ قَسَمْ টা বুঝাচ্ছে।

وَاحْذِفْ لَدٰى اِجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ * جَوَابَ مَا اَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمْ.

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : مِنْ টা فَاعِلْ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে। আর اَحَدٍ হলো শব্দিকভাবে مَجْرُوْرٌ আর مَحَلْ হিসেবে مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ سِوَاهُ : এটা مِنْ بَعْدِهٖ -এর তাফসীর অর্থাৎ بَعْدُ হলো غَيْرُ অর্থে আর مِنْ بَعْدِهٖ -এর মধ্যে مِنْ হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا : এটা يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -এর ইল্লত হয়েছে। অর্থাৎ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ হওয়ার কারণে জমিন ও আকাশ কে পতিত হওয়া থেকে বারণ করে রেখেছেন অর্থাৎ কুফর ও শিরক বাস্তবিক পক্ষে এমন অপরাধ যে, তার শাস্তিতো তাৎক্ষণিক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তিনি তার সিফত রহমত ও মাগফেরাতের কারণে শাস্তিতে বিলম্ব করতেছেন।

قَوْلُهُ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ : মুফাসসির (র.) جَهْدَ -এর তাফসীর غَايَةَ اَيْمَانِهِمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, جَهْدَ টা اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ -এর কারণে مَصْدَرِيَّةٌ -এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আবার حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হওয়াও বৈধ। অর্থাৎ جَاهِدِيْنَ جُهْدٌ [جِيْمْ -এর যবরসহ] অর্থ পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। جُهْدٌ(جِيْمْ এর পেশ সহ) অর্থ শক্তি। মক্কার মুশরিকদের এই অভ্যাস ছিল যে, সাধারণভাবে স্বীয় বাপ-দাদা বা মূর্তির শপথ করত। কিন্তু যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করানো, ইয়াকীন দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তখন কসম কে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করত।

قَوْلُهُ لَيَكُوْنَنَّ : এটা حِكَايَتْ حَالْ بِالْمَعْنٰى হয়েছে অন্যথায় স্থানের চাহিদা ছিল لَنَكُوْنَنَّ হওয়া।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ : لَمَّا হলো حَرْفُ شَرْطْ আর مَازَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا হলো جَوَابُ شَرْطْ এখানে لَمَّا কে ظَرْفِيَّهْ মানা বৈধ নয়। কেননা مَا نَافِيَهْ -এর مَا بَعْدَ টা مَا قَبْلَ -এর মধ্যে আমল করে না। আর অধিক ঘৃনার اِسْنَادْ টা نَذِيْرٌ -এর দিকে অথবা مَجِيْئَتْ -এর দিকে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা نَذِيْرٌ হলো نَفْرَتْ -এর কারণ। অন্যথায় نَذِيْرٌ -এর কাজ হলো نَفْرَتْ সৃষ্টি করা বা نَفْرَتْ -এর মধ্যে বৃদ্ধি করা হয় না।

قَوْلُهُ اِسْتِكْبَارًا : এটা نُفُوْرًا -এর مَفْعُوْلُ لَهٗ অর্থাৎ মুশরিকদের ঈমানের মোকাবিলায় অহঙ্কার ও বড়াই করার কারণে তাদের نَفْرَتْ -এর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর زَادَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ ও হতে পারে অর্থাৎ مَازَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا حَالْ كَوْنِهِمْ مُسْتَكْبِرِيْنَ

قَوْلُهُ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ : এর তাফসীর سُنَّةُ اللّٰهِ فِيْهِمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মাসদার مَفْعُوْلْ -এর দিকে মুযাফ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ -এর মধ্যে وَاوْ টি হলো عَاطِفَهْ আর هَمْزَهْ উহ্যের উপর এসেছে। উহ্য ইবারত হলো اَتَرَكُوْا السَّفَرَ وَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ -এই বাক্যটি সেই কথার সাক্ষী যে, আল্লাহর নিয়মাবলিতে কোনো পরিবর্তন নেই, আল্লাহ তা'আলা পূর্বের মুশরিক ও মুনকিরদের সাথে যে মোয়ামালা করেছেন তা তাদের সাথেও হবে। هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ হয়েছে। যার কারণে نَفِى النَّفِىْ টা اِثْبَاتْ -এর ফায়দা দিয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই লোকেরা সফর করে এবং সালেহ, লূত ও শুয়ায়েব সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

قَوْلُهُ بِمَا كَسَبُوْا : এতে بَاءٌ টি হলো سَبَبِيَّةٌ আর مَا হলো مَصْدَرِيَّةٌ বা مَوْصُوْلَةٌ অর্থাৎ بِسَبَبِ كَسْبِهِمْ এবং بِسَبَبِ الَّذِىْ كَسَبُوْهُ

قَوْلُهُ نَسَمَةً : ذِىْ رُوْحٍ مُتَنَفِّسٍ -কে বলে, বহুবচনে نَسَمٌ

قَوْلُهُ فَيُجَازِيْهِمْ : মুফাসসির (র.) এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ হলো শর্ত আর তার جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَيُجَازِيْهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং গুণাবলির বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক তাঁর পরিপূর্ণ ইলম সম্পর্কে অবগত। শুধু তাই নয়; বরং মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহপাক সম্পূর্ণ অবহিত। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই, মানুষের জীবনের সকল অবস্থা তার নিকট সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। পূর্ববর্তী আয়াতে দোজখীদের আর্তনাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তারা দোজখের শাস্তি-যন্ত্রণায় অধৈর্য হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এই ফরিয়াদ করবে যে, একটিবার অন্তত: তাদের দোজখ থেকে বের হয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হোক। তাহলে তারা পূর্বের ন্যায় আর মন্দ কাজ করবে না, বরং এবার সৎ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের এ অন্যায় আবদারের জবাব দিয়ে ইরশাদ করেছেন মানুষের অবস্থা, তাদের মনের সব গোপন কথা, তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আল্লাহ পাক ভালো করেই জানেন। কাফেররা যত শপথ করেই বলুক না কেন যে, আর অন্যায় করবে না, নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণেই তারা একথা বলে, একটু ছাড় পেলেই তারা তাদের পুরনো অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করবে, একথা আল্লাহ পাক খুব ভালোভাবেই জানেন। এজন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ 'যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে তারা পুনরায় সে মন্দ কাজই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল'।

আর যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট পৃথিবীর কোনো কিছুই গোপন নেই, তাই তাঁর জ্ঞান মোতাবেকই তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং তাদেরকে দোজখ থেকে বের হতে দেওয়া হবেনা

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ.২২,পৃ.২০১-২০২]

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে কাফেররা যতদিন পৃথিবীতে ছিল ততদিন কুফরি ও নাফরমানি করেছে, তাদের শাস্তি হলে তাদের জীবনের দিনগুলোর হিসাব মোতাবেকই হবে, এর বেশি নয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্বাপর সব কিছু জানেন, তাই তিনি একথাও জানেন, যদি তাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হতো, তবে তারা চিরদিনই কাফের থাকত, এজন্যে তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক খুব ভালো ভাবেই জানেন যে কাফেরদেরকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করানো হলে তারা পুনরায় কুফরি, নাফরমানি ও যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত হবে, তাই তাদের শাস্তি সর্বদা অব্যাহত থাকবে। –[তাফসীরে কবীর খ. ২৬,পৃ.-৩০]

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ .... مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ع আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম ইবনে আবি হেলালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কুরাইশরা বলতো যে, যদি আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে কোনো নবী প্রেরণ করেন, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে তাঁর অধিকতর অনুসরণ করবো। ইতিপূর্বে যত উম্মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি আমরা এই নবীর অনুগত থাকবো। তাই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

প্রিয়নবী ﷺ -এর পূর্বে মক্কার কুরায়শরা জানতে পেরেছিল যে, ইহুদি নাসারারা তাদের নিকট প্রেরিত নবী রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। এজন্যে তারা বলেছিল, ইহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নবী রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এরপর মক্কার কুরায়শরা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিল, যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোনো নবী রাসূল আগমন করেন, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে তাঁর অধিকতর অনুসরণ করবো। ইতিপূর্বে যত উম্মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি আমরা এই নবীর অনুগত থাকবো। তাই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

প্রিয়নবী ﷺ -এর পূর্বে মক্কার কুরায়শরা জানতে পেরেছিল যে, ইহুদি নাসারারা তাদের নেকট প্রেরিত নবী রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। এজন্যে তারা বলেছিল, ইহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, তাদের নিকট আল্লাহর পাকের তরফ থেকে নবী রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এপর মক্কার কুরায়েশরা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিল যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোনো নবী রাসূল আগমন করেন, তবে আমরা পূর্ববর্তী যে কোনো উম্মতের চেয়ে সে নবীর অধিকতর অনুসারী হবো।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ : خَلَائِفُ শব্দটি خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগক হেলায় নষ্ট করো না।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ : আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। اَنْ تَزُوْلَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল এ বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ : لَا يَحِيْقُ অর্থ لَا يُحِيْطُ কিংবা لَا يُصِيْبُ অর্থাৎ কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না– কুচক্রীর উপর পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আজাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করাও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন, তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তি কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক. কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, দুই. জুলুম করা এবং তিন. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেওয়া যায়নি।

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইয়াসীন

নামকরণের কারণ : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরাসমূহের নাম রাখা হয় সাধারণত সে সূরায় উল্লিখিত কোনো বিশেষ শব্দ বা ঘটনা দ্বারা অথবা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সূরা ইয়াসীন -এর বেলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সূরাটির শুরুতে يٰسٓ শব্দ উল্লেখ থাকায় তার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতু ইয়াসীন। তা ছাড়া আরবি প্রবাদ- تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ তথা 'কোনো বস্তুর অংশবিশেষের দ্বারা পূর্ণ বস্তুটি নামকরণ করা' হিসেবে অত্র সূরাকে সূরা ইয়াসীন বলে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে।

এ সূরার অন্যান্য নাম : আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত নামটি ছাড়াও সূরাটির কতিপয় নাম প্রদান করেছেন। যেমন- ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটির নাম قَلْبُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন। ইমাম বায়হাকী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাতে এরূপ সূরাকে اَلْمُعِمَّةُ তথা উভয়জগতের কল্যাণের সমষ্টি নামে অভিহিত করা হতো। আরো এরূপ সূরাকে اَلْمُدَافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ তথা প্রত্যেকের দুঃখ নিবারণকারী এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকারী নামে অভিহিত করা হতো।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা ইয়াসীনের মধ্যে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে- ১. রিসালাতের প্রমাণ, ২. হাশরের প্রমাণ ও ৩. তাওহীদের প্রমাণ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা (সূরায়ে ফাতির) -এর সমাপ্তিতে কাফেরগণ কর্তৃক মহানবী ﷺ -এর রিসালাতের অস্বীকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর সূরা ইয়াসীনের প্রারম্ভে নবী করীম ﷺ -এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কাফেরদের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে, কাজেই উপরিউক্ত সূরা ও এ সূরার পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মহানবী ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ এ সূরার আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গির উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ সূরার وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ আয়াত খানা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মদীনার বনী সালামা গোত্র মসজিদে নববীর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا আয়াত খানাকে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা ইয়াসীনে ছোট বড় মোট ৮৩টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এর প্রতিটি আয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত পর্যালোচনায় ভরপুর।

সূরার আলোচ্য বিষয় : এ সূরায় মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। আর যারা নবীর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করত সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সূরায় তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে-

১. **তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে :** প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে।

২. **পরকাল সম্পর্কে :** প্রাকৃতিক নিদর্শন, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের সাহায্যে।

৩. **মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে :** এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অসহনীয় কষ্ট, দুর্ভোগ, নির্যাতন সহ্য করে এ মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও বিবেক সম্মত দাওয়াত অনবরত দিয়ে যাচ্ছেন। আর এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সূরার সার-সংক্ষেপ : সূরা ইয়াসীনের শুরুতেই ওহী এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতা পবিত্র কুরআনের সাথে শপথ করার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী চরম গোমরাহে লিপ্ত কুরাইশী কাফেরদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যাদের জন্য কঠিন আজাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

- এ সূরাতে রাসূলগণকে অস্বীকারকারী ইনতাকিয়াবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে মক্কার পৌত্তলিকরা নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মহানবী ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থাকে।

- এ সূরাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগকারী একনিষ্ঠ দীন প্রচারক হাবীবে নাজ্জারের কথা, যিনি স্বীয় কওমকে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন এবং পরকালের অফুরন্ত শান্তি লাভ করেন। আর তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর অবধারিত আজাব ও ধ্বংসলীলা নেমে আসে।

- এ সূরাতে প্রাকৃতিক নিদর্শন যথা- নির্জীব ভূমিতে জীবনের সঞ্চার করত সুজলা-সুফলা করে তোলা, রাত দিনের গমনাগমন, চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত ও চলাচল ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

- এ সূরাতে আরো আলোচনা করা হয়েছে কিয়ামত ও সে দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থা সম্পর্কে; যেমন- পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের আলোচনা, কিয়ামত দিবসে মু'মিন ও অপরাধীদের মধ্যকার বিচ্ছেদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে আর অপরাধী কাফের মুশরিকরা জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।

- অবশেষে উপসংহারের ন্যায় মৌলিক আলোচ্য বিষয় যথা- পুনরুত্থান, প্রতিদান ইত্যাদির উপর অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত : এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো-

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ . (تِرْمِذِيْ حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ صـ ٣٦٨)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক জিনিসের অন্তঃকরণ রয়েছে, আর কুরআনের অন্তঃকরণ হলো সূরা ইয়াসীন। আর যে ব্যক্তি এ সূরা একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে দশ খতম কুরআন তেলাওয়াত করার ছওয়াব দান করবেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْقُرْاٰنِ سُوْرَةً تَشْفَعُ لِقَارِئِهَا وَتَسْتَغْفِرُ لِمُسْتَمِعِهَا اَلَا وَهِيَ سُوْرَةُ يٰسٓ . تُدْعٰى فِي التَّوْرَاةِ الْمُعِمَّةَ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُعِمَّةُ . قَالَ تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَتَدْفَعُ عَنْهُ اَهْوَالَ الْاٰخِرَةِ؟ وَتُدْعٰى اَيْضًا اَلدَّافِعَةَ وَالْقَاضِيَةَ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ قَالَ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوْءٍ وَتَقْضِيْ لَهٗ كُلَّ حَاجَةٍ -

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তার শ্রবণকারীর জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। আর তা হচ্ছে সূরায়ে ইয়াসীন। তাওরাতে একে اَلْمُعِمَّةُ [আল-মুইম্মাহ] বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! মুইম্মাহ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকারীকে একাধারে দুনিয়ার কল্যাণ দান করবে এবং পরকালের বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে। আর একে اَلدَّافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ ও বলে। আরজ করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আবার কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকের উপর হতে সর্বপ্রকার বিপদাপদকে প্রতিহত করে এবং তার সকল ধরনের প্রয়োজন পূর্ণ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অন্যত্র এসেছে যে, যে ব্যক্তি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যূষে নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করো। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ সূরার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, কোনো জটিল কাজে ৪১ বার এ সূরা পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেবেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি অভাব-অনটনের বেলায় কোনো ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে তার অভাব দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে ও স্বস্তিতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ সূরা পাঠ করবে সে ভোর পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমি এটি এমন ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছি যিনি এ ব্যাপারে পরীক্ষিত।

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক বস্তুরই কলব বা হৃদপিণ্ড রয়েছে, আর কুরআনে কারীমের হৃদপিণ্ড হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তার আমলনামায় দশ খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব লেখা হবে। আর যদি কোনো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা আগমনের সময় এ সূরা তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে তার প্রতিটি হরফের বিনিময় দশজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁরা তার নিকট সারিবদ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন, তার গোসলে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর জানাযা ও দাফনেও উপস্থিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি সাকারাতুল মউতের সময় সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে জান্নাতের শুভ সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি : মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এ সূরাটি মাক্কী জীবনের ক্রান্তি লগ্নে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিহাসের আলোকে জানা যায় যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের ফিকিরে মানসিকভাবে ভীষণ কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। কারণ সুদীর্ঘ দশ দশটি বছর মক্কার অলিতে-গলিতে দাওয়াতি কাজ করে হাতে গোনা গুটি কয়েকজন লোক ব্যতীত তেমন কেউই দীনি দীক্ষা গ্রহণ করেনি। সাধারণ জনগণ পূর্বেও যেমন কুফর ও শিরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এখনো অনুরূপই রয়ে গেছে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ও খাজা আবূ তালিব পরপারে পাড়ি জমান। এরপর মক্কাবাসীদের দীন গ্রহণের প্রতি নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনি দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তায়েফের পৌত্তলিকরা প্রিয় নবীর দাওয়াত তো গ্রহণই করেনি উপরন্তু তারা প্রস্তরাঘাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র বদনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মানসিক অবস্থা কতটুকু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যুগের এক ক্রান্তি লগ্নে সূরা ইয়াসীন অবতীর্ণ হয়। এতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় নবী করীম ﷺ -এর রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। কাফিরদের দাওয়াত বিমুখতায় উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য পেয়ারা নবী ﷺ -কে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখেরাতকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দীন-প্রচারকদের ঘটনা উল্লেখ করত এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰسٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. ইয়াসীন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

٢. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ الْمُحْكَمِ بِعَجِيْبِ النَّظْمِ وَبَدِيْعِ الْمَعَانِيْ ـ

২. প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ। যা আশ্চর্য শব্দ ভাণ্ডার [ভাষা] ও অপূর্ব ভাবের সমন্বয়ে সুদৃঢ়।

٣. اِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

৩. নিশ্চয় আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

٤. عَلٰى مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهٗ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَىْ طَرِيْقِ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ التَّوْحِيْدُ وَالْهُدٰى وَالتَّاكِيْدُ بِالْقَسَمِ وَغَيْرِهٖ رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهٗ لَسْتَ مُرْسَلًا ـ

৪. আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এটা তার পূর্ববর্তী বক্তব্যের (اِنَّكَ) সাথে সংশ্লিষ্ট সঠিক সরল পথে। অর্থাৎ আপনার পূর্ববর্তী নবীদের পথ তথা হেদায়েত ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। শপথ ইত্যাদি দ্বারা তাকিদ নেওয়ার কারণ হচ্ছে কাফিরদের উক্তি لَسْتَ مُرْسَلًا [তুমি প্রেরিত নও]-কে খণ্ডন করা।

٥. تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ الرَّحِيْمِ بِخَلْقِهٖ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ اَىِ الْقُرْاٰنُ ـ

৫. সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সত্তার পক্ষ হতে অবতারিত স্বীয় রাজত্বে যিনি দয়াময় তার সৃষ্টির প্রতি। এটা اَلْقُرْاٰنُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

٦. لِتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا مُتَعَلِّقٌ بِتَنْزِيْلَ مَا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ اَىْ لَمْ يُنْذَرُوْا فِىْ زَمَنِ الْفَتْرَةِ فَهُمْ اَىِ الْقَوْمُ غَافِلُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ وَالرُّشْدِ ـ

৬. যাতে আপনি এর দ্বারা এমন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাতে পারেন এটা পূর্বোক্ত تَنْزِيْلَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ যাদের পূর্বপুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। অর্থাৎ فَتْرَة তথা দুই নবীর গমনাগমনের মধ্যবর্তী সময়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। ফলে তারা কুরাইশ সম্প্রদায় গাফেল অজ্ঞ রয়েছে ঈমান ও সঠিক পথ হতে।

٧. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ وَجَبَ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ اَىِ الْاَكْثَرُ ـ

৭. অবশ্যই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশের উপর ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

তাহকীক ও তারকীব

ইয়াসীন শব্দের বিভিন্ন কেরাত :

- মদীনাবাসী ও ইমাম কেসায়ীর মতে, يٰسٓ -এর ن অক্ষরটি পরবর্তী وَاوْ-এর সাথে اِدْغَام করে পড়তে হবে।
- কারী আবূ আমর আ'মাশ ও হামযাহ -এর মতে يٰسٓ -এর ن অক্ষরটিকে اِظْهَار করে পড়তে হবে।
- ঈসা ইবনে ওমরের মতে, يٰسٓ -এর ن অক্ষটিকে যবর দিয়ে পড়তে হবে।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে আবূ ইসহাক ও নসর ইবনে আসিমের মতে يٰسٓ -এর ن অক্ষরটিকে যের যোগে পড়তে হবে।

يٰسٓ শব্দটি তারকীবগত অবস্থান : يٰسٓ শব্দটির তারকীবগত অবস্থান কয়েকটি হতে পারে–

১. يٰسٓ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে। যথা– هٰذِهٖ يٰسٓ

২. يٰسٓ শব্দটির يَا অক্ষরটি হরফে নেদা আর س মুনাদায়ে মুফরাদ হিসেবে রফার উপর মাবনী হয়েছে। বাহ্যত তার উপর রফা হলেও বস্তুতপক্ষে এটি اُدْعُوْ ফে'লের মাফউল হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে।

৩. يٰسٓ শব্দটি اُتْلُ ফে'লের মাফউল হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে।

ই'রাবের ক্ষেত্রে اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -এর অবস্থান : وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এখানে وَاوْ টি কসমিয়া আর اَلْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ মাওসূফ সিফাত মিলে مُقْسَمٌ بِهٖ আর اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ টা জবাবে কসম বা مُقْسَمٌ عَلَيْهِ।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর ই'রাব : এ আয়াতে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে–

১. عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্য اَلْمُرْسَلِيْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর এ অবস্থায় বাক্যটি হবে اِنَّكَ لَمِنَ الَّذِيْنَ اُرْسِلُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ [নিশ্চয় আপনি সে দলের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে পাঠানো হয়েছে] এমতাবস্থায় عَلٰى অক্ষরটি اِلٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অথবা, এ বাক্যটি اَلْمُرْسَلِيْنَ-এর যমীর থেকে হাল হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তখন বাক্যটি এরূপ হবে যে, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ حَالَ كَوْنِكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ [নিশ্চয় আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত এমতাবস্থায় যে, আপনি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।]

৩. অথবা, এটি اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর, যার প্রথম খবর হলো لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ তখন পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে যে, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ [নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত এবং নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত] এমতাবস্থায় এটা مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে।

তারকীবে تَنْزِيْلَ শব্দের অবস্থান : تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ -এর মধ্যে তিন ধরনের তারকীব হতে পারে–

১. এটা উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَرْفُوْعٌ হবে, তখন পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে اَلْقُرْاٰنُ تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ অথবা এটা يٰسٓ মুবতাদার খবর হবে। যদি يٰسٓ -কে সূরার নাম ধরা হয়।

২. অথবা, এটা উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক হয়ে মানসূব হবে। তখন বাক্যটি হবে– نَزَّلَ الْقُرْاٰنُ تَنْزِيْلًا

৩. অথবা, এটা اَلْقُرْاٰنُ হতে বদল হয়ে মাজরূর হবে।

تَنْزِيْل শব্দটির কিরাত : উল্লেখ্য যে, تَنْزِيْل শব্দটি ৩টি কেরাতে পড়া যায়-

১. হযরত হামযাহ্, কেসাই, ইবনে আমির ও হাফস (র.)-এর মতে, এটা নসবের সাথে تَنْزِيْلَ পড়া হবে।

২. হযরত নাফে', ইবনে কাছীর, আবূ আমর ও আবূ বকর (র.)-এর মতে, এটা রফা'-এর সাথে تَنْزِيْلُ পড়া হবে।

৩. হযরত শায়বা, আবূ জা'ফর ইয়াযীদ ইবনে কা'কা' ও আবূ হাইওয়া তিরমিযী (র.)-এর মতে এটা যেরের সাথে تَنْزِيْلِ পড়া হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহর বাণী لِتُنْذِرَ قَوْمًا -এর মধ্যে لَامْ টি কিসের সাথে مُتَعَلِّقْ হবে? : لِتُنْذِرَ قَوْمًا বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত تَنْزِيْلَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে এবং এ বাক্যটি تَنْزِيْلَ -এর মাফঊলে লাহু হয়েছে।

আল্লাহর বাণী فَهُمْ غٰفِلُوْنَ -এর মধ্যে فَاءْ নেওয়ার কারণ : পূর্ববর্তী مَآ أُنْذِرَ -এর مَا টি نَافِيَةْ হলে তা فَهُمْ سَبَبْ একটি উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হবে। তখন বাক্যটি হবে لَمْ يُنْذَرُوْا فَهُمْ غٰفِلُوْنَ এমতাবস্থায় فَاءْ বর্ণটি غٰفِلُوْنَ سَبَبْ -এর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

অথবা, এটা لِتُنْذِرَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। তখন বাক্যটি হবে لِتُنْذِرَ ..... فَهُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে এ জন্য ভয় দেখাবেন যে, তারা গাফেল। এমতাবস্থায় فَاءْ বর্ণটি تَعْلِيْلِيَّةْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা মহানবী ﷺ উচ্চৈঃস্বরে সূরা সাজদাহ্ তেলাওয়াত করছিলেন, এতে কতিপয় দুষ্কৃতি কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ উত্তেজিত হয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আল্লাহর কুদরতে তখনই তাদের হাতগুলো অকেজো ও অবশ হয়ে পড়ে, আর চোখগুলো যায় অন্ধ হয়ে। এতে নিরুপায় হয়ে কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ দরবারে নববীতে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করে। দয়ার সাগর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য দোয়া করলে তারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়াসীনের প্রথম চারটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, পরবর্তীকালে এ দুষ্কৃতকারীদের প্রত্যেকেই বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

يٰسٓ শব্দের বিশ্লেষণ : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে يٰسٓ এবং এ জাতীয় আরো অনেক শব্দ রয়েছে যথা- الٓرٰ . الٓمٓ . حٰمٓ . قٓ ইত্যাদি এগুলোকে حُرُوْفِ مُقَطَّعَاتْ বলা হয়। এ জাতীয় সকল حُرُوْف গুলো مُتَشَابِهَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে حُرُوْفِ مُقَطَّعَاتْ -এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ ও حُرُوْفِ مُقَطَّعَاتْ -এর মর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন, অন্যথা خِطَابْ (সম্বোধন) অনর্থক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা (لَغْو) অনর্থক হতে পবিত্র। অবশ্য কতিপয় তাফসীরকারক حُرُوْفِ مُقَطَّعَاتْ -এর মর্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াস নিয়েছেন, ফলে তাদের একেকজন একেক ধরনের মর্ম প্রকাশ করেছেন।

- ইবনে আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে ইমাম মালিক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এটা আল্লাহর একটি নাম।
- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাঈ গোত্রের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে يَا إِنْسَانُ হে মানুষ! আর এখানে মানুষ বলতে মহানবী ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে।
- হযরত ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর মতে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি নাম।
- মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মতে এর অর্থ- হে মুহাম্মদ ﷺ। পবিত্র কুরআনে মহানবী ﷺ -এর ৭টি নাম এসেছে।

যথা- ১. مُحَمَّدٌ ২. أَحْمَدُ ৩. طٰهٰ ৪. يٰسٓ ৫. مُزَّمِّلٌ ৬. مُدَّثِّرٌ ৭. عَبْدُ اللّٰهِ

- কারো কারো মতে, এটা কুরআনের একটি নাম।
- আবূ বকর আল-আবরাক বলেছেন, এর অর্থ يَا سَيِّدَ النَّاسِ অর্থ– হে মানুষের নেতা।
- কারো কারো মতে, এর অর্থ يَا رَجُلُ অর্থ– হে ব্যক্তি।
- ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এর অর্থ يَا مُحَمَّدُ অর্থ– হে মুহাম্মাদ ﷺ।
- কারো মতে, এটা সূরাটির ভূমিকা। –কুরতবী, ফাত্হুল কাদীর, খাযিন, ইবনে কাছীর

يٰسٓ দ্বারা কারো নাম রাখা বৈধ কিনা? : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে যেহেতু এটা আল্লাহর নাম তাই এর দ্বারা কোনো মানুষের নাম রাখা যাবে না। কেননা, এর সঠিক অর্থ আমাদের জানা নেই। কাজেই এটা এমনও হতে পারে যে, এটা আল্লাহর এমন একটি নাম যা শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যথা– خَالِقٌ ، رَزَّاقٌ অবশ্য যদি অন্য পদ্ধতিতে يَاسِين লেখা হয়, তাহলে তার দ্বারা মানুষের নাম রাখা যেতে পারে।

ইয়াসীন শব্দটি আরবি না অনারবি? يٰسٓ শব্দটি আরবি না আজমি এ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মাঝে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

- তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে এটা আরবীয় বনূ কিলাব গোত্রের ভাষা।
- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.)-এর মতে, এটা আরবি নয়; বরং এটা হাবশী শব্দ। অর্থ হচ্ছে– মানুষ।
- ইমাম শা'বী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আরবীয় গোত্র বনূ তাঈ-এর ভাষা।
- ইমাম কালবী (র.)-এর মতে, এটা সুরিয়ানী শব্দ। পরবর্তীতে আরবিতে অধিক ব্যবহারের ফলে এটা আরবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
- হারূন আল-আ'ওয়ার ও ইবনে সামাইক প্রমুখগণের মতে, يٰسٓ -এর ن অক্ষরটিকে পেশ যোগে পড়তে হবে। আর তখন يٰسٓ টা উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَرْفُوعٌ হবে। –[বায়যাবী ও কুরতুবী]

মুফাসসিরদের উক্তি اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ -এর বিশ্লেষণ : يٰسٓ এটা আরবি বর্ণমালার সমষ্টি। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়। ১. مُحْكَمٌ ও ২. مُتَشَابِهٌ, আবার مُتَشَابِهٌ -কেও দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত এমন مُتَشَابِهٌ যার আভিধানিক অর্থ জ্ঞাত, কিন্তু পারিভাষিক বা ভাবার্থ অজ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত এমন مُتَشَابِهٌ যার আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থই অজ্ঞাত। আর يٰسٓ শব্দটি শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত। সূরার সূচনাতে ব্যবহৃত এ অর্থ অজ্ঞাত বর্ণসমষ্টিকে حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتٌ বলা হয়।

এজন্যেই তাফসীরে জালালাইন প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) يٰسٓ শব্দের তাফসীরে লেখেছেন- اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ; অর্থাৎ এই يٰسٓ শব্দ দ্বারা আল্লাহর কি উদ্দেশ্য, তা তিনিই ভালো জানেন। অবশ্য মুহাক্কিক তাফসীরকারগণ উল্লেখত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ -এর অর্থ জানতেন। অন্যথায় তাঁকে এসব শব্দ দ্বারা সম্বোধন অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে সাধারণ মু'মিনগণের এর অর্থ জানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তাদের জন্যে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য আয়াত হিসেবে এসেছে। তথাপি কোনো কোনো মুফাসসির অনুমানের উপর ভিত্তি করে এর নানারূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিক অর্থে এর মর্মার্থ সম্বন্ধে আল্লাহই ভালো জানেন।

হাকীম বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর গুণ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সিফাত হাকীম আনলেন কেন? উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, এখানে حَكِيْمٌ [যা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর গুণ]-কে রূপক অর্থে কুরআনের সিফাত নেওয়া হয়েছে।

কারণ কুরআনকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও জড়পদার্থ মনে হয় কিন্তু গভীর দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ পবিত্র কুরআনের মধ্যেও বিবেকবানদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি ভাণ্ডার যা মৃত অন্তরকে সজীব করে তোলে। হৃদয়ের চোখ খুলে দেয় আর অন্তহীন অজানা জগতকে মানুষের চোখের সামনে উন্মোচন করে দেয়, যা অন্য কোনো গ্রন্থের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আর এই নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই কুরআনকে হাকীম বিশেষণের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা غَيْرُ اللّٰهِ -এর নামে কসম করার যথার্থতা : মানুষের জন্যে ইসলামি শরিয়তের হুকুম হলো, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা হরাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে উক্ত আয়াতে ও অপরাপর আয়াতসমূহে সৃষ্ট বস্তুর নামে কসম করেছেন, তা গায়রুল্লাহর নামে কসম করা জায়েজের উপর দলিল নয় কি? এ মাসআলার জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– إِنَّ اللّٰهَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ إِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোনো বস্তুর নামে কসম করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারো জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর নামে শপথ করা জায়েজ নেই।' –[মাযহারী]

উপরিউক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা মুফতি শফী (র.) বলেন, "মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ মনে করে তবে তা ভ্রান্ত ও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কেননা শরিয়ত মানবমণ্ডলীর জন্যে। তাই শরিয়ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কাজকর্মকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল বলে গণ্য হবে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে ইমাম আয্‌যাহাবী (র.) বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– নবীর নামে কসম, কা'বার কসম, ফেরেশেতার কসম, আকাশের কসম, পানির কসম, জীবনের কসম, আমানতের কসম, প্রাণের কসম, মাথার কসম, অমুকের মাজারের কসম ইত্যাদি।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কসম যদি করতেই হয় তবে আল্লাহর নামেই কসম করবে, নচেৎ চুপ থাকবে।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা দেব-দেবীর নামে বা বাপ-দাদার নামে কসম করো না। আমার কথা সত্য না হলে আমি অমুকের সন্তান নই," এরূপ বলা বাপ-দাদার নামে কসমের পর্যায়ভুক্ত। আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এভাবে কসম করে যে, আমার কথা সত্য না হলে আমি মুসলমান নই, সে মিথ্যুক হলে যা বলেছে তাই হবে [অর্থাৎ সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে] আর সে সত্যবাদী হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদেই ইসলামের পথে বহাল থাকতে পারবে না।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, " কেউ অভ্যাসবশত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে ভুলক্রমে কসম করলে তৎক্ষণাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলবে।" –[কিতাবুল কাবায়ের]

অস্বীকারকারীদের জন্য শপথের ফায়দা : আল্লাহ তা'আলা শপথের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর রিসালাতকে সাব্যস্ত করেছেন। আর এটা রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদানকারীদের জন্য যথেষ্ট হওয়া স্পষ্ট। কিন্তু এ শপথ কাফেরদের জন্য কিসের ফায়দা দিবে। মুফাস্‌সিরীনে কেরামগণ এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে,

- কাফেররা যদিও কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলতে অস্বীকার করে, তবুও এটা যে একটি অলৌকিক গ্রন্থ তা স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে তাদের সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে কুরআনের অতি ছোট একটি সূরার ন্যায় সূরা রচনা করতে বলেছেন। তারা শতটা চেষ্টা সত্ত্বেও এর সমকক্ষ কোনো সূরা এমনকি একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এ কারণে এখানে কুরআনের শপথ করা হয়েছে।

✪ এ শপথের মাধ্যমে কাফের–মুশরিকদের যদিও কোনো উপকার সাধিত হয়নি তথাপি এর দ্বারা মু'মিনগণ তথা সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে। আর এ কারণেই বিরুদ্ধবাদীদের অব্যাহত অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার মুখেও সাহাবায়ে কেরাম সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেননি। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহানবী ﷺ -এর রিসালাতকে অস্বীকারকারী কাফের মুশরিকদের মধ্যে যারা বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে একে অনুধাবন করতে চেয়েছে তাদের জন্য এ অবশ্যই ফলপ্রসূ ছিল।

كَيْفِيَّةُ اِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ بِالْقَسَمِ : শপথের মাধ্যমে রিসালাত সাব্যস্তকরণ পদ্ধতি :

✪ কাফিরদের ধারণা ছিল যে, মিথ্যা শপথের ধ্বংস অনিবার্য। মহানবী ﷺ ও তাদের উক্ত বিশ্বাসের সাথে ঐকমত্য ছিলেন। এরপর রাসূল ﷺ বারবার বিভিন্নভাবে শপথ করে স্বীয় বক্তব্য তাদের সামনে তুলে ধরে বুঝাতে চেয়েছেন যে, যদি আমি [আল্লাহ না করুক] মিথ্যাবাদী হতাম তবে তো তোমাদের ধারণা মতে ধ্বংস হয়ে যেতাম! অথচ ধ্বংস হওয়া তো দূরের কথা এত শপথ করার পরও দিন দিন আমার মান-মর্যাদা প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমাদের চোখের সম্মুখে বেড়েই চলছে। কাজেই আমার নবুয়তের সত্যতা স্বীকারে তোমাদের এত কুণ্ঠা কেন?

✪ মহানবী ﷺ ইতোপূর্বে নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে বহু বহু দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু মুশরিকরা বিভিন্ন বাহানায় এটাকে উড়িয়ে দিয়ে কখনো যাদুকর কখনো গণক ইত্যাদি ভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলেছে। যেহেতু তারা যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল তাই তাদের নিকট শপথ করে বক্তব্য উপস্থাপন করা ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা ছিল না।

✪ এটা একাধারে শপথ ও দলিল। কারণ যে কুরআনের শপথ করা হয়েছে তা-ই মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ। যেহেতু মানুষ নিছক দলিলের প্রতি ঝুঁকতে চায় না তাই শপথ আকারে দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শপথের কারণে যখন লোকদের এর প্রতি ঝোঁক হবে তখন তারা দলিলের মর্ম উপলব্ধিতেও সক্ষম হবে।

مَا اُنْذِرَ الخ এটা কোন শ্রেণির বাক্য : মুফাসসিরগণের মতে বাক্যটি ইতিবাচক তথা مُثْبَتْ ও হতে পারে, আবার নেতিবাচক তথা مَنْفِىْ ও হতে পারে। কাজেই যদি এটা নেতিবাচক বাক্য তথা كَلَامْ مَنْفِىْ হয়, তাহলে এর অর্থ হবে لَمْ يُنْذَرْ اٰبَائُهُمْ بِالْوَحْىِ অর্থাৎ তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়নি।

আর যদি এটা ইতিবাচক বাক্য তথা كَلَامْ مُثْبَتْ হয়, তখন এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে–

ক. لِتُنْذِرَ قَوْمًا الَّذِىْ اُنْذِرَ اٰبَائُهُمْ : অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণের কারণ হচ্ছে– আপনি এর দ্বারা এমন জাতিকে ভয় দেখাবেন যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। এমতাবস্থায় مَا اُنْذِرَ -এর مَا টি اِسْمِ مَوْصُوْلْ তথা اَلَّذِىْ -এর অর্থে হবে।

খ. অথবা, বাক্যটির অর্থ হবে– আপনি তাদেরকে এমন শাস্তির ভয় দেখাবেন যে সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষগণ তাদেরকে সতর্ক করে গেছে।

বর্ণিত আয়াত দুটির সমন্বয় সাধন করো : উল্লিখিত আয়াত দুটিতে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মতবিরোধ দেখা যায়। কেননা, প্রথম আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি কিংবা তাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী কোনো নবী বা রাসূল আগমন করেনি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি জাতির মধ্যেই ভীতি প্রদর্শনকারী নবী বা রাসূল আগমন করেছেন। এর সমাধান কল্পে বলা যায় যে, তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি এর ভাবার্থ হচ্ছে– তাদের নিকটতম পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়নি। তবে "তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে" এর ভাবার্থ হবে– তাদের দূরবর্তী পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

অথবা, مَا اُنْذِرَ اٰبَائُهُمْ -এর অর্থ হবে তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী কোনো নবী আগমন করেনি। এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী কেউই ছিল না। নবী বা রাসূল আগমন না করলেও তাদের অনুসারীদের মধ্যে এমন লোকজন অতিবাহিত হয়েছিল যারা তাদেরকে ভয় দেখিয়ে ছিল। আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতের সারকথা। কাজেই উভয় আয়াতের মধ্যে কোনোরূপ অসামঞ্জস্য আর থাকল না। –[ফাতুহাতে ইলাহিয়া]

মুফাসসিরগণ আয়াতের এ অংশটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে বলে তাফসীর করেছেন, তাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এর সমাধান কি? مَا أُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ -এর مَا টি যদি না বাচক হয় তবে অর্থ হবে- "তাদের পূর্ব পুরুষদের ভয় দেখানো হয়নি"। আর যদি এটি إِسْمُ مَوْصُوْل হয়, তখন অর্থ হবে "তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল"? এখন দু'টি অর্থের মধ্যে স্পষ্টই বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা বলব যে, এ উভয় অর্থের মধ্যে মূলত কোনো তফাৎ নেই। কেননা ইমাম রাযী (র.) বলেন, আমাদের বর্ণনানুযায়ী না বাচক হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে "তাদের পূর্ব পুরুষদের ভয় দেখানো হয়নি।" আর তাদের প্রথম যুগের লোকদেরকে ভয় দেখানো এ কথার পরিপন্থি নয় যে, তাদের আদি পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে তবে তাদের নিকটতম পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়নি।

বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব পুরুষদের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অধস্তন পুরুষদের ভীতি প্রদর্শন বাতিল করে না : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনি এমন জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করবেন যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। এর দ্বারা একথা বুঝা উচিত হবে না যে, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের অধস্তন পুরুষদেরকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন নেই। কাজেই ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ও নবী রাসূল এসে যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন তাদেরকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। আর মহানবী ﷺ যেভাবে মক্কাবাসীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন তদ্রূপ ইয়াহুদি-খ্রিস্টান তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে- وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি।

তবে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতি মিশন সর্বপ্রথম স্বীয় জাতি কুরাইশদের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে, তাই এখানে বিশেষভাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই মহানবী ﷺ তাঁর যুগ এবং তার পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগের প্রতিটি মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনাকারী রাসূল। তাঁর দাওয়াতি মিশন বিশেষ কোনো দেশ, জাতি, বর্ণ বা গোত্রের জন্য সীমিত নয়; বরং বর্ণ, গোত্র ও ভাষা নির্বিশেষে সকল দেশ ও জাতির সমস্ত লোকদের জন্যই তিনি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবী ও রাসূল।

আল্লাহর বাণী اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর বাণী- لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى أَكْثَرِهِمْ আয়াতে اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

- কারো কারো মতানুযায়ী এর দ্বারা আল্লাহর বাণী- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ উদ্দেশ্য।
- কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কারা ঈমান আনবে ও কারা ঈমান আনবে না সে সকল লোক।
- কতিপয় মুফাসসিরের মতে, اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা নবী করীম ﷺ ব্যক্ত করেছেন তথা তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাদি।
- অথবা, এখানে اَلْقَوْلُ দ্বারা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত পার্থিব আজাব উদ্দেশ্য।
- তবে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ [এখানে শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।] অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের ব্যাপারে উক্ত বাণী সাব্যস্ত হয়েছে।

اَلْفَتْرَةُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? উল্লেখ্য যে, দুই নবীর গমনাগমনের মধ্যবর্তী সময়কে ফিতরাত বলা হয়। যদি আলোচ্য আয়াতে قَوْمٌ দ্বারা শুধু কুরাইশগণ উদ্দেশ্য হয়, তবে فَتْرَةٌ বলতে হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ -এর মধ্যবর্তী সময়কে বুঝানো হয়েছে। আর তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে- নিকটবর্তীকালে তাদের নিকট কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী নবী পাঠানো হয়নি।

আর যদি قَوْمٌ দ্বারা কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য জাতি উদ্দেশ্য হয়, তবে فَتْرَةٌ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) -এর তীরোধান হতে নিয়ে মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হবে।

আয়াতটি কিসের দিকে ইঙ্গিত করেছে? এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, রাসূল প্রেরণ ও ওহী অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদেরকে সতর্ক করা। আর لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ الخ আয়াতটি সে সত্য উক্তিটির দিকেই ইঙ্গিত করেছে যে, মহানবী ﷺ সমগ্র জাতির প্রতি সত্যের আহ্বায়ক ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। তার হেদায়েতের বদৌলতে উম্মতকে হেদায়েত পেতেই হবে এমনটি কোনো জরুরি বিষয় নয়। নবীর দায়িত্ব তো হলো কেবলমাত্র সতর্ক করা। তাঁর উপর তাদের হেদায়েত জরুরি নয়। কারণ সতর্ককৃত মানুষের মাঝে অনেকেই ঈমান গ্রহণ করেনি। -[কাবীর]

সিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থ হচ্ছে- সরল সোজা সঠিক পথ।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস নকল করেছেন যে, একদা মহানবী ﷺ একটি সরল রেখা অঙ্কন করলেন এবং এর ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা আঁকলেন। এরপর বললেন, এ সরল রেখাটি হলো- صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ আর ডান-বামের রেখাগুলো হলো গোমরাহীর ও ভ্রষ্টতার পথ। এদের মোড়ে মোড়ে শয়তান অবস্থান নিয়ে আছে। তারা লোকদেরকে ঐ পথের দিকে ডাকতে থাকে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় তারাই পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর যারা তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সোজা চলে যায়, শুধুমাত্র তারাই صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ -এর উপর অটল থাকে।

- আল্লামা বায়যাবী (র.)-এর মতে, صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ -এর অর্থ হচ্ছে- طَرِيْقُ الْاِيْمَانِ বা ঈমানের পথ।
- কারো কারো মতে, পবিত্র কুরআনের প্রদর্শিত পথকেই صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ বলা হয়েছে।
- আল্লামা যমখশরী (র.)-এর মতে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসৃত পথকে صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا বলা হয়।
- কিছু কিছু মুফাসসিরের মতে, নবী রাসূলগণের অনুসৃত পথই হচ্ছে صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ তথা সরল সঠিক পথ।

বর্তমান সামাজিক অবস্থার উপর উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রভাব : আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ কুরাইশদের নিকট দাওয়াতি মিশন নিয়ে গেলে তাদের অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করে। যারা তাকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল তারাই তাকে তাচ্ছিল্যের সাথে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তারা জড়বাদী ধ্যান-ধারণা ও বস্তুবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে মহানবী ﷺ -কে রিসালাতের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে তারা ভয়াবহ পরিণামের শিকার হয়।

বর্তমানে সমাজের প্রতি তাকালেও একই চিত্র ফুটে উঠে। বাতিলের কাণ্ডারীরা আজও জাগতিক ধ্যান-ধারণায় আপ্লুত হয়ে দীনকে প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহস আজও দেখাচ্ছে। রাসূলের ﷺ উত্তরাধিকারী ও আহলে হককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় বর্তমানে কতিপয় নামধারী মুসলমানও আধুনিকতার প্রবক্তা সেজে প্রগতির দোহাই দিয়ে দীনের সাথে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করছে।

বর্তমান এই সমস্যা সংকুল সমাজে আলোচ্য আয়াতগুলো হতে শিক্ষা নিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ উপেক্ষা করে বাতিল শক্তিকে পরাভূত করে সত্যের ঝাণ্ডা নিয়ে নায়েবে নবীদেরকে দুর্বার গতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ, সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন- وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا "সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত; মিথ্যা তো বিতাড়িত হবেই।"

অনুবাদ :

٨. اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا بِاَنْ تُضَمَّ اِلَيْهَا الْاَيْدِيْ لِاَنَّ الْغُلَّ يَجْمَعُ الْيَدَ اِلَى الْعُنُقِ فَهِيَ اَيِ الْاَيْدِيْ مَجْمُوْعَةٌ اِلَى الْاَذْقَانِ جَمْعُ ذَقَنٍ وَهُوَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ رَافِعُوْنَ رُءُوْسَهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ خَفْضَهَا وَهٰذَا تَمْثِيْلٌ وَالْمُرَادُ اَنَّهُمْ لَا يُذْعِنُوْنَ لِلْاِيْمَانِ وَلَا يُخْفِضُوْنَ رُءُوْسَهُمْ لَهُ .

৮. আমি তাদের গর্দানে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছি। এভাবে যে, ঘাড়ের সাথে উভয় হাতকে বেঁধে দেওয়া হবে। কেননা غُلّ [বেড়ি] বলে ঘাড়ের সাথে হাতকে জড়িয়ে দেওয়া। কাজেই এটা অর্থাৎ উভয় হাত একত্রিত হয়ে রয়েছে থুতনির দিকে اَذْقَانٌ টা ذَقَنٌ -এর বহুবচন। আর তা হলো চোয়ালের হাড়দ্বয়ের মিলনস্থল কাজেই তারা ঊর্ধ্বমুখী। তারা মাথাগুলোকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে রয়েছে। তাদেরকে অধঃগামী করতে পারছে না। এটা একটি উপমা। এর ভাবার্থ হলো– তারা ঈমানের প্রতি আস্থাবান হচ্ছে না এবং ঈমানের প্রতি তাদের মাথা নত করে না।

٩. وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ تَمْثِيْلٌ اَيْضًا لِسَدِّ طُرُقِ الْاِيْمَانِ عَلَيْهِمْ.

৯. আর আমি স্থাপন করেছি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং তাদের পিছনে আরেকটি প্রাচীর। উভয় স্থানে سَدًّا শব্দটির সীনে যবর অথবা পেশ উভয় পড়া যায়। সুতরাং আমি তাদেরকে ঢেকে ফেলেছি যার কারণে তারা দেখতে পায় না। এখানেও কাফিরদের জন্য ঈমানের পথসমূহ রুদ্ধ করে দেওয়াকে উপমাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

١٠. وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১০. আর তাদের জন্য উভয়ই সমান আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন এখানে اَنْذَرْتَهُمْ শব্দটির উভয় হামযাহকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাহকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে। দ্বিতীয় হামযাহকে সহজ করে সহজীকৃত হামযাহ [দ্বিতীয় হামযাহ] ও অন্য হামযার মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে এবং সহজীকরণ পরিহার করত [বিভিন্ন কেরাতে] পড়া জায়েজ। অথবা আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন না করুন তারা ঈমান আনবে না।

١١. اِنَّمَا تُنْذِرُ يَنْفَعُ اِنْذَارُكَ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ خَافَهُ وَلَمْ يَرَهُ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ هُوَ الْجَنَّةُ .

১১. আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন অর্থাৎ আপনার সতর্কীকরণ কেবলমাত্র তাদেরই উপকারে আসতে পারে– যারা উপদেশ মেনে চলে অর্থাৎ কুরআন মেনে চলে এবং আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে অথচ তাঁকে দেখেনি। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানিত পুরস্কারের শুভ সংবাদ দিন। আর তা হলো জান্নাত।

١٢. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى لِلْبَعْثِ وَنَكْتُبُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مَا قَدَّمُوْا فِيْ حَيٰوتِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ لِيُجَازُوْا عَلَيْهِ وَاٰثَارَهُمْ ط مَا اسْتُنَّ بِهِ بَعْدَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ نَصَبُهُ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ أَحْصَيْنٰهُ ضَبَطْنَاهُ فِيْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ كِتَابٍ بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ.

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি পুনরুত্থানের জন্য এবং লিপিবদ্ধ করি লাওহে মাহফূযে যা তারা সম্মুখে প্রেরণ করে অর্থাৎ তাদের জীবদ্দশায় ভালোমন্দ যা করে যাতে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া যায়। আর তাদের অনুসৃত কার্যাদি অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসরণ করতঃ পরবর্তী লোকেরা যা করে আর প্রতিটি বস্তুকে এমন একটি فِعْل -এর কারণে শব্দটি মানসূব হয়েছে পরবর্তী শব্দটি যার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছে। আমি তাকে সংরক্ষণ করেছি লিপিবদ্ধ করেছি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ স্পষ্ট গ্রন্থে আর তা হলো লাওহে মাহফূয।

তাহকীক ও তারকীব

سَدًّا শব্দটিতে বর্ণিত কেরাত এবং তার إِعْرَابٌ -এর মহল : سَدًّا শব্দটির س -এর মধ্যে দুটি হরকত হতে পারে অর্থাৎ سُدًّا পেশ যোগে পড়া যাবে, অথবা سَدًّا যবর যোগে পড়া হবে। উভয় অবস্থায় অর্থ একই হবে অর্থাৎ পাহাড়, প্রাচীর, বাধা ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ বলেন– اَلسُّدُّ بِالضَّمِّ مَا كَانَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَبِالْفَتْحِ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ بَنِيْ اٰدَمَ অর্থাৎ سَدًّا সীন অক্ষর পেশ যোগে হলে অর্থ হবে আল্লাহর সৃষ্টি পাহাড় বা প্রাচীর। আর যদি সীন অক্ষরে যবর হলে অর্থ হবে মানব নির্মিত প্রাচীর ও পাহাড়। سَدًّا শব্দটি جَعَلْنَا -এর মাফঊল হিসেবে নসব বিশিষ্ট হয়েছে।

فَاَغْشَيْنٰهُمْ -এর তাহকীক : এখানে فَاء অক্ষরটি تَفْسِيْر [ব্যাখ্যা] বা تَعْلِيْل (কারণ, বর্ণনা করা বা ফলাফল (نَتِيْجَة) বর্ণনা করার জন্য এসেছে।

اَغْشَيْنٰهُمْ -এর মধ্যে اَغْشَيْنَا হচ্ছে جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ -এর সীগাহ্ অর্থ– আমি ঢেকে দিলাম, আচ্ছাদিত করে দিলাম। আর هُمْ হচ্ছে যমীর যা তারকীবে মাফঊলে বিহী হয়েছে।

فَاَغْشَيْنٰهُمْ -এর বিভিন্ন কেরাত : এ আয়াতে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. فَاَغْشَيْنٰهُمْ (غ -এর সাথে) এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত। اَلْاِغْشَاءُ অর্থ– আবৃত করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে– আমি তাদের দৃষ্টি শক্তিকে আবৃত করে দিয়েছি, যার ফলে তারা সত্য পথ দেখতে পাচ্ছে না।

২. فَاَعْشَيْنٰهُمْ (ع -এর সাথে] এটা অপ্রসিদ্ধ কেরাত। এটা اَلْعَشَا হতে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো দুর্বল করে দেওয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে– আমি তাদের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

سَوَاءٌ শব্দটি رَفْع হওয়ার কারণ : سَوَاءٌ শব্দটি দু'টি কারণে مَرْفُوْع হয়েছে–

১. سَوَاءٌ শব্দটি مُسْتَوٍ -এর অর্থে إِنْذَارُكَ وَعَدَمُهٗ মুবতাদা মুয়াখখার হতে খবরে মুকাদ্দাম হওয়ায় مَرْفُوْع হয়েছে অর্থাৎ مُسْتَوٍ عَلَيْهِمْ إِنْذَارُكَ وَعَدَمُهٗ -

২. سَوَاءٌ শব্দটি مُسْتَوُوْنَ অর্থে هُمْ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে মারফূ' হয়েছে।

ءَاَنْذَرْتَهُمْ শব্দের বিভিন্ন কেরাত : ءَاَنْذَرْتَهُمْ-এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত রয়েছে–

✪ ইবনে আমের ও কূফীগণের মতে, উভয় হামযাকে স্ব-স্ব অবস্থায় অপরিবর্তিত রেখে পড়া হবে। যথা– ءَأَنْذَرْتَهُمْ

✪ হযরত নাফে' (র.)-এর মতে, দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া হবে। যথা– آنْذَرْتَهُمْ

✪ আবূ আমের (র.) ও ইবনে কাছীর (র.)-এর মতে, উভয় হামযাকে তাসহীল করে পড়া হবে।

✪ তাসহীলকৃত হামযাদ্বয়ের মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া হবে।

✪ একটি হামযাকে তাসহীল করে এবং অপরটিকে আপন অবস্থায় অপরিবর্তিত রেখে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে পড়া হবে।

✪ হিশাম ইবনে আমের (র.)-এর মতে, তাসহীল বর্জন করে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে পড়া হবে। যথা– ءَاَأَنْذَرْتَهُمْ

✪ প্রথম হামযাহ বিলুপ্ত করে পড়া হবে। যথা– أَنْذَرْتَهُمْ

✪ প্রথম হামযাকে তার মাখরাজ হতে আদায় করে দ্বিতীয় হামযাকে নিম্ন স্বরে পাঠ করা।

✪ দ্বিতীয় হামযার হরকত তার পরবর্তী অক্ষরে দিয়ে দ্বিতীয় হামযাকে বিলুপ্ত করে পড়া। যথা– أَنَذَرْتَهُمْ

✪ প্রথম হামযাকে হরফে লীন ও দ্বিতীয় হামযাকে মুদগাম করে পাঠ করা।

ইমাম বায়যাবী ও আবূ হাইয়ান (র.) -এর মতে শুধুমাত্র প্রথম কেরাতটি মুতাওয়াতির বাকিগুলো শায।

فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ الخ -এর মধ্যস্থ هِيَ-এর প্রত্যাবর্তনস্থল : এখানে هِيَ যমীরের মারজি' দুটি হতে পারে–

১. هِيَ -এর মারজি' হলো উহ্য أَيْدِيْ -এর দিকে। অর্থাৎ তাদের হাতসমূহ চিবুকের দিকে অধঃগামী হওয়ার তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

২. هِيَ যমীরটি اَلْأَغْلَالُ-এর দিকে ফিরেছে। এ মতটিই আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.) পছন্দ করেছেন। তখন অর্থ হবে– আমি তাদের গলায় ভারী শিকল পরিয়ে দিয়েছি, যা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ফলে কাফিররা মাথা নিচু করতে পারছে না তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى-এর তারকীব : إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর نَا হলো ইসমে ইন্না, نَحْنُ হলো মুবতাদা। আর نُحْيِ হলো ফে'ল ফায়েল اَلْمَوْتٰى মাফউল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর হলো। এখন মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে ইন্না-এর খবর। এখন إِنَّ তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো।

كُلَّ شَيْءٍ الخ -এর মধ্যস্থ كُلَّ -এর إِعْرَابُ-এর স্থান : এ আয়াতে كُلَّ শব্দটি شَرِيْطَةُ التَّفْسِيْرِ-এর ভিত্তিতে মানসূব হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে– أَحْصَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ -

আল্লাহর বাণী إِمَامٍ مُّبِيْنٍ -এর তাহকীক : এখানে إِمَامٌ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ -এর মাসদার। এটা ইসমে মাফউল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ইসমে জামিদের রূপ লাভ করেছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– পেশ করা, সম্মুখে উপস্থাপন করা। যেহেতু এটি إِسْمُ مَفْعُوْلٍ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই অর্থ হবে যাকে সামনে পেশ করা হয়েছে। এ কারণেই ইমামকে ইমাম বলা হয়। পরবর্তী এটা নেতা ও সর্দার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতে إِمَامٌ অর্থ হলো এমন কিতাব যাতে মানুষের সারা জীবনবৃত্তান্ত লিখিত রয়েছে।

আর مُبِيْنٍ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ হতে إِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ। অর্থ– স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এখানে إِمَامٍ مُّبِيْنٍ দ্বারা লাওহে মাহফূযকে বুঝানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ .... أَجْرٍ كَرِيمٍ আয়াতের শানে নুযূল : কুরতুবী, খাযিন ও ফতূহাতে ইলাহিয়া ইত্যাদি তাঁফসীর গ্রন্থসমূহে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, একদা পাপিষ্ঠ আবূ জাহল শপথ করে বলল, সে যখনই মহানবী ﷺ -কে নামাজরত দেখতে পাবে তখনই প্রস্তর নিক্ষেপ করে মহানবী ﷺ -এর মুবারক মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। এরপর একবার রাসূল ﷺ কে নামাজরত দেখতে পেয়ে পাপিষ্ঠ আবূ জাহল তার কুমতলব হাসিলের জন্য পাথর নিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়। এমন সময় পাথরটি তার হাতে আটকে যায় আর তার হাত থুতনির সাথে জড়িয়ে ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে যায়। ফলে হাতটি তার ঘাড়ে শক্ত বেড়ির ন্যায় হয়ে যায়। তখন তার চোখদ্বয় বন্ধ হয়ে মাথা উর্ধ্বমুখী হয়ে পড়ে।

তথা হতে পলায়ন করে আবূ জাহল তার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ ও অপর এক ব্যক্তিকে এ ঘটনা জানায়। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, আমিই সুযোগ বুঝে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। কাজেই একদা মহানবী ﷺ -কে নামাজরত দেখে নরাধম ওয়ালীদ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে রাসূল ﷺ -এর মাথায় আঘাত হানতে উদ্যত হলো অমনি তার চক্ষুদ্বয় অন্ধ হয়ে গেল, ফলে সে মহানবীর ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেল কিন্তু তাঁকে দেখতে পেল না। বিফল মনোরথ হয়ে সে তার পাপী সহযোগীদ্বয়ের নিকট ফিরে আসল। কিন্তু তাদেরকেও দেখতে পেল না। তখন তার দুষ্কর্মের সাথীদ্বয় তাকে জিজ্ঞাসিল ব্যাপার কি ওয়ালীদ? জবাবে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি কিন্তু তাকে দেখতে পাইনি।

তখন তৃতীয় ব্যক্তি আরো দম্ভোক্তি করে মহানবী ﷺ -এর মস্তক চূর্ণ করার দৃঢ় শপথ নিল। সে একটি পাথর নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে লাত উয্যার শপথ করে বলল, আমি যখন মহানবী ﷺ-এর নিকটবর্তী হতে ইচ্ছা করলাম তখন একটি বিরাটকায় হিংস্র ষাঁড় আমায় তাড়া করল। এমন ষাঁড় আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমি আর একটু অগ্রসর হলে সে আমায় পেটে পুরে ফেলত।

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দান ও মানুষকে সতর্ক করার জন্য .... إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى .... إِمَامٍ مُّبِيْنٍ : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, বনূ সালামা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববী হতে কিছুটা দূরে বসবাস করতেন। তাই তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে বাসস্থান নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী ﷺ তাদের আবেদন মঞ্জুর না করে বললেন যে, তোমাদের প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ছওয়াব লেখা হয়। তখন তাদের শানে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

إِنَّا جَعَلْنَا ...... فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ আয়াতে বর্ণিত কেরাতসমূহ : উল্লিখিত আয়াতে দু'টি কেরাত বর্ণিত রয়েছে–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) أَعْنَاقِهِمْ -এর স্থলে أَيْمَانِهِمْ পড়েছেন।

২. ইমাম যুজাজ (র.) أَعْنَاقِهِمْ -এর স্থলে أَيْدِيْهِمْ পড়েছেন।

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, উল্লিখিত কেরাত শুধুমাত্র তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পঠনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা, এটা মাসহাফে ওসমানীর পরিপন্থি।

সুতরাং এখানে أَيْدِيْهِمْ কিংবা أَيْمَانِهِمْ -কে উহ্য মেনে তাফসীর করা হবে। মূল বাক্য এরূপ হবে যে, إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَفِيْ أَيْدِيْهِمْ أَغْلَالًا অথবা মূলবাক্য এরূপ হবে যে, إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَفِيْ أَيْمَانِهِمْ أَغْلَالًا, আর الْأَذْقَانُ শব্দটি أَيْدِيْ কিংবা أَيْمَانٌ হতে কিনায়া হয়েছে, এটা الْأَعْنَاقُ হতে কিনায়া হয়নি। আরবি ভাষায় অনুরূপ উহ্য বাক্যের প্রচলন রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কারো গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো– তার হাতে ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন যখন فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ -এর উল্লেখ করেছেন তখন এতে প্রতীয়মান হয় যে, الْأَذْقَانُ -এর দ্বারা أَيْدِيْ-কে বুঝানো হয়েছে।

আয়াতে উল্লিখিত اَلْاَعْنَاقُ এবং اَلْاَغْلَالُ -এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না উপমা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْاَعْنَاقُ এবং اَلْاَغْلَالُ -এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না উপমা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে-

১. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এদের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। এটাই পূর্বোল্লিখিত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে اَغْلَالٌ ও اَعْنَاقٌ দ্বারা এদের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য তথা এগুলোকে উপমা দেওয়ার জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপনের বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কথা বুঝানো হয়েছে এবং তাদের ঈমান আনয়ন হতে বিমুখ হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

✪ কতিপয় ওলামায়ে কেরামের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্নমুখী বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করত তাদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করা হতে বিরত রেখেছে। অপর একটি আয়াতেও اَلْاَغْلَالُ فِى الْاَعْنَاقِ দ্বারা عَدَمُ الْاِنْفَاقِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহর পথে ব্যয় না করা)-কে বুঝানো হয়েছে। কাজেই আল্লাহর বাণী- لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ অর্থ- তোমার হাতকে তোমার গলার বেড়ি বানিয়ো না তথা কৃপণতা কর না। সুতরাং এখানেও কৃপণতার অর্থ গ্রহণীয় হবে। যেরূপভাবে গলায় বেড়ি লাগানো ব্যক্তি উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে এবং মাথা নিচু করতে পারে না তদ্রূপ কাফির মুশরিকরাও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অক্ষম। মনে হয় যেন আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে তাদের হাতকে আটকে রাখা হয়েছে।

✪ অপর একদল তাফসীর কারকের মতে, কাফিরদের গলায় বেড়ি ও শিকল পরিয়ে জাহান্নামে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে সে দিকেই আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

✪ কতিপয় মুফাসসিরের মতে, কাফিররা সত্য গ্রহণে আগ্রহী না হওয়া এবং তাদের সত্য হতে বিমুখ হওয়াকে অত্র আয়াতে শিকল পরা ব্যক্তির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। গলায় শিকল পরা ব্যক্তি যেভাবে মাথা নত করতে অক্ষম তদ্রূপ কাফিররাও সত্যের সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করে সত্যকে মাথা পেতে নিতে অপারগ।

اَلسَّدُّ -এর অর্থ এবং কাফিরদের সম্মুখে তা সৃষ্টির কারণ : اَلسَّدُّ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- বাধা প্রদানকারী বস্তু, দেয়াল, বাধা, প্রতিবন্ধক, প্রাচীর, তবে আয়াতে এ অর্থগুলো উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি, আয়াতে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এর রূপক অর্থ। আর তা হচ্ছে- অত্র আয়াতে কাফেরদেরকে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যাকে অগ্র পশ্চাত সকল দিক হতে প্রাচীর দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়েছে, ফলে সে আশে পাশের কোনো কিছু দেখতেও পাচ্ছে না এবং সম্মুখ পানে অগ্রসরও হতে পারছে না। ঠিক তেমনি কাফেরদের চতুর্দিকেও এক অদৃশ্য প্রাচীর বিদ্যমান যার কারণে কাফিররা ঈমান আনতে সক্ষম হচ্ছে না। এমনকি ঈমান ও সত্যকে দেখতেও পাচ্ছে না। বস্তুত দীনের প্রতি কাফেরদের চরম অনীহা ও উদাসীনতাকে এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এ পরিণতি তাদের বেপরোয়া অপকর্মের কারণেই উদ্ভব হয়েছে। এ জন্য মহান রাব্বুল আলামীন মোটেই দায়ী নয়।

অত্র আয়াতে কাফেরদের পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপনের হিকমত : এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেরদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করা হয়েছে। সামনে প্রাচীর স্থাপনের অর্থ হচ্ছে তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু পিছনে প্রাচীর স্থাপনের তাৎপর্য অনেকটাই অস্পষ্ট। নিম্নে এ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা হলো-

১. মানুষ দু ধরনের হেদায়েত পেয়ে থাকে-

ক. هِدَايَةٌ فِطْرِيَّةٌ [স্বভাবগত হেদায়েত] অর্থাৎ মানুষ যে হেদায়েতের উপর জন্মগতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এরপর পরিবেশের চাপে কিংবা অসৎ লোকদের সংস্পর্শে এসে বিপথগামী হয়ে পড়ে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ বলেছেন- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ প্রতিটি আদম সন্তানই ইসলামি স্বভাবের উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। এরপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরদের ধ্যান-ধারণার মূল্যায়ন করলে বুঝা যায় যে, তারা কখনো উক্ত ধ্যান-ধারণাকে পরিত্যাগ করে থাকে।

খ. هِدَايَةُ نَظَرِيَّةٌ [প্রমাণাদির ভিত্তিতে হেদায়েত] অর্থাৎ মহান রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের নিদর্শনাবলি দেখে মানুষ যে হেদায়েত অর্জন করে থাকে, কাফেরদের ভাগ্য-ললাটে এ ধরনের হেদায়েতও জোটেনি।

কাজেই আয়াতে, বাহ্যিকরূপ হতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ সত্যের প্রতিই আল্লাহ তা'আলা وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا বলে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে, কাফিররা তাঁর নিদর্শনাবলি দেখে সঠিক হেদায়েতের উপর জীবন যাপন করতে প্রস্তুত নয়। আর وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا বলে একথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, বাস্তবিকই তারা স্বভাবগত হেদায়েতের উপর প্রত্যাবর্তন করতে রাজি নয়।

২. এ আয়াতে কাফেরদের ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, যদি কোনো ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে না পারে এবং পিছনের ফিরে যেতে না পারে তবে নিশ্চিতরূপেই তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। তদ্রূপ কাফেরদের ধ্বংসও সুনিশ্চিত।

৩. অথবা, এ আয়াত দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেহেতু কাফেররা পরকাল ও পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে না তাই তাদের সামনে যেন একটি প্রাচীর স্থাপিত রয়েছে। ফলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোনো পথ দেখছে না। অপরদিকে জীবনের এ গতিকে পেছনের দিকে ধাবিত করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মনে হয় তাদের পিছনে যেন একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আর উপরিউক্ত আয়াতে وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. অথবা, এখানে وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, কাফিররা তাদের অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করে কর্মে উদ্বুদ্ধ হয় না। মনে হয় যেন তাদের সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক হতেই প্রাচীর প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আর তারা মিথ্যা, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও হিংসা-বিদ্বেষে এমন বিভোর হয়ে রয়েছে যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে তারা সত্যকে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারছে না। কাজেই তাদের চোখে যেন পর্দা পড়ে রয়েছে। -[মা'আরিফ, কাবীর]

আয়াতে ডানে ও বামে উল্লেখ না করে তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীরের কথা কেন উল্লেখ করা হলো? আয়াতে ডানে ও বামে উল্লেখ না করে সামনে ও পিছনে প্রাচীর রয়েছে এর উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ একাধিক হিকমতের উল্লেখ করেছেন-

১. হেদায়েত দু প্রকার : ক. স্বভাবগত হিদায়েত, খ. নিদর্শনাদি ও প্রমাণাদির সাহায্যে প্রাপ্ত হেদায়েত। এখানে সামনে ও পিছনের হেদায়েত উল্লেখ করে উল্লিখিত দু প্রকার হেদায়াত হতে বঞ্চিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই ডানে ও বামে প্রাচীর রয়েছে এ কথা উল্লেখের কোনোই প্রয়োজন নেই।

২. অথবা, সামনে ও পিছনের প্রাচীর রয়েছে উল্লেখ করার দ্বারা ডান ও বামের প্রাচীরের কথা تَغْلِيْبٌ উল্লেখ রয়েছে। কারণ, আরবিতে দু'দিক উল্লেখ করে চতুর্দিক বুঝানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ ছাড়া এ স্থানে কোনো প্রাচীর বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং কাফেরদের হেদায়েত হতে বঞ্চিত হওয়া বুঝানেই মূল উদ্দেশ্য যা "সামনে পিছনে প্রাচীর রয়েছে" উল্লেখ করার দ্বারাই বুঝে আসে।

৩. অথবা, তাদের সম্মুখের ও পিছনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা এমন বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে, তাদের ডান বামে প্রাচীর রয়েছে এ কথা বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।

বাহ্যিক আয়াত প্রমাণ করে যে, তাদেরকে ভয় দেখানো আর না দেখানো বরাবর তথাপিও আল্লাহ আয়াতে তাদেরকে ভয় দেখানোর নির্দেশ দিলেন কেন? سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা ও না করা উভয়ই সমান তথাপিও তাদেরকে কেন ভীতি প্রদর্শনের জন্য মহানবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হলো? এর জবাবে মুফাসসির ওলামায়ে কেরামগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন।

১. এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, কাফেরদেরকে ভয় দেখান আর না দেখান উভয়েই সমান যে, তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তথাপিও অন্যান্য আয়াতে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তার প্রতি আরোপিত দায়িত্ব হতে তিনি নিষ্কৃতি পেতে পারেন। আর পরকালে কাফেররা যেন এ ওজর করতে না পারে যে, আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তো কোনো নবী রাসূল প্রেরিত হননি। যদি কোনো নবী বা রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করা হতো তবে কিছুতেই আমরা বিপথগামী হতাম না।

সার কথা হলো আল্লাহর বাণী- رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ এবং وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ এ ধরনের অন্যান্য আয়াতের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য মহানবী ﷺ -কে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই হেদায়েত কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে পরিস্থিতির শীকার হয়ে মানুষ সে যোগ্যতাকে নষ্ট করে ফেলে। যেমন হাদীসে এসেছে- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ। অর্থাৎ প্রতিটি নবজাতক ফিতরতের উপরই জন্মলাভ করে এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। কাজেই তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনের ফলে তাদের অন্তর্নিহিত ফিতরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটারও অবকাশ রয়েছে।

৩. আল্লামা বায়যাবী (র.) তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু মানুষ ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন আর সে ইচ্ছা করেই কুফরি গ্রহণ করেছে। কাজেই তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তার ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। ফলে সে সত্য ধর্মে ফিরেও আসতে পারে। এ কারণেই তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

৪. ঈমান আনার পথে দু'টি অন্তরায় অন্তরায় রয়েছে- ১. মৌলিক অন্তরায় ২. কৃত্রিম অন্তরায়। أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ الخ আয়াতে প্রথম প্রকার অন্তরায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আর لِيُنْذِرَ الخ এবং এর ন্যায় অন্যান্য আয়াত দ্বারা কৃত্রিম অন্তরায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সার কথা হলো, যদি তারা কৃত্রিম অন্তরায় তথা পারিপার্শ্বিক কারণে ঈমান গ্রহণ না করে থাকে, তবে তারা আপনার তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর যদি মৌলিক অন্তরায়ের কারণে কুফরিকে আঁকড়ে ধরে রাখে তথা কুফরির উপর তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে থাকলে তারা ঈমান আনবে না। তাদের ক্ষেত্রে আপনারা ভয় দেখানো আর না দেখানো সমান। অর্থাৎ তাদের মাঝে এই উভয় প্রকারের লোকজন বিদ্যমান। কিন্তু আপনি তো জানেন না যে, কে কোন প্রকারের অন্তর্গত। তাই আপনি ব্যাপকভাবে দাওয়াতি মিশন চালিয়ে যান যাতে করে দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে প্রথম প্রকারের লোকজন হতে ছাটাই করে নেওয়া যায়।

৫. অথবা, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে কুফরি রেখাপাত করেছে। অর্থাৎ এটি অনেকটাই অতিশয়োক্তির মতোই। অন্যথা তাদের ঈমান আনার সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহর বাণী سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ এটা কাফেরদের কোনো দলের জন্য খাস না আম? উল্লিখিত আয়াত দ্বারা কাফেরদের কোনো বিশেষ দলকে বুঝানো হয়েছে নাকি ব্যাপকভাবে সকল কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসির গণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে-

১. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতটি عَامٌّ বা ব্যাপক। যত লোকই আল্লাহর অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তাদের সকলের অবস্থা এক ও অভিন্ন।

২. কোনো কোনো তাফসীর কারকের মতে, উক্ত আয়াতটি মহানবী ﷺ-এর সমকালীন কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট, ব্যাপকভাবে নয়।

৩. আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.)-এর মতে, এ আয়াত দ্বারা কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিসহ সকলেই উদ্দেশ্য।

৪. ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা আবূ জাহল, আবূ লাহাব, ওতবা, শায়বা, উমাইয়া ইবনে খালফ ও উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কাফেরবর্গ উদ্দেশ্য।

৫. কারো কারো মতে, শুধুমাত্র তৎকালীন মক্কার কাফেরগণই উদ্দেশ্য।

আল্লাহর বাণী لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ الخ **এবং আল্লাহর বাণী** إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ **-এর মধ্যে সমন্বয় :** পবিত্র কুরআনের لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ الخ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে জাতির পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি [কুরাইশ] মহানবী ﷺ তাদের সকলের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী। আর আল্লাহর বাণী– إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ الخ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা কুরআনের অনুসরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে মহানবী ﷺ কেবল তাদেরই জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী। কাজেই আয়াত দ্বয়ের মাঝে প্রকাশ্য মতবিরোধ দেখা দেয়। বিজ্ঞ তাফসীরকারকগণ এর সমাধান কল্পে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী! সকলকে আল্লাহর আজাব ও গজবের ব্যাপারে সতর্ক করে দিবেন। চাই এ সতর্কীকরণ তাদের জন্য সুফল বয়ে আনুক বা না আনুক।

   আর শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা পবিত্র কুরআনের অনুকরণ করে ও আল্লাহকে ভয় করে শুধুমাত্র তারাই আপনার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা উপকৃত হবে। সার কথা হলো, প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা সাধারণ ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য চাই তা উপকারী হোক বা না হোক। আর শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বিশেষ ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য যা উপকারী, কাজেই এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকে না।

২. কাফেরদের মধ্যে দু' ধরনের লোক বিদ্যমান (ক) এমন কাফের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হলেও ঈমান আনয়ন করবে না (খ) এমন কাফের যাদের ভয় দেখানো হলে ঈমান আনয়ন করবে। আর রাসূল ﷺ -এর দায়িত্ব তো কেবল সকলকে পথ দেখানো, মনযিলে মকসূদে পৌঁছে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব নয়। তাই প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথম দলের কথা আর দ্বিতীয় আয়াতে দ্বিতীয় দলের কথা বর্ণিত হয়েছে। কাজেই উভয় আয়াতে কোনো দ্বন্দ্ব বাকি থাকে না।

৩. মহানবী ﷺ -এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রথমোক্ত আয়াতে অবহিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, যদি কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয় আপনার ভয় দেখানোর ফলে প্রভাবিত হয়ে হেদায়েত কবুল না করে, তবে আপনি বিচলিতও হবেন না এবং ধৈর্যচ্যুতও হবেন না। কারণ আপনি তো আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। মূলত যারা পবিত্র কুরআনের অনুকরণ অনুসরণ করে এবং না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে শুধুমাত্র তারাই আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনার ভীতি প্রদর্শন কেবলমাত্র তাদেরকেই উপকৃত করবে।

৪. প্রথমোক্ত আয়াতে গড়ে সকলকে ঈমান আনয়নের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে যারা ঈমান এনেছে শুধুমাত্র তাদেরকে ঈমানের শাখা প্রশাখা জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, উভয় আয়াতে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব নেই। –[কাবীর, মা'আরিফ]

আল্লাহর বাণী إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ **-এর মধ্যে** ذِكْر **এবং** غَيْب **দ্বারা উদ্দেশ্য কি?** উল্লিখিত আয়াতে ذِكْر দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

১. আল্লামা ইমাম রাযী (র.), জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) ও অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, اَلذِّكْر দ্বারা এখানে اَلْقُرْاٰنِ الْحَكِيْم -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ذِكْر শব্দটি اَلِفْ لَامْ যোগে مَعْرِفَةْ হওয়ার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। কেননা পূর্বে اَلْقُرْاٰن ও اَلْحَكِيْم اَلِفْ لَامْ যোগে মা'রিফা হয়েছে।

২. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, আয়াতে اَلذِّكْر বলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহান রাব্বুল আলামীনের নিদর্শনাবলিকে বুঝানো হয়েছে– পবিত্র কুরআনের অন্যত্র وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, উক্ত আয়াতে اَلذِّكْر দ্বারা بَرَاهِيْنَ قَاطِعَةْ তথা অকাট্য দলিলসমূহকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মানুষের হৃদয়ে কোনো বিষয় অকাট্য দলিলের মাধ্যমেই সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকে।

اَلْغَيْبُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْغَيْبُ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. اَلْغَيْبُ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে مَا غَابَ عَنَّا যা আমাদের অগোচরে রয়েছে যথা– কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থাবলি।

২. অথবা আয়াতে اَلْغَيْبُ দ্বারা তাওহীদ তথা মহান রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদ উদ্দেশ্য।

আল্লাহকে না দেখে ভয় করার পদ্ধতি : মানুষ স্বীয় চর্ম চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পায় না। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ -এর মুখে আল্লাহর গুণগানের বর্ণনা শুনে বিশ্বাস করতঃ তার বিধিবিধান অনুযায়ী কর্ম করে।

আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বিষয়াবলি যত লোভনীয় ও মোহনীয়ই হোক না কেন তাঁর আজাব ও গজবের ভয়ে তা হতে বিরত থাকে। অসত্যের সম্মুখে কিছুতেই মাথা নত করে না।

আল্লাহ কিভাবে اِنَّا দ্বারা নিজের পরিচয় পেশ করলেন, অথচ পরিচয়ের জন্য এটা যথেষ্ট নয়? আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى -এর মধ্যে اِنَّا দ্বারা নিজের পরিচয় প্রদান করলেন কেন? অথচ اِنَّا -এর মাধ্যমে কারো সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। আর এ কারণেই মহানবী ﷺ اِنَّا বলে পরিচয় দেওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

উক্ত আয়াতে اِنَّا বলার আল্লাহর পরিচয় অস্পষ্ট হয়নি। কেননা, اِنَّا -এর সাথেই এমন একটি সিফাতের উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। আর তা হচ্ছে اِحْيَاءُ مَوْتٰى তথা মৃতকে জীবিত করা। আর এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। অন্য কারো পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব নয়। এর ফলেই এতে সম্ভাব্য সকল অস্পষ্টতা বিদূরিত হয়েছে এবং اِنَّا দ্বারা আল্লাহর পরিচয় দান পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এর দ্বারা পরোক্ষভাবে তথা اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, পুনরুত্থানের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ তা'আলা। অন্য কোনো দেব-দেবীর এতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। এ কথার মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর জন্য উক্ত গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে আর অন্যদিকে তাঁর বিরোধীদের থেকে এটাকে দূরীভূত করা হয়েছে।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا الخ দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরে কাবীরে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এর তিনটি অর্থ হতে পারে।

১. দুনিয়াতে বান্দা ভালোমন্দ যে আমলই করুক না কেন আল্লাহ তা'আলার দফতরে তা লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়। এখানে مَا قَدَّمُوْا বলে শুধু ভালো কাজেরই উল্লেখ করা হয়েছে বলে বুঝা যায়। বাস্তবিক পক্ষে مَا قَدَّمُوْا বাক্যে উহ্য اَخَّرُوْا ধরে নিতে হবে। তখন পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে যে, مَا قَدَّمُوْا وَاَخَّرُوْا এটা কুরআনের বাণী– سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ বাক্যের মতো একটি বাক্য হবে, যাতে بَرْدٌ শব্দটিও উহ্য ধরে নিতে হয়।

২. আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল কাজকর্ম আপন দফতরে লিপিবদ্ধ করে নেন। চাই তা নেক হোক বা বদ হোক। আর مَا قَدَّمُوْا আয়াতের অংশটি مَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -এর অনুরূপ একটি বাক্য।

৩. মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, আমরা তাদের মনের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও কল্পনা বা নিয়ত তারা যা কোনো কাজের পূর্বে করে থাকে তাও আমাদের দফতরে লিখিত থাকে।

কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনে এটা তোমাদের ভোগ করতে হবে। কর্ম ভাল হলে তা জান্নাতের বাগ-বাগিচায় পরিণত হবে আর খারাপ হলে তা জাহান্নামের অগ্নি শিখার রূপ লাভ করবে।

আল্লাহর বাণী وَاٰثَارَهُمْ -এর اٰثَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতে اٰثَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি সে ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে–

- এখানে اٰثَارٌ -এর দ্বারা এমন ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্য যা পরবর্তীতে প্রকাশ পায় এবং অবশিষ্ট থাকে। যেমন– কোনো ব্যক্তি মানুষদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিল, ধর্মীয় বিধিবিধান জানিয়ে দিল, ধর্ম সম্পর্কে কোনো পুস্তক রচনা করল যার মাধ্যমে জনসাধারণ উপকৃত হয়। অথবা কোনো কিছু ওয়াকফ করল যা থেকে পরবর্তীতে জন সাধারণ উপকৃত হলো। অথবা এমন কোনো কর্ম সম্পাদন করল যা মুসলমানদের উপকার সাধন করে, তাহলে যতদূর পর্যন্ত তার এ ভালো কর্মটির প্রভাব পৌঁছবে এবং যত দিন এটা পৌঁছতে থাকবে তা তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

অপরদিকে খারাপ কাজ, যার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে বাকি থাকে। যথা– অন্যায় আইন কানুন রচনা বা প্রচলন করল কিংবা জনসাধারণকে বিপথগামী করল, তবে যতদূর পর্যন্ত তার এই খারাপ কাজের প্রভাব পড়বে এবং এর কারণে যতদিন ফিতনা সৃষ্টি হতে থাকবে ততদিন তার আমল নামায় তা জমা হতে থাকবে।

এ আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে হযরত জাবির (রা.) মহানবী ﷺ -এর ইরশাদ নকল করেছেন যে–

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ثُمَّ تَلَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রচলন করল সে তো এর প্রতিদান পাবেই এবং যারা এর উপর তার পরবর্তীতে আমল করবে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদানও পাবে। অথচ তাদের কারো ভাগ থেকে কিছুই কমিয়ে নেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের প্রচলন করে সে উহার গুনাহ পাবে এবং তার পরবর্তী যারা এর উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও সে পাবে অথচ তাদের গুনাহ হতে সামান্যতম গুনাহও কম করা হবে না।

এরপর মহানবী ﷺ পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থ– আমি তারা যে ভালোমন্দ সামনে প্রেরণ করে তা লিখে রাখি এবং তাদের আমলের প্রতিক্রিয়া যা পৃথিবীতে বাকি থাকে তাও লিখে রাখি।

–[ইবনে আবী হাতিম ইবনে কাছীর কর্তৃক উদ্ধৃত]

* اٰثَارٌ -এর অপর একটি অর্থ হচ্ছে– পদচিহ্ন। এখানে اٰثَارَهُمْ দ্বারা তাদের আনুগত্য ও নাফরমানির দিকে পা বাড়ানোর চিহ্নসমূহকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে এসেছে– মানুষ নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করলে তার প্রতিটি পদচিহ্নের বিনিময় প্রতিদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) ইমাম রাযী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মদীনার যেসব সম্প্রদায়ের বাসস্থান মসজিদে নববী হতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল তারা মহানবী ﷺ -এর নিকট মসজিদে নববীর নিকটে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী ﷺ তাদের এ আবেদন নামঞ্জুর করে যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে বললেন। আরো বললেন– اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ خُطُوَاتِكُمْ وَيُثِيْبُكُمْ عَلَيْهِ فَالْزَمُوْا بُيُوْتَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিখে রাখেন এবং এর উপর তোমাদেরকে ছওয়াব প্রদান করা হবে। কাজেই তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।

অবশ্য এ শেষোক্ত ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কেননা, এ সূরাটি মাক্কী, আর বর্ণিত ঘটনা ছিল মদীনার। উক্ত সন্দেহের অপনোদন কল্পে বলা যেতে পারে যে, এ আয়াতের ব্যাপকার্থ হলো– আমলের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। আর অত্র আয়াতখানা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর মদীনায় যখন উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় তখন নবী করীম ﷺ প্রমাণ দিতে গিয়ে আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। আর পদচিহ্নকেও অবশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শামিল করেন যা লেখার উল্লেখ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

আর এ আলোচনার দ্বারা উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যকার বাহ্যিক বিরোধেরও অবসান হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর, মা'আরিফ]

আল্লাহ তা'আলা قَدَّمُوْا **বলেছেন** وَنَكْتُبُ مَا اَخَّرُوْا **কেন বলেননি?** এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা যদিও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দফতরে শুধুমাত্র মানুষের পূর্বের কৃত হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয় পরেরটি লিপিবদ্ধ করা হয় না, তবে বাস্তব এটা নয়। বরং মানুষের পূর্বাপরের সকল কর্মই লিপিবদ্ধ করা হয় যা অন্যান্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়। আর অত্র আয়াতে مَاقَدَّمُوْا -এর পরে مَا اَخَّرُوْا শব্দটি উহ্য রয়েছে। এরূপ উহ্য থাকার প্রচলন আরবিতে একাধিক রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রয়েছে যে, سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ অর্থাৎ এমন পোশাক যা তোমাদেরকে গরম [ও ঠাণ্ডা] হতে রক্ষা করবে। এখানে اَلْحَرَّ -এর পর اَلْبَرْدَ শব্দটি উহ্য রয়েছে। এটা আরবি ভাষার একটি বিশেষ রীতি।

আমল লেখার পূর্বে পুনরুত্থানের উল্লেখের কারণ : পুনরুত্থানের বিষয়টি আমল লেখার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৃত্যুর পর মানুষকে পুনঃজীবিত করে তার কৃতকর্ম তাকে দেখিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা বা দণ্ড প্রদান করাই হচ্ছে আমল সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, كِتَابَةُ الْاَعْمَالِ -এর কার্যকারিতা اِحْيَاءُ مَوْتٰى উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পুনরুত্থানের বিষয়টি আমল লিপিবদ্ধকরণ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এদিকে লক্ষ্য করেই كِتَابَةُ اَعْمَالٍ -এর পূর্বে اِحْيَاءُ مَوْتٰى -কে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٣. وَاضْرِبْ اِجْعَلْ لَهُمْ مَثَلاً مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ اَصْحٰبَ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ الْقَرْيَةِ اِنْطَاكِيَّةَ اِذْ جَآءَهَا اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدْلُ اِشْتِمَالٍ مِنْ اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ الْمُرْسَلُوْنَ اَيْ رُسُلُ عِيْسٰى .

১৩. আর আপনি বর্ণনা করুন উপস্থাপন করুন তাদের জন্য উপমা এটা প্রথম মাফউল বসবাসকারীগণ এটা দ্বিতীয় মাফউল এলাকার এন্তাকিয়ার। যখন তথায় আগমন করেছিলেন শেষ পর্যন্ত اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হতে বদলে ইশতিমাল হয়েছে। দূতগণ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর দূতগণ।

١٤. اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدْلٌ مِنْ اِذْ الْاُوْلٰى الخ فَعَزَّزْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ قَوَّيْنَا الْاِثْنَيْنِ بِثَالِثٍ فَقَالُوْآ اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ .

১৪. যখন আমি তাদের নিকট দুজনকে পাঠালাম তখন তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এখানে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্ত اذ ও তৎপরবর্তী বাক্য হতে بدل হয়েছে। এরপর আমি শক্তিশালী করলাম এখানে عززنا -এর প্রথম ز -কে তাশদীদ ছাড়া এবং তাশদীদসহ উভয়ভাবেই পড়া যায় অর্থাৎ আমি ঐ দুজনকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজন দূত প্রেরণ করে, তারা বললেন আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

١٥. قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ .

১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। দয়াময় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা শুধু শুধু মিথ্যাই বলছ।

١٦. قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ جَارٍ مَجْرَى الْقَسَمِ وَزِيْدَ التَّاكِيْدُ بِهٖ وَبِاللَّامِ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ لِزِيَادَةِ الْاِنْكَارِ فِيْ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ .

১৬. দূতগণ বললেন, আমাদের প্রতিপালক জানেন এটা শপথের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কাফেরদের অস্বীকৃতির কারণে পূর্বোক্ত বক্তব্যের উপর শপথ ও لام দ্বারা তাকিদ বাড়ানো হয়েছে নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট অবশ্যই দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

١٧. وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ التَّبْلِيْغُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ بِالْاَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَهِيَ اِبْرَاءُ الْاَكْمَهِ وَالْاَبْرَصِ وَالْمَرِيْضِ وَاِحْيَاءِ الْمَيِّتِ .

১৭. আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে প্রচার করাই সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য ও দ্ব্যর্থহীন প্রচার-ই আমাদের দায়িত্ব। আর তা [অর্থাৎ উক্ত প্রমাণাদি] হলো– জন্মান্ধ, শ্বেত ও অন্যান্য রোগীদেরকে আরোগ্য দান এবং মৃতকে জীবিতকরণ।

তাহকীক ও তারকীব

فَعَزَّزْنَا শব্দে বর্ণিত কেরাত : এখানে দুটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে–

১. জুমহুর কারীগণের মতে, فَعَزَّزْنَا -এর প্রথম ز -কে তাশদীদ যোগে পড়া হবে, এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. আসিম এবং আবূ বকর (র.) মতে, فَعَزَزْنَا -এর প্রথম ز -কে তাখফীফ করে পড়া হবে।

ইমাম জাওহারী (র.) বলেন যে, فَعَزَّزْنَا তাশদীদ যোগে পড়া হলে অর্থ হবে غَلَبْنَا وَقَهَرْنَا আর তাখফীফ করে পড়া হলে অর্থ হবে قَوَّيْنَا وَكَثَّرْنَا।

اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ -এর ই'রাবগত অবস্থান : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ আয়াতে উল্লেখিত اَصْحَابَ শব্দটি উহ্য مِثْل শব্দের মুযাফ ইলাইহ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে অর্থাৎ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مِثْلَ اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ উল্লিখিত বাক্যে مِثْل শব্দটি উহ্য রেখে তদস্থলে اَصْحَابَ শব্দটি আনা হয়েছে। যথা অন্যত্র এসেছে– وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ অর্থাৎ وَاسْئَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ উল্লিখিত বাক্যে اَهْلَ শব্দটিকে উহ্য রাখা হয়েছে।

অথবা, مِثْل শব্দটিকে উহ্য মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তখন বাক্যটি এরূপ হবে–

اِجْعَلْ اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ لَهُمْ مَثَلًا (اَوْ) مِثْلَ اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ لَهُمْ.

অথবা, اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ বাক্যটি اِضْرِبْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফউলও হতে পারে। তখন اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ টি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে।

অথবা, اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ বাক্যটি مَثَلًا হতে বদল হওয়ার কারণে মানসূবের মহলে হবে। এমতাবস্থায় মুযাফকে উহ্য মেনে নিতে হবে।

اِذْ শব্দের মহল্লে ই'রাব : اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ আয়াতে اِذْ টি اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। যেহেতু সর্বদা بَدَل এবং مُبْدَلْ مِنْهُ -এর اِعْرَابْ একই হয়ে থাকে। এখানে اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হলো مُبْدَلْ مِنْهُ আর اِذْ হলো بَدَل অর্থাৎ اِضْرِبْ لَهُمْ وَقْتَ مَجِئِ الْمُرْسَلِيْنَ وَمِثْلَ ذٰلِكَ الْوَقْتِ بِوَقْتِ مَجِيْئِكَ অর্থাৎ কাফেরদের সামনে সেই প্রেরিত লোকদের আগমনের সময়টা বর্ণনা করুন এবং আপনার আগমনের সময় দৃষ্টান্ত হিসেবে ঐ যুক্তিটি পেশ করুন যাতে কাফেররা সতর্ক হয়ে যায়। আর আপনি স্বীয় চিন্তা-ভাবনা বিদূরীত করে শান্ত হতে পারেন অথবা اِذْ টি اِضْرِبْ -এর ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অথবা, اِذْ টি পরবর্তী جَاءَ ফে'লের ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আল্লামা বাগবী (র.) লিখেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) সত্যের দাওয়াত দিতে তাঁর দু'জন সাথীকে এন্তাকিয়া শহরে প্রেরণ করলেন। যখন তারা এন্তাকিয়ার নিকটবর্তী হলেন, তখন দেখলেন, জনৈক বৃদ্ধ বকরি চরাচ্ছে। (এ ব্যক্তির নাম ছিল হাবীব, পরবর্তীকালে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হয়েছিলেন) তারা উভয়ে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সালাম করলেন। সে তাদেরকে তাদের পরিচয় এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। তারা বললেন, 'আমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত, তোমাদেরকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করার আহ্বান জানাতে এসেছি'। বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'তোমাদের নিকট কি কোনো নিদর্শন রয়েছে?' তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রুগণ ব্যক্তিকে সুস্থ করি, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করি'। বৃদ্ধ লোকটি বলল, আমার এক পুত্র দু'বছর ধরে অসুস্থ, তারা বললেন, 'আমাদেরকে তার নিকট নিয়ে চল'। তারা উভয়ে যখন ঐ ব্যক্তির পুত্রের দেহ স্পর্শ করলেন, তখন সে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ সংবাদ সমগ্র জনপদে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের হাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক রোগীকে আরোগ্য দান করলেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, 'এন্তাকিয়া' জনপদের রাজার নাম ছিল আনতাফাস। সে ছিল মূর্তি পূজক। রাজা এ দু' ব্যক্তির সংবাদ পেয়ে তাদেরকে তার দরবারে তলব করলো এবং তাদের পরিচয় জানতে চাইলো, তখন তারা বললেন, 'আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণীবাহক'। রাজা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?' তাঁরা বললেন, 'আমরা তোমাকে আহ্বান করি এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করতে, আর মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে, কেননা এ মূর্তিগুলো কিছু শ্রবণও করতে পারে না, দেখতেও পারে না। অতএব, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এমন পবিত্র সত্তার ইবাদত কর, যিনি সব কিছু শ্রবণ করেন সব কিছু দেখেন'। রাজা বলল, 'আমাদের উপাস্য ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য রয়েছে কি?' তারা বললেন, 'জ্বী-হ্যাঁ'। সেই পবিত্র সত্তা, যিনি তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে সৃষ্টি করেছেন', তখন রাজা বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যাও, পরে তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করব'। তখন প্রেরিত ব্যক্তিগণ উঠে আসেন, অনেক লোক তাদের পিছন পিছন আসে এবং বাজারে এসে তাদের উভয়কে প্রহার করে।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ.) যে দুই ব্যক্তিকে এন্তাকিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন, তারা এন্তাকিয়া পৌছলেও রাজার নিকট যেতে পারেনি, অনেক দিন তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। একদিন রাজা শহরে বের হয়, তখন তাঁরা উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলেন, উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ তা'আলার জিকির করায় রাজা রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে গ্রেফতার ও একশত বেত্রাঘাত করার আদেশ দেয়, যখন তাঁদের উভয়কে মিথ্যাজ্ঞান করা হয় এবং তাঁদেরকে প্রহার করা হয়, তখন হযরত ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নেতা শামউনকে তাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ছদ্মবেশে শামউন সে জনপদে হাজির হলেন। রাজার নিকটস্থ লোকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তাদের মাঝে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তখন তারা রাজাকে শামউনের ব্যাপারে অবহিত করল। রাজা শামউনকে দরবারে ডেকে পাঠালে তিনি হাজির হলেন। শামউনের সঙ্গে আলোচনায় রাজা মুগ্ধ হলো, তাঁর যথোচিত সম্মান সে করল, কিছুদিন পর শামউন রাজাকে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে দু'ব্যক্তিকে আপনি কারাবন্দী করে রেখেছেন, তারা যখন আপনার ধর্মের বিরোধী কথাবার্তা বলেছে, তখন আপনি তাদের প্রহার করিয়েছেন এবং বন্দী করেছেন। আপনি কি তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেছিলেন?' রাজা বলল, 'আমি এত বেশি রাগান্বিত হয়েছিলাম যে, তাদের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারিনি'। তখন শামউন বলল, 'রাজা যদি সমীচীন মনে করেন, তবে তাদেরকে তলব করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন'। শামউনের পরামর্শে রাজা ঐ দু'জন বাণী বাহককে তলব করল। শামউন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদেরকে এখানে কে প্রেরণ করেছে?' তারা জবাব দিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোনো শরিক নেই'। শামউন তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর'। তারা বললো, 'তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁর যেমন মর্জি হয় তেমনি আদেশ দেন'। শামউন বললেন, 'তোমাদের নিকট কোনো নিদর্শন রয়েছে কি?' তারা বললো, 'যে কোনো নিদর্শন ইচ্ছা তলব করতে পারেন'। একথা শ্রবণ করা মাত্র রাজা একটি ছেলেকে ডেকে আনল যার চক্ষুর কোনো নমুনাই ছিল না, কপাল যেমন সমান, চক্ষুর স্থানও তেমনি সমান। তখন ঐ দু'ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতে থাকলেন, অবশেষে ঐ ছেলেটির চক্ষুর স্থান ফেটে গেল এবং একটু পরে সে চক্ষুষ্মান হয়ে গেল। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলো শামউন রাজাকে বললেন, 'যদি আপনি আপনার উপাস্যকে এরূপ করতে বলেন, আর উপাস্যরা এরূপ করতে পারে, তবে আপনার প্রাধান্য বিস্তার হবে'। রাজা বলল, 'তোমার কাছে তো কোনো কিছু গোপন নেই, আমরা যেসব মূর্তির পূজা করি, তারা কোনো কিছু শোনেও না, দেখেও না, কোনো প্রকার ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই তারা করতে পারে না'।

রাজা যখন মূর্তি পূজা করত, তখন শামউন নামাজ আদায় করত এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাকুতি-মিনতি করতে থাকত। লোকেরা মনে করত শামউন তাদের ধর্মে রয়েছে। এরপর রাজা ঐ দু'জন বাণী বাহককে বলল, 'তোমাদের খোদা যদি মৃতকে জীবিত করতে পারে তবে আমি তাঁকে মানব'। তারা বললেন, 'তিনি সর্বসময় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী', তখন রাজা একটি শিশুর লাশ হাজির করল, যার মৃত্যু হয়েছিল এক সপ্তাহ পূর্বে, পিতার অনুপস্থিতি হেতু তাকে দাফন করা হয়নি, মৃত লাশটি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এমন অবস্থায় তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রকাশ্যে দোয়া করল আর শামউন চুপিসারে দোয়া করতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরই মৃত শিশুটি জীবিত হয়ে বসে পড়ল এবং বলল, 'মুশরিক অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়েছিল সাত দিন পূর্বে, আমাকে অগ্নির সাতটি ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি তোমাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করার জন্য বলছি, তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন'। এরপর সে বলেছে, 'আসমানের দরজা খোলা হয়, আর আমি একজন অতি সুন্দর যুবককে দেখেছি যে, এই তিনজনের সুপারিশ করছে', রাজা জিজ্ঞাসা করল, 'তিনজন কে?' সে বলল, 'শামউন এবং এই দুজন', রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলো শামউন যখন দেখলেন যে, এ ঘটনা রাজার মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তখন তিনি রাজাকে বললে, 'আপনি এ দু' ব্যক্তিকে বলুন, তারা যেন আপনার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেয়।' রাজা তাই করল, তখন বাণী বাহকদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান হলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতে লাগল। শামউনও চুপিসারে দোয়া করতে থাকল। কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ তা'আলা রাজার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দিলেন, কবর ফেটে গেল, মেয়েটি বের হয়ে এল এবং বললো, 'আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এ দু'ব্যক্তি সত্যবাদী। তবে আমার আশঙ্কা আপনারা তাদের কথা মানবেন না'। এরপর সে তাদেরকে অনুরোধ করল যে, আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, তারা তাকে কবরে পৌছে দিল।

ইবনে ইছহাক কা'ব এবং ওয়াহাব (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাজা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি আর তার জাতিও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে। এ জন্য সে উভয় রাসূলকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। এ খবর পেয়ে বৃদ্ধ হাবীব দ্রুতবেগে এসে রাজা এবং তার পারিষদের উপদেশ দিয়েছে। এটিই হলো এন্তাকিয়ার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩২-৩৪

ضَرَبَ -এর অর্থ উপমা বর্ণনার তাৎপর্য : ضَرَبَ -এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে তিনটি–

১. প্রহার করা, মারা, আঘাত করা। যথা– ضَرَبَ بَكْرٌ زَيْدًا অর্থ– বকর যায়েদকে মেরেছে। আর এ অর্থটি অধিক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

২. উপমা পেশ করা। যথা– ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا অর্থ– আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

৩. ভ্রমণ করা। যথা– ضَرَبَ خَالِدٌ فِى الْاَرْضِ অর্থ– খালিদ পৃথিবীতে ভ্রমণ করল।

উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারম্ভে ওহী, রিসালাত, পুনরুত্থান এবং তার নিকট জবাবদিহিতার কথা উল্লেখ করেছেন। আর সাথে সাথে প্রমাণাদির মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতাও ফুটিয়ে তুলেছেন। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহর প্রতি কাফেরদের বিশ্বাস স্থাপন করা ও মহানবী ﷺ -এর অনুগত্য মেনে নেওয়া, কিন্তু ঐ হতভাগাদের নিকট আল্লাহর আহবান নিরর্থক ছিল। ফলে তারা ঈমান তো আনয়ন করেইনি বরং উদ্যত ভরে নবীকে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতদের ঘটনা কাহিনী আকারে বর্ণনা করে এদিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা নবীর প্রতি অসদাচরণের কারণে তারা যে ভয়াবহ শাস্তির মুখে পড়েছিল, যদি তোমরা মহানবী ﷺ -এর সাথে অনুরূপ অশোভন আচরণ কর তবে তোমাদের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় ভয়ানক শাস্তি।

অপরদিকে মহানবী ﷺ-কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি মক্কার কাফেরদের যে অশোভন আচরণ এটা কোনো নতুন কিছু নয়। আপনার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের সাথেও এরূপ জঘন্য আচরণ করা হয়েছিল। কাজেই আপনার ব্যথিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এ ছাড়াও উপমা বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ও মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার, মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। যার ফলে তারা পূর্বোক্ত কাহিনী দেখে মুক্তি পাবার আশায় ঈমান গ্রহণ করতে পারে। –[ইবনে কাছীর]

اَلْقَرْيَةَ এবং مُرْسَلُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ ও তাদের মর্যাদা : উল্লিখিত আয়াতে اَلْقَرْيَةَ দ্বারা কোন জনপদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর বিশদ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবার ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) প্রমুখগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, উক্ত জনপদের নাম এন্তাকিয়া। এটাকেই জমহুর মুফাসসিরগণ গ্রহণ করেছেন।

আবূ হাইয়ান ও ইবনে কাছীর (র.) বর্ণনা করেন যে, কোনো মুফাসসিরই উপরিউক্ত অভিমতে, বিরোধিতা করেননি। মা'জামুল বুলদান নামক কিতাবে রয়েছে যে, এন্তাকিয়া হচ্ছে সিরিয়ার একটি বড় শহর। হাবীবে নাজ্জারের মাজারও এই এন্তাকিয়ায় অবস্থিত।

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে লিখেছেন যে, কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্য উক্ত শহর নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। কুরআনে যেহেতু এটাকে অস্পষ্ট রেখেছে কাজেই সেভাবেই রেখে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনের বক্তব্য হচ্ছে– اِبْهَمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ যা অস্পষ্ট রেখেছেন তোমরাও তা অস্পষ্ট রাখ।

اَلْمُرْسَلُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : পবিত্র কুরআনে مُرْسَلٌ এবং রাসূল সাধারণত আল্লাহর নবী ও পয়গম্বরগণকে বলা হয়েছে। এ আয়াতে বর্ণিত ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রেরণের নিসবত নিজের দিকে করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নবী বা রাসূল ছিলেন। ইবনে ইসহাক, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার (র.) এবং ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা রাসূল (পয়গম্বর) ছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এখানে مُرْسَلُوْنَ শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে তথা দূত-এ ব্যবহৃত হয়েছে। এরা তিনজনের কেউই পয়গম্বর ছিলেন না। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী ছিলেন। তিনি তাদেরকে এন্তাকিয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আর যেহেতু এ প্রেরণ করা আল্লাহর নির্দেশে ছিল তাই কুরআনে প্রেরণের নিসবত আল্লাহর দিকে করা হয়েছে।

তাঁদের নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বর্ণনানুপাতে তাঁদের নাম হলো– ১. সাদেক, ২. সাদুক, ৩. সালুম এক বর্ণনায় তৃতীয়জনের নাম শামউন এসেছে। অন্য এক বর্ণনায় তাদের নাম বলা হয়েছে– ১. ইউহান্না, ২. বুলিস, ৩. শামউন। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, মা'আরিফ]

তাঁদের মর্যাদা : হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে এন্তাকিয়া নগরীতে প্রেরণ করেছিলেন। আর এ কারণের তাদের প্রেরণের নিসবত স্বয়ং আল্লাহ নিজের দিকেই করেছেন। কাজেই বুঝা গেল যে, তাঁদের মর্যাদা নবীগণের মর্যাদার মতোই হতে পারে।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الخ কালামটি যে ফিকহী মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করে : কুরআনের এ বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিকহী মাসআলাকে শামিল করে, তা হলো– وَكِيْلُ الْوَكِيْلِ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ وَكِيْلُ الْمُوَكِّلِ لَا وَكِيْلَ حَتّٰى لَا يَنْعَزِلَ بِعَزْلِ الْوَكِيْلِ إِيَّاهُ يَنْعَزِلُ إِذْ أَعْزَلَهُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ. অর্থাৎ উকিলের উকিল যদি মুয়াক্কিলের অনুমতিক্রমে নিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে প্রথম মুয়াক্কিলের উকিল উকিল নয়। এমনকি ঐ নিযুক্ত করা উকিল দ্বিতীয় উকিলের বরখাস্তের মাধ্যমে বরখাস্ত হবে না। প্রথম মুয়াক্কিল বরখাস্ত করলেই বরখাস্ত হবে।

আল্লাহর বাণী فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ-এর মধ্যে ثَالِثٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : অত্র আয়াতে ثَالِثٌ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

১. এখানে ثَالِثٌ দ্বারা হযরত শামউনকে বুঝানো হয়েছে। এন্তাকিয়াবাসী কর্তৃক প্রথম দুজন বন্দি হলে তাদের সাহায্যার্থে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

২. কারো কারো মতে, এখানে ثَالِثٌ দ্বারা হাবীবে নাজ্জার উদ্দেশ্য। তিনি দূতদ্বয়ের আহ্বানে তাওহীদে দীক্ষিত হয়ে তাদেরকে দাওয়াতি মিশনে সহযোগিতা করেন।

৩. কারো কারো মতে, তিনি হচ্ছেন শামউনে সখর, যিনি হযরত ঈসা (আ.) অন্তর্ধানের পর হাওয়ারীদের আমির নিযুক্ত হন।

৪. কারো কারো মতে, ثَالِثٌ দ্বারা এন্তাকিয়ার বাদশাহ উদ্দেশ্য, যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন। –[রুহুল বয়ান]

কাফেরদের নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পদ্ধতি : রাসূলগণকে নানা টালবাহানা ও অনর্থক অজুহাত তুলে যুগে যুগে কাফেররা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নবীগণের দাওয়াতি জিন্দেগী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে কাফেররা একই অজুহাত বারবার তুলে ধরেছে। আর তাদের সেই অজুহাতগুলো হলো– রাসূল তো তাদের মতোই একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। সে কি করে তাদের পথ প্রদর্শক হতে পারে?

হযরত নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত দিয়েছিল তখন তারা প্রতিউত্তরে বলেছিল– مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ أَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ অর্থাৎ এ লোকতো তোমাদের ন্যায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের উপর সে মর্যাদাশীল হতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো ফেরেশতাই অবতীর্ণ করতে পারতেন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে তো আমরা এরূপ কিছু শ্রবণ করিনি।

হযরত হূদ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিলেন তখন তারা বলেছিল– مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ অর্থাৎ এ লোকটি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তাই খায়। আর তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের অনুগত্য কর; তবে নিশ্চিতই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

হযরত সালিহ (আ.)-এর দাওয়াতের জবাবে তাঁর জাতি বলেছিল– اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ অর্থাৎ আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষের আনুগত্য করব?

তাদের জবাবে রাসূলগণ বলেন– اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ আমরা যদিও তোমাদের মতোই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন।

উপরিউক্ত চিন্তা চেতনার ফলেই আল্লাহর পক্ষ হতে যুগে যুগে নেমে এসেছিল আজাব ও গজব। ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ . ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا . فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا .

অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি পূর্বেকার কাফেরদের সংবাদ পৌঁছেনি। কাজেই তারা তাদের কৃত কর্মের (পাপের) স্বাদ ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর তা এ জন্য যে, তাদের নিকট রাসূলগণ প্রমাণাদিসহ আসতেন। অথচ তারা বলত, একজন মানুষই কি আমাদেরকে হেদায়েত করবে? ফলে তারা কুফরি পছন্দ করল এবং সত্য বিমুখ হয়ে পড়ল।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন– وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا অর্থাৎ হেদায়েত আসার পর লোকজনদের ঈমান আনয়ন করতে এটাই বাধা হয়ে দাড়িয়েছে যে, তারা বলল– আল্লাহ কি মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠালেন।

মহান রাব্বুল আলামীন তাদের ভ্রান্ত উক্তি খণ্ডন করত: ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র মানুষই রাসূল হতে পারে; অন্য কেউ নয়। ফেরেশতা বা কোনো অলৌকিক সত্তা মানুষের হেদায়েতের ভারপ্রাপ্ত রাসূল হতে পারে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰۤئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا .

অর্থাৎ হে নবী আপনি বিরোধীদেরকে বলে দিন যে, যদি ফেরেশতাগণ নির্বিঘ্নে জমিনে চলাফেরা করতেন তবে আমি অবশ্যই তাদের নিকট ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম।

মক্কার কাফেরগণও মহানবী ﷺ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তি নকল করে বলেন– وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ অর্থাৎ আর তারা (মক্কার কাফিররা) বলত ইনি কেমন রাসূল তিনি খাবারও গ্রহণ করেন এবং বাজারেও চলাফেরা করেন। অন্য আয়াতে এসেছে–

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ .

অর্থাৎ আর জালিমরা [কাফিররা] চুপিসারে বলে, এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা দেখে শুনে কি যাদুতে জড়িয়ে পড়বে।

সারকথা হলো, এটা মানুষেরও একটি চিরাচরিত অভ্যাস হয়ে রয়েছে; বারংবার কুরআনে এটাই বলা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে এটা মহানবী ﷺ -এর জন্য সান্ত্বনাও ছিল।

মুফাসসির তার বক্তব্য جَارِىْ مَجْرَى الْقَسَمِ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং এতে ফায়দা কি? জালালাইনের মুসান্নেফ (র.) এখানে جَارِىْ مَجْرَى الْقَسَمِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَبُّنَا يَعْلَمُ الخ দ্বারা রাসূলগণ তাদের বক্তব্যের উপর জোর প্রদান করেছেন। এ ছাড়া এর জবাব এভাবে প্রদান করা হয়েছে যেভাবে কসমে জবাব দেওয়া হয়। এ জন্যই তিনি رَبُّنَا يَعْلَمُ আয়াতাংশটি শপথের জবাব বলেছেন।

رَبُّنَا يَعْلَمُ বাক্যটিকে শপথের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হলে পরবর্তী বাক্যটিকে শপথের জবাব হিসেবে গণ্য করা যাবে। আর তাতে এর মধ্যে তাকিদ সৃষ্টি হবে। উক্ত তাকিদ অন্যান্য তাকিদের সাথে মিলে বাক্যটি কাফেরদের উক্তির যথাযথ জবাবের রূপ লাভ করবে।

মহানবী ﷺ বাদশাহদের নিকট দীনের দাওয়াত নিয়ে একজন প্রেরণ করেছেন। অথচ হযরত ঈসা (আ.) দুজন দূত পাঠালেন এর হেকমত কি? ইমাম রাযী (র.) আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর বলেন যে, মহানবী ﷺ দীনের শাখা-প্রশাখার দাওয়াত নিয়ে দূত পাঠিয়েছেন। আর এ জন্য একজনের সংবাদই যথেষ্ট ছিল। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.) উক্ত দূতগণকে দীনের মৌলিক বিষয়ের দাওয়াতসহ পাঠিয়েছিলেন এ জন্য একাদিক লোকের প্রয়োজন ছিল। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ যে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাও তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।

আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে এটাও বলা যায় যে, মহানবী ﷺ একজন দূতের সাথে তার সিলমোহরসহ পত্রও পাঠিয়েছিলেন, তাই একজনই যথেষ্ট ছিল। এ ছাড়াও ইতঃপূর্বে ইজমালীভাবে মহানবী ﷺ -এর দাওয়াত সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আর করীনা পাওয়া গেলে একজনের খবরও একীনের স্তরে পৌঁছতে পারে।

"وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ" -এর তাৎপর্য : রাসূলগণের উপর আল্লাহ তা'আলার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাসাধ্য পালনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ, যুক্তি ও আল্লাহ প্রদত্ত মোজেজার মাধ্যমে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন। রাসূল খুবই সচেতনতার সাথে তাদের সম্মুখে অকাট্য দলিল পেশ করেছেন। মু'জিযা দ্বারা কাফির মুশরিকদেরকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের কিছু হয়নি। উপরন্তু এসব স্পষ্ট নিদর্শনসমূহকে তারা জাদু-মন্ত্র বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে রাসূলগণ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমাদের দায়িত্ব তো কেবলমাত্র তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে খোদায়ী বিধান পৌঁছে দেওয়া। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। তোমরা তা অমান্য করলে আমাদের কিছুই করার নেই। জোর করে তোমাদেরকে আনুগত্য স্বীকার করানো আমাদের দায়িত্ব নয়।

مُبِيْنٌ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ : مُبِيْنٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ এর সীগাহ, বাবে اِفْعَالٌ অর্থ হচ্ছে– স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুফাসসিরগণ কয়েকভাবে এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।

- সুস্পষ্টভাবে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেওয়া।
- সত্যের দাওয়াত সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া।
- হকের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। সত্যকে গ্রহণ না করলে বিরোধীদের বিনাশ সাধন করা।

অনুবাদ :

১৮. قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا تَشَاءَمْنَا بِكُمْ لِانْقِطَاعِ الْمَطَرِ عَنَّا بِسَبَبِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ بِالْحِجَارَةِ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُّؤْلِمٌ.

১৮. তারা বলল, আমরা অকল্যাণ মনে করি কুলক্ষণ মনে করি তোমাদের কারণে কেননা তোমাদের কারণে আমাদের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কসমের লাম তোমরা বিরত না হও তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো পাথর দ্বারা আর আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি ভীষণ পীড়াদায়ক শাস্তি আপতিত হবে اَلِيْمٌ শব্দটি مُؤْلِمٌ অর্থে অর্থ- কষ্টদায়ক

১৯. قَالُوْا طَائِرُكُمْ شُؤْمُكُمْ مَّعَكُمْ ءَ اَئِنْ هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٍ دَخَلَتْ عَلٰى اِنِ الشَّرْطِيَّةِ وَفِيْ هَمْزَتِهَا التَّحْقِيْقُ وَالتَّسْهِيْلُ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ الْاُخْرٰى ذُكِّرْتُمْ ط وُعِظْتُمْ وَخُوِّفْتُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَىْ تَطَيَّرْتُمْ وَكَفَرْتُمْ وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ مُتَجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ بِشِرْكِكُمْ.

১৯. দূতগণ বললেন, তোমাদের অমঙ্গল অলক্ষুণে তোমাদের সাথে। যদি এখানে হামযাটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ যা اِنِ الشَّرْطِيَّةُ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে আর উক্ত হামযাকে অপরিবর্তিত রেখে পড়া যায়, তাসহীল (সহজ) করে পড়া যায় এবং তার ও অপর হামযার মাঝে উভয় অবস্থায় [তাহকীক ও তাসহীল] একটি আলিফ বৃদ্ধি করেও পড়া যায়। তোমাদেরকে নসিহত করা হয় তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয় ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তবে কি তোমরা দুর্ভাগ্য মনে করবে এবং কুফরি করবে। শর্তের জবাব প্রশ্নবোধক অবস্থায় , আর এর দ্বারা তিরস্কার করা উদ্দেশ্য। বরং তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের শিরকের কারণে সীমা অতিক্রমকারী।

২০. وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ هُوَ حَبِيْبُ النَّجَّارُ كَانَ قَدْ اٰمَنَ بِالرُّسُلِ وَمَنْزِلُهٗ بِاَقْصَى الْبَلَدِ يَّسْعٰى ز يَشْتَدُّ عَدْوًا لَمَّا سَمِعَ بِتَكْذِيْبِ الْقَوْمِ الرُّسُلَ قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ.

২০. আর নগরীর উপকণ্ঠ হতে এক ব্যক্তি আগমন করল তিনি হাবীবে নাজ্জার ছিলেন। তিনি দূতগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন আর শহরের সীমান্ত এলাকায় তার বাড়ি ছিল। দৌড়ে দ্রুতবেগে ছুটে। যখন শুনতে পেলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা দূতগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ করো।

২১. اِتَّبِعُوْا تَاكِيْدٌ لِلْاَوَّلِ مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا عَلٰى رِسَالَتِهٖ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ فَقِيْلَ لَهٗ اَنْتَ عَلٰى دِيْنِهِمْ.

২১. তোমরা অনুসরণ করো এটা প্রথমোক্ত اِتَّبِعُوْا -এর তাকিদ। এমন লোকদের যারা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চান না। রিসালতের বিনিময়। আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত তখন তাকে বলা হলো তুমি তাদের [রাসূলগণের] দীনের অনুসারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَالُوْا طَائِرُكُمْ -এর মধ্যস্থিত طَائِرُكُمْ -এর বিভিন্ন কেরাত : এ আয়াতে তিনটি কেরাত রয়েছে–

১. মাসহাফে ওসমানীতে طَائِرُكُمْ রয়েছে।

২. কোনো কোনো কারী طَيْرُكُمْ পড়েছেন। তখন অর্থ হবে–

سَبَبُ شُؤْمِكُمْ مَعَكُمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ اَوْ اَسْبَابُ شُؤْمِكُمْ مَعَكُمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ وَمَعَاصِيْهِمْ .

অর্থাৎ তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদের সাথেই বিরাজমান রয়েছে। আর তা হলো তাদের কুফর। অথবা তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদের নিজেদের সাথেই বিরাজমান রয়েছে। তা হলো তাদের কুফর ও নাফরমানি।

৩. হযরত হাসান (র.)-এর মতে কেরাত হবে اَطَّيَّرُكُمْ অর্থাৎ تَطَيُّرُكُمْ তখন অর্থ হবে– তোমাদের নিজেদের কর্মফলের কারণেই তোমাদের দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া।

اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ -এর মধ্যস্থ اَئِنْ -এর কেরাতসমূহ : এ আয়াতে বর্ণিত اَئِنْ -এর দু'টি হামযার মধ্যে মোট চারটি কেরাত রয়েছে–

১. উভয় হামযাহ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে তথা হামযা দু'টি স্ব-স্ব মাখরাজ হতে অবিকৃত অবস্থায় উচ্চারিত হবে।

২. শর্তের হামযাকে তাসহীল তথা সহজ করে পড়া।

৩. শর্তের ও ইস্তেফহামের হামযা উভয়টিকে অপরিবর্তিত রেখে এদের মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া।

৪. শর্তের হামযাটিকে তাসহীল করে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া।

আল্লাহর বাণী اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ -এর মধ্যে নাহবী মতপার্থক্য : এ আয়াতে شَرْط এবং اِسْتِفْهَام -এর হামযা একত্রিত হওয়ায় নাহবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

✪ ইমাম সীবওয়াইহ (র.)-এর মতে, شَرْط এবং اِسْتِفْهَام যদি একত্রিত হয়, তবে اِسْتِفْهَام -এর জবাব দেওয়া হয়। তাই তাঁর নিকট বাক্যটি হবে– اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ تَطَيَّرْتُمْ -

✪ ইউনুস নাহবিদের মতে, شَرْط এবং اِسْتِفْهَام একত্রিত হলে শর্তের জবাব দেওয়া হয়। তখন বাক্যটি এরূপ হবে– اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ تَطَيَّرُوْنَ [জযমের সাথে]।

يَسْعٰى -এর মহল্লে ই'রাব এবং اَلسَّعْىُ -এর অর্থ : يَسْعٰى শব্দটি জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে পূর্ববর্তী رَجُلٌ হতে হাল হয়েছে তাই এটা মহল্লে নসবে হয়েছে।

سَعْى শব্দের অর্থ– দ্রুত চলা, তাফসীর রুহুল বয়ানে এর অর্থ বলা হয়েছে– اَلسَّعْىُ اَلْمَشْىُ السَّرِيْعُ وَهُوَ دُوْنَ الْعَدْوِ অর্থাৎ সায়ী অর্থ হলো দ্রুত চলা। আর তা দৌড়ানো হতে নিম্নস্তরের, তবে এখানে يَسْعٰى -এর উল্লেখ দ্বারা সৎকাজের সহযোগিতায় দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَطَيُّرٌ -এর অর্থ ও تَطَيُّرٌ এবং تَفَاؤُلٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : اَلتَّطَيُّرُ -এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে অশুভ মনে করা। এ শব্দটি طَيْرٌ (পাখি) হতে নির্গত। বর্ণিত আছে তৎকালে মক্কার লোকেরা সফরে বের হওয়ার প্রাক্কালে একটি পাখি উড়িয়ে দিত। যদি পাখিটি ডান দিকে চলে যেত তবে তারা তাদের মঙ্গলজনক মনে করে সফরে বের হয়ে যেত। আর যদি পাখিটি বাম দিকে যেত তবে তারা এটাকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করত ফলে তারা এ সফরে বের হতে বিলম্ব করত। পরবর্তীতে এ শব্দটি শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

اَلتَّفَاؤُلُ -এর অর্থ হচ্ছে– طَرِيْقُ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা পোষণ পদ্ধতি। কথিত আছে যে, মহানবী ﷺ মদীনায় হিজরত করার জন্য বের হলে পথিমধ্যে বুরাইদ ইবনে আসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন মহানবী ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন যে, برد امرنا অর্থাৎ আমাদের অভিপ্রায় সহজে অর্জিত হবে।

تَفَاؤُلٌ জায়েজ তবে تَطَيُّرٌ মাকরূহ বা হারাম। রাসূল ﷺ تَطَيُّرٌ অপছন্দ করতেন এবং تَفَاؤُلٌ -কে পছন্দ করতেন হাদীসে আছে كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْفَالَ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ অর্থাৎ রাসূল ﷺ اَلْفَالَ -কে ভালবাসতেন আর اَلطِّيَرَةَ -কে অপছন্দ করতেন।

কাফেরদের اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ বলার কারণ : উক্ত দূতগণের দাওয়াত এন্তাকিয়াবাসীগণ শুনেওনি এবং গ্রহণও করেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ না করার ফলে তাদের সেই জনপদে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর বস্তিবাসী এ জন্য রাসূলগণকে অলক্ষুণে বলেছিল। অথবা তারা অন্য কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকবে।

এ ছাড়াও তাদের রাসূলগণকে অলক্ষুণে বলার কারণ এটাও হতে পারে যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল। ফলে অন্যান্যদের সাথে তাদের মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই তা এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করে।

মোটকথা হলো, যুগে যুগে কাফেরদের উপর যখনই কোনো আজাব নেমে আসত তখনই তারা এটাকে রাসূলগণ কিংবা সৎ লোকদের দিকে নিবসত করে দিত। আর এ ধারায়-ই এন্তাকিয়াবাসীগণ রাসূলদের দিকে অলক্ষুণের নিসবত করে দিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ যখন তাদের নিকট কোনো কল্যাণ আসত তারা বলত এটা আমাদের কারণে হয়েছে। আর যখন তারা কোনো অনিষ্টতার মুখোমুখি হতো, তখন মূসা ও তার সঙ্গীসাথীদের উপর দোষারোপ করত।

হযরত সালিহ (আ.)-এর ছামূদ সম্প্রদায় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিল– تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ অর্থ– তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে আমরা অশুভ মনে করি।

কাজেই তাদেরকে طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ (তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে) বলে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, এ বিপদ ও বিপর্যয় তোমাদের অপকর্ম ও রাসূলগণের অবাধ্য হওয়ারই ফসল।

শহরের সীমান্ত হতে আগত ব্যক্তির ঘটনা : শহরের সীমান্ত এলাকা হতে আগত ব্যক্তিটির পরিচিতি কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার (র.) ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি নাজ্জার বা কাঠ মিস্ত্রী ছিলেন। এ ব্যক্তি মহানবী ﷺ -এর উপর [হুযূরের আগমনের ছয় শত বছর পূর্বে] ঈমান এনেছিলেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ : এ ব্যক্তি ছিলেন হাবীবে নাজ্জার, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেকার ব্যক্তি, শহরের এক প্রান্তে নির্জনে থেকে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। রাসূলগণের সঙ্গে কাফেরদের দুর্ব্যবহার দেখে তিনি নীরব থাকতে পারলেন না, তাই তাঁদের সাহায্যে ছুটে আসেন এবং তাঁদের অনুসরণের জন্যে তার সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন–

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

'তোমরা অনুসরণ কর এমন লোকের, যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা হেদায়েত প্রাপ্ত', যারা সঠিক পথের দিশারী।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, হাবীব রেশমী বস্ত্র তৈরি করতেন।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, পেশায় তিনি ছিলেন একজন ধোপা। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। এ জন্য শহরের শেষ প্রান্তে তিনি বসবাস করতেন। একজন দানশীল মর্দে মু'মিন ছিলেন তিনি। তাঁর পুরো দিনের রোজগারের এক ভাগ আল্লাহর রাহে দান করতেন, অন্যভাগ আপনজনদের মাঝে ব্যয় করতেন। তিনি যখন এ দুঃসংবাদ পেলেন যে, দুরাত্মা কাফেররা রাসূলগণকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তখন তিনি ছুটে আসলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে রাসূলগণের অনুসরণ করার এবং অন্যায় পথ পরিহার করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৬]

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, হাবীব সত্তর বছর ধরে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাঁর কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য সে এগুলোর কাছে মিনতি জানিয়েছে। যখন রাসূলগণ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদের নিকট কোনো নিদর্শন রয়েছে কি?' তখন তারা হাবীবের জন্যে দোয়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার তাঁকে আরোগ্য দান করলেন আর এভাবে তাঁর ঈমান লাভের তৌফিক হয়। যখন তিনি রাসূলগণের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন, তখন ছুটে এসে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠা-২২৫]

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, সিরিয়ার 'এন্তাকিয়া' নামক জনপদে যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত রসূলগণ তৌহীদের পয়গাম নিয়ে পৌঁছেন তখন ঐ জনপদবাসী তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁদেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ সংবাদ পেয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন মর্দে কামিল দ্রুত তাদের নিকট ছুটে আসেন এবং তাদেরকে বলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ কর, তাঁরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চায়না অথচ তাঁরা হেদায়েত প্রাপ্ত, তাঁরা তোমাদের কল্যাণকামী, তাঁরা তোমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিতে এসেছেন'। তিনি ছিলেন হাবীব নাজ্জার। তখন তাঁর জাতি তাঁকে বলে, 'এ ব্যক্তি আমাদের ধর্মের বিরোধী হয়ে পড়েছে, এ রাসূলগণের অনুসারী হয়েছে। এ রাসূলগণ যাঁর বন্দেগি করতে বলে এ ব্যক্তিও তাই বলে'।

কাফেরদের এ কথার জবাবে হাবীব নাজ্জার যা বলেছিলেন এ আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا لِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

অর্থাৎ আমার কি হয়েছে যে, আমি সে পবিত্র মহান সত্তার বন্দেগি করব না, যিনি আমাকে এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, শুধু তাই নয়, বরং অবশেষে তোমাদের আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। এমন অবস্থায় আমি তাঁর বন্দেগী করব না, তবে কার বন্দেগী করব? যাঁর করুণায় ধন্য হয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব লাভ করেছি, অহরহ যাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামত আমরা ভোগ করে চলেছি, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।

হাবীবে নাজ্জার এভাবে তাঁর জাতিকে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর কথার বর্ণনা-ভঙ্গি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নিজেকে নসিহত করার ভাষায় তিনি অন্যদেরকে নসিহত করেছেন।

ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতিম তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হাবীব নাজ্জার একটি গর্তের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। রাসূলগণের বিরুদ্ধে তাঁর জাতির ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত সেখানে হাজির হন এবং তাদেরকে এভাবে উপদেশ দান করেন। এর পাশাপাশি তাদের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাবীব যখন লোকদেরকে রাসূলগণের অনুসরণের আহ্বান জানান তখন লোকেরা তাঁকে পাকড়াও করে বাদশাহর নিকট নিয়ে যায়। বাদশাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি রাসূলগণের অনুসারী হয়েছ?' তখন তিনি বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে বলেন- وَمَا لِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করব না, তবে কার ইবাদত করব'? অথচ আমাদের এবং তোমাদের সকলকেই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে'।

-[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৭]

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী রাসূলগণের পর এমনি একটি দল রয়েছে, যারা সত্যের সন্ধান লাভ করেন, তাঁদের রসনায় কালিমায়ে হক্ব উচ্চারিত হয়, তাঁরা নবী রাসূলগণের অনুসরণ করে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন, আখেরাতে নবী রাসূলগণের পরে যে মর্তবা রয়েছে, তা তাঁদেরকেই দান করা হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৮৪]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা, মর্দে কামেল হাবীব নাজ্জার তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, শুধু তাই নয়; বরং আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এমন অবস্থায় আমি কি করে তাঁর ইবাদত না করে থাকি! তাঁর নিকট থেকে বিমুখ হয়ে জড় পদার্থের সম্মুখে মাতা নত করব? মানবতার এমন অবমাননা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۔

'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্য গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজেই আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না'।

বস্তুত যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি দয়াময়, করুণাময় তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অসহায়, অক্ষম জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করব? যারা এত অসহায় যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারই করতে পারবে না, কেননা উপকার বা অপকার করার কোনো শক্তিই তাদের মধ্যে নেই, এমন অবস্থায় আমি যদি তাদের সম্মুখে মাথা নত করি তবে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হব। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اِنِّيْۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ 'এমন অবস্থায় আমি স্পষ্টত পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হব'।

কোনো কোনো মুশরিক এ ধারণা পোষণ করে যে, এ মূর্তিরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করে তাদের পূজারীদের নাজাতের ব্যবস্থা করবে। পূর্ববর্তী আয়াতে এ ভুল ধারণার নিরসন করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মূর্তিরা কোনো প্রকার সুপারিশ করতে পারবে না, যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে আজাব দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এ মূর্তিরা সুপারিশ করে কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না। প্রথমত সুপারিশ করারই তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না, দ্বিতীয়ত তাদের কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, তৃতীয়ত তারা কোনো পূজারীকে বিপদ থেকে উদ্ধারও করতে পারবে না, এক কথায় এ মূর্তিরা তাদের পূজারীদের কোনো উপকার সাধনেই সক্ষম হবে না। এমন অবস্থায় এ অসহায় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত করা পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ পথভ্রষ্টতাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কারো নিকট তা গোপন নয়।

اِنِّيْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۔ এরপর হাবীবে নাজ্জার সকলের সম্মুখে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, জেনে রাখ, নিশ্চয় আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার এ কথা শুনে রাখ'।

এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ঐ নেককার ব্যক্তি তাঁর জাতির ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে রসূলগণকে সাক্ষী করে বললেন, 'আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছি'।

দুই. অথবা, তিনি তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে বললেন, 'তোমরা শুনে রাখ, তোমরা মান বা না মান, আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছি, যিনি তোমাদের প্রতিপালক'। এভাবে তিনি তাঁর জাতিকে ঈমান আনয়নে অনুপ্রাণিত করলেন। আর পূর্বোক্ত অর্থে রাসূলগণকে তাঁর ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষী করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হাবীবে নাজ্জার একথাটুকু বলতে পেরেছিলেন, এরই মধ্যে দুরাত্মা কাফেররা তাঁকে প্রহার করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তাঁকে ধরাশায়ী করে পদদলিত করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, তাঁকে এত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় যে, তাঁর নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বের হয়ে গিয়েছিল।

আর তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, কাফেররা তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে, আর ঐ অবস্থায়ও তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়েত কর'।

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তাঁর ঘাড় কর্তন করে শহরের ফটকের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর কবর এন্তাকিয়া শহরে রয়েছে

তাঁর শাহাদতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে- قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ 'তাঁকে বলা হয়, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর'। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়ার সকল দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নাজাত দিলেন এবং চিরশান্তির নীড় জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলেন, জান্নাতের দ্বার তাঁর জন্যে উন্মুক্ত করা হলো, তাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো, জান্নাতের অনন্ত অসীম নিয়ামত এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে যে কথাটি উচ্চারিত হয়, তা হলো তাঁর জাতির জন্যে আক্ষেপ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ . بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ

সে বলে উঠল, 'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'।

অর্থাৎ যে জাতি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাদের জন্যে তাঁর দরদের অন্ত ছিল না, তাই জান্নাতের নিয়ামত দেখে তিনি বলেছেন, 'যদি আমার জাতি জানত যে, কি কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে জান্নাতের এত অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, তাহলে তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনত এবং তাঁর রসূলগণের অনুসরণ করত'।

قَالُوْا طَائِرُكُمْ الخ -এর বিশদ ব্যাখ্যা : এন্তাকিয়াবাসীগণ রাসূলগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে বলল, তোমাদেরকে আমরা অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করছি। কারণ তোমাদের কারণেই আমাদের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমাদের মাঝে পরস্পর রক্তপাত ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে গেছে।

রাসূলগণ প্রতি উত্তরে বললেন, তোমাদের অশুভ ও অলক্ষুণ তোমাদের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে। তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করাই তো তোমাদের বিপদ ও ক্ষতির কারণ। যদি তোমরা সত্য গ্রহণে ঐকমত্য হতে তবে এ ধরনের বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হতো না এবং এ দুর্ভিক্ষও দেখা দিত না। তোমরা পূর্বে যে পৌত্তলিকতার উপর ঐকমত্য ছিলে তা এমন ঐক্য যা স্বয়ং বিপর্যয় ও বিনাশ আর তা বর্জন করা অপরিহার্য। আর তখন দুর্ভিক্ষ দেখা না দেওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে সুযোগ প্রদান উদ্দেশ্য ছিল।

অথবা তা এজন্য ছিল যে, তাদের নিকট তখনো পর্যন্ত সত্য প্রকাশিত হয়নি। আর আল্লাহর বিধান হচ্ছে কারো নিকট সত্যকে পরিস্ফুট না করে তাদেরকে শাস্তি দেন না।

আর সেই সুযোগ প্রদান করা বা সত্য প্রকাশিত না হওয়াও তোমাদেরই গাফিলতি, মূর্খতা ও কর্মের কুফল ছিল। এর দ্বারা জানা যায় যে, দুর্ভাগ্য ও অকল্যাণের কারণ সর্বাবস্থায়ই তোমাদের কর্ম ছিল।

তোমরা কি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদানকেই দুর্ভাগ্য হিসেবে গণ্য করতে চাও? অথচ এটা হলো সৌভাগ্যের বুনিয়াদ। মূলত শরিয়তের বিরোধিতা করার কারণেই তোমাদের উপর দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আর সকলের বিরোধিতার কারণে তোমরা এর কারণ নির্ণয়ে ভুল করে যাচ্ছ। মোট কথা হলো, তারা যে অজ্ঞ ও বিপথগামী ছিল তা তারা জানত না এবং জানার চেষ্টাও করত না। আর তাদের সীমা লঙ্ঘন ও সত্য গ্রহণ না করার এটাই মূল কারণ ছিল।

নববী দাওয়াত ও সংশোধন পদ্ধতি এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য বিশেষ হেদায়েত : এন্তাকিয়াবাসীদের নিকট প্রেরিত তিনজন দূত কাফিরদেরকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের নির্যাতন, হুমকি ধমকি ও অপপ্রচারের যেভাবে জবাব দিয়েছেন; তদ্রূপ তাদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী হাবীবে নাজ্জার নিজের জাতিকে যেভাবে যুক্তির নিরীখে মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করেছেন এতে দীনের দায়ীদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

রাসূলদের তাবলীগের জবাবে মুশরিকরা তিনটি বক্তব্য দিয়েছে।

১. তোমরা আমাদের মতোই মানুষ! আমরা তোমাদের আনুগত্য কেন করব?

২. মহান রাব্বুল আলামীন কারো উপর কোনো বিধান বা কোনো কিতাব অবতীর্ণ করেননি।

৩. তোমরা তো পূর্ণরূপেই মিথ্যুক।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রাসূলগণের নিঃস্বার্থ উপদেশের জবাবে তারা যে ধৃষ্টতাপূর্ণ উত্তর প্রদান করল এরপরও তাঁরা কত নরম সুরে বললেন– رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক জানেন নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটই প্রেরিত হয়েছি। আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আমরা নিরলসতাবে পালন করেছি। তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে খোদায়ী বিধান পৌছে দিয়েছি। মান্য করা না করা তোমাদের দায়িত্ব। তিরস্কারের কোনো পরোয়া নেই। কি স্নেহ মমতাপূর্ণ জবাব!

তখন এন্তাকিয়াবাসীগণ আরো দাম্ভিকতার সাথে বলল, তোমরা হতভাগা, অলক্ষুণে। তোমাদের কারণেই আজ আমরা মসিবতে নিপতিত। তোমাদের কারণেই আজ মহা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এত ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার পরও রাসূলগণ কতইনা ধৈর্যের সাথে এজমালীভাবে যা বললেন তাতে তাদের অলুক্ষণে হওয়াকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তারা বললেন– طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্ভোগ তোমাদের সাথেই রয়েছে। এরপর রাসূলগণ আরো একধাপ এগিয়ে দরদসহ বললেন যে, তোমরা ভেবে দেখ আমরা তোমাদের এমন কি ক্ষতি করেছি। আমরা তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে কল্যাণ ও মুক্তির উপদেশ দিচ্ছি মাত্র। তাদের কথার মধ্যে শুধু এতটুকুই রুক্ষ কথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তো কেবল সীমালঙ্ঘনকারী।

হাবীবে নাজ্জারের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য : রাসূলগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপনকারী হাবীবে নাজ্জার রাসূলগণের উপর নির্যাতনের খবর জানতে পেরে শহরের সীমান্ত হতে ছুটে এসে স্বীয় জাতিকে অত্যন্ত হিকমতের সাথে দু'টি উপদেশ প্রদান করলেন।

১. তোমরা ভেবে দেখ এ রাসূলগণ বহুদূর দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য এসেছেন। অথচ তারা তোমাদের নিকট কোনোরূপ বিনিময়ও চান না।

২. তারা যে বক্তব্য প্রদান করছেন তা সম্পূর্ণরূপে ইনসাফ ও হেদায়েতপূর্ণ কথা।

এরপর তিনি স্বীয় জাতিকে তাদের বিশ্বাস জনিত ভুল-ত্রুটিগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তোমরা তোমাদের মহান প্রভু আল্লাহকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া প্রতিমা পূজায় লিপ্ত রয়েছ। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ত্রাণকর্তা মনে করছ। এটাতো নিরেট মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা নিজেদেরই কোনো ভালো মন্দ করতে পারে না এবং তারা আল্লাহর সমীপে সুপারিশ করতেও সক্ষম হবে না। তারা কি করে সুপারিশ করবে? তারা নিজেরাই তো সেদিন আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে হাবীবে নাজ্জার এসব কথা বলার পর নিজেকে লক্ষ্য করে বললেন, এত কিছুর পরেও যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের উপাসনা না করি, তবে তো নিশ্চিতভাবেই আমি গভীর গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছি।

এত কিছুর পরও যখন তার সম্প্রদায় তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, তখন বদদোয়া না দিয়ে তিনি বললেন– رَبِّ اهْدِ قَوْمِيْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বজাতির এ সীমাহীন নির্যাতনের স্বীকার হয়ে শাহাদাত প্রাপ্ত লোকটি যখন সম্মান, পুরস্কার ও জান্নাতের অসীম নিয়ামত দেখতে পেলেন তখন তাঁর জালিম সম্প্রদায়ের কথা মনে করে অধীর হয়ে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা যদি আমার প্রাপ্ত পুরস্কার ও নিয়ামত দেখতে, পেতে এর কথা জানতে তবে নিশ্চিতই গোমরাহী ছেড়ে দিয়ে ঈমান গ্রহণ করত আমার এ প্রাপ্ত নিয়ামতে শরিক হতো।

সুবহানাল্লাহ্! কত আশ্চর্যের বিষয়, হাজারো অত্যাচারে পরও তার সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে কত বদ্ধমূল ছিল! এটা এমন বস্তু যা সম্প্রদায়ের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কুফর ও পথভ্রষ্টতা হতে বের করত সম্প্রদায়কে এমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যার কারণে ফেরেশতাগণও তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল।

শেষ কথা হলো, বর্তমানের দায়ী ও মুবাল্লিগণ যদি এভাবে ধৈর্যের সাথে দীনের কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন, তবে আজও পৃথিবীতে দীনের প্রসার তেমনিভাবে হবে। যেমনিভাবে নবী রাসূলগণের যুগে হয়েছিল। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সে দলের পথে চলার তৌফিক দান কর। আমীন।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ-এর মধ্যে رَجُلٌ-কে **নাকেরা নেওয়ার কারণ :** দুটি কারণে আয়াতে رَجُلٌ শব্দটিকে নাকেরা নেওয়া হয়েছে।

১. رَجُلٌ শব্দটিকে নাকেরা নেওয়ার মাধ্যমে লোকটির সম্মান ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

২. লোকটি রাসূলগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিল না এবং এ কাজের জন্য তাকে পূর্ব হতে নিযুক্তও করে রাখা হয়নি।

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ : তেইশতম পারা

٢٢. فَقَالَ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ خَلَقَنِيْ اَيْ لَا مَانِعَ لِيْ مِنْ عِبَادَتِهِ الْمَوْجُوْدُ مُقْتَضِيْهَا وَاَنْتُمْ كَذٰلِكَ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُجَازِيْكُمْ كَغَيْرِكُمْ.

অনুবাদ :

২২. তদুত্তরে তিনি বললেন, আমার কি হলো যে, যে সত্তা আমায় সৃষ্টি করলেন আমি তার উপাসনা করি না। আমাকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আমার সম্মুখে তার ইবাদত করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধক নেই; বরং ইবাদত করার যৌক্তিকতা প্রমাণকারী বস্তুসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। আর তোমাদেরও একই অবস্থা। আর তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে মৃত্যুর পর। অতঃপর অন্যান্যদের ন্যায় তোমাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া হবে।

٢٣. ءَاَتَّخِذُ فِيْ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِيْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ وَهُوَ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ مِنْ دُوْنِهِ اَيْ غَيْرِهِ اٰلِهَةً اَصْنَامًا اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ الَّتِيْ زَعَمْتُمُوْهَا شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ صِفَةُ اٰلِهَةً.

২৩. আমি কি গ্রহণ করবো? এখানে পূর্বে বর্ণিত ءَاَنْذَرْتَهُمْ -এর ন্যায় কেরাতগুলো প্রযোজ্য হবে। আর এটা اِسْتِفْهَام যা نَفِيٌّ -এর অর্থে হয়েছে। তিনি ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে দেবতাগুলোকে যদি দয়াময় আল্লাহ আমার ক্ষতিসাধন করতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনোই উপকারে আসবে না। যার ধারণা তোমরা করছ। কোনো কিছুই আর তারা আমায় রক্ষা করতেও সক্ষম হবে না। এটা اٰلِهَةً শব্দের সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٤. اِنِّيْٓ اِذًا اِنْ عَبَدْتُ غَيْرَ اللّٰهِ لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ.

২৪. এমতাবস্থায় আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি তবে সুনিশ্চিত বিভ্রান্তিতে পতিত হবো। প্রকাশ্য গোমরাহী।

٢٥. اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ اَيْ اِسْمَعُوْا قَوْلِيْ فَرَجَمُوْهُ فَمَاتَ.

২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কাজেই আমার কথা শোনো! তোমরা আমার কথা শ্রবণ করে তা মান্য করো। কিন্তু তারা সকলেই তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করল, ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

٢٦. قِيْلَ لَهٗ عِنْدَ مَوْتِهِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط وَقِيْلَ دَخَلَهَا حَيًّا قَالَ يَا حَرْفُ تَنْبِيْهٍ لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ.

২৬. বলা হলো তাকে তার মৃত্যুর সময় তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো কারো মতে তিনি জীবিতাবস্থায়ই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তিনি বললেন হায়! হরফে তাম্বীহ্ আফসোস যদি আমার সম্প্রদায় জানত!

٢٧. بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ بِغُفْرَانِهِ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

২৭. কি কারণে আমার প্রতিপালক আমায় ক্ষমা করলেন তাঁর করুণা ও ক্ষমা সম্পর্কে এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

২৮. وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ اَىْ حَبِيْبٍ مِنْ بَعْدِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ اَىْ مَلَاۤئِكَةٍ لِاِهْلَاكِهِمْ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ مَلَاۤئِكَةً لِاِهْلَاكِ اَحَدٍ .

২৮. আর আমি অবতীর্ণ করিনি এখানে مَا টি নেতিবাচক তার সম্প্রদায়ের উপর অর্থাৎ হাবীবে নাজ্জারের সম্প্রদায়ের উপর তার পরে তার মৃত্যুর পর আকাশ হতে কোনো সৈন্য ফেরেশতাদেরকে তাদের ধ্বংস করার জন্য আর আমার প্রেরণ করার প্রয়োজনও ছিল না। ফেরেশতাদেরকে কাউকেও ধ্বংস করার জন্য।

২৯. اِنْ مَا كَانَتْ عُقُوْبَتُهُمْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً صَاحَ بِهِمْ جِبْرَئِيْلُ فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ سَاكِتُوْنَ مَيِّتُوْنَ .

২৯. এটাতো ছিল তাদের শাস্তি এতভিন্ন ছিল না اِنْ টি নেতিবাচক। একটিমাত্র বিকট আওয়াজ যা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের উপর একটি বিকট আওয়াজ দিয়েছিলেন। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল নিস্তব্ধ ও মৃত হয়ে গেল।

তাহকীক ও তারকীব

আল্লাহ তা'আলার বাণী أَأَتَّخِذُ -এর বিভিন্ন কেরাত : أَأَتَّخِذُ -এর উভয় হামযা পড়ার ক্ষেত্রে ৬টি কেরাত রয়েছে।

১. উভয় হামযকে অপরিবর্তিত রেখে পড়া।

২. দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفْ -এর রূপ ধারণ করবে।

৩. দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল করে পড়া হবে।

৪. দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল করে উভয় হামযার মাঝে একটি اَلِفْ বাড়িয়ে পড়া।

৫. উভয় হামযাকে অপরিবর্তিত রেখে মাঝে একটি اَلِفْ বাড়িয়ে পড়া।

৬. উভয় হামযাকে উচ্চারণ না করে পূর্বের تُرْجَعُوْنَ -এর সাথে যুক্ত করে পড়া।

اِنْ يُّرِدْنِ الخ -এর মধ্যস্থ বিভিন্ন কেরাত : اِنْ يُّرِدْنِ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. يَاۤءِ مُتَكَلِّمْ -কে উহ্য রেখে اِنْ يُّرِدْنِ পাঠ করা।

২. يَاۤءِ مُتَكَلِّمْ -কে উল্লেখ করে اِنْ يُّرِدْنِىْ পাঠ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী صَيْحَةً -এর বিভিন্ন কেরাত : উল্লেখ্য যে صَيْحَةً -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. صَيْحَةً -কে মানসূব হিসেবে পড়া। ২. صَيْحَةٌ -কে মারফূ' হিসেবে পড়া।

وَلَا يُنْقِذُوْنَ -এর مَعْطُوْف কোনটি? : পবিত্র কুরআনের আয়াত لَا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ -এর মধ্যস্থ وَلَا يُنْقِذُوْنَ টি لَا تُغْنِ عَنِّىْ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর পূর্ণ বাক্যটি মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে جَزَاء হচ্ছে اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ -এর। কাজেই শব্দটি لَا يُنْقِذُوْنَ হবে যা মূলত لَا يُنْقِذُوْنَنِىْ ছিল جَمْع -এর نُوْن এবং يَاۤءِ مُتَكَلِّمْ পড়ে গেছে। বর্তমান অবস্থিত نُوْن টি হচ্ছে নূনে বিকায়া।

يَا لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ -এর তারকীব : এখানে يَا টি হলো حَرْف نِدَا. আর لَيْتَ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। আর মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে قَوْمِيْ اِسْمُ لَيْتَ আর يَعْلَمُوْنَ হলো خَبَر لَيْتَ এখন لَيْتَ তার اِسْم এবং خَبَر -কে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়ে মুনাদা। নেদা মুনাদা মিলে জুমলায়ে নেদাইয়্যাহ হয়েছে। আর এর জওয়াবে নেদা উহ্য রয়েছে তা হলো- يَكُوْنَ حَسَنًا

بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ -এর মুতা'আল্লাক : بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ এখানে جَار এবং مَجْرُوْر মিলে يَعْلَمُوْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। এরপর يَعْلَمُوْنَ -এর যমীর হলো ফায়েল। এখন ফে'ল ফায়েল ও مُتَعَلِّقْ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইবাদতের অর্থ ও আবিদের শ্রেণিবিভাগ : اَلْعِبَادَةُ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- غَايَةُ التَّذَلُّلِ তথা চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়া।

اَلْعِبَادَةُ **-এর পারিভাষিক অর্থ–** ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মানব জীবনে আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণ আনুগত্য করাকে ইবাদত বলে।

মনীষীগণ আবিদকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন–

- প্রথম শ্রেণির আবিদ হচ্ছেন– যারা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই তাঁর ইবাদত করে না; বরং আল্লাহ তা'আলাকে তাদের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত করেন। চাই তিনি তাঁদেরকে পুরস্কার দেন বা শাস্তি প্রদান করেন। এ দলটিকে এমন ভৃত্যের সাথে তুলনা করা যায় যে সর্বাবস্থায় মনিবের আনুগত্য করে; মনিব তার সাথে ভালো ব্যবহার করুক বা না করুক।
- দ্বিতীয় শ্রেণির আবিদ হচ্ছেন– যারা তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা প্রদানের কারণে তাঁর উপাসনা করেন।
- তৃতীয় শ্রেণির আবিদ হচ্ছেন– যারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর ইবাদত বন্দেগি করে।

এ আয়াতে হাবীবে নাজ্জারের উক্তি وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রথম শ্রেণির আবিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা তিনি আল্লাহকে তার স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত বন্দেগি করতেন।

–[তাফসীরে কাবীর]

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ **আয়াতের মর্মার্থ :** হাবীবে নাজ্জার আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শালীনতাপূর্ণ পদ্ধতিতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত আল্লাহ তা'আলা এটাকে প্রতীয়মান করত অবশেষে সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এটাকে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়টিকে নিজের দিকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, আল্লাহ আমায় সৃষ্টি করলেন তাঁর ইবাদত করতে আমার কি করে আপত্তি থাকতে পারে? এখানে ওজর করার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। কারণ সৃষ্টি করেছেন যিনি ইবাদতও পাবেন তিনি। তাই তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদত পেতে পারে না। কথাটিকে তিনি নিজের দিকে সম্বোধন করলেও সম্প্রদায়ের সকলকে যে এ একই পথ গ্রহণ করতে হবে তা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

এ ছাড়াও তিনি আয়াতটির শেষাংশে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের এ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের ভেবে দেখা দরকার যে মৃত্যুর পর তোমাদের মহা প্রভু আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন। কাজেই তোমাদের তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করা উচিত। তার এ পদ্ধতিতে দাওয়াত পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে– যাতে বিরোধীরা উত্তেজিত হয়ে না পড়ে এবং তারা উত্থাপিত বিষয়ে যেন ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে পারে।

أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً -এর মধ্যে প্রশ্নাকারে বক্তব্য উত্থাপনের কারণ কি? উল্লিখিত আয়াতে হাবীবে নাজ্জারের প্রশ্নাকারে বক্তব্য উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে– যদি প্রশ্ন না করে তিনি সোজা বলতেন যে لا اتخذ الخ অর্থাৎ আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানাব না, তবে প্রশ্ন করার অবকাশ থেকে যেত– কেন বানাবে না? এখন তার ব্যবহৃত পদ্ধতিতে বিরোধীদের পক্ষ হতে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপনের কোনোই অবকাশ রইল না।

সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে হাবীবে নাজ্জারের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি বিনে কেউ ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে না।

إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : বাতিল মাবুদদের অসারতার কথা বর্ণনা করে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মোটেই সেসব দেবদেবীর অর্চনা করা সমীচীন নয় যারা আল্লাহর নিকট কোনো অপরাধীর ব্যাপারে সুপারিশ করে তাকে মুক্ত করতে পারে না। অথবা তার এমন কোনো ক্ষমতাও নেই যার ফলে সে তাকে নিষ্কৃতি পাইয়ে দিবে। এরা না কারো উপকার করতে পারে না কারো অপকার সাধন করতে পারে। কাজেই এদের উপাসনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে চরম বোকামি আর কি হতে পারে?

আয়াতে إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّي না বলে بِرَبِّكُمْ কেন বললেন? আয়াতে দু'টি কারণে بِرَبِّي না বলে بِرَبِّكُمْ বলা হয়েছে।

- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো إِظْهَار حَقِيْقَت তথা বাস্তব বিষয়ের প্রকাশ করা। যদিও তারা তা সমর্থন করে না।
- হাবীবে নাজ্জার উক্ত বক্তব্যের দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন যে, যে আল্লাহর প্রতি আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান করছি তিনি যেরূপে আমার প্রতিপালক অনুরূপভাবে তোমাদেরও প্রতিপালক। কাজেই তোমাদেরও আমার ন্যায় তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। দাওয়াতি পদ্ধতির এটা একটি বিশেষ কৌশল।

আয়াতে فَاسْمَعُوْنِ বলে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ আয়াতে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ হতে একাধিক মতামত রয়েছে।

- কতিপয় তাফসীরকারকের মতে, অত্র আয়াত দ্বারা রাসূলগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। যখন হাবীবে নাজ্জার দেখল যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা তার উপদেশ বাণী গ্রহণ তো দূরের কথা উল্টো তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি রাসূলগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা শুনে রাখুন! আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তার একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– রাসূলগণ যেন দরবারে ইলাহীতে তার ঈমান আনয়নের সাক্ষ্য প্রদান করেন।
- কারো কারো মতে, এ আয়াতে হাবীবে নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন। তিনি তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি এ কারণে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। হাবীবে নাজ্জার যখন নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, তার স্বজাতি তাকে হত্যা করবেই তখন তিনি তাঁর ঈমান গ্রহণের কথা সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। –[মা'আরিফ, ইবনে কাছীর, কাবীর]

হাবীবে নাজ্জারকে কখন বলা হলো যে, 'তুমি বেহেশতে প্রবেশ করো'? হাবীবে নাজ্জারকে কখন বলা হয়েছিল যে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ করো? এ নিয়ে মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ–

- জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলার অর্থ হলো তাকে সুসংবাদ দেওয়া যে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে, যথা সময়ে তা প্রাপ্ত হবে।

অথবা এমনও হতে পারে যে, মৃত্যুর পরপরই তার স্থান বেহেশতে দেখানো হয়েছে। এছাড়া আলমে বরযখে জান্নাতীগণ জান্নাতের আপ্যায়ন পেয়ে থাকেন। কাজেই তার বরযখে পৌঁছা এক হিসেবে জান্নাতে পৌঁছারই নামান্তর।

এ আয়াতে اُدْخُلِ الْجَنَّةَ [অর্থাৎ 'জান্নাতে প্রবেশ কর' উক্তি দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, হাবীবে নাজ্জারকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ বেহেশতে প্রবেশ করা কিংবা জান্নাতের আলামত পরিলক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র মৃত্যুর পরেই হওয়া সম্ভব।

✪ কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, জীবিত অবস্থায়ই হাবীবে নাজ্জারকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে শহীদ করতে দৃঢ় মনস্থ হলো তখন দয়াময় আল্লাহ তাকে নিজ কুদরতে জান্নাতে উঠিয়ে নিলেন।

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ আয়াতে আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত : تَمَنِّيْ আয়াতে يَا لَيْتَ قَوْمِيْ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে-

১. আফসোস করে হাবীবে নাজ্জার বলেছেন- يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ "হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত"। তার এ হায় বা আকাঙ্ক্ষাসূচক শব্দের অর্থ হলো- তিনি চেয়েছেন যে তাঁর জাতি তার এ শুভ পরিণতির কথা তথা জান্নাতে প্রবেশ ও অফুরন্ত মর্যাদা লাভের কথা যদি জানতো, তারা তার সৎ ইচ্ছা ও সৎ আকাঙ্ক্ষার কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরে লজ্জিত হতো।

২. কতিপয় তাফসীর কারকের মতে হাবীবে নাজ্জারের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার জাতি তার অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিক যাতে তারা তাঁর মতোই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাদের অবস্থাকেও অনুরূপ বানিয়ে নেয় এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে যেন তারা প্রবেশ করতে পারে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আল্লাহর বাণী بِمَا غَفَرَلِيْ -এর মধ্যস্থ مَا -এর অর্থ : আলোচ্য আয়াতে مَا -এর অর্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

✪ একদল মুফাসসিরের মতে, উক্ত مَا মাসদারের অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- আমার প্রভুর আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া।

✪ কারো কারো মতে, এখানে مَا টি মওসূলের অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ দাড়ায় بِالَّذِيْ غَفَرَهُ لِيْ رَبِّيْ অর্থাৎ সেই বস্তুর বদৌলতে আমার প্রভু আমায় ক্ষমা করেছেন।

✪ ফাররা নাহবীর মতে, এখানে مَا টি اِسْتِفْهَامْ -এর জন্য হয়ে تَعَجُّبْ -এর অর্থ প্রদান করেছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- بِاَيِّ شَيْئٍ غَفَرَلِيْ رَبِّيْ কোন জিনিসের বিনিময়ে আমার প্রভু আমায় ক্ষমা করে দিলেন।

তবে নাহবী কেসায়ী ফাররার বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, নাহবী ফাররার বক্তব্য তখনই সঠিক হতো যদি بِمَا না হয়ে بِمَ হতো। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে مَا -এর সাথে اَلِفْ বহাল থেকেও তা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

কিভাবে মৃত্যুর পর উল্লিখিত ব্যক্তি তার জাতির ব্যাপারে কথা বলল? যখন হাবীবে নাজ্জার তার সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করেন, তখন তিনি আলমে বরখে অবস্থান করছিলেন। এ আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে মানুষ মৃত থাকবে না। তথায় তার প্রয়োজনীয় অনুভূতি ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকবে। কেউ কেউ বলেন, তখন দেহ ব্যতীত তার রূহ জীবিত থাকে। আর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের অনুভূতি এবং পৃথিবীবাসীদের প্রতি তার আগ্রহও বিরাজমান থাকে।

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ -এর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক : পূর্ব বর্ণিত بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ -এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর এক মু'মিন বান্দার শুভ হাল ও প্রশংসনীয় মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আর এর বিপরীতে এ আয়াতে কাফের, মুশরিক ও খোদাদ্রোহীদের দূরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহ তা'আলার একটি চির সুদৃঢ় নীতি পরিলক্ষিত হয় যে, যেখানে তিনি বিশ্বাসীদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন, তার সাথে সাথেই কাফেরদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা আরবি প্রবাদের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। প্রবাদটি হচ্ছে– وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ অর্থাৎ, কোনো বস্তুর পাশাপাশি তার বিপরীত বস্তুর উল্লেখকরণ দ্বারা তাকে স্পষ্ট করে তোলে।" যেমনিভাবে আলোকে বুঝার জন্য অন্ধকারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তেমনিভাবে ঈমানকে সম্যক উপলব্ধির জন্য কুফরের ধারণা লাভ করা একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া লোকেরা যেন ঈমান গ্রহণ করার সাথে সাথে ঈমান না আনার কু-পরিণতি সম্পর্কেও যেন জানতে ও বুঝতে পারে।

وَمَا اَنْزَلْنَا আয়াতে ক্রিয়াকে আল্লাহর নিজের দিকে নিসবত করা ও قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ আয়াতে না করার কারণ : উল্লেখ যে, وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ الخ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার اِنْزَال فِعْل -কে নিজের দিকে নিসবত করার কারণ হচ্ছে এটা শাস্তি প্রদানের ব্যাপার যা তার দিকে সম্পর্কিত হওয়াকে এবং فِعْل মা'রূফ ও قَوِىْ হওয়াকে কামনা করে। আর قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ আয়াতে ফি'লে মাজহুল দ্বারা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– যাতে ফেরেশতার কথার দ্বারা সে কিছুটা হীন ও দুর্বল হয়। যখন প্রত্যেক ফেরেশতা ও সৎ ব্যক্তি তাকে দেখতে পায় যে, তাকে স্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আর আয়াতটি সম্মানজনক প্রবেশের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ الخ আয়াতে কওমকে رَجُلٌ -এর দিকে নিসবত করার হিকমত : মুফাসসিরীনে কেরাম উক্ত নিসবতের দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কওমকে হাবীবে নাজ্জারের প্রতি নিসবত করার মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা একই সম্প্রদায়ের একটি ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ঈমান আনয়নের কারণে কিরূপ মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন। অপর দিকে বিশ্বাস স্থাপন না করে পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত থাকার কারণে সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদেরকে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগে নিপতিত করেছেন। একই সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও আদর্শের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।

২. অথবা, এর নিসবতকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– উক্ত আজাব ও শাস্তি হাবীবে নাজ্জারের কওমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেহেতু রাসূলগণের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তাই তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হয়নি। এ কারণেই রাসূলগণের দিকে কওমকে ইযাফত না করে হাবীবে নাজ্জারের দিকে করা হয়েছে।

হাবীবে নাজ্জারের পরে তার জাতির উপর ঐশীবাহিনী প্রেরিত না হওয়াকে খাস করার কারণ? এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ হাবীবে নাজ্জারের তীরোধানের পর তার সম্প্রদায়ের উপর কোনো ঐশী বাহিনী প্রেরিত হয়নি। অথচ হাবীবে নাজ্জারের মৃত্যুর পূর্বেও তার জাতির প্রতি কোনো ঐশী বাহিনী প্রেরিত হয়নি। সুতরাং একটিকে নির্দিষ্ট করার কারণ কি?

এর কারণ হচ্ছে– আল্লাহ পাক কোনো সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তথায় রাসূল পাঠিয়ে প্রথমে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। যথা, আল্লাহ বলেন– وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا অর্থাৎ রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক করার পূর্ব পর্যন্ত আমি কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করি না। আর এন্তাকিয়াবাসীর নিকট যেহেতু পূর্বে রাসূল পাঠানো হয়নি তাই তাদের প্রতি আজাব

পাঠানোর প্রশ্নই উঠে না। আর এ কারণেই আজাব নাজিল হওয়ার আলোচনা করাও অবান্তর বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে যেহেতু হাবীবে নাজ্জারের পরে রাসূলগণও হাবীবে নাজ্জার তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। তাদেরকে বারবার বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনেনি। এ কারণেই তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ কারণেই ঐশী বাহিনী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে হাবীবে নাজ্জারের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ঐশীবাহিনী পাঠানোর হিকমত ও বিশেষ ঘটনার সাথে এটা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ : কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অনেক সময় মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে ঐশীবাহিনী প্রেরণ করেছেন। আবার কখনো বাহিনী প্রেরণ না করে অন্যভাবে মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন এর মূল হেতু কি? বিভিন্নভাবে এর জবাব প্রদান করা যেতে পারে।

- মহান রাব্বুল আলামীন কাফির মুশরিকদেরকে কোথায় কোন পদ্ধতিতে শায়েস্তা করবেন এটা পূর্ণরূপে তারই ইচ্ছাধীন। তিনিই সকল ক্ষমতার আধার। যে কোনো স্থানে যে কোনোভাবে তিনি অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারেন। কাজেই শাস্তি বিধানে বৈচিত্র্য পন্থা অবলম্বনের কারণেই বিভিন্ন সময় কাফির মুশরিকদেরকে বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করেছেন।
- যেখানে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মু'মিনের দল বিদ্যমান ছিল তথায় তাদের সাহায্যার্থে ঐশী বাহিনী প্রেরণ করেছেন। আর যেখানে এমন দল ছিল না সেখানে অন্যভাবে শাস্তি অবতীর্ণ করে বেঈমানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

হাবীবে নাজ্জারের জাতিকে বিকট শব্দে ধ্বংস করা এবং বদর খন্দক ও অপরাপর যুদ্ধে ফেরেশতা অবতীর্ণ করে মুশরিকদের ধ্বংস করার হিকমত : কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অনেক সময় মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে ঐশীবাহিনী প্রেরণ করেছেন। আবার কখনো বাহিনী প্রেরণ না করে অন্যভাবে মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন এর মূল হেতু কি? বিভিন্নভাবে এর জবাব প্রদান করা যেতে পারে।

- এটা আল্লাহর খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল এবং প্রশ্নাতীত ব্যাপার।
- ঐশীবাহিনীর মাধ্যমে সাহায্য করা মহানবী ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে।
- হাবীবে নাজ্জারের সময় কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য কোনো বাহিনী ছিল না বিধায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিকট শব্দ ধ্বনি দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

٣٠. يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج هٰؤُلَاءِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَاُهْلِكُوْا وَهِيَ شِدَّةُ التَّأَلُّمِ وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ اَيْ هٰذَا اَوَانُكِ فَاحْضُرِيْ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ مَسُوْقٌ لِبَيَانِ سَبَبِهَا لِاشْتِمَالِهٖ عَلٰى اِسْتِهْزَائِهِمُ الْمُؤَدِّيْ اِلٰى اِهْلَاكِهِمُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ الْحَسْرَةُ .

অনুবাদ :

৩০. বান্দাদের জন্য পরিতাপ সেসব লোক ও তাদের ন্যায় অনুরূপ সবার প্রতি যারা রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তা হলো কঠোর যন্ত্রণা। আর তার পূর্বে নেদা প্রবিষ্ট হওয়া রূপক হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ হে পরিতাপ! এটা তোমার উপস্থিত হওয়ার সময়। সুতরাং তুমি উপস্থিত হয়ে যাও। তাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করা মাত্রই তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত এ বাক্য দ্বারা তাদের উপর আফসোস করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা অত্র বাক্যে রাসূলের প্রতি তাদের বিদ্রূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে পৌঁছে দিয়েছে। আর সে ধ্বংস তাদের প্রতি পরিতাপ ও আক্ষেপের কারণ হয়েছে।

٣١. اَلَمْ يَرَوْا اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ الْقَائِلُوْنَ لِلنَّبِيِّ لَسْتَ مُرْسَلًا وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَيْ عَلِمُوْا كَمْ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى كَثِيْرًا ، مَعْمُوْلَةٌ لِمَا بَعْدَهَا ، مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا عَنِ الْعَمَلِ وَالْمَعْنٰى اَنَّا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ اَنَّهُمْ اَيِ الْمُهْلَكِيْنَ اِلَيْهِمْ اَيِ الْمَكِّيِّيْنَ لَا يَرْجِعُوْنَ اَفَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِرِعَايَةِ الْمَعْنَى الْمَذْكُوْرِ .

৩১. তারা কি দেখেনি অর্থাৎ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল তুমি রাসূল নও। আর বক্তব্যকে সাব্যস্ত করার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জেনেছে। কত এখানে كَمْ টি খবরিয়া অর্থ- অনেক। এটা তৎপরবর্তী শব্দের মা'মূল। এটার পূর্ববর্তী শব্দকে আমল হতে বারণকারী। আর এর অর্থ হলো- আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি অনেক যুগকে অর্থাৎ জাতিকে যে তারা অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তরা তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে আসবে না। তারা কি তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। اَنَّهُمْ الخ বাক্যটি উল্লিখিত অর্থের দিক বিবেচনায় তার পূর্ববর্তী বাক্য হতে بَدَل হয়েছে।

٣٢. وَاِنْ نَافِيَةٌ اَوْ مُخَفَّفَةٌ كُلٌّ اَيْ كُلُّ الْخَلَائِقِ مُبْتَدَأٌ لَّمَّا بِالتَّشْدِيْدِ بِمَعْنٰى اِلَّا وَبِالتَّخْفِيْفِ فَاللَّامُ فَارِقَةٌ وَمَا مَزِيْدَةٌ جَمِيْعٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ اَيْ مَجْمُوْعُوْنَ لَدَيْنَا عِنْدَنَا فِي الْمَوْقِفِ بَعْدَ بَعْثِهِمْ مُحْضَرُوْنَ لِلْحِسَابِ خَبَرٌ ثَانٍ .

৩২. আর নয় এখানে নেতিবাচক অথবা তাশদীদবিহীন করা হয়েছে। তারা সকলেই অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি। এটা (كُلٌّ) মুবতাদা, তবে (এখানে لَمَّا) তাশদীদযুক্ত। এটা اِلَّا -এর অর্থে হয়েছে। অথবা তাশদীদ ছাড়া। এমতাবস্থায় لَامْ পার্থক্যকারী আর مَا হবে অতিরিক্ত। সকলেই এটা মুবতাদার খবর হয়েছে। অর্থাৎ সকলে একযোগে আমার নিকট আমার কাছে তাদের পুনরুত্থানের পর হাশরের মাঠে হাজির করা হবে হিসাব-নিকাশের নিমিত্তে এটা দ্বিতীয় খবর।

তাহকীক ও তারকীব

مَا يَأْتِيْ مِنْ رَّسُوْلٍ-এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে مِنْ টি অতিরিক্ত। কাজেই মূল বাক্যটি হবে- مَا يَأْتِيْهِمْ رَسُوْلٌ এখানে مَا হলো ফি'ল هُمْ হলো মাফউল رَسُوْلٌ হলো ফায়িল। আর ফায়িল হওয়ার কারণে رَسُوْلٌ শব্দটি মহল্লান মারফূ' হবে। যদিও مِنْ -এর কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাজরূর হয়েছে।

كَمْ -এর মহল্লে ই'রাব : أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا বাক্যে كَمْ শব্দটি দু' হিসেবে মানসূব হবে।

১. لَمْ يَرَوْا ফি'লের মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। তখন كَمْ অর্থ كَثْرَتْ হবে। বাক্যটি এরূপ হবে- أَلَمْ يَرَوْا كَثْرَةً أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ

২. كَمْ শব্দটি أَهْلَكْنَا ফি'লের মাফউল হিসেবেও মানসূব হতে পারে। তখন বাক্যটি হবে- أَلَمْ يَرَوْا أَهْلَكْنَا كَثِيْرًا مِنَ الْقُرُوْنِ

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ-এ বর্ণিত তিনটি যমীরের মারজি' : এ আয়াতে قَبْلَهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْمَوْجُوْدُوْنَ আর أَنَّهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْمُهْلَكُوْنَ এবং إِلَيْهِمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْمَوْجُوْدُوْنَ পূর্ণ বাক্যটি নিম্নরূপ হবে- أَلَمْ يَرَوْا الْمَوْجُوْدُوْنَ أَنَّا أَهْلَكْنَا كَثِيْرًا مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَ الْمَوْجُوْدِيْنَ أَنَّ الْمُهْلَكِيْنَ إِلَى الْمَوْجُوْدِيْنَ لَا يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ বর্তমান লোকেরা কি অবগত নয় যে, তাদের পূর্বে খোদাদ্রোহীতার কারণে বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সে ধ্বংসপ্রাপ্তরা বর্তমান জীবিতদের নিকট ফিরে আসবে না।

أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ-এর তারকীব : এখানে أَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফি'ল আর هُمْ হলো এর ইসম। إِلَى হরফে জার هُمْ মাজরূর। জার মাজরূর মিলে لَا يَرْجِعُوْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। لَا يَرْجِعُوْنَ ফি'ল ও ফায়িল ও مُتَعَلِّقْ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে أَنَّ -এর خَبَرْ হয়েছে। এখন أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো। তবে অর্থগত দিক হতে أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য كَمْ أَهْلَكْنَا الخ বাক্য হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ায় مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

جَمِيْعٌ এবং مُحْضَرُوْنَ -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে جَمِيْعٌ এবং مُحْضَرُوْنَ উভয়টি كُلٌّ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে মহল্লান মারফূ' হয়েছে।

বাক্যটির তারকীব হবে- إِنْ হরফে মুশাব্বাহ্ বিল ফি'ল, এর ইসম হলো উহ্য , যমীর। كُلٌّ হলো মুবতাদা جَمِيْعٌ হলো প্রথম খবর। আর لَدَيْنَا যরফ, মুতা'আল্লিক হয়েছে مُحْضَرُوْنَ -এর সাথে। مُحْضَرُوْنَ টি তার যরফ মুতা'আল্লিক নিয়ে দ্বিতীয় খবর। মুবতাদা তার উভয় খবরকে নিয়ে إِنْ خَبَرِ হলো। إِنْ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ الخ -এর মধ্যস্থ إِنْ -এর তাহকীক : এখানে إِنْ -এর ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে-

১. إِنْ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফি'ল। এর তাশদীদকে ফেলে দিয়ে তাখফীফ করা হয়েছে। আর তখন , উহ্য যমীর-এর ইসিম হবে। لَمَّا তাখফীফের সাথে لَامْ উক্ত إِنْ -কে নেতিবাচক إِنْ হতে পৃথক করবে। مَا হবে অতিরিক্ত। আর অবশিষ্ট বাক্যটি إِنْ -এর খবর হবে। আয়াতের অর্থ হবে- আর নিশ্চয় তাদের সকলকে একযোগে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

২. إِنْ টি নেতিবাচক বা نَافِيَة হবে। আর لَمَّا তাশদীদ যুক্ত হবে, আর إِلَّا -এর অর্থে হবে। মূল আয়াতটি এরূপ হবে- مَا كُلٌّ إِلَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ অর্থ- তাদের সকলকেই আমার নিকট সম্মিলিতভাবে উপস্থিত করা হবে।

সারকথা হলো উভয় অবস্থায় আয়াতের মূল ভাবের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَسْرَةً -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْحَسْرَةُ فِي اللُّغَةِ اَشَدُّ التَّلَهُّفِ عَلَى الشَّيْءِ الْفَائِتِ অর্থাৎ অভিধানে হারানো বস্তুর উপর কঠোর মানসিক যন্ত্রণাকে حَسْرَةٌ বা আফসোস বলা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন– اَنْ يَلْحَقَ اِنْسَانٌ مِنَ النَّدَمِ مَا يَصِيْرُ بِهِ حَسْرًا অর্থাৎ মানুষ এরূপ লাঞ্ছিত হওয়া যার ফলে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়।

يَحَسْرَةً عَلَى الخ -এর মধ্যে আক্ষেপকারী কে? يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ الخ আয়াতে আক্ষেপকারীকে এ নিয়ে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়।

- হযরত যাহ্হাক (র.) -এর মতে, এ আয়াতে পরিতাপকারী হচ্ছে ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ কাফেররা যখন রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তখন ফেরেশতাগণ আক্ষেপ করে উক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।
- কতিপয় মুফাসসিরের মতে আক্ষেপকারী হলেন রাসূলগণ। অর্থাৎ এন্তাকিয়াবাসী যখন হাবীবে নাজ্জারকে হত্যা করল ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসল, তখন রাসূল আক্ষেপ করে উক্ত কথা বললেন।
- কারো কারো মতে, হাবীবে নাজ্জার নিজেই স্বীয় জাতির ঔদ্ধত্য আচরণের উপর আফসোস করে উপরিউক্ত বক্তব্য দিয়েছেন।
- কারো কারো মতে, এন্তাকিয়াবাসীরা নিজেরাই আজাবে গ্রেফতার হওয়ার পর আক্ষেপ করেছে।
- ইমাম মুজাহিদ বলেন, হাবীবে নাজ্জারের জাতি ধ্বংসে নিমজ্জিত হওয়ার সময় উপরিউক্ত আফসোস করেছিল। আবুল আলিয়া হযরত আনাস (রা.) হতে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।
- বাস্তবিক পক্ষে কোনো আফসোসকারী ছিল না; বরং এটা আফসোসের উপযোগী সময় তা-ই বলা উদ্দেশ্য।
- কারো কারো মতে, স্বয়ং আল্লাহ হচ্ছেন আফসোসকারী। হাসি-বিদ্রূপ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ক্রিয়াকে যেভাবে আল্লাহর প্রতি সম্বোধন করা হয় রূপকভাবে, তদ্রূপ حَسْرَةٌ তথা আফসোসকেও রূপকার্থে আল্লাহর শানে প্রযোজ্য হবে।
- অথবা, বলা যেতে পারে যে, মহান রাব্বুল আলামীন حَسْرَةٌ -এর শুধুমাত্র সংবাদদাতা; নিজে আফসোসকারী নন।
- তাফসীরে খাযিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে কাফেরদের উপর আফসোস করে বলবেন– يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ হায় আফসোস! বান্দাদের উপর তাদের নিকট আগত সকল রাসূলের সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে আজ তারা ভয়ানক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হলো।

عِبَادٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে اَلْعِبَادِ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে–

- কারো কারো মতে, اَلْعِبَاد দ্বারা এখানে হাবীবে নাজ্জারের জাতিকে বুঝানো হয়েছে।
- কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, اَلْعِبَاد দ্বারা এন্তাকিয়া শহরে প্রেরীত তিনজন রাসূল উদ্দেশ্য। কাফেরদের উপর যখন বিভিন্ন প্রকার বালা-মসিবত আসতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় যেন তারা বলতে চাচ্ছিল– হায় আফসোস! তারা যদি আজ উপস্থিত থাকত তবে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম।
- العباد দ্বারা প্রত্যেক এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি কুফরি করেছে এবং কুফরিতে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর অহংকারে মত্ত হয়ে রাসূলগণকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

আফসোসের কারণ : এ আয়াতে আক্ষেপের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন- مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ সে বান্দাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হচ্ছে- তাদের নিকট যত রাসূলই আগমন করেছেন তারা সকলের সাথে উপহাস করেছে, অপমান করেছে, তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে তাদের উপর মহা শাস্তি নেমে এসেছে। তারা নিপতিত হয়েছে ধ্বংস লীলায়। আর তাদের জন্য তো পূর্ব হতেই আখিরাতে সীমাহীন দুর্গতি তো রয়েছেই।

এখানে মূলত পরোক্ষভাবে মক্কার কাফেরদেরকে হুশিয়ার করে দেওয়া উদ্দেশ্য। রাসূলগণের উপর মিথ্যারোপের ফলে যেমন এন্তাকিয়াবাসী সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে, ঠিক তদ্রূপ যদি মক্কার কাফির মহানবী ﷺ -কে মিথ্যারোপ করার উপর অটল থাকে, তবে তাদের ললাটেও সে চরম দুর্গতি অপেক্ষা করছে। আর এটাই আল্লাহর অমোঘ নীতি।

وَمَا يَأْتِيْهِمْ الخ আয়াতে هُمْ যমীরের مَرْجِعْ : এ আয়াতে هُمْ-এর مَرْجِعْ সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. هُمْ-এর মারজি' হবে হাবীবে নাজ্জারের সম্প্রদায়। অর্থাৎ হাবীবে নাজ্জারের সম্প্রদায় এন্তাকিয়াবাসীদের নিকট আগত তিনজন রাসূলের সকলকেই তারা প্রত্যাখ্যান করল। সকলের সাথেই তারা বিদ্রূপ করল।

২. هُمْ-এর مَرْجِعْ হবে ব্যাপকভাবে সকল কাফির সম্প্রদায়। তখন অর্থ হবে- কাফেরদের নিকট যত রাসূলই এসেছেন তারা সকলের সাথেই বিদ্রূপে মেতে উঠেছে। কোনো নবী রাসূলই তাদের উপহাস হতে রেহাই পায়নি।

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ আয়াতে কাফেরদের পরকালের শাস্তির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, রাসূলগণকে কাফেরদের উপহাস করার ও মিথ্যারোপ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে পৃথিবীতে তাদের উপর আজাব ও গজব অবতীর্ণ হয়েছে, ফলে তারা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, পার্থিব শাস্তিই যে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য হয়ে গেছে এটা মনে করার কোনোই কারণ নেই। তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে। আর তখনই তাদেরকে জাহান্নামের অন্তহীন আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

অনুবাদ :

٣٣. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ عَلَى الْبَعْثِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَحْيَيْنٰهَا بِالْمَاءِ مُبْتَدَأٌ وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا كَالْحِنْطَةِ فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ.

৩৩. আর তাদের জন্য রয়েছে একটি নিদর্শন- পুনরুত্থানের ব্যাপারে। এটা পূর্বে উল্লিখিত খবর। মৃত শুষ্ক জমিন (الْمَيْتَةُ শব্দটি দু ভাবে পড়া যায়) তাশদীদ ছাড়া এবং তাশদীদসহ। আমি একে জীবিত (সজীব) করেছি পানি দ্বারা, তা মুবতাদা। আর আমি তা হতে শস্য-দানা বের করেছি। যেমন- গম। সুতরাং তা হতে তারা ভক্ষণ করে।

٣٤. وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لا اَىْ بَعْضِهَا.

৩৪. আর আমি তাতে বাগ-বাগিচার সৃষ্টি করেছি বাগানসমূহ খেজুর ও আঙ্গুরের আর তাতে আমি নদী-নালাও প্রবাহিত করেছি। অর্থাৎ তার কোনো কোনো অংশে।

٣٥. لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ ط بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمَّتَيْنِ اَىْ ثَمَرِ الْمَذْكُوْرِ مِنَ النَّخِيْلِ وَغَيْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَىْ لَمْ تَعْمَلِ الثَّمَرَ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ اَنْعُمَهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ.

৩৫. যাতে তারা তার ফল-মূল হতে ভক্ষণ করতে পারে (এখানে ثَمَرٌ শব্দটির প্রথম দুই অক্ষর) উভয় যবরবিশিষ্ট এবং পেশবিশিষ্টও হতে পারে। অর্থাৎ উল্লিখিত খেজুর ও অন্যান্য ফলমূল হতে। আর তাদের হাত তাকে সৃষ্টি (তৈরি) করেনি। অর্থাৎ (তাদের হাত) ফল সৃষ্ট করেনি। সুতরাং তারা কি শুকরিয়া আদায় করবে না? তাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহের (শুকরিয়া কি তারা আদায় করবে না)।

٣٦. سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الْاَصْنَافَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنَ الْحُبُوْبِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ مِنَ الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ الْغَرِيْبَةِ الْعَجِيْبَةِ.

৩৬. পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের এদের সমস্তকে যা জমিন উৎপাদন করে- শস্য দানা ইত্যাদি এবং তাদের নিজেদের হতে নারী ও পুরুষ এবং যা তারা অবহিত নয় বিস্ময়কর আশ্চর্যজনক সৃষ্টিকুল।

তাহকীক ও তারকীব

سُبْحَانَ শব্দের অর্থ : سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الخ আয়াতে سُبْحَانَ শব্দটি ইসমে মাসদার হয়েছে। এর অর্থ পবিত্রতা, এটা একটি ফে'লে মাহযূফ হতে মাফউলে মুতলাক হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। এর মূলরূপ হবে اُسَبِّحُ سُبْحَانَ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি যথাযথভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর দিকে কাফের মুশরিকগণ যেসব অযৌক্তিক বিষয়াবলিকে সম্পৃক্ত করে থাকে যথা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, আল্লাহর সন্তান-সন্ততি নির্ধারণ করা ইত্যাদি হতে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পূত-পবিত্র।

কারো কারো মতে, سُبْحَانَ -এর পূর্বে سَبِّحُوْا (আমরের সীগাহ) উহ্য রয়েছে। তখন অর্থ এরূপ হবে- سَبِّحُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِشَانِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর শানে যা প্রযোজ্য নয় তা হতে আল্লাহ পূত-পবিত্র কর।

সার কথা হচ্ছে– কোনো মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর দিকে নিসবত করা। আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টিকে গুণগতভাবে বা সত্তাগতভাবে ইবাদতে অংশীদার করা। আল্লাহর ইচ্ছায় কারো হাত রয়েছে বলে মনে করা চরম মূর্খতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এ সবকিছু হতে পূর্ণরূপে পবিত্র।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا-এর তারকীব : অত্র আয়াতে وَ হরফে আতফ اٰيَةٌ لَّهُمْ হলো খবরে মুকাদ্দাম আর الْاَرْضُ মাওসূফ اَلْمَيْتَةُ হলো সিফত মাওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা এবং اَحْيَيْنٰهَا এটা জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ হলো। خَبَر مُقَدَّمْ ও مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

مِنْ ثَمَرِهٖ-এর , যমীরের মারজি' কি? لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ আয়াতে , যমীরের মারজি' নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

- কারো কারো মতে, ثَمَرِهٖ-এর যমীরের মারজি' হলো نَخِيْل এবং اَعْنَابْ।
- কারো মতে, এর যমীরের مَرْجِعْ হলো مَاءُ الْعُيُوْنِ
- কারো মতে, এর যমীরের مَرْجِعْ হলো اَللّٰهُ অর্থাৎ مِنْ ثَمَرِ اللّٰهِ
- কারো মতে, এটা وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ বাক্যের দিকে ফিরেছে।
- কারো মতে, وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ-এর মধ্যস্থিত تَفْجِيْر-এর অর্থের দিকে ثَمَرِهٖ-এর যমীরের মারজি' ফিরেছে।

وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ-এর মধ্যস্থিত مَا শব্দের অর্থ কি? এ আয়াতে مَا শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

১. مَا টি নেতিবাচক অর্থে হবে। অর্থাৎ ফল-মূল সৃষ্টি ও নদী প্রবাহিত করার বিষয়টি তারা করেনি।

২. مَا টি اِسْم مَوْصُوْل-এর অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে– وَالَّذِيْ عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْغَرْسِ بَعْدَ التَّفْجِيْرِ يَاْكُلُوْنَ مِنْهُ اَيْضًا وَيَاْكُلُوْنَ مِنْ ثَمَرِ اللّٰهِ الَّذِيْ اَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ পানি প্রবাহের পর মানুষ তাদের হাতে বীজ বপন করে যা উৎপাদন করেছে তারা তা হতে খায় এবং আল্লাহর দেওয়া ঐ ফল-মূলও তারা খায় যা মানুষের কোনো প্রকার চেষ্টা তদবীর ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

৩. مَا টি মাসদারের অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে– لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِ اللّٰهِ وَعَمِلَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহর ফল এবং নিজেদের হাতে উৎপাদিত (হতে) ভক্ষণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও এর ন্যায় অন্যান্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণের উদ্দেশ্য : সূরা ইয়াসীনের অধিকাংশ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতের নিদর্শনাবলি, তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আখেরাতের উপর দলিল উপস্থাপন করা এবং হাশর-নাশরের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা সম্পর্কীয়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর কুদরতের অনুরূপ নিদর্শনাবলিরই আলোচনা করা হয়েছে। একদিকে যা আল্লাহর কুদরতের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ অন্য দিকে মানবজাতি ও সাধারণ সৃষ্টজীবের উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত এবং তাঁর আশ্চর্য জনক কৌশলাদির বিবরণ রয়েছে।

প্রথম আয়াতে জমিনের একটি উপমা পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের সম্মুখে যা সদা সর্বদা বিদ্যমান। শুষ্ক জমিনে আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে জমিনে এক প্রকার জীবনের সঞ্চার হয়। এর মধ্যে গাছ-পালা, ফল-ফলাদি, তরুলতা ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে যার নিদর্শন প্রকাশ পায়। আর এদের জীবন ধারণের জন্য জমিনের নিচে এবং উপরিভাগে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন।

বায়ু মেঘ ও জমিনের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে– লোকেরা যেন তা হতে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। আর এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আনুগত্য করে তাওহীদে বিশ্বাস করে।

এ ছাড়াও আল্লাহর আরো একটি বড় কুদরত হলো– তিনি প্রতিটি বস্তুকে শ্রেণিবিন্যাস করত নারী-পুরুষ, ঝাল-টক ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।

নিষ্প্রাণ মাটি যেভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব একত্ববাদের উপর দলিল বা নিদর্শন হতে পারে : মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম ক্ষমতাবলির নিদর্শন ও তাওহীদের প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– শুষ্ক জমিনকে বৃষ্টির পানি দ্বারা সজীব করে এতে গাছ-পালা শস্য-দানা ও ফল-ফলাদি উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থাকরণ।

যেহেতু এ প্রক্রিয়াটি প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখে ঘটছে তাই আল্লাহ তা'আলা সর্বাগ্রে এটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া এটা এমন একটি বিষয় যা বুঝার জন্য কোনোরূপ চিন্তা গবেষণার জরুরত হয় না। কিন্তু প্রতিনিয়ত চোখে পড়ার কারণে আমরা আল্লাহর এই অসীম কুদরতটির ব্যাপারে কখনো আগ্রহ ভরে ভেবে দেখছি না।

আল্লাহ তা'আলা এ শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ ভূমিতে বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণের সঞ্চার করেন। এরপর তা হতে হরেক রকম বাগ-বাগিচার সৃষ্টি করেন এবং তাতে পানি সিঞ্চন করার জন্য বিভিন্ন নদী-নালা ও ঝরণা প্রবাহের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষ এগুলো হতে উৎপাদিত ফসল ও ফল-মূল খেয়েই জীবন ধারণ করে থাকে।

এ নিষ্প্রাণ ভূমি হতে কিভাবে চির সবুজ সজীব বৃক্ষরাজির সৃষ্টি হয়? সে ব্যাপারে গবেষকগণ কতিপয় কারণ বর্ণনা করেছেন।

- শূন্যে আল্লাহ বায়ু স্থাপন করে রেখেছেন তা আকাশের বিপদাপদ হতে ভূমিকে রক্ষা করে এবং বৃষ্টি বর্ষণে সাহায্য করে।
- ভূমি সূর্য হতে প্রয়োজনীয় উত্তাপ শোষণ করে; বৃক্ষ রাজির উৎপাদন ও বিকাশে সাহায্য করে।
- জমিনের উপরিভাগে আল্লাহ তা'আলা নদী-নালা প্রবাহিত করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর তলদেশেও পানির ভাণ্ডার জমা রেখেছেন এদের থেকে পানি সিঞ্চন করে ফসলাদি উৎপাদান সাহায্য পাওয়া যায়।
- ভূমির উপরিভাগে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি বিশেষ স্তর সৃষ্টি করেছেন যা হতে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খাদ্য শোষণ করতে পারে।

গবেষকদের মতে উপরিউক্ত কারণগুলোর সাথে আরো কারণ যুক্ত হয়ে মৃত নিষ্প্রাণ ভূমি হতে সজীব-সতেজ বৃক্ষরাজি উৎপন্ন হয়। মোট কথা হচ্ছে– নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়ে যায় যে, এগুলো আপনা আপনিই উৎপন্ন হতে পারে না। নিশ্চয় এর উপর এক অদৃশ্য শক্তির হাত রয়েছে। পূর্ব হতেই যিনি মানব এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই এ সকল ব্যবস্থাপনা। কৃষক জমিতে চাষাবাদ করে বীজ বপন করে পানি দেয় তাই বলে তো সে বীজ হতে বৃক্ষ গজানো, ডাল ছড়ানো, পত্র-পল্লবের সৃষ্টি ইত্যাদির কোনোটিই করতে পারে না। আর এগুলো সবই তো হয় মহা কৌশলীর কুদরতি হাতে। এদিকে ইঙ্গিত করেই সূরায়ে ওয়াকি'আতে উল্লেখ হয়েছে– বল তো তোমরা যে ক্ষেত-খামার কর তাতে তোমরাই ফসল উৎপাদন কর না আমি করি?

উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের নিদর্শন রয়েছে।

সকল ফলের মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরকে খাস করার কারণ : দুনিয়ার অসংখ্য ফল-মূল হতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে খেজুর এবং আঙ্গুরকে নির্দিষ্ট করলেন কেন? এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেন–

- পবিত্র কুরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন উপমা প্রসঙ্গে সাধারণত সে সকল বস্তুসমূহের উল্লেখ করেছেন যা মক্কাবাসীদের সুপরিচিত ছিল। এখানেও সে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ আরববাসীগণ খেজুর ও আঙ্গুরের সাথে অধিক পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে এ দুটিকে উল্লেখ করেছেন।
- ফল-মূল দু ধরনের– ১. যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত, ২. যা পরিতৃপ্তির জন্য খাওয়া হয়। এখানে প্রথম প্রকার হতে খেজুর এবং দ্বিতীয় প্রকার হতে আঙ্গুরের উল্লেখ করা হয়েছে।

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে اَزْوَاجٌ শব্দটি زَوْجٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো– জোড়া। জোড়ার মধ্যে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু থাকে। এদের প্রত্যেকটিকে অপরটির زَوْجٌ বলে। যথা– নারী-পুরুষ। নারীকে পুরুষের আর পুরুষকে নারীর زَوْجٌ বলে। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণীর স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ পরস্পর زَوْجٌ অনেক গাছ-গাছালি ও তরুলতার মধ্যেও স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা মতে ফল-ফুল বিশিষ্ট গাছের মধ্যে স্ত্রী লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রজনন পদ্ধতি বিরাজমান রয়েছে। তদ্রূপ অন্যান্য জড় পদার্থ ও সৃষ্টিকুলের মধ্যেও যদি প্রজননের এই গোপন ধারা অব্যাহত থাকে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এ দিকেই وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাফসীরকারকগণ সাধারণভাবে أَنْوَاعٌ দিয়ে أَزْوَاجٌ -এর তাফসীর করেছেন। أَنْوَاعٌ অর্থ হলো– প্রকারসমূহ। কারণ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গকে যেভাবে পরস্পর زَوْجَيْنِ (যুগল) বলা হয় তেমনিভাবে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তুকেও زَوْجَيْنِ বলা হয়। যথা– ঠাণ্ডা-গরম, শুষ্ক-আর্দ্র, আনন্দ-বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটি আবার উচ্চ, মধ্য নিম্ন-এর হিসেবে অনেক স্তর, শ্রেণিবিভাগ ও প্রকারভেদ রয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মাঝেও বর্ণ, আকার, ভাষা ও জীবন ধারণ পদ্ধতির দিক বিবেচনায় অনেক প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান। أَزْوَاجٌ শব্দটির মধ্যেও উপরোক্ত সকল শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ। উল্লেখ করে বৃক্ষরাজির প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করেছেন। এরপর مِنْ أَنْفُسِهِمْ الخ হতে মানুষের নফসের প্রকরণ বর্ণনা করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যে অসংখ্য সৃষ্টজীব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আজ পর্যন্ত জানা-জানি হয়নি। ভূ-মণ্ডলের নিম্ন দেশে সমুদ্র, পাহাড়-পর্বতে কত অসংখ্য পরিমাণ জীব-জন্তু, গাছ-পালা ও জড় পদার্থ রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছুই জানেন।

পরস্পরের জন্য জুড়ি হওয়া এবং তাদের মিলনের ফলে নবতর জিনিসের অস্তিত্ব লাভ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করে : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, সমস্ত বস্তু নিচয়কে তিনি জুটি করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক বস্তুকে স্ত্রী ও পুরুষ এ দু লিঙ্গে এবং বহু শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন– যেমন মানবজাতিকে নারী-পুরুষ এ দু শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে যৌনশক্তি, প্রেম-ভালবাসা ও একের প্রতি অপরের দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ প্রেম-প্রীতির বন্ধনে যৌবনের প্রচণ্ড আকর্ষণে অন্তহীন আবেগে মিলিত হয়। তাদের এ মিলনের ফসল হিসেবে এক নবতর প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। আর উভয়ে আনন্দচিত্তে হাজারো কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে এ নব প্রজন্মের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মানবজাতির বংশ ধারা এভাবেই অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

সৃষ্টি জগতের এ সুশৃঙ্খল ধারা অব্যাহত থাকাটা কি কোনো দুর্ঘটনার ফল? নাকি এটা কোনো পরিকল্পনা ছাড়া এমনিতেই চলছে? এটা হতে পারে না। কারণ কোনো দুর্ঘটনা তো সুশৃঙ্খলভাবে ঘটতে পারে না। আর একটি সামান্য কর্মও কোনো পরিকল্পনা ছাড়া সম্পাদন করা যায় না। তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে– সে পরিকল্পনাকারী কে? এটা তো মানুষ হতে পারে না। তবে নিশ্চয় এর পিছনে এক মহাশক্তির হাত রয়েছে। আর সেই শক্তিই হলেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। আমরা আরো দেখতে পাই যে, এসব কিছুই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলছে; এর কোনোরূপ ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আর এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় এগুলো সব একমাত্র সত্তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই জুটি করে সৃষ্টি করা এবং তাদের মিলনের ফলে নব প্রজন্মের আবির্ভাব আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ **-এর মধ্যস্থ হামযা ও ফা-এর অর্থ :** এখানে হামযাটি اِسْتِفْهَامٌ তথা প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর فَ টি হরফে আত্‌ফ হিসেবে এসেছে। এর মা'তূফ আলাইহ উহ্য রয়েছে। ইবারতটি এরূপ হচ্ছে যে, أَيُنْكِرُوْنَ نِعْمَةَ فَلَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ– তারা কি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করতেন তারা যার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে না।

আল্লাহর বাণী أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ **বাক্যটিকে হামযায়ে ইস্তিফহামের সাথে বর্ণনা করলেন কেন?** এখানে কাফের মুশরিকদের কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য اِسْتِفْهَامٌ -এর হামযার সাথে বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা এতই কৃতঘ্ন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সুখ শান্তির জন্য এত সব উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে রেখেছেন তারা এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যার প্রথম দাবি হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া। কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করা। বড়ই পরিতাপের বিষয় সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছেড়ে এরা এমন কতিপয় বস্তুর উপাসনায় তারা লিপ্ত যারা একটি লতাপাতা তৈরি করতেও সক্ষম নয়। এর চেয়ে চরম গোমরাহী আর কি হতে পারে?

৩৭. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ عَلَى الْقُدْرَةِ الْعَظِيْمَةِ اللَّيْلُ ج نَسْلَخُ نَفْصِلُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ دَاخِلُوْنَ فِى الظَّلَامِ ـ

৩৮. وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ الخ مِنْ جُمْلَةِ الْاٰيَةِ لَهُمْ اَوْ اٰيَةٌ اُخْرٰى وَالْقَمَرُ كَذٰلِكَ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط اَىْ اِلَيْهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ ذٰلِكَ جَرْيُهَا تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْعَلِيْمِ بِخَلْقِهِ ـ

৩৯. وَالْقَمَرَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَهُوَ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ قَدَّرْنٰهُ مِنْ حَيْثُ سَيْرِهِ مَنَازِلَ ثَمَانِيَةً وَّعِشْرِيْنَ مَنْزِلًا فِىْ ثَمَانٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسْتَتِرُ لَيْلَتَيْنِ اِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا حَتّٰى عَادَ فِىْ اٰخِرِ مَنَازِلِهِ فِىْ رَاْيِ الْعَيْنِ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ اَىْ كَعُوْدِ الشَّمَارِيْخِ اِذَا عَتَقَ فَاِنَّهُ يَدِقُّ وَيَتَقَوَّسُ وَيَصْفَرُّ ـ

৪০. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ يَسْهُلُ وَيَصِحُّ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ فَتَجْتَمِعُ مَعَهُ فِى اللَّيْلِ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط فَلَا يَاْتِىْ قَبْلَ اِنْقِضَائِهِ وَكُلٌّ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ فِىْ فَلَكٍ مُّسْتَدِيْرٍ يَّسْبَحُوْنَ يَسِيْرُوْنَ نُزِّلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ ـ

অনুবাদ :

৩৭. আর একটি নিদর্শন তাদের জন্য মহান কুদরতের উপর রাত্রি। আমি ছিন্ন করি, পৃথক করি, তা হতে দিবসকে। ফলে তারা অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।

৩৮. আর সূর্য পরিভ্রমণ করে– [আয়াতের শেষ পর্যন্ত তাদের [পূর্বোক্ত] মোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অথবা এটা [তাদের জন্য] পৃথক একটি নিদর্শন। আর চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপ। এটা নির্ধারিত কক্ষপথে তা পর্যন্ত তাকে অতিক্রম করতে পারে না। তা সূর্যের পরিভ্রমণ– নির্ধারিত মহাপরাক্রমশালীর তাঁর রাজত্বে মহাজ্ঞানীর তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে।

৩৯. আর চন্দ্র اَلْقَمَرُ শব্দটিতে رَفْع ও نَصْب উভয়টি হতে পারে। এটা এমন একটি فِعْل -এর সাহায্যে مَنْصُوْب তার পরবর্তী শব্দ যার ব্যাখ্যা করে। তার জন্যও আমি নির্ধারণ করেছি। তার ভ্রমণের দিক বিবেচনায় মঞ্জিল গন্তব্যস্থল সমূহ। প্রত্যেক মাসের আটাশ রাত্রির জন্য আটাশটা মঞ্জিল [নির্ধারণ করেছি]। আর মাস ৩০ দিনের হলে দুটি এবং ২৯ দিনের হলে একটি রাত্রি গোপন থাকে। এমনকি প্রত্যাবর্তন [রূপ ধারণ] করে চোখের দৃষ্টিতে তার শেষ মঞ্জিলে শুষ্ক বাঁকা পুরানো খেজুরের শাখার ন্যায় অর্থাৎ খেজুরের শাখার ন্যায়। যখন তা পুরানো হয়ে যায়, তখন অত্যন্ত সরু ও কামানের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায় এবং হলুদ রং ধারণ করে।

৪০. সূর্যের জন্য সম্ভবপর নয়– সম্ভব (সহজ) ও সঠিক নয়– চন্দ্রের নাগাল পাওয়া– যাতে রাত্রি বেলায় তার সাথে একত্রিত হতে পারে। আর রাত্রির পক্ষে দিবসকে অতিক্রম করা অসম্ভব– কাজেই তা দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আগমন করে না। তাদের প্রত্যেকেই كُلٌّ -এর তানবীন মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে হয়েছে। (অর্থাৎ মুযাফ ইলাইহকে হযফ করত তানবীন দেওয়া হয়েছে।) অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি কক্ষ পথে বৃত্তের মধ্যে সাঁতার কাটছে পরিভ্রমণ করছে। তাদেরকে বিবেকবানদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ আয়াতে اَلْقَمَرَ -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতের اَلْقَمَرَ শব্দটির মহল্লে ইরাব সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে।

১. আবূ আমির, ইবনে কাছীর, নাফে' ও আলী প্রমুখগণের মতে اَلْقَمَرُ শব্দটি مَرْفُوْعٌ হবে, তখন এটা মুবতাদা হবে। আর وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الخ বাকীটি তার খবর হবে।

২. অপরাপর কারীগণ এটাকে مَنْصُوْبٌ পড়েছেন। তখন এর পরবর্তী ফে'ল তার عَامِلٌ হবে। অথবা এটা এমন একটি উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যে ফে'লটির ব্যাখ্যা পরবর্তী ফে'লটি করেছে। বাক্যটি এরূপ হবে যে, وَقَدَّرْنَا الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : نَسْلَخُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– চামড়া উপড়িয়ে ফেলা। কোনো বস্তুর উপরের গেলাফ বা কোনো প্রাণীর চামড়া উপড়িয়ে ফেললে ভিতরের বস্তু বের হয়ে পড়ে।

এ উপমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ পৃথিবীতে মৌলিক হলো অন্ধকার আর আলো হলো অমৌলিক বা আরজী যা অন্যান্য নক্ষত্ররাজি হতে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এই আলো আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়েই পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়েই এটাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এরপর অন্ধকার থেকে যায়। একেই পরিভাষায় রাত বলা হয়। এটা মহান আল্লাহর একটি বিশেষ কুদরত, অসীম ক্ষমতা, বান্দার এতে কোনোই হাত নেই। কাজেই তা হতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদ প্রমাণিত হয়।

اَلْمُسْتَقَرُّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এবং আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের ভাবার্থ হলো সূর্য তার গন্তব্য পানে চলতে থাকে। مُسْتَقَرٌّ বলে স্থিতির স্থান ও সময় উভয়টিকে। আবার ভ্রমণের শেষ সীমাকেও مُسْتَقَرٌّ বলা হয়। তবে আলোচ্য আয়াতে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

- কতিপয় মুফাসসিরের মতে এখানে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা مُسْتَقَرٌّ زَمَانِيٌّ তথা স্থিতির সময়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় যখন সূর্য তার নির্ধারিত গতির সমাপ্তি ঘটাবে। আর তা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে–

সূর্য এমন দৃঢ়তা ও মজবুত শৃঙ্খলার সাথে এর কক্ষ পথে চলছে যে, এতে কখনো এক সেকেণ্ডের তারতম্য হয় না। এভাবে হাজার বছর ধরে চলে আসছে তবুও এর গতি অব্যাহত রয়েছে। তবে এ গতিরও শেষ সীমা রয়েছে। তথায় পৌছলে এ ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর সেই সীমা হলো কিয়ামতের দিন। সূরায়ে যুমারের একটি আয়াত এর দিকে ইঙ্গিত করেছে। আয়াতটি হচ্ছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। রাতকে দিনের উপর দিনকে রাতের উপর ঢেকে দেন। আর তিনি চাঁদ সুরুজকে অনুগত বাধ্যগত করে রেখেছেন। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ আয়াতে اَجَلٍ مُّسَمًّى দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আর সূরায়ে ইয়াসীনে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা اَجَلٍ مُسْتَقَرٍّ তথা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য।

- কোনো তাফসীর কারকের মতে, এখানে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা مُسْتَقَرٌّ مَكَانِيٌّ তথা স্থিতির উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা বুখারী ও মুসলিমের একটি সহীহ হাদীসের ভিত্তি করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে– হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) একদা সূর্যাস্তের সময় মহানবী ﷺ -এর সাথে মসজিদে ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "আবূ যর তুমি কি জান সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কোথায় যায়।" উত্তরে হযরত আবূ যার গিফারী (র.) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে গিয়ে সিজদাবনত হয়। এরপর মহানবী ﷺ বললেন– وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এখানে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

সিহাহ সিত্তাহে রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রা.) একদা রাসূল ﷺ কে وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا -এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিলেন মহানবী ﷺ বললেন- مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ অর্থাৎ সূর্যের স্থিতি হলো আরশের নিচে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে- যাতে উল্লেখ আছে যে, অস্ত যাওয়ার পর সূর্য আরশের নিচে সেজদা করে। এবং পরবর্তী কক্ষে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় চলা আরম্ভ করে। এমনিভাবে এক দিন আসবে যেদিন সূর্য পরবর্তী কক্ষে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবে যেদিক থেকে এসেছো সেদিকেই চলে যাও। আর এটা হলো কিয়ামতের একটি নিদর্শন।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সূর্য স্বীয় ইচ্ছাধীন চলতে পারে না; বরং মহান রাব্বুল আলামীনের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুপাতে তা চলমান। রাসূল ﷺ হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-কে তাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। সারকথা হলো, সূর্যের উদয় অস্তের সময় বিশ্ব জগতে এক বিশাল পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় যা সূর্যের কারণে হয়ে থাকে। মহানবী ﷺ এ পরিবর্তনশীল সময় দ্বারা মানুষকে সতর্ক করার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা সূর্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বেচ্ছাচারী মনে কর না। আল্লাহর ইচ্ছায়ই সূর্য অনুগামী হাদীসে আল্লাহর অনুগত হওয়াকেই সেজদাবনত হয় বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বস্তুর সেজদা তার অবস্থা মাফিক হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন- كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার ইবাদত ও তাসবীহের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত। যেমনিভাবে মানুষকে তার সালাত ও তাসবীহের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তার ইবাদত ও তাসবীহের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সূর্যের সেজদা করার দ্বারা মানুষের জমিনে মাথা ঠেকানো বুঝা সঠিক হবে না।

কুরআন হাদীসের উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সূর্য ও চন্দ্র গতিশীল। একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এরা পরিভ্রমণ করবে। আধুনিক জড়বিজ্ঞানীগণও এ ধারণা পোষণ করেন। তবে পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, 'সূর্য স্থির' এটা কুরআন হাদীস অনুযায়ী না হওয়ায় এটা ভুল প্রমাণিত হলো।

চন্দ্র ও সূর্যের মঞ্জিলসমূহের বিবরণ : مَنَازِلَ এটা مَنْزِلٌ -এর বহুবচন। অর্থ- অবতরণের স্থল। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলাচলের জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চন্দ্র ও সূর্যের ভ্রমণের জন্য আল্লাহ আকাশে বারটি রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাকে বুরূজ বলা হয় এবং চন্দ্র ও সূর্য এ বারটি বুরূজ দিয়েই চলাচল করে। এ ছাড়া এদের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন মঞ্জিলও রয়েছে। চাঁদ তার মঞ্জিলসমূহকে ২৮ রাতে অতিক্রম করে। প্রত্যেক রাতে একটি করে ২৮ রাত পর্যন্ত অতিক্রম করার পর চাঁদ দু' রাত অদৃশ্য থাকে। আর মাস যদি ২৯ দিনে হয়, তবে এক রাত অদৃশ্য থাকে। এ মঞ্জিলগুলো বার বুরূজে বিভক্ত।

তদ্রূপ সূর্যেরও ২৮টি মনজিল রয়েছে। সে সকল মঞ্জিলগুলো ও বার ভাগে বিভক্ত। সূর্যের চেয়ে চন্দ্রের গতি অনেক দ্রুত এ জন্য চন্দ্র মাত্র একমাসের মধ্যেই তার মঞ্জিলসমূহ পরিভ্রমণ করে ফেলে। অথচ এ কাজ সমাধা করতে সূর্যের এক বছর সময় লেগে যায়। যথা- ঘড়ির মিনিটের কাটা ঘণ্টায় ৬০ মঞ্জিল অতিক্রম করে অথচ ততক্ষণে ঘণ্টার কাটা মাত্র পাঁচ মঞ্জিল অতিক্রম করে।

উল্লেখ্য যে, চন্দ্র ও সূর্যের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- চাঁদের মঞ্জিলগুলো চোখে দেখা যায়, আর সূর্যের মঞ্জিলগুলো হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জানা যায়।

স্বয়ং চাঁদের মঞ্জিল হওয়া না হওয়া : وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ চাঁদকেই মঞ্জিল হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। অথচ বাস্তব কথা তা নয় বরং চাঁদের পরিভ্রমণের জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত রয়েছে।

ইমাম যামখশরী (র.) বলেন- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ আয়াতে قَدَّرْنَا -এর পরে এবং ه যমীরের পূর্বে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ বাক্যটি হবে- وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا سَيْرَهٗ مَنَازِلَ অর্থাৎ আমরা চাঁদের পরিভ্রমণকে মঞ্জিল হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

অথবা, قَدَّرْنَاهُ -এর ه যমীরের পরে একটি ذَا উহ্য রয়েছে তখন ইবারত হবে وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ ذَا مَنَازِلَ অর্থাৎ আমরা চাঁদকে অনেক মঞ্জিলে নির্ধারণ করেছি। এ অবস্থায় পূর্বোক্ত প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। কেননা, ذُو الشَّيْءِ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّيْءِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর মালিক ঐ জিনিসের নিকটবর্তী। আর এ কারণেই আল্লাহ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ বলেছেন। -[কাশশাফ, কাবীর]

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ -এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে العرجون শব্দটির অর্থ হলো– খর্জুর গাছের এমন ডাল, যা বেঁকে কামানের মতো হয়ে যায়। এখানে মাসের শেষভাগের চাঁদের আকারের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্ণিমার পর যা হ্রাস পেতে পেতে কামানের আকার ধারণ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে একে আরবীয়গণ খেজুরের শুষ্ক ডালের সাথে তুলনা করেছেন।

চাঁদ হ্রাস-বৃদ্ধি পায় কিনা? বাস্তবিক পক্ষে চাঁদের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এটা একটাই চাঁদ গতিশীল এবং বিভিন্ন সময় তা বিভিন্ন মঞ্জিলে অবস্থান করায় আমরা দূর হতে আমাদের চর্ম চোখে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখতে পাই। তাই কখনো আমরা চাঁদকে ছোট দেখি, কখনো বড় দেখি, কখনো আবার দেখতেই পাই না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এ মত প্রকাশ করেছেন যে, চাঁদ মূলত ছোট বড়, মোটা-চিকন হয় না।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

- চন্দ্রকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে আনার ক্ষমতা সূর্যের নেই। অথবা সূর্য চন্দ্রের পরিভ্রমণ কক্ষে প্রবেশ করে চাঁদের সাথে সংঘর্ষ জড়িয়ে যেতে পারে না।
- আল্লাহ তা'আলা চাঁদের উদয় অস্তের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সময়ে সূর্যের পক্ষে আগমন করা সম্ভব নয়। তাই চাদনী রাতে হঠাৎ করে সূর্যের আগমন ঘটা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব। অপর দিকে দিবসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই রজনীর আবির্ভাব ঘটা এবং রাতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই দিনের আগমন ঘটাও অসম্ভব।

فَلَك -এর অর্থ এবং প্রত্যেক নক্ষত্রের জন্য فَلَك রয়েছে কিনা? فَلَك -এর আভিধানিক অর্থ– আকাশ। তবে এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে فَلَك দ্বারা নক্ষত্র বিচরণকারী পথকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, চাঁদ কোথাও স্থিতিশীল থাকে না; বরং আকাশের নিচে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে চাঁদ বিচরণ করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চাঁদে মানুষের পদার্পণের ঘটনাসমূহ এটাকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে। শুধু চাঁদই নয় বরং সূর্য সহ অন্যান্য নক্ষত্রসমূহ আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করছে।

এ আয়াতে চারটি মহা সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. চন্দ্র-সূর্যসহ আকাশের সকল নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহই সর্বদা গতিশীল।

২. গ্রহ ও নক্ষত্র প্রত্যেকেরই নিজস্ব কক্ষ পথ রয়েছে।

৩. নক্ষত্রসহ আকাশ মণ্ডল আবর্তিত হয় না; বরং নক্ষত্ররাজি আকাশমণ্ডলে আবর্তিত হয়।

৪. যেরূপে কোনো তরল প্রবহমান বস্তুতে কোনো বস্তু সাতার কাটে অনেকটা সেরূপ হচ্ছে আকাশমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির গতির প্রকৃতি।

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি গ্রহ ও নক্ষত্রের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষপথ রয়েছে। আর প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করছে। চন্দ্র ও সূর্য তাদের কক্ষপথে বারটি স্থান পরিভ্রমণ করে। এদেরকে بُرْج বলা হয়। এগুলো হলো–

١. سُنْبُلَةٌ . ٢. مِيْزَانٌ . ٣. عَقْرَبٌ . ٤. قَوْسٌ . ٥. جَدْيٌ . ٦. دَلْوٌ . ٧. حَمَلٌ . ٨. ثَوْرٌ . ٩. جَوْزَا . ١٠. سَرَطَانٌ . ١١. اَلْاَسَدُ . ١٢. حُوْتٌ .

يَسْبَحُوْنَ -এর মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলো غَيْرِ عَاقِلَة হওয়া সত্ত্বেও কেন نُوْن ও وَاو দ্বারা বহুবচন নেওয়া হলো? নাহবী বিধান মতে সাধারণত عَاقِلَة বা বিবেকবানদের বহুবচন وَاو এবং نُوْن দ্বারা নেওয়া হয়। এখানে চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এরা কোনোটাই বিবেকবান নয় তারপরও কেন يَسْبَحُوْنَ -এর মধ্যে وَاو এবং نُوْن দ্বারা বহুবচন নেওয়া হলো?

জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে বিবেকহীনকে বিবেকবানের স্থলাভিষিক্ত করেছেন বিধায় وَاو এবং نُوْن দ্বারা বহুবচন নিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এরূপ উপমা রয়েছে।

অনুবাদ :

٤١. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ عَلٰى قُدْرَتِنَا اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ ذُرِّيَّاتِهِمْ اَىْ اٰبَاءَهُمُ الْاُصُوْلَ فِى الْفُلْكِ اَىْ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ الْمَشْحُوْنِ الْمَمْلُوْءِ .

৪১. আর তাদের জন্য নিদর্শন আমার কুদরতের উপর এই যে, আমি আরোহণ করিয়েছি। তাদের বংশধরদেরকে এক কেরাত রয়েছে ذُرِّيَّاتِهِمْ বহুবচনের সাথে অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষগণকে নৌকার মধ্যে অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় বোঝাই করা পরিপূর্ণ।

٤٢. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ اَىْ مِثْلِ فُلْكِ نُوْحٍ وَهُوَ مَا عَمِلُوْهُ عَلٰى شَكْلِهِ مِنَ السُّفُنِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ بِتَعْلِيْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا يَرْكَبُوْنَ فِيْهِ .

৪২. আর তাদের জন্য তার ন্যায় সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর নৌকার ন্যায়। তা হলো লোকেরা আল্লাহর তালিমে সেই (নূহের) নৌকার আকারে যেসব ছোট বড় নৌকাসমূহ [পরবর্তীতে] তৈরি করেছে। যাতে তারা আরোহণ করে– যার মধ্যে।

٤٣. وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ مَعَ اِيْجَادِ السُّفُنِ فَلَا صَرِيْخَ مُغِيْثَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ يُنْجَوْنَ .

৪৩. অথচ আমি চাইলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি নৌকা আবিষ্কার করা সত্ত্বেও। তখন নালিশ শ্রবণ করার মতো কেউ থাকবে না। কোনো সাহায্যকারী তাদের জন্য। আর তারা পরিত্রাণ পাবে না– নাজাত পাবে না।

٤٤. اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ اَىْ لَا يُنْجِيْهِمْ اِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَّا لَهُمْ وَتَمْتِيْعُنَا اِيَّاهُمْ بِلَذَّاتِهِمْ اِلٰى اِنْقِضَاءِ اٰجَالِهِمْ .

৪৪. তবে যদি আমার রহমত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে উপভোগের সুযোগ দান করি তাহলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ তা রক্ষা পাবে না তবে দু অবস্থায় রক্ষা পাবে। এক. আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহ হলে এবং দুই. মৃত্যু অবধি তাদেরকে আমার পক্ষ হতে সুযোগ দানের মাধ্যমে।

٤٥. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا كَغَيْرِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ اَعْرَضُوْا .

৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমাদের সম্মুখে যা রয়েছে তাকে ভয় করো। (অর্থাৎ) দুনিয়ার আজাব অন্যান্যদের ন্যায় এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে তাকেও ভয় করো। অর্থাৎ আখেরাতের আজাব। যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা যেতে পারে। তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٤٦. وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ .

৪৬. আর যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে কোনো নিদর্শন আগমন করে, তখনই তা হতে তারা বিমুখ হয়ে যায়।

٤٧. وَإِذَا قِيْلَ أَيْ قَالَ فُقَرَاءُ الصَّحَابَةِ لَهُمْ أَنْفِقُوْا عَلَيْنَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ مِنَ الْأَمْوَالِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتِهْزَاءً بِهِمْ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ أَطْعَمَهُ فِيْ مُعْتَقَدِكُمْ هٰذَا إِنْ مَا أَنْتُمْ فِيْ قَوْلِكُمْ لَنَا ذٰلِكَ مَعَ مُعْتَقَدِكُمْ هٰذَا إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ وَالتَّصْرِيْحُ بِكُفْرِهِمْ مَوْقِعٌ عَظِيْمٌ.

৪৭. আর যখন বলা হয় অর্থাৎ দরিদ্র সাহাবীগণ (রা.) বলে তাদেরকে লক্ষ্য করে ব্যয় করো আমাদের উপর– যা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রিজিক হিসেবে দান করেছেন– অর্থাৎ যেই সম্পদ তোমাদেরকে দান করেছেন। তখন কাফেররা প্রত্যুত্তরে ঈমানদারগণকে বলে– তার সাথে বিদ্রূপ করত যাকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন আমি কি তাকে খাওয়াবো? তোমরা তো এরূপ ধারণা পোষণ কর। তোমরা তো– তোমাদের এ আকিদা-বিশ্বাস সত্ত্বেও আমাদের নিকট ঐ বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে স্পষ্ট গোমরাহীতে [বিভ্রান্তিতে] লিপ্ত রয়েছে। (مُبِيْنٍ অর্থ) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। অত্র আয়াতে খোলাখুলিভাবে তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করায় প্রতীয়মান হয় যে, এটা জঘন্য কুফর [সাংঘাতিক অপরাধ]।

তাহকীক ও তারকীব

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا আয়াতে رَحْمَةً -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে رَحْمَةً শব্দটি মহল্লান মানসূব হয়েছে। তবে মানসূব হওয়ার কারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

- কেসায়ীর মতে, رَحْمَةً টি مُسْتَثْنٰى হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।
- ইমাম যুজাজের মতে, مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

وَمَتَاعًا إِلٰى حِيْنٍ -এর মধ্যে إِلٰى حِيْنٍ -এর অর্থ : এখানে إِلٰى حِيْنٍ -এর অর্থ নিয়ে দুটি মত পরিলক্ষিত হয়।

- হযরত কাতাদাহ (র.)-এর মতে, إِلٰى حِيْنٍ অর্থ হচ্ছে– إِلَى الْمَوْتِ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত।
- ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (র.)-এর মতে, إِلٰى حِيْنٍ অর্থ إِلَى الْقِيَامَةِ এ সুরতে আয়াতের অর্থ হবে–

إِلَّا أَنْ نَرْحَمَهُمْ وَنُمَتِّعَهُمْ إِلٰى آجَالِهِمْ وَأَنَّ اللّٰهَ عَجَّلَ عَذَابَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَأَخَّرَ عَذَابَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنْ كَذَّبُوْهُ إِلَى الْمَوْتِ وَالْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, তবে আমার অনুগ্রহের কারণে তাদেরকে তার মৃত্যু অবধি সুযোগ প্রদানের ফলে তারা রেহাই পাচ্ছে ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করছে আর আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সাথে সাথে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু শেষ নবীর উম্মতদের শাস্তিকে মৃত্যু ও কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন যদিও তারা রাসূল ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক না কেন।

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ الخ আয়াতে آيَةٍ -এর অর্থ : এখানে آيَةٍ শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে।

১. আল্লাহর কিতাবের আয়াত যার দ্বারা মানুষকে উপদেশ প্রদান করা হয়।

২. বিশ্ব প্রকৃতির এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব ও ইতিহাসে বিদ্যমান নিদর্শনাবলি যা হতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে।

১. এ আয়াতটি মক্কার কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূল ﷺ -এর দরিদ্র সাহাবায়ে কেরাম যখন তাদেরকে বললেন যে, তোমরা আল্লাহর জন্য তোমাদের সম্পদের যে অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ তা হতে দান কর। তারা তখন উপহাস ও তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারেন আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব? এটা হতে পারে না অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন– وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا অর্থাৎ তারা তাদের পশু ও ফসলের একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিল।" তবুও তারা তাদেরকে বঞ্চিত করল। আর বলল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে খাওয়াতে পারেন। যে বিশ্বাস তোমরা পোষণ করে থাক। তাই কেন আমরা তোমাদেরকে খাওয়াব। তোমাদের আল্লাহর প্রতি এত অগাধ বিশ্বাস থাকার পরও খাদ্যের জন্য আমাদের নিকট ধন্না দেওয়া স্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

২. যখন বিশ্বাসীগণ কাফেরদেরকে অসহায় দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার জন্য উপদেশ দিতেন তখন তারা বলল, আল্লাহই তো তোমাদের বিশ্বাস অনুপাতে রিজিকদাতা। তিনি তাদেরকে কেন রিজিক হতে মাহরূম করলেন? তাদেরকে যদি আমরা রিজিক প্রদান করি তবে আমরাই রিজিকদাতা হয়ে যাই। কাজেই আমাদেরকে দান-সদকার উপদেশ করার মাধ্যমে তোমরা স্পষ্টতই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

৩. আয়াতটি মক্কার মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তাদেরকে দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি দান-সদকা করার জন্য বলা হতো তখন তারা বলত। আল্লাহর কসম! আমরা কিছুতেই তাদেরকে দান করতে পারব না। তাদেরকে আল্লাহ অসহায় দরিদ্র করবেন আর আমরা তাদেরকে খাওয়াব তা হতে পারে না। অনুরূপই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে।

৪ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) একদা দরিদ্র মুসলমানদেরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছিলেন, তখন সেখানে আবূ জাহল উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবূ বকর! তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ এদেরকে খাওয়াতে সক্ষম? হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা বিশ্বাস করি। আবূ জাহল বলল, তবে আল্লাহ এদেরকে খাওয়াচ্ছেন না কেন? জবাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অভাব-অনটন দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, তারা ধৈর্য ধরতে পারে কিনা? আবার কাউকে অঢেল ধনসম্পদ দান করেও পরীক্ষা করেন যে, সে কি সম্পদের মোহে পড়ে অহংকারী হয়ে যায়, না আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে। আর ফকির মিসকিনদেরকে দান খয়রাত করে। এ কথা শুনে আবূ জাহল হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, শপথ খোদার! হে আবূ বকর তুমি নিশ্চিতভাবে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছ। তুমি কি করে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ তাদেরকে খাওয়াতে সক্ষম, অথচ তিনি তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন না; বরং তুমি তাদেরকে খাওয়াচ্ছ, তখনই উপরিউক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, অভাবীদের প্রতি তোমাদের দান-সদকা করার উপদেশ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তোমাদেরকে তাদের জন্য রিজিকদাতা বানিয়ে দেওয়া হবে। অথবা আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষণ করাতে অক্ষম। আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক হতেই তো তাদেরকে দিতে বলা হয়েছে। আর তোমাদের জন্য তো এতে রয়েছে এক মহাপরীক্ষা। তা হচ্ছে– নিষ্কলুষ হৃদয়ে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে দান-খয়রাত করতে পার কি-না? আর তাদের জন্য রয়েছে অভাব অনটন সত্ত্বেও ধৈর্যধারণের কঠিন পরীক্ষা। অন্যথায় তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে অতিরিক্ত দান করতে সক্ষম হয়েছেন অনুরূপভাবে তাদেরকেও দান করতে পারতেন।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الخ -এর সাথে পূর্বোক্ত আয়াতের সম্পর্ক : ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর তিনটি সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন।

১. পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ ও অন্যান্য জীব যে মাটিতে বসবাস করে সেই নিষ্প্রাণ মাটিতে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর আরেকটি অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ মানুষকে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভৃত উন্নতি সাধন ও লাভবান হওয়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আবার তাদের জন্য স্থল ভাগেও বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২. পূর্বের আয়াতে আকাশের কতেক নিদর্শনাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে পৃথিবীর কতিপয় নিদর্শনাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাগণের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ দান করেছেন তা দু'ধরনের। প্রথমটি অত্যাবশ্যক। আর দ্বিতীয়টি হলো– অত্যাবশ্যক নয় তবে কল্যাণকর ও সৌন্দর্য বর্ধক। কাজেই প্রথমটি সৃষ্টি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। আর দ্বিতীয় হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধির ও উপভোগ করার জন্য। আর জমিন সৃষ্টি ও এতে প্রাণের সঞ্চার করা প্রথমোক্ত পর্যায়ভুক্ত। কারণ যদি মাটি সৃষ্টি করা না হতো এবং এতে প্রাণের সঞ্চার না করা হতো, তবে মানবের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। রাত-দিনও প্রথম শ্রেণিভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহে প্রথমোক্ত শ্রেণির কতিপয় বস্তুর উল্লেখ করার পর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির কয়েকটি বস্তুর বর্ণনা করেছেন। কাজেই জলযান ও স্থলযানের মাধ্যমে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত হবে। এটা মানুষের আবশ্যক বস্তুসমূহের উপর বাড়তি অনুদান যা মানবের জন্য কল্যাণকর ও সৌন্দর্য বর্ধক। –[কাবীর]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ الخ আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বের আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর হিকমত ও কুদরতের প্রকাশ স্থলসমূহের উল্লেখ করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। তা গ্রহণ করলে পরকালে বেহেশত লাভের মাধ্যমে সীমাহীন শান্তি পাওয়ার ও প্রত্যাখ্যান করলে জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতে মক্কার কাফেরদের বক্রতার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের অবস্থা হচ্ছে– ছওয়াব ও শাস্তির প্রত্যাশা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আজাব ও গজবের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারে না। তাদের মন মগজ এতই কলুষিত হয়ে রয়েছে যে, কোনো জিনিসই তাদের মাঝে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : প্রথমে পৃথিবীর সৃষ্টি রাজি ও পরবর্তীতে আকাশের বিবরণ এবং এদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সুনিপুণ কৌশলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সমুদ্র ও তার সংশ্লিষ্ট বস্তু নিয়ে তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশের আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত ভারি ও বোঝাই করা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নৌযানকে সমুদ্র পৃষ্ঠে চলাচলের উপযোগী করে বানিয়েছেন। পানি তাদেরকে নিমজ্জিত না করে দূরদেশে নিয়ে যায়। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি তাদের সন্তানদেরকে আরোহণ করিয়েছি। বাস্তবিক পক্ষে আরোহণকারী তারা নিজরাই ছিল। মানুষের বোঝা সন্তান-সন্ততি হওয়ার কারণে এখানে সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে যখন সন্তান চলাফেরার উপযোগী না হয়।

আয়াতের অর্থ হচ্ছে– তোমরাই যে তাতে আরোহণ কর তা নয়; বরং ছোট ছেলে মেয়ে দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকজন এবং তাদের সামনে সবই এসব নৌকায় বহন করা হয়।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ -এর সার হচ্ছে– মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য আল্লাহ শুধু নৌযানই সৃষ্টি করেননি, এর সাথে বাহনও সৃষ্টি করেছেন । আরববাসীগণ এর দ্বার তাদের অভ্যাস অনুযায়ী উটকে বুঝেছেন। কারণ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উট অধিক বোঝা বহনে সক্ষম হতো। উট বিশাল বিশাল বোঝার স্তূপ বহন করে দেশ দেশান্তরে ছুটে যায়। তাই তারা উটকে سَفِيْنَةُ الْبَرِّ বা মরুর জাহাজ বলত।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে কুরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ : وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ আয়াতে উট বা অন্য কোনো আরোহী প্রাণীর কথা উল্লেখ না করে তা অস্পষ্ট রেখেছেন। এতে সকল বাহনই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মানুষের বোঝাসমূহ দূর-দূরান্তে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারে। বর্তমান যুগের উড়োজাহাজও প্রমাণ করে যে, مِّنْ مِّثْلِهٖ -এর সবচেয়ে বড় উপমা এটাই। আর নৌযানের সাথে এর সামঞ্জস্য অত্যধিক। সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ সাতার কাটে অথচ ডুবে যায় না। তদ্রূপ উড়োজাহাজও আকাশের বায়ুমণ্ডলে সাতার কাটে অথচ পড়ে যায় না। আর এ কারণেই আল্লাহ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ -কে উহ্য রেখেছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল যানবাহন তাতে শামিল হতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

"وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ" **-এর তাফসীর :** আল্লাহর নিদর্শনাবলি বিশেষ একদল কাফেরের মন-মস্তিষ্কে কোনোরূপ পরিবর্তন ও প্রভাব ফেলতে পারে না। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে সাহায্য করে না। তবে যারা নিরপেক্ষভাবে এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করার ইচ্ছা করে সত্য গ্রহণে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার জন্য তৈরি থাকে। তার হৃদয়ে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রভাব বিস্তার করবে। এছাড়া পবিত্র কুরআন তাদেরকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে সত্যকে বিবেচনা করে দেখার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে– তারা এটা দেখতে রাজি নয়। এত কিছুর পরও আল্লাহর অনুগ্রহ তাদেরকে পরিত্যাগ করেনি; বরং তাদেরকে রাসূলগণের মাধ্যমে বারংবার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** এ আয়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ "যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে"-এর দ্বারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আখেরাতের জন্য নেক আমল সংগ্রহ কর আর দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকো। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।
- তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেন, ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যে সকল কাফের মুশরিক আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে, তাদের সেসব ঘটনাবলিকে مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর وَمَا خَلْفَكُمْ দ্বারা আখেরাতের আজাবকে বুঝানো হয়েছে।
- কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, এর দ্বারা আসমানি জমিনি বালা-মসিবতকে বুঝানো হয়েছে।
- কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন– مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ হলো দুনিয়ার আজাব, আর وَمَا خَلْفَكُمْ হলো আখেরাতের আজাব।
- কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো আগের পরের গুনাহসমূহ।
- কেউ কেউ বলেন, مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ অর্থ যা তোমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে, আর وَمَا خَلْفَكُمْ অর্থ যা অপ্রকাশিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর।

"وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ الخ" **-এর বিশদ ব্যাখ্যা :**

একদলকে অপরের মাধ্যমে রিজিক দানের হিকমত : যখন মুসলমানগণ কাফেরদেরকে গরিব-অভাবীদেরকে সাহায্য করতে এবং ভুখা-নাঙ্গাদেরকে খাওয়াতে বলে– তোমাদেরকে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে অভাবীদেরকে দান কর– তখন তারা বিদ্রূপ করে বলে, যখন তোমরা দাবি কর যে, সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা অথচ তিনি তাদেরকে দেননি– তখন আমরা কেন তাদেরকে দান করব? তোমরা যে আমাদেরকে নসিহত কর যে, তাদেরকে দান করার জন্য; এটাতো তোমাদের বিভ্রান্তি। তাতে আমাদেরকে রিজিকদাতা বানাতে চাচ্ছ। অথচ মূলতঃ এ কাফেররা ও আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে স্বীকার করে। যেমন একটি আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়– وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আকাশ হতে কে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে? যদ্দরুন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর জমিনকে ঐ পানির দ্বারা সঞ্জীব করেন। জবাবে তারা অবশ্যই বলবে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ।"

এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তারাও আল্লাহ তা'আলাকেই রিজিকদাতা মনে করতেন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে বিদ্রূপ করতে গিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছে মাত্র। আল্লাহ যখন রিজিকদাতা সুতরাং তিনিই গরিবদেরকে দান করবেন। আমরা তাদেরকে দিতে যাব কেন? যেন ঐ আহমকেরা আল্লাহর পথে ব্যয় করা ও গরিব-মিস্‌কিনদেরকে দান করাকে আল্লাহর রিজিকদাতা হওয়ার বিরোধী মনে করেছে। অথচ তারা এটা বুঝিয়ে উঠতে পারেনি যে, সর্ব রিজিকদাতা আল্লাহ তা'আলা কৌশলপূর্ণ রীতি হলো, এক জনকে দান করত তাকে অন্যান্যদের জন্য মাধ্যম বানিয়ে থাকেন। আর উক্ত মাধ্যম-এর দ্বারা অন্যদেরকে রিজিক দান করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তিনি প্রত্যেককেই বিনা মাধ্যমে সরাসরি রিজিক প্রদান করতে পারেন। যেমন– অসংখ্য কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীকুলকে আল্লাহ তা'আলা বিনা মাধ্যমে সরাসরি রিজিক দান করেন। তাদের মধ্যে ধনী-গরিবের নেই। কেউ কাউকে দান করে না। সকলেই কুদরতি দস্তরখান হতে আহার গ্রহণ করে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে জীবন-ধারণের শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চারের নিমিত্তে রিজিক প্রদানের জন্য এক দলকে অপর দলের জন্য মাধ্যম বানিয়েছেন। যাতে ব্যয়কারী ছওয়াবের অধিকারী হয় এবং যাদেরকে দেওয়া হবে তারা কৃতজ্ঞতা পালনকারী হয়। কেননা পরস্পরের প্রয়োজনের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ভরশীল। আর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপরই বিশাল মানব সভ্যতার সৌধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব ঘটলে মুহূর্তের মধ্যে উক্ত সৌধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে বাধ্য।

মোটকথা, গরিবের প্রয়োজন ধনবানদের সম্পদের আর ধনীদের প্রয়োজন গরিবের পরিশ্রমের। তাদের প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী। আর চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কারও অন্যের উপর অনুগ্রহেরও তেমন কিছু নেই। যা কিছু একে অপরকে দেয় তার গরজেই দেয়।

মুসলিমগণ কাফেরদেরকে ব্যয় করতে বলার কারণ : প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলিমগণ কাফেরদেরকে কিসের ভিত্তিতে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য বলেছিলেন? অথচ তারা তো আল্লাহর উপর ঈমানই আনেনি। তা ছাড়া শাখামূলক আহকাম দ্বারা তাদেরকে সম্বোধনও করা হয়নি।

তার জবাবে বলা যেতে পারে যে, মুসলিমগণ কোনো শরয়ী নির্দেশ হিসেবে তাদেরকে তা বলেননি; বরং মানবিক সাহায্য এবং ভদ্রতার প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী তা বলেছেন।

ذُرِّيَّةً শব্দে বর্ণিত অর্থসমূহ : কুরআনের আয়াত إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ -এর মধ্যস্থ ذُرِّيَّةً -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন।

- ذُرِّيَّةً -এর অর্থ হলো اَلْاٰبَاءُ وَالْاَجْدَادُ তথা পূর্ব পুরুষগণ।
- আল্লামা ওয়াহেদীর মতে, اَلذُّرِّيَّةُ تَقَعُ عَلَى الْاٰبَاءِ كَمَا تَقَعُ عَلَى الْاَبْنَاءِ অর্থাৎ ذُرِّيَّةً শব্দটি যেরূপভাবে অধঃস্তন পুরুষকে বুঝায় অনুরূপভাবে উর্ধ্বতন পুরুষকেও বুঝায়।
- শায়খ আবূ ওসমানের মতে, سُمِّيَ الْاٰبَاءُ ذُرِّيَّةً لِاَنَّ مِنْهُمْ ذَرْءَ الْاَبْنَاءِ অর্থাৎ যেহেতু পূর্বপুরুষগণ হতে সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে তাই তাদেরকে ذُرِّيَّةً বলা হয়।
- ذُرِّيَّةً -এর অর্থ হচ্ছে নারীদের পেটের জমাট বীর্য। ঐ পেটকে পরিপূর্ণ নৌকার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।
- কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তিটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]
- কারো মতে ذُرِّيَّةً দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল পূর্ব পুরুষ যাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করানো হয়েছিল।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ -এর মধ্যস্থিত যমীরের মারজি' : উক্ত আয়াতে যমীরদ্বয়ের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. হযরত নাফে' (র.) ذُرِّيَّاتَهُمْ বহুবচনের সাথে পড়েছেন। তখন اٰيَةٌ لَّهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হবে اَهْلَ مَكَّةَ আর ذُرِّيَّتَهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হবে الْاُمَمُ الْمَاضِيَةُ তথা পূর্ববর্তী জাতিসমূহ। আয়াতটির অর্থ এরূপ হবে যে, وَاٰيَةٌ لِاَهْلِ مَكَّةَ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থাৎ মক্কাবাসীদের আরেকটি নিদর্শন হলো– আমি বিগত জাতিসমূহের সন্তানদেরকে বোঝাই করা নৌকায় আরোহণ করেছি।

২. আয়াতস্থ উভয় যমীরের মারজি' হলো اَهْلَ مَكَّةَ তখন আয়াতের অর্থ হবে– وَاٰيَةٌ لِاَهْلِ مَكَّةَ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةَ اَهْلِ مَكَّةَ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থাৎ মক্কাবাসীদের আরেকটি নিদর্শন হলো– আমি মক্কার সন্তানদেরকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ আয়াতে مِثْلِهِ -এর অর্থ : এখানে مِثْلِهِ শব্দটির একাধিক অর্থ হতে পারে :

- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ও কাতাদাহ (র.)-এর মতে আয়াতে مِثْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উট। অর্থাৎ আল্লাহ উটকে মরুর জাহাজের ন্যায় বানিয়েছেন।
- অথবা, আয়াতে مِثْل দ্বারা যে সকল প্রাণীর পরিবহনের ক্ষমতা রয়েছে তাদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে।
- হযরত যাহহাক (র.)-এর মতে, হযরত নূহ (আ.)-এর পরে যে সকল নৌকা তৈরি করা হয়েছে তাদেরকে مِثْل দ্বারা বুঝানো হয়েছে।
- আবূ মালিক (র.) বলেছেন, এখানে مِثْل দ্বারা সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌযানকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বড় বড় নৌযানের অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, এ আয়াতে مِثْل অর্থ নৌকা হবে। কেউ কেউ এটাকেই সহীহ বলেছেন।

অনুবাদ :

٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْبَعْثِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ .

৪৮. আর তারা বলে কখন এ ওয়াদা কার্যকর হবে? পুনরুত্থানের ব্যাপারে [কৃত ওয়াদা] যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক এ ব্যাপারে।

٤٩. قَالَ تَعَالٰى مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً وَهِيَ نَفْخَةُ إِسْرَافِيْلَ الْأُوْلٰى تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ أَصْلُهُ يَخْتَصِمُوْنَ نُقِلَتْ حَرَكَةُ التَّاءِ إِلَى الْخَاءِ وَأُدْغِمَتْ فِي الصَّادِ أَيْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ عَنْهَا بِتَخَاصُمٍ وَتَبَايُعٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَخْصِمُوْنَ كَيَضْرِبُوْنَ أَيْ يَخْصِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

৪৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তারা অপেক্ষা করছে না – প্রতীক্ষা করছে না– তবে একটি বিকট ধ্বনির আর তা হলো হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার। তা তাদেরকে ধরাশায়ী করবে এমতাবস্থায় যে, তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবে। (يَخِصِّمُوْنَ -এর ص অক্ষরটি) তাশদীদ যোগে হবে। এর প্রকৃত রূপ يَخْتَصِمُوْنَ . تَا -এর হরকতকে স্থানান্তর করতঃ خ -এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং تَا -কে ص -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ (বিকট ধ্বনিটি হলো) এমতাবস্থায় যে, তারা তা হতে বেখবর ছিল পরস্পর বাক-বিতণ্ডা, লেন-দেন ও পানাহার ইত্যাদিতে মশগুল থাকার কারণে। অন্য এক কেরাতে يَخْصِمُوْنَ [বাবে ضَرَبَ হতে] يَضْرِبُوْنَ -এর ওজনে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ তারা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে।

٥٠. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً أَيْ بِأَنْ يُّوْصُوْا وَلَا إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَأَشْغَالِهِمْ بَلْ يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا .

৫০. আর তারা না অসিয়ত করতে সক্ষম হবে (تَوْصِيَةً) অর্থাৎ অসিয়তকরণ। আর না তারা তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতে পারবে। তাদের বাজারসমূহ ও কর্মক্ষেত্রসমূহ হতে; বরং তথায় তারা মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَخِصِّمُوْنَ -এর মধ্যে বর্ণিত কেরাতসমূহ : يَخِصِّمُوْنَ শব্দটি পাঁচটি কেরাত রয়েছে–

১. يَخَصِّمُوْنَ অর্থাৎ خ এবং يَاء তে যবর আর ص -এ তাশদীদযুক্ত যবর দ্বারা পড়া। এটা আবূ আমের ও ইবনে কাছীর (র.)-এর অভিমত।

২. يَخْصِمُوْنَ অর্থাৎ يَاء -এর উপর যবর خ সাকিন এবং ص -এর নিচে যের এটা ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াছছাব, আ'মাশ ও হামযা (র.)-এর অভিমত।

৩. يَخِصِّمُوْنَ অর্থাৎ يا যবরযুক্ত, خ -এর নিচে যের এবং ص -এর নিচে তাশদীদযুক্ত যের। এটা আসিম ও কেসায়ী (র.)-এর অভিমত।

৪. ইবনে জুবায়ের, আবূ বকর ও হাম্মাদ (র.) কর্তৃক আসিম-এর বর্ণনা মতে يَاء এবং خَاء -এর নিচে যের এবং ص -এর উপর তাশদীদসহ যের যোগে পড়া يِخِصِّمُوْنَ।

৫. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাতে يَخْتَصِمُوْنَ রয়েছে। তাশদীদের অবস্থায় মূলত يَخْتَصِمُوْنَ ছিল। تَا -এর হরকতকে তার পূর্বের خ এ দিয়ে. تَا -কে ص দ্বারা পরিবর্তন করে ص কে ص এর মধ্যে إِدْغَامْ করা হয়েছে ফলে يَخَصِّمُوْنَ হয়েছে।

إِنْ كُنْتُمْ الخ শর্তের جَزَاء কোথায় এবং এর দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? إِنْ كُنْتُمْ শর্তে জাযা হচ্ছে উহ্য। মূল বাক্যটি এরূপ হবে– قَالُوْا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِيْ دَعْوَا كُمْ بِوُقُوْعِ الْبَعْثِ فَقُوْلُوْا مَتٰى يَكُوْنُ ذٰلِكَ অর্থাৎ পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কৃত দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে বল তা কখন সংঘটিত হবে।

এ আয়াতে কাফেররা নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণকে সম্বোধন করত উপরিউক্ত বক্তব্য প্রদান করেছে। কেননা তারাই তো কিয়ামত পুনরুত্থান ও হাশর-নাশরের দাবিদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে কাফেরদের চিন্তাধারা এবং আকীদা বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আজাব ও গজবের যে ভয় প্রদান করেছেন এবং নিয়ামত ও পুরস্কারের যে অঙ্গীকার করেছেন একাধিকবার পুনরুত্থানের যে উল্লেখ করেছেন কাফেরদের ধারণা মতে এর কোনোই বাস্তবতা নেই তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ধারণা পূর্ণরূপে অবাস্তব মনে করে এর প্রতি কটাক্ষ করারও দুঃসাহস দেখিয়েছে।

কিয়ামতের ব্যাপারে কাফেররা প্রশ্ন করল কেন? পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কাফেররা কিয়ামতের ব্যাপারে উপহাসছলে প্রশ্ন করেছে বাস্তবতা জানার উদ্দেশ্যে নয়। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তারা জানার জন্যই প্রশ্ন করেছে তবুও আল্লাহর হিকমতের চাহিদা হচ্ছে– কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কাউকেও দান করবেন না। এমনকি এ জ্ঞানের খবর তাঁরই প্রেরিত পয়গম্বরগণকেও প্রদান করেননি।

যদি ঐ ব্যক্তিদের উক্ত প্রশ্ন বাস্তব ঘটনা জানার জন্যও হয় তবুও অনর্থক হবে। কাজেই এর জবাবে কিয়ামতের বর্ণনা না দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যা নিশ্চিতভাবে সংঘটিতব্য তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হচ্ছে বিবেকবানদের কাজ। কবে হবে কখন হবে এ সকল নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনোই যুক্তি থাকতে পারে না।

মোটকথা হলো, মানুষের চাহিদার কারণে আল্লাহর পরিকল্পনায় কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিয়ামত যথা সময়েই সংঘটিত হবে। কেউ কোনো ব্যাপারে তাঁকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কারো মর্জি মতো এটাকে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হবে না।

কিভাবে ও কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে? কিয়ামত সংঘটিত হবে এত বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে এর দিন তারিখ গোপন রেখেছেন। এতদ্ব্যতীত এর সন তারিখ জানার মধ্যেও কোনো কামিয়াবি নেই।

কিয়ামত কিভাবে হবে? কিয়ামত এমন অবস্থায় আসবে যখন লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল থাকবে। কেউ হয়তো ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এমনকি কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকবে। কিয়ামত যে কায়েম হবে এ কথাটি কখনও তাদের স্মরণ হয় না। এমন অবস্থাতেই কিয়ামত এসে যাবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে, ব্যবসা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিক্রেতা এখন কাপড় সরিয়ে নেয়নি। এমন আকস্মিক অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হবে। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, মানুষ উটের দুধ নিয়ে আসবে, পান করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়। মানুষ খাবারের লোকমা মুখে দিবে কিন্তু খাওয়ার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। আর খেতে পারবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ফারিয়াবীর সূত্রে অন্য একখানা হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামত এমন অবস্থায় হবে যখন লোকেরা বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে, কাপড় পরিমাপ করবে উটের দুধ দোহন করবে এবং এমনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে। [আর এমন অবস্থায় কিয়ামত হবে। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন খণ্ড ২৩; পৃ. ৩২-৩৩]

উল্লিখিত আয়াতে اَلْوَعْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতে اَلْوَعْدُ দ্বারা পুনরুত্থান সম্পর্কিত অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। মহানবী ﷺ যে ব্যাপারে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

সারকথা হলো, মহানবী ﷺ -এর কিয়ামত, ভালো মন্দের হিসাব-নিকাশ, পুনরুত্থান, ছওয়াব ও আজাবের ব্যাপারে কৃত সকল প্রতিশ্রুতিই এখানে اَلْوَعْدُ -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিশ্চয় কাফেররা কিয়ামতকে স্বীকারই করে না এরপরও مَا يَنْظُرُوْنَ আয়াতে আল্লাহ কিভাবে বললেন তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে? মহানবী ﷺ-কে যদিও কাফেররা বারবার অহেতুক প্রশ্ন করে জর্জরিত করছিল। তবে তারা একবারের জন্যও ব্যাপারটির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা ও চিন্তা করেনি। এর সন তারিখ জানার চেয়েও যে, কিয়ামতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা অধিক শ্রেয় তা একবারের জন্যও ভেবে দেখেনি; বরং তারা এতই অসতর্ক ও বেখবর হয়ে রয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত আসুক পরে দেখা যাবে কি করতে হয়? আল্লাহ তা'আলা এ কারণেই বলেছেন যে, তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। আর এটাই এ আয়াতের সঠিক অর্থ। এর অর্থ এটা নয় যে, কাফেররা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে এর জন্য অপেক্ষা করছে এটা বুঝানো এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً হতে اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ -এর সাথে কাফেরদের তাওহীদ ছাড়া কিয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কেও মতবিরোধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করছেন যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র একটি বিকট ধ্বনির মাধ্যমে তা সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে কাফেররা পূর্ব কোনো সতর্ক বার্তাই সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে না। নিশ্চিতরূপে তারা ধারণা করে থাকবে যে, কিয়ামত বলতে কিছুই হবে না। তখন তারা নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকবে। হাতের কাজও সমাধা করার সুযোগ পাবে না। হঠাৎ করেই কিয়ামত এসে যাবে। পৃথিবীর সব কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়ারও অবকাশ পাবে না। আর কেউ কর্মস্থল হতে স্বীয় বাড়ি ফিরে যাওয়ারও ফুরসত পাবে না।

সারকথা হলো, তোমরা যে কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর এমন হঠাৎ করে সংঘটিত হবে যে, তোমরা বুঝেই উঠতে পারবে না। আর এর ছোবল ও আঘাত এতই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ হবে যে, এর ধকল কেউই সহ্য করতে সক্ষম হবে না। ছোট বড় সকলকেই তার হস্তে অসহায়ের মতো জীবন দিতে হবে।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতে যে বিকট শব্দের কথা বলা হয়েছে তা হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর শিঙ্গার ফুৎকার। এটা হবে প্রথম ফুৎকার। এর মাধ্যমেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর পরবর্তী ফুঁকে পুনরুত্থান হবে।

অনুবাদ :

৫১. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ هُوَ قَرْنُ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ لِلْبَعْثِ وَبَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً فَاِذَاهُمْ الْمَقْبُوْرُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْقُبُوْرِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ بِسُرْعَةٍ ـ

৫১. আর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, এটা পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার। উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। তখন তারা কবরস্থ লোকজন কবরসমূহ হতে সমাধিস্থল হতে তাদের প্রভুর নিকট দৌড়ে আসবে, তড়িঘড়ি বের হয়ে আসবে।

৫২. قَالُوْا اَىِ الْكُفَّارُ مِنْهُمْ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكُنَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا فِعْلَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتة لِاَنَّهُمْ كَانُوْا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ نَائِمِيْنَ لَمْ يُعَذَّبُوْا هٰذَا اَىِ الْبَعْثُ مَا اَىِ الَّذِىْ وَعَدَ بِهِ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ فِيْهِ الْمُرْسَلُوْنَ اَقَرُّوْا حِيْنَ لَا يَنْفَعُهُمُ الْاِقْرَارُ وَقِيْلَ يُقَالُ لَهُمْ ذٰلِكَ ـ

৫২. তারা বলবে অর্থাৎ তাদের মধ্যকার কাফেররা বলবে হায়! অবহিতকরণের জন্য নিপাত আমাদের ধ্বংস আমাদের। এটা মাসদার, তবে এটার শব্দ হতে কোনো فِعْل নির্গত হয় না। আমাদেরকে কে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে জাগ্রত করল? কেননা, কিয়ামত ও পুনরুত্থানের ফুৎকারদ্বয়ের মাঝামাঝি সময় তারা নিদ্রিত ছিল। তাদেরকে তখন আজাব দেওয়া হয়নি। এটা অর্থাৎ পুনরুত্থান তা (অর্থাৎ) যা ওয়াদা করেছেন– তার সাথে দয়াময় (আল্লাহ) আর সত্য বলেছেন– এর ব্যাপারে রাসূলগণ। এমন সময় তারা তা স্বীকার করবে যখন উক্ত স্বীকৃতি তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে তা বলা হবে।

৫৩. اِنْ مَا كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا عِنْدَنَا مُحْضَرُوْنَ ـ

৫৩. নয় (اِنْ শব্দটি مَا এর অর্থে ব্যবহৃত) তা তবে একটি বিকট ধ্বনি। সুতরাং তখন তাদেরকে একযোগে আমার কাছে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৫৪. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

৫৪. আজ কারও উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না তবে সে প্রতিদানই দেওয়া হবে যা তোমরা আমল করেছ।

তাহকীক ও তারকীব

يَاوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا الخ আয়াতে يَاوَيْلَنَا -এর কেরাতসমূহ : এখানে তিনটি কেরাত প্রসিদ্ধ রয়েছে।

১. يَا وَيْلَنَا এটাই বিশুদ্ধ কেরাত যা মাসহাফে ওসমানীতে বিদ্যমান।

২. يَا وَيْلَتَنَا অর্থ وَيْل এবং نَا-এর মাঝে একটি تَ বৃদ্ধি করে পড়া। এটা ইবনে আবী লায়লা হতে বর্ণিত।

৩. يَا وَيْلَتَا অর্থাৎ শেষে نُوْن -এর স্থানে تَا এনে পাঠ করা। এটা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا -এর মধ্যস্থ مَنْ -এর কেরাতসমূহ : এখানে مَنْ -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে।

১. مَنْ بَعَثَنَا অর্থাৎ من -এর মীমে যবর এবং بَعَثَنَا -এর ث -এর মধ্যেও যবর হবে। এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত ও মাসহাফে ওসমানীতে বিদ্যমান।

২. مِنْ بَعْثِنَا অর্থাৎ মীম ও ث উভয়ের নিচে যের হবে। এরূপ কেরাত হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

৩. مَنْ وَهَبَنَا এ কেরাত হযরত উবাই ইবনে জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ الخ' **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আয়াতের অর্থ হচ্ছে- আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া মাত্র তারা কবর হতে বের হয়ে প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়বার হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন তখন সাথে সাথে অনতিবিলম্বে সকল মানুষ কবর হতে বের হয়ে আল্লাহর মহান দরবারে হাজির হওয়ার জন্য চলতে থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে।

ইবনে আবী হাতিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দিলে সমস্ত মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। আর এর চল্লিশ বছর পর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিলে সকলে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে নিয়ে যাবেন।

আলোচ্য আয়াতে اجداث এটা جدث -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো কবর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ জীবিত হবে এবং হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত গমন করতে থাকবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে লোকেরা সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বে। কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির তুলনায় তারা কবরের কষ্টকে সহজ মনে করবে।

দুটি বিরোধী বিষয়ের মধ্যে ফুৎদ্বয়ের প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি : প্রলয় এবং পুনরুত্থান মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার কুদরত ও সীমাহীন কৌশলেরই পরিচায়ক। মূলত শিঙ্গায় ফুৎকার একটি সংকেত মাত্র। এর না প্রলয় সাধনের ক্ষমতা আছে আর না পুনরুত্থান সংঘটনের সামর্থ্য; বরং প্রলয় ও পুনর্জীবন আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় কুদরতে করে থাকেন।

আর যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, শিঙ্গার ফুৎকারের প্রভাবেই তা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই তা অসম্ভব নয় যে, তিনি একই বস্তুর প্রভাবে দ্বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে নিবেন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, শিঙ্গার কার্য হলো বস্তুর মধ্যে কম্পন ও স্থানান্তরের সৃষ্টি করা।

যেহেতু প্রথম ফুৎকার কার্যকরী হয়েছে মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণী ও সংঘটিত বস্তুর উপর সেহেতু তাদের মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে এরা লণ্ডভণ্ড হয়ে প্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় ফুৎকার কার্যকরী হয়েছে ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তুরাজির উপর। তাদের বিভিন্ন অংশে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে তারা মিলিত হয়ে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে- তথা পুনর্জীবনের সৃষ্টি হয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

দু ফুৎকারের মধ্যবর্তী ব্যবধান ও ফুৎকারের সংখ্যা : জালালাইন গ্রন্থকার (র.) আল্লামা মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ বৎসর সময়ের দূরত্ব রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) এ মতের সমর্থনে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসখানা নিম্নরূপ-

رَوَى الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً اَلْأُوْلٰى يُمِيْتُ اللّٰهُ بِهَا كُلَّ حَيٍّ وَالْأُخْرٰى يُحْيِى اللّٰهُ بِهَا كُلَّ مَيِّتٍ.

অর্থাৎ হযরত হাসান হতে মোবারক ইবনে ফাযালাহ বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান হবে। প্রথম ফুৎকারে আল্লাহ সকল জীবিতকে মৃত্যু দিবেন এবং দ্বিতীয় ফুৎকারে সকলকে পুনর্জীবিত করবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গা মুখে নিয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথমটিকে نَفْخَةُ الْفَزَعِ তথা ভীতির ফুৎকার বলে। এটা আকাশ পাতালের সকল কিছুকে প্রকম্পিত করে তুলবে। এতে সবকিছু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় ফুৎকারকে نَفْخَةُ الصَّعْقِ বা বেহুঁশির ফুৎকার বলে। এটা শোনা মাত্রই সকল কিছু বেহুঁশ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ ছাড়া তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমূল পরিবর্তন করে জমিনকে ভিন্নরূপ প্রদান করা হবে। উকাজ বাজারে বিক্রীত চাদরের ন্যায় তাকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হবে যে তার কোথাও সামান্যতম ভাঁজও থাকবে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা জমিনকে একটু ধাক্কার মতো দেবেন। এটা শুনে যে যেখানে মৃত্যুবরণ করে পড়ে রয়েছিল তথা হতে পরিবর্তিত জমিনের বুকে উঠে দাঁড়াবে। আর এটাই হচ্ছে তৃতীয় ফুৎকার। এটাকে বলা হয় نَفْخَةُ الْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ফুৎকার।

يَنْسِلُونَ ... فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى এবং فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার সমন্বয় : رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কবরবাসী কবর হতে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে। অন্য আয়াত فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা কবর হতে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। আয়াতদ্বয়ের মধ্যে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বৈপরীত্ব দেখা যায়। এর সমাধান কল্পে মুফাসসিরগণ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন। অর্থাৎ তারা কবর হতে উঠেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে। এরপর দ্রুত হাশরের মাঠের দিকে ছুটে চলবে।

অন্যান্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ মানুষদেরকে ডেকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে।

মোটকথা হলো, তারা প্রথমবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পরবর্তীতে ফেরেশতাগণের আহ্বানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৌড়ে ময়দানে মাশহারে যেতে বাধ্য থাকবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, দাড়ানো আর দৌড়ানো এক জিনিস নয় এ কথা সত্য, কিন্তু দাঁড়ানো সম্পূর্ণরূপে দৌড়ানোর পরিপন্থি নয়। আর দাঁড়ানো দৌড়ানোকেই অস্বীকার করে না। অর্থাৎ কারো দাঁড়িয়ে থাকা দৌড়ানোকে অস্বীকার করে না। কারণ পথচারী দাঁড়ানো অবস্থায় হাঁটে এবং প্রয়োজনে দৌড় দিয়ে থাকে। কাজেই আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনোই গরমিল নেই।

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর তাদের কবর কোথায় হবে? : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর তাদের কবর কোথায় হবে এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের অভিমত হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের দেহের অংশসমূহ জমাট করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখবেন। যেখানে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল সেখান থেকে সে বের হয়ে আসবে। অথবা أَجْدَاثٌ দ্বারা আলমে বরযখকে বুঝানো হয়েছে।

পাপী অনুগ্রহকারীর দিকে দৌড়ে আসে না। এরপরও আল্লাহ কিভাবে বললেন যে, কাফেররা আল্লাহর দিকে দৌড়ে যাবে? মুফাসসিরগণ এর জবাবে বলেছেন– কাফেররা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে ছুটে যাবে না; বরং তাদেরকে ফেরেশতাগণ তাড়িয়ে নেওয়ার কারণে তারা দৌড়ে যেতে বাধ্য হবে। যেরূপ অন্য আয়াতে রয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ অর্থাৎ প্রত্যেকের সাথেই একজন বিতাড়নকারী রয়েছে।

কাফেররা কিভাবে বলবে "يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا الخ" অথচ কবরে তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে?

১. কেউ কেউ বলেছেন, যদিও কাফেরদেরকে কবরের আজাব দেওয়া হবে কিন্তু দুই ফুৎকারের মাঝামাঝি সময়ে তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে না। সুতরাং হাশরের ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তারা হায় হুতাশ করে বলবে হায়! ধ্বংস আমাদের (জন্য অবধারিত) কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল হতে জাগ্রত করল।

২. কাফেররা যদিও কবরে আজাবে নিপতিত ছিল এবং তথায় তাদের আরামের জিন্দেগী ছিল না। তথাপি কিয়ামতের প্রথমদিকের আজাবের তুলনায়ও কবরের সেই আজাব অতি নগণ্য মনে হবে। মনে হবে তা যেন কোনো আজাবই ছিল না। সুতরাং তারা আফসোস করে বলবে– কে আমাদেরকে কবর হতে উত্তোলন করল, কবরে থাকাই আমাদের জন্য শ্রেয় ছিল।

আলোচ্য আয়াতে وَيْلٌ -কে আহ্বানের হিকমত : বিপদ অত্যাসন্ন হয়ে পড়লে অথবা মসিবতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এমন বিপদ সংকুল মুহূর্তে অস্থির হয়ে তখন সে ধ্বংসকে ডাকতে উদ্যত হয়; লয় ও ধ্বংস হয়ে যাওয়াকেই তখন সে বিপদ হতে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মনে করে থাকে। সম্ভবত হাশরের ময়দানে উপরিউক্ত কারণে কাফেররা ধ্বংস (وَيْلٌ) -কে আহ্বান করবে হাশরের কঠিন শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মৃত্যুকে কামনা করবে।

আল্লাহর বাণী 'مَنْ بَعَثَنَا' -এর মধ্যস্থিত প্রশ্নের উত্তর : কিয়ামতের দিবস হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার পর সমস্ত মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে যাবে। তারা হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত পদে ছুটবে আর বলবে– يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا হায়রে আমাদের নিপাত (হোক) কে নিদ্রাস্থল হতে আমাদেরকে জাগিয়ে আনল। এক মহা বিভীষিকার সামনে আমাদেরকে কে দাঁড় করিয়ে দিল।

উক্ত প্রশ্নের জবাব বিলুপ্ত রয়েছে। পরবর্তী আয়াত- "هٰذَا مَا وَعَدَ الخ" দ্বারা তা বোধগম্য হয়। আর তা হলো هٰذَا بَعْثُ অর্থাৎ যা তোমাদেরকে শয়নস্থল হতে উঠিয়ে হাশরে আল্লাহর বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তা হলো পুনরুত্থান- এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদার প্রতিফলন।

অত্র আয়াতে مَنْ بَعَثَنَا -এর সাথে يَا وَيْلَنَا -এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তাদেরকে শয়নস্থল হতে জাগ্রত করার নিদ্রাস্থল হতে উঠিয়ে আনার কারণে ধ্বংস কামনার কি সূত্র থাকতে পারে?

এটা তো দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পরে আলমে বারযখে তাদের মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার করে দেওয়া হলো যাতে তারা সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করতে পারত। তখন তাদেরকে সীমিত পরিমাণ আজাবও দেওয়া হয়েছে। যদিও কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকার তথা কিয়ামত হতে পুনরুত্থান এর মাঝামাঝি সময় তাদেরকে কোনো আজাব দেওয়া হয়নি। সে যাই হোক, হাশরের আজাবের তুলনায় কবরের আজাব ছিল অতি নগণ্য। তা ছাড়া এ প্রথম তারা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারল যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণ তাদেরকে যে অন্তহীন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা সমাগত। সুতরাং তখন তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে বলতে থাকবে এটাই কি সেই পুনরুত্থান? তাহলে তো এ অনন্ত শাস্তি হতে আমাদের জন্য ধ্বংস হয়ে যাওয়াই শ্রেয় হবে।

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ -এর প্রবক্তা কে? এ আয়াতের প্রবক্তা নির্ণয়ে মুফাসসিরগণ একাধিক মন্তব্য করেছেন।

- হযরত মুজাহিদ (র.)-এর সমর্থিত মতানুযায়ী এ আয়াতের প্রবক্তা হচ্ছেন মু'মিনগণ তারা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে একথা বলবেন।
- হযরত কাতাদাহ্ (র.) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতানুসারে আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দিয়েছেন তিনি কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এ কথা বললেন।
- হযরত ফররা ও অপর একদল মুফাসসিরের মতে ফেরেশতাগণ কাফেরদেকে লক্ষ্য করে এ উক্তি করেছেন।
- কারো কারো এর প্রবক্তা কাফেররা নিজেই তারা সেদিন পুনরুত্থান দিবসকে স্বীকার করে বলবে- এটাতো সেই পুনরুত্থান আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশ্য তাদের তখনকার স্বীকারোক্তির কোনোই কাজে আসবে না।

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ الخ আয়াতে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কি? এখানে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ণয়ে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে-

- পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত مَرْقَدِنَا হচ্ছে এর মারজি' তখন এটা مَرْقَدِنَا -এর সিফাত হবে। আর বাক্যটি هٰذَا পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যাবে। আর مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ الخ বাক্যটি পৃথক বাক্য হবে। অর্থ- কে আমাদেরকে এ শয্যাস্থান হতে তুলে আনল।
- অথবা اَلْبَعْثُ হচ্ছে- هٰذَا এর মারজি'। তখন বাক্যটি অর্থ এরূপ হবে- এটা সেই পুনরুত্থান করুণাময় আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর রাসূলগণ যার সততা ঘোষণা করেছেন।

অনুবাদ :

৫৫. إِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ بِسُكُوْنِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا عَمَّا فِيْهِ اَهْلُ النَّارِ مِمَّا يَلْتَذُّوْنَ بِهٖ كَافْتِضَاضِ الْاَبْكَارِ لَا شُغُلَ يَتْعَبُوْنَ فِيْهِ لِاَنَّ الْجَنَّةَ لَا نَصَبَ فِيْهَا فٰكِهُوْنَ نَاعِمُوْنَ خَبَرٌ ثَانٍ لِاِنَّ وَالْاَوَّلُ فِىْ شُغُلٍ .

৫৫. নিঃসন্দেহে জান্নাতীগণ মগ্ন হয়ে– (شُغُلٍ -এর) غ অক্ষরটি সাকিনও হতে পারে। পেশ যোগেও হতে পারে অর্থাৎ জাহান্নামিরা যেই [মসিবতের] অবস্থায় থাকবে জান্নাতিরা তা হতে মুক্ত থাকবে। উপভোগ্য বিষয়াদিতে [মশগুল থাকবে] যেমন কুমারী মেয়েদেরকে উপভোগ করা। এমন কিছুতে লিপ্ত হওয়া নয় যা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে। কেননা, জান্নাতে কোনোরূপ কষ্টের বালাই নেই। উপভোগ করবে। সম্ভোগ করবে। এটা (فٰكِهُوْنَ) إِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর। তার প্রথম خَبَرٌ হলো فِىْ شُغُلٍ।

৫৬. هُمْ مُبْتَدَأٌ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ اَوْ ظِلٍّ خَبَرٌ اَىْ لَا تُصِيْبُهُمُ الشَّمْسُ عَلَى الْاَرَائِكِ جَمْعُ اَرِيْكَةٍ وَهِىَ السَّرِيْرُ فِى الْحَجْلَةِ اَوِ الْفُرُشُ فِيْهَا مُتَّكِـُٔوْنَ . خَبَرٌ ثَانٍ مُتَعَلِّقٌ عَلٰى .

৫৬. তারা (هُمْ) মুবতাদা এবং তাদের স্ত্রীগণ ছায়া তলে থাকবে (ظِلٰلٍ শব্দটি) ظُلَّةٌ অথবা ظِلَّةٌ -এর বহুবচন। এটা خَبَرٌ অর্থাৎ তাদেরকে সূর্যের কিরণ স্পর্শ করবে না। খাটসমূহের উপর– এটা (اَرَائِكُ) اَرِيْكَةٌ -এর বহুবচন। আর তা হলো (নব দম্পত্তির জন্য তৈরি) গম্বুজ (বা মশারি) বিশিষ্ট শোয়ার খাট। অথবা, তৎ মধ্যস্থ (পাতানো) বিছানা। তারা হেলান দিয়ে থাকবে। (مُتَّكِـُٔوْنَ) দ্বিতীয় খবর। তা عَلٰى -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

৫৭. لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ فِيْهَا مَا يَدَّعُوْنَ يَتَمَنَّوْنَ .

৫৭. তাদের জন্য তথায় ফল-ফলাদি থাকবে। আর তাদের জন্য তথায় আরো থাকবে যা তারা কামনা করবে– আকাঙ্ক্ষা করবে।

৫৮. سَلٰمٌ مُبْتَدَأٌ قَوْلًا اَىْ بِالْقَوْلِ خَبَرُهُ مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ بِهِمْ اَىْ يَقُوْلُ لَهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .

৫৮. তাদের প্রতি সালাম (سَلٰمٌ) মুবতাদা। বক্তব্যের আকারে– قَوْلًا শব্দটি بِالْقَوْلِ -এর অর্থে হয়েছে। তার خَبَرٌ হলো– দয়াময় প্রভুর পক্ষ হতে তাদের উপর। অর্থাৎ তাদেরকে [আল্লাহ তা'আলা] বলবেন, "তোমাদের প্রতি সালাম"।

৫৯. وَ يَقُوْلُ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ اَىْ اِنْفَرِدُوْا عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْدَ اِخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ .

৫৯. আরো বলবেন– হে পাপীরা আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। অর্থাৎ তারা ঈমানদারগণের সাথে মিশ্রিত থাকা অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ঈমানদারদের হতে আলাদা হয়ে যাও।

৬০. اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ اٰمُرْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ عَلٰى لِسَانِ رُسُلِىْ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج لَا تُطِيْعُوْهُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ .

৬০. আমি কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেইনি? তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করিনি? হে বনূ আদম! আমার রাসূলগণের ভাষায়– তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না। অর্থাৎ তার অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুস্পষ্ট শত্রুতা [রয়েছে তার সাথে]।

٦١. وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط وَحِّدُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

৬১. আর ইবাদত করো আমার অর্থাৎ আমার একত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করো এবং আমার অনুসরণ করো। এটাই পথ– রাস্তা-সরল-সঠিক।

٦٢. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا خَلْقًا جَمْعُ جَبِيْلٍ كَقَدِيْمٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْبَاءِ كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ عَدَاوَتَهٗ وَاِضْلَالَهٗ اَوْ مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَتُؤْمِنُوْنَ.

৬২. অথচ শয়তান তোমাদের মধ্য হতে বিভ্রান্ত গোমরাহ করেছে লোকজনকে মানুষদেরকে (جِبِلًّا) এটা جَبِيْلٌ -এর বহুবচন। যেমন– قَدِيْمٌ অন্য এক কেরাত بَا অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট। অনেক তোমরা কি বুঝে উঠতে পার না? শয়তানের শত্রুতা ও তার পথভ্রষ্টকরণ। অথবা, তাদের উপর যে আজাব নেমে আসে তা। যাতে তোমরা ঈমান আনয়ন করতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

شُغُلٍ শব্দের কেরাতসমূহ : এখানে شُغُلٍ শব্দটিতে দুটি কেরাত পড়া যেতে পারে–

১. মাসহাফে ওসমানীতে রয়েছে شُغُلٍ অর্থাৎ س এবং غ উভয় অক্ষরে পেশ হবে। আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. আবূ আমির নাফি' ও ইবনে কাছীর প্রমুখগণ شُغْلٍ অর্থাৎ ش পেশ যোগে এবং غ -কে সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আয়াতে سَلَامٌ -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে سَلَامٌ শব্দটির বিভিন্ন اِعْرَابٌ হতে পারে–

✪ এটা উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে অর্থাৎ هُوَ سَلَامٌ

✪ سَلَامٌ হলো মুবতাদা, আর قَوْلًا -এর নসবদাতা-এর খবর। মূল বাক্যটি হবে– سَلَامٌ يُقَالُ لَهُمْ قَوْلًا

✪ سَلَامٌ টি مَا يَدَّعُوْنَ মুবতাদার খবর হবে।

✪ سَلَامٌ টি مَا يَدَّعُوْنَ মুবদাল মিনহু হতে বদল হয়েছে।

✪ سَلَامٌ টি مَا يَدَّعُوْنَ -এ যে ও مَا আছে তার صِفَتٌ হবে, যখন مَا টি মওসূফা হবে। তবে যদি مَا টি اَلَّذِىْ বা মাসদারিয়া হয়, তবে এ ই'রাব হবে না।

✪ سَلَامٌ টি মুবতাদা, আর مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ হলো এর খবর। আর قَوْلًا উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক যা তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তখন পুরো বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারাযাহ হবে।

✪ কারো মতে, سَلَامٌ টি مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَدْحِ হবে। –[কুরতুবী, জালালাইন, কাবীর]

"جِبِلًّا" -এর মধ্যে পঠিত বিভিন্ন কেরাতসমূহ : جِبِلًّا -এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত হতে পারে।

✪ প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী جِبِلًّا অর্থাৎ ب এবং ج এর নিচে যের ل -এর উপর তাশদীদসহ যবর হবে। এটাই হযরত আসেম ও মদীনার কারীদের অভিমত।

✪ অপর একদল কারী جُبُلًا অর্থাৎ ج এবং ب -এর উপর পেশ দিয়ে এবং "ل" কে তাখফীফ করে পড়েছেন।

✪ ইবনে আবী ইসহাক, হাসান, ঈসা ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ এবং নসর ইবনে আনাস (রা.) প্রমুখগণ جُبُلًّا অর্থাৎ ب এবং ج -এর উপর পেশ আর ل -কে তাশদীদযুক্ত করে পড়েছেন।

✪ আবূ আমির বাসরী ও ইবনে আমির শামী (র.)-এর মতে, جُبْلًا অর্থাৎ ج -এর উপর পেশ ب সাকিন এবং ل -কে তাখফীফ করে পড়া হবে।

✪ আবূ ইয়াহইয়া ও আশহাব উকাইলী (র.)-এর মতে, جِبْلًا অর্থাৎ ج -এর নিচে যের ب -এর উপর জযম এবং ل -কে তাখফীফ করে পড়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ الۡيَوۡمَ فِىۡ شُغُلٍ الخ -এর বিশদ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় فِىۡ شُغُلٍ -এর বিবিধ অর্থ মুফাসসিরগণ হতে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তাদের বিবরণ দেওয়া হলো।

১. এর অর্থ হলো জাহান্নামীরা যেসব বিপদ-আপদ ও অস্থিরতায় থাকবে ঈমানদারগণ তা হতে মুক্ত থাকবেন।

২. জান্নাতীগণ যে শুধু আজাব হতে মুক্ত থাকবে তাই নয়; বরং তদুপরি তারা জান্নাতের নিয়ামত রাজি উপভোগে এমন মগ্ন থাকবে যে, অবসরের গ্লানি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

৩. দুনিয়াতে অবস্থান কালে ঈমানদারগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট বহু কিছুর আবেদন জানাবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু আখেরাতে জান্নাতে তাদের জন্য প্রদত্ত নিয়ামত রাজির উপভোগে এমন মগ্ন ও বিভোর হয়ে পড়বে যে, তাদের আর বেশি কিছুর আবেদন করার অবকাশই থাকবে না।

৪. ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার জাঁক-জমকপূর্ণ মেহমানদারিতে মশগুল হয়ে পড়বে।

৫. ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ (র.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখগণের মতে شُغُلُهُمۡ اِفۡتِضَاضُ الۡعَذَارٰى। অর্থাৎ বেহেশতবাসী নব যৌবনা কুমারীদের সাথে সহবাস ও সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে।

৬. জান্নাতীগণ বেহেশ্‌তের নিয়ামত রাজিতে এমনভাবে মশগুল থাকবেন যে, দোজখীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত করবার সুযোগ পাবে না। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন। -[মা'আরিফ, কাবীর, কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

إِنَّ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ الۡيَوۡمَ فِىۡ شُغُلٍ فٰكِهُوۡنَ: কখন বলা হবে? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে এক আহ্বানকারী মু'মিন ও গায়রে মু'মিনদেরকে ডেকে বলবেন- আমার সে সকল মাহবুব বান্দাগণ কোথায়? যারা আমারই ইবাদত করেছে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে? তখন মু'মিনগণ পূর্ণিমার চাঁদ ও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অবয়বে আত্মপ্রকাশ করবে। ইয়াকুত পাথরের নোখ বিশিষ্ট নূরের তৈরি উটে তারা আরোহণ করবেন এবং তাতে চড়ে সারা হাশরের ময়দান পরিভ্রমণ করে আরশের ছায়ার নিচে পৌছবেন। তখন মহান রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেন-

اَلسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِى الَّذِيۡنَ اَطَاعُوۡنِىۡ وَحَفِظُوۡا عَهۡدِىۡ بِالۡغَيۡبِ اَنَا اصۡطَفَيۡتُكُمۡ وَاَنَا اَحۡبَبۡتُكُمۡ وَاَنَا اخۡتَرۡتُكُمۡ اِذۡهَبُوۡا فَادۡخُلُوا الۡجَنَّةَ بِغَيۡرِ حِسَابٍ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ الۡيَوۡمَ وَلَا اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ.

অর্থাৎ আমার সেই বান্দাগণের প্রতি সালাম যারা আনুগত্য করেছে এবং আমার প্রতিশ্রুতি গোপনেও রক্ষা করেছে। তাদেরকে আমি নির্বাচিত করেছি, পছন্দ করেছি এবং সম্মানিত করেছি। তোমরা যাও আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করো। আজ তোমাদের কোনো ভয়ও নেই এবং চিন্তারও কোনোই কারণ নেই।

এরপর তারা বিদ্যুৎ গতিতে বেহেশতের পানে ছুটে যাবে। অবশিষ্ট লোকজন হাশরের ময়দানে পড়ে থাকবে। পরস্পর তারা বলাবলি করবে যে, আমাদের মধ্য থেকে অমুক অমুক ব্যক্তি কোথায় গেল। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে এক ঘোষক বলবেন- إِنَّ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ الۡيَوۡمَ فِىۡ شُغُلٍ فٰكِهُوۡنَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে জান্নাতীরা আজ সম্ভোগে ব্যস্ত রয়েছে।

سَلٰمٌ قَوۡلًا مِّنۡ ... هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ -এর ব্যাখ্যা : 'পরম করুণাময় প্রতিপালকের তরফ থেকে বলা হবে, 'সালাম'। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীগণ তাদের আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকবেন, হঠাৎ তাদের উপর একটি নূর প্রকাশিত হবে, তারা তা দেখতে থাকবেন এবং তারা জানতে পারবেন, এটি হলো আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লী। তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে সরাসরি অথবা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলবেন, 'আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আহলাল জান্নাহ' অর্থাৎ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখন সমস্ত জান্নাতবাসীগণ ঐ নূর দেখায় মশগুল হয়ে পড়বে, অন্য কোনো দিকে তাদের মনযোগ থাকবে না। কিছুক্ষণ পর সে নূর সরে যাবে, কিন্তু তার বরকতসমূহ বর্তমান থাকবে। -[ইবনে মাজাহ, আবিদদুনিয়া]

আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন, জান্নাতের প্রত্যেকটি দুয়ার থেকে ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীগণকে 'সালাম' পৌছাবেন।

মুকাতিল (র.) বলেছেন, জান্নাতের প্রত্যেকটি দুয়ার থেকে ফেরেশতাগণ একথা বলে প্রবেশ করবেন যে, হে জান্নাতবাসীগণ! করুণাময় প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি সালাম। وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ 'আর (ঘোষণা করা হবে) হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা আজ [মু'মিনগণ থেকে] পৃথক হয়ে যাও'।

দোজখীদেরকে পৃথক হওয়ার আদেশ হবে। দুনিয়াতে ভালো-মন্দ পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তা সম্ভব হবে না, নেককারদের থেকে বদকার লোকদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাফসীরকার মুকাতিল (র.)-এর সুদ্দী (র.) এবং যুজ্জাজ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, পাপীষ্ঠদেরকে বলা হবে, তোমরা নেককার লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো মু'মিনদেরকে জান্নাতের দিকে এবং কাফেরদেরকে দোজখের দিকে প্রেরণ করা হবে।

যাহহাক (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দোজখে প্রত্যেক কাফেরের জন্যে একটি গৃহ নির্দিষ্ট থাকবে, যখন কোনো দোজখী তার গৃহে প্রবেশ করবে, তখন ঐ গৃহের অগ্নি দুয়ার সর্বকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে, ভেতর থেকে সে দেখতে পারবে না, আর তাকেও দেখা যাবে না।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা দোজখের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে, তাদেরকে লৌহ নির্মিত সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ঐ সিন্দুকগুলোকে নতুন লোহার সিন্দুকে প্রবেশ করানো হবে, এরপর দোজখের তলদেশে তা নিক্ষেপ করা হবে। এ জন্য কোনো দোজখী অন্য দোজখীর আজাবও দেখতে পাবে না, সে ধারণা করবে যে, শুধু তাকেই এত কঠিন আজাব দেওয়া হয়। আর অন্যের আজাব দেখে সান্ত্বনা পাবারও কোনো ব্যবস্থা থাকবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা দূরে সরে যাও, জান্নাতের চিরসুখে তোমাদের কোনো অংশ নেই, বেহেশতবাসীদের থেকে তোমরা তফাত থাক, তোমাদের স্থান অন্যত্র, তোমরা সেখানেই থাকবে।

ইবনে আবি হাতিম হযরত হাসান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা নেককার লোকদের থেকে দূরে সরে যাও। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৫৫৭]

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

অর্থাৎ 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে মু'মিনদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তিরস্কার করা হবে এভাবে যে, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করিনি যে, তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়ো না, শয়তান তোমাদের জঘন্য শত্রু, সে তোমাদের চির বৈরী এবং প্রকাশ্য শত্রু, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো তোমাদের সর্বনাশ করা। আমি নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

'আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগি করো, এটিই সরল সঠিক পথ।' ইহকাল পরকালের শান্তি, কল্যাণ নিহিত রয়েছে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে, কিন্তু তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর নি, শয়তানের অনুগামী হয়েছ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ -এর অনুসরণের স্থলে তাঁর বিরোধিতা করেছ। অতএব, এর শাস্তি ভোগ কর, দুনিয়াতে সরল-সঠিক পথ পরিহার করে বক্র পথ অবলম্বন করেছ, আজ তার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দোজখের শাস্তি ভোগ কর। এ জন্য সর্বপ্রথম নেককারদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

"فِىْ شُغُلٍ فَكِهُوْنَ" আয়াতে "شُغُلٍ" -কে নাকেরাহ নেওয়ার কারণ : এখানে شُغُلٍ -এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এটা নাকেরাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বেহেশতবাসীগণ চিত্তবিনোদন ও সম্ভোগের হরেক রকম বিষয়াদিতে সদা ব্যাপৃত থাকবে এর ফলে সকল প্রকারের চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-বেদনা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর জান্নাতে নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম নিয়ামত হবে আল্লাহর দীদার লাভ করা।

"هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ الخ" আয়াতে "اَزْوَاجُهُمْ" দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতে اَزْوَاجٌ শব্দটি দ্বারা দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে-

১. اَزْوَاجٌ -এর অর্থ হবে اَمْثَالٌ বা সাদৃশ্য ও اَشْكَالٌ বা অনুরূপ অর্থাৎ اَشْكَالُهُمْ فِى الْاِحْسَانِ وَاَمْثَالُهُمْ فِى الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ইহসানের দিক দিয়ে তাদের তুল্য এবং ঈমানের দিক দিয়ে তাদের অনুরূপ।

২. اَزْوَاجٌ -এর অর্থ হবে জোড়া বা জুটি। তথা নর-নারী বা স্বামী-স্ত্রী। এ অর্থ কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেমন- اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ অর্থাৎ তবে তাদের স্ত্রীদের সাথে। আর اَزْوَاجٌ এর মধ্যে জান্নাতের হুর ও মু'মিনদের মু'মিন সতী স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

"وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা : دَعْوَةٌ মাসদার হতে يَدَّعُوْنَ শব্দটিকে বের করা হয়েছে। دَعْوَةٌ -এর অর্থ হলো আহ্বান করা। অর্থাৎ জান্নাতীবাসীগণ যাই আহ্বান করবে তা-ই পাবে। এখানে يَدَّعُوْنَ -এর স্থলে يَسْئَلُوْنَ ব্যবহার করেননি। কারণ প্রার্থনাও এক ধরনের কষ্টের শামিল। আর জান্নাত সকল কষ্ট হতে পূর্ণরূপে মুক্ত। তাই সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই তার সন্নিকটে বিদ্যমান থাকবে।

ইবাদত আনুগত্য হওয়া হিসেবে নবী-রাসূলগণের জন্য ইবাদত জায়েজ হবে কিনা? উপরিউক্ত আয়াতে- اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ -এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ ইবাদতকে আনুগত্য (اِطَاعَةٌ) -এর অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো যে, اِطَاعَةٌ ও عِبَادَةٌ যদি সমার্থক হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণী "اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ" -এর মধ্যে আমাদেরকে নবী-রাসূল ও ইমামগণের ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, নবী রাসূল ও নেতাগণের আনুগত্য যদি আল্লাহ তা'আলার অনুমোদিত বিষয়াদিতে হয়, তাহলে তা পক্ষান্তরে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য হিসাবে গণ্য হবে। এর দ্বারা নবী-রাসূল ও শাসকবর্গের ইবাদত লাযেম হবে না। হ্যাঁ, এমন কোনো বিষয়াদিতে যদি তাদের আনুগত্য করা হয় যা আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেননি, তাহলে তা তাদের ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে [এবং তা শিরক এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে]।

উপরিউক্ত বিষয়টিকে হাদীস শরীফে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে- "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" "স্রষ্টার নাফরমানি হয় এমন কোনো ব্যাপারে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" আরো বলা হয়েছে- "اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ" আনুগত্য করা যাবে কেবলমাত্র শরিয়ত সিদ্ধ কাজে।

ইমাম রাযী (র.) একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে এভাবে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন, ধর তোমার নিকট কোনো ব্যক্তি এসে তোমাকে কোনো কার্যের আদেশ করল। এখন তোমাকে ভেবে দেখতে হবে যে, তার উক্ত হুকুম শরিয়ত সিদ্ধ কিনা। যদি তা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, তার সাথে শয়তানের যোগসাজোশ রয়েছে। সুতরাং তুমি এটা করলে শয়তানের ইবাদত করা হবে। অপরদিকে তা যদি শরিয়ত সম্মত হয় তাহলে তা পালনে কোনো বাধা নেই। তা উক্ত ব্যক্তি বা শয়তানের আনুগত্য না হয়ে (বরং) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে। অনুরূপভাবে নাফস যদি কোনো কার্যের প্ররোচনা দেয় তাকেও উপরিউক্তভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

শয়তানের উপাসনার বিভিন্ন ধাপ : শয়তানের উপাসনার কয়েকটি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে।

১. শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং তার মন ও মুখ সেই কর্মে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

২. মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো পাপ কর্মে লিপ্ত হয় তবে মন ও মুখ এর স্বীকৃতি দেয় না। অর্থাৎ সে ভুলবশত এতে লিপ্ত হলেও মন ও মুখ সে পাপ কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করে না।

৩. সুস্থ মস্তিষ্কে সর্বদা পাপ কর্মে লিপ্ত থাকা এবং এটা করার কারণে আনন্দিত ও পুলকিত হওয়া। এটা মহা অন্যায় যা কুফরিতে পৌঁছে দেয়। আর এটাই শয়তানের উপাসনা রূপে গণ্য হবে।

الـخ أَلَمْ أَعْهَدْ আয়াতে اَلْعَهْدُ -এর অর্থ ও এর দ্বারা উদ্দেশ্য : عَهْد শব্দটির অর্থ হচ্ছে- চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও সদুপদেশ তবে সদুপদেশ, অর্থটি অধিক প্রযোজ্য। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে- اَلَمْ أُوْصِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ الـخ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে সদুপোদেশ দেইনি।

এ আয়াতে اَلْعَهْدُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এখানে العهد দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতিই উদ্দেশ্য।

২. অথবা, এখানে عَهْد দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- আলমে আরওয়াহতে আল্লাহ তা'আলা সকল আদম সন্তানের রূহকে একত্রিত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?] বলে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. অথবা রাসূলগণের মাধ্যমে প্রতিটি সম্প্রদায়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا الـخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, পৃথিবীর অনেক লোকই এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, ইবলিস শয়তান অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করেছে। আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং নিজেদের সর্বনাশের পথ বেছে নিয়েছে। যদি তারা বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী হতো, যদি তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করত, তবে আজ এ ধরণা বিপদের সম্মুখীন হতো না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে- সেদিন তারা জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি সত্যকে গ্রহণ করেনি। নবী ও রাসূলগণের অনুসারী হয়নি। তাই আজ তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত।

আল্লাহর বাণী "جِبِلًّا كَثِيْرًا" দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ আয়াতে جِبِلًّا كَثِيْرًا শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে-

১. হযরত কালবী (র.)-এর মতে, جِبِلًّا كَثِيْرًا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- أُمَمًا كَثِيْرًا তথা বহু জাতি।

২. তাফসীরে জালালাইনের গ্রন্থকার লিখেন যে, جِبِلًّا كَثِيْرًا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- خَلْقًا كَثِيْرًا তথা বহু মাখলুক বা সৃষ্টিকুল। ইমাম মুজাহিদ (র.) ও এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

৩. হযরত কাতাদাহ (র.)-এর মতে, جِبِلًّا كَثِيْرًا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- جُمُوْعًا كَثِيْرًا তথা বহু জমাত বা দল।

অনুবাদ :

٦٣. وَيُقَالُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ بِهَا .

৬৩. আর তাদেরকে আখেরাতে সম্বোধন করে বলা হবে- এটা সেই দোজখ [জাহান্নাম] যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল- যা সম্পর্কে।

٦٤. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ .

৬৪. অদ্য তোমরা তাতে প্রবেশ করো। কেননা তোমরা তাকে অস্বীকার করেছিলে।

٦٥. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ اَيِ الْكُفَّارِ لِقَوْلِهِمْ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ وَغَيْرُهَا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَكُلُّ عُضْوٍ يَنْطِقُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ .

৬৫. আজ আমি মোহর এঁটে দেবো তাদের মুখে অর্থাৎ কাফেরদের মুখে। কেননা তারা তখন বলবে আমাদের রব- আল্লাহর কসম। আমরা মুশরিক ছিলাম না। আর আমার সাথে তাদের হস্তসমূহ কথা বলবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করবে তাদের পা-সমূহ এমনকি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদিও। যা তারা করেছে (সেই সম্পর্কে) সুতরাং প্রতিটি অঙ্গ তা বলে দেবে যা তা হতে প্রকাশ পেয়েছে।

٦٦. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ لَاَعْمَيْنَاهَا طَمْسًا فَاسْتَبِقُوا ابْتَدَرُوا الصِّرَاطَ الطَّرِيْقَ ذَاهِبِيْنَ كَعَادَتِهِمْ فَاَنّٰى فَكَيْفَ يُبْصِرُوْنَ حِيْنَئِذٍ اَيْ لَا يُبْصِرُوْنَ .

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুসমূহ মুছে নিষ্প্রভ করে দিতে পারি। অর্থাৎ অবশ্যই তাদের চক্ষুসমূহকে নিষ্প্রভ করে অন্ধ করে দিতে পারি। অতঃপর তারা চলত দৌড়াত রাস্তায় পথে গিয়ে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী। সুতরাং কিভাবে কি করে তারা দেখতে পেত এমতাবস্থায় অর্থাৎ তারা তখন কিছুই দেখতে পেত না।

٦٧. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ اَوْ حِجَارَةً عَلٰى مَكَانَتِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مَكَانَاتِهِمْ جَمْعُ مَكَانَةٍ بِمَعْنٰى مَكَانٍ اَيْ فِيْ مَنَازِلِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ اَيْ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى ذَهَابٍ وَّلَا مَجِيْءٍ .

৬৭. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাসখ (রূপ বিকৃত) করে দিতে পারতাম। বানর, শূকর অথবা পাথরে রূপান্তরিত করে দিতে পারতাম। তাদের জায়গায় অন্য এক কেরাতে مَكَانَاتِهِمْ এসেছে। তা مَكَانَةٌ (مَكَانَاتٌ) -এর বহুবচন। অর্থাৎ مَكَانٌ মানে তাদের আবাস- স্থলসমূহে। যাতে তারা না সামনে চলতে পারত আর না পিছে ফিরে যেতে পারত। অর্থাৎ তারা যাওয়া-আসা [গমনাগমন] করতে পারত না।

তাহকীক ও তারকীব

"فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ" -এর তাহকীক : আল্লামা যমখশারী (র.) এ আয়াতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করেছেন-

✪ এ আয়াতে اَلصِّرَاطَ -এর পূর্বে একটি اِلٰى উহ্য রয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে- فَاسْتَبِقُوْا اِلَى الصِّرَاطِ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অন্ধ করে দিতে পারতাম। ফলে তারা রাস্তার পানে ছুটে যেত কিন্তু কিছুই দেখতে পেত না।

✪ এখানে اِسْتِبَاقٌ টা اِبْتِدَارٌ -এর অর্থে হয়েছে। তাই আমলও اِبْتِدَارٌ -এর ন্যায় হয়েছে।

✪ اِسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ -এর صِرَاطٌ -কে مُسْتَبَقٌ (অতিক্রমরত) বানানো হয়েছে مُسْتَبَقٌ اِلَيْهِ (এর দিকে ছুটে যাচ্ছে এরূপ) বানানো হয়নি। যেমন বলা হয়েছে– اَلصِّرَاطُ الَّذِيْ هُوَ مَعَهُمْ لَيْسُوْا طَالِبِيْهَا لَهُ قَاصِدِيْنَ اِيَّاهُ وَاِنَّمَا هُمْ عَلَيْهِ اِذَا طَمَسَ اللّٰهُ عَلٰى اَعْيُنِهِمْ لَايُبْصِرُوْنَهُ فَكَيْفَ اِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلَى الصِّرَاطِ অর্থাৎ এটা সে পথ যা তাদের সাথেই রয়েছে তারা না একে অনুসন্ধান করে না এর প্রতি মনোনিবেশ করে দিবেন। তখন তারা তা দেখতে পাবে না। কাজেই (ভেবে দেখ) তারা যদি রাস্তার উপরই না থাকত তবে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াত।

لَطَمَسْنَا এবং لَمَسَخْنَا শব্দদ্বয়ের অর্থ : لَطَمَسْنَا -এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম কিসায়ী বলেন– طَمَسَ يَطْمِسُ ভাষাবিদদের নিকট اَلْمَطْمُوْسُ এবং اَلطَّمِيْسُ এর অর্থ হলো– এমন অন্ধ ব্যক্তি যার চোখে কোনোরূপ খুঁত নেই তথা চোখ বন্ধ অন্ধ ব্যক্তি। لَمَسَخْنَا -এর অর্থ হচ্ছে– اَلْمَسْخُ হলো সৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তন অর্থাৎ এটাকে পাথর অথবা কংকর অথবা জানোয়ারে রূপান্তরিত করা। হযরত হাসান (রা.) বলেন, আমরা অবশ্যই তাদের বসিয়ে দিব যাতে তারা সামনে অগ্রসর না হতে পারে এবং পিছনে ফিরেও যেতে না পারে। যথা পাথর ও কঙ্কর সামনেও অগ্রসর হতে পারে না এবং পিছনেও যেতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ" -এর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতীদের বিভিন্ন নিয়ামত ও পুরস্কারের উল্লেখ করেছেন। জান্নাতীগণ বেহেশতের বিভিন্ন নিয়ামত ও আনন্দ উপভোগে মশগুল থাকবেন। তারা ও তাদের স্ত্রীগণ ছায়াশীতল পরিবেশে শাহী খাটে হেলান দিয়ে উপবেশন করবেন। তারা তাদের হাতের কাছেই সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাবেন। তথায় তাদের প্রভুর সাথে সম্মুখ সাক্ষাৎ ঘটবে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সালাম দিবেন। এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কি হতে পারে।

আর আল্লাহ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের শাস্তির উল্লেখ করেছেন। সারকথা হলো, আল্লাহ বিচার দিবসে সকলের ব্যাপারেই কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন। ঈমানদারদের সাথে কৃত জান্নাতের ওয়াদা জান্নাত দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ করবেন। তদ্রূপ কাফেরদেরকেও জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। তাই আল্লাহ বলবেন– هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ এটাই সেই জাহান্নাম তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? এখানে كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ বলে সে সকল কাফের ও নাফরমান বান্দাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও আখেরাতকে অবিশ্বাস করেছিল। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, তারা যদি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং সৎ কর্ম না করে তাদেরকে পরকালে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে অগ্নি দাহন সহ্য করতে হবে। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। সুতরাং আল্লাহ তখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, এটা সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম অথচ তোমরা তা বিশ্বাস করিনি। আজ চাক্ষুস দেখে তাতে প্রবেশ করে আমার ওয়াদার সত্যতা যাচাই করে নাও। স্বীয় কৃতকর্মের ফল হাতে নাতে বুঝে নাও।

এটা তাদের মানসিক যাতনা উসকে দেওয়া এবং তাদেরকে তিরস্কার করাই এ সম্বোধনের মূল উদ্দেশ্য।

"اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় কাফেরদের ভর্ৎসনা করা হয়েছেন।

✪ এখানে আল্লাহ তা'আলা اِصْلَوْهَا (জাহান্নামে প্রবেশ কর) আমরের সীগাহ ব্যবহার করেছেন। অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য উপরিউক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে অন্যত্র বলেন– ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ তুমি আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর, কেননা পৃথিবীতে তো তুমি নিজেকে সম্মানিত মনে করতে।

✪ "আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর" এর দ্বারা কাফেরদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা করা হয়েছিল, তা মূলত আজ থেকেই শুরু হবে। ইতপূর্বে যে শাস্তি ভোগ করেছ এর মোকাবিলায় সেই আজাব কোনোই ধর্তব্য নয়। তোমাদের উপর আজ হতে যে শাস্তি শুরু হচ্ছে এর শুরু থাকলে শেষ নেই।

✪ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -এর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের কারণও বলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাউকে কোনো শাস্তি দেওয়া হলে সাধারণত শাস্তি দেওয়ার সময় তার কারণ দর্শানো হয়ে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ অহেতুক শাস্তি দিচ্ছেন না; বরং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পিছনে যে যথার্থ কারণ রয়েছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও এর দ্বারা তাদেরকে লজ্জা দেওয়া উদ্দেশ্য। এটাও তাদের জন্য এক ধরনের শাস্তি। এরপর তাদের মুখ ফুটে আর কিছু বলার অবকাশ থাকবে না।

"اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ .... بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" -এর ব্যাখ্যা : 'আজ আমি তাদের মুখ সীল করে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে'।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, কিয়ামতের দিন কাফের এবং মুনাফিকরা তাদের পাপাচারের কথা অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে যে, আমরা এসব পাপকার্যে লিপ্ত হইনি তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বাকশক্তি রহিত করে দেবেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির ছিলাম, তিনি তখন মুচকি হাসলেন এবং আমাকে বললেন, 'তুমি কি জান আমি কেন মুচকি হাসলাম'? আমি আরজ করলাম, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলই তা জানেন'। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'এ বিষয়ে আমি মুচকি হেসেছি যে, কিয়ামতের দিন এক বান্দা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার তুমি কি আমাকে জুলুম করা থেকে আশ্রয় দাওনি'? (অর্থাৎ তুমি কি একথা ঘোষণা করোনি যে, কিয়ামতের দিন কারো প্রতি জুলুম করা হবেনা) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'অবশ্যই,' তখন বন্দা আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার! আজ আমার বিরুদ্ধে আমি কারো সাক্ষ্য মেনে নেব না, তবে যে সাক্ষ্য আমার নিজের দেহের অংশ হবে, তা মানব'। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'আজ তুমি নিজে এবং তোমার আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা (কিরামুন কাতিবীন) সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট'। এরপর তার মুখ সীল করা হবে এবং ঐ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যেভাবে মানুষ রসনা দ্বারা কথা বলে, ঠিক তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বাকশক্তি দান করবেন। এরপর তাকে তার বাকশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'তোমাদের জন্যে ধ্বংস, আমি তো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যেই যা কিছু বলেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমার শত্রু হয়ে পড়েছ'।

নাসাঈ শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে, যখন তোমাদের রসনা বন্ধ থাকবে, সর্ব প্রথম তোমাদের উরু এবং হাতকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কে?' সে আরজ করবে, 'আমি তোমার বান্দা, তোমার নবীর প্রতি এবং তোমার কিতাবের প্রতি আমি ঈমান এনেছিলাম, নামাজ, রোজা, জাকাত প্রভৃতি আদায় করেছি'। এমনি আরো বহু নেক আমলের উল্লেখ করবে, তখন তাকে বলা হবে, 'আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি সাক্ষী হাজির করছি'। সে চিন্তা করবে, কাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে। তখন হঠাৎ দেখবে, তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে, এরপর তার উরুকে বলা হবে, 'তুমিই সাক্ষ্য দাও', তখন উরু, হাড় এবং গোশত বলে উঠবে এবং ঐ মুনাফিকের মুনাফিকী এবং যাবতীয় গোপন পাপাচারগুলোর সুস্পষ্ট বিবরণ দেবে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, রসনা বন্ধ করে দেওয়ার পর মানুষের বাহু সর্বপ্রথম কথা বলবে।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তার গুনাহ সমূহের বিবরণ সম্মুখে রেখে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ সব ঠিক'? সে আরজ করবে, 'জী হ্যাঁ, সবই ঠিক'। আমার দ্বারা এসব গুনাহ হয়েছে', তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'যাও আমি এসব মাফ করে দিলাম', তখন এভাবে কথা হবে যে, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ জানবে না, অন্য কারো নিকট তার গুনাহ প্রকাশ পাবে না, এরপর তার নেকীসমূহ হাজির করা হবে এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে। (হে ক্ষমা প্রিয় প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ মাফ করে দিও, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত কর না, আমাদের গুনাহসমূহকে গোপন রেখ, আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিও, হে দয়াবান প্রতিপালক! তোমার দরবার থেকে আজ পর্যন্ত কেউ মাহরুম হয়নি, আমাদেরকেও তোমার রহমত থেকে মাহরুম কর না। তোমার শাস্তি থেকে আমাদেরকে নাজাত দিও, তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে নাজাত দিও এবং দোজখের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে দয়াময় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে জান্নাত নসিব কর এবং তোমার দীদার লাভের সৌভাগ্য দান কর)। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত এ হাদীস ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম সংকলন করেছেন।

এভাবে কাফের এবং মুনাফিকদেরকেও আল্লাহ তা'আলা হাজির করে তাদের কৃতকর্মের বিবরণ সম্মুখে রেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এসব ঠিক?' সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে, 'হে পরওয়ারদেগার! এসব তোমার ফেরেশতারা অসত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে'। তখন ফেরেশতা বলবেন, 'হায়! সে কি বলে?' তুমি কি অমুক দিন এ কাজ করনি"? ঐ কাফের বলবে, 'অবশ্যই নয়'। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রসনা বন্ধ করে দেবেন এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-১৫-১৬, তফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ বিবরণ স্থান পেয়েছে, তবে তিনি একথাও বলেছেন, আমার ধারণা এই যে, হুযূর ﷺ একথা বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির ডান উরু কথা বলবে, এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আবূ ইয়া'লা এবং হাকিম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন কাফেরদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে তিরস্কার করা হবে, কিন্তু কাফের তার পাপাচারের কথা অস্বীকার করবে এবং ঝগড়া করবে, তখন আদেশ দেওয়া হবে যে শপথ করা কাফেররা শপথও করবে, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিস্তব্ধ করে দেবেন, (রসনার কার্যকারিতা স্তব্ধ করে দেবেন), এরপর তারা তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে। পরে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

মোহর এঁটে দেওয়ার কাজকে আল্লাহর দিকে এবং বাক্যালাপ ও সাক্ষ্যের কাজকে হাত ও পায়ের দিকে সম্বোধন করার রহস্য : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন- نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো। পরবর্তীতে বললেন- وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ الخ অর্থাৎ তাদের হাত আমাদের সাথে বাক্যালাপ করবে, তাদের পা আমার নিকট তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। এরূপ বলা হয়নি যে, আমি হাতকে কথা বলাবো আর পা দ্বারা সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করবো।

এর রহস্য হচ্ছে- যখন কাফেররা হাশরের মাঠে রাসূল ও ফেরেশতাগণের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে নিজেদের সাফাই গাইতে শুরু করবে আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের বাক স্বাধীনতাকে বিলোপ করে দিবেন। নিজ ইচ্ছাধীনে তাদের কোনো কথা বলার শক্তি থাকবে না। এরপর তাদের ব্যাপারে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সাক্ষী নিয়োগ করা হবে। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গসমূহ সাক্ষ্য প্রদান করবে। এগুলোকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা হবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে (কথা বলার শক্তি পাওয়ার পর) তাদের হাত স্বেচ্ছায় আল্লাহর সাথে কথা বলবে এবং পদরাজি দরবারে ইলাহীতে সাক্ষ্য প্রদান করবে। কাজেই এ সাক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় হবে।

হাতের জন্য কথা বলা ও পায়ের জন্য সাক্ষ্য নির্ধারণের হিকমত : এ আয়াতে হাতের দিকে কথা বলার এবং পায়ের দিকে সাক্ষ্য দেওয়ার নিসবত করা হলো কেন এর হেকমত কি?

এর হেকমত হচ্ছে– তাদের হাত তাদের কুফর হতে শুরু করে সকল অপকর্মের বিবরণ দিবে। কারণ অধিকাংশ কর্ম হাতের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়ার ফলে সাধারণত সকল কর্মকে হাতের দিকে নিসবত করার প্রথা চালু রয়েছে। যথা অন্য একটি আয়াতে এসেছে مَا عَمِلَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাদের হাত যা উপার্জন করেছে। এ কারণে হাতই তাদের সকল অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরবে। আর যেহেতু হাতের বিবরণের সমর্থক হিসেবে ন্যূনতম পক্ষে একজন সাক্ষীর প্রয়োজন তাই তাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কাজেই কথা বলার সম্পর্ক হাতের দিকে করা এবং সাক্ষ্য দেওয়ার নিসবত পায়ের দিকে করা যথার্থই হয়েছে।

হাত-পা উভয়ে অপরাধী! কাজেই তাদের সাক্ষ্য কিরূপে গ্রহণীয় হবে? কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো পাপ কর্ম হলে তার হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলেই সমভাবে এতে দোষী হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সে ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য কিরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেন–

- এটা মূলত তাদের স্বীকারোক্তির নামান্তর। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তারা তাদের কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবে।
- তারা তাদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে সাক্ষী দিবে। কিন্তু তাদের এ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই যে, চূড়ান্ত ফয়সালা হবে তা তো বলা হয়নি।

আল্লাহর নিকট হাত কখন বিবরণ দেবে এবং পা ও অন্যান্য অঙ্গসমূহ সাক্ষ্য দেবে? ময়দানে মাহশরে বিচারের সম্মুখীন হয়ে কাফেররা তাদের সকল পাপের কথা অস্বীকার করবে। উপরন্তু ফেরেশতাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলবে যে, আমলনামায় যা লিখা আছে এর সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তখন আল্লাহর হুকুমে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ বিবরণ পেশ করবে এবং সাক্ষ্য দিবে।

এ আয়াতে শুধুমাত্র হাত ও পায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে অন্যান্য অঙ্গ সমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। যথা এক আয়াতে এসেছে– يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তার জিহ্বা, হাত, পা সেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

অন্যত্র এসেছে– تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

"يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ" ও "اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ" -এর মধ্যে সমন্বয় : প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের তথা বিচারের দিবস কাফির-মুশ্‌রিকদের মুখ বন্ধ করে দিবেন– যাতে তারা কথা বলতে পারবে না। অথচ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সেদিন কাফের-মুশরিকদের জিহ্বাও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। আপাত দৃষ্টিতে উভয় আয়াতের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। মুফাস্‌সিরগণ নিম্নোক্তভাবে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

১. তারা তাদের ইচ্ছামতো কথা বলবার ক্ষমতা বিলোপ করা হবে। তবে মুখের মাধ্যমে তারা যেসব কুফর ও ফিসকের কথাবার্তা বলেছে তা মুখ আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে দিবে।

২. তাদের হতে মিথ্যা ও অবান্তর কথা বলবার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। কাজেই জিহ্বার সত্য সাক্ষ্য প্রদানে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকবে না।

"اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى الخ" -এর সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ণনা : তাফসীরে খাযিন ও ইবনে কাছীরে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবীগণ (রা.) একবার নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবেন কিনা? হুযূর ﷺ তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, উজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশে তোমাদের সূর্য দেখতে কি অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। হুযূর ﷺ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্র দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়? সাহাবীগণ (রা.) জওয়াব দিলেন, না। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, সে পবিত্র সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, তোমরা উজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র-সূর্যকে যদ্রূপ দেখতে পাও আখেরাতে তোমাদের রবকেও তদ্রূপ দেখতে পাবে

সেই কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে বলবেন- আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করিনি? তোমার জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাকার জীব সৃষ্টি করে তোমার উপকার করিনি? বান্দা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, হে প্রভু! অবশ্যই আপনি তা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার কি ধারণা ছিল যে, আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? বান্দাহ বলবে- না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যদ্রূপ সেদিন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তদ্রূপ আমিও আজ তোমাকে ভুলে যাব। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? তোমার দাম্পত্য সুখের জন্য জুটি তৈরি করিনি? তোমার জন্য উট-ঘোড়া ইত্যাদি সৃষ্টি করত তোমাকে ভোগের অনুমতি প্রদান করিনি? বান্দা বলবে, হে প্রভু! অবশ্যই তুমি তা প্রদান করেছ। আবার আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি সেদিন আমাকে যদ্রূপ ভুলে গিয়েছিলে আমিও তদ্রূপ তোমাকে ভুলে থাকব। আবারও আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তখন সে বলবে, হে রব! আমি তোমার ও তোমার রাসূল এবং আসমানি কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করেছি, তোমার রাসূলের আনুগত্য করেছি, নামাজ-রোজা পালন করেছি, জাকাত দান করেছি। তা ছাড়া অন্যান্য সৎকার্যেরও যথাসম্ভব বিবরণ পেশ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ঠিক আছে, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আমার সাক্ষ্যদাতাদেরকে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য হাজির করছি। তখন বান্দা মনে মনে ভাববে যে, কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংস এমনকি হাড়সমূহ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

কুরতুবী ও ইবনে কাছীর (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার আমরা (কতিপয় সাহাবী) নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় হুযুর ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছ? কেন আমি হাসছি? আমরা বললাম আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। হুযুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি হাসছি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে কি নির্যাতন হতে রেহাই দিবেন না? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি দিব। বান্দা বলবে, হে রব! আমার নিজের পক্ষ হতে সাক্ষী দিন অন্য কাউকে সাক্ষ্য প্রদানে অনুমতি দিবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন- "كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا" অর্থাৎ তোমার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তুমি নিজে এবং কিরামুন-কাতিবুনই যথেষ্ট।

অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে কথা বলবার নির্দেশ দেওয়া হবে। তারা তার কাজ-কর্মের সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দিবে। তখন সে তার অঙ্গসমূহকে ভর্ৎসনা করবে।

"وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى الخ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- "وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ" আয়াতের অর্থ হলো "لَاَعْمَيْنَاهُمْ عَنِ الْهُدٰى" অর্থাৎ আমি তাদেরকে হেদায়েতের পথ হতে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।

খ. ইমাম সুদ্দী (র.) ও হাসান (র.) বলেছেন, অত্র আয়াতের অর্থ হলো, আমি তাদেরকে অন্ধ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি- যাতে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সুতরাং তারা সঠিকভাবে জীবন-যাপনের কোনো পথ ও পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না।

গ. সাইয়েদ কুতুব (র.) লিখেছেন, অত্র আয়াতে কাফেরদের দুটি অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

১. তাদের চক্ষুকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে। অতঃপর উক্ত অবস্থায় যখন তারা রাস্তায় বের হবে তখন অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় পথে পথে ঘুরতে থাকবে। আর দৌড়ানোর চেষ্টা করলে পা পিছলে পড়ে যাবে। সুতরাং কোথা হতে তারা পথের সন্ধান লাভ করবে?

২. কিছু কাল অন্ধ থাকবার পর তারা অকস্মাৎ নিজেদের স্থানসমূহ আঁকড়ে স্থবির হয়ে যাবে। তাদের অবস্থা মূর্তির ন্যায় হয়ে যাবে। না সামনে অগ্রসর হতে পারবে আর না পিছনে ফিরে যেতে পারবে। তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের আর শেষ থাকবে না।

٦٨. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ بِإِطَالَةِ اَجَلِهِ نُنَكِّسْهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ مِنَ التَّنْكِيْسِ فِى الْخَلْقِ ط اَىْ خَلْقَهُ فَيَكُوْنُ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَشَبَابِهِ ضَعِيْفًا وَهَرِمًا اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّ الْقَادِرَ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَعْلُوْمَ عِنْدَهُمْ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ فَيُؤْمِنُوْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ .

٦٩. وَمَا عَلَّمْنٰهُ اَيِ النَّبِيَّ الشِّعْرَ رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اِنَّ مَا اَتٰى بِهِ مِنَ الْقُرْاٰنِ شِعْرٌ وَمَا يَنْبَغِىْ يَتَسَهَّلُ لَهُ ط الشِّعْرُ اِنْ هُوَ لَيْسَ الَّذِىْ اَتٰى بِهِ اِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ مُظْهِرٌ لِلْاَحْكَامِ وَغَيْرِهَا .

٧٠. لِتُنْذِرَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا يَعْقِلُ مَا يُخَاطَبُ بِهِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ وَهُمْ كَالْمَيِّتِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ مَا يُخَاطَبُوْنَ بِهِ .

অনুবাদ :

৬৮. আর যাকে আমি অধিক বয়স দান করি– তার আয়ু দীর্ঘ করে তাকে পরিবর্তন করে দেই– অন্য এক কেরাতে তাশদীদ যোগে রয়েছে তা تَنْكِيْس মাসদার হতে গৃহীত। সৃষ্টির মধ্যে অর্থাৎ তার [শারীরিক] গড়নে ও প্রভাবে। সুতরাং তার শক্তিমত্তা ও যৌবন দুর্বলতা এবং বার্ধক্যে পর্যবসিত হয়ে যায়। তারপরও কি তারা উপলব্ধি করতে পারে না? এই যে, তার উপর ক্ষমতাবান যা তাদের জানা রয়েছে– পুনরুত্থানের উপরও ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তাদের ঈমান গ্রহণ করা সমীচীন। অপর এক কেরাতে تَا -এর সাথে (تَعْقِلُوْنَ) রয়েছে।

৬৯. আমি শিক্ষা দান করিনি তাকে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -কে, কবিতা-কাব্য রচনার জ্ঞান– এটা দ্বারা তাদের বক্তব্য– "مَا اَتٰى بِهِ مِنَ الْقُرْاٰنِ شِعْرٌ" [মুহাম্মদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ কুরআন কাব্য বৈ কিছু নয়] -কে খণ্ডন করা হয়েছে। আর তা শোভনীয়ও নয় সহজ সাধ্য নয়– তার জন্য (অর্থাৎ) কাব্য রচনা করা। নয় তা অর্থাৎ হুযুর ﷺ যা নিয়ে আগমন করেছেন তা নয়– তবে উপদেশ– নসিহত এবং প্রকাশকারী কুরআন– আহকাম ইত্যাদি প্রকাশকারী।

৭০. যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। (تُنْذِرَ শব্দটি) يَا ও تَا উভয়ের সাথে হতে পারে। তার দ্বারা তাদেরকে যারা জীবিত– যা দ্বারা তাদেরকে সম্বোধন করা হয় তা তারা উপলব্ধি করে। আর তারা হলো ঈমানদারগণ। যাতে যথার্থ প্রমাণিত হতে পারে বক্তব্য শাস্তি-বিষয়ক– কাফেরদের উপর [ব্যাপারে]। আর কাফেররা হলো মৃততুল্য। তাদেরকে যা বলা হয় তা তারা উপলব্ধি করে না। উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে না।

তাহকীক ও তারকীব

لِيُنْذِرَ ও نُنَكِّسْهُ-এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : نُنَكِّسْهُ শব্দটির মধ্যে দ্বিবিধ কেরাত রয়েছে।

এক. হযরত আসিম (র.) ও হামযা (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ تَنْكِيْس [তানকীসুন] মাসদার হতে نُنَكِّسْهُ পড়েছেন। অর্থাৎ প্রথম ن পেশ যোগে, দ্বিতীয় ن যবর যোগে এবং ك তাশদীদ যুক্ত হয়ে যের যোগে ও س পেশ বিশিষ্ট হবে।

দুই. অপরাপর ক্বারীগণ পড়েছেন– نَنْكُسْهُ বাবে نَصَرَ -এর نَكْسٌ মাসদার হতে। অর্থাৎ প্রথম ن যবরবিশিষ্ট। দ্বিতীয় ن জযমবিশিষ্ট এবং ك তাশদীদবিহীন পেশ যোগে।

لِيُنْذِرَ -এর মধ্যে আবার দুই কেরাত রয়েছে।

এক. لِيُنْذِرَ . ي যোগে। সাধারণ ক্বারীগণ এটাই পড়েছেন। এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

দুই. لِتُنْذِرَ . تَا যোগে। এটা হযরত নাফে মাদানী ও ইবনে আমর শামী (র.)-এর কেরাত।

উল্লেখ্য যে, لِتُنْذِرَ . ت যোগে হলে এর ফায়েল হবে নবী করীম ﷺ তখন অর্থ হবে- لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ কুরআন এ জন্য নাজিল করা হয়েছে যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন তাদেরকে যারা আল্লাহর ইলমে ঈমানদার হওয়া নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।

অপরদিকে لِيُنْذِرَ . ي যোগে হলে এর فَاعِلٌ -এর ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

এক. এর فَاعِلٌ হবে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন।

দুই. উক্ত فِعْلٌ (لِيُنْذِرَ) -এর فَاعِلٌ হবে নবী করীম ﷺ অর্থাৎ যাতে নবী করীম ﷺ ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন।

তিন. উক্ত فِعْلٌ -এর فَاعِلٌ হবে কুরআনে হাকীম। অর্থাৎ যাতে কুরআনে হাকীম তাদেরকে সতর্ক করে দিতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ الخ" -এর নাজিল হওয়ার কারণ : নবী করীম ﷺ কুরআনে কারীম মক্কার মুশরিকদের নিকট পেশ করার পর তারা বিভিন্ন ছল-চাতুরীর মাধ্যমে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

তারা বলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী নন এবং কুরআনও আল্লাহর নাজিলকৃত ঐশীগ্রন্থ নয়। বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন কবি এবং কুরআন একটি কাব্য গ্রন্থ মাত্র। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচারকে খণ্ডন করবার জন্য আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত কয়টি নাজিল করেন। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, আমি না মুহাম্মদ ﷺ -কে কাব্যগাথা শিক্ষা দান করেছি আর না এটা তার জন্য শোভা পায়। বরং কুরআন তো একটি জীবন-বিধান ও উপদেশ গ্রন্থ মাত্র। আর মহানবী ﷺ -কে আমি পাঠিয়েছি ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমার আজাবের দলিল (যৌক্তিকতা) পাকা-পোক্ত করার জন্য।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও বর্ণনাদি হতে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ যে শুধু কবিতা রচনা করতে অক্ষম ছিলেন তাই নয়; বরং তিনি অপরাপর কবিদের রচিত কবিতা ও সঠিকভাবে পড়তে পারতেন না। খলীল ইবনে আহমদ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ কবিতা পছন্দ করতেন, তবে তিনি নিজে তা রচনা বা আবৃত্তি করতেন না।

নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা হতে দেখা যায় রাসূলে কারীম ﷺ কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে তাদের সুর-ছন্দ ও শব্দ অটুট রাখতে পারেন নি।

একবার নবী করীম ﷺ তোরফার একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে গিয়ে পড়েছেন-

سَتُبْدِىْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ٭ وَيَأْتِيْكَ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالْاَخْبَارِ

অথচ মূলত শ্লোকটি হবে নিম্নরূপ- سَتُبْدِىْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ٭ وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ

যা হোক উক্ত বয়েতটি রদ-বদল করে পড়ার পর নবী করীম ﷺ -এর নিকট হযরত আবু বকর (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বয়েতটি আপনি যদ্রূপ পড়েছেন তদ্রূপ নয়। তখন নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, আমি কবি নই। আর কবিতার আবৃত্তি ও রচনা আমার জন্য শোভাও পায় না। ইমাম জাস্সাস (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে সহীহ সনদে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাসান ইবনে আবুল হাসান (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে, একবার নবী করীম ﷺ আবৃত্তি করেছেন-

كَفٰى بِالْاِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, কবি তো বলেছেন–

هُرَيْرَةُ وَدِّعْ اَنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيًا ✽ كَفَى الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ لِلْمَرْءِ اَنَاهِيًا

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) অথবা হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি নিঃসন্দেহ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতখানা– وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ اِنْ هُوَ الخ নাজিল করেন।

"وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ الخ" -এর **পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে যোগসূত্র :** ইসলামি জীবন-বিধানের তিনটি মৌলিক দিক রয়েছে, তারা হচ্ছে তাওহীদ। রিসালাত ও আখেরাত। উল্লেখ্য যে, মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বেশির ভাগ উক্ত তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন– "اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ الخ" -এর মধ্যে তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ الخ -এর মধ্যে আখেরাতের আলোচনা করা হয়েছে। এরপর وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ الخ [এর মধ্যে আখেরাত ও] পুনরুত্থানের উপর যে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতাবান তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তারপর আলোচ্য আয়াত "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ الخ" -এর মধ্যে রেসালতকে সাব্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নবী করীমের রিসালাতের উপর আরোপিত কাফেরদের সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা অপবাদ مُحَمَّدٌ ﷺ شَاعِرٌ وَالْقُرْاٰنُ شِعْرٌ হযরত মুহাম্মদ ﷺ কবি এবং কুরআন একটি কাব্যগ্রন্থকে খণ্ডন করা হয়েছে।

"وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ الخ" -এর **বিশদ ব্যাখ্যা :** نُعَمِّرْ শব্দটি تَعْمِيْر হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ– দীর্ঘায়ু দান করা। আর نُنَكِّسْ শব্দটি تَنْكِيْس হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– উপুড় বা বিপরীত করে দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সীমাহীন কুদরত ও অসীম হিকমতের আরও একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। প্রত্যেক মানুষ এবং জীব-জন্তু সদা-সর্বদা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহর কুদরতের আমল অবিরাম তার মধ্যে জারি রয়েছে। এক ফোঁটা নিষ্প্রাণ অপবিত্র বীর্য হতে তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। মাতৃ উদরের তিন-তিনটি অন্ধকার স্তরে এই বিশ্ব-বক্ষাণ্ডের নির্যাস ও ক্ষুদে বিশ্বের [তথা-মানুষের] সৃষ্টি হয়েছে, অসংখ্য সূক্ষ্ম মেশিনসমূহ তার সৃষ্টিতে যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর প্রাণ দান করত তাকে জীবিত করা হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ মাতৃগর্ভে প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়েছে। তারপর এ বিশ্ব-বৃক্ষাণ্ডে পদার্পণ করেছে। তখন পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ ও অংশ ছিল অতি দুর্বল-নাজুক। আল্লাহ তা'আলা তার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার মায়ের বুকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন পূর্ব হতেই। এতে সে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠল। তখন হতে শুরু করত যৌবনের কতই না সিঁড়ি অতিক্রম করে তার প্রতিটি অঙ্গ হয়েছে শক্ত-সামর্থ্য, তার দেহে সঞ্চিত হয়েছে সিংহ সম শক্তি। বল-বীর্য আর রূপ-লাবণ্যের এক অভূতপূর্ব সমাহার ঘটিয়েছে তার শরীরে। সব দিক মিলিয়ে যে কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বির মোকাবিলার জন্য সে হয়ে উঠেছে অধিকতর যোগ্য।

পুনরায় যখন স্রষ্টা ও মালিকের ইচ্ছায় তার সমস্ত শক্তির মধ্যে ভাটার আভাস পরিলক্ষিত হলো। ভাটায় ভাটায় শেষাবধি বৃদ্ধাবস্থার শেষ সীমায় গিয়ে উপনীত হলো। তথায় গিয়ে চিন্তা করলে সে দেখতে পাবে পুনরায় সে ঐ মঞ্জিলে গিয়ে পৌঁছেছে যা শিশুকালে ডিঙ্গিয়ে এসেছিল। সমস্ত আদত অভ্যাসে পরিবর্তন দেখা দিল। যা এক সময় অত্যন্ত প্রিয় মনে হতো তা এখন ঘৃণ্য ও তিক্ত মনে হতে লাগল। যাতে আরাম পাওয়া যেত তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। কুরআনে মজীদে তাকেই تَنْكِيْس (বিপরীত করে দেওয়া) বলা হয়েছে। কবি যথার্থই বলেছেন– مَنْ عَاشَ اَخْلَقَتِ الْاَيَّامُ جِدَّتَهُ ✽ وَخَانَهُ ثِقَتَاهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে যুগ তার নতুনত্ব ও শক্তি-সামর্থ্যকে পুরানো ও দুর্বল করে ছাড়বে। আর তা সর্বাধিক দুই জন বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিও তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতঃ পৃথক হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে মানুষ চোখে দেখা ও কর্ণে শুনা বস্তুর উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অথচ বৃদ্ধকালে তাদের নির্ভরযোগ্যতাও থাকে না। কান ভারি হয়ে যাওয়ার দরুন কথা পুরোপুরি বুঝে উঠা মুশকিল। দৃষ্টির দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে দেখা কঠিন। মুতানাব্বীর ভাষায়– وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيْلًا تَقَلَّبَتْ ✽ عَلٰى عَيْنَيْهِ حَتّٰى يَرٰى صِدْقَهَا كِذْبًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অধিক আয়ু পাবে পৃথিবী তার চোখের সামনেই পাল্টে যাবে। এমন কি যাকে সে পূর্বে সত্য (সঠিক) জানত তাও মিথ্যা মনে হতে থাকবে।

মানব অস্তিত্বে এই আমূল পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের সাক্ষ্য তো বহন করেই করে; উপরন্তু তাতে মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট অনুগ্রহও নিহিত রয়েছে। বিশ্ব স্রষ্টা মানুষের মধ্যে যেসব শক্তি আমানত রেখেছেন, মূলত তা সরকারি মেশিন যা তাকে দান করা হয়েছে। আর এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা তোমার মালিকানাধীন নয় এবং স্থায়ীও নয়। পরিশেষে তা তোমার নিকট হতে ফেরত নেওয়া হবে। তার বাহ্যিক চাহিদা তো এটা ছিল যে, যখন নির্ধারিত সময় আসবে তখন তার নিকট হতে একই সময়ে সব ফেরত নিয়ে যাওয়া, কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদের ফেরত দানের জন্যও দীর্ঘ কিস্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে তা ফেরত নেওয়ার নিয়ম করেছেন। যাতে মানুষ তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করত আখেরাতের সফরের উপাদান (পাথেয়) সংগ্রহ করে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ الخ -এর ব্যাখ্যা : কুরআনে মাজীদের যে সকল অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া এবং বাস্তবধর্মী আবেদন মানুষের মনে সুগভীর রেখাপাত করেছিল মক্কার মুশরিকদের পক্ষে তা অস্বীকার করার কোনো পথ ছিলনা। সুতরাং তারা কখনো কখনো একে জাদু এবং নবী করীম ﷺ -কে জাদুকর বলতে লাগল এবং কোনো কোনো সময় কুরআনকে কাব্য ও রাসূলে কারীম ﷺ -কে কবি বলে অপপ্রচার চালাতে শুরু করল। উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের মূল স্পিরিট হতে লোকদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ লোকেরা যেন ধরে নেয় যে, এটার এ প্রতিক্রিয়া ও আবেদন ঐশীবাণী হওয়ার দরুন নয়, বরং জাদু-মন্ত্র অথবা কাব্য গাঁথা হওয়ার কারণে। মানুষের অন্তরকে তা নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি নবী করীম ﷺ -কে কবিতা-কাব্য শিক্ষা দান করিনি। আর তা আমার হাবীবের জন্য শোভাও পায় না। ঐশী জ্ঞানের ভাণ্ডার নবীর সাথে অলীক কল্পনার জালে আবদ্ধ কবির কি-ই-বা সম্পর্ক থাকতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আরবীয়রা তো এমন এক জাতি, কবিতা ও কাব্য রচনা যাদের মজ্জাগত ব্যাপার। মহিলা এমনকি শিশুরাও অকপটে-অনায়াসে কবিতা বলতে পারে। কবিতার হাকীকতের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অবহিত। তারা (জেনে-শুনে) কিভাবে নবী করীম ﷺ -কে কবি এবং কুরআনকে কাব্যগ্রন্থ বলতে পারে? কেননা কবিতার ওজন, ছন্দ ও সুর-তালের সাথে তো এর কোনো মিল নেই। কোনো মূর্খ– কবিতা সম্পর্কীয় জ্ঞানের সাথে যার এতটুকু যোগসাজোস নেই সেও তাকে কবিতা– কাব্যগাঁথা বলে দাবি করতে পারে না।

এর জবাবে মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, شِعْر (কাব্য) মূলত অলীক কল্পনাপ্রসূত বিষয়াবলিকে বলা হয়– চাই পদ্যে হোক অথবা গদ্যে হোক। তারা কুরআনকে কাব্য এবং নবী করীম ﷺ কে কবি বলার পিছনে উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা নিছক কাল্পনিক ও মনগড়া। আর যদি شِعْر -এর দ্বারা পদ্যকে বুঝানোই তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে এ হিসেবে পদ্য বলা হয়েছে যে, পদ্যের ন্যায় এরও আশ্চার্যজনক প্রভাব ও আসর রয়েছে।

ইমাম জাস্‌সাস (র.) স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল নবী করীম ﷺ কোনো সময় কবিতা আবৃত্তি করেছেন কিনা? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, না। তবে তোরফার রচিত নিম্নোক্ত শ্লোকটি একবার তিনি আবৃত্তি করেছিলেন–

سَتُبْدِيْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ۞ وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ

তাকে তিনি ছন্দের ওজন ভেঙ্গে "مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالْاَخْبَارِ" পড়েছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শ্লোকটি আপনি যদ্রূপ পড়েছেন তদ্রূপ নয়। জবাবে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কবি নই। আর কাব্য রচনা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়। ইমাম ইবনে কাছীর (র.) স্বীয় তাফসীরে এই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ প্রমুখগণও তা বর্ণনা করেছেন। তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং কোনো কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা তিনি অন্যদের কবিতা আবৃত্তি করাও পছন্দ করতেন না।

অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় খোদ নবী করীম ﷺ হতে যে কিছু শ্লোক বর্ণিত রয়েছে তার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো তা কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং হঠাৎ (ঘটনাক্রমে) মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছিল। আর কদাচিৎ অকস্মাৎ মুখ হতে দু' একটি শ্লোক বের হয়ে পড়লে কবি বলা হয় না। কাজেই নবী করীম ﷺ ও তার দ্বারা কবি হয়ে যাননি।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ একটি হিকমতের প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ -কে কাব্য রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়নি। তবে এতে কাব্য চর্চা করা সর্বাংশে নিন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং স্বয়ং নবী করীম ﷺ নিজ পবিত্র মুখে বহু কবি ও তাদের কবিতার প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে কবিতা শিক্ষা না দেওয়ার কারণ : আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে কেন কবিতা শিক্ষা দেননি? মুফাস্সিরগণ এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

এক. সাধারণত কাব্য ও কবিতা অলীক ও কাল্পনিক বিষয়াবলির উপর নির্ভর করত রচিত হয়ে থাকে। উক্ত বিষয়াদির সাথে সত্য ও বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক তো থাকেই না; বরং তা অসত্য ও গোমরাহীর দিকেই মানুষের মন-মগজকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সূরায়ে শুয়ারায় আল্লাহ তা'আলা ফরমান– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ـ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ অর্থাৎ "গোমরাহ ও পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। (হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন না তারা বক্তব্যের প্রতি ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত করে থাকে। আর তারা এমন কিছু বলে বেড়ায় যা নিজেরা করে না।"

সুতরাং কাব্য ও কবিতা এবং তা চর্চাকারীদের সাধারণ অবস্থা যখন এরূপ তখন ঐশী জ্ঞানের ধারক ও বাহকের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তার জন্য তা কিভাবে শোভনীয় ও বরণীয় হতে পারে?

দুই. নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা যদি কবিতা রচনার ক্ষমতা প্রদান করতেন তাহলে কাফের মুশরিকরা কুরআনের মূল দাবি হতে লোকদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে পারত। এই সুযোগে কুরআনে কারীমকেও নিছক একটি কাব্য গ্রন্থ বলে চালিয়ে দিতে সক্ষম হতো। সুতরাং যাতে কুরআনে কারীমের মুখ্য উদ্দেশ্য পণ্ড না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য করে রাসূলে করীম ﷺ -কে কবিতা শিক্ষা দেওয়া হয়নি; কাব্য রচনার ক্ষমতা প্রদান করা হয় নি।

"وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ الخ" -এর মধ্যে মহল্লী (র.) يَنْبَغِي -এর তাফসীর يَتَسَهَّلُ -এর দ্বারা করার কারণ : মুফাস্সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন–

এক. তৎকালে আরবি ভাষা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। বড় বড় কবি-সাহিত্যিকগণ প্রতিযোগিতা মূলকভাবে কবিতা রচনা করেছিলেন। তাদের মোকাবিলায় কবিতা রচনা করা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ন্যায় একজন নিরক্ষর মানুষের জন্য মোটেই সহজ সাধ্য তথা সম্ভবপর ছিল না।

দুই. মক্কার সমস্ত কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণীরা মিলে যেই কুরআনের একটি আয়াতের সমতুল্য একটি বাক্য ও রচনা করতে সক্ষম হলো না সেই কুরআন নবী করীম ﷺ -এর ন্যায় একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কিভাবে রচনা করতে পারেন? সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর জন্য এ কুরআন– যাকে তারা কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে– রচনা করা মোটেই সহজ তথা সম্ভবপর ছিল না।

মহানবী ﷺ -এর উপর কাফেররা পাগলামি, জাদু, গণক ইত্যাদির অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও অত্র আয়াতে বিশেষভাবে কবিতা শিক্ষা দেওয়ার প্রতিবাদ করা হলো কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন এবং তা পরবর্তীতে বাস্তবের সাথে হুবহু মিলে যেত তখন কাফেররা বলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন গণক। আবার যখন মহানবী ﷺ স্বীয় নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ কোনো মোজেজা দেখাত তখন তারা বলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন জাদুকর। আবার নবী করীম ﷺ যখন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন ফলে কাফেররা আবিভূত হয়ে যেত তখন রাসূল ﷺ কে তারা বলত তিনি একজন কবি। এত অপবাদ দেওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলা আয়াতে কেন শুধুমাত্র কবিতার নফী করলেন। এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

✪ এ আয়াতে যদিও শুধু কবিতার প্রতিবাদ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে অপরাপর অপবাদসমূহেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে, কাজেই একই আয়াতে সবগুলোর প্রতিবাদ করা জরুরি নয়।

✪ রাসূল ﷺ -এর সবচেয়ে বড় মোজেজা হলো পবিত্র কুরআন, এ কারণেই কুরআনের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদকে প্রথমে খণ্ডন করা হয়েছে।

✪ এ আয়াত দ্বারা মূলত মহানবী ﷺ -এর রিসালাতকে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য আর তাঁর রিসালাত প্রমাণিত হয়ে গেলে অন্যান্যগুলো আপনাতে মিটে যাবে। এ কারণেই এখানে কবিতার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কাফেরদের উক্তি "কুরআন কাব্য গ্রন্থ" এটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। পবিত্র কুরআন হচ্ছে একটি উপদেশ ও আহকাম সম্বলিত কিতাব। মানবজাতির জন্য এতে সদুপদেশ ও জীবন বিধান নিহিত রয়েছে। বোধ সম্পন্ন লোকদের সতর্ক হওয়া এবং কাফেরদের উপর আল্লাহর শাস্তির ঘোষণা সপ্রমাণিত হওয়াই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদেরকে জীবিত ও কাফেরদেরকে মৃত ঘোষণা করেছেন। কুরআনের পরিভাষায় ঈমানকে জীবন এবং কুফরকে মৃত্যু হিসেবে গণ্য করেছে। মনে হয় যেন ঈমানদারগণ জীবিত এবং ঈমানবিহীন অন্তর মৃতের ন্যায়। অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে।

কাজেই এ আয়াতে বলা হয়েছে রাসূল ﷺ যেন জীবিত তথা ঈমানদারদেরকে সতর্ক করতে পারেন তাই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু মহানবী ﷺ তো এ কুরআনের মাধ্যমে কাফেরদেরকেও সতর্ক করেছেন। তথাপিও ঈমানদারদেরকে খাস করার কারণ হচ্ছে– এ সতর্কীকরণ শুধুমাত্র মু'মিনদেরই কাজে এসেছে। এর দ্বারা শুধুমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে– কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাবের ঘোষণাকে স-প্রমাণিত করা। এর অর্থ এটা হতে পারে যে, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব। কাফেরদের ব্যাপারে এ বাণী যথার্থই প্রমাণিত হবে। অথবা এর অর্থ হবে যে নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে কথা দিয়েছেন যে, তাঁর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান না আনলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এর যথার্থতা যেন কাফেরদের ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়। আল্লাহর আদালতে কাফেররা যেন কোনো রূপ ওজর আপত্তি করতে না পারে। কাজেই কুরআনের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর পরও যারা কুফরিতে আঁকড়ে থাকবে তার দায়-দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে। তাদেরকেই এর পরিণাম ফল ভোগ করতে হবে। অন্য কারো ঘাড়ে এর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আজাব হতে নিস্তার লাভের আর কোনোই সুযোগ বাকি থাকবে না।

অনুবাদ :

٧١. اَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ فِىْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَىْ عَمِلْنَاهُ بِلَا شَرِيْكٍ وَلَا مُعِيْنٍ اَنْعَامًا هِىَ الْاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ضَابِطُوْنَ.

৭১. আর তারা কি দেখে না? তারা কি জানে না? এখানে اِسْتِفْهَام সাব্যস্তকরণের জন্য হয়েছে। এর মধ্যে প্রবিষ্ট وَاوْ আত্ফের জন্য হয়েছে। আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি অন্য সকল মানুষের ন্যায় যা আমার কুদরতি হাতে সৃষ্টি অর্থাৎ কোনো অংশীদার ও সাহায্যকারী ছাড়াই চতুষ্পদ জন্তু তা হলো উট, গরু ও ছাগল ইত্যাদি অতঃপর তারা তাদের মালিক হয়েছে তাদেরকে আয়ত্তকারী হয়েছে।

٧٢. وَ ذَلَّلْنَاهَا سَخَّرْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ مَرْكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ.

৭২. আর আমি তাদেরকে অনুগত করে দিয়েছি অর্থাৎ বাধ্যগত করে দিয়েছি তাদের জন্য। সুতরাং তাদের কোনো কোনোটি তাদের সওয়ারি তাদের বাহন এবং তাদের মধ্য হতে কোনো কোনোটিকে তারা ভক্ষণ করে।

٧٣. وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَاَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا وَمَشَارِبُ مِنْ لَبَنِهَا جَمْعُ مَشْرَبٍ بِمَعْنٰى شُرْبٍ اَوْ مَوْضِعِهِ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ اَلْمُنْعِمَ عَلَيْهِمْ بِهَا فَيُؤْمِنُوْنَ اَىْ مَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ.

৭৩. আর সেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে উপকারিতা– যেমন– উটের পশম, গরুর লোম ও ছাগলের লোম এবং পানীয়সমূহ তাদের দুগ্ধ হতে। তা (مَشَارِبُ) مَشْرَبٌ-এর বহুবচন। এটা অর্থ পানীয় অথবা পান করার স্থল। সুতরাং এতদসত্ত্বেও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করছে না? তাদের দ্বারা যিনি তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যাতে তারা ঈমান গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তারা এটা করেনি।

٧٤. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ اٰلِهَةً اَصْنَامًا يَعْبُدُوْنَهَا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ بِشَفَاعَةِ اٰلِهَتِهِمْ بِزَعْمِهِمْ.

৭৪. আর তারা বানিয়েছে আল্লাহকে ছাড়া আল্লাহকে ব্যতীত উপাস্যসমূহ প্রতিমাসমূহ যাদের তারা উপাসনা করে। এ উদ্দেশ্যে যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ তাদের ধারণা হলো তাদের উপাস্য প্রতিমাগুলো সুপারিশ করত তাদের হতে আল্লাহর আজাবকে প্রতিহত করবে।

٧٥. لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَىْ اٰلِهَتُهُمْ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ نَصْرَهُمْ وَهُمْ اَىْ اٰلِهَتُهُمْ مِنَ الْاَصْنَامِ لَهُمْ جُنْدٌ بِزَعْمِهِمْ نَصْرَهُمْ مُحْضَرُوْنَ فِى النَّارِ مَعَهُمْ.

৭৫. তারা সক্ষম হবে না অর্থাৎ তাদের উপাস্য দেব-দেবীরা সক্ষম হবে না। এখানে দেব-দেবীদেরকে বিবেকবানদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে (শব্দরূপ ব্যবহারে)। তাদের সাহায্য করতে বরং তারা অর্থাৎ তাদের উপাস্য দেব-দেবীসমূহ তাদের জন্য বাহিনীরূপে তাদের ধারণানুযায়ী যারা তাদের সাহায্যকারী বাহিনী হাজির করা হবে তাদের সাথে জাহান্নামে।

٧٦. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ . لَكَ لَسْتَ مُرْسَلًا وَغَيْرَ ذٰلِكَ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ .

৭৬. সুতরাং আপনাকে যেন ব্যথিত না করে তাদের বক্তব্য "তুমি রাসূল নও" ইত্যাদি। আমি ভালো করেই জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে : তা এবং অন্যান্য বিষয়াবলি। সুতরাং তদনুযায়ী তাদেরকে আমি প্রতিফল প্রদান করবো।

তাহকীক ও তারকীব

مَنَافِعُ ও مَشَارِبُ-এর অর্থ : مَنَافِعُ এটা مَنْفَعٌ-এর বহুবচন। চতুষ্পদ জন্তু হতে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ। যেমন– তাদের পশম, চামড়া ও হাড় ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন জিনিস-পত্র তৈরি করা হয়।

مَشَارِبُ এটা مَشْرَبٌ-এর বহুবচন। এটা মাসদার তথা شُرْبٌ-এর অর্থেও হতে পারে। আবার ইসমে যরফ তথা مَوْضِعُ الشُّرْبِ (পান করবার স্থান)-এর অর্থেও হতে পারে।

"لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ"-এর মধ্যকার যমীরসমূহের মারজি' : অত্র আয়াতে যমীরসমূহের মারজি'র ব্যাপারে একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান।

প্রথমত "لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ" এখানে হয়তো لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো اَلْكُفَّارُ আর هُمْ-এর مَرْجِعٌ হলো اَلْاٰلِهَةُ ইবারত হবে– "اَلْكُفَّارُ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ الْاٰلِهَةِ" কাফেররা তাদের উপাস্যদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।

অথবা, لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর মারজি' হবে اَلْاٰلِهَةُ এবং هُمْ-এর মারজি' হবে اَلْكُفَّارُ ইবারত দাঁড়াবে– لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْاٰلِهَةُ نَصْرَ الْكُفَّارِ কাফেরদের উপাস্যরা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।

দ্বিতীয়ত "وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ" এখানেও প্রথম هُمْ-এর মারজি' হবে اَلْكُفَّارُ এবং দ্বিতীয় هُمْ-এর মারজি' হবে اَلْاٰلِهَةُ ইবারত হবে– "وَالْكُفَّارُ لِلْاٰلِهَةِ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ" কাফেররা উপাস্য দেব-দেবীর জন্য সমুপস্থিত সেনাবাহিনী।

অথবা, প্রথমোক্ত هُمْ-এর মারজি' হলো اَلْاٰلِهَةُ এবং শেষোক্ত هُمْ-এর মারজি' হলো اَلْكُفَّارُ ইবারত হবে– وَالْاٰلِهَةُ لِلْكُفَّارِ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ. উপাস্যরা কাফেরদের জন্য সমুপস্থিত বাহিনী (তথা প্রতিপক্ষ) হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আয়াতের মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ الخ-এর মধ্যে وَاوْ টি حَالِيَه বা অবস্থাজ্ঞাপক। কাজেই বাক্যটি অবস্থা ব্যাপক হয়ে মহল্লান মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ (م) اِنَّا نَعْلَمُ الخ"-এর শানে নুযূল : মুশরিকরা নবী করীম ﷺ-কে নানাভাবে কষ্ট দিত। তারা তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন করত। গাল-মন্দ করত ও নানা কটূক্তি করত। কখনও বলত মুহাম্মদ ﷺ পাগল, কখন বলত জাদুকর, গণৎকার আবার কখনো বলত মুহাম্মদ ﷺ কবি আর কুরআন হলো তাঁর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। আবার কখনো রটনা করত যে, তাঁকে জিনে পেয়েছে– নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তাদের অত্যাচারে নবী করীম ﷺ মাঝে মধ্যে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়তেন। মুশরিকদের এহেন দুর্ব্যবহারে তাঁর হৃদয়-মন ব্যথিত ও হতাশ হয়ে পড়ত। সবচেয়ে পীড়াদায়ক বিষয় ছিল তারা নিজেরা তো ঈমান আনেই নি; বরং অন্যান্যদেরকেও ঈমান আনতে বাধা দিত। যারাই ঈমান আনত তারাই তাদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতো। হরহামেশাই নীরিহ ঈমানদারদের বুক ফাটানো আর্তনাদে দয়াল নবী ﷺ শিহরিয়ে উঠতেন। এমনতর

পরিস্থিতিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের কতিপয় আয়াত নাজিল করতঃ রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। আলোচ্য আয়াতখানা সেই সব আয়াতের একটি। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর হাবীবকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি মুশরিকদের দুর্ব্যবহার ও কটূক্তিতে ব্যথিত হবেন না। তাদের সকল আচরণ সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত রয়েছি। আমি তাদের থেকে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবো।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ الخ আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনে তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ১. আল্লাহর একত্ববাদ ২. রাসূল ﷺ -এর রিসালাত ৩. আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহের নসিহত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী আয়াতে মহানবী ﷺ ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদের কথা শুরু করা হয়েছে। মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে এ আয়াতে কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং তার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ অর্থাৎ মানুষ কি দেখে না যে তারা আল্লাহর অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ ভোগ করে চলছে। এ নিয়ামতসমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুগুলো অন্যতম। আল্লাহ মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন উট, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি। আল্লাহ এ চতুষ্পদ জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। একটি ছোট বালক অনায়াসে বড় বড় জন্তুকে তার লাগাম ধরে হাটিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ এগুলোর দুধ পান করে গোশত খায়। এগুলোর চামড়া এবং পশম দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে, শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করে। তারা এ জীবজন্তু থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে। এগুলোর দ্বারা তাদের অনেক প্রয়োজনের আয়োজন হয়। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও অশেষ দান। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, যথা নিয়মে তাঁর বন্দেগি করা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়।

"مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا" -এর মধ্যে হস্তদ্বয়কে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করার রহস্য : কুরআনে হাকীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার হাত-এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সৃষ্টিকুলের ন্যায় কায়াবিশিষ্ট নন। সুতরাং তাঁর হাত বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে?

মুতাকাদ্দিমীনে ওলামায়ে কেরাম (র.) উক্ত প্রশ্নের জওয়াবে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার হাত, চোখ, কান ইত্যাদি আছে। তবে তার সৃষ্টির হাত-পা বা কান, চোখের ন্যায় মোটেই নয়; বরং যদ্রূপ তার জন্য শোভনীয় তদ্রূপ রয়েছে। তার মূল অবস্থা আমাদের জানা নেই।

আর মুতায়াখ্খিরীনে ওলামায়ে কেরাম তার বিভিন্ন তাবীল করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁরা অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, "আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন" এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টির ব্যাপারে কেউই তাঁর শরিক বা অংশীদার নেই।" আল্লাহই ভালো জানেন।

"وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا الخ" -এর ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বান্দার উপর তাঁর একটি বিরাট ইহসানের উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, অধিকাংশ জীব-জন্তু যেমন উট, গরু, হাতি, মহিষ ইত্যাদি মানুষ হতে অনেক বড় ও বহু গুণে বেশি শক্তিশালী। তাদের মোকাবিলায় মানুষ অতিশয় দুর্বল ও হীনকায়। কাজেই মানুষ তাদেরকে বশীভূত করতে না পেরেই ছিল স্বাভাবিক। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে শুধু উক্ত জানোয়ারদের সৃষ্টিই করেননি; বরং এই বন্য ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোকে মানুষের অনুগতও বানিয়ে দিয়েছেন। একটি বালক একটি বিরাটকায় শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়। অতঃপর তার পিঠে সওয়ার হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এটা মানুষের নিজস্ব কোনো গুণ নয়; বরং শুধুমাত্র আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الخ আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করে, তার গোশতও ভক্ষণ করে। এখানে ইরশাদ করেছেন যে, শুধু তাই নয়; বরং তাদের হতে তারা আরও নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। তাদের পশম, চামড়া ও হাড়কে তারা বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করে থাকে। তারা তাদের দুগ্ধ পান করে থাকে। দুগ্ধ হতে নানা ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলার এত নিয়ামত উপভোগ করেও তারা এতটুকু শুকরিয়া আদায় করে না। কেননা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা হলো তাঁর বড় শুকরিয়া আদায় করা। অথচ তারা তা হতে দূরে সরে রয়েছে। আল্লাহর অপার রহমত ও অসংখ্য নিয়ামতে নিমজ্জিত থেকে তারা নিষ্প্রাণ জড় প্রতিমা ও কাল্পনিক দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। তা হতে অধিক বোকামি ও অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে? শুধু তাই নয়, তা হতেও অধিক দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো তারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিয়ামতের মৌখিক স্বীকৃতি ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেই শোকরের হক আদায় হয়ে যাবে না; বরং কার্যত তা দেখিয়ে দিতে হবে। মোটকথা, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলে, তাঁর আদেশাবলি মান্য করলে ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলি হতে বিরত থাকলেই প্রকৃতপক্ষে শুকরিয়া আদায় করেছে বলে গণ্য হবে, অন্যথা নয়। সুতরাং গায়রুল্লাহর ইবাদত করা, তাদের জন্য ভেট ও নযর-নেওয়াজ দেওয়া, তাদের নিকট কিছু চাওয়া ইত্যাদির সবকিছুই আল্লাহর না শোকর তথা কুফরানে নিয়ামতের শামিল।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الخ -এর ব্যাখ্যা : কাফের মুশরিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। উক্ত নিয়ামত রাজির শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা ছিল তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অথচ তারা আল্লাহর সাথে এমন কতিপয়কে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে যারা তাদের মোটেই কোনো উপকার করতে পারবেনা। যদিও তাদের আশা যে, ঐ উপাস্যরা আখেরাতে আল্লাহর আজাব ও গজব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে। বরং ঐ উপাস্য দেবতারা তাদের জন্য [অর্থাৎ উপাসনাকারীদের জন্য] সেনাবাহিনী হিসেবে সমুপস্থিত হবে।

এখানে মুফাসসিরগণ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ -এর দুটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

এক. এখানে جُنْدٌ -এর দ্বারা বিরোধী বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে : অর্থাৎ কাফের-মুশরিকরা যেসব গায়রুল্লাহর ইবাদত করছে কিয়ামত দিবসে তারা ঐ কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

দুই. হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তারা দেব-দেবীকে তো তাদের সাহায্যের জন্য পূজা করেছিল। অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা তো কাফের-মুশরিকদের সাহায্য করতে সক্ষম-ই নয়; বরং উপাসনাকারীরাই তাদের খাদেম এবং তাদের সেনাবাহিনী হিসেবে দিবা-রাত্রি তাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে–তাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। তারাই বরং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে তারাই তো অস্ত্র ধারণ করে। –[কুরতুবী]

আয়াতে কারীমা "فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ الخ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে خِطَابٌ (সম্বোধন) করা হয়েছে। এখানে প্রকাশ্য ও গোপন কথা বলে ইঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, মক্কার কাফের ও মুশরিক নেতৃবৃন্দ নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা চালাত তা সম্পর্কে তাদের স্পষ্টই জানা ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিরুদ্ধে তারা যে দোষারোপ করছে, যে অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন– সর্বাংশেই মিথ্যা ও বানোয়াট। এমনকি নিজেদের ঘরোয়া মিটিংয়ে তারা তা স্বীকারও করত। মূলত নিজেদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অটুট রাখার জন্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ও তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া ছিল এ অপপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে তাদের এ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও অহেতুক অপবাদের মুখে ধৈর্য ধারণের এবং তাতে ব্যথিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপতৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন। তিনি তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সত্যকে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত করবেন– তা কাফের-মুশরিকদের নিকট যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন। মোটকথা, বিজয় শেষ পর্যন্ত আপনারই হবে। আর তাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও দুর্গতি এবং পরকালের সীমাহীন ভোগান্তি। কাজেই হে-হাবীব! আপনার চিন্তিত ও ব্যথিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার এবং আপনার অনুসারীদের জন্য রয়েছে ইহকালে মর্যাদা ও সম্মানের আসন আর পরকালে অনন্ত শান্তি– এতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।

অনুবাদ :

৭৭. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ يَعْلَمُ وَهُوَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ إِلٰى أَنْ صَيَّرْنَاهُ شَدِيْدًا قَوِيًّا فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ لَنَا مُّبِيْنٌ بَيِّنُهَا فِيْ نَفْيِ الْبَعْثِ.

৭৭. মানুষ কি দেখে না? তথা জানে না? আর [সে এখানে মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য] হলো আস ইবনে ওয়ায়েল। আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য হতে ধাতু হতে- এমনকি অতঃপর আমি তাকে কঠিন ও শক্তিশালী করেছি। অথচ সে ঝগড়াকারী- আমার সাথে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত প্রকাশ্য পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি প্রশ্নে সে প্রকাশ্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ সে সরাসরি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বসেছে।

৭৮. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا فِيْ ذٰلِكَ وَّنَسِيَ خَلْقَهُ ط مِنَ الْمَنِيِّ وَهُوَ أَغْرَبُ مِنْ مِثْلِهِ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ أَيْ بَالِيَةٌ وَلَمْ يَقُلْ بِالتَّاءِ لِأَنَّهُ اِسْمٌ لَا صِفَةٌ رُوِيَ أَنَّهُ أَخَذَ عَظْمًا رَمِيْمًا فَفَتَّتَهُ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَرٰى يُحْيِي اللّٰهُ هٰذَا بَعْدَ مَا بَلِيَ وَرَمَ فَقَالَ ﷺ نَعَمْ وَيُدْخِلُكَ النَّارَ.

৭৮. আর আমার সামনে একটি উদাহরণ পেশ করেছে ঐ ব্যাপারে এবং ভুলে বসেছে তার সৃষ্টির ঘটনাকে- বীর্য হতে। অথচ তা তার পেশকৃত উদাহরণ হতে অধিকতর আশ্চার্যজনক। সে বলল, কে হাড়গুলোকে জীবিত করবে? এমতাবস্থায় যে, জরাজীর্ণ হয়ে (পচে-গলে) গিয়েছে। অর্থাৎ পুরানো হয়ে গিয়েছে। আর تَا যোগে (رَمِيْمَةٌ) বলেননি। কেননা তা ইসম, সিফাত নয়। বর্ণিত আছে যে, আস ইবনে ওয়ায়েল একটি পুরানো হাড় নিল। তারপর তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর নবী করীম ﷺ -কে বলল, তুমি কি মনে কর যে, এ হাড়টি পুরানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনঃ জীবিত করবেন? জবাবে নবী করীম ﷺ বলবেন, হ্যাঁ, আর তোমাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

৭৯. قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ أَيْ مَخْلُوْقٍ عَلِيْمٌ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا قَبْلَ خَلْقِهِ وَبَعْدَ خَلْقِهِ.

৭৯. হে হাবীব! আপনি তাকে বলে দিন, উক্ত হাড়গুলোকে তিনিই পুনঃ জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে অর্থাৎ মাখলুক সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন- এজমালিভাবে এবং বিশদভাবে। তা সৃষ্টির পূর্বে এবং তা সৃষ্টির পরে।

৮০. اِلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ فِيْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ الْمَرْخِ وَالْعَفَارِ أَوْ كُلِّ شَجَرٍ إِلَّا الْعِنَابَ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ تَقْدَحُوْنَ وَهٰذَا دَالٌّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ فَإِنَّهُ جَمَعَ فِيْهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْخَشَبِ فَلَا الْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ وَلَا النَّارُ تُحْرِقُ الْخَشَبَ.

৮০. যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য- অপরাপর মানুষের ন্যায় সবুজ বৃক্ষ হতে মারখ ও আফার নামক গাছ হতে অথবা আঙ্গুর ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষ হতে অগ্নি। সুতরাং তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর চুলা ধরাও। অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে থাক। আর এটা পুনরুত্থানের শক্তি ও সম্পর্ক প্রমাণ করে। কেননা তিনি তাতে পানি, অগ্নি ও কাঠের সমাহার করেছেন। অথচ না পানি আগুনকে নিভিয়ে দিচ্ছে আর না আগুন কাঠকে পুড়িয়ে ফেলেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ, ইকরামা, উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের এবং সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আর বায়হাকী আবূ মালিকের সূত্রে, এমনিভাবে আল্লামা বাগবী (র.) বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ আয়াত উবাই ইবনে খলফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা সে একটি পঁচা হাড় নিয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয় এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে বলে, সে এভাবে ধ্বংস হওয়ার পর কে তাকে পুনর্জীবন দান করবেন? মহানবী ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং দোজখে নিক্ষেপ করবেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আয়াতের মর্মকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুক্র বিন্দু থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়। -[মাযহারী]

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে- মানুষ কি তার সৃষ্টির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে না? কিভাবে সে তার অস্তিত্ব লাভ করেছে তা কি সে ভুলে গেছে? তার স্মরণ করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা একটি শুক্র বিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যখন তার কোনোই অস্তিত্ব ছিল না, কোনো নমুনা ছিলনা, এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দয়ায় সে জীবনের যাবতীয় উপকরণ লাভ করেছে। ঠিক এমনিভাবে যখন মানুষ মৃত্যুর পর কঙ্কালে পরিণত হবে, তখন পুনরায় আল্লাহ তা'আলাই তাকে নবজীবন দান করবেন।

বস্তুত মানুষ যদি তার প্রথম সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়। যদি সে এ মহা সত্য সম্পর্কে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাকে অনস্তিত্বের শূন্য গর্ভ থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন, তবে এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবে না যে, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে জীবন দান করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। যিনি একটি শুক্র বিন্দুকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছেন সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অতি সহজ কাজ। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, একদিন এমনও ছিল, যখন তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর এখন সে এক বাস্তব সত্য। কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তার উপর মৃত্যুর আলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হবে এবং এ পৃথিবীতে তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আর তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হবে। এরপর আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তার জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব-নিকাশ নিবেন। কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন যে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى অর্থাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব। আবার পুনরায় এ মাটি থেকে বের করব।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাই এতে কার্যকর হবে। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা এক ফোঁটা অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সে আজ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে উপলব্ধি করতে চায় না। বিতর্কে লিপ্ত হতে চায়। যিনি অপবিত্র উপকরণ দ্বারা এত সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করেন তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দেওয়া আদৌ কঠিন কাজ নয়।

-[মাযহারী ৯ খণ্ড, পৃ. ৫৬৭]

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ الخ আয়াতে اِنْسَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ আয়াতে اِنْسَانٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে-

১. তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী (র.) লিখেন- اِنْسَانٌ দ্বারা এখানে কুরাইশ নেতা আবূ জাহল, উবাই ইবনে খলফ, আস ইবনে ওয়ায়েল ও ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. তাফসীরে রুহুল বয়ানের ভাষ্যমতে, এখানে اِنْسَانٌ দ্বারা পরকাল অবিশ্বাসকারী সকল মানুষকেই বুঝানো হয়েছে।

৩. জালালাইনের লেখক জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) -এর মতে, এখানে اَلْاِنْسَانُ দ্বারা শুধুমাত্র আস ইবনে ওয়ায়েলকে বুঝানো হয়েছে

৪. ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর شُعَبُ الْاِيْمَانِ গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াতে اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে বুঝানো হয়েছে :

সারকথা হলো, এ আয়াতটি যার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন এর দ্বারা সকল কাফেরই উদ্দেশ্য। কারণ তারা সকলেই পরকালকে অস্বীকার করে।

اَلنُّطْفَةُ উল্লেখের রহস্য : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে اَلنُّطْفَةُ শব্দের উল্লেখ করার মাধ্যমে স্বীয় কুদরতের প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ نُطْفَةٌ এমন একটি বস্তু যার রং-রূপ, আকার-আকৃতি এক ও অভিন্ন। অথচ আল্লাহ তা'আলা তা হতে বিভিন্ন রং-রূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করছেন। স্বীয় ইচ্ছা মাফিক কেউই জন্ম লাভ করতে পারে না। সন্তানের বাবা মাও স্বীয় ইচ্ছাধীনে সন্তান জন্ম দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছাধীনেই তা করে থাকেন। মূলত এতে কারোরই হাত নেই। যে আল্লাহ নির্দিষ্ট (একই) আকার-আকৃতির বীর্য হতে বিভিন্ন রং-রূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন তিনি সন্দেহাতীতভাবে পুনরুত্থানেও সক্ষম।

'وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا .... فَاِذَآ اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُوْنَ' আয়াতের ব্যাখ্যা : দুরাত্মা কাফেররা আল্লাহ তা'আলার শানে ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্য করে এবং নিজের সৃষ্টির ইতিকথাই ভুলে যায়, তারা বলে যে, মানুষের পুনরুত্থান কি করে সম্ভব? একটি হাড় যখন পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন কার এ শক্তি আছে যে, তাকে নব জীবন দান করবে? অর্থাৎ যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব মনে করা হয়, তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষেও তাকে তেমনি অসম্ভব মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম শক্তিকে মানুষের শক্তির ন্যায় মনে করে, তাই তারা এমন অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ. অর্থাৎ '(হে রাসূল!) আপনি বলুন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই পুনর্জীবিত করবেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।'

অর্থাৎ এ হাড়গুলোকে সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলাই পুনর্জীবন দান করবেন, যিনি প্রথম এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন।

পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান : এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করবেন, মৃত্যুর সময় রুহকে দেহ থেকে পৃথক করা হয়, কিন্তু পুনরায় মানুষকে জীবিত করা হবে আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এ কাজ আদৌ কঠিন কিছু নয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হতভাগা কাফের আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে, অথচ তার নিজের সৃষ্টি তত্ত্বই সে ভুলে যায়, যদিও এ আয়াত উবাই ইবনে খালফ অথবা আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতের মধ্যে জবাব রয়েছে সকল যুগের কাফের মুশরিকদের, যারা এমন বেয়াদবিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রকৃত অবস্থা এই, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যা সৃষ্টি নিজেও তার সম্পর্কে জানে না স্রষ্টা তা জানেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ 'তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, পঁচাগলা হাড়গুলোকে একত্রিত করা এবং তাতে জীবন সঞ্চার করা এত বিস্ময়কর নয়, যত বিস্ময়কর হলো মানব দেহের নির্যাস রূপে শুক্রকে বের করা এবং এ অপবিত্র বস্তু থেকে একজন সম্মানিত মানুষ তৈরি করা। ঐ একটি অপবিত্র বস্তুর মধ্যেই থাকে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ এক কথায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এসব কিছুই ছিল আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানে যা মানব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ দুরাত্মা কাফেররা তাদের সৃষ্টির ইতিকথাকে ভুলে গিয়ে বলেছে, 'কে এই পঁচাগলা কঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার করবে'? আলোচ্য আয়াতে সরাসরি তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবারের সৃষ্টি থেকে কঠিনও নয়, বিস্ময়করও নয়।

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ 'তিনিই তো তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, তোমরা তা থেকেই অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক'।

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরতের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আরবে দু'প্রকার বৃক্ষ রয়েছে, এক প্রকারকে বলা হয়, 'মীরখ', আর এক প্রকার হলো 'ইফার'। এ দু'প্রকার বৃক্ষের ডালাগুলো সবুজ হয় এবং তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি পড়তে থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় প্রকার বৃক্ষের ডালাগুলোর পরস্পরের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। এটি কতবড় বিস্ময়কর বিষয় যে, আগুন পানি এক হতে পারে না, অথচ এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয় এবং এভাবে তোমরা অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক। যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন বের করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, একবার আকাবা ইবনে আমর হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে বললেন, আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে দিন, যা আপনি প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, সে তার উত্তরাধিকারীদেরকে অসিয়ত করল যে, আমার মৃত্যু হলে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আমার লাশকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে, এরপর ঐ ছাইগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেবে। তারা তাই করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে তার ছাইগুলোকে একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এমনটি কেন করলে'? সে আরজ করল 'হে পরওয়ারদেগার! আপনার ভয়ে'। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর ﷺ পথ চলার সময় এ হাদীস ইরশাদ করেছিলেন যা আমি নিজে তাঁর জবান মোবারক থেকে শ্রবণ করেছি। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সে ব্যক্তি বলেছিল, আমার দেহের ছাইগুলোকে দু'ভাগ করবে, একভাগ বাতাসে ছেড়ে দেবে, আরেকভাগ সমুদ্রে ফেলে দেবে। এরপর আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে সমুদ্র এবং বাতাস তার ছাইগুলো একত্রিত করে হাজির করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন। আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বৃক্ষ উৎপাদন করেন এবং এ সবুজ বৃক্ষ থেকে তিনি অগ্নি বের করেন, আর এটি কোন কঠিন কাজ নয়, এমনিভাবে জীবিতকে মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং মৃতকে পুনর্জীবন দান করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়। এ জন্য আরবে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে– لِكُلِّ شَجَرٍ نَارٌ وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আঙ্গুর বৃক্ষ ব্যতীত সকল বৃক্ষেই অগ্নি রয়েছে।

যাহোক, আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর পক্ষে মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং তাকে পুনর্জীবন দান করে তাঁর দরবারে হাজির করা সবই সহজ এবং সবই সম্ভব। এ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মু'মিন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২০,২১, তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড– ৯, পৃষ্ঠা-৬৭১]

অনুবাদ :

৮১. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مَعَ عِظَمِهِمَا بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط أَيِ الْأَنَاسِيَّ فِي الصِّغَرِ بَلٰى ق أَيْ هُوَ قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ أَجَابَ نَفْسَهُ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْكَثِيْرُ الْخَلْقِ الْعَلِيْمُ بِكُلِّ شَيْءٍ.

৮১. তাহলে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল– তাদের বিশালতা সত্ত্বেও তিনি তাদের ন্যায় (জীব)-কে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অর্থাৎ মানুষকে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও। হ্যাঁ, অবশ্যই অর্থাৎ তিনি তা করতে সক্ষম। আল্লাহ নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আর তিনি বহু সৃষ্টিকারী– অত্যধিক সৃষ্টিকারী সম্পূর্ণ অবহিত সব কিছুর ব্যাপারে।

৮২. إِنَّمَا أَمْرُهُ شَأْنُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَيْ خَلْقَ شَيْءٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَيْ فَهُوَ يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يَقُولَ.

৮২. নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যাপার (অর্থাৎ) তাঁর অবস্থা হলো যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাকে বলেন, "হও" তাতে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ ফলে সে বস্তু (অস্তিত্বসম্পন্ন) হয়ে যায়। অন্য এক কেরাতে يَقُولَ -এর উপর আতফ হয়ে নসবের সাথে (فَيَكُونَ) হয়েছে।

৮৩. فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ مَلِكُ زِيْدَتِ الْوَاوُ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ أَيِ الْقُدْرَةُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُرَدُّونَ فِي الْأٰخِرَةِ.

৮৩. সুতরাং পূত-পবিত্র সে সত্তা যার হস্তে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা (مَلَكُوتُ শব্দটি আসলে ছিল) مَلِكُ মুবালাগাহ বা আধিক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে এর সাথে واو এবং تا -কে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কুদরত (ক্ষমতা)। প্রত্যেক বস্তুর উপর। আর তারই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ আখেরাতে তার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

بِقَادِرٍ -এর বিভিন্ন কেরাত : بِقَادِرٍ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. প্রসিদ্ধ কেরাত হচ্ছে মাসহাফে উল্লিখিত بِقَادِرٍ -

২. আল্লামা আবুল মুনযির, সাল্লাম ও ইয়াকুব হাযরামী প্রমুখের মতে কেরাতটি يَقْدِرُ -

اَلْخَلَّاقُ শব্দের বিভিন্ন কেরাত : এখানেও দুটি কেরাত রয়েছে–

* মাসহাফে উল্লিখিত اَلْخَلَّاقُ আর এটা প্রসিদ্ধ কেরাত।

* হযরত হাসান (র.) اَلْخَلَّاقُ -এর পরিবর্তে اَلْخَالِقُ পড়েছেন।

فَيَكُونَ -এর বিভিন্ন কেরাত : فَيَكُونُ শব্দটির শেষের ن -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত হতে পারে–

১. মাসাহাফে উল্লিখিত فَيَكُونُ অর্থাৎ শেষের ن টি পেশ যোগে হয়ে আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. ইমাম কেসায়ী (র.) فَيَكُونَ অর্থাৎ শেষের ن টিকে যবরের সাথে পড়েছেন। তখন এটা পূর্বের يَقُولَ -এর উপর আতফ হবে।

"مَلَكُوتُ" -এর মধ্যে পঠিত কেরাত : এখানেও দুটি কেরাত রয়েছে–

১. মাসহাফে উল্লিখিত مَلَكُوْتُ আর এটাই প্রসিদ্ধ।

২. তালহা ইবনে মুদারিক ইব্রাহীম তামীমী প্রমুখ কারীদের মতে مَلَكُوْتُ -এর স্থানে শব্দটি مَلَكَةُ হবে।

"تُرْجَعُوْنَ" -এর মধ্যকার কেরাত : تُرْجَعُوْنَ শব্দটিতেও দুটি কেরাত রয়েছে–

১. মাসহাফে উল্লিখিত تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ শব্দের প্রথম অক্ষরটি হবে ت যোগে আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. হযরত সুলামী, যিররু, ইবনে হুযায়ফা ও আব্দুল্লাহ প্রমুখগণ এখানে يُرْجَعُوْنَ অর্থ শব্দের প্রথম বর্ণটি يَ যোগে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَوَلَيْسَ الَّذِيْ .... وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ" -এর ব্যাখ্যা : 'যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, নিশ্চয় পারেন, তিনিই প্রকৃত স্রষ্টা আর তিনিই সর্বজ্ঞ'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হিকমতের বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, যিনি বিশাল আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব প্রদান করা কোনো অবস্থাতেই কঠিন হতে পারে না। তোমরা বিরাট বিস্তৃত নীলাভ আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং বিশাল বিস্তৃত জমিনের দিকেও তাকাও, যিনি আসমান জমিনের ন্যায় মহাসৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে পাঁচ/ছয় ফুট ক্ষুদ্র মানুষের পুনঃসৃষ্টি কি আদৌ কঠিন হতে পারে? আসমানের নিচে জমিনের উপর কোটি কোটি মানুষ বাস করছে, আসমান জমিনের সৃষ্টির তুলনায় মানুষের সৃষ্টি নিতান্ত সামান্য ব্যাপার, এরপরও কি কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষে একথা চিন্তা করা সম্ভব হয় যে, মানুষকে পুনর্জীবন দেওয়া আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কঠিন হবে? অবশ্যই নয়, তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি মহাজ্ঞানী, সৃষ্টি জগতের সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্য বিস্ময়কর, এ জন্যে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ 'মানুষের সৃষ্টি থেকে আসমান জমিনের সৃষ্টি অত্যন্ত বড় ব্যাপার'।

وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি একের পর এক সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ 'আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থা তো এমনই, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তার সম্পর্কে বলেন, 'হও', আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও', অমনি ঐ বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করে। তিনি যা কিছু করতে চান, তার জন্যে তাঁর একটি আদেশই যথেষ্ট।

মুসনাদে সংকলিত একখানি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই গুণাহগার, তবে যাকে আমি ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব, তোমরা সকলেই ফকির, যাকে আমি ধনী করি, আমি অত্যন্ত বড় দাতা, আমি যা ইচ্ছা তা করি। আমার পুরস্কারও একটি কথা, আর আমার আজাবও একটি কথা, আমি যা কিছু করতে চাই, আমি শুধু বলি, 'হও' তখন তা হয়ে যায়। সকল মন্দ বস্তু থেকে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। যিনি আসমান জমিনের বাদশাহ, যাঁর হাতে আসমান জমিনের চাবি রয়েছে, তিনি সকলের স্রষ্টা, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাবান। কিয়ামতের দিন সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তিনিই সুবিচারক, তিনিই নিয়ামতদাতা, তিনিই মানুষকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন, তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যাঁর হাতে সব কিছুর ক্ষমতা রয়েছে। তাই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ 'বরকতময় সে আল্লাহ তা'আলা যাঁর হাতে রয়েছে সমস্ত ক্ষমতা, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বোপরি শক্তিমান।'

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, সমগ্র বিশ্বজগতের সব কিছুর সমূহ কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হাতে রয়েছে। অতএব মানুষকে পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান করা তাঁর জন্যে কঠিন কোনো বিষয়ই নয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন, সে বিচক্ষণ ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু একবার নয়; বরং হাজার বার সৃষ্টি করতে, মৃত্যুমুখে পতিত করতে এবং পুনর্জীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ 'অতএব, পবিত্র, মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। অর্থাৎ যখন এ সত্য জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একথাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা মরা পঁচা হাড়গুলোতে পুনরায় প্রাণ দিতে সক্ষম, আর এ সত্যও উদ্ভাসিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন এবং কোনো কিছুকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলে তিনি শুধু আদেশ দেন 'হও' বলে, তখন তা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা। কাফেররা তাদের মূর্খতা বশত তাঁর শানে যেসব আপত্তিকর মন্তব্য করে, তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর রহমত সবার উপরে রয়েছে অব্যাহত।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ 'আর তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) লিখেছেন, এ বাক্যটির মধ্যে দু'টি কথা রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, তার জন্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৫৭৩]

এ সূরার মর্মকথা : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

এক. প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের কথা এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ [হে রসূল!] 'নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্যতম'।

দুই. তৌহীদের অনেক দলিল প্রমাণ বর্ণনা করে ঘোষণা করা হয়েছে-

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ 'অতএব, পবিত্র সে আল্লাহ তা'আলা, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা', তাই প্রত্যেককে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ তিন. 'আর তাঁরই নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। অর্থাৎ প্রত্যেককেই পুনর্জীবন দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকেরই পুনরুত্থান হবে, এভাবে হাশরের ময়দানে হাজির হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আস্-সাফ্ফাত

নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত اَلصَّفّٰتُ দ্বারা সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'আস-সাফফাত'। যার অর্থ হলো– সারিবদ্ধ। যেহেতু এ সূরার শুরুতে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সূরাটি শুরু করেছেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য সূরাটিকে 'আস্-সাফ্ফাত' নামকরণ করেছেন। অথবা, অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ (অংশবিশেষের নামের দ্বারা সম্পূর্ণ বস্তুর নামকরণ) মূলনীতির অনুকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ করেছেন।

মুফাস্সিরীনে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট একটি পবিত্র ও অনুগত জাতি। মুহূর্তকালের জন্যও তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে গাফেল হন না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে আদেশ করা হয় সাথে সাথেই তাঁরা তা পালন করতে লেগে যান। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই রাসূলে কারীম ﷺ সূরাটির নামকরণ করেছেন সূরা 'আস্-সাফ্ফাত'।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : সূরা 'আস্-সাফ্ফাত' তাওহীদ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রুকু'তে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থাসমূহের সাথে সাথে রিসালাতের বর্ণনাও করা হয়েছে। মোটকথা, সম্পূর্ণ সূরার মধ্যে ঘুরে-ফিরে এ তিনটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইয়াসীনেও উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমষ্টিগত যোগসূত্রের দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। –[কামালাইন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : সূরাটি হিজরতের পূর্বে রাসূলে কারীম ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে একথা সুস্পষ্ট বর্ণিত নেই যে, নবুয়তের কোন সালে তা অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যাঁ বিষয়বস্তু ও ভাব-ভঙ্গি পর্যালোচনা দ্বারা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না যে, মাক্কী যুগের শেষভাগে তা অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ঘটনাসমূহের ব্যাপক উদ্ধৃতির মাধ্যমে হুযুর ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার দ্বারা এটাই অনুমান করা যায় যে, তখন নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সীমা অতিক্রম করেছিল এবং স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ও সে সময় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা আস্-সাফ্ফাতে সর্বমোট ১৮২টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এ সূরার প্রতিটি আয়াত মানব জীবনের এক একটি দিক-নির্দেশনা।

সূরার বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত লূত (আ.) ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাবলি কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাঁদের আনুগত্যের গুণাবলি উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর যেসব ঐতিহাসিক কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে, মুসলিম জাতির জনক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান জীবনেতিহাস। তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে ইঙ্গিত পেয়ে একমাত্র স্নেহের পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারের মুখে সান্ত্বনা লাভের প্রেরণা জোগিয়েছিল; তাঁদের নিরাশ অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল।

সূরার শেষ আয়াতসমূহে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাময়িক প্রতাপ-প্রতিপত্তি দেখে শঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেননা অচিরেই তাদের সকল শক্তি ও দম্ভ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে এবং তারা লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। আর শেষ ফলে ঈমানদারগণই কামিয়াব হবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ﻻ اَلْمَلٰئِكَةُ تَصِفُ نُفُوْسَهَا فِى الْعِبَادَةِ اَوْ اَجْنِحَتَهَا فِى الْهَوَاءِ تَنْتَظِرُ مَا تُؤْمَرُ بِهٖ .

১. শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো। ফেরেশতাদের শপথ যারা ইবাদতের জন্য নিজেদেরকে সারিবদ্ধ কিংবা শূন্যলোকে আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতীক্ষায় ডানাসমূহ সারিবদ্ধকারী।

٢. فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﻻ اَلْمَلٰئِكَةُ تَزْجُرُ السَّحَابَ اَىْ تَسُوْقُهٗ .

২. অতঃপর শপথ তাদের যারা ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারী। সেই ফেরেশতাগণ যারা মেঘকে শাসন করে তথা তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

٣. فَالتّٰلِيٰتِ جَمَاعَةُ قُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ تَتْلُوْهُ ذِكْرًا ﻻ مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى التّٰلِيٰتِ .

৩. অতঃপর শপথ তাদের যারা আবৃত্তিতে রত কুরআন আবৃত্তিকারী দল যারা তা তেলাওয়াত করে, জিকিরের। [এখানে ذِكْرًا শব্দটি] تَالِيَاتِ -এর অর্থ হতে মাসদার।

٤. اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ .

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক।

٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﻻ اَىْ وَالْمَغَارِبِ لِلشَّمْسِ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ .

৫. তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অর্থাৎ সূর্যের অস্তস্থলেরও [রব তিনি-ই]। প্রত্যহ সূর্যের একেকটি [পৃথক] উদয়স্থল ও অস্তস্থল রয়েছে।

٦. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ﻻ اَىْ بِضَوْئِهَا اَوْ بِهَا وَالْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ كَقِرَاءَةِ تَنْوِيْنِ زِيْنَةٍ الْمُبَيَّنَةِ بِالْكَوَاكِبِ .

৬. নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। অর্থাৎ তারকারাজির আলো দ্বারা কিংবা খোদ তারকার দ্বারা। আর ইযাফত বয়ানের জন্য, যদ্রূপ زِيْنَةٍ যার বয়ান আনা হয়েছে كَوَاكِبِ -এর দ্বারা তা তানবীন হওয়ার অবস্থায় [স্পষ্টত বয়ান] হয়ে থাকে।

৭. وَحِفْظًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُقَدَّرِ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ عَاتٍ خَارِجٍ عَنِ الطَّاعَةِ .

৭. আর তাকে সংরক্ষিত করেছি حِفْظًا শব্দটি একটি উহ্য فِعْل -এর দ্বারা মানসূব হয়েছে অর্থাৎ حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ আমি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দ্বারা তাকে হেফাজত করেছি, প্রত্যেক [এখানে مِنْ كُلِّ জার-মাজরূর মিলে পূর্বোক্ত] উহ্য فِعْل -এর সাথে মুতা'আল্লিক অবাধ্য শয়তান থেকে। অবাধ্য, যে আনুগত্য হতে বের হয়ে গিয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الخ আয়াতে اَلْكَوَاكِبُ -এর মহল্লে ই'রাব : اَلْكَوَاكِبُ -এর মহল্লে ই'রাব সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম হাফস, হামযাহ ও আবূ বকর (র.) প্রমুখগণের মতে, اَلْكَوَاكِبُ শব্দটি মহল্লে মানসূবে হয়েছে। তখন এটা زَيَّنَّا অথবা اَعْنِىْ উহ্য ফে'লের মাফউল হবে।

২. মাজরূর হবে। এমতাবস্থায় তা زِيْنَةٌ হতে বদল অথবা আতফে বয়ান হবে। অথবা, اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ হবে। কিংবা اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ হওয়ার দরুন মাজরূর হবে।

৩. মারফূ' হবে। সে ক্ষেত্রে তা উহ্য মুবতাদা তথা هِىَ -এর খবর হবে।

وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ الخ আয়াতের শব্দটির মহল্লে ই'রাব : حِفْظًا শব্দটি দু-দিকে লক্ষ্য করে মানসূব হতে পারে–

১. উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক হবে। তথা حَفِظْنَا حِفْظًا [আমি ভালোভাবে হেফাজত করেছি]।

২. অর্থের দিকে লক্ষ্য করে زِيْنَةٌ -এর উপর আতফ হয়ে মানসূব হবে। তথা زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا زِيْنَةً وَّحِفْظًا [আমি সৌন্দর্য ও হেফাজতের দিক দিয়ে নিকটতম আকাশকে সুশোভিত করেছি]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالصّٰفّٰتِ ..... اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ -এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতসমূহে একত্ববাদের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা। তবে তাওহীদের ঘোষণার পূর্বে তিনটি শপথ বর্ণনা করা হয়েছে– ১. তাদের কসম যারা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান। ২. বিতাড়িতগণের শপথ। ৩. জিকির পাঠকারীগণের শপথ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মানগণ, বিতাড়িতকারীগণ ও জিকির পাঠকারীগণ কারা? কুরআনে কারীমে তা প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত হয়নি। এ জন্য তাদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

১. কিছুসংখ্যক মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতে তারা হলেন, সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণকারী, যারা ইসলাম বিদ্বেষীদের শক্তি ধ্বংস করে দেয়। আর সারিবদ্ধ হওয়া কালীন আল্লাহ তা'আলার জিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও তেলাওয়াতে কুরআনে লিপ্ত থাকেন।

২. কিছুসংখ্যক মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, তারা হলেন সেই নামাজ আদায়কারীগণ যারা শয়তানি কুচিন্তা-ভাবনা ও অবৈধ কার্যাদিকে প্রতিহত করে এবং নিজের সকল ধ্যান-ধারণাকে জিকির ও তেলাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত করে।

৩. জমহুরে মুফাসসিরীনের মতে, তাঁরা হলেন ফেরেশতাগণ। আলোচ্য আয়াতে তাঁদের তিনটি গুণাবলির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ফেরেশতাদের প্রথম গুণ : "وَالصَّٰفَّٰتِ صَفًّا" শব্দটি صَفٌّ হতে নির্গত। এটার অর্থ হলো– কোনো দলকে একটি সরল রেখার উপর সন্নিবেশিত করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে– কাতারের পর কাতার বেঁধে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত পালনের নিমিত্তে দণ্ডায়মান ফেরেশতাগণ। যাদের শানে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ নিজেই বলেছেন– وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ 'নিঃসন্দেহে আমরা (আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।' ফেরেশতাগণ কখন এবং কোথায় এরূপ করে থাকে? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখগণের মতে ফেরেশতাগণ শূন্যালোকে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। যখন কোনো নির্দেশপ্রাপ্ত হন সঙ্গে সঙ্গে তা পালনে রত হয়ে যান।

২. কারো কারো মতে, এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, জিকির ও তাসবীহ-তাহলীলে লিপ্ত হয়ে যান, তখনই তাঁরা সারিবদ্ধ হন।

নিয়ম-নীতির অনুসরণ করাও দীনি দায়িত্ব : উল্লিখিত আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি কাজে নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। এটা তো সুস্পষ্ট যে, চাই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হোক বা অন্য কোনো বিধান পালন হোক তা এভাবে অর্জিত হতে পারত যে, ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ না হয়ে এলোমেলো ও ছড়ানো-ছিটানোভাবে একত্রিত হতো। কিন্তু উল্লিখিত বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর তাঁদের উত্তম গুণাবলির সর্বোচ্চ স্থানে তার উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের এ বিশেষ গুণটি আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

নামাজে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ইসলামি মতাদর্শ ও ভাবমূর্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কবুল করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। যারা ঐ আহবানে সাড়া দিয়েছে তারা উত্তম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর পরই নামাজের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে। এ ইবাদত সুশৃঙ্খলও সারিবদ্ধভাবে পালন করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা নামাজে তদ্রূপ সারিবদ্ধ হও না কেন, যদ্রূপ ফেরেশতাগণ তদের প্রভুর নিকট হাজিরা দেওয়ার সময় সারিবদ্ধ হয়ে থাকে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়ার সময় কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে থাকেন? রাসূলে কারীম ﷺ উত্তর দিলেন, তাঁরা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় [অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না]।

হযরত আবূ মাসউদ বসরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– রাসূলে কারীম ﷺ নামাজে আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন, 'সোজা থাকো, আগে পিছনে যেয়ো না, তা না হলে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে।' এ প্রসঙ্গে আরো বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় গুণ : "فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا" এটা زَجْرٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– বারণ করা, বিরত রাখা। হুমকি-ধমকি দেওয়া, তাড়িত করা ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ হবে– তাদের শপথ যারা ধমক ও শাসনবাণী শুনায় এবং বারণ করে। এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরেশতাগণ কি বারণ করে? অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরাম এটার জবাবে বলেছেন যে, বারণ করা দ্বারা ফেরেশতাগণের ঐ তৎপরতাকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌঁছতে বারণ করে থাকে। স্বয়ং কুরআন মাজীদে এর বিস্তারিত বিবরণ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ফেরেশতাগণের তৃতীয় গুণ : 'فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا' অর্থাৎ ফেরেশতাগণ "ذِكْر" পাঠকারী। ذِكْر -এর অর্থ হলো– 'উপদেশবাণী' বা 'আল্লাহর স্মরণ'। প্রথমোক্ত অর্থ অনুসারে আয়াতটির অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা আসমানি কিতাবের মাধ্যমে যে উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পাঠকারী। এ তেলাওয়াত বরকত হাসিল ও ইবাদতের জন্যও হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতটির অর্থ হবে– ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করেন, তাঁরা তাসবীহ-তাহলীলে সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের উক্ত তিনটি গুণাবলির উল্লেখ করে ইবাদত-বন্দেগির সমস্ত গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ১. ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হওয়া। ২. তাগুতী শক্তিকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে বিরত রাখা। ৩. আল্লাহ তা'আলার আহকাম ও উপদেশাবলি নিজে পাঠ করা এবং অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, ইবাদত-বন্দেগির কোনো আমলই এ তিন শাখা বহির্ভূত নয়। অতএব উল্লিখিত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হলো, 'যে ফেরেশতাগণ বন্দেগির সকল গুণাবলির ধারক-বাহক তাঁদের শপথ, তোমাদের প্রকৃত মাবুদ বা ইলাহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।'

ফেরেশতাগণের শপথ করার তাৎপর্য : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক হলো, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে অভিহিত করত। সে মতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলি সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়; বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতের অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতা ইত্যাদির শপথ করেছেন কেন? আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণের শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

'ইতকান'-এ আবুল কাসেম কুশায়রী (র.) থেকে এ প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার জন্য শপথ করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণা তাঁকে শপথ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে তারা কোনো না কোনো উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আজাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী- وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ আয়াত শুনে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলার মতো মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই পরিচিত পন্থা নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شَهَادَتْ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন, যেমন- شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা এ কাজ করেছেন, যেমন- اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهُ لَحَقٌّ -[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের মর্যাদা তাঁর চেয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাখলুকের শপথ করলেন কেন? উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোনো সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মতো হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন, যেমন- اِىْ وَرَبِّىْ এ ধরনের শপথ কুরআন মাজীদে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে- কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলি এবং কুরআনের শপথ করেছেন, যেমন- وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে আল্লাহর সত্তা থেকে পৃথক নয়। -[ইবনে কাইয়্যিম]

বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সৃষ্টবস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন- কুরআন মাজীদে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুকালের শপথ করে বলা হয়েছে- لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ইবনে মারদুবিয়্যাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কুরআনে কোনো নবী ও রাসূলের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি। কেবল রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুকালের শপথ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ -এর শপথও তূর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তুর শপথ করা হয়। যেমন– وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয় এ জন্য যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এ প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শপথ করা হারাম, তাহলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা গায়রুল্লাহর শপথ করলেন? সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের প্রসিদ্ধ বিধান হলো, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা যে সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহর শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– إِنَّ اللّٰهَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ إِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোনো বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর শপথ করা বৈধ নয়। –[মাযহারী] উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরিয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহর শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল। –[মা'আরিফুল কুরআন]

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ **আয়াতের ব্যাখ্যা :** তিনি পালনকর্তা আসমান সমূহের, জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব, যে সত্তা এতসব মহা সৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলিল। এখানে مَشَارِقُ শব্দটি مَشْرِقٌ -এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতের مَشَارِقُ শব্দ দ্বারা শুধু পূর্বাকাশে সূর্যের উদিত হবার স্থানের কথা বলা হয়েছে, পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হলো, দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তুর মধ্যে একটির উল্লেখ করলেই অন্যটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। এতদ্ব্যতীত অস্তের তুলনায় উদয়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের মহিমার অধিকতর প্রকাশ ঘটে। তাই مَشَارِقُ বা উদয়ের স্থানের উল্লেখই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন]

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ **-এর আয়াতের ব্যাখ্যা :** এখানে اَلسَّمَاءُ الدُّنْيَا অর্থ– পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য হলো, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরি নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই অবস্থিত হবে; বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এ তারকা, শোভিত আকাশ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। অতএব, আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও জুলুম! –[মা'আরিফুল কুরআন]

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ **-এর তাফসীর :** উল্লিখিত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজসজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়বি সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোনো শয়তান যৎসামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٨. لَا يَسَّمَّعُوْنَ اَيِ الشَّيَاطِيْنُ مُسْتَانَفٌ وَسَمَاعُهُمْ هُوَ فِي الْمَعْنَى الْمَحْفُوْظِ عَنْهُ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى الْمَلٰئِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَعُدِّيَ السَّمَاءُ بِاِلٰى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْاِصْغَاءِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ وَالسِّيْنِ اَصْلُهُ يَتَسَمَّعُوْنَ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي السِّيْنِ وَيُقْذَفُوْنَ اَيِ الشَّيَاطِيْنُ بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ اٰفَاقِ السَّمَاءِ.

৮. তারা কোনো কিছু শ্রবণ করতে পারে না অর্থাৎ শয়তানরা, এটা নতুন [স্বতন্ত্র] বাক্য। আর তাদের শ্রবণ করা– প্রকৃতপক্ষে তা হতে [আকাশকে] হেফাজত করা হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বজগতের অর্থাৎ আকাশের ফেরেশতাকুলের। আর سَمَاءٌ শব্দটির দিকে اِلٰى -এর দ্বারা مُتَعَدِّيْ করা হয়েছে। কেননা এতে اِصْغَاءٌ [মনোযোগের সাথে শ্রবণ করার] অর্থ নিহিত রয়েছে। অন্য এক কেরাতে মীম ও সীন অক্ষরদ্বয় তাশদীদ যোগে রয়েছে। এটার আসল হলো يَتَسَمَّعُوْنَ - تَاءٌ -কে س -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ শয়তানদেরকে অগ্নিপিণ্ড [উজ্জ্বল তারকা] নিক্ষেপ করা হয় চারদিক থেকে আকাশের দিগন্তসমূহ হতে।

٩. دُحُوْرًا مَصْدَرُ دَحَرَهُ اَيْ طَرَدَهُ وَاَبْعَدَهُ وَهُوَ مَفْعُوْلٌ لَهُ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ وَّاصِبٌ دَائِمٌ.

৯. তাদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। এখানে دُحُوْرًا শব্দটি دَحْرَهُ [যা বিলুপ্ত রয়েছে তা]-এর মাসদার। অর্থাৎ তাকে বিতাড়িত করল এবং দূরে সরিয়ে দিল। আর এটা (অর্থাৎ دُحُوْرًا) মাফঊলে লাহু হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। সর্বদা [অনন্তকাল]-এর জন্য।

١٠. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ مَصْدَرٌ اَيِ الْمَرَّةَ وَالْاِسْتِثْنَاءُ مِنْ ضَمِيْرِ يَسَّمَّعُوْنَ اَيْ لَا يَسَّمَّعُ اِلَّا الشَّيْطَانُ الَّذِيْ سَمِعَ الْكَلِمَةَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فَاَخَذَهَا بِسُرْعَةٍ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ كَوْكَبٌ مُضِيْءٌ ثَاقِبٌ يَثْقُبُهُ اَوْ يُحْرِقُهُ اَوْ يُخَبِّلُهُ.

১০. তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে– এটা (اَلْخَطْفَةَ) মাসদার। অর্থাৎ একবার। আর يَسَّمَّعُوْنَ -এর ضَمِيْر হতে (اِلَّا -এর দ্বারা) اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রবণ করতে পারে না। তবে সে শয়তান যে ফেরেশতার নিকট হতে [এক-আধ] কথা শুনে ফেলেছে এবং তড়িৎবেগে তা আয়ত্ত করে ফেলেছে। উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে– উজ্জ্বল নক্ষত্র যা জ্বলন্ত। তা শয়তানকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে অথবা জ্বালিয়ে ফেলে কিংবা ক্ষত-বিক্ষত করে ছাড়ে।

١١. فَاسْتَفْتِهِمْ اِسْتَخْبِرْ كُفَّارَ مَكَّةَ تَقْرِيْرًا اَوْ تَوْبِيْخًا اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَمَا فِيْهِمَا وَفِي الْاِتْيَانِ بِمَنْ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ.

১১. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন– মক্কাবাসী কাফিরদের নিকট হতে জেনে নিন, প্রমাণার্থে কিংবা ভয় প্রদর্শনার্থে। তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? যেমন– ফেরেশতার জগৎ, আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে। আর আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিবেকবানদের অগ্রাধিকার প্রদান করত [مَا -এর পরিবর্তে] مَنْ ব্যবহার করা হয়েছে।

إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ اَيْ اَصْلَهُمْ اٰدَمَ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ لَازِمٍ يَلْصَقُ بِالْيَدِ الْمَعْنٰى اَنَّ خَلْقَهُمْ ضَعِيْفٌ فَلَا يَتَكَبَّرُوْا بِاِنْكَارِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ الْمُؤَدِّيْ اِلٰى هَلَاكِهِمُ الْيَسِيْرِ ـ

আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তাদের আদি পিতা আদমকে- এঁটেল মাটি থেকে। এমন মাটি যা হাতের সাথে লেগে থাকে। অর্থাৎ তাদের সৃষ্টি [গঠন] দুর্বল সুতরাং অহঙ্কারবশত তারা যেন কুরআনে কারীম ও মহানবী ﷺ -কে অস্বীকার না করে, যা [সে অস্বীকৃতি] তাদেরকে সহজেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلْمَلَاُ الْاَعْلٰى : এখানে اَلْمَلَاُ -এর অর্থ হলো জগৎ, আর اَلْاَعْلٰى -এর অর্থ হলো- ঊর্ধ্ব। অতএব اَلْمَلَاُ الْاَعْلٰى -এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- ঊর্ধ্বজগৎ। আলোচ্য আয়াতে ঊর্ধ্বজগতের দ্বারা ফেরেশতাগণের জগৎকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা ফেরেশতাকুল আকাশে বসবাস করে। এর বিপরীত শব্দ হলো اَلْمَلَاُ الْاَسْفَلُ তথা নিম্নজগৎ। জিন ও মানুষের জগৎকে নিম্নজগৎ বলা হয়। কেননা তারা নিম্নজগৎ তথা জমিন বা পৃথিবীতে বসবাস করে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى دُحُوْرًا : এটা فُعُوْلٌ -এর ওজনে মাসদার। এর অর্থ হলো- বিতাড়িত করা, বহিষ্কার করা, প্রতিহত করা ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে دُحُوْرًا শব্দটি মাফউলে লাহু হয়ে নসব বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ শয়তানদেরকে আকাশের দিগন্তসমূহ হতে চতুর্দিক থেকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। আর তা করা হয় তাদেরকে বহিষ্কার করার জন্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلْخَطْفَةَ : শব্দটির অর্থ হলো- ছিনিয়ে নেওয়া, আকস্মিকভাবে ছো মেরে কিছু নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ কোনো শয়তান যদি ঘটনাক্রমে ফেরেশতাদের কোনো আলোচনা শুনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ভস্ম করে ফেলে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى شِهَابٌ : শব্দটির অর্থ হলো- অগ্নিপিণ্ড, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এটা একবচন, বহুবচনে شُهُبٌ।

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثَاقِبٌ : শব্দটির অর্থ হলো- প্রজ্বলিত, তেজস্বী, ছিদ্রকারী, ছিন্নভিন্নকারী।

قَوْلُهُ فَاسْتَفْتِهِمْ : আলোচ্য আয়াতাংশে فَ হরফে আতফ, আর اِسْتَفْتِ সীগায়ে اَمْرٌ حَاضِرٌ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহছ مَعْرُوْفٌ বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ অর্থ- ফতোয়া তলব করা, জানতে চাওয়া। هُمْ যমীর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে হাবীব! আপনি মক্কার কাফেরদের নিকট জানার জন্য জিজ্ঞাসা করুন, তারাই কি সবচেয়ে শক্তিশালী? না আমার অপরাপর সৃষ্টি। যেমন- আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল, ফেরেশতাজগৎ ইত্যাদি অধিক শক্তিশালী। আলোচ্য আয়াতে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদের থেকে এ ব্যাপারে স্বীকৃতি আদায় করা, অথবা তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى طِيْنٍ لَّازِبٍ : طِيْنٌ অর্থ হলো- মাটি, আর لَازِبٌ অর্থ হলো- আঠালো বা নিকৃষ্ট। অতএব, শব্দদ্বয়ের সমষ্টিগত অর্থ হলো- আঠালো বা নিকৃষ্ট মাটি।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ -এর মধ্যকার বিভিন্ন কেরাত : উল্লিখিত আয়াতে لَا يَسَّمَّعُوْنَ -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত হতে পারে-

১. لَا يَسَّمَّعُوْنَ এটা মূলে لَا يَتَسَمَّعُوْنَ (বাবে تَفَعُّلٌ হতে تَسَمُّعٌ মাসদার) تَا-কে س -এর দ্বারা পরিবর্তন করে س -কে অপর س -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আলোচ্য কেরাতটি হযরত হামযাহ, কিসাঈ ও হাফস (র.) হযরত আসিম (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ উসাইদ (র.) ও উক্ত কেরাতটি গ্রহণ করেছেন। এ কেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন- سَمِعَ (ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ) হতে প্রচলিত فِعْل বা ক্রিয়া إِلٰى -এর দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয় না। তাই এটা বাবে تَفَعُّلٌ হতে ব্যবহৃত হবে।

২. আম কারীগণ لَا يَسْمَعُوْنَ -কে বাবে سَمِعَ হতে পড়েছেন, আর এটাই সুপ্রসিদ্ধ কেরাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَا .... كُلِّ جَانِبٍ **আয়াতের মর্মার্থ :** উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জিন শয়তানরা ঊর্ধ্বজগৎ তথা ফেরেশতা জগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না; বরং তারা সেখানকার কোনো কথা শ্রবণ করতে মনস্থ করলে চতুর্দিক হতে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়। ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, জাহিলিয়া যুগে মক্কা তথা সমগ্র আরবভূমিতে গণকদের অসম্ভব দৌরাত্ম্য ছিল। ইসলামের প্রারম্ভ যুগে জাহেলিয়াতের অপরাপর বদ-রুসুমের মতো তার প্রভাব ও প্রচলনও অবশিষ্ট থেকে যায়। সে যুগের গণকেরা দাবি করত যে, তারা জিনের মারফত দূর-অতীত এবং ভবিষ্যতের অনেক খবরা-খবর বলতে সক্ষম। তাদের প্রচারকৃত খবরা-খবরের কিয়দংশ কোনো কোনো সময় সত্যও হতো। কেননা তখন শয়তানরা [জিন] আকাশে গিয়ে ফেরেশতাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করত এবং সে সকল আলাপ-আলোচনা উক্ত গণকদের নিকট এসে অবহিত করত।

রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি লোকদেরকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত প্রাপ্ত আল-কুরআন লোকদের মাঝে পেশ করতে লাগলেন। আর আল-কুরআনেই অতীত ও ভবিষ্যতের বহু ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে। এ কারণেই মক্কার লোকেরা কুরআন মাজীদকে গণকদের প্রদত্ত খবরা-খবরের সাথে তুলনা করতে লাগল। রাসূল ﷺ -কে গণক আখ্যা দিয়ে উপহাস করতে লাগল। তারা আরও বলতে লাগল যে, জিন শয়তানের যোগসাজসেই রাসূল ﷺ এ সকল তথ্যাবলি প্রচার করছেন। আলোচ্য আয়াতে তাদের সে সকল অমূলক দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জিন শয়তানের মাধ্যমে আকাশের যে সংবাদাদি গণকরা সংগ্রহ করত তার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের খবরা-খবর সংগ্রহ করা হতে জিন শয়তানদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা হয়েছে। যখনই কোনো জিন শয়তান ঊর্ধ্বজগৎ তথা আসমান হতে কোনো তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ তাকে প্রতিহত করা হয়। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয় এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বলেছেন, শয়তান বিতাড়নে যে তারকা ব্যবহৃত হয়, অন্য তারকা থেকে স্বতন্ত্র। এ তারকাগুলোর মধ্যে আগ্নেয় দাহিকা শক্তি থাকে, যা ইবলীস শয়তান ও তার অনুচরদের উপর নিক্ষেপ করা হয় যেন ইবলীস শয়তান বা তার কোনো অনুচর ফেরেশতাদের কোনো কথা শ্রবণ করতে না পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে শয়তানগুলো আসমানে পৌঁছে ওহী শ্রবণ করত, একটি কথা শ্রবণ করে আর নয়টি মিথ্যা কথা তার সঙ্গে যুক্ত করে গণকদের নিকট পৌঁছাত। যখন প্রিয়নবী ﷺ -কে নবুয়ত দান করা হলো, তখন শয়তানদেরকে আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হলো, যদি যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন আগ্নেয় দাহিকা শক্তি সম্পন্ন তারকা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, এ সংবাদ যখন অভিশপ্ত ইবলীস পায়, তখন সর্বত্র সে তার অনুচরদের প্রেরণ করে, যারা আরবের দিকে যায়, তারা নাখলার দু'টি পাহাড়ের মধ্যখানে প্রিয়নবী ﷺ -কে নামাজে রত অবস্থায় দেখতে পায়। ইবলীসকে যখন এ সংবাদ দেওয়া হয়, তখন ইবলীস বলে, এ ব্যক্তির কারণেই আমাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

অতএব, একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর শয়তানের জন্য আসমানে হানা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। কাজেই রাসূল ﷺ নিজেও গণক ছিলেন না এবং তাঁর কোনো জিন শয়তানের সাথে যোগসাজসও ছিল না। এটা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদ্ব্যতীত আল-কুরআনের মাধ্যমে রাসূল ﷺ যে তথ্যাদি প্রচার করতেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্ভেজাল সত্য। অন্যদিকে জিন শয়তানের মারফত গণকরা যেসব তথ্যাদি প্রকাশ করত তার এক-আধটা ঘটনাক্রমে সত্য হলেও তাতে মিথ্যার অংশই ছিল অধিক। তাই রাসূল ﷺ গণক ছিলেন– তাদের এরূপ অমূলক দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয়।

"لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ ..... مِنْ كُلِّ جَانِبٍ" আয়াতের ব্যাখ্যা : তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন– ১. আসমানের সৌন্দর্য বর্ধনে, ২. শয়তানদেরকে মারার জন্যে ও ৩. পথ-প্রদর্শনের জন্যে। এতদ্ব্যতীত তারকারাজি সৃষ্টির অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আসমানে কোনো বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন, তখন ফেরেশতাগণ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের ডানা ঝাপটান, কোনো পাথরের উপর জিঞ্জির স্পর্শ করলে যেমন শব্দ হয়, ফেরেশতাগণের ডানা ঝাপটানোর তেমনি শব্দ শ্রুত হয়। যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে অপেক্ষাকৃত কিছু ভয় দূর হয়, তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ করেছেন'। তখন অন্য ফেরেশতাগণ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ফরমান সত্য, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।' ফেরেশতাদের একথা কিছু শয়তান চুরি করে শ্রবণ করে এবং তাদের নিকট অন্যরাও এভাবে শ্রবণ করে। এভাবে উপরের শয়তান নিচের শয়তানকে জানিয়ে দেয়। একের পর এক শুনতে থাকে। যে শয়তান সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, সে ঐ কথাটি জাদুকর কিংবা গণকের নিকট পৌঁছে দেয়। পরিণামে ঐ কথাটি জাদুকর গণকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এদিকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে জাদুকর এবং গণকেরা ঐ কথার সঙ্গে আরো একশটি মিথ্যা কথা একত্রিত করে মানুষের নিকট বর্ণনা করে [এমন হবে, এমন হবে] গণকদের কথামতো যদি একটি কথাও সত্য হয়, তবে ঐ একটি কথার কারণেই ঐ গণকের প্রচার হয় এবং তার কথার সত্যায়ন হয়, এভাবে তার সম্পর্কে কথা বলা হয় যে, অমুক গণক এ বিষয়ে এমন কথা বলেছিল।

তবে জিন শয়তান কিভাবে আকাশে তথ্য সংগ্রহের জন্য হানা দেয়, আর কিভাবেই বা এক-আধটু শ্রবণ করে অথবা কিভাবে অগ্নিপিণ্ড তাকে ভস্মীভূত করে ফেলে, তা আমাদের বোধশক্তির বাইরে। তার সঠিক অবস্থা ও ধরন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। কোনো কিছুই তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে নেই। আর তাঁর কুদরতের সকল রহস্য অনুধাবন করা মানুষের দুর্বল মস্তিষ্কের আওতা বহির্ভূত। সুতরাং তিনি ও তাঁর রাসূল ﷺ যা বলেছেন, তা বিনা বাক্য-ব্যয়ে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত আয়াতে পরোক্ষভাবে কাফের-মুশরিকদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা জিনদেরকে খুবই শক্তিশালী মনে করে থাকে। এমনকি দেব-দেবী বিশ্বাসে তাদের পূজা-অর্চনাও করে– তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। তাদের ধারণা এ জিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার বংশগত সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে মুশরিকদের অনুরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে বলা হয়েছে যে, জিন শয়তানের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোনো সম্পর্কই নেই; বরং তারা আল্লাহ তা'আলার চির শত্রু হিসাবেই পরিচিত। ঊর্ধ্বজগত তথা যেখানে ফেরেশতাগণ সমগ্র জাহানের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন– সেখানে এ সকল জিন শয়তানের প্রবেশেরও অনুমতি নেই। তারা সেখানে অনুপ্রবেশের অপচেষ্টা করলে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া হয়।

পূর্বের আয়াতের সাথে আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র : উল্লিখিত আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিদ্রোহী শয়তানের কবল হতে আকাশমণ্ডলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আকাশে এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনা করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে কোনো বিদ্রোহী জিন তথা শয়তানের পক্ষে সেখানে হানা দিয়ে কোনো তথ্য সংগ্রহের সুযোগ নেই। অতএব, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গণকদের সাথে তুলনা করে যে, বলে থাকে– 'তিনি জিনের মারফত বিভিন্ন আসমানি খবরা-খবর সংগ্রহ করত তা ওহীর নামে পেশ করেছেন'– তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও সত্যের পরিপন্থি ছাড়া বাস্তবের সাথে তার সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

উক্ত আয়াতে সে একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, ফেরেশতাকুলের জগতের সমগ্র জাহানের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির পরিকল্পনা সম্পর্কিত যে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে তার কণা পরিমাণও শয়তানরা শুনতে পায় না। এমনকি কোনো শয়তান যদি ঘটনাক্রমে দু'-একটি শুনেও ফেলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে সে শয়তানকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে তারা অন্য কারও নিকট তা পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। অতএব, প্রতীয়মান হলো, আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো বড় ধরনের পার্থক্য নেই; বরং আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মর্মার্থ অভিন্ন।

আকাশে ফেরেশতাদের বাক্যালাপ শোনার জন্য যে সকল শয়তানরা চেষ্টা করে তাদের অবস্থাদির বিবরণ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা অপবাদ দিত তার মধ্যে অন্যতম অপবাদ ছিল, তারা নবী করীম ﷺ -কে গণক বলে আখ্যা দেয়। আর তারা বলত যে, গণকদের মতো রাসূল ﷺ -এরও জিন শয়তানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি সে সকল জিন শয়তানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যাদি আকাশ হতে সংগ্রহ করেন এবং তা ঐশী বাণী বলে জনসম্মুখে প্রচার করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে যেসব শয়তান আসমানি খবরা-খবর সংগ্রহে সচেষ্ট হয়ে থাকে তার বাস্তবিক অবস্থা ও অবস্থান আলোকপাত করে মুশরিকদের উল্লিখিত দাবির অমূলকতা প্রমাণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে উক্ত শয়তানদের তিনটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

১. لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ শয়তানরা উর্ধ্বজগৎ তথা ফেরেশতা জগতের আলাপ-আলোচনা শ্রবণে সক্ষম নয়।

২. وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য চতুর্দিক হতে (অগ্নিপিণ্ড) নিক্ষেপ করা হয়। যাতে তারা অবধারিত ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়।

৩. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ অর্থাৎ (পরকালে) তাদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব রয়েছে। যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

অতএব উপরে শয়তানের যে তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা উর্ধ্বজগতে সাধারণত পৌঁছতে পারে না। আর ঘটনাক্রমে যদি পৌঁছেও যায় এবং সেখান হতে ফেরেশতাদের কোনো কথাবার্তা শুনার জন্য চেষ্টা করে, তখন সাথে সাথে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

সুতরাং প্রতীয়মান হলো, শয়তান উর্ধ্বজগৎ তথা ফেরেশতাজগৎ হতে কিছুই শুনতে পারে না এবং শয়তান (জিন)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোনো তথা বংশীয় কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এ ব্যাপারে কাফের-মুশরিকদের ধারণা ও দাবি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন।

উল্লিখিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ কি নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরে হয়েছে না পূর্বেও ছিল? وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ : আর [যখন শয়তানরা উর্ধ্বজগতের কোনো কথা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তখন] চতুর্দিক হতে তাদেরকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। আর এতে তারা জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, শয়তানদের প্রতি এ জাতীয় আচরণ কি রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরে শুরু হয়েছে না পূর্ব হতেই চলে আসছিল? এ প্রসঙ্গে মুফাস্সিরীনে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে–

- একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মত অনুসারে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরবর্তী সময় হতে উল্লিখিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপকরণ আরম্ভ হয়েছে– এর পূর্বে তা ছিল না। সূরা জিনে বর্ণিত আয়াত দ্বারাও অনুরূপ প্রমাণিত হয়। বরং রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ সময়েই শয়তানকে নিক্ষেপ করার জন্য অগণিত অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি করা হয়। এর পূর্বে তা ছিল না। যখনই কোনো শয়তান আসমানি কোনো তথ্য বা আলোচনা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য আকাশে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে সাথে সাথে উক্ত জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হতো।

- অন্য একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেও শয়তানকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো। তবে সর্বদা নিক্ষেপ করা হতো না; বরং কোনো কোনো সময় অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো আবার সময় সময় তা করা হতো না। এতদ্ব্যতীত তা চতুর্দিক হতে নিক্ষেপ করা হতো না; বরং কোনো কোনো দিক হতে নিক্ষেপ করা হতো, অন্য কোনো কোনো দিক হতে নিক্ষেপ করা হতো না। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরবর্তী সময় হতে সর্বদা ও চতুর্দিক হতে শয়তানের উপর অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের বন্দোবস্ত করা হয়।
- অপর একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, শয়তানকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের এ পদ্ধতি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেও ছিল এবং তার ধারাবাহিকতা তাঁর নবুয়ত লাভের পরেও বলবৎ থাকে। পূর্ববর্তী যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সাধারণ জনগণের ভাষ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতা হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেও তা প্রচলিত থাকে, তবে তা কিভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মোজেজা হতে পারে? তাই এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অভিমতটি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কেননা উক্ত মতানুসারে যদিও পূর্বেও অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের প্রচলন ছিল, কিন্তু তা সর্বদা ও চতুর্দিক হতে ছিল না; বরং কখনো কখনো ও কোনো কোনো দিক হতে ছিল। অন্যদিকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর তা চতুর্দিক হতে এবং সর্বদা নিক্ষেপ করা হতো। কাজেই তা এদিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা হতে কোনো অন্তরায় নেই। মোটকথা হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের সময়কালে কোনো শয়তানের পক্ষে কোনো আসমানি তথ্য আহরণের কোনো সুযোগই আর বাকি থাকেনি। আল্লাহ তা'আলা এ সময় আকাশকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কোনো বিদ্রোহী শয়তান আকাশ হতে যদিও বা ঘটনাক্রমে দু'-একটি কথা শুনে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি অগ্নিপিণ্ড তাকে ধাওয়া করে এবং ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

উল্লিখিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপকরণ নবুয়তের কারণে ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ী হলো কেন? পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা আসমানের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তারকারাজির মাধ্যমে আসমানের হেফাজতের জন্য এমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, কোনো জিন শয়তানের পক্ষে আসমান হতে কোনো তথ্য বা আলোচনা সংগ্রহ করা অসম্ভব। যখনই কোনো জিন শয়তান আকাশ তথা ফেরেশতা জগৎ হতে কোনো তথ্য সংগ্রহের মনস্থ করে তৎক্ষণাৎ একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তকে গণকদের কথার সাথে সংমিশ্রণ হতে সংরক্ষণের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাহলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর উক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ও বলবৎ থাকল কেন? এর রহস্য বা কারণ কি?

ইমাম কুরতুবী (র.) উক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকার দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন–

১. গণক বিদ্যা যাতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় তথা শয়তানরা পরবর্তী যুগেও যেন আকাশের কোনো তথ্য বা আলোচনা সংগ্রহ করে ফাসিক ও ফাজির গণকদের মাধ্যমে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে না পারে। রাসূলে কারীম ﷺ গণকদের পেশা এবং গণকের নিকট যাওয়াকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন– لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ অর্থাৎ যে গণকদের পেশা অবলম্বন করে বা গণকের নিকট যায় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বযুগে মানুষ সচরাচর গণকদের প্রতি খুবই উৎসাহী ও আস্থাশীল ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ তাকে সমূলে উপড়ে ফেলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর পরবর্তী সময়ে পুনরায় যদি এ শাস্ত্রের কিছুটা আস্থাশীলতা বা যথার্থতা লোক সমাজে প্রকাশ পায়, তাহলে মানুষের ধারণা হতে পারে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে নবুয়তের [যুগের] পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং পুনঃ গণকদের যুগের সূচনা হয়েছে।

অতএব, উল্লিখিত দু'টি কারণে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও শয়তানকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। কাজেই অদ্যাবধি কোনো শয়তানের পক্ষে আসমানি তথ্য বা আলোচনা সংগ্রহ করে কোনো গণকের নিকট পৌঁছানোর সামান্যতম সুযোগ নেই। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমান গণক বিদ্যার কোনোরূপ নির্ভরযোগ্যতা বা আস্থাশীলতা নেই।

আয়াতে বর্ণিত অগ্নিপিণ্ডসমূহ ঐ সকল তারকারাজির অন্তর্গত কিনা যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আসমানকে সুসজ্জিত করেছেন? আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ الخ অর্থাৎ আমি বাতিসমূহ তথা তারকারাজির মাধ্যমে নিকটবর্তী আকাশ তথা পৃথিবীর আকাশকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করেছি। আর আমি তারকারাজিকে শয়তানকে নিক্ষেপকরণের মাধ্যমও বানিয়েছি।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে তারকারাজি আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে শয়তানকে প্রতিহত করা হয়, নাকি শয়তানকে প্রতিহত করার জন্য অন্য তারকারাজি বিদ্যমান রয়েছে?

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এর উত্তরে বলেছেন, যে অগ্নিপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশকে অনুপ্রবেশকারী শয়তানদেরকে প্রতিহত করা হয়ে থাকে তারা ঐসব তারকারাজির অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আকাশকে শোভাবর্ধন করেছেন। কেননা নিক্ষেপের পর উক্ত অগ্নিপিণ্ড নিঃশেষ হয়ে যায়। আর যদি নিক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডসমূহ শোভাবর্ধনকারী তারকারাজির অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে আকাশের তারকারাজির মধ্যে অত্যধিক ঘাটতি পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। কেননা আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করছি যে, আকাশে কোনোরূপ ঘাটতি বা পরিবর্তন ছাড়াই সর্বদা বিদ্যমান। কজেই প্রতীয়মান হলো যে, নিক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডগুলো সেসব তারকারাজির অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ অর্থাৎ আমি নিকটতম আকাশ তথা দুনিয়ার আকাশকে বাতিসমূহ (তারকারাজির) দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সে তারকারাজিকেই শয়তানের জন্য রজম নিক্ষেপকারী বানিয়েছি। এ আয়াত দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, যে তারাকারাজির দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করা হয়েছে সে তারকারাজিকেই শয়তান প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেননা আলোচ্য আয়াতে وَجَعَلْنَاهَا -এর মধ্যকার هَا -এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো مَصَابِيحَ যা দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী তারকারাজিকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব এ বিশ্লেষণ অনুসারে ইমাম রাযী (র.)-এর জবাব ভুল সাব্যস্ত হয়। তবে ইমাম রাযী (র.)-এর পক্ষ হতে জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে هَا যমীরের পূর্বে মুযাফ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ وَجَعَلْنَا مِثْلَهَا আর আমি উল্লিখিত তারকারাজির ন্যায় তারকাকে শয়তান প্রতিহত করার জন্য বানিয়েছি।

এতদ্ব্যতীত মুফাস্সিরীনে কেরামের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শয়তানকে তারকা নিক্ষেপ করা হয় না; বরং তারকা হতে একটি অগ্নিপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে শয়তানকে প্রতিহত করে ও ভস্ম করে দেয়। তারকার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই উক্ত অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি করে রেখেছেন। অতএব, তা তারকারই একটি অংশের ন্যায় হওয়ার দিকে লক্ষ্য করলে তাকেও তারকা বলে অবহিত করা হয়। আর তা তারকা হতে বিচ্ছিন্ন বস্তু হওয়া এবং তার কারণে তারকা ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ার দিকে লক্ষ্য করলে তা তারকা ছাড়া অন্য বস্তু বললে ভুল হবে না। অতএব, আলোচ্য আয়াতের এবং ইমাম রাযীর বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবিক কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট, তবে তাকে কিভাবে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে? কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট। যেমন শয়তানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন- خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ অর্থাৎ তুমি আমাকে অগ্নি হতে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছ। [সুতরাং আমি কিভাবে আদমকে সিজদা করতে পারি?] অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ অর্থাৎ আর ইতঃপূর্বে আমি জ্বলন্ত অগ্নি হতে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে শয়তান আগুনের সৃষ্টি তাকে অগ্নিপিণ্ড দ্বারা কিভাবে ভস্ম করে দেওয়া যেতে পারে? এতদ্ব্যতীত আখেরাতে কিভাবেই বা তাকে অগ্নি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে?

মুফাসসিরীনে কেরামগণ উপরিউক্ত প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন–

১. যে আগুন দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তুলনায় অগ্নিপিণ্ড এবং পরকালের আগুন অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী হবে, যাতে তারা ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যায় এবং আজাব অনুভব করে।

২. শয়তান আগুনের সৃষ্টি– এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, শয়তানের সর্বাঙ্গই আগুন; বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তানের মূলধাতু আগুন। যেভাবে মানুষের মূলধাতু মাটি হলেও মানুষ সর্বাংশেই মাটি নয়। অতএব যেভাবে মানুষকে মাটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া যায়, ঠিক তেমনিই শয়তানকেই আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া যায়। কাজেই অগ্নিপিণ্ড দ্বারা শয়তানকে ভস্ম করে দেওয়া কিংবা অগ্নি দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া মোটেও যুক্তিহীন কিছু নয়।

মানুষকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার মর্মার্থ কি? : মানুষকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার দু'টি মর্মার্থ হতে পারে–

১. মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সকল মানুষই যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান সেহেতু তাদের সকলকেই যেন মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. মানুষ বীর্য হতে মাতার গর্ভে অনেক স্তর অতিক্রম করে পৃথিবীর মুখ দর্শন করে। আর অন্যদিকে বীর্য সৃষ্টি হয় রক্ত হতে, আর রক্ত সৃষ্টি হয় নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য হতে। খাদ্য প্রস্তুত হয় ফল-মূল ও শস্যদানা হতে। ফল-মূল ও শস্যদানা সৃষ্টি হয় মাটি হতে। অতএব, উপরিউক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মানুষকে মাটি হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ অর্থাৎ আমি মানুষকে আঠালো মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টি হলো খুবই দুর্বল ও নিকৃষ্ট। তাই তাদের অহঙ্কার করার মতো কিছুই নেই। অতএব তাদের অহঙ্কার করা অনুচিত। অহঙ্কারের কারণে রাসূল ﷺ -কে প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অমান্য করা একেবারেই উচিত নয়। তাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, তারা যদি রাসূলে কারীম ﷺ -কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আল-কুরআনকে ঐশীগ্রন্থ হিসেবে মান্য না করে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে এতে রাসূলে কারীম ﷺ ও আল-কুরআনের কোনোই ক্ষতি সাধিত হবে না। আর আল্লাহর উলূহিয়াতেও কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। এতে শুধুমাত্র তাদেরই ক্ষতি সাধন হবে। যার ফলশ্রুতিতে অচিরেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাদের এ জাতীয় আচরণ আল্লাহ তা'আলার আজাব ও গজবকে অবধারিত করবে। তা প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

"لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى" : আয়াতাংশের দুটি (উহ্য) সুরত রয়েছে : لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى আয়াতাংশের দুটি উহ্য সুরত হতে পারে। যথা–

১. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى এটা মূলে ছিল– لِئَلَّا يَسَّمَّعُوا إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى অর্থাৎ যাতে তারা ঊর্ধ্বজগতের তথা আসমানের কোনো আলোচনা শুনতে না পারে। নসব প্রদানকারী হরফ اَنْ বিলুপ্ত হওয়ার পর فِعْل টি তার মূল অবস্থায় তথা রফা'-এর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ এটা لَا يَسَّمَّعُونَ হয়ে গেছে। যেমন নিম্নবর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

ক. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ জন্য আহকাম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

খ. رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ..... অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পাহাড়-পর্বতকে খুঁটি স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। যাতে জমিন তোমাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে; বরং স্থির থাকে।

২. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى এটা জুমলায়ে মুসতানিফাহ বা স্বতন্ত্র বাক্য। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই।

আলোচ্য মাযহাবদ্বয়ের প্রথমটি প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি ইমাম যামাখশারী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

অনুবাদ :

١٢. بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ غَرْضٍ اِلَى اٰخَرَ وَهُوَ الْاِخْبَارُ بِحَالِهِ وَحَالِهِمْ عَجِبْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ اَيْ مِنْ تَكْذِيْبِهِمْ اِيَّاكَ وَ هُمْ يَسْخَرُوْنَ مِنْ تَعَجُّبِكَ .

১২. বরং এখানে بَلْ শব্দটি এক উদ্দেশ্য হতে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে স্থানান্তরের দিকে হয়েছে। আর তা হলো, তাঁর ও তাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা আপনি বিস্ময়বোধ করেন– عَجِبْتَ শব্দের تَ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট হবে। রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এ জন্য আপনি বিস্মিত হয়েছেন। আর তারা বিদ্রূপ করে আপনার বিস্মিত হওয়ার কারণে।

١٣. وَاِذَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِالْقُرْاٰنِ لَا يَذْكُرُوْنَ لَا يَتَّعِظُوْنَ .

১৩. যখন তাদেরকে বুঝানো হয়, কুরআনের মাধ্যমে ওয়াজ-নসিহত করা হয়– তখন তারা বুঝে না– ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ করে না।

١٤. وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ يَسْتَسْخِرُوْنَ يَسْتَهْزِءُوْنَ بِهَا .

১৪. তারা যখন কোনো নিদর্শন দেখে– যেমন– চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া– তখন বিদ্রূপ করে– মোজেজা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

١٥. وَقَالُوْٓا فِيْهَا اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ .

১৫. এবং বলে, মোজেজা প্রসঙ্গে– কিছুই নয়, এ যে সুস্পষ্ট জাদু– সুস্পষ্ট জাদু।

١٦. وَقَالُوْا مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ فِي الْهَمْزَتَيْنِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ .

১৬. তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলে– আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? (اِذَا ও اِنَّا) উভয় স্থলে হামযাদ্বয় ১. স্বঅবস্থায় [অপরিবর্তিত] থাকবে। ২. দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে পড়া যাবে। ৩. উক্ত দু অবস্থায়ই হামযাদ্বয়ের মধ্যখানে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পাঠ করা যায়।

١٧. اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ بِسُكُوْنِ الْوَاوِ عَطْفًا بِاَوْ وَبِفَتْحِهَا وَالْهَمْزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَحَلُّ اِنَّ وَاسْمِهَا اَوِ الضَّمِيْرِ فِيْ لَمَبْعُوْثُوْنَ وَالْفَاصِلُ هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ .

১৭. আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? [اَوْ শব্দটির] وَاو জযমের সাথে পড়া যায়। তখন اَوْ -এর দ্বারা আতফ হবে। আর وَاو -এর মধ্যে যবরও হতে পারে। তখন হামযা اِسْتِفْهَام -এর জন্য (তথা প্রশ্নবোধক) হবে, আর আতফ وَاو -এর দ্বারা হবে। مَعْطُوْف عَلَيْهِ টা اِنَّ ও তার ইসমের মহল হবে। অথবা, مَعْطُوْف عَلَيْه টা لَمَبْعُوْثُوْنَ -এর মধ্যকার যমীর হবে। আর فَاصِل তথা ব্যবধানকারী হলো ইস্তিফহামের হামযাহ।

١٨. قُلْ نَعَمْ تُبْعَثُوْنَ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ صَاغِرُوْنَ .

১৮. হে রাসূল ﷺ! বলুন, হ্যাঁ তোমাদেরকে পুনঃ জীবিত করা হবে– এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত– দীনহীন হবে।

١٩. فَإِنَّمَا هِيَ ضَمِيرٌ مُبْهَمٌ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ زَجْرَةٌ أَيْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ أَيِ الْخَلَائِقُ أَحْيَاءً يَنْظُرُونَ مَا يُفْعَلُ بِهِمْ.

১৯. বস্তুত সে উত্থান হবে এখানে هِيَ অস্পষ্ট যমীর, তার পরবর্তী বাক্য তাকে বিশ্লেষণ করে– বিকট শব্দ ধ্বনি মাত্র একটি– যখন তারা অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজীব জীবিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করতে থাকবে– তাদের সাথে যে আচরণ করা হবে।

٢٠. وَقَالُوا أَيِ الْكُفَّارُ يَا لِلتَّنْبِيهِ وَيْلَنَا هَلَاكَنَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا فِعْلَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ أَيِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ.

২০. এবং বলবে, অর্থাৎ কাফেররা হায়! এখানে يَا তাম্বীহের জন্য হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের ধ্বংস। وَيْل শব্দটি মাসদার, তার শব্দ হতে কোনো فعل হয় না। আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে– এটাই তো প্রতিফল দিবস– হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের দিন।

٢١. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.

২১. বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন– সমগ্র সৃষ্টিজীবের মধ্যকার– যাকে তোমরা মিথ্যা বলবে।

তাহকীক ও তারকীব

আল্লাহর বাণী عَجِبْتَ -এর মধ্যকার কেরাতের বিভিন্নতা : উল্লিখিত আয়াতে عَجِبْتَ শব্দের মধ্যে দু জাতীয় কেরাতে বর্ণিত হয়েছে–

১. আবূ আমর আসিম ও মদীনাবাসী কারীগণের মতে, عَجِبْتَ শব্দের تَ অক্ষর যবর যোগে হবে। এ ক্ষেত্রে এর দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন যে, হে রাসূল! কাফের মুশরিকেরা যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করার পরও আল-কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করার কারণে আপনি বিস্মিত হয়ে পড়েছেন অথচ তারা সে সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করছে। জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার (র.) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

২. হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং কূফার অন্যান্য কারীগণ, আবূ উবায়েদ ও ফাররা প্রমুখ কারীগণের মতে উক্ত عَجِبْتُ শব্দের تُ অক্ষর পেশ যোগে হবে। এ ক্ষেত্রে এর فَاعِلْ তথা কর্তার ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। এর فَاعِلْ আল্লাহ তা'আলা হবেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, আমি তো কাফের ও মুশরিকদের স্পর্ধা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে অথচ তারা হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসে লিপ্ত রয়েছে। অথবা এর فَاعِلْ রাসূলে কারীম ﷺ হবেন। তখন আয়াতটির উহ্যরূপ হবে– قُلْ يَا مُحَمَّدُ بَلْ عَجِبْتُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি বলুন যে, আমি তো তোমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি, অথচ তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসে ব্যস্ত রয়েছ। –[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ -এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে কাফের-মুশরিকদের নিকট পুনঃ জীবনকে প্রমাণিত করেছেন। তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের তুলনায় অসংখ্য শক্তিশালী ও বৃহৎ আকৃতির বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। আর মুহূর্তে তাদের ধ্বংস করা এবং সাথে সাথে তাদের জীবন দান করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার জন্য একেবারেই মামুলি ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে নিকৃষ্ট মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন সে মানুষের জন্য স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসূলের রিসালাত ও কুরআনে কারীমের সত্যতাকে অস্বীকার করা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার।

অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বুঝানো হোক, তারা বুঝে না। কুফরি ও খোদাদ্রোহীতায় তারা এতটুকু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে, সত্যকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা বরং সত্যের প্রতি উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সৎপথ প্রদর্শনের কাজ যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা বুঝিয়ে বলার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার নিসবত করা জায়েজ কিনা? সাধারণত মানুষ যখন কোনো ব্যতিক্রমধর্মী বস্তু দেখে তখন আশ্চর্যবোধ করে থাকে, আর এটা মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তবে আল্লাহ তা'আলার দিকে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার নিসবত করা জায়েজ কিনা? এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়।

ইমাম রাযী (র.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উক্ত عَجِبْتُ ফে'লটিকে যদি পেশসহ পড়া হয়, তাহলে তার ফায়িল বা কর্তা হবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু আমরা এ বক্তব্য গ্রহণ করতে পারি না। কেননা মূলত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন। বাক্যটি মূলে ছিল- قُلْ يَا مُحَمَّدُ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ -যেমন অপর দু'টি আয়াতাংশ লক্ষণীয়।

১. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ [আপনি তাদের কথা শুনুন এবং তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন], ২. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ কিভাবে তারা জাহান্নামের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারল।

অবশ্য عَجِبْتُ ফি'লটিকে পেশযুক্ত করে পড়লে যে নাজায়েজ হবে তা নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রতি تَعَجُّبُ বিস্মিত হওয়ার নিসবত করা জায়েজ। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে রাসূল! আপনি যে শুধু তাদের কার্যকলাপে বিস্মিত হয়েছেন তা নয়; বরং আমিও তাদের আচার-আচরণে আশ্চর্যবোধ করেছি। তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্যান্বিত হওয়ার প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার মতো নয়। আল্লাহ তা'আলার উদার ও মহান সত্তায় না কোনো কিছু ঘৃণার সঞ্চার করতে পারে আর না কোনো কিছু ব্যাপক অনুভূত হতে পরে। অতএব, আল্লাহ তা'আলার মন্দ কাজের উপর বিস্মিত হওয়ার মর্মার্থ হলো তার শাস্তি প্রদান করা। আর ভালো কাজের উপর বিস্মিত হওয়ার মর্মার্থ হলো তার পুরস্কার প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ এবং وَاللّٰهُ خَادِعُهُمْ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র করার অর্থ হলো তাদেরকে স্বীয় ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তি প্রদান করা হবে।

প্রমাণ উপস্থাপনের পর কিয়ামত ও হাশরের প্রসঙ্গে কাফের-মুশরিকদের অবস্থা : আল্লাহ তা'আলা অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে পুনর্জীবন ও হাশরকে প্রমাণিত করেছেন। তারপরও কাফের ও মুশরিকগণ তা মেনে নেয়নি; বরং উপহাস করে তা উড়িয়ে দিয়েছে। বিরোধিতা হতে তারা কিঞ্চিৎ পরিমাণও পিছিয়ে আসেনি। ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে আলোচ্য অবস্থায় কাফেরদের কিছু সংখ্যক আচার-আচরণের উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে অকাট্য ও সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর তাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান-এর নীতি আরও মজবুত হলো। এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ খুবই বিস্মিত হলেন। অথচ কাফেররা রাসূল ﷺ -এর প্রতি তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হলো যে, তাদের হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া সুদূর পরাহত। তারা কোনো প্রকারেই রাসূল ﷺ -কে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। মিথ্যার শিকড় তাদের মনের গভীরে এমন গেড়ে বসেছে যে, সত্যের খোঁচায় তা আরও বদ্ধমূল হয়ে যায়। মোটকথা, কাফের-মুশরিকরা রাসূলে কারীম ﷺ -কে স্বীকার করবে না, এটাই তাদের শেষ কথা।

২. রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাদেরকে সত্য সম্পর্কে বুঝাতেন তখন তারা তা বুঝার চেষ্টাই করত না। যেন তারা সত্যকে শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না। এ জন্যই আল-কুরআনে তাদেরকে صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ [তারা বধির, মূক, অন্ধ কাজেই কিছু বুঝে না।] বলা হয়েছে। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ [তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করা হলেও তারা তা গ্রহণ করে না।]

৩. কিয়ামত ও পরকালকে তারা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ব্যাপার মনে করে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই কোনো মোজেজা ও নিদর্শনও এ প্রসঙ্গে তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ অর্থাৎ 'তারা কোনো মোজেজা বা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়।' তা হতে শিক্ষা গ্রহণের কোনোরূপ উদ্যোগ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তা দ্বারা তাদের মন-মগজ কিঞ্চিৎ পরিমাণও পরিবর্তন হয় না; বরং তারা বলে- اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ [এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়]।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার কাফের-মুশরিকরা কিয়ামত ও পুনর্জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বিস্মিত হতো এবং বলত যে, যে লোকটি মৃত্যুবরণ করে মাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে পুনরায় কিভাবে জীবন লাভ করতে পারে? এটা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। এমনকি এ বিষয়ে তারা অস্বীকৃতির এমন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যারা তা বিশ্বাস করত তারা তাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করতো, তাকে বড় বোকা মনে করত। তাদেরকে উক্ত অস্বীকৃতির পথ হতে ফিরিয়ে আনার শুধুমাত্র দু'টি পদ্ধতিই বাকি ছিল।

১. তাদের সম্মুখে কিয়ামত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা। যেমন তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের কি জানা নেই পুনরুত্থানের তুলনায় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি অধিক কঠিন কাজ। সুতরাং যিনি এ কঠিন কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি সে তুলনায় সহজ কাজটি তথা পুনরুত্থানের কাজটি করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। এতদ্ব্যতীত কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করার তুলনায় তা ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুনরায় তৈরি করা সহজ। সুতরাং যে স্রষ্টা মানুষকে কোনোরূপ পূর্ব নমুনা ছাড়া প্রথমবার সৃজন করেছেন, তিনি তাদেরকে পুনরায় পূর্বের অপেক্ষা সহজেই পুনর্জীবিত করতে পারবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে বাস্তব কথা হলো আলোচ্য প্রমাণ অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত হওয়ার পরও তা হতে মুশরিকরা উল্লেখযোগ্য কোনো উপকৃত হতে পারেনি। কেননা উল্লিখিত দলিলের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা তারা উপলব্ধি করা দূরের কথা উপলব্ধি করার চেষ্টাও করেনি। অতএব তা কিভাবে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

২. রাসূলে কারীম ﷺ মোজেজা ও নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর রিসালাতকে প্রতিষ্ঠা করবেন, তাদের আস্থা অর্জন করবেন। যাতে পরে হাশর-নশর, কিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম-এর ঘটনাবলি রাসূল ﷺ -এর মুখে শ্রবণ করেই বিশ্বাস করে নিবে। তা তাদের বুঝে আসুক বা না আসুক তারা তার পরোয়া করবে না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, শত মোজেজা ও অলৌকিক নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের পাথরসম অন্তর এতটুকু নরম হয়নি; বরং আরো অধিক কঠিন হয়েছে। সমস্ত অলৌকিক নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদিকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিয়েছে।

৩. জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাওয়াতকে নিষ্প্রভ করার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফের ও মুশরিক নেতারা বহু অপপ্রচার ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে গণক, জিনে পাওয়া ব্যক্তি, পাগল ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অবশেষে যখন তারা দেখল যে, এ সকল অপপ্রচারেও কাজ হচ্ছে না, তখন প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন জাদুকর আর কুরআন হলো জাদু বিদ্যা। অতএব, কুরআনে কারীমকে লক্ষ্য করে তারা প্রচার করতে লাগল– إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোজেজা ও নিদর্শনাদি নিয়ে মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত কেন? রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কার কাফের ও মুশরিকদের সম্মুখে মোজেজা ও নিদর্শন উপস্থাপন করতেন, বিভিন্ন নিদর্শনাবলি উত্থাপন করতেন এবং পরকাল ও পুনরুত্থানের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিতেন তখন তারা তাকে অস্বীকার তো করতই, সাথে সাথে তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাদের তিরস্কারের পশ্চাতে বিশেষ কারণ ছিল তারা পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস ও অবাস্তব বলে মনে করত এবং রাসূল ﷺ -এর মোজেজাসমূহকে মনে করত নিছক জাদু। তাদের এ ব্যাপারটি বুঝে আসত না যে, একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে, মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে কিভাবে জীবিত করা যেতে পারে? কিভাবে তাকে হিসাব-নিকাশের জন্য বিচারের সম্মুখীন করা যেতে পারে? সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার কাজ-কর্মের তালিকাই বা কোথায় পাওয়া যাবে? এ সকল বিষয় কখনো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি মুশরিকদেরকে বলে দিন– نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে। আর এ অমান্য ও অবিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে সেই পুনরুত্থানের দিন তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে, অসীম আজাবে নিপতিত হতে হবে। আফসোস ও হায়-হুতাশ সেদিন তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। শাস্তি হতে পরিত্রাণের কোনো পথই সেদিন আর তোমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে না।

"وَقَالُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আল্লামা আলূসী (র.) এ পর্যায়ে আরবের বিখ্যাত বীর কুস্তিগীর রোকানার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মক্কার অধিবাসী রোকানাকে রাসূলে কারীম ﷺ একটি পাহাড়ের পাদদেশে বকরি চরাতে দেখলেন, তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, সে বলল, 'আমি এসব কথা বুঝি না, আমি কুস্তিগীর, আমাকে কুস্তিতে পরাভূত করতে পারলে আমি বিষয়টি চিন্তা করব'। রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি তোমাকে কুস্তিতে পরাজিত করি, তবে ইসলাম কবুল করবে তো'? সে বলল, 'জী হ্যাঁ'। এরপর রাসূলে কারীম ﷺ -কে রোকানার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হলো, তিনি একে একে তিনবার ধরাশায়ী করলেন। এরপরও সে আরও কিছু মোজেজা দেখার জন্যে আবেদন করল। তখন তিনি বৃক্ষকে ডাকলেন, বৃক্ষটি তাঁর নিকট হাজির হলো। তারপর রোকানা মক্কাবাসীর নিকট এসে বলল, ইনি বিরাট জাদুকর, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় [অবশ্য পরবর্তীকালে রোকানা ইসলাম গ্রহণ করেন]।

তাফসীরে যিলালে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের আশ-পাশে এমনকি তাদের সত্তার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে অসীম কুদরত রয়েছে, তার প্রতি তারা একবারও ফিরে তাকায়নি, একটুও চিন্তা-ভাবনা করেনি। যদি তারা এ ব্যাপারে একটু চিন্তাও করত, তবে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, বেহেশত-দোজখ কিছুই তাদের নিকট অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো না। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান, তা যদি একবারও তারা মনের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করত, তাহলে তাদের বিবেক তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য করত যে, যে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি পুনরুত্থানেও সক্ষম। হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত-দোজখ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর জন্য কোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু চিন্তা-ভাবনাকে না ফিরানোর দরুন তারা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'এটা তো জাদু-মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।'

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিরাট আওয়াজ। আরবি ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার বুঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এ ফুঁৎকার দেওয়া হবে। -[কুরতুবী]

যদিও আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নাশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। [তাফসীরে কাবীর] কাফেরদের উপর ফুঁৎকারের প্রভাব হবে এই যে, وَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ - সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম ছিল, তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। -[কুরতুবী]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর মোজেজার সত্যতা প্রমাণ এবং তা অস্বীকারকারীদের অভিমত খণ্ডন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকরা কোনো আয়াত [নিদর্শন] দেখলে তাকে উপহাস করে। এখানে آيَةً -এর দ্বারা নিদর্শন তথা মোজেজা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সর্বশ্রেষ্ঠ যে মোজেজা দান করেছেন তা হচ্ছে আল-কুরআন বা আল্লাহর বাণী। এতদ্ব্যতীত আরো বহু মোজেজা রাসূলে কারীম ﷺ -কে দান করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এর অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

কতেক ভ্রান্ত দল ও ব্যক্তিবর্গ রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্যান্য মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতানুসারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনো মোজেজা অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতের আলোকে তাদের উক্ত দাবি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কেননা আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকরা কোনো মোজেজা প্রত্যক্ষ করলে তার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

অপর দিকে বাতিল মতামতের প্রবক্তারা আলোচ্য আয়াতের অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা উক্ত আয়াতে মোজেজার অন্য অর্থ গ্রহণ করার অপচেষ্টা করেছে।

তাদের মধ্যকার কারো কারো অভিমত হলো যে, উল্লিখিত আয়াতে آيَةً -এর অর্থ হলো- যুক্তিভিত্তিক দলিল- মোজেজা নয়। কিন্তু তাদের উক্ত দাবি মোটেও সঠিক নয়। কেননা পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে- وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ আর কাফের মুশরিকরা বলে এটা তো নিছক সুস্পষ্ট জাদু। অতএব, কোনো যুক্তিভিত্তিক দলিলকে আর যাই বলুক না কেন- কমপক্ষে সুস্পষ্ট জাদু বলে কেউই অভিহিত করে না বা করতে পারে না।

তাদের মধ্যকার অন্য আরেক দলের অভিমত হলো, উক্ত আয়াতে آيَةً -এর অর্থ হলো আল-কুরআনের আয়াত। কেননা কাফের ও মুশরিকরা আল-কুরআনের আয়াতকে জাদু-মন্ত্র বলে আখ্যা দিত। কিন্তু এটাও সঠিক অর্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে رَأَوْا শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো- দেখা, প্রত্যক্ষ করা। আল-কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে এ শব্দটি মোটেও প্রযোজ্য নয়। কেননা আল-কুরআনের আয়াত দেখার বস্তু নয় বরং শ্রবণযোগ্য বিষয়। আল-কুরআনের যেখানেই আয়াতের কথা উল্লেখ হয়েছে সেখানেই শোনার কথা এসেছে, সেখানে দেখার কথা বলা হয়েছে।

অন্যান্য আল্লাহর নবীদের বেলায়ও তদ্রূপ ব্যবহার হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) যখন ফেরাউনের নিকট নবুয়তের দাবি উপস্থাপন করলেন, তখন ফেরাউন বলল- إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ অর্থাৎ 'যদি [নবুয়তের পক্ষে] তুমি কোনো মোজেজা এনে থাক তাহলে তা দেখাও- যদি তোমার দাবিতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।' আলোচ্য আয়াতে দু'টি লক্ষণীয়। প্রথমত এখানে آيَةً দ্বারা মোজেজাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কারো দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত ফিরআউন মোজেজা দেখাতে বললে হযরত মূসা (আ.) লাঠিকে সর্পে পরিণত করে চাক্ষুস দেখিয়ে দেন- শুনিয়ে দেননি। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, আল-কুরআনের আয়াত শোনা ও অনুধাবন করার বিষয়, আর মোজেজা দেখা ও প্রত্যক্ষ করার বিষয়।

মোটকথা, অত্র আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল-কুরআন ছাড়া আরও অসংখ্য মোজেজা দান করা হয়েছে। আর যারা তা অস্বীকার করে তাদের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। অতএব কারণে তারা বিপথগামী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত। -[কুরতুবী, মা'আরিফ]

কোনো কোনো সময় রাসূলে কারীম ﷺ মোজেজা উপস্থাপন করতে কেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন? আল-কুরআনের কিছু সংখ্যক আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কোনো কোনো সময় রাসূলে কারীম ﷺ কাফের ও মুশরিকদের মোজেজা উপস্থাপন করার আবেদন মেনে নেননি। অথচ রাসূল ﷺ যে কাফের ও মুশরিকদের সামনে অসংখ্য মোজেজা উপস্থাপন করেছেন তা তো কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। এ বিরোধের কারণ কি?

আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এটা তো সন্দেহহীনভাবে প্রমাণিত যে, রাসূলে কারীম ﷺ কাফের ও মুশরিকদের সম্মুখে অসংখ্য মোজেজা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু যে সকল আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মোজেজা উপস্থাপন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, তার কারণ হলো, তারা সর্বক্ষণ নিজেদের মনগড়া নতুন নতুন মোজেজা প্রার্থনা করত। সে সকল মোজেজা উপস্থাপন করতে রাসূল ﷺ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। কেননা সে ক্ষেত্রে দীন-ইসলাম একটি খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত হতো। আর আল্লাহর রাসূল তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী মোজেজা দেখাবেন, কাফের ও মুশরিকদের মর্জি মাফিক নয়। অতএব সর্বক্ষণ একেকটি নতুন নতুন মোজেজা উপস্থাপন যেভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ভাব-গাম্ভীর্যের পরিপন্থি, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরোধী।

আরও একটি উত্তর এটাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে, যা তিনি পূর্ববর্তী অন্যান্য নবী-রাসূলদের ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন- কোনো সম্প্রদায়কে কাঙ্ক্ষিত মোজেজা উপস্থাপন করার পর যদি তারা ঈমান গ্রহণ না করে, তবে ফলশ্রুতিতে আম গজব [আজাব]-এর মাধ্যমে তাদেরকে নির্মূল করে দেন। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেহেতু আম গজব [আজাব] হতে হেফাজত করা ও তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল, তাই তাদের প্রার্থিত মোজেজা তাদেরকে দেখানো হয়নি। কেননা প্রার্থিত মোজেজা প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান গ্রহণ করলে পূর্বে প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের উপর আম গজব (আজাব) আপতিত হতো এবং এতে তারা ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যেত। -[মা'আরিফ]

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ আয়াতের বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তি কে? আলোচ্য কথাটি হাশরের দিন কাকে লক্ষ্য করে বলবে? এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরীনে কেরাম হতে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়-

১. কতেক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এটা কাফেরদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের অংশ বিশেষ।

২. কতেক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এটা কাফেরদরে বক্তব্য। তারা পরস্পরের মধ্যে এ জাতীয় কথা বলাবলি করবে। এটা সত্য প্রত্যক্ষের কারণে তাদের নিছক আফসোস ও হা-হুতাশ মাত্র।

৩. কারো মতে, এটা ফেরেশতাদের বক্তব্য। ফেরেশতারা মুশরিকদের লক্ষ্য করে এ উক্তি করবেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলবেন যে, অদ্য তোমাদের মধ্যে ফয়সালা ও মীমাংসার দিন। সকল মকদ্দমার ফয়সালা আজ সমাধা হবে। আজ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারও দিবস। আজ তোমরা পরস্পর আলাদা হয়ে যাবে। কেউ জান্নাতের অফুরন্ত শান্তিতে প্রবেশ করবে, আর কেউ জাহান্নামের সীমাহীন আজাবের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে।

৪. কারো মতে, হাশরের ময়দানে ঈমানদারগণ কাফেরদের লক্ষ্য করে উক্ত বক্তব্য বলবে। কেননা দুনিয়াতে সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে ঈমানাদরদের সাথে কাফের ও মুশরিকদের মতানৈক্য ও বিতর্ক ছিল, দুনিয়ার আদালতে তার মীমাংসা করার অবকাশ ছিল না, তাই সেই বিতর্ক মীমাংসার জন্য ঈমানদারগণ সুদীর্ঘ সময় যাবৎ এ দিনের অধীর অপেক্ষায় ছিল।

৫. কারো মতে, হাশরের ময়দানের সমগ্র পরিবেশই যবানে হাল তথা নীরব ভাষায় উক্ত বক্তব্য বলতে থাকবে।

যা হোক, উল্লিখিত বক্তব্যের প্রবক্তা যেই হোক না কেন, তা দ্বারা যে, কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হবে, তাতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। -[কুরতুবী]

অনুবাদ :

২২. وَيُقَالُ لِلْمَلٰئِكَةِ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ وَاَزْوَاجَهُمْ قُرَنَاءَهُمْ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ .

২২. আর ফেরেশতাদের বলা হবে– একত্র করো গুনাহগারদেরকে– শিরকের মাধ্যমে নিজেদের উপর। তাদের দোসরদেরকে– তাদের শয়তান সঙ্গীদেরকেও হাজির করো এবং যাদের ইবাদত তারা করত [তাদেরকেও হাজির করো]।

২৩. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنَ الْاَوْثَانِ فَاهْدُوْهُمْ دُلُّوْهُمْ وَسُوْقُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ٧ طَرِيْقِ النَّارِ .

২৩. আল্লাহ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যে সকল প্রতিমার তারা উপাসনা করত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত করো– পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, হাঁকিয়ে নিয়ে যাও– জাহান্নামের পথে দোজখের রাস্তার দিকে।

২৪. وَقِفُوْهُمْ اِحْبِسُوْهُمْ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ٧ عَنْ جَمِيْعِ اَقْوَالِهِمْ وَاَفْعَالِهِمْ .

২৪. আর তাদেরকে থামাও– তাদেরকে পথের নিকট থামাও– তারা জিজ্ঞাসিত হবে– তাদের সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে।

২৫. وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ لَا يَنْصُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَحَالِكُمْ فِى الدُّنْيَا .

২৫. আর তাদেরকে তর্ৎসনা করে বলা হবে– তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? পরস্পরের সাহায্য করছ না কেন? যেভাবে দুনিয়ার জীবনে করতে।

২৬. وَيُقَالُ لَهُمْ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ مُنْقَادُوْنَ اَذِلَّاءُ .

২৬. তাদেরকে আরও বলা হবে– বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী। অবনত ও লাঞ্ছিত।

২৭. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ يَتَلَاوَمُوْنَ وَيَتَخَاصَمُوْنَ .

২৭. তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। একে অপরকে অভিযুক্ত করবে ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের জন্য اَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে اَزْوَاجٌ অর্থ– সতীর্থই। হযরত ওমর (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বাইহাকী, আব্দুর রাযযাক প্রমুখ তাফসীরবিদ এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমরের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে اَزْوَاجَهُمْ -এর অর্থ মুশরিকদের সমমনা লোক। সে মতে সুদখোরকে অন্য সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্যপায়ীদের সাথে একত্র করা হবে। –[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

এছাড়া وَمَا كَانُوا يَعْبُدُوْنَ বাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্র করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে। -[মা. আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া মুশরিকরা যাদের ইবাদত করত : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন মুশরিকদের সাথে তাদের ঐ সকল মাবুদকেও একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন যাদেরকে তারা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে মাবুদ তথা উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল। মুশরিকরা যে সকল গায়রুল্লাহর ইবাদত করত [বা বর্তমানেও করে] তাদেরকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়-

১. এমন সকল মানুষ ও শয়তান যারা ইচ্ছা পোষণ করত যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া তাদের উপাসনা করুক। অতএব অন্যের উপাসনা কামনা করার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে তারা জাহান্নামী হবে।

২. যে সকল জড় ও গায়রে মুকাল্লাফ বিষয়াদির তথা মূর্তি, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির মুশরিকরা উপাসনা করে থাকে, তারা যদিও বাস্তবিক দোষী নয় তথাপি মুশরিকদের আফসোস ও হা-হুতাশ বর্ধিত করার কারণে তাদেরকেও ঐ সকল মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৩. এমন সকল মুকাল্লাফ যাদের উপাসনা মুশরিকরা করেছে, কিন্তু তারা এ উপাসনা তো কামনাই করে না; বরং তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং মানুষদেরকে এ জাতীয় উপাসনা হতে বারণ করেছেন। তারা সর্বদা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তথা বিশুদ্ধ তাওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এ তৃতীয় শ্রেণির মাবুদ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হুকুমের আওতাধীন হবে না। কেননা তাদের উপাসনার ব্যাপারে এ সকল মাবুদরা সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। এ সকল মাবুদ হচ্ছেন ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও আল্লাহর ওলীগণ; শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অজ্ঞতাবশত মানুষরা তাদের উপাসনা করেছে।

'وَمَا كَانُوا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ' আয়াতের মর্মার্থ : শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করবেন, মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যে সকল মূর্তি ও প্রতিমার উপাসনা করেছে তাদের সকলকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ অর্থাৎ 'তোমরা ঐ অগ্নিকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' এ আয়াতে মানুষ দ্বারা মুশরিকরা উদ্দেশ্য আর পাথর দ্বারা মূর্তি ও প্রতিমাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা ঐ সকল শয়তানগণকে মুশরিকদের সঙ্গে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও, মানুষ যাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের উপাসনা করত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা কর না। [অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছি।] আর ব্যাপক অর্থে শয়তানের উপাসনা করার অর্থ হলো তার কুমন্ত্রণা অনুসারে চলা, তার কুমন্ত্রণায় পড়ে শিরকে লিপ্ত হওয়া।

মূর্তিকে বিনা অপরাধে কিভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা মুশরিকরা যাদের উপাসনা [পূজা] করে থাকে তাদেরকেও মুশরিকদের সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদি এরা তো নির্বোধ, গায়রে মুকাল্লাফ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কি কারণ থাকতে পারে? মুফাসসিরীনে কেরাম এর দু'টি জবাব প্রদান করেছেন-

১. এ বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। আর তার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারীও তিনিই। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন- তাতে কারো কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ নেই।

২. আলোচ্য নির্জীব ও নির্বোধ পদার্থসমূহকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার মূল উদ্দেশ্য আজাব দেওয়া নয়; বরং মুশরিকদের শাস্তি ও হা-হুতাশকে বাড়িয়ে দেওয়াই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। কেননা মুশরিকরা যখন তাদের সাথে তাদের উপাস্য দেব-দেবী ও প্রতিমাসমূহ উপস্থিত করা হয়েছে প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের আফসোস ও দুঃখের কোনো অন্ত থাকবে না। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নির মধ্যেও শান্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা।

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা দেব-দেবী ও প্রতিমাসমূহকে যদিও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, কিন্তু তাদেরকে আজাব দিবেন না। কেননা তিনি কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণও অন্যায়-অবিচার করেন না।

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ...... بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ আয়াতের মর্মার্থ : অর্থাৎ তাদেরকে সেদিন ধমক দিয়ে বলা হবে যে, এ কঠিন বিপদ মুহূর্তে তোমরা কেন একে অন্যকে সাহায্য করছ না? যদি সাহায্য করার সাধ্য থাকে, তবে সাহায্য কর না কেন? এ কথাটি সম্পূর্ণ বিদ্রূপাত্মক। কেননা সেখানে সাহায্য করার সাধ্য যে কারো নেই, একথা সকলেরই জানা; বরং সেদিন তারা অত্যন্ত অসহায় হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) مُسْتَسْلِمُونَ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন خَاضِعُونَ অর্থাৎ কাফেররা সেদিন অসহায় অবস্থায় থাকবে। আর হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাঁবেদার ও অনুগত হবে।

এরপর তারা নিজেরাই পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে। একে অপরকে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করবে। কিন্তু তাতে কোনোরূপ লাভবান হবে না। নেতা ও অনুসারী সকলেই কঠোর আজাবে আবদ্ধ হবে। তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাফাই কোনো উপকারে আসবে না। এমনকি হাজারো দুঃখ প্রকাশ, আফসোস, হা-হুতাশ ও ক্ষমা-প্রার্থনাও তাদেরকে অফুরন্ত শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবে না।

অনুবাদ :

২৮. قَالُوْا اَيِ الْاَتْبَاعُ مِنْهُمْ لِلْمَتْبُوْعِيْنَ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ عَنِ الْجِهَةِ الَّتِىْ كُنَّا نَاْمَنُكُمْ مِنْهَا بِحَلْفِكُمْ اِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ فَصَدَّقْنَاكُمْ وَاتَّبَعْنَاكُمْ اَلْمَعْنٰى اَنَّكُمْ اَضْلَلْتُمُوْنَا.

২৮. তারা বলবে অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে অনুসারীরা নেতাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। তোমরা এমন পদ্ধতিতে আমাদের নিকট আসতে যে, আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছি এবং তোমাদের অনুসরণ করেছি। অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে বিপথগামী করছ।

২৯. قَالُوْا اَيِ الْمَتْبُوْعُوْنَ لَهُمْ بَلْ لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّمَا يَصْدُقُ الْاِضْلَالُ مِنَّا اَنْ لَوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَرَجَعْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ اِلَيْنَا.

২৯. তারা বলবে অর্থাৎ নেতারা অনুসারীদেরকে বলবে বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। আর আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি এটা তোমাদের এ দাবি কেবল তখনই যথার্থ হতো যদি পূর্ব হতে তোমরা ঈমানদার থাকতে এবং [আমাদের ফুসলানোর কারণে] ঈমান হতে আমাদের আকিদা তথা শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে।

৩০. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ج قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ تَقْهَرُكُمْ عَلٰى مُتَابَعَتِنَا بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ضَالِّيْنَ مِثْلَنَا.

৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, অর্থাৎ শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না যা তোমাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করতে পারে। বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়– তোমরাও আমাদের ন্যায়ই বিপথগামী ছিলে।

৩১. فَحَقَّ وَجَبَ عَلَيْنَا جَمِيْعًا قَوْلُ رَبِّنَا ق بِالْعَذَابِ اَىْ قَوْلُهُ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اِنَّا جَمِيْعًا لَذَائِقُوْنَ الْعَذَابَ بِذٰلِكَ الْقَوْلِ وَنَشَأَ عَنْهُ قَوْلُهُمْ.

৩১. সুতরাং সত্য হয়েছে– অনিবার্য হয়েছে আমাদের বিপক্ষে সকলের আমাদের পালনকর্তার উক্তি– শাস্তি সম্পর্কিত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী 'নিশ্চয় আমি মানুষ ও জিনের দ্বারা একযোগে জাহান্নামকে পূর্ণ করবো'– আমাদের অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে– আজাবের স্বাদ। আল্লাহ তা'আলার বাণীর কারণে।

৩২. فَاَغْوَيْنٰكُمْ الْمُعَلَّلُ بِقَوْلِهِمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ.

৩২. আর তা হতে তাদের বক্তব্য সৃষ্টি হয়েছে– আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। যা তাদের এ বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয়– কারণ আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।

৩৩. قَالَ تَعَالٰى فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِى الْغَوَايَةِ.

৩৩. আল্লাহ তা'আলার বাণী– সুতরাং তারা সবাই সেদিন– কিয়ামতের দিন– শাস্তিতে শরিক হবে– কেননা দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতার মধ্যে তারা অংশীদার ছিল।

٣٤. إِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا نَفْعَلُ بِهٰؤُلَاءِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ غَيْرِ هٰؤُلَاءِ أَيْ نُعَذِّبُهُمُ التَّابِعَ مِنْهُمْ وَالْمَتْبُوْعَ.

৩৪. আমি এমনি – যেরূপ এ মুশরিকদের সাথে ব্যবহার করেছি– অপরাধীদের সাথে ব্যবহার করে থাকি– এদের মতো অন্যান্য অপরাধীদের সাথেও অর্থাৎ আমি তাদের মধ্য হতে নেতা ও অনুসারী উভয় দলকেই শাস্তি প্রদান করবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ' আয়াতের বিশ্লেষণ : শেষ বিচারে দিন মুশরিক নেতাদেরকে তাদের অনুসারীরা বলবে, অথবা কাফেররা তাদের শয়তানদের বলবে, তোমরা তো অনেক শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে যে, আমরা বাধ্য হয়ে তোমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি।

উল্লিখিত আয়াতে মুফাস্‌সিরগণ يَمِيْن -এর বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন–

১. শক্তি ও বল– এ অর্থের বিবেচনায় আয়াতের অর্থ হবে– তোমরা প্রবল প্রতাপের সাথে আমাদের নিকট আসতে, তোমরা শক্তি প্রয়োগ করে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ বিশ্লেষণই সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য।

২. শপথ ও কসম– এ অর্থের বিচারে কোনো কোনো মুফাস্‌সির আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– 'তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। তোমরা শপথ করে বলতে যে, তোমাদের ধর্মই সঠিক, আর রাসূলের শিক্ষা মিথ্যা।' এ বিশ্লেষণও সরাসরি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে يَمِيْن -এর অর্থ হলো– اَلزَّيْن তথা সৌন্দর্য। অর্থাৎ অনুগামীরা তাদের মুশরিক নেতাদেরকে সম্বোধন করে বলবে– 'তোমরা আমাদের নিকট পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীকে আকর্ষণীয় করে দেখাতে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।'

৪. কল্যাণ ও মঙ্গল– এ অর্থের বিবেচনায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে– 'তোমরা কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে আমাদের সাথে প্রতারণা করেছিলে। তোমরা দাবি করতে যে, তোমরা যে পথ ও ধর্মে আছ, সেটাই হক ও সত্য। আর আমাদের মঙ্গল কামনাই তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

৫. ডান বা ডান দিকের পথ– এ অর্থের বিবেচনায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে–'তোমরা আমাদের ডান দিকের পথ দিয়ে আসতে অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট নিজেদেরকে ডানপন্থি বা হকপন্থি বলে উপস্থাপন করতে।

মুফাস্‌সিরীনদের সর্দার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথম মতকেই গ্রহণ করেছেন।

যে সকল কারণে ডান দিককে বাম দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত يَمِيْن -এর একটি অর্থ– ডান হাতও রয়েছে। অনেক মুফাসসিরীনের মতে এটাই يَمِيْن -এর বাস্তবিক অর্থ। তবে বিভিন্ন কারণে ডান হাত বা ডান দিক– বাম দিকের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নিম্নে তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. রাসূলে কারীম ﷺ সকল ভালো কাজই ডান হাত ও ডান দিক হতে শুরু করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কেও তদ্রূপ করার নির্দেশ দিতেন।

২. বিবেকবান ও বিশুদ্ধ রুচিবোধের অধিকারী সব মানুষই সকল ভালো কাজ ডান হাতে সমাধা করে থাকে। আর নিম্ন কাজগুলো বাম হাতে করে থাকে।

৩. সাধারণত সকল বিবেকবান লোকই এ ব্যাপারে একমত যে, বাম হাত ডান হাত থেকে উত্তম।

৪. হাশরের ময়দানে [আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক] ঈমানদারদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, আর কাফের ও মুশরিকদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে।

৫. ডান কাঁধের ফেরেশতারা ভালো কাজের হিসাব রাখেন আর বাম কাঁধের ফেরেশতারা মন্দ কাজের হিসাব রাখেন।

৬. বাস্তবিকই সাধারণত ডান হাত বাম হাত হতে অধিক শক্তিশালী।

হাশরের ময়দানে মুশরিক নেতা ও তাদের অনুগামীদের মধ্যকার কথোপকথন : হাশরের ময়দানে যখন মুশরিক নেতাদের সাথে তাদের অনুসারীদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবেই নেতাদেরকে লক্ষ্য করে তাদের অনুসারীরা দোষারোপ করে বলবে- إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট শিরকের দাবি নিয়ে আসতে এবং শপথ করতে যে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। তোমরা আমাদেরকে চরমভাবে প্রতারিত করে আজ জাহান্নাম মুখী করেছ তোমাদের কারণেই আজ আমরা জাহান্নামের পথিক হয়েছি। তখন মুশরিক নেতারা তাদের অনুসারীদের অভিযোগের জবাব দিবে এবং পাল্টা তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেবে। অতএব তারা তাদের অনুসারীদেরকে বলবে–

১. মুশরিক নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে– بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ বরং আমাদের আহ্বানের পূর্বেও তো তোমরা ঈমানদার ছিলে না। তোমাদের দাবি তো তখনই যুক্তিযুক্ত হতো যদি এরূপ হতো যে, পূর্ব হতে তোমরা ঈমান এনেছিলে, অতঃপর আমাদের কুমন্ত্রণায় পড়ে ঈমান পরিত্যাগ করে শিরকের দিকে দিয়ে আসতে। কিন্তু ব্যাপারটি তো মোটেও তদ্রূপ নয়; বরং পূর্বেও তোমরা ঈমানদার ছিলে না।

২. তারা তাদের অনুসারীদের জবাবে আরো বলবে– وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ তোমাদের উপর তো আমাদের কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না, যার কারণে আমরা তোমাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে পথভ্রষ্ট করতে পারি। অতএব আমরা তোমাদেরকে বিপথগামী করেছি বলে তোমরা যে অভিযোগ করেছ তা মোটেও সত্য নয়। বরং আমাদের আহ্বানের পর তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় শিরককে গ্রহণ করেছ।

৩. মুশরিক নেতারা আরো বলবে– بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِيْنَ বরং তোমরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ছিলে। তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় শিরককে গ্রহণ করেছ।

৪. তারা তাদের অনুসারীদেরকে আরো বলবে– فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ অর্থাৎ 'আমাদের উপর আমাদের প্রভুর বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। আমাদের সকলকেই আজাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' আজ কারো আজাব হতে মুক্তির পথ নেই।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "قَوْلُ رَبِّنَا" 'আমাদের প্রভুর বাণী' -এর দ্বারা আয়াতে কারীমা– لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ (শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলবেন) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা একযোগে জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব।

মোটকথা, মুশরিকরা একে অপরকে যতই দোষারোপ করুক না কেন এবং যতই সাফাই বর্ণনা করুক না কেন তাতে কোনো ফল হবে না। তাদের সকলকেই অনন্ত কালের কঠিন আজাবে আক্রান্ত হতে হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ **আয়াতের বিশ্লেষণ :** এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহ্বান জানানোর একথা বলে আজাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সেও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে; বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

৩৫. إِنَّهُمْ أَيْ هٰؤُلَاءِ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعْدَهُ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ .

৩৫. নিশ্চয়ই তারা অর্থাৎ এ কাফেররা যা পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় – তাদেরকে যখন বলা হতো, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই', তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।

৩৬. وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا فِيْ هَمْزَتَيْهِ مَا تَقَدَّمَ لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ أَيْ لِأَجْلِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৬. আর তারা বলত, আমরা কি এটার অর্থাৎ أَئِنَّا -এর হামযাদ্বয়ে পূর্ববর্তী তাহকীক প্রযোজ্য হবে (যা অনুরূপ স্থলে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো? অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর বাণীর কারণে।

৩৭. قَالَ تَعَالٰى بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ الْجَائِيْنَ بِهٖ وَهُوَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ .

৩৭. আল্লাহ তা'আলার বাণী– না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। যারা ইতঃপূর্বে হক তথা সত্যসহ আগমন করেছেন। আর তা (অর্থাৎ সত্য) হলো– 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই।'

৩৮. إِنَّكُمْ فِيْهِ الْتِفَاتٌ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ .

৩৮. তোমরা অবশ্যই এখানে اِلْتِفَاتٌ বাক্যের গতি বা রীতির পরিবর্তন করা হয়েছে– বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে।

৩৯. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৩৯. আর তোমরা প্রতিফল পাবে তবে তার প্রতিফল দেওয়া হবে– যা তোমরা পৃথিবীতে করতে।

৪০. إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ أَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ ذِكْرُ جَزَاؤُهُمْ فِيْ قَوْلِهٖ .

৪০. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর বাছাই করা বান্দা অর্থাৎ ঈমানদারগণ। এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হয়েছে।

৪১. أُولٰئِكَ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا .

৪১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে তাদের প্রতিফলের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে– জান্নাতে নির্ধারিত রুজি সকাল-সন্ধ্যা।

৪২. فَوَاكِهُ ج بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِلرِّزْقِ وَهِيَ مَا يُؤْكَلُ تَلَذُّذًا لَا لِحِفْظِ صِحَّةٍ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُسْتَغْنُوْنَ عَنْ حِفْظِهَا بِخَلْقِ أَجْسَامِهِمْ لِلْأَبَدِ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ بِثَوَابِ اللّٰهِ .

৪২. ফলমূল– এটা রিজিক হতে بَدَلٌ অথবা بَيَانٌ হয়েছে। আর তা হলো যা তৃপ্তি ও স্বাদের জন্য এমন করা হয়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নয়। কেননা জান্নাতবাসীগণ স্বাস্থ্য রক্ষার মুখাপেক্ষী নন। কারণ তাদের শরীরকে চিরদিনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা সম্মানিত হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতিদানের কারণে।

৪৩. فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ .

৪৩. নিয়ামতের উদ্যানসমূহে।

৪৪. عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ لَا يَرٰى بَعْضُهُمْ قَفَا بَعْضٍ .

৪৪. মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন একে অপরের পৃষ্ঠদেশ দেখতে হবে না।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ عَلٰى كُلٍّ مِنْهُمْ بِكَأْسٍ هُوَ الْاِنَاءُ بِشَرَابِهِ مِنْ مَّعِيْنٍ مِنْ خَمْرٍ يَجْرِىْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ كَاَنْهَارِ الْمَاءِ ۔ .٤٥ ৪৫. তাদেরকে ঘুরেফিরে পরিবেশন করা হবে– তাদের প্রত্যেককে আশ-পাশে পেয়ালার মাধ্যমে তা (كَأْس) হলো পানীয় ভর্তি পেয়ালা– সুরা মদ অর্থাৎ মদ– যা পানির নহরসমূহের ন্যায় ভূমির উপর প্রবাহিত হবে।

بَيْضَاءَ اَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ لَذَّةٍ لَذِيْذَةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا فَاِنَّهَا كَرِيْهَةٌ عِنْدَ الشُّرْبِ ۔ .٤٦ ৪৬. সুশুভ্র– দুধ হতেও সাদা হবে স্বাদযুক্ত– সুস্বাদু হবে পানকারীদের জন্য দুনিয়ার মদের বিপরীত। কেননা এটা পান করার সময় বিস্বাদ মনে হয়।

তাহকীক ও তারকীব

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۔ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ **বাক্যাংশসমূহের মহল্লে ই'রাব কি?** অত্র আয়াতে فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ বাক্যাংশটুকু مُكْرَمُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হতে পারে, তা ছাড়া এটা هُمْ مُكْرَمُوْنَ-এর -এর দ্বিতীয় খবরও হতে পারে, আবার حَالْ ও হতে পারে। عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ বাক্যাংশে عَلٰى سُرُرٍ পরবর্তী مُتَقٰبِلِيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হতে পারে। আর এটা حَالْ ও হতে পারে আর وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ পূর্ববর্তী মুতা'আল্লাক দ্বয়ের যে কোনো একটি হতে حَالْ হতে পারে। –[কামালাইন]

غَيْرَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -এর মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর বাণী وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -এর মধ্যে اِلَّا শব্দটি غَيْرَ -এর অর্থে হয়েছে। সুতরাং এটা مُضَافْ আর مَا ইসমে মাওসূল -এর صِلَةْ -এর সাথে মিলিত হয়ে মুযাফ ইলাইহ হওয়ার কারণে মহল্লান মাজরূর হয়েছে। অথবা, এটা جَزَاءْ বিলুপ্ত মুযাফের মুযাফ ইলাইহি হয়ে মাজরূর হয়েছে। বাক্যটি হবে– وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃত অপকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ : আয়াতে بَيْضَاءَ এবং لَذَّةٍ-এর মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۔ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۔

'সাদা বাঁটি সুরাপূর্ণ পাত্র জান্নাতীদেরকে পরিবেশন করা হবে। যা পানকারীদের নিকট সুস্বাদু হবে।' অত্র আয়াতে بَيْضَاءَ শব্দটি مَعِيْنٍ-এর সিফাত হিসেবে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে। কিন্তু এটা غَيْرُ مُنْصَرِفْ হওয়ার কারণে তাতে যবর হয়েছে। আর لَذَّةٍ শব্দটিও مَعِيْنٍ-এর দ্বিতীয় সিফাত হয়ে مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : উল্লিখিত আয়াতটি মক্কার মুশরিক নেতাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মক্কার মুশরিক নেতারা তার শয্যাপাশে একত্রিত হয়েছিল। তারা জীবনের শেষলগ্নে বাপ-দাদার ধর্ম তথা শিরকের উপর অটল থাকার পরামর্শ দিল। এ সুযোগে নবী করীম ﷺ তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন– قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَمْلِكُوْنَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ بِهَا الْعَجَمُ অর্থাৎ "তোমরা বলো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই– তাহলে তোমরা এর দ্বারা আরবের উপর নেতৃত্ব লাভ করবে এবং অনারবরাও তোমাদের অনুগত হয়ে যাবে।" কিন্তু তারা নবীজীর ডাকে সাড়া দিল না; বরং তারা অহঙ্কার করে বলল– "একজন পাগল ও কবির পিছনে পড়ে আমরা কি আমাদের মা'বুদদের উপাসনা ছেড়ে দেবো– বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করবো?"

তাদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল করে আল্লাহ ফরমান– এরা তো এমন সম্প্রদায় যখন তাদেরকে দুনিয়াতে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হতো– বাতিল দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ করত এক আল্লাহ– সত্যিকার মা'বুদের ইবাদতের জন্য আহ্বান জানানো হতো তখন তারা অহঙ্কার বশত তা প্রত্যাখান করত। –[কবীর, সাবী, কুরতুবী ইত্যাদি]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন যে, একটি জাতি অহঙ্কার ও গরিমায় পড়ে তা গ্রহণ করেনি অতঃপর প্রমাণ হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতখানা তেলাওয়াত করেন– إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ এ মুশরিকরা এমন যে, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার মা'বুদ নেই তখন অহঙ্কার বশত তারা তা প্রত্যাখ্যান করত।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا.

"সে সময়কে স্মরণ করো, যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অহঙ্কার স্থান দিয়েছিল– জাহেলিয়াতের অহঙ্কার, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন। আর তাদের উপর তাকওয়ার বাণী তথা "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" -কে লাযেম তথা অত্যাবশ্যক [বা বদ্ধমূল] করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর সর্বাধিক হকদার ও যোগ্য।"

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মক্কার মুশরিকরা যে অহঙ্কার ও গোয়ার্তুমীর পরিচয় দিয়েছিল এবং তার মোকাবিলায় নবী করীম ﷺ ও তদীয় সাহাবীগণ সেই চরম ধৈর্য অবলম্বন করেছেন এখানে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মোটকথা, অহঙ্কার অহমিকাবোধই মুশরিকদেরকে দীন ও তাওহীদ হতে তথা আল্লাহ তা'আলার খাস করুণা হতে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

আলোচ্য আয়াতের বিশ্লেষণ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা রাসূলে কারীম ﷺ -কে পাগল ও কবি বলে আখ্যায়িত করত। তারা বলত যে, একজন কবি ও পাগলের কথা ধরে কি আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? তা কখনো হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ পাগলও নন, কবিও নন। বরং তিনি তো সত্যবাণী নিয়ে আগমন করেছেন। আর তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা তো নতুন কিছু নয়; বরং ইতঃপূর্বে হাজারো– লাখো নবী এ তাওহীদের দাওয়াত সত্যের পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।

صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-কে সত্যায়িত করেছেন– এটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করেননি। সুতরাং পূর্ববর্তী কোনো নবীর উম্মত তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করার– তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লাগার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণই থাকতে পারে না। তিনি তো পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকেই সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

২. তাঁর দাওয়াত নতুন কোনো কিছু নয়; বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও এ একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং এতে বিস্মিত হওয়ার এবং একে অসম্ভব কিছু ভাববার কি যুক্তি থাকতে পারে?

৩. তাঁর পূর্ববর্তী যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তাঁরা সকলেই রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যায়িত করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মূর্ত প্রতীক।

মোটকথা, রাসূলে কারীম ﷺ যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তা ইতঃপূর্বে আদি পিতা আদম (আ.) হতে হাজারো যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরামের মুখে উচ্চারিত অসংখ্য বনী আদমের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। সুতরাং এর দরুন যারা মুহাম্মদ ﷺ -কে পাগল ও কবি বলে আখ্যায়িত করছে মূলত তারা নিজেরাই পাগলামি ও কাল্পনিক কাব্যে বিভোর রয়েছে– তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ আয়াতের বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর খাঁটি ঈমানদার বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট রিজিক (رِزْقٌ مَعْلُومٌ) রয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন–

১. কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন– رِزْقٌ مَعْلُومٌ -এর দ্বারা জান্নাতী খাদ্যের সেই বিস্তারিত তালিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সূরায় বিক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ তাফসীরটিই পছন্দ করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন– "رِزْقٌ مَعْلُومٌ" -এর অর্থ হলো তার সময় জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবেশন করা হবে। যেমন অন্য আয়াতে عَشِيَّةً ও غَدْوَةً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, "رِزْقٌ مَعْلُومٌ" -এর অর্থ নিশ্চিত ও সার্বক্ষণিক হবে। সেখানকার অবস্থা পৃথিবীর মতো হবে না। দুনিয়াতে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, আগামীকাল সে কি খাবে এবং কি পরিমাণ খাবে। আর যার নিকট খাদ্য রয়েছে সে নিশ্চিত জ্ঞাত নয় যে, উক্ত খাদ্য তার নিকট কত সময় থাকবে? প্রত্যেকের মধ্যেই এ আশঙ্কা থাকে যে, যা এখন তার নিকট রয়েছে তা পরক্ষণেই তার নিকট নাও থাকতে পারে। জান্নাতের অবস্থা এরূপ হবে না; বরং তথাকার খাদ্য নিশ্চিত ও স্থায়ী হবে। -[কুরতুবী]

তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদের খাদ্য পরীক্ষিত হবে। ঈমানদারগণের নেক আমল অনুসারে তাদেরকে জান্নাতে পরিমিত রিজিক দেওয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক পরিমাণে দান করবেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বেহেশতে তথাকার বাসিন্দারা কোনোরূপ টানাপড়েন ও অনিশ্চয়তা অনুভব করবেন না।

"فَوَاكِهُ" -এর বিশ্লেষণ : فَوَاكِهُ শব্দের দ্বারা খোদ কুরআন মাজীদ জান্নাতের রিজিকের তাফসীর বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তা হবে মেওয়া-ফলফলাদি। فَوَاكِهُ এটা فَاكِهَةٌ -এর বহুবচন; আরবিতে এমন খাদ্যকে فَاكِهَةٌ বলে যা তৃপ্তি স্বাদের জন্য ভক্ষণ করা হয়; পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় "ফল-ফলাদি" দ্বারা– কেননা ফল-ফলাদি স্বাদ এবং তৃপ্তির জন্য খাওয়া হয়। নতুবা ফল-ফলাদি হতে فَاكِهَةٌ -এর ভাব অনেক ব্যাপক।

ইমাম রাযী (র.) এ فَوَاكِهُ শব্দ হতে একটি রহস্য উন্মোচন করেছেন। তা এই যে, জান্নাতে যত খাদ্য দেওয়া হবে সবই স্বাদ ও তৃপ্তির জন্য দেওয়া হবে– ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। কেননা জান্নাতে কোনো বস্তুর প্রয়োজন হবে না। জান্নাতে জীবন-যাপন অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোনো খাদ্য ভক্ষণের প্রয়োজন হবে না। অবশ্য খাওয়ার ইচ্ছা হবে। সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার কারণে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। আর জান্নাতের সব খাবার-খাদ্যে নিয়ামতের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি প্রদান করা। -[মা'আরিফ, কাবীর]

"وَهُمْ مُكْرَمُونَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আর তারা সম্মানিত হবে। এটা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে উক্ত রিজিক সম্পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে দেওয়া হবে। কেননা মর্যাদা ও সম্মানের সাথে না হলে অতি সুস্বাদু বস্তুও তিক্ত ও বিস্বাদ মনে হয়। এটা হতে আরও প্রমাণিত হয় যে, শুধু খাবার খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না; বরং মেহমানকে তা'জীম ও সম্মান করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

"عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে জান্নাতীগণের মজলিসের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁরা মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করবেন। কেউ কারো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। তবে প্রশ্ন হলো তা বাস্তবে কিরূপে সম্ভব? এর সঠিক জবাব আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে মুফাস্‌সিরগণ হতে তার দু'টি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

১. একদল মুফাস্‌সির বলেছেন, মজলিসের বেষ্টনী এত বিশাল হবে যে, একে অপরের প্রতি পৃষ্ঠ ফেরানোর প্রয়োজন হবে না।

২. অন্য দলের মতে, তাদের আসন এরূপ হবে যে, ইচ্ছা করলে প্রয়োজন মতো এদিক সেদিক ঘুরানো যাবে। সুতরাং যার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে তার দিকে ঘুরে যাবে।

"يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ" আয়াতের বিশ্লেষণ : জান্নাতীদেরকে বিশুদ্ধ স্বাদ পূর্ণ গ্লাস ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে। লক্ষণীয় যে, كَأْسٌ -এর অর্থ হলো- পানীয় ভর্তি পাত্র। আর সাধারণত শরাবের [মদের] পাত্রকেই كَأْسٌ বলে।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে বিশুদ্ধ মদ পূর্ণ গ্লাস ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে। কিন্তু কারা পরিবেশন করবে? এর উল্লেখ নেই। অবশ্য অন্য একটি আয়াত হতে তার জবাব পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

"وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ"

"আর জান্নাতীদের সেবার জন্য তাদের জন্য নিযুক্ত খাদেমগণ ঘুরতে থাকবে। তারা এমন সুশ্রী হবে যেন সুরক্ষিত মুক্তা।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا"

"আর জান্নাতীদের খেদমতের জন্য এমন সব বালক ঘুরতে থাকবে যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে বিক্ষিপ্ত মুক্তা [ছড়িয়ে রয়েছে]।"

কিন্তু আবারও প্রশ্ন উঠে যে, এ غِلْمَانٌ যাদেরকে অন্য আয়াতে "وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ" বলা হয়েছে তারা কারা? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুশরিকদের সেসব ছেলে যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে জান্নাতীদের খাদেম হিসেবে নিয়োগ করা হবে। সুতরাং হযরত আনাস (রা.) ও সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের বালকরা- যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করে তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে।

অন্য এক দল মুফাস্‌সিরে কেরামের মতে, তারা ভিন্ন একটি জাতি। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। চিরদিন তারা বালকই থাকবে। তাদের শারীরিক গঠনের কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

উল্লেখ্য যে, সনদের দিক বিবেচনায় উপরোল্লিখিত আনাস (রা.) ও সামুরাহ (রা.)-এর হাদীসখানা দুর্বল। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিকেই অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ প্রাধান্য দিয়েছেন।

"لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে لَذَّةٌ শব্দটি মাসাদর। এর অর্থ হলো- সুস্বাদু হওয়া। এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন- এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। মূলত শব্দটি ছিল "ذَاتُ لَذَّةٍ" অর্থাৎ সুস্বাদু বিশিষ্ট। নাহুবিদ যুজাজের মতও এটাই।

কারো কারো মতে, এখানে لَذَّةٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এরূপ ব্যবহার আরবি ভাষায় ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তা পালনকারীদের জন্য সুপেয় হবে।

অন্য এক দল মুফাস্‌সিরের মতে, এটা সিফাতের সীগাহ হবে। কেননা لَذَّةٌ -এর সিফাত যদ্রূপ لَذِيْذٌ হয়ে থাকে তদ্রূপ لَذٌّ ও হয়। আর এখানে لَذَّةٌ সেই لَذٌّ -এর সিফাত হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে তা পানকারীদের নিকট সুস্বাদু মনে হবে।

"إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" আয়াতে কোন প্রকারের اِسْتِثْنَاءٌ হয়েছে? আল্লাহর বাণী "إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে-

"إِنَّ الْكَفَرَةَ يُجْزَوْنَ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَإِنَّهُمْ يُجْزَوْنَ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً."

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের সমপরিমাণে প্রতিফল তথা আজাব দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহর মুখলিস বান্দা তথা ঈমানদারদের কথা আলাদা। কেননা তাদেরকে কৃতকর্ম অপেক্ষা বহুগুণে বেশি ছওয়াব দেওয়া হবে।

অনুবাদ :

٤٧. لَا فِيْهَا غَوْلٌ مَا يَغْتَالُ عُقُوْلَهُمْ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ بِفَتْحِ الزَّاءِ وَكَسْرِهَا مِنْ نَزَفَ الشَّارِبُ وَاَنْزَفَ اَىْ لَا يُسْكِرُوْنَ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

৪৭. এতে মাথাব্যথা হবে না যা তাদের জ্ঞানকে বিকৃত করতে পারে। এর কারণে তারা মাতালও হবে না يُنْزَفُوْنَ শব্দটির ز অক্ষরটি যবর যোগেও হতে পারে আবার যের যোগেও হতে পারে। এটা نَزَفَ الشَّارِبُ ও اَنْزَفَ الشَّارِبُ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তারা মাতাল হবে না। যা দুনিয়ার মদের বিপরীত।

٤٨. وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ حَابِسَاتُ الْاَعْيُنِ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ لَا يَنْظُرْنَ اِلٰى غَيْرِهِمْ لِحُسْنِهِمْ عِنْدَهُنَّ عِيْنٌ ضِخَامُ الْاَعْيُنِ حِسَانُهَا .

৪৮. আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না যারা কেবল- স্বীয় স্বামীদের প্রতি চক্ষু নিবদ্ধকারী। স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তারা তাকাবে না। কেননা তাদের নিকট স্বীয় স্বামীদেরকে [সর্বাধিক] সুন্দর মনে হবে। ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা রমণী ডাগর ডাগর চোখ সুদর্শন হয়ে থাকে।

٤٩. كَاَنَّهُنَّ فِى اللَّوْنِ بَيْضٌ لِلنَّعَامِ مَّكْنُوْنٌ مَسْتُوْرٌ بِرِيْشِهٖ لَا يَصِلُ اِلَيْهِ غُبَارٌ وَلَوْنُهٗ وَهُوَ الْبَيَاضُ فِىْ صُفْرَةٍ اَحْسَنُ اَلْوَانِ النِّسَاءِ .

৪৯. যেন তারা রঙের দিক দিয়ে ডিম উটপাখির সুরক্ষিত লুক্কায়িত ডিম উটপাখি স্বীয় পাখা দ্বারা যাকে ঢেকে রাখে- যার গায়ে ধুলাবালি পড়তে পারে না। আর তার রঙ হলো হলুদ মিশ্রিত সাদা- এটাই মহিলাদের সর্বাধিক সুন্দর [ও উৎকৃষ্ট] রঙ।

٥٠. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاۤءَلُوْنَ عَمَّا مَرَّ بِهِمْ فِى الدُّنْيَا .

৫০. মুখোমুখি হবে তাদের একদল জান্নাতীদের একদল অপর দলের এমতাবস্থায় যে, পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সেই ঘটনাবলি সম্পর্কে যা দুনিয়াতে থাকাবস্থায় ঘটেছিল।

٥١. قَالَ قَاۤئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ صَاحِبٌ يُنْكِرُ الْبَعْثَ .

৫১. তাদের একজন বলবে আমার একজন সঙ্গী ছিল এমন সঙ্গী যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত।

٥٢. يَقُوْلُ لِىْ تَبْكِيْتًا اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ بِالْبَعْثِ .

৫২. সে বলত, আমাকে ভর্ৎসনা নিমিত্তে তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? পুনরুত্থানের উপর।

٥٣. اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا فِى الْهَمْزَتَيْنِ فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاضِعَ مَا تَقَدَّمَ لَمَدِيْنُوْنَ مَجْزِيُّوْنَ وَمُحَاسَبُوْنَ اَنْكَرَ ذٰلِكَ اَيْضًا .

৫৩. আমরা যখন মৃত্যুবরণ করবো এবং হাড়সর্বস্ব মাটি হয়ে যাবো তখন কি- উক্ত তিন স্থলে হামযাদ্বয়ে সেসব কেরাত প্রযোজ্য যা ইতঃপূর্বে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে? আমাদেরকে কি প্রতিদান দেওয়া হবে? আমাদের কি হিসাব-নিকাশ হবে? সে এটাকেও অস্বীকার করেছে।

٥٤. قَالَ ذٰلِكَ الْقَائِلُ لِاِخْوَانِهِ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ مَعِىْ اِلَى النَّارِ لِنَنْظُرَ حَالَهٗ فَيَقُوْلُوْنَ لَا.

৫৪. সে বলবে উক্ত বক্তা তার জান্নাতি ভাইদেরকে বলবে, তোমরা কি ঝুঁকে দেখবে? আমার সাথে জাহান্নামের দিকে। যাতে আমরা তার অবস্থা দেখতে পারি। তখন তারা বলবে, না, আমরা দেখবো না।

٥٥. فَاطَّلَعَ ذٰلِكَ الْقَائِلُ مِنْ بَعْضِ كُوَى الْجَنَّةِ فَرَاٰهُ اَىْ رَاٰى قَرِيْنَهٗ فِىْ سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ اَىْ وَسْطِ النَّارِ.

৫৫. অতঃপর সে (নিজে) ঝুঁকে দেখবে– সেই বক্তা জান্নাতের কোনো দরজা হতে। তখন দেখতে পাবে তাকে অর্থাৎ তার সেই (দুনিয়ার) সাথিকে জাহান্নামের মধ্যখানে অর্থাৎ জাহান্নামের মাঝখানে।

তাহকীক ও তারকীব

"اَلْمُصَدِّقِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : اَلْمُصَدِّقِيْنَ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. তা تَصْدِيْق হতে নির্গত হবে। তখন ص অক্ষরটির মধ্যে তাশদীদবিহীন যবর হবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ। এটাই জমহুরের কেরাত।

২. تَصَدُّق হতে ইসমে ফায়িল-এর সীগাহ। এমতাবস্থায় এটা মূলে ছিল اَلْمُتَصَدِّقِيْنَ পরে ت -কে ص -এর দ্বারা পরিবর্তন করে ص -কে ص -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ সদকাকারীগণ। এ কেরাতে ص অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত হবে। এটা আলী ইবনে কায়সান, সোলায়মান ও হামযাহ প্রমুখগণের কেরাত।

ইমাম নাহাস (র.) দ্বিতীয় কেরাতটির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এখানে সদকার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু ইমাম কুশায়রী (র.) বলেছেন, উক্ত কেরাতে সহীহ। কেননা এটা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে।

"قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ" -এর মধ্যকার اَلطَّرْفُ -এর মহল্লে ই'রাব : এখানে اَلطَّرْفُ -এর মধ্যে দু প্রকারের ই'রাব হতে পারে।

১. এটা মহল্লান মারফূ' হবে। তখন قَاصِرَاتُ শব্দটিকে সিফাতে মুশাব্বাহ হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. এটা মহল্লান মানসূব হবে। এমতাবস্থায় قَاصِرَاتُ শব্দটি ইসমে ফায়িলের সীগাহ হবে।

আয়াতে তাশবীহের বিশ্লেষণ : এখানে كَاَنَّ হরফে তাশবীহ هُنَّ হলো "مُشَبَّهٌ" এবং "بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ" হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ আর وَجْهُ التَّشْبِيْهِ হলো ডিমের খোসা ও কুসুমের মধ্যকার ঝিলির রং যদ্রূপ স্বচ্ছন্দ, কোমল, উজ্জ্বল ও মসৃণ ঠিক জান্নাতে হুরদের রং তদ্রূপ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا فِيْهَا غَوْلٌ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতখানার সরল অর্থ হলো– জান্নাতীদেরকে যে মদ পরিবেশন করা হবে তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তা পান করে তারা মাতাল হয়েও পড়বেন না। মুফাস্সিরগণ হতে غَوْلٌ শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ, ইবনে আবী নাজিহ ও মুজাহিদ প্রমুখ মুফাস্সিরগণ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, غَوْلٌ -এর অর্থ হলো পেটের ব্যথা।

কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ হলো দুর্গন্ধ।

কারো কারো মতে, তার অর্থ হলো আকল বিকৃত হয়ে যাওয়া।

প্রকৃতপক্ষে غَوْلٌ শব্দটি উপরোক্ত সব কয়টি অর্থকেই শামিল করে।

হাফিজ ইবনে জারীর (র.) বলেছেন যে, এখানে غَوْلٌ শব্দটি বিপদ (মসিবত)-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মদের ন্যায় আখেরাতের মদের কোনো বিপদ (ক্ষতি) হবে না। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, দুর্গন্ধ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাওয়া কিছুই তার মধ্যে থাকবে না। -[তাফসীরে ইবনে জারীর]

"لَا يُنْزَفُوْنَ" অর্থাৎ উক্ত মদ পান করার দরুন তারা মাতাল হয়ে পড়বে না। আরবি ভাষায় প্রবাদ আছে- "اَلْخَمْرُ غَوْلٌ لِلْحِلْمِ وَالْحَرْبُ غَوْلٌ لِلنُّفُوْسِ" অর্থাৎ মদ বিনষ্ট করে মানুষের আকল-বুদ্ধিকে আর যুদ্ধ ধ্বংস করে মানুষের জীবনকে। মাতাল ও মস্তিষ্ক বিকৃত লোককে مَنْزُوْفٌ বলে।

জাহেলিয়াতের যুগের প্রখ্যাত আরব কবি তার নিম্নোক্ত দু'টি শ্লোকে উক্ত অর্থেই এ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

وَإِذْ هِيَ تَمْشِيْ كَمَشْيِ النَّزِ ☆ يْفِ يَصْرَعُهُ بِالْكَثْبِ الْبَهَرْ

نَزِيْفٌ اِذَا قَامَتْ لِوَجْهٍ تَمَايَلَتْ ☆ تَرَاشِي الْفُؤَادِ الرَّخِصِ اِلَّا تَخَتَّرَا

উপরিউক্ত শ্লোক দু'টিতে কবি তার প্রেমিকাকে মাতালের সাথে তুলনা করতে গিয়ে نَزِيْف শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, জান্নাতের মদ পান করার দরুন মাতাল হয়ে পড়বে না; যদ্রূপ দুনিয়ার মদের বেলায় হয়ে থাকে। দুনিয়ার মদে সাধারণত দু'টি দোষ দেখা যায়।

১. এক প্রকার দোষ হলো, তা কাছে নিলেই এক ধরনের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তার বিস্বাদ মানুষকে তিক্ত করে। তা পান করলে পেট ব্যথা করে, মস্তিষ্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মোটের উপর মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে।

২. দ্বিতীয় দোষ হচ্ছে- তা পান করলে মানুষের জ্ঞান-বিবেক লোপ পায়। মানুষ মাতাল হয়ে পড়ে, ক্ষণিকের মাদকতা ও স্ফূর্তি লাভের জন্য মানুষ এত সব ক্ষতিকে বেমালুম ভুলে যায়।

কিন্তু জান্নাতের মদের মধ্যে এসব ক্ষতির তো কিছুই থাকবে না, বরং স্ফূর্তি ও তৃপ্তি থাকবে তদপেক্ষা হাজারো গুণ বেশি।

"قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে জান্নাতের হুরদের সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। "তারা আনত নয়না হবে।" এর একাধিক অর্থ হতে পারে।

যে পুরুষদের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিবেন তাদের ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের দিকে তারা চোখ তুলে দেখবেন না।

আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) বর্ণনা করেছেন, সে হুরগণ তাঁদের স্বামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন- "আমার প্রভুর ইজ্জতের শপথ করে বলছি যে, জান্নাতে তোমার অপেক্ষা উত্তম অন্য কাউকে আমি দেখছি না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী বানিয়েছেন সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।"

আল্লামা ইবনে জওযী (র.) "আনত নয়না হওয়ার" অন্য একটি ব্যাখ্যাও করেছেন, তা হচ্ছে- তারা তাদের স্বামীর নয়নকে অবনমিত রাখবে। অর্থাৎ তারা এত সুন্দর এবং অনুগত হবে যে, তাদের স্বামীদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছাই হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), ইকরামা (র.) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ আল্লামা ইবনে জাওযী (র.)-এর প্রথমোক্ত অভিমতের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

عِيْنٌ -এর অর্থ হলো বড় চক্ষুবিশিষ্টা রমণীগণ। সাধারণত বড় চক্ষুবিশিষ্টা রমণীরা সুন্দরী হয়ে থাকে।

"كَاَنَّهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য জান্নাতের হুরদেরকে লুক্কায়িত বা আবৃত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবি ভাষাভাষীগণের এরূপ উপমার প্রয়োগ প্রসিদ্ধ ছিল। যেসব ডিম পালক দ্বারা আবৃত থাকত তাদের মধ্যে বাইরের ধুলাবালি পড়তে পারত না। কাজেই তারা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হতো। এতদ্ব্যতীত তাদের রং হতো হলুদ মিশ্রিত সাদা যা আরবদের নিকট মহিলাদের সর্বাধিক আকর্ষণীয় রং হিসেবে গণ্য ছিল। এ জন্য হুরদের রংকে তাদের রংয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়নি; বরং ডিমের সেই ঝিলির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা খোসার ভিতরে লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ উক্ত রমণীগণ সেই ঝিলির ন্যায় নরম, নাযুক ও স্বচ্ছ হবে। -[রুহুল মা'আনী]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। একটি মারফূ' হাদীস হতে শেষোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেছেন, হুরদের মসৃণতা ও স্বচ্ছতা হবে ডিমের সেই ঝিলির ন্যায় যা তার খোসার ও কুসুমের মাঝখানে হয়ে থাকে।

মোটকথা উপরিউক্ত কয়টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সম্ভোগের জন্য কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন।

ক. তথায় তাদেরকে রিজিকের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

খ. জান্নাতীদেরকে ইজ্জত ও সম্মান দেওয়া হবে।

গ. জান্নাত তাদের জন্য বিলাসবহুল ও সুখময় হবে।

ঘ. খাঁটি নেশাবিহীন তৃপ্তিদায়ক শরাব পরিবেশন করা হবে।

ঙ. পতিপরায়ণতা সুন্দরী-রমণী তাদের সঙ্গিনী হবে। -[রুহুল মা'আনী, ইবনে জারীর, মা'আরিফ, সাফওয়াহ]

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যা : জান্নাতে জান্নাতিরা গল্প-গুজবে মশগুল থাকবে। তারা বিলাশবহুল আসনে সমাসীন হয়ে মুখোমুখি বসে গল্পের মজলিস করবে। তারা পরস্পরের নিকট পৃথিবীর জীবনের স্মৃতিচারণ করবে। পৃথিবীতে তারা কে কোন অবস্থায় জীবনযাপন করেছে তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন হবে। তারা যখন আলোচনায় মশগুল থাকবে তখন জান্নাতি খাদেমগণ তাদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করবে। জান্নাতিদেরকে এমন খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কর্ণ শুনেনি, কোনো অন্তর যার কল্পনাও করতে পারেনি।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে জান্নাতির কি অবস্থা হবে তার আলোচনা করতে গিয়ে মাযী (مَاضِىْ) -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন। কেননা যদিও তা পরে সংঘটিত হবে তথাপি তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। যদ্রূপ অতীতকালে অনুষ্ঠিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই।

এক জান্নাতি ও তার কাফের সঙ্গী : এখানে প্রথম দশটি আয়াতে জান্নাতীদের সাধারণ অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে একজন জান্নাতী লোকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সে ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছার পর তার এক কাফের সঙ্গীর কথা স্মরণ হবে। সে দুনিয়াতে আখেরাতকে অবিশ্বাস করত। তারপর আল্লাহর অনুমতি পেয়ে সে জান্নাতী তার জাহান্নামী বন্ধুর সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাবে। কুরআন মাজীদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির নাম-ঠিকানার উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই তিনি কে? তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন তার নাম ইয়াহুদা এবং তার কাফের সঙ্গীর নাম مَطْرُوْس আর তারা হলেন সেই দু'জন সাথী সূরায়ে কাহাফে "وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ الخ" -এর মধ্যে যাদের আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য কতিপয় তাবেয়ী হতে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, দুজন মানুষ কোনো কারবারে শরিক ছিল। তাদের আট হাজার দিনার মুনাফা হলো। চার হাজার করে তারা পরস্পরের মধ্যে তা বণ্টন করে নিল।

এক শরিক তার টাকা হতে এক হাজার টাকা দিয়ে একটি জমিন ক্রয় করল। অপর সাথী ছিল অত্যন্ত খোদাভীরু। সে দোয়া করল, "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দিনার দিয়ে একটি জমিন ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে জান্নাতের একটি জমি ক্রয় করেছি। এই বলে সে এক হাজার দীনার সদকা করে দিল। অতঃপর তার সাথী এক হাজার দিনার ব্যয় করে একটি ঘর নির্মাণ করল। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দিনার খরচ করত একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। "আমি এক হাজার দিনারের বিনিময়ে আপনার নিকট হতে জান্নাতের একটি গৃহ খরিদ করছি।" এটা বলে সে আরও এক হাজার দিনার সদকা করে দিল। অতঃপর তার সঙ্গী এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। আর বিয়ের কাজে এক হাজার দিনার খরচ করে দিল। তখন সেই লোকটি আল্লাহর নিকট দোয়া করল "হে আল্লাহ অমুক ব্যক্তি বিবাহের কার্যে এক হাজার দিনার খরচ করেছে। আর আমি জান্নাতী মহিলাদের এক জনের সাথে বিবাহের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দিনার মান্নত করছি।" এই বলে আরও এক হাজার দনার সদকা করে দিল। তারপর তার সঙ্গী এক হাজার দিনার খরচ করে কিছু গোলাম ও সামগ্রী ক্রয় করল। তখন সে বাকি এক হাজার দনার সদকা করত আল্লাহর নিকট জান্নাতের গোলাম ও সামগ্রীর প্রার্থনা জানাল।

তারপর হঠাৎ সে ঈমানদার ব্যক্তি খুব অভাবে পড়ে গেল। সে ভাবল, তার পূর্বের বন্ধুর নিকট গেলে হয়তো সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সুতরাং তার নিকট গিয়ে নিজের প্রয়োজনের উল্লেখ করল। সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করল, তোমার সম্পদের কি হয়েছে? সে তার নিকট সব ঘটনা খুলে বলল। বন্ধুটি তাজ্জব হয়ে বলল– "সত্যিই কি বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুবরণ করে ধুলায় মিশে যাওয়ার পর পুনরায় আমাকে জীবিত করা হবে"। আর তথায় আমাদের আমলের হিসাব-নিকাশও নেওয়া হবে? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দিব না। তারপর উভয় মৃত্যুবরণ করল।

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতী দ্বারা সেই মু'মিন বান্দাকে বুঝানো হয়েছে যে পরকালের তরে তার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিয়েছে। আর জাহান্নামী দ্বারা উদ্দেশ্য তার সেই ব্যবসায়ী শরিক যে আখেরাত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে তাকে উপহাস করেছে।

অসৎ সঙ্গ বর্জনের তাগিদ : যা হোক, আলোচ্য ঘটনা উল্লেখের মূল কারণ হলো, মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে, সে যেন তার সাথী-সঙ্গীগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। তাকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে, তার সাথে এমন কেউ রয়েছে কিনা যে তাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অসৎ সঙ্গে যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয় তা তো শুধু আখেরাতেই সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়া যাবে। কিন্তু তখন তো সে ক্ষতি হতে পরিত্রাণের কোনো পথই খোলা থাকবে না। সুতরাং খুব যাচাই-বাছাই করে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোনো নাফরমান ও কাফেরের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করত তার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ বেমালুম গোমরাহী ও ধ্বংসে নিপতিত হয়। যাতে করে পরকালে জাহান্নামী হয়ে পড়ে।

অনুবাদ :

٥٦. قَالَ لَهُ تَشْمِيْتًا تَاللّٰهِ اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ كِدْتَّ قَارَبْتَ لَتُرْدِيْنِ لَتُهْلِكَنِى بِاِغْوَائِكَ.

৫৬. সে বলবে তাকে তিরস্কার করে আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে إِنْ অব্যয়টিকে তাশদীদযুক্ত হতে তাশদীদবিহীন করা হয়েছে। তুমি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছ তুমি কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে– আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করার– তোমার বিভ্রান্তিকরণের দ্বারা আমাকে ধ্বংস করার কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলে।

٥٧. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ اَىْ اِنْعَامُهُ عَلَىَّ بِالْاِيْمَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ مَعَكَ فِى النَّارِ.

৫৭. আর যদি আমার প্রভুর নিয়ামত না হতো অর্থাৎ আমার প্রতি অনুগ্রহ না করতেন ঈমান দান করে তাহলে আমিও হাজিরকৃতদের দলভুক্ত হয়ে পড়তাম তোমার সাথে জাহান্নামে।

٥٨. وَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ.

৫৮. আর জান্নাতিরা বলবে আমরা কি আর মৃত্যুবরণ করবো না?

٥٩. اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى اَىْ الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ هُوَ اِسْتِفْهَامُ تَلَذُّذٍ وَتَحَدُّثٍ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ تَابِيْدِ الْحَيَاةِ وَعَدَمِ التَّعْذِيْبِ.

৫৯. আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত অর্থাৎ যা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। আর কি আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না? এটা তৃপ্তির প্রশ্ন এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ ও চিরস্থায়ী জীবন দান করত আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার বহিঃপ্রকাশ।

٦٠. اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৬০. নিশ্চয় এটা যা জান্নাতিদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে– অবশ্যই তা মহাবিজয়।

٦١. لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ قِيْلَ يُقَالُ لَهُمْ ذٰلِكَ وَقِيْلَ هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ.

৬১. অনুরূপ (ব্যক্তি)-এর জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত কথিত আছে যে, তা তাদেরকে বলা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, তারা নিজেরাই তা বলবে।

٦٢. اَذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ لَهُمْ خَيْرٌ نُزُلًا وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلنَّازِلِ مِنْ ضَيْفٍ وَغَيْرِهِ اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ الْمُعَدَّةِ لِاَهْلِ النَّارِ وَهِىَ مِنْ اَخْبَثِ الشَّجَرِ الْمُرِّ بِتِهَامَةَ يُنْبِتُهَا اللّٰهُ فِى الْجَحِيْمِ كَمَا سَيَاْتِىْ.

৬২. এটাই কি যা তাদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে উত্তম আপ্যায়ন– আর তা (نُزُلٌ) হলো মেহমান ও অন্যান্য আগন্তুকের জন্য যা তৈরি করা হয় না যাক্কুম বৃক্ষ? যা জাহান্নামিদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আর এটা [অর্থাৎ যাক্কুম বৃক্ষ] হলো তেহামাহ এলাকার নিকৃষ্টতম তিক্ত বৃক্ষ। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে তা উৎপন্ন করবেন। যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে।

٦٣. اِنَّا جَعَلْنَاهَا بِذٰلِكَ فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ اَىِ الْكَافِرِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اِذْ قَالُوْا النَّارُ تُحْرِقُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تُنْبِتُهُ.

৬৩. নিশ্চয় আমি নির্ধারণ করেছি তাকে [অর্থাৎ] তাতে পরীক্ষা জালিমদের জন্য অর্থাৎ কাফেরদের জন্য মক্কাবাসীদের মধ্য হতে। কেননা [এতদ্শ্রবণে] তারা বলেছে– আগুন তো বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ফেলে। সুতরাং তা কিভাবে বৃক্ষ উৎপন্ন করবে।

তাহকীক ও তারকীব

"لَتُرْدِيْنِ" -এর মধ্যস্থিত একাধিক কেরাত : অত্র শব্দটির মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. হযরত নাফে (র.) ও একদল ক্বারী "لَتُرْدِيْنِ" শব্দটিকে ى মুতাকাল্লিম সহ (لَتُرْدِيْنِىْ) পড়েছেন।

২. জমহুর ক্বারীগণ ى মুতাকাল্লিমকে হযফ করে পড়েছেন।

"مَيِّتِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত একাধিক কেরাত : আল্লাহর বাণী "اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত مَيِّتِيْنَ শব্দে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুরের মতে "مَيِّتِيْنَ" হবে [আলিফ ব্যতীত।]

২. হযরত যায়েদ ইবনে আলী (র.) "بِمَائِتِيْنَ" পড়েছেন। –[কুরতুবী ও ফাতহুল কাদীর]

"ذٰلِكَ" দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং نُزُلًا কি জন্য মানসূব হয়েছে? ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো ঐসব নিয়ামত যা জান্নাতে জান্নাতীগণকে দেওয়া হবে। نُزُلًا তারকীবে تَمْيِيْز হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। এখানে ذٰلِكَ মুবতাদা এবং خَيْرٌ খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে مُمَيَّزٌ আর نُزُلًا তামীঈয।

"اِنَّا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" -এর মা'তূফ আলাইহি : অত্র আয়াত তথা "اِنَّا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" আয়াতখানা هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ -এর পরে একটি উহ্য বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। মূলত ছিল– "اَنَحْنُ مُخَلَّدُوْنَ فِى الْجَنَّةِ مُنَعَّمِيْنَ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" আমরা কি চিরকাল জান্নাতে নিয়ামত প্রাপ্ত হব? যদ্দরুন আমাদের মৃত্যু হবে না।

"مَوْتَةً" শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ কি? অত্র আয়াতে مَوْتَةً শব্দটি مُسْتَثْنٰى হওয়ার দরুন مَنْصُوْب হয়েছে। এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ আর اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ -এর মধ্যে مُسْتَثْنٰى মানসূব হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْلَا نِعْمَةُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : একজন জান্নাতি তার এক সঙ্গীকে জাহান্নামে দেখে বলবে– হায়রে! দুনিয়াতে তো আমাকে গোমরাহ করার চক্রান্ত করেছিলে। তুমি তো আমার সর্বনাশ করার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলে। আল্লাহ তা'আলার যদি অশেষ অনুগ্রহ আমার প্রতি না হতো এবং আমি শিরক পরিহার করত ঈমান না আনতাম তাহলে আমিও তোমার সাথে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।

এ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেছেন যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই হেদায়েত লাভ করতে পারে এবং গোমরাহী হতে বেঁচে থাকতে পারে। কেউই আপন ক্ষমতা বলে হেদায়েত লাভ করতে পারে না এবং গোমরাহী হতে বেঁচে থাকতে পারে না। এটা ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি অনুগ্রহ ও দয়া। কাফের ও মুশরিকরা তা হতে বঞ্চিত।

কিন্তু বাতিলপন্থিরা বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ ঈমানদার ও কাফেরদের উপর সমভাবে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সাথে যা করেন কাফেরদের সাথেও তা করেন।

বিরোধীদের মতবাদকে খণ্ডন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, যদি হেদায়েতের নিয়ামত ঈমানদার ও কাফের উভয়ের জন্যই সাধারণভাবে হতো, তাহলে তো কাফেররা গোমরাহ হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। যখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, কাফেররা ঈমান ও হেদায়েত হতে বঞ্চিত রয়েছে তখন এটাই মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েতের নিয়ামত দান করেননি।

মোটকথা, আল্লাহর খাস অনুগ্রহের কারণেই ঈমানদারগণ ঈমান ও হেদায়েতের দৌলত লাভে ধন্য হয়েছে এবং শিরক ও কুফরির অভিশাপ হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে। অবশ্য এখানে তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টিকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

"أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلَىٰ" আয়াতের ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তিটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে যে, সে তার জাহান্নামী সঙ্গীকে দেখার জন্য জাহান্নামে ঝুঁকে দেখবে তার ব্যাপারেই এখানে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের অতিশয্যে বলে উঠবে- "আমরা কি কখনো মৃত্যুবরণ করব না?" এর অর্থ এই নয় যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর মূলতই তার বিশ্বাস নেই; বরং এটা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে চরম আনন্দ লাভ করার পর যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে, এমন চরম নিয়ামত তার লাভ হয়ে গেছে। পরিশেষে কুরআনে আলোচ্য ঘটনার প্রকৃত শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- "لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ" এরূপ সফলতার জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।

কবরের আজাবকে অস্বীকারকারীরা কিভাবে এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছে? আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের কথা উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেছেন- أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلَىٰ দুনিয়ার প্রথম বারের মৃত্যু ব্যতীত আমরা কি আর মৃত্যুবরণ করব না? আলোচ্য আয়াত দ্বারা কবরের আজাবকে অস্বীকার করে এভাবে দলিল পেশ করে থাকে যে, তা হতে প্রকাশ্য প্রতীয়মান হয়, দুনিয়ার মৃত্যুর পর তাদের আর মৃত্যু হবে না। এটা হতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার মৃত্যুর পর হাশরের পুনরুত্থান পর্যন্ত তারা মৃত অবস্থায়ই থাকবে। সুতরাং কবরে কিভাবে তাদের আজাব হবে? কেননা কবরে প্রাণহীন দেহের মধ্যে তাকে আজাব দেওয়া সম্ভবপর নয়।

ইমাম রাযী (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে দুনিয়ার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে; আখেরাতের কথা বলা হয় নি। সুতরাং দুনিয়ার মৃত্যু তো মাত্র একবার-ই হয়ে থাকে।

অথবা, বলা যেতে পারে যে, কবরে শুধুমাত্র এমন অনুভূতির সৃষ্টি করে দেওয়া হবে যাতে শাস্তি অনুভব করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জীবন দান করা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, কবরের আজাব শুধু রূহের উপর হবে, দেহ ও রূহের একত্রে মিলনের কোনো প্রয়োজন নেই। যদি দেহ ও রূহ মিলিত হতো তবেই তাকে জীবন বলা যেত।

আর কবরের আজাব এরূপ মুতাওয়াতির বর্ণনাসমূহের দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত যে, উহাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

أَذٰلِكَ خَيْرٌ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করার পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুলনা করে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যে, এতদুভয়ের মধ্য হতে কোনটি উত্তম? সুতরাং ইরশাদ হয়েছে- أَذٰلِكَ خَيْرٌ الخ। জান্নাতের যে নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা হয়েছে তা উত্তম, না যাক্কুমের বৃক্ষ যা জাহান্নামীদেরকে খাওয়ানো হবে?

যাক্কুমের হাকীকত : আরবের তেহামা এলাকায় যাক্কুম নামক একটি বৃক্ষ দেখা যায়। আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এটা অপরাপর মরুভূমিতেও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। অবশ্য এলাকা ও ভাষাভেদে এটার নামের তারতম্যও হতে পারে।

তবে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, জাহান্নামীদেরকে যে বৃক্ষ খাওয়ানো হবে তা দুনিয়ার এ যাক্কুম বৃক্ষই না অন্য ধরনের কোনো বৃক্ষ যাকে যাক্কুম নাম দেওয়া হবে।

কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) বলেছেন, তা দুনিয়ার এ যাক্কুম বৃক্ষই হবে।

অপর একদল মুফাসসির কেরাম (র.)-এর মতে জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ হবে অন্য ধরনের; তা দুনিয়ার যাক্কুম বৃক্ষের ন্যায় হবে না। দুনিয়ার যাক্কুম বৃক্ষের সাথে এটার কোনো তুলনা হয় না। যেমন দুনিয়াতে যদ্রূপ সর্প-বিচ্ছু রয়েছে তদ্রূপ দোজখেও সর্প-বিচ্ছু রয়েছে। কিন্তু দোজখের সর্প-বিচ্ছু দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছু অপেক্ষা হাজারো গুণে ভয়ানক ও ভয়াবহ হবে। অদ্রূপ জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ ও দুনিয়ার যাক্কুম বৃক্ষ অপেক্ষা বহুগুণে বিস্বাদ হবে। যদিও উভয় একই জাতীয় হোক না কেন।

"إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : "আমি যাক্কুম বৃক্ষকে সেই জালিমদের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়েছি।" আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

- একদল মুফাস্সির বলেছেন যে, অত্র আয়াতে فِتْنَةً দ্বারা আজাবকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বৃক্ষটিকে আজাবের মাধ্যমে বানিয়ে দিয়েছি।
- জমহুর মুফাস্সিরে কেরামের মতে, এখানে فِتْنَةً শব্দটি "পরীক্ষা"-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছি যে, কারা এর উপর ঈমান আনে আর কারা ঈমান না এনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে? সুতরাং আরবের লোকেরা উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। তারা উক্ত আজাবে ভীত হয়ে ঈমান আনার পবিরর্তে উপহাস ও বিদ্রূপের পন্থা অবলম্বন করেছে।

বর্ণিত আছে যে, যখন যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কীয় আয়াতগুলো নাজিল হলো তখন আবু জাহল তার সঙ্গীদেরকে বলল- "তোমাদের বন্ধুরা (অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথীবর্গ) বলে যে, অগ্নিতে একটি বৃক্ষ রয়েছে। অথচ আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলে। আল্লাহর শপথ, আমরা তো জানি যাক্কুম খেজুর ও মাখনকে বলে। সুতরাং আম এবং খেজুর ও মাখন খাও।" আসলে বর্বরী ভাষায় মাখন ও খেজুরকে যাক্কুম বলে। এ জন্য সে উপহাসের উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

- ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে উক্ত আয়াতের তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন। দু'টি উপরে উল্লিখিত তাফসীরের ন্যায়। আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে- যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। আর তা খাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর হবে। কাজেই এমতাবস্থায় যাক্কুম বৃক্ষটি তাদের জন্য ফেতনায় পরিণত হবে।

জাহান্নামে কিভাবে বৃক্ষ জন্মাবে অথচ অগ্নি বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ফেলে? যাক্কুম বৃক্ষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তা জাহান্নামের মধ্যে গজাবে। কিন্তু এ বক্তব্যই কাফেরদের ফেতনার মধ্যে ফেলেছে। বাহ্যিক জ্ঞান সম্পন্ন বস্তুবাদী কাফের-মুশরিকরা বুঝে উঠতে পারেনি যে, যেই আগুন বৃক্ষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে তাতে কিভাবে বৃক্ষ জন্মিতে পারে? আর জড়বিজ্ঞানীদের নিকট আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। মুসলিম মনীষী ও মুফাস্সিরগণ বিভিন্নভাবে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

- ইমাম রাযী (র.) তার উত্তরে বলেছেন যে, আগুনের সৃষ্টিকর্তা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বৃক্ষ পোড়াতে আগুনকে নিষেধ করবেন। সুতরাং আগুন আর বৃক্ষকে পোড়াবে না।

এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাফেররা প্রাণে মেরে ফেলার জন্য যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে অগ্নিতে ফেললেন, তখন আল্লাহ তা'আলা অগ্নিকে নির্দেশ দিলেন যেন তাকে স্পর্শও না করে বরং আগুন যেন এরূপ হয়ে যায় যাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে- "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ" আমি বললাম, হে অগ্নি! ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর শীতল ও প্রশান্তিদায়ক হয়ে যাও। আর সাথে সাথে অগ্নি তাই হয়ে গেল। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি পশম পোড়ানোর শক্তিও আর তার বাকি রইল না।

অন্যান্য মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, যখন এর জন্যই হয়েছে অগ্নি তখন আল্লাহ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুন দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে, সবুজ-সতেজ হয়ে থাকে। যেমন কিছু প্রাণী রয়েছে যা আগুনে জীবিত থাকে এবং সেখানেই প্রতিপালিত হয়ে থাকে। -[তাফসীরে কাবীর, মা'আরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

٦٤. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ قَعْرِ جَهَنَّمَ وَاَغْصَانُهَا تَرْتَفِعُ اِلَى دَرَكَاتِهَا .

৬৪. যাককূম এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে উত্থিত হবে। জাহান্নামের গহ্বর হতে আর তার ডালপালাসমূহ জাহান্নামের সর্বস্তরে প্রসারিত হবে।

٦٥. طَلْعُهَا الْمُشَبَّهُ بِطَلْعِ النَّخْلِ كَاَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ اَىِ الْحَيَّاتِ الْقَبِيْحَةِ الْمَنْظَرِ .

৬৫. তার মোচা (ছড়া) যা খেজুরের মোচার সদৃশ হবে যেন শয়তানের মাথা অর্থাৎ বিশ্রী দৃশ্যের সর্পসমূহ।

٦٦. فَاِنَّهُمْ اَىِ الْكُفَّارُ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا مَعَ قُبْحِهَا لِشِدَّةِ جُوْعِهِمْ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ .

৬৬. সুতরাং নিশ্চয় তারা অর্থাৎ কাফেররা অবশ্যই তা হতে ভক্ষণ করবে। এটা বিস্বাদ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার তীব্রতার কারণে। আর তা দ্বারা তারা পেট ভর্তি করবে।

٦٧. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ اَىْ مَاءٍ حَارٍّ يَشْرَبُوْنَهُ فَيَخْتَلِطُ بِالْمَاكُوْلِ مِنْهَا فَيَصِيْرُ شَوْبًا لَهُ .

৬৭. তারপর এটার সাথে তাদেরকে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ গরম পানি যা তারা পান করবে। ফলে তা ভক্ষিত বৃক্ষের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। আর এভাবে তা তার জন্য মিশ্রণ হবে।

٦٨. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ يُفِيْدُ اَنَّهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا لِشُرْبِ الْحَمِيْمِ وَاَنَّهُ لَخَارِجُهَا .

৬৮. অতঃপর অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে প্রজ্বলিত অগ্নি [জাহান্নাম]। এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, গরম পানি পান করানোর জন্য জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামের বাইরে আনা হবে। আর পানি হবে জাহান্নামের বাইরে।

٦٩. اِنَّهُمْ اَلْفَوْا وَجَدُوْا اٰبَاۤءَهُمْ ضَاۤلِّيْنَ .

৬৯. নিঃসন্দেহে তারা লাভ করেছে– পেয়েছে তাদের পিতৃপুরুষদের বিপথগামী।

٧٠. فَهُمْ عَلٰىٓ اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ يُزْعَجُوْنَ اِلَى اِتِّبَاعِهِمْ فَيُسْرِعُوْنَ اِلَيْهِ .

৭০. সুতরাং তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। তাদের অনুসরণে ব্যস্ত হয়ে তার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

٧١. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ .

৭১. তাদের পূর্বেও বিপথগামী হয়েছিল অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ অতীতকালের জাতিসমূহের মধ্য হতে।

٧٢. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ مِنَ الرُّسُلِ مُخَوِّفِيْنَ .

৭২. আর আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারীদেরকে। ভয় প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে।

٧٣. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ اَىْ عَاقِبَتُهُمُ الْعَذَابُ.

৭৩. সুতরাং ভেবে দেখ কি পরিণতি হয়েছিল তাদের যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। [অর্থাৎ] কাফেরদের অর্থাৎ তাদের পরিণাম ছিল আজাব।

٧٤. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهُمْ نَجَوْا مِنَ الْعَذَابِ لِاِخْلَاصِهِمْ فِى الْعِبَادَةِ اَوْ لِاَنَّ اللّٰهَ اَخْلَصَهُمْ لَهَا عَلٰى قِرَاءَةِ فَتْحِ اللَّامِ.

৭৪. তবে আল্লাহ তা'আলার খালেস বান্দাগণের কথা আলাদা অর্থাৎ ঈমানদারগণ। সুতরাং তারা আজাব হতে নাজাত পাবে ইবাদতের মধ্যে তাদের ইখলাসের কারণে। অথবা, এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইবাদতের জন্য খালিস [নির্দিষ্ট] করেছেন। لَامْ অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হওয়া অবস্থায় শেষোক্ত অর্থটি হবে।

তাহকীক ও তারকীব

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহর বাণী "اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত "الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. اَلْمُخْلَصِيْنَ -এর ل অক্ষরটি যবর যোগে اَلْمُخْلَصِيْنَ হবে। এটা জমহুরের কেরাত। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের জন্য খালিস (খাস) করেছেন।

২. اَلْمُخْلِصِيْنَ -এর ل অক্ষরটি যের বিশিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় আয়াতখানার অর্থ হবে– যারা আল্লাহর ইবাদতকে রিয়া ইত্যাদি হতে খালিস করেছে।

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ কি? আল্লাহর বাণী– "اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।

১. এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ তাদের পূর্বে বহু পূর্ববর্তীরাই বিপথগামী হয়েছে তবে আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ বিপথগামী হননি।

২. এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো "كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ" অর্থাৎ রাসূলগণ যাদেরকে সতর্ক করেছেন তাদেরকে পরিণামে আজাব ভোগ করতে হয়েছে। তবে আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ তথা ঈমানদারগণকে আজাব ভোগ করতে হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اِنَّهَا شَجَرَةٌ ... الْجَحِيْمِ" আয়াতের শানে নুযূল : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কুরআন মাজীদে সেই আয়াতসমূহ নাজিল হলো যাতে যাক্কুম বৃক্ষের কথা রয়েছে তখন আবূ জাহল তার সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলল, তোমাদের বন্ধু তথা মোহাম্মদ ﷺ বলে যে, অগ্নিতে একটি বৃক্ষ জন্মাবে– অথচ অগ্নি তো বৃক্ষকে ভস্ম করে জ্বালিয়ে ফেলে। আল্লাহর কসম, আমরা তো জানি যে, খেজুর এবং মাখনকে যাক্কুম বলে।

আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে ইরশাদ করেছেন– اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ الخ অর্থাৎ যাক্কুম খেজুর ও মাখন নয়; বরং যাক্কুম হলো এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামে জন্ম নিবে এবং তথায় থাকবে।

"اِنَّهَا شَجَرَةٌ ... الْجَحِيْمِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইতঃপূর্বেই জাহান্নামীদের অন্যতম খাদ্য হিসেবে যাক্কুম গাছের উল্লেখ করেছেন। এখানে পরপর কয়েকটি আয়াতে যাক্কুম গাছ সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝির অবসানের নিমিত্তে এর বিবরণ পেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যাক্কূম এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামের গহ্বরে জন্মাবে। আল্লাহ স্বীয় কুদরতে তাকে অগ্নিতেই সৃষ্টি করবেন এবং অগ্নিতেই এটা লালিত-পালিত হবে ও বৃদ্ধি পাবে।

যাক্কূম বৃক্ষের ছড়া [মোচা] বিভৎস দৃশ্যের সর্পের মাথার ন্যায় হবে।

ইমাম যামাখ্শরী (র.) লিখেছেন যে, সাধারণত খেজুর গাছের মোচাকে طَلْع বলে। এখানে اِسْتِعَارَةٌ তথা রূপকার্থে যাক্কূম বৃক্ষের জন্য طَلْع শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থগত ও শব্দগত উভয় দিক দিয়েই اِسْتِعَارَةٌ হতে পারে।

ইবনে কুতাইবা (র.) বলেছেন যে, যাক্কূমের ছড়া প্রতি বৎসর বের হয় বিধায় তাকে طَلْع বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত বিস্বাদ ও তিক্ত হবে। তা তক্ষণের কারণে পেট ফুলে যাবে। নাড়িভুঁড়ি পচে যাবে।

জাহান্নামীদের যাক্কূম খাওয়ার কারণ : জাহান্নামীরা যে শখ করে যাক্কূম ফল খাবে তা নয়; বরং জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকবে, তখন তাদেরকে যাক্কূম বৃক্ষ তক্ষণ করতে দেওয়া হবে। তারপর গরম পানি পানীয় হিসেবে দেওয়া হবে। মূলত এটাও তাদের জন্য এক প্রকারের শাস্তি হবে। তাদের পেটে এমন ক্ষুধার জ্বালা ও তাড়নার সৃষ্টি করা হবে যে, তারা তা ভক্ষণ করতে বাধ্য হবে। তা খাওয়ার পর গলা ফুলে ফোস্‌কা পড়ে যাবে। তখন তাদের ভীষণ পানির পিপাসা হবে। আর পান করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে উত্তপ্ত গরম পানি। –[খাযিন, কাবীর]

طَلْعُهَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা যাক্কূম বৃক্ষের ছড়ার উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন– طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِيْنِ অর্থাৎ এটার ছড়া শয়তানের মস্তকের ন্যায় বিশ্রী ও বিভৎস।

দুটি অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে কিভাবে তুলনা করা সম্ভব হলো? এখানে আল্লাহ তা'আলা যাক্কূম বৃক্ষের ছড়াকে শয়তানের মস্তকের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ যাক্কূম এমন একটি বৃক্ষ যা জাহান্নামে জন্মাবে এবং তথায় বড় হবে। মূলতঃ দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষের সাথে তার তুলনাই হয় না। দ্বিতীয়ত শয়তানের মাথার সাথে তাকে তুলনা করা হয়েছে অথচ মানুষ না শয়তানকে দেখেছে আর না শয়তানের মাথা অবলোকন করেছে। সুতরাং দু'টি অদেখা ও অচেনা বস্তুর মধ্যকার তুলনা মানুষ কিভাবে উপলব্ধি করতে পারবে? মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

* যাক্কূম বৃক্ষ যদিও তিক্ততা ও বিস্বাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষ হতে অত্যধিক জঘন্য ও মারাত্মক তথাপি আকার-আকৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষের সাথে এটা সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন– দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছু অপেক্ষা আখেরাতের সর্প-বিচ্ছু কোটি গুণ অধিক বিষধর হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আকারগত একটি মিল বিদ্যমান। সুতরাং দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষের মাধ্যমে আমরা জাহান্নামের যাক্কূম বৃক্ষের মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করতে পারি।

অপর দিকে শয়তান যদিও অদৃশ্য তথাপি তার সম্পর্কে সেই আদিকাল হতেই মানুষের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে। মানুষ সাধারণত ফেরেশতাকে সুন্দরের প্রতীক ও উপমা এবং শয়তানকে অসুন্দর ও কদর্যতার প্রতীক এবং উপমা হিসেবে গণ্য করে।

সুতরাং মানুষের মধ্যে প্রচলিত উক্ত চিরাচরিত ধারণার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'আলা যাক্কূম ফলের চরম কদর্যতা ও বিভৎসতাকে প্রকাশ করার জন্য তাকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করেছেন। বালাগাত তথা আরবি অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় এরূপ তুলনা করাকে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ বা কাল্পনিক তুলনা বলে।

* এক দল মুফাস্‌সির (র.) এখানে رُءُوسُ الشَّيَاطِيْنِ -এর অর্থ করেছেন– "বিভৎস দৃশ্যের সর্পের মাথা", আর এটা তো মানুষের জানাশুনা রয়েছে।

কারো কারো মতে, رُءُوسُ الشَّيَاطِيْنِ বিশ্রী মাথাবিশিষ্ট এক প্রকার গুল্ম। তার সাথে যাক্কূম গাছকে তুলনা করা হয়েছে। –[কাশ্শাফ, কাবীর, মা'আরিফ]

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন– এখানে ثُمَّ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। তিনি আয়াতখানার দু'টি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

এক. জাহান্নামবাসীরা অত্যন্ত বিস্বাদ ও তিক্ত যাক্কূম গাছের ফল দ্বারা তাদের উদর পূর্তি করবে। এতে তাদের গলায় ফোসকা পড়ে যাবে। তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন তারা পিপাসায় আর্তনাদ করতে থাকবে। এর সুদীর্ঘ কাল পর তাদেরকে জাহান্নামের বহির্ভাগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তথায় গরম উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা এখানে জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়ের বিবরণ পেশ করেছেন। প্রথমত তাদের নিকৃষ্টতা ও কদর্যতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পানীয়ের জঘন্যতা ও ভয়াবহতার উল্লেখ করেছেন। এখানে ثُمَّ শব্দটি উল্লেখের তাৎপর্য হলো তাদের খাদ্য অপেক্ষাও পানীয় নিকৃষ্ট হবে। –[কাবীর, কুরতবী ও জালালাইন]

"ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيْمِ" আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "গরম পানি পান করানোর পর পুনরায় জাহান্নামীরা জাহান্নামেই ফিরে যাবে।" সুতরাং তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ফুটন্ত পানি পান করার সময় জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের হাঁকিয়ে জাহান্নাম হতে এমন একটি ঝর্ণার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যার পানি টগবগ করে উতরাতে থাকবে। পানি পান করানোর পর পুনরায় তাদেরকে জাহান্নামের অভ্যন্তরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

–[কাশ্‌শাফ, কুরতুবী, কাবীর ও জালালাইন]

إِنَّهُمْ ...... يُهْرَعُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "কাফের ও মুশরিকরা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে গোমরাহ পেয়েছে এবং তারা পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করে কুফরির পথে দৌড়ে চলেছে।"

কাফেররা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা কখনো চিন্তা করে দেখেনি যে, বাপ-দাদার যুগ হতে যেসব রেওয়াজ ও পদ্ধতিসমূহ চলে এসেছে তা সঠিক না ভুল; বরং তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণে ছুটে চলেছে দ্রুতবেগে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) তাফসীরে ইবনে কাছীরে লিখেছেন, আল্লাহ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, আমি কাফের ও মুশরিকদেরকে এ জন্য উপরিউক্ত আজাব দিয়েছি যে, তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে গোমরাহ পেয়েছে এবং না বুঝে শুনে তাদের অনুকরণ করেছে। মূলত বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণই তাদেরকে ইহ-পরকালের কঠিন আজাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে অতীতাকালের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। মক্কার মুশরিকরাই যে, প্রথম খোদাদ্রোহীতার সবক গ্রহণ করেছে তা নয় বরং তাদের পূর্বেও অধিকাংশ লোকেরাই বিপথগামী হয়েছে। আমি এ লোকদের ন্যায় তাদের নিকটও রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা রাসূলের আনুগত্য করেনি, তাদের কথা মানেনি। রাসূলগণ (আ.) তাদেরকে হাজারোভাবে বুঝিয়েছিলেন। তাদেরকে দিবা-রাত্রি দীনে হকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। রাসূলগণের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। বরং উল্টো তাদের এই চরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরম বন্ধু রাসূলগণের উপর তারা অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। পরিণামে তাদের উপর নেমে এসেছিল আল্লাহর পক্ষ হতে আজাব ও গজব, ধ্বংস যজ্ঞে পরিণত হয়েছিল তাদের বিলাস বহুল বাড়ি-ঘর। সুতরাং তোমরা তাদের হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার এবং নিঃসন্দেহে জেনে রাখ! রাসূলের বিরোধিতায় অটল থাকলে তোমাদেরও হবে সেই একই পরিণতি তোমাদের ধ্বংসও হবে অনিবার্য।

হ্যাঁ, আমার কিছু মুখলিস বান্দা যারা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারা যেমন সে কালেও ছিল তেমনটি এ কালেও আছে। তারা আজাব হতে পরিত্রাণ লাভ করে চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করবে।

অনুবাদ :

٧٥. وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ بِقَوْلِهٖ رَبِّ اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ لَهٗ نَحْنُ اَىْ دَعَانَا عَلٰى قَوْمِهٖ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِالْغَرَقِ .

৭৫. আর অবশ্যই আমাকে নূহ আহ্বান করেছিল তার এ উক্তির দ্বারা "প্রভু হে! আমি পরাস্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন"। সুতরাং কতই না উত্তম সাড়াদানকারী আমি তার জন্য। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে আমার নিকট ফরিয়াদ করেছিল। তখন আমি তার জাতিকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছি।

٧٦. وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ اَىِ الْغَرَقِ .

৭৬. আর আমি তাকে এবং তার আহলে সম আদর্শে বিশ্বাসীদের -কে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি : অর্থাৎ পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে।

٧٧. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ نَسْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَوْلَادٍ سَامٌ وَهُوَ اَبُو الْعَرَبِ وَفَارِسَ وَالرُّوْمِ وَحَامٌ وَهُوَ اَبُو السُّوْدَانِ وَيَافِثُ اَبُو التُّرْكِ وَالْخَزَرِ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَا هُنَالِكَ .

৭৭. আর আমি তার বংশধরদেরকেই (পৃথিবীতে) অবশিষ্ট রেখেছি। সুতরাং (বর্তমান পৃথিবীর) সকল মানুষই তাঁর নসল (বংশধর) হতে সৃষ্টি হয়েছে। হযরত নূহের তিন সন্তান (জীবিত) ছিল। এক. সাম– তিনি আরব, পারস্য (ইরান) ও রোমের জনক। দুই. হাম– তিনি হলেন সুদানের জনক। তিন. ইয়াফাস– তিনি তুর্কী, খাযরাজ, ইয়াজুজ-মাজুজ ও তথাকার অন্যান্য বংশের জনক।

٧٨. وَتَرَكْنَا اَبْقَيْنَا عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَنًا فِى الْاٰخِرِيْنَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاُمَمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

৭৮. আর আমি রেখেছি বাকি রেখেছি তার জন্য উত্তম প্রশংসা পরবর্তীগণের মধ্যে আম্বিয়াগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত জাতিসমূহের জন্য।

٧٩. سَلٰمٌ مِّنَّا عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ .

৭৯. শান্তি বর্ষিত হোক আমার পক্ষ হতে নূহের উপর সমগ্র বিশ্বের মাঝে।

٨٠. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

৮০. নিশ্চয় আমি তদ্রূপ যদ্রূপ প্রতিদান দিয়েছি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি সৎকর্মশীলদেরকে।

٨١. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ .

৮১. নিঃসন্দেহে সে আমার ঈমানদার বান্দাগণের মধ্যে অন্যতম ছিল।

٨٢. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ كُفَّارَ قَوْمِهٖ .

৮২. আর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম অন্যদেরকে (অর্থাৎ) তার জাতির কাফেরদেরকে।

٨٣. وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ اَىْ مِمَّنْ تَابَعَهٗ فِىْ اَصْلِ الدِّيْنِ لَاِبْرٰهِيْمَ وَاِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ اَلْفَانِ وَسِتُّمِائَةٍ وَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَكَانَ بَيْنَهُمَا هُوْدٌ وَصَالِحٌ .

৮৩. আর তার অনুসারীদের মধ্যে অর্থাৎ দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল তাদের মধ্যে– অবশ্যই ইবরাহীম (আ.)ও একজন ছিলেন। যদিও তাঁদের উভয়ের মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে। আর তা হলো দু হাজার ছয়শত চল্লিশ বৎসর। তাঁদের উভয়ের মাঝে হযরত হূদ ও সালিহ (আ.) অতিবাহিত হয়েছেন।

٨٤. اِذْ جَآءَ اَىْ تَابَعَهُ وَقْتَ مَجِيْئِهِ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ مِنَ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ .

৮৪. যখন তিনি আগমন করেছিলেন, অর্থাৎ আগমনের সময় তাঁর অনুসরণ করেছেন– তাঁর প্রভুর নিকট বিশুদ্ধ অন্তরসহ-সন্দেহ ইত্যাদি হতে বিশুদ্ধ চিত্তে।

٨٥. اِذْ قَالَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لَهُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مُوَبِّخًا مَاذَا مَا الَّذِىْ تَعْبُدُوْنَ .

৮৫. যখন তিনি বলেছিলেন তাঁর উক্ত অবস্থায়, যা তাঁর মধ্যে সর্বক্ষণ থাকত– তাঁর পিতা ও জাতিকে লক্ষ্য করে তিরস্কার করার জন্য কিসের কোন বস্তুর তোমরা ইবাদত কর?

তাহকীক ও তারকীব

"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত "تَرَكْنَا" -এর مَفْعُوْلٌ কি? আলোচ্য আয়াতাংশে "تَرَكْنَا" -এর مَفْعُوْلٌ -এর ব্যাপারে দ্বিবিধ সম্ভাবনা রয়েছে।

ক. "تَرَكْنَا" -এর مَفْعُوْلٌ হলো "ثَنَاءً حَسَنًا" [অর্থাৎ উত্তম প্রশংসা] যা মাহযূফ [উহ্য] রয়েছে।

খ. "تَرَكْنَا" -এর مفعول হলো "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ" অর্থাৎ "تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ اَنْ يُّسَلِّمُوْا عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার সম্পর্কে এ ব্যবস্থা করে রেখেছি যেন কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হওয়ার জন্য দোয়া করে।

"سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ" -এর নাহবী তারকীব : এখানে سَلَامٌ মুবতাদা এবং عَلٰى نُوْحٍ এটা نَازِلٌ -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এর خَبَرٌ মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

আবার তারকীবে উক্ত বাক্যটির অবস্থান সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. আলোচ্য বাক্য "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ" এটা পূর্ববর্তী تَرَكْنَا ফে'লের مُفَسِّرٌ

২. এটা تَرَكْنَا ফি'লের مَفْعُوْلٌ -এর مُفَسِّرٌ অর্থাৎ "تَرَكْنَا عَلَيْهِ شَيْئًا" আমি তার ব্যাপারে কিছু অবশিষ্ট রেখেছি। আর তা (شَيْئًا) হলো "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ"

৩. এটার পূর্বে قُلْنَا শব্দটি মাহযূফ রয়েছে। বাক্যটি হবে– قُلْنَا سَلَامٌ عَلٰى الخ এমতাবস্থায় এটা قُلْنَا -এর مَفْعُوْلٌ হবে।

কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশরী (র.) নিম্নোক্তভাবে এর তাফসীর করেছেন– "وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ وَهِىَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ" আর আমি পরবর্তীতে মধ্যে এ উক্তিটির প্রচলন করে দিয়েছি তা হলো "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ"

"وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَاِبْرَاهِيْمَ" আয়াতে "شِيْعَتِهِ" -এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : এখানে شِيْعَتِهِ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعٌ বা প্রত্যাবর্তনস্থল-এর ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. شِيْعَتِهِ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعٌ হলো হযরত নূহ (আ.)। যার উল্লেখ পূর্বে রয়েছে। অর্থাৎ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ نُوْحٌ لَاِبْرَاهِيْمَ দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পূর্ববর্তী নবী হযরত নূহ (আ.)-এর পন্থানুসারী। এ ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের মত ও পথ এক ও অভিন্ন। ইমাম যামাখশরী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের উভয়ের মধ্যে– ২৬৪০ বৎসরের ব্যবধান ছিল। হযরত হুদ (আ.) ও হযরত সালিহ (আ.) তাদের মাঝখানে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন। এটাই জমহুরের মাযহাব এবং গ্রহণযোগ্যও বটে। কেননা, ইতঃপূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রকাশ্য প্রকাশভঙ্গী এটাকেই সমর্থন করে।

২. شِيْعَتِهِ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعْ হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ। অর্থাৎ "وَاِنَّ مِنْ شِيْعَةِ مُحَمَّدٍ لَاِبْرَاهِيْمُ" হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মত ও পথের অনুসারী। এটা ইমাম কালবী (র.)-এর মাযহাব। কিন্তু কুরআনের প্রকাশভঙ্গির বিরোধী হওয়ার দরুন এটা গ্রহণযোগ্য নয়। –[জালালাইন, কাশশাফ, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের নিকট সতর্ককারী নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়নি; বরং তাদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ হতে উক্ত ইজমালী আলোচনার বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকজন নবী ও রাসূলের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সূরা নূহ, হূদ ও অন্যান্য সূরায়ও হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কিত কাহিনীসমূহ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে দু'জন নবীর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই হযরত নূহ (আ.)-এর জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতএব আমরাও প্রথমত তাঁর সংক্ষিপ্তাকারে জীবন কাহিনী উপস্থাপন করলাম।

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী : মতান্তরে এক লাখ কি দুই লাখ নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. হযরত আদম (আ.) হতে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত। এ শ্রেণির নবী ও রাসূলগণের কোনো শরিয়ত ছিল না। তাঁরা শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিতেন এবং আদব-কায়দা ও জীবন-যাপন প্রণালী শিক্ষা দিতেন।

দুই. হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত। এ শ্রেণির নবী-রাসূলগণকে সংক্ষিপ্ত শরিয়ত তথা হালাল-হারাম ও ইবাদতের বিধান প্রদান করা হয়েছে।

তিন. হযরত মূসা (আ.)-এর পর হতে মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত। এ যুগে শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ বিধান নাজিল হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর বংশ পরিচিতি : নূহ ইবনে লামেক ইবনে মাতুশালেহ ইবনে আখনুক ইবনে ইয়ারুদ মুহালয়িল ইবনে কিনান ইবনে আনুশ ইবনে শিছ ইবনে আদম (আ.)। হযরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম ছিল আব্দুল গাফ্ফার। তিনি সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতেন বলে তার উপাধি হয়েছে নূহ।

কুরআন মাজীদের ২৮টি সূরায় ৪৩টি স্থানে হযরত নূহ (আ.)-এর আলোচনা রয়েছে।

কথিত আছে যে, হযরত আদম (আ.) হতে হযরত নূহের যুগের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বৎসর যাবৎ শিরক ছিল না। মানুষ তখন এক আল্লাহর ইবাদত করত। বহু দিন পর মানুষ তাওহীদ হতে বিচ্যুত হয়ে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে রাসূল করে পাঠান। হযরত নূহ (আ.) লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর জাতি উদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর প্রভৃতি প্রতিমা ও সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদির পূজা করছে।

হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয় শত বৎসর পর্যন্ত তাঁর জাতিকে হেদায়েত করেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে মাত্র ৪০ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষ তার উপর ঈমান আনয়ন করে। অন্যান্যরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করে। পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতির হেদায়েত হতে নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন তিনি গোত্রের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট বদদোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে একটি বিরাট নৌকা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিলেন। শীঘ্রই যে, মহা প্লাবন আসছে তাও জানিয়ে দিলেন। নৌকা তৈরির পর হযরত নূহ (আ.) ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিলেন। শুরু হলো মহাপ্লাবন। সেই প্লাবনে সমস্ত কাফের ও মুশরিকরা ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু ঈমানদারগণ যারা তাঁর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তারাই রেহাই পেলেন। দীর্ঘ সাত মাস পর হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আ.)-এর একজন পুত্র কেনান মুশরিক ছিল, তুফানে সেও নিহত হয়। তার জন্য হযরত নূহ (আ.) পিতৃস্নেহে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ তো গৃহীত হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা এ জন্য নবীকে তিরস্কার করেছেন।

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ও বরকতে জাহাজের সমস্ত ঈমানদার নারী-পুরুষ ও প্রাণীকুলসহ জাহাজ হতে সহীহ সালামতে অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে পরবর্তী প্রজন্ম হযরত নূহ (আ.)-এর আওলাদ হতে সৃষ্টি হয়েছে। অপরাপর ঈমানদারগণ হতে বংশধারা অবশিষ্ট ছিল না। এ জন্য হযরত নূহ (আ.)-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়ে থাকে।

হযরত নূহ (আ.) নবী-রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয়ু লাভ করেছেন। তিনি মতান্তরে মোট ১৩০০ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করা হয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির মধ্যে প্রতিমা-পূজা অনুপ্রবেশ পদ্ধতি : সূরা নূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন- . "وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا" আর হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির মুশরিক লোকেরা বলাবলি করতে লাগল- "তোমরা তোমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মোটেই পরিত্যাগ করবে না। বিশেষত উদ, সুয়া, ইয়াগুছ ও ইয়াউকের ইবাদত পরিহার করো না।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) হতে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত কতিপয় জাতি একেশ্বরবাদী ও সৎকর্মশীল ছিলেন। তাদের মধ্যে বহু বুজুর্গ ও দীনদার লোক অতিবাহিত হয়েছে। সেই বুজুর্গদের বহু অনুসারী ও অনুগামী ছিল। অনুসারীরা তাদের বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাদের মূর্তি তৈরি শুরু করল। তাদের ধারণা ছিল এতে উক্ত বুজুর্গগণের অনুসরণ ও অনুকরণে সুবিধা হবে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের উত্তরসূরিদেরকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করল। তাদেরকে বুঝাল যে, এ প্রতিমাগুলোর পূজার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। এতে তাদের আত্মা শান্তি পাবে। এভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর গোত্রের মধ্যে মূর্তি পূজা তথা শিরক অনুপ্রবেশ করল। প্রথম প্রথম তো তারা প্রতিমা পূজার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতও করত। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর ইবাদত পরিহার করে পুরোপুরি মূর্তি পূজায় আত্মনিয়োগ করল।

وَلَقَدْ نَادَانَا ... الْمُجِيبُونَ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করেছেন, আর হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির হেদায়েত হতে নিরাশ হয়ে এবং তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট বদদোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁর জাতির কাফেরদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

অত্র আয়াতে উল্লেখ নেই যে, হযরত নূহ (আ.) কখন এবং কি জন্য আল্লাহ তা'আলাকে ডেকেছেন। সুতরাং এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন।

- কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ যেন নৌকায় উঠে পড়েন। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আ.) তাই করলেন। অতঃপর প্রচণ্ড ঝড়সহ বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো এবং জমিনের নিম্নদেশ হতে পানি বের হতে শুরু করল। মোটকথা এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হলো। সমস্ত পৃথিবী সেই প্লাবনের পানিতে সম্পূর্ণ তলিয়ে গেল। তখন হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই প্লাবন হতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অত্র আয়াতে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- এক দল মুফাস্‌সির (র.) বলেছেন যে, হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয় শত বৎসর যাবৎ তাঁর কওমকে হেদায়েত করেছিলেন– তাদেরকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু গুটি কতেক নর-নারী ব্যতীত কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি; বরং তারা তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়েছিল; তাঁকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি বাধ্য হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেছিলেন। তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন।

বস্তুত হযরত নূহ (আ.)-এর উক্ত দোয়াকে অপর দু'টি আয়াতে আরও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি আয়াতে তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ হয়েছে– "رَبِّىْ اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ" অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) বলেছেন, হে প্রভু! আমি তো পরাস্ত হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। অন্যত্র বলা হয়েছে– "رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا" "হে প্রভু! জমিনের উপর কাফেরদের একটি ঘর-বাড়িও অবশিষ্ট রেখো না......"।

দোয়া কবুল করা মহা নিয়ামত ছিল : আল্লাহ অত্র আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ.) আমার নিকট দোয়া করেছিলেন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছি। আল্লাহ "নূহের দোয়া কবুল করেছেন" এটা বুঝাতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ" [সুতরাং আমি কতইনা উত্তম জবাব প্রদানকারী।]

আলোচ্য বাক্যটি বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ–

- উক্ত দোয়া কবুল করতে গিয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে বহুবচনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।
- আলোচ্য আয়াতে فَا অক্ষরটি নতীজাহ বা ফলাফল বুঝানোর জন্য হয়েছে। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর আন্তরিক যথার্থ আবেদনের ফলেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন।
- আল্লাহ তা'আলা নিজেই উক্ত জবাবকে উত্তম হিসেবে গণ্য করেছেন।

আলোচ্য বাক্যে لَامْ -এর অর্থ : আলোচ্য বাক্যে فَلَنِعْمَ -এর মধ্যে لَامْ অক্ষরটি একটি অনুক্ত কসমের জবাব হয়েছে। তা ছাড়া এখানে مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ ও অনুক্ত রয়েছে। মূলত বাক্যটি এরূপ হবে– "فَوَاللّٰهِ لَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ نَحْنُ" "আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি তার উত্তম জবাবদাতা।"

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য আরবিতে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলায় অনুবাদে একবচন হবে। নতুবা, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

"وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبَاقِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, "আমি নূহ (আ.)-এর বংশধরদেরকেই কেবলমাত্র অবশিষ্ট রেখেছি।"

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন–

১. এক দল মুফাস্‌সির বলেছেন, এখানে শুধুমাত্র আরবের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীতে একমাত্র নূহ (আ.)-এর আওলাদের দ্বারা আরবকে আবাদ করা হয়েছে। কেননা অন্যান্যরা তুফানে মৃত্যুবরণ করেছে। আর হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার তুফান শুধুমাত্র আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যত্র তা বিস্তার লাভ করেনি।

২. আরেক দল মুফাস্‌সিরের মতে, এখানে "বংশধর" দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর উপর যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের সকলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার তুফান বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে যারা হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল শুধু তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে আবাদ করেছেন।

৩. জমহুর মুফাস্‌সিরে কেরামের মতে, এখানে "বংশধর"-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর রক্ত সম্পর্কীয় তথা তার সন্তানগণকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের মতে আল্লাহ তা'আলা প্লাবনোত্তর কালে হযরত নূহ (আ.)-এর তিন ছেলে– সাম, হাম ও ইয়াফসের বংশধরগণের দ্বারা জমিনকে আবাদ করেছেন। তাঁর উক্ত তিন পুত্রই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। অবশিষ্ট এক পুত্র কেনান– তাঁর উপর ঈমান আনেনি। ফলে সে প্লাবনের সময় মৃত্যুবরণ করেছে। এমনকি হযরত নূহ (আ.)-এর সুপারিশেও আল্লাহ তা'আলা কেনানকে রেহাই দেননি।

সুতরাং সাম হলেন আরব ও পারস্যবাসী ও অন্যান্যগণের জনক। আরেক পুত্র হাম-এর বংশধর হলো আফ্রিকার অধিবাসীগণ কেউ কেউ হিন্দুস্থানের অধিবাসীগণকেও তার বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র ইয়াফসের বংশধর হলো তুর্কী-মঙ্গোলীয় ও ইয়াজুজ-মাজুজ-এর সন্তান-সন্ততি। যারা নৌকায় আরোহণ করে আত্মরক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর উক্ত তিন পুত্র ব্যতীত অন্য কারো সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করেনি।

কুরআনে কারীমের প্রকাশভঙ্গি এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় অভিমতটিই সর্বাধিক শক্তিশালী; জমহুর মুফাস্সিরগণ তাকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম তিরমিযী (র.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ (র.) একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে- হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'সাম আরবদের জনক, হাম আফ্রিকাবাসী ও ইয়াফস রোমীয়দের জনক।' উক্ত হাদীসখানাকে ইমাম তিরমিযী (র.) হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিম (র.) বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস। -[রূহুল মা'আনী]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "আমি পরবর্তীদের মধ্যে এ কথাটির প্রচলন রেখে দিয়েছি যে, বিশ্বে হযরত নূহ (আ.)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" অর্থাৎ নূহের (আ.) পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে আমি তাদের নিকট হযরত নূহ (আ.)-কে এত সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছি যে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য শান্তির দোয়া করতে থাকবে। এ কারণেই বাস্তবেও দেখা যায় যারা নিজেদেরকে আসমানি কিতাবের ধারক ও বাহক বলে দাবি করে তারা সকলেই হযরত নূহ (আ.)-এর পবিত্রতা ও নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করে। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই তাঁকে নেতা হিসেবে গণ্য করে থাকে।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেই ঘটনাদ্বয়ে তিনি নিছক আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ পাওয়ার জন্য মহা কুরবানি দিয়েছেন। প্রথম ঘটনাটি হলো তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলার জন্য কাফেরদের ষড়যন্ত্রের বিষয় সম্পর্কীয়।

সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত নূহ (আ.)-এর পন্থানুসারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আয়াতে উল্লেখিত "شِيعَةٌ" শব্দটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আরবি ভাষায় "شِيعَةٌ" এমন দল ও সম্প্রদায়কে বলে যারা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে এক ও অভিন্ন।

আর প্রকাশ্যতঃ এখানে شِيعَتِهِ যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো হযরত নূহ (আ.)। এমতাবস্থায় অর্থ হবে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পূর্ববর্তী নবী হযরত নূহ (আ.)-এর পথ ও পন্থার উপর ছিলেন। আর দীনের বুনিয়াদী বিষয়াদিতে উভয় এক ও অভিন্ন ছিলেন। তাছাড়া তাঁদের উভয়ের শরিয়তের মধ্যেও সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল।

উল্লেখ যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) ও হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর মাঝখানে ২৬৪০ বৎসরের ব্যবধান ছিল। আর তাঁদের উভয়ের মাঝখানে হযরত হূদ ও সালিহ (আ.) নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। -[জালালাইন, কাশ্‌শাফ]

"إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতখানার অর্থ দাঁড়ায়- "যখন তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট পরিষ্কার-নির্মল অন্তঃকরণসহ আগমন করলেন।" এখানে তাঁর প্রতিপালকের নিকট আগমন করার অর্থ হলো- "আল্লাহর দিকে রুজু করা, আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। তাঁর ইবাদত করা। অত্র আয়াতে 'কালবে সালীম' নির্মল অন্তরের শর্তারোপ করত এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতকারীর অন্তর গলদ আকীদা-বিশ্বাস নিন্দনীয় জযবা হতে মুক্ত না হবে। যদি গলদ আকীদা-বিশ্বাসের সাথে কোনো ইবাদত করে, তাহলে যত মেহনতই করুক না কেন তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ যদি ইবাদতকারীর আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোনো পার্থিব ফায়েদা হাসিলের উদ্দেশ্যে হয় তবে তাও প্রশংসনীয় হবে না। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর "রুজু ইলাল্লাহ" (আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া) সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটিমুক্ত ও খালিস ছিল। তার অন্তঃকরণে না ছিল কোনোরূপ ভ্রান্ত আকীদার ছাপ, আর না ছিল কপটতা ও কৃত্রিমতার সংমিশ্রণ।

অনুবাদ :

٨٦. اَئِفْكًا فِىْ هَمْزَتَيْهِ مَا تَقَدَّمَ اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ وَاِفْكًا مَفْعُوْلٌ لَهُ وَاٰلِهَةً مَفْعُوْلٌ بِهِ لِتُرِيْدُوْنَ وَالْاِفْكُ اَسْوَءُ الْكِذْبِ اَىْ اَتَعْبُدُوْنَ غَيْرَ اللّٰهِ .

৮৬. তবে কি মিথ্যা-মনগড়া – এর হামযাদ্বয়ে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত কেরাতসমূহ প্রযোজ্য হবে। উপাস্যদেরকে কামনা করছ আল্লাহ ব্যতীত? এখানে اِفْكًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهُ এবং اٰلِهَةً -এর مَفْعُوْلٌ بِهِ -এর تُرِيْدُوْنَ হয়েছে। আর اِفْكٌ হলো নিকৃষ্টতম মিথ্যা। অর্থাৎ তোমরা কি গায়রুল্লাহর ইবাদত করছ?

٨٧. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِذْ عَبَدْتُّمْ غَيْرَهُ اَنَّهُ يَتْرُكُكُمْ بِلَا عِقَابٍ لَا وَكَانُوْا نَجَّامِيْنَ فَخَرَجُوْا اِلٰى عِيْدٍ لَهُمْ وَتَرَكُوْا طَعَامَهُمْ عِنْدَ اَصْنَامِهِمْ زَعَمُوْا التَّبَرُّكَ عَلَيْهِ فَاِذَا رَجَعُوْا اَكَلُوْهُ وَقَالُوْا لِلسَّيِّدِ اِبْرَاهِيْمَ اُخْرُجْ مَعَنَا .

৮৭. তাহলে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? তোমরা যদি গায়রুল্লাহর ইবাদত কর তবে কি তিনি তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবেন? কখনই না। আর তারা নক্ষত্রভক্ত (বা জ্যোতিবির্দ্যায় বিশ্বাসী) ছিল। সুতরাং একবার তারা তাদের এক মেলায় গমন করল এবং তাদের খাবার তাদের প্রতিমাগুলোর সম্মুখে রাখল। এটাকে তারা বরকত মনে করত। সুতরাং মেলা হতে ফিরে এসে তা ভক্ষণ করত। নেতা ইবরাহীম (আ.)-কেও তারা বলল, আমাদের সাথে চলুন।

٨٨. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ اِيْهَامًا لَهُمْ اَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا لِيَتَّبِعُوْهُ .

৮৮. অনন্তর তিনি তারকারাজির প্রতি একবার তাকালেন – তাদের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি করার জন্য যে, তিনি তাদের উপর নির্ভর করেন। যাতে তারা তাঁর কথা মেনে নেয়।

٨٩. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ عَلِيْلٌ اَىْ سَاَسْقَمُ .

৮৯. অতঃপর বললেন, আমি অসুস্থ রুগ্ণ, অর্থাৎ শীঘ্রই আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

٩٠. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ اِلٰى عِيْدِهِمْ مُدْبِرِيْنَ .

৯০. সুতরাং তারা চলে গেল তাঁর নিকট হতে তাদের মেলার দিকে তাকে পশ্চাতে রেখে।

٩١. فَرَاغَ مَالَ فِىْ خُفْيَةٍ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ وَهِىَ الْاَصْنَامُ وَعِنْدَهَا الطَّعَامُ فَقَالَ اِسْتِهْزَاءً اَلَا تَاْكُلُوْنَ فَلَمْ يَنْطِقُوْا فَقَالَ .

৯১. অতঃপর তিনি গমন করলেন গোপনে গেলেন তাদের উপাস্য দেবতাগুলোর নিকট। আর তারা হলো প্রতিমা– তাদের সম্মুখে ছিল খাবার এবং বললেন, উপহাস করে– তোমরা ভক্ষণ করতেছ না কেন? কিন্তু প্রতিমাগুলো কিছুই বলল না। তখন তিনি বললেন–

٩٢. مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ فَلَمْ يُجِبْ .

৯২. তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

٩٣. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ بِالْقُوَّةِ فَكَسَّرَهَا فَبَلَغَ قَوْمَهُ مَنْ رَاٰهُ .

৯৩. অতঃপর তিনি তাদের উপর সজোরে আঘাত করলেন, শক্তিমত্তার সাথে। সুতরাং তাদের ভেঙ্গে ফেললেন। এ ঘটনা যে প্রত্যক্ষ করল সে তার সংবাদ তার কওমের নিকট পৌঁছে দিল।

٩٤. فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ اَىْ يُسْرِعُوْنَ الْمَشْىَ فَقَالُوْا نَحْنُ نَعْبُدُهَا وَاَنْتَ تُكَسِّرُهَا .

৯৪. তখন কওমের লোকেরা তার নিকট ছুটে আসল; অর্থাৎ তারা দ্রুত ছুটে আসল এবং তারা বলল, আমরা তাদের ইবাদত করি, আর তুমি তাদের ভেঙ্গে ফেলবে?

তাহকীক ও তারকীব

"اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ الخ" এর মধ্যে اِفْكًا শব্দের মহল্লে ই'রাব কি? অত্র আয়াতে اِفْكًا শব্দটি বিভিন্ন কারণে মহল্লান মানসূব হয়েছে।

ক. এটা تُرِيْدُوْنَ ফি'লের مَفْعُوْل لَهُ মূল বাক্যটি হবে- "اَتُرِيْدُوْنَ اٰلِهَةً مِنْ دُوْنِهٖ اِفْكًا" তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি মিথ্যা উপাস্য কামনা কর। এখনে অধিক গুরুত্বারোপের জন্য مَفْعُوْل لَهُ -কে فِعْل ও مَفْعُوْل بِهٖ -এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে।

খ. এটা تُرِيْدُوْنَ ফে'লের مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। অর্থাৎ "تُرِيْدُوْنَ اِفْكًا"

গ. এটা تُرِيْدُوْنَ ফে'লের যমীর হতে حَالْ হতে পারে। অর্থাৎ "اَتُرِيْدُوْنَ اٰلِهَةً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰفِكِيْنَ"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَنَظَرَ نَظْرَةً الخ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কওম বৎসরের একটি বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। সে দিবস যখন আসল তখন কওমের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দাওয়াত দিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইব্রাহীম (আ.) মেলায় অংশ গ্রহণ করলে তাদের দীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। আর তার নতুন দীনের দাওয়াত হতে ফিরে আসবে।

কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) উক্ত ঘটনা হতে অন্যভাবে উপকৃত হওয়ার পরিকল্পনা করলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, যখন গোত্রের লোকেরা মেলায় চলে যাবে তখন তিনি প্রতিমার ঘরে ঢুকে তাদের ভেঙ্গে ফেলবেন। যাতে তারা ফিরে এসে স্বচক্ষে তাদের মাবুদদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। হয়তো দেবতাদের অপরাগতা ও দুর্দশা দেখে তাদের কেউ কেউ ঈমানও গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক হতে বিরত থাকতে পারে। এ কারণে তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু এভাবে অস্বীকার করলেন যে, প্রথমত তারকাদের প্রতি একবার গভীরভাবে নজর করলেন তারপর বললেন, "আমি অসুস্থ"। কওমরে লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে মেলায় চলে গেল।

ইবরাহীম (আ.) নক্ষত্রের প্রতি তাকালেন কেন? হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওমের লোকেরা যখন তাঁকে মেলায় যেতে বলল তখন তিনি নক্ষত্রের প্রতি তাকালেন এবং অসুস্থতার অজুহাতে যেতে অপারগ বলে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি নক্ষত্রের দিকে কেন তাকালেন? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে একাধিক মতামত পাওয়া যায়।

১. এক দল মুফাস্সিরের মতে এটা একটি গতানুগতিক ব্যাপার ছিল। ঘটনাচক্রেই তা সংঘটিত হয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে যেয়ে মানুষ কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন তার কওমের লোকেরা মেলায় যাওয়ার আহ্বান করল তখন তিনি ভাবছিলেন যে, কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। উক্ত চিন্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি অকস্মাৎ আকাশের দিকে তাকালেন এবং তাদের জবাব দিলেন।

২. জমহুর মুফাস্সিরগণ বলেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ঘটনাক্রমে সিতারার দিকে তাকাননি; বরং এর পিছনে বিশেষ রহস্য নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে– তাঁর জাতি জ্যোতির্বিদ্যার সাথে অত্যন্ত পরিচিত এবং তার ভক্ত ছিল। তারা তারকা দেখে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করত। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) সিতারার দিকে তাকিয়ে এ জন্য জাওয়াব দিয়েছেন– যাতে কওমের লোকেরা বুঝে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তার অসুস্থতার ব্যাপারে যা বলছে তা মনগড়া নয়; বরং সে তারকার গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা বলেছে। যদিও খোদ হযরত ইবরাহীম (আ.) জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না; তবুও মেলায় অংশ গ্রহণ করতে বিরত থাকার জন্য তিনি উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন– যা কওমের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি মুখে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনো হাওলা দেননি, আর এটাও বলেননি যে, নক্ষত্র দেখে আমি তাদের হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি। বরং শুধু তারকার প্রতি তাকিয়ে দেখেছেন সেহেতু এতে তাঁর মিথ্যার সাথে জড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এটার দ্বারা কি জ্যোতিষশাস্ত্রের সহযোগিতা করেছেন? হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা সন্দেহ হতে পারে যে, তিনি তার উক্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারা তাঁর সেই কওমকে সহযোগিতা করেছেন যারা শুধুমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং নক্ষত্রকে পৃথিবীর ঘটনাবলির ব্যাপারে– مُؤَثِّر حَقِيْقِى (প্রকৃত সংঘটক) মনে করত।

তবে উক্ত সন্দেহ সঠিক নয়। কেননা যদি ইব্রাহীম (আ.) পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে হুশিয়ার করে না দিতেন তাহলে উক্ত অভিযোগ যথার্থ হতো। তা ছাড়া তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই তো এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং এ অস্পষ্ট আমলের দ্বারা কাফেরদের সহযোগিতা করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো মেলায় অংশ গ্রহণ হতে বিরত থাকা। যাতে হকের দাওয়াত দানের জন্য অধিক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কৌশল ছিল। কাজেই তার উপর কোনো যথার্থ অভিযোগ উঠতে পারে না।

শরিয়তে জ্যোতিষশাস্ত্রের স্থান : এটা তো সকলেরই জানা যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন যা মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রত্যেকেই পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন– সূর্যের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়ার কারণে গরম ও ঠাণ্ডার সৃষ্টি হওয়া। চন্দ্রের উঠা-নামার দ্বারা সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হওয়া। এখানে কেউ কেউ তো বলে থাকেন যে, ঐ নক্ষত্ররাজির প্রভাব তো তাই যা বাহ্যত অনুভূত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে কেউ কেউ দাবি করে থাকে যে, তা ব্যতীতও তারকারাজির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের জীবনের অধিকাংশ বিষয়কে প্রভাবিত করে থাকে। কোনো নক্ষত্র বিশেষ কোনো কক্ষে গমন করলে বিশেষ কিছু লোকের জীবনে সফলতা ও সুখ-শান্তি বিরাজ করে। আর তাই অপর কিছুলোকের জন্য ব্যর্থতা ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আবার মানুষের আকীদা দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দলের মতে উক্ত প্রভাব ফেলার ব্যাপারে তারকা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে অন্য কারো হাত নেই। অপর দলের মতে বস্তুত এটা আল্লাহ তা'আলাই তারকার মাধ্যমে করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলাই তারকারাজির মধ্যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দান করেছেন। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর ন্যায় এগুলোও ব্যর্থতা ও সফলতার সবব বা কারণ–মূল নিয়ামক শক্তি নয়।

যারা নক্ষত্ররাজিকে মূল নিয়ামক শক্তি মনে করে এবং ধারণা করে যে, পৃথিবীর ঘটনাবলি ও পট পরিবর্তন তারকারাজির প্রভাবের কারণেই হয়ে থাকে। নক্ষত্রই তাবৎ দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের উক্ত আকীদা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। অনুরূপ আকীদা মানুষকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। বৃষ্টির ব্যাপারে আরবের লোকদের আকীদা ছিল যে, একটি বিশেষ নক্ষত্র যাকে "নাউ" বলে– তা বৃষ্টি নিয়ে আগমন করে। আর বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা তার অধীনে রয়েছে। নবী করীম ﷺ জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ করেছেন এবং উক্ত আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অপরপক্ষে যারা নক্ষত্রকে ক্ষমতার মূল নিয়ামক মনে করেন; বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে এর মূল নিয়ামক মনে করে আর নক্ষত্রকে অসিলা ও সবব হিসেবে গণ্য করে তাদের আকীদায় শিরকের স্তরে পৌঁছে না। তাদের বক্তব্য হলো বৃষ্টি তো আল্লাহ তা'আলাই বর্ষণ করেন কিন্তু এর বাহ্যিক সবব বা কারণ হলো মেঘ। তদ্রূপ সমস্ত কামিয়াবী ও ব্যর্থতার প্রকৃত উৎস তো হলো আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি উক্ত কামিয়াবী ও ব্যর্থতার সবব হয়ে থাকে মাত্র। সুতরাং অনুরূপ ধারণা ও আকীদা পোষণ করা শিরক নয়। কুরআন ও হাদীস এটাকে সমর্থনও করে না আবার প্রত্যাখ্যানও করে না। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ পাক নক্ষত্ররাজির বিবর্তন ও সেগুলোর উদয়-অস্তের মধ্যে এমন কিছু শক্তি নিহিত রেখেছেন যা মানুষের ভালো-মন্দের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু সে প্রভাবকারী শক্তিকে অনুসন্ধান করার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করা, এর উপর নির্ভরশীল হওয়া, বিশ্বাস স্থাপন করা, তদনুযায়ী ভবিষ্যদ্বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَأَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَأَمْسِكُوْا" -

"তাক্দীরের আলোচনা শুরু হলে বিরত থাকো (অর্থাৎ এর খুঁটি-নাটি পর্যালোচনা ও চুল-চেরা বিশ্লেষণে লেগে যেয়ো না।) নক্ষত্ররাজির চুল-চেরা বিশ্লেষণ হতে বিরত থাকো এবং আমার সাহাবীগণের মতভেদ সম্পর্কীয় খুঁটি-নাটি পর্যালোচনা হতে আত্মরক্ষা কর।" –[তাবরানী এহইয়ায়ে উলূম]

হযরত ওমর (রা.) ইরশাদ করেন– "تَعَلَّمُوْا مِنَ النُّجُوْمِ مَا تَهْتَدُوْنَ بِهِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوْا"

"জোতির্বিদ্যা ততটুকু শিক্ষা কর যতটুকু দ্বারা জলে-স্থলে পথ চলতে সক্ষম হবে। এর বেশি গভীর পর্যালোচনায় লেগে যেয়ো না।"

উপরিউক্ত নিষিদ্ধকরণের দ্বারা তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এদের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে মশগুল হওয়া হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

জোতির্বিদ্যা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দানের হিকমত : শরিয়ত কেন জোতির্বিদ্যা হতে দূরে থাকার পরামর্শ দান করেছে? إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ নামক গ্রন্থে ইমাম গাযালী (র.) এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. মানুষ যখন জোতির্বিদ্যায় গভীর আলোচনা ও চর্চায় মশগুল হয়ে যায় তখন ধীরে ধীরে সে নক্ষত্ররাজিকে মূল শক্তির নিয়ামক মনে করতে থাকে। আর তা ক্রমান্বয়ে তাকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

২. মূলত ঐশীবাণী ব্যতীত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এতদসম্পর্কীয় কিছু জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু আজ তা পাওয়া যায় না। আজকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানী যা বলেন, তা শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই বলেন। নিশ্চিতভাবে তাঁরা কিছুই বলতে পারে না। এ ব্যাপারে জনৈক মনীষী যথার্থই বলেছেন– "مُفِيْدُهُ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ وَمَعْلُوْمُهُ غَيْرُ مُفِيْدٍ" . অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের যা উপকারী তা অজ্ঞাত আর যা জ্ঞাত তা মোটেও উপকারী নয়।

সুতরাং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুশিয়ারার দায়লমী জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তদীয় গ্রন্থ– "اَلْمُجْمَلُ فِي الْأَحْكَامِ" -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন– "জোতির্বিদ্যা একটি প্রমাণহীন বিদ্যা। এতে ওয়াস্ওয়াসাহ এবং নিছক ধারণার বিরাট অবকাশ রয়েছে।"

আল্লামা আলূসী (র.) তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এমন কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বসম্মত নিয়মাবলি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

৩. এর চর্চার মাধ্যমে জীবনের মূল্যবান সময় অনর্থক কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। যেহেতু এর দ্বারা কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না সেহেতু এটা পার্থিব কাজ-কর্মে তেমন উপকারী নয়। এমন একটি অনর্থক কাজের পিছনে পড়া ইসলামি আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতে। এ জন্যই এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বাণী "আমি অসুস্থ"-এর মর্মার্থ : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন তাঁর কওমের লোকেরা মেলায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল তখন তিনি "আমি অসুস্থ" বলে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সত্যিকারই কি তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন? কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু নেই। তবে সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, তিনি তখন এত অসুস্থ ছিলেন না যে কওমের সাথে যেতে পারতেন না। কাজেই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, তিনি কিভাবে বলেছেন- "আমি অসুস্থ"?

মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন-

✪ জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দ্বারা "তাওরিয়াহ" করেছেন। "তাওরিয়াহ" বলে এমন কথা বলা যা বাহ্যত ঘটনার বিপরীত (বাস্তব বিরোধী)। কিন্তু বক্তা এর দ্বারা এমন সূক্ষ্ম কোনো অর্থ বুঝিয়ে থাকেন যা বাস্তব। এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) যা বলেছেন তার প্রকাশ্য (বাহ্যিক) অর্থ তো হলো "আমি অসুস্থ"। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য তা ছিল না। তবে মূল উদ্দেশ্য কি ছিল- সে ব্যাপারে আবার তাফসীরকারদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

ক. একদল মুফাস্সিরের মতে এর দ্বারা তিনি তাঁর মানসিক সংকোচ-মনোবেদনার কথা বুঝিয়েছেন- যা গোত্রের শিরক ও কুফর দেখতে দেখতে তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ জন্যই এখানে مَرِيْضٌ শব্দ ব্যবহার না করে سَقِيْمٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা سَقِيْمٌ শব্দের অর্থ হলো সাধারণ ও স্বাভাবিক অসুস্থতা। সরল বাংলায় এর অর্থ হবে- "আমার মন খারাপ"। এর দ্বারা সাধারণত মানসিক ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

খ. অন্য একদল মুফাস্সিরের মতে, إِنِّيْ سَقِيْمٌ -এর দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল- "আমি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব।" কেননা আরবি ভাষায় ইসমে ফায়িলের সীগাহ অধিকাংশ সময় ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদের অন্যত্র রয়েছে- "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ" অর্থাৎ আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং ইব্রাহীম (আ.)ও এখানে বলতে চেয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই (ভবিষ্যতে) অসুস্থ হয়ে পড়ব। কেননা মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকেরই অসুস্থ হয়ে পড়া নিশ্চিত। যদি বাহ্যিক রোগ দেখা নাও যায় তথাপি মানসিক অস্থিরতা দেখা দেওয়া অনিবার্য।

✪ অথবা বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মানসিক অবস্থা কমবেশি অসুস্থ ছিল। কিন্তু তিনি এত অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় অংশ গ্রহণ করতে অপারগ ছিলেন। তবে তিনি স্বাভাবিক অসুস্থতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, কওমের লোকজন তাকে মেলায় অংশ গ্রহণে অক্ষম মনে করেছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরোক্ত উক্তিকে كِذْبَةٌ (মিথ্যা) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে كِذْبَةٌ -এর দ্বারা মূলত তাওরিয়াহকে বুঝানো হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে তাওরিয়ার হুকুম : প্রকাশ থাকে যে, তাওরিয়াহ দু প্রকারে বিভক্ত-

১. قَوْلِيْ [বক্তব্যমূলক] অর্থাৎ এমন কথা বলা যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব বিরোধী, কিন্তু অপ্রকাশ্য অর্থ সম্পূর্ণ বাস্তব সম্মত।

২. عَمَلِيْ [কর্মমূলক] অর্থাৎ এমন কাজ করা যার উদ্দেশ্য দর্শক এরূপ মনে করবে। অথচ কাজটি সমাধাকারীর উদ্দেশ্য হবে অন্য কিছু। এটাকে إِيْهَامٌ ও বলে। অধিকাংশ মুফাস্সিরে কেরামের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়েছেন তা ছিল إِيْهَامٌ। আর তিনি যে নিজেকে অসুস্থ বলে প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল বক্তব্যমূলক তাওরিয়াহ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত ঘটনা ও বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে তাওরিয়াহ জায়েজ। খোদ নবী করীম ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় উপরিউক্ত দু প্রকারের তাওরিয়াহ করেছেন। হিজরতের সময়কার একটি ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য। মদীনায় যাওয়ার পথে প্রিয়নবী ﷺ -কে দেখিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইনি কে? হযরত আবূ বকর (রা.) জবাবে বলেছেন- "هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِيْ" অর্থাৎ তিনি পথ প্রদর্শনকারী, আমাকে পথ দেখান। প্রশ্নকর্তা মনে করেছিল সাধারণ পথ প্রদর্শনকারী। এ জন্য সে কেটে পড়ল। অথচ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল দীনি ও রুহানী পথ প্রদর্শক।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, হুযূর ﷺ যে দিকে জিহাদের জন্য বের হবেন বলে পরিকল্পনা করতেন মদীনা হতে সে দিকে বের না হয়ে অন্য দিকে হতে বের হতেন, যাতে লোকেরা তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে। এটা ছিল নবী করীম ﷺ -এর اِيْهَام -

হাস্যরস ও কৌতুকের ব্যাপারেও নবী করীম ﷺ তাওরিয়াহ করতেন। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধাকে বলেছেন, "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না"। বৃদ্ধা তা শুনে কাঁদতে শুরু করল। নবী করীম ﷺ বুড়িকে বুঝিয়ে বললেন, এর অর্থ হলো বৃদ্ধাগণ বৃদ্ধা থাকা অবস্থায় জান্নাতে যাবেন না; বরং তারা যুবতী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

নক্ষত্ররাজির উপর আস্থা স্থাপন করা নাজায়েজ– তথাপি হযরত ইবরাহীম (আ.) কিভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন? : উপরের বিভিন্ন আলোচনায় উক্ত প্রশ্নটির জবাব প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেছে। তথাপি ব্যাপারটি আরও অধিক সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে তার জবাব পেশ করলাম।

কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা, এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নক্ষত্ররাজির উপর আস্থা স্থাপন করত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। তথাপি হযরত ইব্রাহীম (আ.) নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিভাবে মেলায় অংশ গ্রহণ না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন? যা দ্বারা প্রকাশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নক্ষত্রের উপর নির্ভর করেই উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ পেশ করা হলো–

১. রাত ও দিনের একটি বিশেষ সময়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) অসুস্থ হয়ে পড়তেন– জ্বরে ভুগতেন। সুতরাং তিনি তারকার দিকে তাকিয়ে জানতে চেয়েছেন তা সেই সময় কিনা। কেননা তৎকালে ঘড়ির ব্যবহার ছিল না। সুতরাং রাত্রিকালে তারকার অবস্থানের দ্বারা সময় নির্ণয় করা হতো। কাজেই যখন দেখলেন এটা তাঁর জ্বর আগমনের সময় তখন তাকেই মেলায় অংশ গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য অজুহাত হিসেবে পেশ করলেন। যদিও আসলে তিনি মূর্তি ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে এমন মেলার অশ্লীলতা হতে নিজেকে হেফাজত করার জন্য মেলায় যেতে অস্বীকার করেছিলেন তথাপি তাঁর পেশকৃত ওজরও অসত্য ছিল না।

২. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতির লোকজন জোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ও নক্ষত্রভক্ত ছিল। সুতরাং তাদেরকে স্বীয় বক্তব্য সহজেই বিশ্বাস করানোর জন্য তিনি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কুদরত অবলোকন করার জন্য তারকারাজির প্রতি তাকিয়েছিলেন।

৪. হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি নির্দিষ্ট তারকা ছিল। যখন এটা বিশেষ একটি স্থানে উদিত হতো তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সুতরাং সে তারকাটিকে যথাস্থানে দেখে তিনি বললেন– "আমি অসুস্থ।"

৫. নক্ষত্ররাজিকে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ মূলনিয়ামক শক্তি মনে না করে তাদের প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়া জায়েজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে তেমন কোনো প্রভাবকারী শক্তি নিহিত রেখে থাকেন, তবে এটা তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই পরিগণিত হবে।

৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) অনেকটা গতানুগতিকভাবে তারকারাজির প্রতি তাকিয়েছিলেন। তিনি কিভাবে মেলায় অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে পারবেন এবং আপাতত একটা ওজর পেশ করত গোত্রের লোকদের হাত হতে রেহাই পেতে পারবেন তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তিনি অকস্মাৎ আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

আল্লাহর বাণী " فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَزِفُّونَ " এবং " مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا الخ " -এর মধ্যকার বিরোধের সমাধান কি?
প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছিল তা কওমের লোকেরা পূর্ব হতে জানতে পেরেছিল। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গার সময় কওমের এক লোক তা দেখে ফেলেছিল এবং সে-ই তাদেরকে জানিয়েছিল। যদ্দরুন তারা ছুটে এসে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল আমরা তো তাদের ইবাদত করি, অথচ তুমি কেন তাদের ভেঙ্গে ফেললে?

পক্ষান্তরে শেষোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিকট জানতে চেয়েছে যে, কে তাদের দেবতাদের সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে? অর্থাৎ কে তাদেরকে ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলেছে?

বাহ্যিকভাবে উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ পরিদৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ বা গরমিল নেই। কেননা–

ক. কওমের কিছু লোক জানতে পেরেছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছে। কাজেই তারা প্রথমোক্ত বক্তব্য পেশ করেছে। অন্যদিকে কিছু লোকের নিশ্চিত জানা ছিল না যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) মূর্তি ভেঙ্গেছেন কিনা? সুতরাং তারা শেষোক্ত ভাষায় প্রশ্ন করেছে।

খ. কওমের সকলেই যদিও লোকমুখে শুনেছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে তথাপি তারা নানা জনে নানা ভাষায় হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতি প্রশ্নবান ছুঁড়ে মেরেছিল। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে তাদের ভাষার বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র।

অনুবাদ :

٩٥. قَالَ لَهُمْ مُوَبِّخًا اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا اَصْنَامًا .

৯৫. তিনি বললেন তাদেরকে তিরস্কার করে কেন তাদের পূজা কর যাদের তোমরা খোদাই করে বানাও? পাথর ইত্যাদি দ্বারা প্রতিমারূপে।

٩٦. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ نَحْتِكُمْ وَمَنْحُوْتِكُمْ فَاعْبُدُوْهُ وَحْدَهُ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَقِيْلَ مَوْصُوْلَةٌ وَقِيْلَ مَوْصُوْفَةٌ .

৯৬. আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং যা তোমরা কর তাদেরকেও অর্থাৎ তোমাদের খোদাই করা ও খোদাইকৃত সব-কে। কাজেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো। এখানে مَا শব্দটি মাসদারের অর্থে হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে مَوْصُوْلْ হয়েছে। আবার অন্যান্যরা বলেছে مَوْصُوْف হয়েছে।

٩٧. قَالُوا بَيْنَهُمْ ابْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَامْلَئُوْهُ حَطَبًا وَاضْرِمُوْهُ بِالنَّارِ فَاِذَا الْتَهَبَ فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ النَّارِ الشَّدِيْدَةِ .

৯৭. তারা বলল পরস্পরের মধ্যে তাঁর জন্য একটি সৌধ নির্মাণ কর। অতঃপর তাকে লাকড়ি দ্বারা বোঝাই করো এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করে দাও। তারপর অগ্নি যখন লেলিহান শিখায় পরিণত হবে তখন তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো ভীষণ অগ্নিতে।

٩٨. فَاَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا بِاِلْقَائِهِ فِى النَّارِ لِتُهْلِكَهُ فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ الْمَقْهُوْرِيْنَ فَخَرَجَ مِنَ النَّارِ سَالِمًا .

৯৮. তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে মনস্থ করেছিল অগ্নিতে নিক্ষেপ করত তাঁকে ধ্বংস করার জন্য। সুতরাং আমি তাদেরকে অপদস্থ [অকৃতকার্য] করলাম। পর্যুদস্ত করলাম। কাজেই তিনি নিরাপদে অগ্নি হতে বের হয়ে আসলেন।

٩٩. وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ مُهَاجِرًا اِلَيْهِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ سَيَهْدِيْنِ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِىْ بِالْمَصِيْرِ اِلَيْهِ وَهُوَ الشَّامُ فَلَمَّا وَصَلَ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ .

৯৯. আর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট চললাম কুফরের দেশ হতে তাঁর দিকে হিজরত করেছিলাম। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন যথায় তিনি আমাকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো শাম [সিরিয়া]। সুতরাং যখন তিনি সেই পবিত্র জমিনে গমন করলেন তখন দোয়া করলেন।

١٠٠. قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ وَلَدًا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

১০০. হে আমার প্রভু! আমাকে দান করুন একটি সন্তান সৎকর্মশীল।

١٠١. فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ اَىْ ذِىْ حِلْمٍ كَثِيْرٍ .

১০১. সুতরাং আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল [বিচক্ষণ] পুত্রের শুভ সংবাদ দান করলাম অর্থাৎ অধিক ধৈর্যশীল [বিচক্ষণ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন তার গোত্রের লোকেরা মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত করল এবং প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ছাড়ল তখন তিনি তাদের নিকট মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরালেন। তিনি তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন যে, তোমরা নিজেদের হাতের গড়া প্রতিমাসমূহের পূজা কর কেন? যাদেরকে তোমরাই সৃষ্টি করেছ তারা তোমাদের সৃষ্টি করেনি। এগুলো না কথাবার্তা বলতে পারে আর না একটু নড়া-চড়া করার ক্ষমতা রাখে। উপরন্তু যারা নিজেদেরকে হেফাজত করতে পারে না তারা কিভাবে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে? আল্লাহর আজাব ও গজব হতে কিভাবে তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করতে পারবে? তোমাদের যদি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকত তবে এরূপ বোকামি করতে না; বরং এ সকল প্রতিমাদের বাদ দিয়ে একমাত্র সেই আল্লাহর ইবাদত করাই তোমাদের উচিত, যিনি তোমাদের এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের স্রষ্টা। সৃষ্টি যিনি করেছেন ইবাদতের প্রাপ্যও তিনি। অন্য কেউ ইবাদতের হকদার হতে পারে না।

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সংগ্রাম : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি ছিল প্রতিমা পূজারী। তারা পাথর ইত্যাদি দ্বারা মূর্তি তৈরি করত এবং পূজা-অর্চনা করত। তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করত। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার কওমকে মূর্তিপূজা হতে সরিয়ে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আনয়নের প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলেন। এর জন্য তিনি একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমে নানাভাবে তাদেরকে এর অসারতা বুঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের কাহিনী নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন–

"وَاِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا . اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ" .

"আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্মরণ কর যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেন, আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে– যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা তো প্রতিমা পূজার পিছনে পড়ে রয়েছ। আর তোমরা মিথ্যা উপাস্যসমূহের সৃষ্টি করে রেখেছ। তোমরা যেসব গায়রুল্লাহর উপাসনা করছ তারা তোমাদেরকে রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই রিজিক অনুসন্ধান কর তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর শুকরিয়া আদায় কর। কেননা তাঁর নিকটই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর যদি তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন কর তবে জেনে রাখ যে, [এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয় বরং] তোমাদের পূর্বেও বহু জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। রাসূলগণের দায়িত্ব তো হলো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া।

সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সব বুঝানোর পরও যখন ঈমান আনল না এবং শিরকের পথ হতে ফিরে আসল না তখন তিনি আরও কঠোর হলেন। সম্প্রদায়ের লোকজন একদিন মেলায় চলে গেল। সুযোগ বুঝে তিনি তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমাঘরে গেলেন। প্রতিমাদেরকে প্রথমে খুব ভর্ৎসনা করলেন। অতঃপর বড় প্রতিমাটি ব্যতীত বাকি সব কয়টিকে কুঠারের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কুঠারটি বড় প্রতিমাটির স্কন্ধে রেখে চলে আসলেন। সম্প্রদায়ের লেকেরা এটা নিয়ে তার সাথে যথেষ্ট বিতর্ক করল। পরিশেষে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তথায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিক্ষেপ করল। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর রহমতে সম্পূর্ণ নিরাপদে অগ্নি হতে বের হয়ে চলে আসলেন। তারপর আল্লাহর নির্দেশে স্বদেশ ইরাক ছেড়ে হিজরত করে সিরিয়া চলে যান।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনা : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওমের বার্ষিক মেলার দিন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও তারা দাওয়াত করল। অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তিনি মেলায় যেতে অস্বীকার করলেন। প্রতিমারা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাণের শত্রু। তিনি প্রতিমা ও তার প্রতিমা পূজারী গোত্র উভয়কেই মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন।

কওমের লোকেরা মেলায় অংশগ্রহণের জন্য শহরের বাইরে চলে গেল। সুযোগ বুঝে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদের কেন্দ্রী প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করলেন। নানাভাবে প্রতিমাগুলোকে তিরস্কার করলেন। মেলায় যাওয়ার পূর্বে কওমের লোকেরা প্রতিমাদে সামনে নানা প্রকারে খাদ্য-দ্রব্য রেখে গিয়েছিল; ফিরে এসে বরকত হিসেবে খাওয়ার জন্য। হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিদে বললেন, "তোমাদের কি হয়েছে তোমরা খাচ্ছ না কেন?" পুনরায় বললেন, "কি ব্যাপার তোমাদের মুখে কথা সরছে না কেন?"

হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি কুঠার হাতে নিয়ে সব কয়টি মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। কেবল বড় মূর্তিটি বাকি রাখলেন কুঠারখানা বড় মূর্তিটির কাঁধে রেখে দিলেন। লোকজন মেলা হতে ফিরে আসার পূর্বেই বাড়ি ফিরলেন।

মেলা হতে লোকজন ফিরে এসে যখন তাদের প্রতিমাদের অবস্থা দেখল তখন তারা এর উৎস খুঁজতে শুরু করল। সকলের মুে একই কথা কার এত বড় স্পর্ধা? কে মূর্তিদের সাথে এরূপ আচরণ করেছে? সমবেত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠল ইবরাহীম (আ.) নামের এক যুবক মূর্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে থাকে। সম্ভবত এটা তার কাজ।

যা হোক, তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে জনসমক্ষে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করল। তারা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের মূর্তি (মাবুদ) দের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, "বরং তাদের বড় জনই ত করেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেসা কর, যদি তারা কথা বলতে পারে।" ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তর শুনে তাদের মধ্যে কিছুট অনুশোচনা ও উপলব্ধির সৃষ্টি হলেও মূর্তিপূজা পরিহারের সৎ সাহস হলো না। হযরত ইবরাহীম (আ.) আরও বললেন- "তোমর কি এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে এমন বস্তুর পূজা করবে যারা না তোমাদের উপকার করতে পারে আর না ক্ষতি করতে পারে; তোমাদের জন্য এবং তোমাদের মাবুদদের জন্য আফসোস, তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই?"

পরিশেষে তারা পরামর্শ করল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে কি শাস্তি দেওয়া যায়? কেউ কেউ বলল, তাকে হত্যা করতে হবে। আবার অন্যান্যরা মত প্রকাশ করল যে, তাকে পুড়ে মারতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দীর্ঘদিন যাবৎ বিশাল লাকড়ির স্তূপ করা হলো। তারপর তাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ডিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নিক্ষেপ করা হলো। তামাশা দেখার জন্য জমায়েত হলো হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে হযরত ইব্রাহীম (আ.) রক্ষা পেলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ আমি আগুনকে বললাম, হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাও।

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিরাপদে আগুন হতে বের হয়ে আসলেন। আল্লাহর কুদরতের জাজ্বল্যমান প্রকাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও পাপিষ্ঠ কওমের চোখ খুলল না। তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল না।

উক্ত ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কোনো দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ রহিত করে দিতে পারেন; বরং তার স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণ তা হতে প্রকাশ করাতে পারেন- "إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহর বাণী "قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا" -এর ব্যাখ্যা : মূর্তি ভাঙ্গার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যখন লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জনসমক্ষে হাজির করল, তখন তিনি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে এমন শাণিত ও জোরালো বক্তব্য পেশ করলেন যে, তারা তার কোনো যুক্তি সঙ্গত জবাব দিতে পারল না। সাধারণত মানুষ যখন কোনো বিষয়ে যুক্তি পেশ করতে অপারগ হয় তখন শক্তির পথ বেছে নেয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওমের ব্যাপারেও তাই ঘটল। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সপ্রমাণ বক্তব্যকে খণ্ডন করতে না পেরে তারা নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করল। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল- "ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ" তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর এবং তাকে তাতে নিক্ষেপ কর।

কিভাবে সেই অগ্নিকুণ্ড বানানো হয়েছিল কুরআনে কারীমে তার বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে এতদবিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, কাফেররা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে পাথর দ্বারা একটি দেয়া [বেষ্টনী] উঠিয়েছিল। তার উচ্চতা ছিল ত্রিশ গজ এবং পরিধি ছিল বিশ গজ। তা লাকড়ি দ্বারা ভর্তি করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অত্র আয়াতে আগুনের স্তূপকে جَحِيم বলা হয়েছে। ইমাম মুজাজ (র.) বলেছেন- আগুনের উপর আগুনের স্তূপকে جَحِيم বলে।

এ কঠিন মুহূর্তে তাঁর প্রভুকে স্মরণ করলেন। একমাত্র তার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর অসীম রহমত ও কুদরতে আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গেল। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সাপেবর হলো।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করার ফায়দা : এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করার পিছনে দু'টি ফায়েদা থাকতে পারে।

১. মক্কার কুরাইশদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতাদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া মক্কার মুশরিক (কুরাইশ)-রা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরি বলে দাবি করত। সুতরাং তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তো খাঁটি একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ তোমরা মূর্তি পূজায় আপাদমস্তক ডুবিয়ে রয়েছ। সুতরাং কোন মুখে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী দাবি করছ? হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সত্যিকার উত্তরাধিকারী হতে হলে তোমাদের নিখাদ তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে, মূর্তি পূজা বর্জন করতে হবে।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াত এক অভিন্ন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মূর্তি পূজা পরিত্যাগের জন্য আহ্বান করছেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণে তথা পৌত্তলিকতাকে পরিহার করে একত্ববাদকে গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করেছিল। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বিজয়ী করেছিলেন। তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াত গ্রহণ না কর, তার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠ, তা হলে তোমাদেরকেও ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। এতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কোনো ক্ষতি হবে না। যেমনভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার মুশরিক কওমের মধ্যে ঘটেছিল।

"قَالَ وَاِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন- "وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ" হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

অত্র আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আগুন হতে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আমার প্রতিপালকের একত্ববাদ প্রচার করার ফলে আজ গোটা জাতি আমার দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অথচ তাদের সাথে আমার বৈষয়িক কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কাজেই আমি এখন আমার রবের হয়ে গিয়েছি। তিনি আমাকে যথায় যাওয়ার নির্দেশ দেন আমি তথায় চলে যেতে এক পায়ে খাড়া। এ নির্দয় মুশরিক কওমের দেশে আর আমি থাকতে চাই না। তাদের অসৎ সঙ্গ হতে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কওম হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে উক্ত উক্তি করেছিলেন। কেননা এত বৎসরের সাধনার পর একমাত্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ.) ছাড়া কেউই তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।

মুফতি শফী (র.) মা'আরিফুল কুরআনে বলেন, "এখানে আল্লাহ তা'আলার দিকে যাওয়ার অর্থ হলো দারুল কুফর পরিত্যাগ করে আমার রব আমাকে যেথায় যাওয়ার হুকুম করেন আমি সেথায় চলে যাব। তথায় যেয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করব। সুতরাং তিনি বিবি সারা ও ভাতিজা হযরত লূত (আ.)-কে সঙ্গে করে ইরাকের বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে সিরিয়া চলে যান।

তাফসীরে যিলালের গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হিজরত পূর্ব প্রতিক্রিয়া। যে সময় তিনি দীর্ঘ অতীতের সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তখন তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, মাতা-পিতা, বাড়ি-ঘর, দেশ-মাটি সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অবশ্যই তাঁর রব তাকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। তাঁর ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিবেন। যথায় তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর ঈমান-আকীদার হেফাজত করতে পারবেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে পারবেন। মনের সেই গভীর প্রত্যাশায় হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

"إِنِّىْ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّىْ" আয়াত হতে নির্গত মাসআলা : আলোচ্য আয়াত তথা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, যেথায় দীন ঈমানের হেফাজত করা যায় না, দীনের দাওয়াত প্রদান করতে গেলে জীবন নাশের হুমকি আসে তথা হতে হিজরত করে তুলনামূলক নিরাপদ জায়গায় যাওয়া জায়েজ। কেননা উপরিউক্ত অবস্থায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) স্বদেশ ত্যাগ করে সিরিয়া চলে গেছেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা : সিরিয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। যখন তিনি নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন সব ছেড়ে সিরিয়া পৌঁছলেন তখন তিনি অনেকটা একাকীত্ব অনুভব করলেন। তাঁর সাথে একমাত্র বিবি সারা ও ভাতিজা লূত (আ.) ব্যতীত আর কেউই ছিলেন না। এ সময় তাঁর মনে সন্তান লাভের বাসনা জাগল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনো বাক্যে দোয়া করলেন- "رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ" হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একজন সুসন্তান দান করুন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তাঁকে একজন সুসন্তানের শুভ সংবাদ দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে- "فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ" সুতরাং আমি তাঁকে একজন ধৈর্যশীল সন্তানের খোশখবর দিলাম।

حَلِيْمٌ (ধৈর্যশীল) বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সন্তান তার জীবনে এমন ধৈর্যের পরিচয় দিবেন এবং বিচক্ষণতা দেখাবে যে, পৃথিবী তার উপমা উপস্থাপন করতে পারবে না।

উক্ত সন্তান জন্মলাভের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে- হযরত সারা দেখলেন যে, তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি হচ্ছে না। তিনি ভাবলেন যে, তিনি বন্ধ্যা- তার কোনো সন্তান-সন্ততি হবে না। এদিকে মিশরের প্রেসিডেন্ট তার কন্যা হাজেরাহকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করলেন। হযরত সারা (আ.) হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়ে দিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) হাজেরাকে বিবাহ করলেন। এ হাজেরা (আ.) উদর হতেই সেই প্রতিশ্রুত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আর তিনিই হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। যিনি আজীবন মহা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন।

"وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ" আয়াতে مَا শব্দটি কয় অর্থে হতে পারে? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর মূর্তিপূজারী কওমকে নসিহত করতে যেয়ে বলেছেন- "وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ" অর্থাৎ [তোমরা কেন প্রতিমাদের পূজা কর? অথচ] আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাকে সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতে مَا অব্যয়টি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ রাখে।

১. مَا ইসমে মাওসূল (তথা اَلَّذِىْ)-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ "خَلَقَ الَّذِىْ تَصْنَعُوْنَهُ" যা তোমরা তৈরি কর তার স্রষ্টাও মূলত তিনিই।

২. مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ হবে। অর্থাৎ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ اَعْمَالَكُمْ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আমলকেও সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে বান্দার আমলের সৃষ্টিকর্তাও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা। বান্দা নিজে নয়। আর এটাই গ্রহণীয় মাযহাব।

৩. مَا শব্দটি اِسْتِفْهَامٌ-এর অর্থে হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامٌ ও হবে تَوْبِيْخٌ বা ভর্ৎসনার জন্য, অর্থাৎ "وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَاَىَّ شَيْءٍ تَعْمَلُوْنَ" আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর যা তোমরা করছ?

৪. مَا শব্দটি এখানে نَفْىٌ -এর অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- কাজের মূলকর্তা তোমরা নও, তোমরা মূলত কিছুই করতে সক্ষম নও।

"فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ" আয়াতখানা একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট- তা কি? আল্লাহর বাণী "فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ" বাক্যটি একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আর তা হলো "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ" সুতরাং আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করলাম। -[কাবীর, জালালাইনের হাশিয়া]

অনুবাদ :

١٠٢. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ اَىْ اَنْ يَّسْعٰى مَعَهٗ وَيُعِيْنُهٗ قِيْلَ بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَقِيْلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَنَةً قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى اَىْ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ وَ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ حَقٌّ وَاَفْعَالُهُمْ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط مِنَ الرَّأْيِ شَاوَرَهٗ لِيَأْنَسَ بِالذَّبْحِ وَيَنْقَادَ لِلْاَمْرِ بِهٖ قَالَ يٰٓاَبَتِ التَّاءُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز بِهٖ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১০২. অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো অর্থাৎ তাঁর সাথে চলাফেরা করতে পারে এবং তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর কারো কারো মতে তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তের বৎসর। তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, আমি দেখি অর্থাৎ আমি স্বপ্নযোগে দেখেছি আমি তোমাকে জবাই করছি নবীগণের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। আর তাঁদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। সুতরাং ভেবে দেখ, তোমাদের কি মত? تَرٰى ফে'লটি এখানে رَأْي [অর্থাৎ মত] হতে উদ্ভূত। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সাথে পরামর্শ করেছেন যাতে সে জবাইয়ের প্রতি আগ্রহী হয় এবং তার ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, হে আমার পিতা! এখানে ت অক্ষরটি ইযাফতের ى -এর পরিবর্তে হয়েছে। আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। আল্লাহ চাহে শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন সে ব্যাপারে।

١٠٣. فَلَمَّآ اَسْلَمَا خَضَعَا وَانْقَادَ لِاَمْرِ اللّٰهِ وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ صَرَعَهٗ عَلَيْهِ وَلِكُلِّ اِنْسَانٍ جَبِيْنَانِ بَيْنَهُمَا الْجَبْهَةُ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمِنٰى وَاَمَرَّ السِّكِّيْنَ عَلٰى حَلْقِهٖ فَلَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا بِمَانِعٍ مِنَ الْقُدْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ ـ

১০৩. যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলেন– আল্লাহর আদেশের সামনে নত হলেন এবং আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং তাকে কাত করিয়ে [এক পাশের উপর] শায়িত করলেন এক পাশের উপর তাকে শোয়ায়ে দিলেন। আর প্রত্যেক মানুষের সম্মুখভাগের দুটি অংশ থাকে, যার মাঝখানে থাকে ললাট। আর এ ঘটনাটি মিনায় সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ইসমাঈলের গলদেশে ছুরি চালালেন। কিন্তু ছুরি কোনো কাজই করল না। আল্লাহর কুদরতে পক্ষ হতে প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে।

١٠٤. وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ـ

১০৪. তখন আমি তাকে আহ্বান করলাম, হে ইবরাহীম।

١٠٥. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ج بِمَا اَتَيْتَ بِهٖ مِمَّا اَمْكَنَكَ مِنْ اَمْرِ الذَّبْحِ اَىْ يَكْفِيْكَ ذٰلِكَ فَجُمْلَةُ نَادَيْنٰهُ جَوَابُ لَمَّا بِزِيَادَةِ الْوَاوِ اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ بِامْتِثَالِ الْاَمْرِ بِاِفْرَاجِ الشِّدَّةِ عَنْهُمْ ـ

১০৫. তুমি তো অবশ্যই স্বপ্নাদেশ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। জবাই করার যা ক্ষমতা তোমার ছিল তা প্রয়োগ করে। অর্থাৎ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং نَادَيْنَاهُ (আমি তাকে আহ্বান করেছি।) বাক্যটি অতিরিক্ত واو সহযোগে لَمَّا -এর জবাব হয়েছে। নিশ্চয় আমি তদ্রূপ যদ্রূপ তোমাকে প্রতিদান দিয়েছি– প্রতিদান দিয়ে থাকি সদ্ব্যবহারকারীদেরকে নিজের নাফসের সাথে [আল্লাহর] আদেশ পালন করত তাদের হতে মসিবতকে লাঘব করত।

١٠٦. إِنَّ هٰذَا الذَّبْحَ الْمَأْمُوْرَ بِهِ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ أَيِ الْاِخْتِبَارُ الظَّاهِرُ. ১০৬. নিশ্চয় এটা আদিষ্ট জবাই– অবশ্যই তা সুস্পষ্ট পরীক্ষা অর্থাৎ প্রকাশ্য পরীক্ষা।

তাহকীক ও তারকীব

আল্লাহর বাণী "يَا اَبَتِ" -এর মহল্লে ই'রাব কি? يَا اَبَتِ বাক্যাংশটুকু মূলত ছিল "يَا اَبِى" (হে আমার পিতা!) এখানে تَ অক্ষরটি "ى" মুতাকাল্লিম-এর পরিবর্তে হয়েছে। সুতরাং এটা مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর স্থলে হয়েছে। يَا হরফে নেদা। এটা اُدْعُوْ (বা اَطْلُبُ) -এর অর্থে হয়ে থাকে। কাজেই اَبَتِ (বা اَبِىْ) اَطْلُبُ ফে'লের مَفْعُوْل হয়ে মহল্লে মানসূব হয়েছে।

এখানে يَا হরফে নিদা اَبَتِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مُنَادٰى হয়েছে। نِدَاءٌ ও مُنَادٰى মিলে قَالَ ফে'লের مَفْعُوْل হয়েছে। সুতরাং বাক্যটি مَفْعُوْل হয়ে مَنْصُوْب -এর মহল্লে হয়েছে।

"فَجُمْلَةُ نَادَيْنَاهُ جَوَابُ الخ" বক্তব্য দ্বারা গ্রন্থকার (র.) কি বুঝিয়েছেন? জালালাইনের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, "وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ" বাক্যটি পূর্ববর্তী لَمَّا -এর জবাব হয়েছে। তবে এখানে وَاوْ অক্ষরটি অতিরিক্ত হয়েছে। সুতরাং فَلَمَّا اَسْلَمَا الخ শর্ত আর نَادَيْنَاهُ الخ জবাব (বা জাযা)। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়াহ হয়েছে।

আর واو কে যদি অতিরিক্ত ধরা না হয়, তা হলে এটা স্বতন্ত্র বাক্য হবে। এমতাবস্থায় لَمَّا -এর জবাব বিলুপ্ত হবে।

"اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" আয়াতের মধ্যকার كَذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কি? আলোচ্য আয়াতে كَذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো ঐ সকল নিয়ামত ও প্রতিদান যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেরূপ প্রতিদান দিয়েছি আমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে আমি অনুরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকি। (كَمَا جَزَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ) (ع) كَافْ مُشَبَّه হলো جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ এবং আর مُشَبَّهٌ بِهٖ হলো جَزَاءُ اِبْرَاهِيْمَ এ স্থলে وَوَلَدَهُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) হরফে তাশবীহ ও اِطَاعَةُ اللّٰهِ [আল্লাহর আনুগত্য ও ইখলাস] হলো ওয়াজহে তাশবীহ।

"تَرٰى" শব্দটির বিভিন্ন কেরাত : فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى আয়াতের মধ্যকার تَرٰى শব্দের মধ্যে দু'ধরনের কেরাত হতে পারে–

১. জমহুর কারীগণের অভিমত হলো, ت অক্ষরটি যবরের সাথে হবে।

২. ইমাম হামযাহ ও কিসায়ী (র.)-এর মতে, ت অক্ষরটি পেশ যোগে ও ر অক্ষরের নিচে যের দিয়ে تُرِىْ পড়বে।

"مَا تُؤْمَرُ بِهٖ" আয়াতের মধ্যকার مَا কোন অর্থে হয়েছে? আলোচ্য আয়াতাংশে مَا শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. مَا শব্দটি মাসদারের অর্থে হবে। এক্ষেত্রে مَا تُؤْمَرُ بِهٖ অর্থ হবে "اَلْمَأْمُوْرُ بِهٖ" [যা আপনি আদিষ্ট হয়েছেন]।

২. مَا শব্দটি মাওসূফা হবে এবং পরবর্তী বাক্যটি তার সিফাত হবে।

"وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ" আয়াতের মধ্যকার لَامْ টি কোন অর্থে হয়েছে? আলোচ্য আয়াতের মধ্যকার لِلْجَبِيْنِ -এর لَامْ অক্ষরটি عَلٰى অর্থে হয়েছে, অর্থাৎ তাকে কপালের এক পার্শ্বের উপর শুয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

" فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ .... إِنِّي أَذْبَحُكَ " আয়াতের ব্যাখ্যা : যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে চলাফেলা করার মতো বয়সে উপনীত হলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রকে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করতেছি।

কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) উপর্যুপরি তিন দিন উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর সর্বসম্মভাবে নবীগণের স্বপ্ন ওহী। সুতরাং উক্ত স্বপ্নের মর্মার্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে জবাই করেন।

স্বপ্নযোগে কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেন? আল্লাহ তা'আলা তো কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে সরাসরি উপরিউক্ত নির্দেশ তথা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ হযরত ইব্রাহীমের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে স্বপ্নযোগে কেন উক্ত নির্দেশ প্রদান করলেন? মুফাস্সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. যাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। স্বপ্নযোগে প্রদত্ত নির্দেশে তাবীল [অপব্যাখ্যা] করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাবীলের আশ্রয় গ্রহণ না করে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা এখানে মূলত হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাই হওয়ার কামনা করেননি; বরং জবাইয়ের আয়োজন চেয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং উপরিউক্ত নির্দেশ যদি মৌখিক দেওয়া হতো, তাহলে তাতে পরীক্ষা হতো না। কাজেই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে জবাই করেছেন। আর এতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বুঝেছিলেন যে, জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি জবাইয়ের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও হয়ে গেল এবং স্বপ্নও সত্য হলো। যদি তাঁকে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে এটা হয়তো পরীক্ষা হতো নতুবা নির্দেশটিকে পরবর্তীতে মানসূখ (রহিত) করতে হতো। পরীক্ষাটি কতইনা কঠিন ছিল! এ দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– " فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ " যে পুত্র সন্তানটিকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নিকট হতে আরজু করে নিয়েছিলেন তাকে কুরবানি করার নির্দেশ তখন আসল যখন ছেলেটি পিতার সাথে চলাফেরা করার যোগ্য হয়েছিল। লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করার পর তখন সে পিতার সাহায্যকারী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিল মাত্র। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, তখন তার বয়স হয়েছিল তের বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আ.) তখন বালেগ হয়ে গিয়েছিলেন।

" فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ " **আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্রের সাথে পরামর্শ করলেন কেন?** আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর মতামত জানতে চেয়েছেন। তাঁর সাথে এতদ্বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে যেয়ে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সাথে পরামর্শ করতে গেলেন কেন? এখানে ইসমাঈল (আ.)-এর মতামত চাওয়ার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এর জবাবে মুফাস্সিরগণ দু'টি কারণের উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন যে, পুত্র পরীক্ষায় কতটুকু কৃতকার্য হয়।

২. নবীগণের চিরন্তন নীতি এই ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা তৈরি থাকতেন। কিন্তু এ আনুগত্যের ব্যাপারে সর্বদা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যা হিকমত মাফিক ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হতো। যদি ইব্রাহীম (আ.) পূর্ব হতে কিছু না বলে পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন, তাহলে তা পিতা-পুত্র উভয়ের জন্যই সংকটের সৃষ্টি করত। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আ.) ব্যাপারটি পুত্রের নিকট পরামর্শ ও মতামত চাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করত এ জন্য পেশ করেছেন যে, পুত্র পূর্ব হতে তা যে আল্লাহর নির্দেশ তা অবগত হয়ে জবাই হওয়ার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে। তা ছাড়া পুত্রের মনে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয় তাও বুঝিয়ে শুনিয়ে নিরসন করা যাবে। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) তো ছিলেন খলিলুল্লাহর পুত্র এবং নবীর পদে তার নিয়োগ ছিল মাত্র সময়ের ব্যাপার। তিনি বললেন, আপনি আপনার আদিষ্ট কর্ম শীঘ্রই পালন করুন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মতামত এ জন্য জানতে চাননি যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। নবীর ব্যাপারে এরূপ কল্পনাও করা যায় না।

أَذْبَحُكَ -এর অর্থ এবং তারবিয়াহর দিনগুলোকে তারবিয়াহ নামকরণের কারণ : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন- "إِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أَذْبَحُكَ" "আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি তোমাকে জবাই করছি।" এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্য- "إِنِّى أَذْبَحُكَ" আমি তোমাকে কুরবানি (জবাই) করছি, এর দুটি অর্থ হতে পারে-

১. আমি জবাই বা কুরবানির কাজ করছি।

২. তোমাকে কুরবানি করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا" তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। এর দ্বারা প্রথমোক্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর "اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ" তোমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা তুমি পালন কর। এর দ্বারা শেষোক্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, তারবিয়ার রাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে বলছে যে, হে ইব্রাহীম (আ.)! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার পুত্র কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ঘুম হতে জাগার পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) ভাবতে লাগলেন সত্যিই কি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে পুত্র কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে না শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে। পরবর্তী রাত্রিতেও তিনি অনুরূপ স্বপ্নে দেখলেন। তখন তার বিশ্বাস জন্মিল যে, আল্লাহর পক্ষ হতেই তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই স্বপ্ন তিনি তৃতীয় রাত্রেও দেখলেন। এরপর তিনি ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পূর্ব হতে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য ব্যাপারটি তার সাথে আলোচনা করলেন। সুতরাং তাঁকে বললেন, "হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে কুরবানি করছি। চিন্তা করে দেখ তো এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি?"

যা হোক, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বপ্নের তিনটি রাত্রির দিনকে তারবিয়ার দিন- "اَيَّامُ التَّرْوِيَةِ" হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ প্রদানের হিকমত : আল্লাহ তা'আলা কেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন? এর মধ্যে বিরাট হিকমত ও রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরম ও পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে خَلِيْلُ اللّٰهِ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে উক্ত উপাধির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন নেক সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তাকে একজন সৎ সন্তান দান করলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বৃদ্ধকালে পুত্র সন্তান পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খুশির সীমা রইল না। আল্লাহ তা'আলা এবার হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, পুত্রের প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভালোবাসা বেশি, না আল্লাহ তা'আলার প্রতি। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্বপ্নযোগে নির্দেশ দিলেন, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য।

এ সুকঠিন পরীক্ষায় ও পরিশেষে হযরত ইব্রাহীম (আ.) পূর্ণাঙ্গভাবে সফলকাম হলেন। দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসাই যে তাঁর অন্তরে অধিক- পুত্র কুরবানিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আরেকবার তিনি তা প্রমাণ করলেন। ফলে তাঁর خَلِيْلُ اللّٰهِ উপাধি সার্থক হলো।

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ - আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বললেন, "আব্বাজান! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- তা আপনি অতিশীঘ্র করে ফেলুন।"

এর দ্বারা একদিকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) আত্ম উৎসর্গের এক নজিরবিহীন উদাহরণ পেশ করেছেন অপরদিকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যল্প বয়সে তাঁকে আশ্চর্যজনক মেধাশক্তি ও ইলম দান করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর নিকট আল্লাহর নির্দেশের হাওলাও দেননি; বরং শুধুমাত্র একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) বুঝে ফেললেন যে, নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। আর প্রকৃত পক্ষে ইহা আল্লাহর নির্দেশের একটি রূপ মাত্র। সুতরাং হযরত ইসমাঈল (আ.) উত্তরে স্বপ্ন না বলে আল্লাহর নির্দেশের কথা বলেছেন।

ওহীয়ে গায়রে মাতলু-এর দলিল : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা হাদীস অস্বীকারকারীদের মতবাদের অসারতা ও ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে থাকে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্র কুরবানির নির্দেশ স্বপ্নযোগে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত ইসমাঈল (আ.) স্পষ্ট ভাষায় তাকে "আল্লাহর নির্দেশ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং নবীগণের স্বপ্ন ও বাণীও ওহীর মর্যাদাপ্রাপ্ত।

"سَتَجِدُنِىٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ الخ" আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : কুরবানির ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আল্লাহ চাহে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। এখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর চরম শিষ্টাচার ও নম্রতা লক্ষণীয়–

প্রথমত ইনশাআল্লাহ বলে বিষয়টিকে আল্লাহর উপর হাওলা করে দিয়েছেন। এ হওয়ালার মধ্যে আত্ম গর্বের বাহ্যিক যে রূপটি প্রকাশিত হতে পারত তা দূর করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত তিনি এভাবেও বলতে পারতেন যে, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। কিন্তু তা না বলে তিনি বলেছেন– "আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" যার দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীতে ধৈর্যশীল আমি একা নই; বরং আমার ন্যায় আরও বহু ধৈর্যশীল রয়েছে। আমি শুধু তাদের জমাতে শামিল হতে চাই। –[রূহুল মা'আনী]

আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করার কারণ : বরকত ও শক্তি হাসিলের জন্য হযরত ইসমাঈল (আ.) তার صَبْر বা ধৈর্যকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত না কোনো ভালো কাজ করা যায় আর না কোনো মন্দ কার্য হতে আত্মরক্ষা পাওয়া যায়।

"فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) যখন আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে কাত করে শোয়ায়ে দিলেন ....।

اَسْلَمَا শব্দের অর্থ হলো, ঝুঁকে যাওয়া, বাধ্যগত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যখন তাঁরা উভয়ে আল্লাহর আদেশের সামনে ঝুঁকে গেলেন, পিতা-পুত্রকে জবাই করার জন্য এবং পুত্র জবাই হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। এখানে لَمَّا -এর জবাবের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এসব প্রকাশিত হওয়ার পর কি এক আশ্চর্যজনক হৃদয়-বিদারক ঘটনার অবতারণা হয়েছে তা ভাষায় অবর্ণনীয়।

কতিপয় তাফসীরকারক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, শয়তান হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার জন্য তিন বার চেষ্টা করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজও হাজীগণ মিনাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে।

পিতা-পুত্র যখন কুরবানি দেওয়ার জন্য মিনার নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে লক্ষ্য করে হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, পিতা! আপনি আমাকে কুরবানির পূর্বে শক্ত করে বেঁধে নিন। আপনার ছুরি ধারাল করে নিন। আর ইচ্ছা করলে আমার পরিত্যক্ত জামাটি আমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা প্রশান্তি লাভ করবেন। আর আম্মাকে আমার সালাম বলবেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন– "পুত্র! আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ করার ব্যাপারে তুমি আমার কতই না উত্তম সাহায্যকারী" এই বলে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে চুমু খেলেন এবং বেঁধে ফেললেন।

অতঃপর কপালের এক পার্শ্বে তাঁকে শোয়ায়ে দিলেন। এখানে "وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ" -এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে এভাবে কাত করে শোয়ায়ে দিলেন যে, তার কপালের এক পার্শ্ব জমিনকে স্পর্শ করেছিল। অভিধানের দৃষ্টিতেও এ ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য। কেননা আরবি ভাষায় কপালের দুই পাশকে جَبِيْن বলে। আর কপালকে বলে جَبْهَةٌ।

কিন্তু কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– "তাকে উপুড় করে জমিনে শোয়ায়ে দিলেন।" মুহাক্কিকগণ উভয় বক্তব্যের মধ্যে তাতবীক বা সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রথমত হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কাত করিয়ে শোয়ায়ে ছিলেন। কিন্তু পরে যখন বারংবার ছুরি চালিয়ে কাবু করতে পারলেন না তখন উপুড় করে শোয়ায়ে দিলেন।

–[মা'আরিফ, মাযহারী, রুহুল মা'আনী]

"وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বললাম, হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নাদেশকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছ। আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে তোমার যা করার ছিল তা তুমি করেছ। তোমার দায়িত্ব পালনে তুমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করনি। স্বপ্নে তো হযরত ইব্রাহীম (আ.) এটাই দেখিয়েছেন যে, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করছেন। এখন সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও।

"اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাই করার ঘটনা উল্লেখ করে পরিশেষে ইরশাদ করেছেন– "আমি মুখলিস বান্দাদেরকে অনুরূপভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি– পুরস্কৃত করে থাকি"। অর্থাৎ যখন আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয়, নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে কুরবানি দিয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে ব্রতী হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াবী বিপদ-আপদ হতে হেফাজত করেন। তদুপরি আখেরাতের ছওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেন।

অনুবাদ :

١٠٧. وَفَدَيْنٰهُ اَىِ الْمَامُوْرَ بِذَبْحِهٖ وَهُوَ اِسْمَاعِيْلُ اَوْ اِسْحَاقُ قَوْلَانِ بِذِبْحٍ بِكَبْشٍ عَظِيْمٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ الَّذِىْ قَرَّبَهُ هَابِيْلُ جَاءَ بِهٖ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَبَحَهُ السَّيِّدُ اِبْرَاهِيْمُ مُكَبِّرًا.

১০৭. আর আমি ছাড়িয়ে নিলাম তাকে অর্থাৎ যাকে জবাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল অথবা হযরত ইসহাক (আ.). এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। একটি মহান কুরবানির বিনিময়ে– দুম্বা, যা বেহেশত হতে পাঠানো হয়েছে। এটা সেই দুম্বা যাকে হাবীল কুরবানি স্বরূপ পেশ করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহু আকবার বলে তাকে জবাই করেছেন।

١٠٨. وَتَرَكْنَا اَبْقَيْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ثَنَاءً حَسَنًا.

১০৮. আর আমি অবশিষ্ট রেখেছি– বাকি রেখেছি তার ব্যাপারে পরবর্তীদের মধ্যে উত্তম প্রশংসা।

١٠٩. سَلٰمٌ مِنَّا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ.

১০৯. শান্তি আমার পক্ষ হতে ইবরাহীমের উপর।

١١٠. كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ.

১১০. তদ্রূপ-যদ্রূপ আমি তাকে প্রতিদান দিয়েছি– প্রতিদান দিয়ে থাকি– সদ্ব্যবহারকারীদেরকে– নিজেদের নফসের সাথে।

١١١. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

১১১. নিশ্চয় সে আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

١١٢. وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ اُسْتُدِلَّ بِذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الذَّبِيْحَ غَيْرُهُ نَبِيًّا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ يُوْجَدُ مُقَدَّرًا نُبُوَّتُهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

১১২. আর আমি শুভ সংবাদ দিয়েছি তাকে (পুত্র) ইসহাকের– এটা হতে প্রমাণ করা হয় যে, অন্য জনকে কুরবানি করা হয়েছে। নবীরূপে এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ (نَبِيًّا) হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব এমতাবস্থায় হবে যে, তার নবুয়ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। (আর) সে সৎকর্মশীলদের একজন হবে।

١١٣. وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ بِتَكْثِيْرِ ذُرِّيَّتِهٖ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ط وَلَدِهٖ بِجَعْلِنَا اَكْثَرَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَسْلِهٖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ مُؤْمِنٌ وَّظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ كَافِرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْكُفْرِ.

১১৩. আর আমি তাঁকে বরকত দান করেছি– তাঁর সন্তানসন্ততি প্রবৃদ্ধির আধিক্যের মাধ্যমে এবং ইসহাককেও (যিনি) তাঁর সন্তান। অধিকাংশ নবী তাঁর বংশ হতে নির্ধারণ করার মাধ্যমে। আর তাঁদের উভয়ের সন্তানসন্ততিতে কতক সৎকর্মশীল– ঈমানদার এবং কতক স্বীয় নাফসের উপর জুলুমকারী কাফের স্পষ্টরূপে– যাদের কুফর সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি বড় কুরবানি দান করেছি। বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) উক্ত আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকালেন। তখন দেখলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি দুম্বা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কতিপয় বর্ণনামতে এটা সেই দুম্বা ছিল যা হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হাবীল কুরবানি হিসেবে পেশ করেছিলেন।

যা হোক এ জান্নাতী দুম্বা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে দান করা হয়েছে, আর তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে তাকে জবাই করেছেন। তাকে এ জন্য عَظِيْم (মহান) বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তা ছাড়া তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়-এর অবকাশ নেই। -[মা'আরিফ]

যাবীহ-এর ব্যাপারে মতপার্থক্য এবং অগ্রগণ্য মাযহাব : উপরে আয়াতসমূহের তাফসীর এ নিরিখে করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যে পুত্র কুরবানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে ছিল হযরত হযরত ইসমাঈল (আ.)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং-

(ক) হযরত ওমর (রা.), আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), আব্বাস (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার (রা.), সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.), কাতাদাহ (রা.), মাসরূক (র.), ইকরামাহ (র.), আতা (র.), মুকাতেল (র.), যুহরী (র.) ও সুদ্দী (র.) প্রমুখ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষীগণের মতে যবীহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)।

(খ) অপরদিকে হযরত ইবনে ওমর (রা.), আবূ হুরায়রাহ (রা.), আবূ তোফায়েল (র.), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.), হাসান বসরী (র.), মুজাহিদ (র.), ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.), শা'বী (র.), মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারজী (র.) তথা জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ.)।

পরবর্তী মুফাস্সিরগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (র.)ও প্রথমোক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপরদিকে হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) ও অন্যান্যগণ শেষোক্ত মাযহাবকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা কঠোরভাবে প্রথমোক্ত মাযহাবের প্রতিবাদ করেছেন।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাহাবী ও তাবেয়ীনের মধ্যে কতিপয় এমন ব্যক্তিগণ রয়েছেন যাদের হতে পরস্পর বিরোধী মতামত বর্ণিত হয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আলী (রা.), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.), হাসান বসরী (র.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ। সম্ভবত তারা একেক সময় একেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যা হোক, কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি এবং হাদীস ও ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যে পুত্র জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। এ মতের পক্ষে প্রসিদ্ধ দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

১. কুরআন মাজীদে সে পুত্রের কুরবানির পূর্ণাঙ্গ ঘটনা পেশ করার পর বলা হয়েছে- بَشَّرْنَاهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ [আমি অতঃপর তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি যিনি নবী ও সালিহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এটা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে পুত্রকে কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি অবশ্যই ইসহাক ভিন্ন অন্য কেউ হবেন। যার কুরবানির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর হযরত ইসহাক (আ.)-এর জন্মের খোশখবর দেওয়া হয়েছে।

২. হযরত ইসহাক (আ.) সম্পর্কীয় উক্ত খোশখবরে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি নবী হবেন। তা ছাড়া অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, হযরত ইসহাকের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ঔরষে হযরত ইয়াকূব (আ.) জন্মগ্রহণ করবেন। فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ আমি সারাকে ইসহাকের সুসংবাদ পাঠালাম এবং ইসহাকের ঔরষে ইয়াকূবের জন্মলাভের কথাও জানিয়ে দিলাম। এটা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বড় হবেন। এমনকি তাঁর আওলাদ হবে। সুতরাং বাল্যকালে নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে? আর যদি বাল্যকালে নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হতো তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ.) বুঝে ফেলতেন যে, অদ্যাবধি তো সে নবুয়ত পায় নি এবং তার ঔরষে হযরত ইয়াকূবও জন্মলাভ করেনি। কাজেই জবাইয়ের মাধ্যমে তার মৃত্যু হতে পারে না। এটা তো স্পষ্ট এমতাবস্থায় তা না কোনো বড় পরীক্ষা হতো আর না তা সম্পন্ন করার দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রশংসার পাত্র হতে পারতেন। পরীক্ষা তো তখনই হতে পারে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) মনে করতেন যে, জবাই করার দ্বারা আমার এ সন্তান খতম হয়ে যাবে। আর এ মানসিকতা নিয়েই তিনি কুরবানি করতে উদ্যত হবেন। সুতরাং এটা কেবল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ব্যাপারেই সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে। কেননা না তার নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আর না দীর্ঘজীবি হওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

৩. কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি হতে প্রতীয়মান হয় যে, যে পুত্রের কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) ইরাক হতে হিজরত করে যাওয়ার সময় একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। উক্ত দোয়ার জবাবে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে حَلِيْمٌ অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, উক্ত ছেলে যখন তার পিতার সাথে চলা-ফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জবাই করার জন্য স্বপ্নযোগে নির্দেশ দিলেন। ঘটনার এ ধারাবাহিকতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ছেলেটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র। আর সর্বসম্মতভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। অথচ হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। কাজেই এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই ছিলেন যাবীহ।

৪. এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত যে, কুরবানির উক্ত ঘটনাটি মক্কার আশেপাশে সংঘটিত হয়েছে। কেননা তা তো সংঘটিত হয়েছে মিনায়। তা ছাড়া যুগ যুগ ধরে হজের মওসুমে মক্কায় কুরবানি করার প্রথা চালু রয়েছে। যে দুম্বাটিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে জবাই করেছেন তার শিং কা'বা শরীফে ঝুলন্ত রয়েছিল। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-এর সমর্থনে একাধিক বর্ণনার হাওলা দিয়েছেন। হযরত আমের শা'বী (র.) বলেছেন– "আমি নিজে কা'বা শরীফে উক্ত শিং দেখেছি।"

সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেছেন, সেই দুম্বার শিং যুগ যুগ ধরে কা'বা শরীফে লটকানো ছিল। অতঃপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন বায়তুল্লাহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তখন তা পুড়ে যায়। আর এটা তো জানা কথা যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই মক্কায় বসবাসরত ছিলেন, হযরত ইসহাক (আ.) নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই যাবীহ ছিলেন।

৫. নবী করীম ﷺ একটি হাদীসে ইরশাদ করেছেন– "اَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ" 'আমি দুই যাবীহের পুত্র' হাদীসখানার তাৎপর্য হচ্ছে– হযরতের ﷺ আপন পিতা আব্দুল্লাহকে তার পিতা আব্দুল মুত্তালিব কুরবানির জন্য মানত করেছিলেন। অতঃপর তৎকালীন বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানী গুণীগণের পরামর্শক্রমে তাঁর প্রাণের বিনিময়ে একশত উট সদকা করেছিলেন। সুতরাং এক যাবীহ পাওয়া গেল। আর অনিবার্যভাবেই অপর যাবীহ হলেন হযরত ইসমাইল (আ.)। কেননা নবী করীম ﷺ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের। আর অত্র হাদীসে নবী করীম ﷺ দ্বিতীয় যাবীহ দ্বারা সে ইসমাঈল (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা নিশ্চিত বলা যায়।

বিরোধীগণের দলিলসমূহের জবাব এবং যেসব মুসলিম মনীষী তাকে সমর্থন করে তাদের সংশয়ের নিরসন : যেসব সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন যাবীহ তাদের বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে হাফিজ ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন–

এর গূঢ়-রহস্য তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে বাহ্যত যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে– এ সব বক্তব্যের উৎস হলো হযরত কা'বে আহবার। কেননা যখন তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে মুসলমান হলেন তখন হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁর পুরানো কিতাব সমূহের বক্তব্য শুনাতে আরম্ভ করলেন। কোনো কোনো সময় হযরত ওমর (রা.) তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা হতে কেউ কেউ সুযোগ গ্রহণ করল। তারা ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে কা'বে আহবারের নিকট হতে যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন।

ইবনে কাছীরের উপরিউক্ত বক্তব্য বাস্তবিকই যথার্থ। কেননা হযরত ইসহাক (আ.)-কে মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই যাবীহ বলে দাবি ও প্রচার করে থাকে। বর্তমান বাইবেলে উক্ত জবাইয়ের ঘটনাটি নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

"এরপর আল্লাহ তা'আলা আবরাহাম (আ.)-কে পরীক্ষা করলেন এবং বললেন, হে আবরাহাম! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত : আল্লাহ অতঃপর বললেন, তুমি তোমার পুত্র ইসহাক (আ.) যে তোমার "একমাত্র সন্তান" এবং যাকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ কর। তাকে নিয়ে সুরিয়া দেশে চলে যাও এবং তথায় একটি পাহাড়ে– যেই পাহাড়ের কথা আমি তোমাকে বলে দিব তথায় কুরবানি হিসেবে পেশ করে দাও।"

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইহুদিরা স্বজন-প্রীতি করতে যেয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে হযরত ইসহাক (আ.)-এর নামোল্লেখ করেছেন। তারা মূল তাওরাতের ভাষা বিকৃত করেছেন। কেননা এখানেই তাকে একমাত্র সন্তান বলা হয়েছে। অথচ একমাত্র সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) নন। কেননা সর্বসম্মতভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রথম সন্তান এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল হযরত ইসহাক (আ.)-এর বহু পূর্বে। খোদ বর্তমানের বাইবেল হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাফিজ ইবনে কাছীর (র.) বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার জন্য আরও লেখেন–

ইহুদিদের পবিত্র কিতাবসমূহে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বৎসর। অপরদিকে যখন হযরত ইসহাক (আ.) জন্মলাভ করেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বয়স হয়েছিল একশত বৎসর। তাদের কিতাবে আরও উল্লেখ আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে তাঁর একমাত্র সন্তান জবাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক নসখায় [সংস্করণে] "একমাত্র"-এর পরিবর্তে "প্রথম সন্তান" কথাটির উল্লেখ রয়েছে। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদিরা এখানে– "ইসহাক" শব্দটি নিজেদের পক্ষ হতে মনগড়াভাবে জুড়ে দিয়েছে। আর এর কারণ হচ্ছে– হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন ইহুদিদের পরদাদা। অপরদিকে হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আরবদের পরদাদা।

হাফেজ ইবনে কাছীর এতদ্বিষয়ে আরও একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর খেলাফতের যুগে এক ইহুদি আলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কোন সন্তানকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! খোদার কসম, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। ইহুদিরা তা ভালোভাবেই জানে। তবে আরবদের প্রতি ঈর্ষার দরুন তারা ইসহাকের নাম প্রচার করে থাকে।

উপরিউক্ত প্রমাণাদির দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই ছিলেন যাবীহ।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো এমন কিছুর নির্দেশ দেন মূলত যার বাস্তবায়ন চান না: আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার জন্য। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে উদ্যত হলেন, এমনকি পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে আরম্ভ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আর তা কার্যকর করতে দিলেন না। সুতরাং এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মাঝে-মধ্যে এমন কিছু নির্দেশ দেন মূলত যা সংঘটিত হওয়া কামনা করেন না। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতও তা-ই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানি হওয়া যখন আল্লাহ তা'আলা চাননি তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে তা করার জন্য নির্দেশ দিলেন কেন?

মুফাসসিরগণ এর জবাবে বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র যাকে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনে পেয়েছেন– বহু আবেদন-নিবেদন করত যাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে চেয়ে নিয়েছেন তাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানি করতে প্রস্তুত কিনা তা যাচাই করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর সেই পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ.) যে একশত ভাগই সফল হয়েছেন তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তবায়নের পূর্বেই হুকুম রহিত হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আলিমগণের মতামত বর্ণনা কর : আলোচ্য আয়াত হতে সাব্যস্ত হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার পূর্বেই জবাইয়ের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি জান্নাতী দুম্বা পাঠিয়েছিলেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকেই জবাই করেছেন। সুতরাং এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো হুকুম বাস্তবায়নের পূর্বেই রহিত হয়ে যেতে পারে।

অধিকাংশ মুজতাহিদ ও ফকীহগণ উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু হানাফী ফকীহগণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী অধিকাংশ আলিম ও মু'তাযেলীদের মতে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে তথা অমলের সময় আসার পূর্বে কোনো হুকুম বা শরয়ী বিধান মানসূখ (রহিত) হতে পারে না।

উপরিউক্ত দলিলের জবাবে তারা বলেন যে, মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কুরবানি করার হুকুমই দেওয়া হয়নি, বরং হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করছেন। আর বাস্তবেও তিনি তা করেছেন। যদিও কুদরতে ইলাহী প্রতিবন্ধক হওয়ার দরুন হযরত ইসমাঈল (আ.) মৃত্যুবরণ করেননি।

"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ" আর তাঁর ব্যাপারে আমি পরবর্তী লোকদের মধ্যে উত্তম প্রশংসার প্রথা চালু করে রাখলাম।

আয়াতে এটা স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কি অবশিষ্ট রেখেছেন? সুতরাং মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী লোকজনদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য উত্তম প্রশংসার প্রবর্তন করে রেখেছেন। সুতরাং সকল আহলে কিতাবই তার উপর সালাম পৌঁছায় ও তার জন্য দোয়া করেন।

২. আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর উপর সালাম পাঠানোর প্রচলন রেখেছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার বিপদ-আপদ হতে তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং তাকে দুর্নাম হতে হেফাজত করেছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলেন– "وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ" আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য সত্য কথনের প্রচলন রাখুন। উক্ত দোয়া কবুল করত আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

"كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আমি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যদ্রূপ প্রতিফল দান করেছি সৎলোক ও মুখলিস লোকদেরকে আমি অনুরূপভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। আর তাদের সীমাহীন বিপদাপদেও নিপতিত করি।

যারা 'ইহসান' (ইখলাস)-এর পথ গ্রহণ করে– আমার বন্ধুত্বের দাবি করে আমি তাদের উপর কঠিন পরীক্ষা চাপিয়ে দেই। আর তা তাদের অনাহূত দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করার জন্য নয়; বরং ক্রমান্বয়ে তাদের মর্যাদা উঁচু করার জন্যই এ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। যাতে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। আর পরীক্ষার কারণে যেসব বিপদ-আপদে তাদেরকে নিমজ্জিত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সহজেই তা হতে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসি। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছিল। এমন কি তাঁর ন্যায় অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও সৎলোকদের ব্যাপারেও তা-ই ঘটে থাকে।

"وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আওলাদের মধ্যে কিছু সৎলোকও রয়েছে। আবার এমন কিছু লোকজন রয়েছে যারা স্পষ্টত নিজেদের ক্ষতি করছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের এ ভ্রান্ত আকিদাকে খণ্ডন করেছেন যে, তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর আওলাদ হওয়ার মর্যাদাবান ও পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সৎলোকের সাথে সম্পর্ক থাকাই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং পরিত্রাণ লাভের মূল ভিত্তি হলো আকিদা-বিশ্বাস ও আমল। খালেস আকিদা-বিশ্বাস ও সৎকর্মের গুণেই শুধুমাত্র মর্যাদাবান হতে পারে এবং আখেরাতে পরিত্রাণের আশা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানির ঘটনা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যের প্রতিও পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর ঔরষ হতে দুটি বড় বড় জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরগণ হলেন বনূ ইসরাঈল। তাদের হতে দুটি বড় ধর্মীয় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্ভব হয়েছে। উক্ত দুটি ধর্ম পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা দখল করে রেখেছে। অপর জাতি হলো বনূ ইসমাঈল তথা মক্কাবাসীগণ। কুরআন মাজীদ নাজিল হওয়ার সময় তারাই ছিল সমগ্র আরবের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। আর তাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন কুরাইশগণ। বস্তুত এ দু'টি জাতির ভাগ্যে যে মর্যাদা-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ হয়েছিল তা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উক্ত দু'জন মহান পুত্রের সাথে সম্পর্কের কারণেই হয়েছিল। পৃথিবীতে কত জাতি কত সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে কিন্তু নিমিষেই আবার তা তলিয়ে গেছে ইতিহাসের অতল গহ্বরে। কিন্তু এ দু জাতির উত্থান আজও পতনের মুখ দেখেনি। কিয়ামতের পূর্বে দেখবেও না। আর সেই খোদানুগত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আত্ম উৎসর্গের বরকতেই সম্ভব হয়েছে যা তোমাদের আদি পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন তা মূলত বংশগত কারণে নয়। বরং তাদের ঈমান-আকিদা খালেস হওয়া এবং তাদের আমল ভালো হওয়া তথা খাঁটি খোদা প্রেমিক হওয়ার কারণেই একমাত্র তারা মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এখন তোমরাও যদি তাদের ন্যায় মর্যাদাবান হতে চাও তাহলে তোমাদেরকেও তাদের গুণাবলির অধিকারী হতে হবে– বহু কঠিন কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধুমাত্র বংশের দোহাই দিয়ে না দুনিয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে আর না আখেরাতে আল্লাহর আজাব হতে পরিত্রাণ পাবে। কেননা হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.) উভয়ের আওলাদে ঈমানদার ও কাফের দুই শ্রেণির লোকজনই [অন্তর্ভুক্ত] হতে পারে। মোটকথা হযরত ইব্‌রাহীম বা হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর দোহাই দিয়ে কিছুই হবে না বরং যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ করবে।

অনুবাদ :

١١٤. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ بِالنُّبُوَّةِ.

১১৪. আর আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম – নবুয়ত দান করে।

١١٥. وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ اَىْ اِسْتِعْبَادِ فِرْعَوْنَ اِيَّاهُمْ.

১১৫. আর আমি নাজাত দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে এবং তাদের কওমকে [অর্থাৎ] বনূ ইসরাঈলকে মহাবিপদ হতে অর্থাৎ তাদেরকে ফেরাউনের গোলামি হতে।

١١٦. وَنَصَرْنٰهُمْ عَلَى الْقِبْطِ فَكَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ.

১১৬. আমি তাঁদেরকে সাহায্য করেছি কিবতীদের বিরুদ্ধে সুতরাং তাঁরাই বিজয়ী হয়েছিল।

١١٧. وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ اَلْبَلِيْغَ الْبَيَانِ فِيْمَا اَتٰى بِهٖ مِنَ الْحُدُوْدِ وَالْاَحْكَامِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّوْرٰةُ.

১১৭. আর আমি তাঁদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছিলাম যা স্পষ্ট বর্ণনাকারী ঐ সব বিষয়কে যা তার মধ্যে রয়েছে যেমন– ফৌজদারি দণ্ডবিধি, আহকাম ইত্যাদি। আর তা হলো তাওরাত।

١١٨. وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ.

১১৮. আমি প্রদর্শন করেছি পথ-রাস্তা সহজ-সরল।

١١٩. وَتَرَكْنَا اَبْقَيْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ثَنَاءً حَسَنًا.

১১৯ আর আমি অবশিষ্ট রেখেছি– বাকি রেখেছি তাদের উভয়ের ব্যাপারে পরবর্তীগণের মধ্যে উত্তম প্রশংসা।

١٢٠. سَلَامٌ مِنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

১২০. শান্তি আমার পক্ষ হতে মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-এর উপর।

١٢١. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُمَا نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

১২১. আমি তদ্রূপ-যদ্রূপ তাদের উভয়কে প্রতিদান দিয়েছি– সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

١٢٢. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

১২২. তাঁরা উভয়ে আমার মু'মিন বান্দাগণের অন্যতম ছিল।

١٢٣. وَاِنَّ اِلْيَاسَ بِالْهَمْزَةِ اَوَّلَهُ وَتَرْكِهٖ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ قِيْلَ هُوَ ابْنُ اَخِىْ هَارُوْنَ اَخِىْ مُوْسٰى وَقِيْلَ غَيْرُهُ وَاُرْسِلَ اِلٰى قَوْمٍ بِبَعْلَبَكَّ وَنَوَاحِيْهَا.

১২৩. নিশ্চয় ইলইয়াস (আ.) اِلْيَاسْ শব্দটির প্রথমে হামযাসহ এবং হামযা ব্যতীত উভয় অবস্থায় পঠিত হয়েছে। অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন– তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হারূন (আ.)-এর ভাতিজা। তাঁকে বা'লাবাক্কা ও তার আশ-পাশের এলাকায় পাঠানো হয়েছিল।

١٢٤. اِذْ مَنْصُوْبٌ بِاُذْكُرْ مُقَدَّرًا قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ اللّٰهَ.

১২৪. স্মরণ করো যখন (اِذْ) একটি উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের দ্বারা مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তিনি তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। তোমরা কি ভয় করবে না? আল্লাহ তা'আলাকে।

١٢٥. اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا اِسْمُ صَنَمٍ لَهُمْ مِنْ ذَهَبٍ وَبِهِ سُمِّيَ الْبَلَدُ مُضَافًا اِلَى بَكَّ اَيْ اَتَعْبُدُوْنَهُ وَتَذَرُوْنَ تَتْرُكُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ فَلَا تَعْبُدُوْنَهُ.

১২৫. তোমরা কি আহ্বান করবে বা'লকে? বা'ল তাদের একটি স্বর্ণনির্মিত মূর্তি (প্রতিমা)। আর بك -এর দিকে ইযাফত করত এর দ্বারা শহরের নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি এর ইবাদত কর? আর পরিহার করবে পরিত্যাগ করবে সর্বোত্তম স্রষ্টাকে সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে না?

তাহকীক ও তারকীব

"وَنَصَرْنٰهُمْ" -এর মধ্যকার যমীরের مَرْجِعْ কি? نَصَرْنٰهُمْ -এর هُمْ -এর মারজি'র ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. এখানে هُمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) এবং তাদের জাতি। এটাই জমহুরের মত এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা এর পূর্বে "وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا" রয়েছে।

২. "هُمْ" যমীরের মারজি' হলো, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)। এটা ইমাম ফাররার (র.)-এর মাযহাব। তাঁর মতে দুয়ের অধিক হলেই جَمْع হিসেবে গণ্য করা যায়। কেননা এর পরে ধারাবাহিকভাবে "وَاٰتَيْنٰهُمَا" এবং وَهَدَيْنٰهُمَا রয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্ম-উৎসর্গের উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) নমরূদ ও তার কুচক্রী বাহিনীর হাত হতে পরিত্রাণ দিয়ে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার নব জীবন লাভের উল্লেখ করেছেন।

এখানে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের জীবনীর সাথে হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্তের গভীর মিল রয়েছে। প্রথমত বড় মিল হলো হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের ন্যায় হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে জীবনে কম আত্মত্যাগ করতে হয়নি– যৎসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিতে হয়নি। তা ছাড়া হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যদ্রূপ নমরূদ ও তার অনুসারীদের হাত হতে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) কেও তদ্রূপ ফেরাউন ও তার অনুগামীদের হাত হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তৎসংশ্লিষ্টদের প্রতি যদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয়েছিল তদ্রূপ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর উপরও আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্য করেছেন।

"وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছি।" এখানে আল্লাহ তা'আলা অতি সংক্ষিপ্তাকারে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের বিবরণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে নবুয়তের নিয়ামত দান করেছেন। তাদেরকে এবং তাদের জাতি বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউন ও কিবতীদের সীমাহীন নির্যাতন হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন। ফিরআউন ও তার সহযোগী কিবতীরা হযরত মূসা (আ.)-এর গোত্র বনূ ইসরাঈলকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছিল। বনূ ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে তারা হত্যা করত আর মেয়েদেরকে তাদের সেবার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে জীবিত রাখত।

হযরত মূসা (আ.) যখন ফেরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং বনূ ইসরাঈলকে মুক্তি দানের আহ্বান জানালেন তখন ফেরাউন অত্যন্ত চটে গেল। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলেন। পরিশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর দলই বিজয়ী হলেন। ফেরাউন ও তার সহযোগীরা নিপাত গেল- দলবলসহ ফেরাউন নীল নদে ডুবে মরল।

তাদের মরণোত্তর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এক আশ্চর্যজনক গরমিল পরিলক্ষিত হয়। ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে যুগ যুগ ধরে মানুষ ঘৃণা ও নিন্দার সাথে স্মরণ করছে অথচ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে স্মরণ করছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে। মূলত এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরতেরই কারিশমা। কিয়ামত অবধি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে স্মরণ করতে যেয়ে মানুষ বলতে থাকবে- سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর উপর শান্তি ......।

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের প্রকাশ : আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন নবীগণের কাহিনীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ে। হযরত মূসা (আ.) তদীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.) এবং গোটা বনূ ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের অনুগ্রহ করেছেন।

এক. তাঁকে নবুয়ত ও অন্যান্য বহু নিয়ামত দান করেছেন।

দুই. অসীম বিপদ-আপদ হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা উভয় ধরনের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- "وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ" আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছি। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপর দিকে "وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ" [আমি তাদেরকে এবং তাদের গোত্রকে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি] এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বিপদ-মসিবত হতে তাঁকে নাজাত দিয়েছেন। গোটা বনূ ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সহযোগীদের অত্যাচার হতে নাজাত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে পার্থিব ও দীনি উভয় প্রকারের কল্যাণই দান করেছেন। পার্থিব কল্যাণ যেমন- জীবন, বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, কৃতিত্ব ও মর্যাদা। আর দীনি কল্যাণ হলো ঈমান, সৎকর্ম, নবুয়ত ও রিসালাত এবং মোজেজা ইত্যাদি।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধনে ধনী করেছেন। খোদাদ্রোহীদের সকল প্রকার নির্যাতন হতে নিষ্কৃতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত ও করুণা বর্ষিত হয়েছে তাদের উপর।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে যে সকল নিয়ামত দান করেছেন তাদের বিস্তারিত বিবরণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর উপর অনুগ্রহ করেছি। অতঃপর কয়েকটি আয়াতে তিনি সেই অনুগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নে আমরা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও ইতিহাসের আলোকে তাদের মোটামুটি বিস্তারিত রূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

এক. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) এবং তাঁর জাতি বনূ ইসরাঈলকে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি। এটার প্রতি ইঙ্গিত করত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ" আর আমি তাদেরকে এবং তাদের জাতিকে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি। এখানে "اَلْكَرْبِ الْعَظِيْمِ" মহাবিপদ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ নেই। মুফাসসিরগণ হতে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. নীল নদে ডুবে যাওয়া হতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) ও তাঁদের গোত্রকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। আর ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর জাতি বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউন ও তার সহযোগী কিবতীদের জুলুম নির্যাতন হতে নাজাত দিয়েছিলেন।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে সাহায্য করেছিলেন। ফলে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর জাতি ফেরাউন ও কিবতীদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। আল্লাহর বাণী– "وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ" [আর আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম সুতরাং তারাই হয়েছে বিজয়ী।]

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের নিকট গিয়েছিলেন। ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন এবং মোজেজা তলব করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা প্রমাণিত হওয়ার পর ফেরাউন ও তার সহযোগীরা তাকে জাদু বলে উড়িয়ে দেয়। ফেরাউন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ খোদা (রব) বলে দাবি করে। সে বলে "اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى" আমি তোমাদের বড় রব। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট দাবি জানান বনূ ইসরাঈলকে মুক্তি দেওয়ার জন্য– তার সাথে মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য; কিন্তু ফেরাউন তাঁর দাবি মেনে তো নিলই না; বরং দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে চলল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারী বনূ ইসরাঈলকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। ফেরাউন দলবল নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। আল্লাহর কুদরতে হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈল নীল নদ পার হয়ে চলে গেলেন। পক্ষান্তরে তাদের পিছু ধাওয়া করতে যেয়ে ফেরাউন তার দলবলসহ নীল নদে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

তিন. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে একটি সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ" আর আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে সুস্পষ্ট কিতাব প্রদান করেছি। যাতে সর্বপ্রকার দণ্ডবিধান ও অপরাপর আহকাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিধৃত হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে যাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা ছিল অত্যন্ত বক্র স্বভাবের। তারা মূসা (আ.)-এর রিসালাতকে মেনে নিতে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। শিরক ও দুনিয়ার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ তাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় মন-মগজে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, তা হতে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা ছিল অতি দুরূহ কাজ। হযরত মূসা (আ.) দাওয়াতের জবাবে তারা নানা টাল-বাহানা ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। সত্যের পক্ষে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দলিলাদি মোজেজা স্বচক্ষে দেখেও তারা সত্যের প্রতি এতটুকু আকৃষ্ট হয়নি; বরং জাদু বলে– সব মোজেজাকে প্রত্যাখ্যান করেছে– হযরত মূসা (আ.)-কে জাদুকরদের শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করেছে। কাজেই তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য বলিষ্ঠ যুক্ত ও মোহনীয় প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ একটি আসমানি কিতাবের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাতকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করেই নাজিল করেছেন। এখানে "اَلْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ" বলে তাওরাতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মূলত তাওরাত ছিল দীন-দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ। তাওরাত সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ফরমান– "اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ" (নিশ্চয় আমি তাওরাত নাজিল করেছি; তাতে রয়েছে হেদায়েত ও আলো।) আর এ মহাগ্রন্থের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে সহজ-সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে– "وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" আর আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে সঠিক-সোজা পথের সন্ধান দিয়েছি– সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করেছি।

চার. আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী উম্মতের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর সুনাম ও সুখ্যাতি জারি রেখেছেন। হাজার হাজার বৎসর ধরে অগণিত মানুষ তাঁদের গুণ-কীর্তন করে আসছে– পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে তাঁদেরকে স্মরণ করছে। তাদের নামের সাথে পড়ছে– "عَلَيْهِ السَّلَامُ" তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে বলছে– "سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ" শান্তি বর্ষিত হোক হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর প্রতি। এত বড় নিয়ামত কয়জনের ভাগ্যে জুটে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার মুখলিস বান্দাগণকে তেমনটি প্রতিদান দিয়ে থাকি যেমনটি প্রতিদান দিয়েছি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে "إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে তাঁর মু'মিন বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ"

পক্ষান্তরে ফেরাউন ও তার সহযোগীরা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদেরকে যদিও বা মানুষ স্মরণে আনে, তবে তা ঘৃণা ও নিন্দার সাথে। ফেরাউনের আলোচনা করতে গেলে একজন প্রতাপশালী পাপী ও জালিমের বিভৎস চেহারাই আমাদের মনের মুকুরে ভেসে উঠে।

এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখের উপকারিতা : কুরআনে মাজীদে যেসব নবী-রাসূলের কাহিনী বিক্ষিপ্তাকারে হলেও মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- তাঁদের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) অন্যতম।

এখানে সূরা সাফ্ফাতে নবী-রাসূলগণের আলোচনায় তাঁকে তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং তাঁর ভাই হারুন ও বনূ ইসরাঈলের প্রতি কি কি অনুগ্রহ করেছেন তার বিবরণ পেশ করেছেন।

উক্ত আলোচনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মোখাতাব ও পাঠকদেরকে এটাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) সত্যের উপর অটল থাকায়, তাঁদের কওম বনূ ইসরাঈল তাঁদের অনুগত থাকায় আমি তাদের উপর অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছি। তাদেরকে ফেরাউন ও কিবতীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছি। সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ লাভ করতে চাও, সারা বিশ্বে বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করতে চাও, তাহলে নবী মুহাম্মদের ﷺ আনুগত্য কর। আমার অশেষ রহমত তোমাদের উপর বর্ষিত হবে; তোমরা এক মহাবিজয়ী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ নেতাদেরকে লক্ষ্য করে যথার্থ বলেছেন- "তোমরা ঈমান আনয়ন কর, পড়, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তাহলে সমস্ত আরব ও আজম তোমাদের পদতলে এসে যাবে।"

"وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ স্থলে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর আলোচনার ধারাবাহিকতায় চতুর্থ পর্যায়ে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর কাহিনী : কুরআনে মাজীদে মাত্র দুটি স্থানে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত সূরা আনআমে এবং দ্বিতীয়ত সূরা সাফ্ফাতের এ কয়টি আয়াতে। তবে সূরা আনআমে তার কোনো কাহিনীর উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর লিষ্টিতে তাঁকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। হ্যাঁ, এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের ঘটনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর বিস্তারিত আলোচনা নেই। নিশ্চয় হাদীসসমূহেও তাঁর অবস্থাদির বিশদ বর্ণনা নেই। এ জন্য তাঁর ব্যাপারে তাফসীরের কিতাবসমূহে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হতে গৃহীত।

মুফাস্সিরে কেরামের একটি ক্ষুদ্র দলের মতে হযরত ইলইয়াস হযরত ইদরীস (আ.)-এর অপর নাম। তাঁরা একই ব্যক্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত ইলইয়াস ও খাজের এক ব্যক্তি। কিন্তু মুহাক্কিকগণ উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কুরআন মাজীদে হযরত ইলইয়াস ও হযরত ইদরীস (আ.)-এর উল্লেখ এমন পৃথকভাবে করা হয়েছে যে, উভয়কে এক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার কোনো অবকাশ নেই। কাজেই হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) তার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা দুজন পৃথক রাসূল। -[আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া]

কখন এবং কোথায় হযরত ইলইয়াস (আ.) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন? হযরত ইলইয়াস (আ.) কবে কোথায় ন হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন– তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ এ ব্যাপারে একম যে, তিনি হযরত হিযকীল (আ.)-এর পরে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে বনূ ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এটা সময়ের কথা, যখন হযরত সোলায়মান (আ.)-এর স্থলাভিষিক্তগণের এক অপকর্মের কারণে বনূ ইসরাঈল দু' দলে বিভক্ত হ গিয়েছিল। এক দলকে বলা হতো ইয়াহুদীয়াহ বা ইয়াহুদাহ। তাদের কেন্দ্র ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। অপর দলকে বলা হতে ইসরাঈল। তাদের রাজধানী ছিল সামেরাহ।

হযরত ইসমাঈল (আ.) জর্দানের জালআদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইসরাঈলীদের তৎকালীন বাদশাহের নাম বাইবে 'আখিয়াব'এবং আরবি ইতিহাস ও তাফসীরের কিতাবে 'আজব' অথবা 'আখব' উল্লেখ রয়েছে। তার স্ত্রী "বা'ল" একটি প্রতিম [দেবী]-এর পূজা করত। সে মহিলাই ইসরাঈলে "বা'ল" নামে একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে সমস্ত বনূ ইসরাঈলকে প্রতিম [মূর্তি] পূজায় লাগিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত ইলইয়াস (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তিনি যেন তথায় যে তাদের তাওহীদের তালীম দেন। ইসরাঈলীদেরকে মূর্তিপূজা হতে বারণ করেন। –[ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর]

দাওয়াত ও গোত্রের সাথে সংঘর্ষ : হযরত ইলইয়াস (আ.) ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াব এবং তার প্রজাদের 'বা'ল' নামক মূর্তির পূজা হতে বারণ করত তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু' একজন ব্যতীত সকলেই তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল; বরং তারা উল্টা তাঁর উপর নির্যাতনের পাঁয়তারা করল। এমনকি বাদশাহ আখিয়াব ও তার স্ত্রী ইসাবেলা তাঁকে শহীদ করার পরিকল্পনা করল। তিনি বহুদূরে একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তথায় বসবাস করতে লাগলেন। অতঃপর বদদোয় করলেন যে, ইসরাঈলীরা যেন দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। যাতে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করতে যেয়ে তিনি মোজেজা দেখাতে পারেন। আর এতে গোত্রের লোকেরা ঈমান গ্রহণ করার সুযোগ পায়। সুতরাং ইসরাঈলীরা মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল।

অতঃপর হযরত ইলইয়াস (আ.) আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে এ আজাব নেমে এসেছে। তোমরা এখন ফিরে আসলে তা দূর হয়ে যাবে। আর এ সুযোগে আমার সত্যতাও যাচাই করতে পারবে। তিনি তাদের নিকট প্রস্তাব দিলেন যে, তোমরা তো দাবি কর ইসরাঈলীদের মধ্যে তোমাদের বা'লের সাড়ে চারশত নবী রয়েছে। তোমরা একদিন তাদের সকলকে হাজির কর। তারা বা'লের নামে কুরবানি পেশ করুন। আর আমি আল্লাহর নামে কুরবানি পেশ করব। যার কুরবানিকে আসমান হতে আগুন নেমে এসে জ্বালিয়ে যাবে তার দীন সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সকলেই উক্ত প্রস্তাব খুশি মনে মেনে নিল।

কারমাল পাহাড়ের পাদদেশে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বা'লের মিথ্যা (ভণ্ড) নবীরা তাদের কুরবানি পেশ করল। তারা ভোর হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বা'লের নিটক প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলইয়াস (আ.) তাঁর কুরবানি পেশ করলেন। আসমান হতে আগুন নেমে এসে তাঁর কুরবানিকে জ্বালিয়ে গেল। এটা দেখে বহু লোক সেজদায় পড়ে গেল। তাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কিন্তু 'বা'ল'-এর ভণ্ড নবীরা তা মেনে নিল না। সুতরাং হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর নির্দেশে 'কাইশুন' নামক ময়দানে তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হলো।

এরপর মুষলধারে বৃষ্টি হলো। সম্পূর্ণ এলাকা পানিতে সয়লাব হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের স্ত্রী ইসাবেলার এতেও বোধ উদয় হলো না। সে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর উপর ঈমান আনল না; বরং তাঁকে হত্যার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

এটা শুনে ইলইয়াস (আ.) সামেরাহ হতে আত্মগোপন করলেন। কিছু দিন পর তিনি বনূ ইসরাঈলের অপর ভূখণ্ড ইয়াহুদীয়াহতে গিয়ে তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করলেন। কেননা ধীরে ধীরে "বা'ল" পূজা তথায়ও বিস্তার লাভ করেছিল। সেখানকার বাদশাহ ইয়াহুরামও তাঁর কথা মানল না। অতঃপর সে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে গেল। কয়েক বৎসর পর তিনি পুনরায় ইসরাইলে চলে গেলেন। আখিয়াব ও তার ছেলে আখযিয়াহকে হেদায়েত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে তার অপকর্মে পূর্ববৎ নিয়োজিত রইল। সুতরাং তাকে আল্লাহ তা'আলা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত করলেন এবং কঠিন রোগ-ব্যাধিতে লিপ্ত করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে তার নিকট নিয়ে গেলেন।

হযরত ইলইয়াস (আ.) জীবিত না মৃত? হযরত ইলইয়াস (আ.) এখনও জীবিত আছেন না মৃত্যুবরণ করেছেন? এ ব্যাপারে আলিমগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

তাফসীরে মাযহারীতে আল্লামা বাগাবীর হাওলা দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ.)-কে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় আকাশে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) ও ইবনে আসাকির ও হাকিম হতে এমন কিছু রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন যা দ্বারা তিনি জীবিত রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কা'বুল আহবার (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, চারজন নবী এখনও জীবিত আছেন। দু'জন জমিনে তাঁরা হচ্ছেন– হযরত খাজের (আ.) ও হযরত ইলইয়াস (আ.)। আর দু'জন আসমানে। তাঁরা হলেন– হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইদরীস (আ.)। এমনকি কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খাজের (আ.) ও হযরত ইলইয়াস (আ.) প্রতি বৎসর রমজান মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোজা রাখেন। -[কুরতুবী]

কিন্তু হাফিজ ইবনে কাছীরের ন্যায় মুহাক্কিকগণ উপরিউক্তক্ত বর্ণনা সমূহের সত্যতা স্বীকার করেননি। এসব বর্ণনার ব্যাপারে তাঁদের মন্তব্য হলো– "وَهُوَ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِىْ لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ بَلِ الظَّاهِرُ اَنَّ صِحَّتَهَا بَعِيْدَةٌ"

তা ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে না সত্য বলা যায় আর না মিথ্যা; বরং তাদের বিশুদ্ধ হওয়া যে সুদূর পরাহত– তা (দিবালোকের ন্যায়) স্পষ্ট। -[আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া]

ইবনে কাছীর (র.) আরও বলেন, ইবনে আসাকির তো কতিপয় রেওয়ায়েত এমন ব্যক্তিদের নিকট হতে করেছেন যারা হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু তাদের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। হয়তো এ কারণে যে, তাদের সনদ দুর্বল। নতুবা এ জন্য যে, যাদের দিকে ঘটনাবলিকে নিসবত করা হয়েছে তারা অজ্ঞাত। -[আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া]

মোদ্দাকথা, হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর জীবিত থাকা কোনো বিশ্বস্ত ইসলামি বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে নিরাপদ পন্থা হলো নীরবতা অবলম্বন করা। আর ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসখানার উপর আমল করতে হবে। "তোমরা তাদেরকে সত্যও বল না আবার মিথ্যাও বল না।" কেননা কুরআনে কারীমের তাফসীর, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ এবং নসিহতের উদ্দেশ্যে তা (ইসরাঈলীয়াত) ব্যতীতও পূর্ণ হয়ে যায়।

"اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** بَعْل (বা'ল)-এর আভিধানিক অর্থ হলো– সরদার, মালিক ও মনিব। এটা স্বামীর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে তা স্বামীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের সেমিটিক জাতি তাকে ইলাহ বা উপাস্যের অর্থে প্রয়োগ করত। তারা একটি বিশেষ দেবতার নামকরণও করেছিল 'বা'ল'। তৎকালীন লেবাননের ফেনিকি জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল 'বা'ল'। আর বা'লের স্ত্রী আস্তারাত ছিল তাদের সর্বপ্রধান দেবী।

'বা'ল' দ্বারা তারা মতান্তরে সূর্য অথবা সুচারতী গ্রহকে বুঝাত আর আস্তারাত বলে মতান্তরে চন্দ্র বা শুকতারাকে বুঝাত। যা হোক, তৎকালে বাবেল হতে মিশর পর্যন্ত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে 'বা'ল'-এর উপাসনা করা হতো। বিশেষত লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন সর্বত্র মুশরিক জাতিসমূহ এ কাজে ব্যাপকহারে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে বনূ ইসরাঈল মিশর হতে ফিলিস্তিন ও জর্দান এসে বসবাস করতে শুরু করল। তাওরাতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা এ মুশরিক জাতির সাথে বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। তখন এ মূর্তি [বা'ল] পূজার রোগ তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করল। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা ইউশা-ইবনে নূনের মৃত্যুর পর পরই বনূ ইসরাঈলের লোকদের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বা'লের পূজা বনূ ইসরাঈলের মধ্যে এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, তারা বা'লের উদ্দেশ্যে বলিদানের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছিল। কিন্তু এক আল্লাহ প্রেমিকের তা বরদাশত হলো না। তিনি রাত্রি বেলায় গোপনে উক্ত বলিদান ক্ষেত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন। পরের দিন লোকেরা এক বিশাল সমাবেশ করল। তারা উক্ত খোদা প্রেমিককে হত্যা করার সংকল্প ব্যক্ত করল।

পরবর্তী যুগে অবশ্য হযরত শামবীল, হযরত তালূত, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) বনূ ইসরাঈলকে মূর্তি পূজার অভিশাপ হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। তাদের প্রচেষ্টায় বনূ ইসরাঈলের মূর্তি পূজার অবসান হয়। সর্বত্র পুনরায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর পর মূর্তি পূজার ফেতনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বিশেষত উত্তর ফিলিস্তিনেই ইসরাইল রাষ্ট্র 'বা'ল' নামক দেবতার পূজায় সরগরম হয়ে উঠল।

"وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইলইয়াস (আ.) তাঁর গোত্রকে মূর্তি পূজার জন্য তিরস্কার করে বললেন– "তোমরা কি বা'ল মূর্তির উপাসনার পিছনে পড়ে এক আল্লাহর ইবাদতকে বর্জন করবে?"

এ স্থলে– "اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" -এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, [আল্লাহর পানাহ] অন্য কেউও স্রষ্টা কারিগর। অন্যান্য কারিগর [ও আবিষ্কারক] গণ তো শুধু বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগিয়ে একটি বস্তু তৈরি করে থাকে। তারা কোনো বস্তুকে অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দানে স্বভাবগতভাবে সক্ষম। –[বয়ানুল কুরআন]

গায়রুল্লাহর দিকে সৃষ্টির নিসবত জায়েজ নেই : উল্লেখ্য যে, خَلَقَ -এর অর্থ হলো– সৃষ্টি করা। এর মর্মার্থ হলো– অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করা। আর উক্ত ক্ষমতা স্বভাবগতভাবে থাকা। সুতরাং উক্ত গুণটি আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস, অন্য কারো দিকে তার নিসবত করা জায়েজ নেই। সুতরাং আমাদের যুগে লেখকগণের লেখা, কবিদের কাব্য ও চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্মকে যে "সৃষ্টি" বলার প্রথা দেখা যায় তা মূলত সঠিক নয়। বেশি থেকে বেশি তাকে তাদের 'সাধনা' বলা যেতে পারে। অথবা, লেখা, কাব্য ও চিত্রকর্ম বলাই ভালো। –[মা'আরিফ]

অনুবাদ :

١٢٦. اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ عَلٰى اِضْمَارِ هُوَ وَبِنَصْبِهَا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ اَحْسَنَ .

১২৬. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও প্রতিপালক। (اَللّٰهُ) ও উভয় رَبُّ তিনটিই রফা'বিশিষ্ট হবে هُوَ যমীরকে উহ্য মেনে। অপরদিকে اَحْسَنَ হতে বদল গণ্য করে তিনটিকেই নসব বিশিষ্ট পড়া যাবে।

١٢٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ فِى النَّارِ .

১২৭. অথচ তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল অবিশ্বাস করেছিল। কাজেই তাদেরকে উপস্থিত একত্রিত করা হবে জাহান্নামে।

١٢٨. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىْ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ فَاِنَّهُمْ نَجَوْا مِنْهَا .

১২৮. আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে ঈমানদারগণ। কেননা তারা জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পাবে।

١٢٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ثَنَاءً حَسَنًا .

১২৯. আর তার ব্যাপারে আমি পরবর্তীদের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছি উত্তম প্রশংসা।

١٣٠. سَلَامٌ مِّنَّا عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ هُوَ اِلْيَاسُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهٗ وَقِيْلَ هُوَ مَنْ اٰمَنَ مَعَهٗ فَجُمِعُوْا مَعَهٗ تَغْلِيْبًا كَقَوْلِهِمْ لِلْمُهَلَّبِ وَقَوْمِهِ الْمُهَلَّبُوْنَ وَعَلٰى قِرَاءَةِ اٰلِ يَاسِيْنَ بِالْمَدِّ اَىْ اَهْلَهُ الْمُرَادُ بِهِ اِلْيَاسُ اَيْضًا .

১৩০. আমার পক্ষ হতে ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক ইনি সেই ইলইয়াস– যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– তিনি হলেন, যিনি তাঁর [পূর্বোক্ত ইলইয়াস-এর] উপর ঈমান আনয়ন করেছিলেন। সুতরাং তাগলীবের কায়দা অনুযায়ী তারা [সালাম প্রেরণাকারীগণ] তাঁর সাথে উক্ত ঈমানদারকে একত্রিত করেছে। যেমন– আরবের লোকেরা মুহাল্লাব ও তার কওমকে [একত্রে] মুহাল্লাবুন বলে থাকে। আর اٰلِ يَاسِيْنَ মদের সাথে [অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরের সাথে] আরেকটি কেরাত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর পরিবার-পরিজন। এটার দ্বারা হযরত ইলইয়াস (আ.)-কেও উদ্দেশ্য [অন্তর্ভুক্ত] করা হয়েছে।

١٣١. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

১৩১. নিশ্চয় আমি এভাবে যেভাবে তাঁকে প্রতিদান দিয়েছি মুখলিস বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

١٣٢. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ .

১৩২. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম।

١٣٣. وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

১৩৩. আর নিশ্চয় হযরত লূত (আ.)ও অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

١٣٤. اُذْكُرْ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ .

১৩৪. স্মরণ করো যখন আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে নাজাত দিয়েছি।

١٣٥. اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ .

১৩৫. একজন বুড়ি ব্যতীত সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশিষ্টজনদের সাথে শাস্তিতে নিপতিত হয়েছিল।

١٣٦. ثُمَّ دَمَّرْنَا اَهْلَكْنَا الْاٰخَرِيْنَ كُفَّارَ قَوْمِهٖ .

১৩৬. অতঃপর আমি নিপাত করেছি ধ্বংস করেছি অন্যান্যদেরকে অর্থাৎ তাঁর কওমের কাফেরদেরকে।

١٣٧. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ اَىْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِىْ اَسْفَارِكُمْ مُّصْبِحِيْنَ اَىْ وَقْتَ الصَّبَاحِ يَعْنِى بِالنَّهَارِ .

১৩৭. আর তোমরা তাদের নিকট দিয়ে পাড়ি জমিয়ে থাক অর্থাৎ ভ্রমণে গেলে তোমরা তাদের মনযিল ও নিদর্শনাদির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে থাক। ভোরবেলায় অর্থাৎ ভোরের সময়ে তথা দিবাভাগে।

١٣٨. وَبِالَّيْلِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مَا حَلَّ بِهِمْ فَتَعْتَبِرُوْنَ بِهِ .

১৩৮. আর রাত্রিকালেও তথাপি তোমরা কি বুঝ না? হে মক্কাবাসীগণ! তাদের উপর [আজাব ও গজবের] কি [ঘটনা] ঘটে গিয়েছিল। সুতরাং তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

তাহকীক ও তারকীব

"اَللّٰهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ" আয়াতে اَللّٰهُ ও رَبَّ-এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী "اَللّٰهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত اَللّٰهُ ও رَبَّ শব্দদ্বয়ের মধ্যে দু ধরনের ই'রাব হতে পারে–

এক. তারা مَرْفُوْعٌ হবে। ইবনে কাছীর, আবূ আমর, আবূ জা'ফর, শায়বা ও নাফে' প্রমুখগণ উক্ত তিনটি শব্দে রফা' দিয়ে পড়েছেন। রফা' হওয়ার দুটি দিক হতে পারে।

১. একটি اَللّٰهُ رَبُّكُمْ الخ স্বতন্ত্র বাক্য (جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ);

২. এটা একটি উহ্য মুবতাদা (مُبْتَدَأٌ) -এর خَبَرٌ আর সেই উহ্য মুবতাদাটি হলো هُوَ অর্থাৎ "هُوَ اللّٰهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ"

দুই. উক্ত তিনটি শব্দ مَنْصُوْبٌ হবে। হাসান ইবনে আবূ ইসহাক, রাবী ইবনে খায়যাম, ইবনে আহছাব, আ'মাশ, হামযা ও কিসায়ী প্রমুখ ক্বারীগণ উক্ত তিনটি শব্দের মধ্যে নসব দিয়ে পড়েছেন। তার আবার দু'টি দিক রয়েছে।

ক. আবূ উবায়েদ (র.) বলেছেন যে, উক্ত তিনটি শব্দই পূর্বোক্ত "اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" হতে نَعْتٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

খ. ইমাম নাহাস (র.) বলেছেন, উল্লিখিত তিনটি শব্দ পূর্বোক্ত "اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইলইয়াস (আ.) যখন তার সম্প্রদায়কে মূর্তি পূজা বর্জন করত আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আজাব ও গজবের ভয় দেখালেন তখন তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (অবিশ্বাস) করল। ইরশাদ হচ্ছে– রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। আল্লাহর সত্য রাসূলকে মিথ্যুক বলার শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে। এর দ্বারা আখেরাতের আজাব ও উদ্দেশ্য হতে পারে এবং দুনিয়ার দুর্ভোগও বুঝানো যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে বনূ ইসরাঈলের দু'টি রাষ্ট্র ইসরাঈল ও ইয়াহুদাহ উভয়ের শাসকবর্গ নিপাত গিয়েছিল।

'سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ' -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইলইয়াস (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে দোয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত লোকেরা তাঁদের জন্য শান্তির দোয়া করতে থাকবে। তাঁদের প্রশংসা ও গুণ-গান করতে থাকবে।

অত্র আয়াতের إِلْيَاسِيْنَ শব্দটির মধ্যে ক্বারীগণ হতে দু'টি ক্বেরাত বর্ণিত রয়েছে। ক্বেরাতের পার্থক্যের কারণে তার অর্থের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

১. জমহূর কারীগণের (র.) মতে, এটা إِلْيَاسِيْنَ হামযার নিচে যের لَامْ অক্ষরটি জযম যোগে يَاسِيْن -এর সাথে যুক্ত করে

২. হযরত নাফে, ইবনে আমির ও ইয়াকূব (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ آلِ يَاسِيْنَ পড়েছেন। তারা آلِ শব্দটিকে يَاسِيْن -এর দিকে ইযাফত করেছেন। শেষোক্ত ক্বেরাত অনুযায়ী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ইলইয়াস ইয়াসীনের বংশধর অর্থাৎ ইলইয়াস ইবনে ইয়াসীন।

দুই. ইয়াসীনের বংশধর মানে মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধর। [কেননা, নবী করীমের এক নাম হলো ইয়াসীন।]

তিন. ইয়াসীন কুরআনে কারীমের একটি নাম। সুতরাং "سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِيْنَ" -এর অর্থ হলো- "سَلَامُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ اٰمَنَ بِكِتَابِ اللّٰهِ الَّذِيْ هُوَ يَاسِيْنَ" অর্থাৎ আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক সেই লোকদের প্রতি যে আল্লাহর ইয়াসীন নামীয় কিতাব তথা কুরআনে হাকীমের উপর ঈমান আনয়ন করেছেন।

প্রথমোক্ত ক্বেরাত অনুযায়ী এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এক. ইলইয়াসীন- হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর অপর নাম। আরবীয়রা সাধারণত আজমী (অনারব) শব্দের সাথে يَا ও نُ বৃদ্ধি করে পড়ে থাকে। যেমন- তারা سِيْنَا কে سِيْنِيْنَ পড়ে থাকে। সুতরাং إِلْيَاسْ -কে তারা إِلْيَاسِيْنَ পড়ে থাকে।

দুই. নাহুবিদ যুজাজ (র.) বলেছেন, مِيْكَالْ হতে যেমন مِيْكَائِيْل ও مِيْكَائِيْل পড়া হয়ে থাকে তদ্রূপ إِلْيَاسْ হতে إِلْيَاسِيْنَ পড়া হয়েছে।

তিন. নাহুবিদ ফাররা (র.) বলেছেন, إِلْيَاسِيْنَ এটা إِلْيَاسْ -এর বহুবচন। এর দ্বারা ইলইয়াস এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- مُهَلَّبْ ও তার গোত্রের লোকদেরকে একত্রে مُهَلَّبُوْنَ বলা হয়ে থাকে।

"وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : (ع) قِصَّةُ لُوْطٍ - হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী : হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর ঈমান এনে তিনি তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে হিজরত করে সিরিয়াও গিয়েছিলেন। মিশরেও তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। ফিলিস্তিনের সাদূম নামক এলাকায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে হেদায়েতের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি নবুয়ত লাভ করেছিলেন। এলাকাটি ছিল নানা অশ্লীল ও অপকর্মের কেন্দ্র। কোনো প্রকার ভালো ও প্রশংসনীয় কাজ তাদের মধ্যে ছিল না। তারা নিকৃষ্টতম অপকর্ম তথা সমকামে অভ্যস্ত ছিল। নারীদের পরিবর্তে ছেলেদের সাথে তারা যৌন সম্ভোগ করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন ঘৃণ্য কার্য-কলাপের ব্যাপারে ভর্ৎসনা ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন-

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ـ

অর্থাৎ 'তোমরা কি সেই জাতি নও যারা পুরুষের সাথে অপকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত হও এবং বংশধারা ছিন্ন কর (বা ডাকাতি কর) আর প্রকাশ্য মজলিসে দুষ্কর্মে মেতে উঠ।'

হযরত লূত (আ.) তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদের অশ্লীল কার্যকলাপ বর্জন করত সত্য পথে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হাজারোভাবে তাদের বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হযরত লূত (আ.)-এর দাওয়াত কবুল করেনি। সত্যের ডাকে সাড়া দেয়নি। মাত্র ৩টি কতেক লোক ব্যতীত সকলেই তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীও ছিল বিরোধীদের দলভুক্ত।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করার জন্য কয়েকজন ফেরেশতাসহ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ বালকের আকৃতিতে আগমন করেছিলেন। পাষণ্ডরা তাদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত লূত (আ.) ও ঈমানদারগণকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী যেহেতু মুশরিকা ছিল সেহেতু তাকে রেখে যেতে বললেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর হুকুমে সমগ্র লূত জনপদকে উপুড় করে ধ্বংস করে দিলেন। এ স্থলে সংক্ষিপ্তাকারে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখানে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখের উপকারিতা : এ স্থলে হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তোমরা সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভ্রমণে যাওয়ার সময় সাদ্দুমের সেই এলাকা দিয়ে দিবা-রাত্রি যাতায়াত করে থাক যেখানে লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। কিন্তু তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করছ না। সকাল ও সন্ধ্যার উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত এ সময়েই তারা উক্ত স্থান অতিক্রম করে থাকে। কাযী আবুস সাউদ (র.) বলেছেন যে, সাদ্দুমের উক্ত স্থানটি রাস্তার এমন পর্যায়ে অবস্থিত যেখান থেকে গমনকারীরা সকাল বেলায় রওয়ানা করে এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছে থাকে। –[তাফসীরে আবীস্ সাউদ]

"إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আজাব হতে নাজাত দিয়েছি। কিন্তু একজন বৃদ্ধাকে নাজাত দেইনি। সে পশ্চাৎ অবস্থানকারী তথা শাস্তি প্রাপ্তদের দলভুক্ত ছিল। এখানে সেই বৃদ্ধা কে? কেনই বা তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?

মুফাস্সিরগণ [এবং কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য] এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ বুড়িটি স্বয়ং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী। সে মুশরিকদের সহযোগী ছিল। উপরন্তু হযরত লূত (আ.)-এর সাথে হিজরত করতে রাজি হয়নি বিধায় আজাবে নিমজ্জিত হয়েছিল।

"إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : হযরত লূত (আ.)-এর গোত্র– যাদের নিকট তাকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের 'সাদ্দুম' নামক স্থানে বসবাস করত। তাদের ধ্বংসাবশেষ ও স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনাদি যুগ-যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল। আরবের কুরাইশরা সিরিয়ায় সফরে যাওয়া-আসা করার সময় তা তাদের পথে পড়ত। তথা হতে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হতো, আর আগমনকারীরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছত।

আল্লাহ তা'আলা এখানে কুরাইশদেরকে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন যে, হে কুরাইশ জাতি! তোমরা সিরিয়া যাওয়া-আসার পথে একবারও ভেবে দেখেছ যে, হযরত লূত (আ.)-এর গোত্র সাদ্দুমবাসীদেরকে কেন আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর হযরত লূত (আ.) ও তার উপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেই বা কেন নাজাত দিয়েছিলেন? তোমরা হযরত লূত (আ.)-এর জাতির ইতিহাস হতে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পার যে, যদি নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতায় তোমরা অনড় থাক তাহলে তোমরাও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিপতিত হবে। ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। তোমরা গোটা জাতি-গোটা দেশ। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ﷺ ও তার অনুসারীদেরকে আল্লাহ পাক অবশ্যই হেফাজত করবেন, যদ্রূপ হযরত লূত (আ.) ও তাঁর অনুগামীদেরকে রক্ষা করেছিলেন।

অনুবাদ :

١٣٩. وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

১৩৯. আর ইউনুস (আ.) রাসূলগণের একজন ছিলেন।

١٤٠. اِذْ اَبَقَ هَرَبَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ السَّفِيْنَةِ الْمَمْلُوْءَةِ حِيْنَ غَاضَبَ قَوْمَهُ لَمَّا لَمْ يَنْزِلْ بِهِمُ الْعَذَابُ الَّذِىْ وَعَدَهُمْ بِهٖ فَرَكِبَ السَّفِيْنَةَ فَوَقَفَتْ فِىْ لُجَّةِ الْبَحْرِ فَقَالَ الْمَلَّاحُوْنَ هُنَا عَبْدٌ اَبِقٌ مِنْ سَيِّدِهٖ تُظْهِرُهُ الْقُرْعَةُ .

১৪০. স্মরণ করো, যখন সে পলায়ন করেছিল পালিয়ে গিয়েছিল বোঝাইকৃত নৌকায় পরিপূর্ণ নৌকায় যখন তাঁর গোত্র তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কেননা সে তাদেরকে যে আজাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা আসেনি। সুতরাং সে নৌকায় আরোহণ করল। অতঃপর নৌকাটি সমুদ্রের মধ্যে আটকে পড়ল। তখন মাঝিরা বলল, এখানে একজন গোলাম রয়েছে যে, তার মনিব হতে পলায়ন করেছে। লটারির দ্বারা সে প্রকাশিত (সনাক্ত) হবে।

١٤١. فَسَاهَمَ قَارَعَ اَهْلَ السَّفِيْنَةِ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ الْمَغْلُوْبِيْنَ بِالْقُرْعَةِ فَاَلْقَوْهُ فِى الْبَحْرِ .

১৪১. অতঃপর লটারি দিল নৌকার আরোহীরা লটারি দিল। ফলে সে দোষী সাব্যস্ত হলো– লটারিতে পরাস্ত হলো। সুতরাং তারা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

١٤٢. فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ اِبْتَلَعَهُ وَهُوَ مُلِيْمٌ اَىْ اٰتٍ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِنْ ذِهَابِهٖ اِلَى الْبَحْرِ وَرُكُوْبِهِ السَّفِيْنَةَ بِلَا اِذْنٍ مِنْ رَبِّهٖ .

১৪২. অতঃপর তাকে মৎস গ্রাস করল– তাকে গলাধঃকরণ করল। আর সে ছিল তিরস্কৃত অর্থাৎ এমন কিছু করেছিল যাতে সে তিরস্কৃত হয়েছে। যেমন– স্বীয় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত সমুদ্রে যাত্রা, নৌকায় আরোহণ করা।

١٤٣. فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ الذَّاكِرِيْنَ بِقَوْلِهٖ كَثِيْرًا فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

১৪৩. সুতরাং যদি না তিনি আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনাকারী এবং গুণগান) পাঠকারী হতেন– স্বীয় বক্তব্য "لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" [তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।] এর দ্বারা মাছের পেটে আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী না হতো।

١٤٤. لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ لَصَارَ بَطْنُ الْحُوْتِ قَبْرًا لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

১৪৪. তাহলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে অবস্থান করত। (অর্থাৎ) কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট তার জন্য কবর হতো।

فَنَبَذْنٰهُ اَلْقَيْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ بِالْعَرَاءِ بِوَجْهِ الْاَرْضِ اَىْ بِالسَّاحِلِ مِنْ يَوْمِهِ اَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ اَوْ سَبْعَةِ اَيَّامٍ اَوْ عِشْرِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَهُوَ سَقِيْمٌ عَلِيْلٌ كَالْفَرْخِ الْمُمَعَّطِ . ١٤٥

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম –মাছের পেট হতে আমি তাকে ফেলে দিলাম। সমভূমিতে ভূমির উপর। অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সেই দিনই অথবা মতান্তরে তিন, সাত, বিশ কিংবা চল্লিশ দিন পর। আর তখন সে অসুস্থ ছিল– রুগ্ণ পালকহীন পাখির ছানার ন্যায়।

وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ وَهُوَ الْقَرْعُ تَظِلُّهُ وَهِىَ بِسَاقٍ عَلٰى خِلَافِ الْعَادَةِ فِى الْقَرْعِ مُعْجِزَةٌ لَهُ وَكَانَتْ تَاْتِيْهِ وَعْلَةٌ صَبَاحًا وَمَسَاءً يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا حَتّٰى قَوِىَ . ١٤٦

১৪৬. আর তার উপর লতা-পাতাযুক্ত বৃক্ষ সৃষ্টি করলাম। আর তা হলো লাউগাছের ঝাড়, যা তাকে ছায়া দিল। তা ছিল কাণ্ডযুক্ত, যা সাধারণত লাউগাছের হয় না (অস্বাভাবিক)। এটা তাঁর মোজেজা ছিল। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নিকট একটি হরিণী আসত। সে তার দুধ পান করত। এভাবে সে হৃষ্টপুষ্ট [শক্তিশালী] হয়ে উঠল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্ট কাহিনী : সূরা সাফ্‌ফাতে যে সকল নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বশেষে হযরত ইউনুস (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আম্বিয়া, নিসা, আন্‌আম, ইউনুস ও আলোচ্য সূরায় বিশেষভাবে তাঁর কাহিনীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে তাকে ذُو النُّوْنِ এবং صَاحِبُ الْحُوْتِ ও বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ আর স্মরণ কর যাননূনকে যখন সে দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং ধারণা করেছিল যে, আমি তাকে পাকড়াও করতে পারব না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– "فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ" (সুতরাং তোমার প্রভুর নির্দেশ আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছ ওয়ালার ন্যায় হয়ো না।)

হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্রের সামাজিক অবস্থা : হযরত ইউনুস (আ.) ছিলেন 'মোছেল' শহরের নিনুওয়া নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁর জাতির লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক। তাদের প্রধান মূর্তির নাম ছিল 'আশতার'। তাঁর জাতির লোকেরা ধনবান ও অত্যন্ত সম্পদশালী ছিল। তাদের ধন-সম্পদ বিত্ত-বৈভব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য ছিল। মূলত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যই তাদের মধ্যে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও অপরাধ প্রবণতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। এর কারণেই তারা খোদাদ্রোহী ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ" অর্থাৎ 'যে কোনো শহরে আমি রাসূল (ভীতি প্রদর্শনকারী) পাঠিয়েছি তথাকার বিত্তবান ও প্রভাবশালীরা বলেছে– তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তাকে অস্বীকার করি।'

হযরত ইউনুস (আ.)-এর দাওয়াত : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ" আর হযরত ইউনুস (আ.) রাসূলগণের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করত নিনুওয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত ইউনুস (আ.) গোত্রের হেদায়েতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি তাদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন। তাদেরকে মূর্তি পূজা হতে বারণ করলেন। তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। তিনি তাদের শাস্তির ভয় দেখালেন। জাতির লোকদের প্রতি বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার সময় জাতির লোকদের একটি সময়ে আজাব আসার কথা বলে গেলেন। গোত্রের লোকেরা আজাবের নিদর্শনাদি দেখে হযরত ইউনুস (আ.)-কে খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। অবশেষে তারা আল্লাহর নিকট তওবা করল এবং কান্নাকাটি করতে শুরু করল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাদের উপর আজাব নাজিল করলেন না। হযরত ইউনুস (আ.) যখন জানতে পারলেন যে, গোত্রের উপর আজাব নাজিল হয়নি তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন গোত্রের নিকট ফিরে গেলে এবার আর তাঁর রেহাই নেই। গোত্রের লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে। এমনকি তারা তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতে পারে। সুতরাং তিনি অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। তিনি সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। তথায় একটি জাহাজে আরোহণ করলেন। জাহাজটি ছিল আরোহীতে ঠাসা। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে জাহাজটি আটকে গেল। মাঝি-মাল্লারা বলল, এ জাহাজে মনিবের নিকট হতে পলায়ন করে আসা কোনো দাস রয়েছে। তার গুনাহের কারণে আমাদের জাহাজ আটকে গেছে। অতঃপর তারা লটারী দিল। লটারীতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠল। লোকেরা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল। একটি বৃহদাকারের মাছ তাঁকে গ্রাস করল এবং গিলে ফেলল। হযরত ইউনুস (আ.) অনুতপ্ত হলেন। তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কেন আল্লাহর অনুমতি না নিয়ে চলে আসলেন, তজ্জন্য নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তিনি মাছের পেটে বার বার পড়তে লাগলেন- "لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ"

"হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার গুণ-গান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের একজন।" আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, হযরত ইউনুস (আ.)-এর উক্ত দোয়া আরশের নিচে গিয়ে পৌঁছল। ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আমাদের প্রভু! এক আশ্চর্য জনক স্থান হতে একটি দুর্বল শব্দ শোনা যাচ্ছে। তা কার আওয়াজ? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এটা আমার বান্দা হযরত ইউনুস (আ.)-এর আওয়াজ- তার দোয়া। ফেরেশতাগণ পুনরায় আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করলেন, হে আমাদের রব! আপনি কি হযরত ইউনুস (আ.)-কে তার স্বাভাবিক অবস্থার সৎকর্মের বিনিময়ে তাঁকে এ মসিবত হতে উদ্ধার করবেন না? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় আমি তাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করব। আল্লাহ তা'আলা মাছটিকে নির্দেশ দিলেন হযরত ইউনুস (আ.)-কে সমুদ্র উপকূলে উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষেপ করার জন্য। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মাছটি হযরত ইউনুস (আ.)-কে একটি উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ" . অর্থাৎ আমি হযরত ইউনুস (আ.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছি- তাঁর দোয়া কবুল করেছি। আর আমি তাকে দুঃশ্চিন্তা (বিপদ) হতে উদ্ধার করেছি। আমি ঈমানদারদের অনুরূপভাবে উদ্ধার করে থাকি।

হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে কত দিন ছিলেন এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যেদিন মাছ তাকে গ্রাস করেছিল সেদিনই তাকে উপকূলে উদগীরণ করেছে। কেউ বলেন তিন দিন, কারো মতে সাত দিন, কোনো কোনো মুফাসসির বলেন- বিশ দিন আবার এক দলের মতে চল্লিশ দিন তিনি মাছের পেটে ছিলেন।

মাছটি তাঁকে সমুদ্রের উপকূলে উন্মুক্ত ময়দানে উদ্গীরণ করল। আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে তথায় একটি লাউগাছ জন্মিয়ে দেন। লাউগাছটি ছিল সাধারণত নিয়মের বহির্ভূতভাবে কাণ্ড ও ডালপালা বিশিষ্ট। এটা হযরত ইউনুস (আ.)-এর মোজেজা স্বরূপ ছিল। একটি হরিণীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন। হরিণীটি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নিকট আসত। তিনি তার দুধ পান করতেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলেন। অথচ যখন মাছটি তাঁকে উদগীরণ করেছিল তখন তিনি অতিশয় দুর্বল ছিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল। শরীরের চামড়া নবজাতক পাখির ছানার ন্যায় নাজুক হয়ে পড়েছিল।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্রের তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন : হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্র তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি তাদের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। এমনকি কখন তাদের উপর আজাব আসবে তাও জানিয়ে দিলেন। অতঃপর এলাকা ছেড়ে পাশের এক জায়গায় অবস্থান করলেন। গোত্রের লোকজন সেই নির্দিষ্ট দিন আজাবের আ'লামত দেখতে পেল। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-কে খুঁজল, কিন্তু পেল না। তারা পরস্পরে পরামর্শ করল– কি করা যায়। বয়োবৃদ্ধগণ বললেন, হযরত ইউনুস (আ.) বলতো তার খোদা সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। সুতরাং চল আমরা হযরত ইউনুস (আ.)-এর খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সুতরাং সকলে মিলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা দোয়া করল– "إِنَّ ذُنُوبَنَا قَدْ عَظُمَتْ وَجَلَّتْ وَأَنْتَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَجَلُّ اِفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ" ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করলেন। তাদের উপর হতে আজাব সরে গেল।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্রের শুভ পরিণতি : সমুদ্র হতে উত্থিত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পুনরায় তাওহীদ ও ইবাদতের দাওয়াত নিয়ে তাঁর জাতির নিকট গেলেন। এবার তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করল। সকলে খালিস তওবা করত আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হলেন। পরবর্তী সময়ে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছিল। তাদের উপর আর কোনো আজাব আসেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ" সুতরাং তারা ঈমান এনেছিল। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছিলাম।

"وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস (আ.)ও নবী (রাসূল) ছিলেন। যখন তিনি বোঝাইকৃত নৌকায় আরোহণ করে পালিয়ে গেছেন সে ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়

হযরত ইউনুস (আ.) কি পলায়নের পূর্বে নবী ছিলেন? মৎস্যের সেই স্মরণীয় ঘটনার পূর্বে হযরত ইউনুস (আ.) নবী ছিলেন কিনা? এ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণ ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অতএব একদলের নিকট মৎস্যের ঘটনার পর তাঁকে নবী বানানো হয়েছে। তাঁদের মতে হযরত ইউনুস (আ.)-কে সে কালের বাদশাহ ও তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হেদায়েত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। তিনি তাদেরকে আজাবের ভয় দেখালেন। অতঃপর আজাব আপতিত না হওয়ায় তিনি পালিয়ে যান এবং পথিমধ্যে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আর এ স্থলে لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ -এর অর্থ হলো তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার ইলমে (জ্ঞানমতো) নবী ছিলেন। যদিও জনসাধারণের সমক্ষে তাঁর নবুয়ত প্রকাশ পায়নি বা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নবুয়তের দায়িত্ব তখনও গ্রহণ করেননি। আর তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ছেড়ে পলায়ন করেননি; বরং তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট হতে পলায়ন করেছিলেন।

অন্য দলের অভিমত হলো, হযরত ইউনুস (আ.) মৎস্যের ঘটনার পূর্বেই নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ পলায়ন করার পূর্বেই তিনি নবী ছিলেন। কুরআনে কারীমের প্রকাশ্য বচনভঙ্গি ও অধিকাংশ বর্ণনানুসারে এ অভিমতটি অগ্রগণ্য হওয়া প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তিনি নবী ছিলেন এবং নবুয়ত লাভের পরই মৎস্যের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ.) যখন বোঝাইকৃত নৌকার দিকে পলায়ন করেছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন।

হযরত ইউনুস (আ.) কেন বোঝাইকৃত নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন? মুফাস্‌সিরীনে কেরাম উক্ত পলায়নের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন–

১. হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ করল না। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর রিসালাতকেও অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে অবগত করলেন যে, উক্ত সম্প্রদায়ের উপর আজাব অবতীর্ণ করবেন। আর আজাব অবতীর্ণ করার জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বে হযরত ইউনুস (আ.) গোত্র হতে সরে পড়লেন; কিন্তু গোত্রের তওবার কারণে আজাব সরে যায়। এ দিকে গোত্র তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে এ ভয়ে ঘটনার যথার্থ পর্যালোচনা না করেই তিনি পালিয়ে যান।

২. হযরত ইউনুস (আ.) গোত্রকে আজাবের যেই ভয় দেখিয়েছেন তার প্রতিশ্রুতি মূলত আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া হয়নি; বরং তিনি নিজের পক্ষ হতে উক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন আজাব নাজিল করার জন্য কিন্তু তার কওমের তওবার কারণে দোয়ার কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। সুতরাং তিনি মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পালিয়ে যান।

إِبَاقٌ-এর অর্থ এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর শানে "أَبَقَ" শব্দ প্রয়োগের কারণ : أَبَقَ শব্দটি إِبَاقٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– "কোনো গোলাম তার মনিবের নিকট হতে পালিয়ে যাওয়া।"

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-এর ব্যাপারে এ জন্য أَبَقَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। নবীগণ (আ.) আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। তাদের সাধারণ ভুল-ত্রুটিও আল্লাহ তা'আলার নিকট জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লামা আলূসী (র.) "إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ" -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন– أَبَقَ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, মনিবের নিকট হতে পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ.) যেহেতু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত নিজ জাতির নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর সম্পর্কে এ শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ হয়েছে।

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে যখন আজাব আসল না তখন হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই চলে গেলেন। পরে তাঁর জাতির লোকেরা যখন তাকে পেল না তখন তারা বড়-ছোট সব লোক ও সব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বের হলো আজাব নাজিল হওয়ার বড় দেরি ছিল না। তারা আল্লাহর দরবারে কান্না-কাটি করল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

"فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইউনুস (আ.) নৌকায় উঠার পর সমুদ্রের মাঝে নৌকা আটকে গেল। মাঝিরা বলল, এ নৌকায় এমন কেউ রয়েছে যে, তার মনিবের নিকট হতে পালিয়ে এসেছে। অতঃপর তাকে সনাক্ত করার জন্য তারা লটারি দিল। "সুতরাং তিনি লটারিতে অংশ গ্রহণ করলেন এবং পরাভূত হলেন।"

উক্ত লটারি তখন দেওয়া হয়েছিল যখন নৌকা সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়েছিল। আর বোঝাই অধিক হওয়ার কারণে তা পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

শরিয়তে লটারির বিধান : শরিয়তের দৃষ্টিতে লটারির মাধ্যমে কারো অধিকার সাব্যস্ত করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণত যদ্রূপ লটারির মাধ্যমে কাউকে চোর সাব্যস্ত করা যায় না। তদ্রূপ যদি দুজনের মধ্যে কোনো সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে মতভেদ হয় তাহলে লটারির মাধ্যমে তার ফয়সালা করা জায়েজ নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তিকে শরিয়ত কয়েকটি বস্তু হতে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেয়, তাহলে তাদের যে কোনো একটি গ্রহণ করার জন্য লটারী দেওয়া জায়েজ; বরং উক্ত পরিস্থিতিতে লটারী দেওয়া উত্তম। যেমন কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তা হলে সফরে যাওয়ার সময় তাদের যে কোনো একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জায়েজ কিন্তু এ ক্ষেত্রে লটারী দেওয়া উত্তম। তাহলে আর কেউ মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সুযোগ পাবে না। নবী করীম ﷺ তাই করতেন।

مُدْحَضِيْنَ -এর তাফসীর "مَغْلُوْبِيْنَ" দ্বারা করার কারণ : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) যে নৌকায় উঠেছিলেন তা সম্পূর্ণ বোঝাই ছিল। উপরন্তু মাঝ দরিয়ায় যেয়ে তা ঝড়ের কবলে পড়ে। কর্তৃপক্ষ লটারীর মাধ্যমে আরোহীদের একজন সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লটারী দেওয়া হলো, লটারীতে হযরত ইউনুস (আ.) পরাজিত হলেন। তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো।

এখানে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) اَلْمُدْحَضِيْنَ-এর তাফসীর করেছেন– "اَلْمَغْلُوْبِيْنَ" শব্দের দ্বারা। مُدْحَضِيْنَ শব্দটি إِدْحَاضٌ মাসদার হতে গঠিত হয়েছে। إِدْحَاضٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– কাউকে অকৃতকার্য (ব্যর্থ) করে দেওয়া। এর মর্মার্থ হলো– লটারীতে তার নাম উঠল। তিনি নিজে নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তবে এর দ্বারা তার উপর আত্মহত্যার অপবাদ দেওয়া যাবে না। কেননা হয়তো উপকূল নিকটে ছিল এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, সাতার কেটে তীরে চলে যেতে পারবেন। –[মা'আরিফুল কুরআন]

"فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইউনুস (আ.) সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার পর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। তিনি তখন অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লেগে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যদি হযরত হযরত ইউনুস (আ.) জিকিরে আত্মনিয়োগ না করতেন, তাহলে তথা হতে তার রেহাই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; বরং কেয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই অবস্থান করত।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত; বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে– উক্ত মাছের পেটকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর কবর বানিয়ে দেওয়া হতো।

তাসবীহ ও ইস্তেগফারের দ্বারা মসিবত লাঘব হয় : আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, বিপদ-মসিবত লাঘবে তাসবীহ ও ইস্তেগফারে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে বারংবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করছিলেন– "لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ" [হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই। আমি আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের একজন।] এ কালিমা পাঠের বরকতে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা (বিপদ) হতে নাজাত দিলেন। আর তিনি মাছের পেট হতে সহীহ সালেম বের হয়ে আসলেন। এ জন্য বুজুর্গানে দীন হতে এ রীতি চলে এসেছে যে, তারা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে বিপদাপদের সময় উক্ত কালিমা সোয়া লক্ষ বার পড়ে থাকেন। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মসিবত দূর করে দেন।

আবূ দাউদ শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে দোয়া পড়েছেন (অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (তা যে কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্যে পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করবেন। –[কুরতুবী, মা'আরিফ]

'فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ .... شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ' আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– হযরত ইউনুস (আ.) যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং একটি খোলা ময়দানে মাছটি তাঁকে উদগীরণ করল। তখন হযরত ইউনুস (আ.) খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর আশ্রয় ও ছায়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা লতা-পাতাযুক্ত একটি গাছ তথায় গজিয়ে দিলেন।

اَلْعَرَاءُ - বলে খোলা ময়দানকে যেখানে কোনো গাছ-পালা তরুলতা জন্মায় না। সেখানে আত্মগোপন করার অথবা আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছটি 'মোছেল' শহরের একটি বস্তির অদূরে একটি উন্মুক্ত ময়দানে উদ্গীরণ করেছিল।

কোনো কোনো বর্ণনা মতে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকার কারণে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শরীরের পশম পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না।

يَقْطِيْنٌ এমন গাছকে বলা হয় যার কাণ্ড হয় না। হাদীসে এসেছে যে, এটা ছিল লাউগাছ। এটা গজানোর উদ্দেশ্য ছিল হযরত ইউনুস (আ.)-এর ছায়া পাওয়া। এখানে شَجَرَةً শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মোজেজা হিসেবে লাউগাছের কাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অথবা, অন্য কোনো গাছের উপর লাউয়ের ঝাড় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা ঝাড় ব্যতীত ছায়া পাওয়া মুশকিল ছিল।

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, লাউগাছটি দু'ভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-এর উপকারে এসেছিল। প্রথমত উন্মুক্ত ময়দানে তা তাঁকে ছায়াদান করেছিল। দ্বিতীয়ত তাঁর শরীরে যেন মাছি বসতে না পারে তারও ব্যবস্থা হয়েছিল এ লাউগাছটির মাধ্যমে। কেননা লাউ ঝাড়ে মাছি বসে না।

অনুবাদ :

١٤٧. وَاَرْسَلْنٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ كَقَبْلِهٖ اِلٰى قَوْمٍ بِنَيْنَوٰى مِنْ اَرْضِ الْمُوْصِلِ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ بَلْ يَزِيْدُوْنَ عِشْرِيْنَ اَوْ ثَلَاثِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا .

১৪৭. আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম – তৎপর যদ্রূপ পূর্বে পাঠিয়েছিলাম মোসেল শহরের নিনুওয়া নামক স্থানের একটি জাতির নিকট– একলক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট বিশ অথবা ত্রিশ কিংবা সত্তর হাজার।

١٤٨. فَاٰمَنُوْا عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ الْمَوْعُوْدِيْنَ بِهٖ فَمَتَّعْنٰهُمْ اَبْقَيْنَاهُمْ مُتَمَتِّعِيْنَ بِمَا لَهُمْ اِلٰى حِيْنٍ تَنْقَضِىْ اٰجَالُهُمْ فِيْهِ .

১৪৮. সুতরাং তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। প্রতিশ্রুত আজাব স্বচক্ষে দেখার পর– সুতরাং আমি তাদেরকে সম্ভোগের সুযোগ করে দিলাম আমি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখলাম একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যেন তাতে তাদের নির্ধারিত সময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

١٤٩. فَاسْتَفْتِهِمْ اِسْتَخْبِرْ كُفَّارَ مَكَّةَ تَوْبِيْخًا لَهُمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ بِزَعْمِهِمْ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ فَيَخْتَصُّوْنَ بِالْاَبْنَاءِ .

১৪৯. কাজেই আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি তিরস্কারের ভঙ্গিতে মক্কাবাসীদের নিকট জানতে চান– তোমাদের রবের জন্য কি কন্যা সন্তান রয়েছে কেননা তারা মনে করে (এবং বলে বেড়ায়) যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা– আর তাদের জন্য রয়েছে পুত্র সন্তান? কাজেই তারা শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে।

١٥٠. اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ خَلْقَنَا فَيَقُوْلُوْنَ ذٰلِكَ .

১৫০. অথবা, আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছি আর তারা স্বচক্ষে দেখেছে? আমার সৃষ্টিকরণ– যদ্দরুন তারা তা বলে বেড়াচ্ছে?

١٥١. اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ كِذْبِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ

১৫১. জেনে রেখো! তারা তাদের বানোয়াট তাদের মিথ্যা [ভাষণ] বলে বেড়ায়।

١٥٢. وَلَدَ اللّٰهُ ۙ بِقَوْلِهِمُ الْمَلٰئِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِيْهِ .

১৫২. যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন– তাদের এ বক্তব্যের মাধ্যমে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী এ ব্যাপারে।

١٥٣. اَصْطَفَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَاسْتُغْنِىَ بِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فَحُذِفَتْ اَىْ اِخْتَارَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ .

১৫৩. তিনি কি বেছে নিয়েছেন? প্রশ্নবোধক হামযাটি যবর-যোগে। তার কারণে হামযায়ে অসলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কাজেই তাকে বিলোপ করা হয়েছে অর্থাৎ পছন্দ করেছেন– পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানকে?

١٥٤. مَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ هٰذَا الْحُكْمَ الْفَاسِدَ .

১৫৪. তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিরূপ ফয়সালা কর? এরূপ অন্যায় ফয়সালা।

١٥٥. اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِي الذَّالِ اِنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الْوَلَدِ .

১৫৫. তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? (تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে) تَاء -কে ذَال -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। [মূলত এটা ছিল تَتَذَكَّرُوْنَ -এ ব্যাপারে যে,] আল্লাহ তা'আলা সন্তানসন্ততি হতে পবিত্র।

١٥٦. اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ اَنَّ لِلّٰهِ وَلَدًا .

১৫৬. নাকি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে? প্রকাশ্য দলিল এ ব্যাপারে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সন্তান সন্ততি রয়েছে।

١٥٧. فَاْتُوْا بِكِتَابِكُمُ التَّوْرَاةِ فَارُوْنِيْ ذٰلِكَ فِيْهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ ذٰلِكَ .

১৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের কিতাবখানা পেশ করো অর্থাৎ তাওরাত আর তাতে আমাকে তা দেখিয়ে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক– তোমাদের উক্ত উক্তির মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অতঃপর পুনরায় আমি তাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকজনের নিকট পাঠিয়েছি। আলোচ্য আয়াতের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে।

মাছের ঘটনার পর হযরত ইউনুস (আ.)-কে কাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কওমকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি নৌকায় উঠার পর নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে এবং ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। লোকেরা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দেয়। একটি মাছ তাকে গিলে ফেলে এবং পরে একটি উপকূল ভূমিতে ফেলে দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তথা হতে নাজাত পাওয়ার পর হযরত ইউনুস (আ.) পুনরায় দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আদিষ্ট হন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুনরায় তাঁকে কোথায় পাঠানো হয়েছে? পূর্ববর্তী কওম তথা মোসেল শহরের নিনুওয়া এলাকায় না অন্য কোথাও? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আল্লামা বাগাবী (র.) ও একদল মুফাস্সিরের মতে উল্লিখিত আয়াতে নিনুওয়ায় প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পর তাকে অন্য একটি জাতির নিকট পাঠানো হয়েছে? যাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কিছু বেশি।

২. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, পুনরায় (মাছের ঘটনার পর) হযরত ইউনুস (আ.)-কে পূর্বোক্ত নিনুওয়াবাসীদের নিকটই পাঠানো হয়েছিল। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এ অভিমতই পোষণ করে থাকেন। কুরআনে কারীমের বচনভঙ্গি ও হাদীস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনাদির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়ে থাকে। অবশ্য হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনীর শুরুতে তাঁর রিসালাতের উল্লেখ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল হওয়ার পরই মাছের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখানে পুনরায় এ জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় তথায়ই প্রেরিত হয়েছেন। তবে এখানে এটাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁকে গুটি কতেক লোকের নিকট পাঠানো হয়নি; বরং তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক।

"اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" আয়াতে "اَوْ" কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এখানে "اَوْ" শব্দটিকে "بَلْ" -এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.)ও তা-ই বলেছেন। হযরত মুকাতিল, ফাররা ও আবূ উবায়দা (র.) "اَوْ" শব্দটির অর্থ بَلْ বলে মনে করেন।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "اَوْ" শব্দটি এখানে "وَ" -এর অর্থে হয়েছে।
- অন্য এক কেরাতে এসেছে- "بَلْ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" অর্থাৎ দর্শকগণ তাদেরকে এক লক্ষের বেশি মনে করেন। কিন্তু কত বেশি মনে করে- সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।
- কেউ কেউ বলেছেন, বিশ হাজার।
- কারো কারো মতে, ত্রিশ হাজার।
- কেউ কেউ বলেছেন, সত্তর হাজার।

"اَوْ" শব্দটি সন্দেহের জন্য অথচ আল্লাহ তা'আলার শানে সন্দেহ ঠিক নয়। তথাপি আল্লাহ তা'আলা কিভাবে "اَوْ" বললেন?

অথবা, "وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" আয়াতে "اَوْ" **শব্দটি দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে?** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" অর্থাৎ আর আমি হযরত ইউনুস (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম একলক্ষ লোকের নিকট অথবা ততোধিক লোকের নিকট।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছুই জানেন, শুনেন, কোনো ব্যাপারেই তার সন্দেহ-সংশয় থাকার কথা নয় তথাপি আল্লাহ তা'আলা এখানে "اَوْ" শব্দ ব্যবহার করলেন কিভাবে?

এর জাওয়াবে মুফাস্সিরগণ বলেছেন- তা সাধারণ লোকদের হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ লোক যদি তাদেরকে দেখত তাহলে বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার কিছু বেশি।

আল্লামা থানবী (র.) বলেছেন- এখানে সন্দেহের প্রকাশ করার উদ্দেশ্যই নয়। বরং তাদেরকে এক লক্ষও বলা যায় এবং লক্ষাধিক বলা যায়। আর তা এভাবে যে, যদি ভগ্নাংশ হিসেবে করা না হয় তাহলে এক লক্ষ হবে। আর যদি ভগ্নাংশকে হিসেবে ধরা না হয় তাহলে লক্ষাধিক হবে।

"فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- হযরত ইউনুস (আ.)-কে পুনরায় নিনুওয়া পাঠানোর পর তথাকার লোকেরা ঈমান গ্রহণ করল। তারা খাঁটি অন্তরে তাওবা করত আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ মৃত্যু অবধি তিনি তাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখলেন। মোটকথা তাদেরকে ইহলৌকিক সমৃদ্ধি এবং পারলৌকিক শান্তি দান করলেন।

তবে কেউ কেউ বলেন, এখানে "اِلٰى حِيْنٍ" -এর অর্থ হলো যতদিন পর্যন্ত তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়নি ততদিন পর্যন্ত তাঁদের উপর কোনো আজাব ও গজব আসেনি- তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিল।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাদিয়ানীদের দলিল পেশ এবং মুহাক্কিকীনের পক্ষ হতে এর জবাব : আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্র হতে আজাব সরে গিয়েছে। কেননা তাঁর কওম সময়মতো ঈমান গ্রহণ করেছিল।

অথচ ভণ্ডনবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তা হতে তার স্বপক্ষে অযৌক্তিক দলিল পেশ করেছিল। তা এই যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার বিরোধীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, যদি তারা তার উপর ঈমান না আনে তাহলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, অমুক সময় তাদের উপর আজাব এসে পড়বে। কিন্তু এতে বিরোধীদের বিরোধিতা আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। কিন্তু তাদের উপর আজাব আসল না। অতঃপর কাদিয়ানীরা ব্যর্থতার লাঞ্ছনা ঢাকা দেওয়ার জন্য বলতে লাগল যে, বিরোধীরা যেহেতু মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে এবং তওবা করেছে সেহেতু তাদের হতে আজাব সরে গেছে। যদ্রূপ হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওম হতে আজাব সরে গিয়েছিল।

কিন্তু হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওম ঈমান আনার এবং রাসূলের আনুগত্য করার কারণে আজাব হতে রেহাই পেয়েছে। অথচ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিরোধীগণ না তার উপর ঈমান এনেছে আর না তার অনুসরণ করেছে। কাজেই উভয় ঘটনাকে এক করে দেখার কোনোরূপ অবকাশ নেই। বরং তার দ্বারা দলিল পেশ করা সম্পূর্ণ বাতিল।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে অত্র আয়াতগুলোর সম্পর্ক : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতসমূহে তাওহীদকে প্রমাণ করা ও শিরককে বাতিল করার মূল আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে শিরকের একটি খাস প্রকারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের আকীদা ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। আর জিনদের নেতাদের কন্যারা হলো ফেরেশতাদের মাতা। আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেছেন, কুরায়েশ ব্যতীত জুহায়নাহ, বনূ সালীমাহ, বনূ খোযায়াহ ও বনূ মালীহের লোকজনও উক্ত আকীদা পোষণ করত। –[কাবীর, মা'আরিফ]

'ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা' মুশরিকদের এ আকিদার সমালোচনা : মক্কার কাফেররা বিশেষত কুরাইশ, বনূ জুহায়নাহ, বনূ৫প্রৃযি সালীমাহ, বনূ খোযায়াহ ও বনূ মালীহের লোকেরা আকিদা পোষণ করত যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। অত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত আকিদার কঠোর সমালোচনা করেছেন। জোরালো ভাষায় ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাদের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

প্রথমত তোমাদের উক্ত দাবি খোদ তোমাদের সামাজিক প্রচলন ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল। কেননা তোমরা নিজেরা কন্যাদেরকে লজ্জাকর মনে কর। এখন যাকে তোমরা নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর– যাকে নিজেরা ঘৃণা কর তাকে আল্লাহ তা'আলার জন্য কিভাবে সাব্যস্ত কর। তাছাড়া তোমরা যে দাবি কর ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান– এতদ্বিষয়ে তোমাদের নিকট কি প্রমাণ রয়েছে?

কোনো দাবি সাব্যস্ত করার জন্য তিন প্রকারের দলিল পেশ করা যেতে পারে।

এক. স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা।

দুই. নকলী (বর্ণনামূলক) দলিল। অর্থাৎ এমন কারো বক্তব্যের রেফারেন্স দেওয়া যাকে সকলে মান্য করে।

তিন. আকলী (যুক্তিভিত্তিক) দলিল।

আর এটা তো স্পষ্ট যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করতে দেখনি। তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় তোমরা তথায় উপস্থিত ছিলে না। সুতরাং তাদের কন্যা হওয়ার ব্যাপারে তোমরা প্রত্যক্ষদর্শী হতে পর না। এ দিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "أَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ" অর্থাৎ নাকি আমি ফেশেতাদেরকে কন্যা করে সৃষ্টি করার সময় তারা তা দেখেছে?

আর তোমাদের নিকট কোনো নকলী দলিলও নেই। কেননা তাদের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে যার সত্যবাদী হওয়া সর্বজনবিদিত। অথচ যারা উক্ত আকিদা পোষণ করে থাকে তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া সর্বজনবিদিত। কাজেই তাদের বক্তব্য দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বুঝাতে চেয়েছেন– "أَلَآ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ" [তারা তা মিথ্যা বলে বেড়ায়।]

তা ছাড়া আকলী দলিল বা যুক্তিও তোমাদের মতবাদকে সমর্থন করে না। কেননা খোদ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র সন্তানের মোকাবিলায় কন্যা সন্তানের মর্যাদা কম। সুতরাং যে পবিত্র সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) এর মর্যাদা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক তিনি কি করে নগণ্য মর্যাদার বস্তুটিকে [অধিক মর্যাদার মোকাবিলায়] গ্রহণ করতে পারেন? আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন– أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ؛ الخ আল্লাহ তা'আলা কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন? ধিক তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর! কিভাবে তোমরা এরূপ রায় দিতে পারলে?

এখন শুধু তোমাদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি পথই অবশিষ্ট রয়েছে তাহলো তোমাদের নিকট কোনো আসমানি কিতাব এসেছে যাতে ওহীর মাধ্যমে তোমাদের উক্ত আকিদার তা'লীম দেওয়া হয়েছে। যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে দেখাও যে, তোমাদের সে কিতাব ও ওহী কোথায়? নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ . فَأْتُوْا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ * অথবা তোমাদের নিকট কি কোনো স্পষ্ট দলিল রয়েছে? সুতরাং যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমাদের আসামানি কিতাব খুলে দেখাও।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবি করত তা সর্বাংশে মিথ্যা ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

হটধর্মীদেরকে পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জবাব দিতে হয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, হটধর্মীদেরকে ইলযামি জবাব দেওয়া উচিত। ইলযামি জবাব বলে বিরোধীদের কোনো দাবিকে খোদ তাদের অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের অন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা মেনে নিয়েছি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপর দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভুল হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বিরোধীদেরকে বুঝানোর জন্য তা করা হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা বিরোধীদের আকিদাকে বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য খোদ তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছেন যে, কন্যা সন্তানের জন্য লজ্জাকর হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটও কন্যা সন্তানের জন্য লজ্জাকর। আর তার অর্থ এটাও নয় যে, তারা যদি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান না বলে পুত্র সন্তান বলত, তাহলে তা সঠিক হতো। বরং এটা একটি ইলযামী জবাব। এর উদ্দেশ্য হলো খোদ তাদের ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে তাদের আকিদাকে খণ্ডন করা।

অন্যথা এ রকম আকিদার প্রকৃত জবাব হলো আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তার না কোনো সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন রয়েছে আর না সন্তান-সন্ততি হওয়া তাঁর উচ্চ মর্যাদার জন্য শোভনীয় হতে পারে।

অনুবাদ :

١٥٨. وَجَعَلُوْا اَىْ الْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَهُ تَعَالٰى وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اَىْ الْمَلٰئِكَةِ لِاجْتِنَانِهِمْ عَنِ الْاَبْصَارِ نَسَبًا ط بِقَوْلِهِمْ اَنَّهَا بَنَاتُ اللّٰهِ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ اَىْ قَائِلِىْ ذٰلِكَ لَمُحْضَرُوْنَ النَّارَ يُعَذَّبُوْنَ فِيْهَا .

১৫৮. আর তারা নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ মুশরিকরা নির্ধারণ [করেছে] তার মাঝে অর্থাৎ আল্লাহর মাঝে এবং জিনদের মাঝে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাঝে, কেননা তারা দৃষ্টি হতে লুকিয়ে থাকে جِنٌّ -এর শাব্দিক অর্থ হলো গোপন থাকা, লুকিয়ে থাকা। বংশের সম্পর্ক- কেননা তারা বলত ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। অথচ জিনরা জানে যে, নিঃসন্দেহে তাদেরকে অর্থাৎ তা যারা বলে- অবশ্যই উপস্থিত করা হবে জাহান্নামে তথায় তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে।

١٥٩. سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ بِاَنَّ لِلّٰهِ وَلَدًا .

১৫৯. আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ তার পবিত্রতা- তা হতে যা তারা বর্ণনা করে থাকে- যেমন (তারা বলে) আল্লাহর সন্তানসন্ততি রয়েছে।

١٦٠. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىْ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ فَاِنَّهُمْ يُنَزِّهُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا يَصِفُهُ هٰؤُلَاءِ .

১৬০. আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত অর্থাৎ ঈমানদারগণ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ রয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারগণ ঐ সব কলঙ্ক হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন যা মুশরিকরা বলে বেড়ায়।

١٦١. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاَصْنَامِ .

১৬১. নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা অর্থাৎ মূর্তিসমূহ।

١٦٢. مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى مَعْبُوْدِكُمْ وَعَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِفٰتِنِيْنَ لا اَىْ اَحَدًا .

১৬২. তোমরা কেউই পার না তার নিকট হতে- তোমাদের মাবুদের নিকট হতে, আর عَلَيْهِ শব্দটি مُتَعَلِّقٌ হয়েছে আল্লাহর বাণী بِفٰتِنِيْنَ -এর সাথে [বিভ্রান্ত করে] ফিরিয়ে আনতে অর্থাৎ কাউকেও না।

١٦٣. اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ جِبْرَئِيْلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ .

১৬৩. শুধুমাত্র জাহান্নামে প্রবেশকারীদের ব্যতীত যা আল্লাহ তা'আলার জানা রয়েছে।

١٦٤. وَمَا مِنَّا مَعْشَرَ الْمَلٰئِكَةِ اَحَدٌ اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ لا فِى السَّمٰوٰتِ يَعْبُدُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ .

১৬৪. হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে বললেন- নেই আমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ) ফেরেশতাদের মধ্য হতে কেউ- তবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট জ্ঞাত স্থান রয়েছে- আকাশমণ্ডলে তথায় সে আল্লাহর ইবাদত করে। সে তা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

١٦٥. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ اَقْدَامَنَا فِى الصَّلٰوةِ .

১৬৫. আর নিশ্চয় আমরা সারিবদ্ধকারী আমাদের পা-গুলোকে নামাজের মধ্যে।

١٦٦. وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ الْمُنَزِّهُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ .

১৬৬. আর নিঃসন্দেহে আমরা তাসবীহকারী– আল্লাহ তা'আলার জন্য যা অশোভনীয় তা হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।

١٦٧. وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ كَانُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لَيَقُوْلُوْنَ .

১৬৭. নিঃসন্দেহে اِنْ ছাকীলাহ হতে খাফীফাহ করা হয়েছে– তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেররা বলে আসছে।

١٦٨. لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا كِتَابًا مِنَ الْاَوَّلِيْنَ اَىْ مِنْ كُتُبِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَّيْنَ .

১৬৮. যদি আমাদের নিকট থাকত জিকির অর্থাৎ কিতাব পূর্ববর্তীদের হতে– অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কিতাবসমূহ হতে।

١٦٩. لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ الْعِبَادَةَ لَهٗ قَالَ تَعَالٰى .

১৬৯. তাহলে তো অবশ্যই আমরা আল্লাহর মুখলিস একনিষ্ঠ বান্দা হতাম (অর্থাৎ) আল্লাহর জন্য ইবাদতকে খালেস করতাম।

١٧٠. فَكَفَرُوْا بِهٖ اَىْ بِالْكِتَابِ الَّذِىْ جَاءَهُمْ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ الْاَشْرَفُ مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ .

১৭০. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– অথচ তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল অর্থাৎ যে কিতাবখানা তাদের নিকট এসেছে। আর তা হলো কুরআনে হাকীম– যা সেসব কিতাব হতে উত্তম। সুতরাং অচিরেই তারা জানতে পারবে– তাদের কুফরির পরিণতি সম্পর্কে।

١٧١. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بِالنَّصْرِ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ج وَهِىَ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اَوْ هِىَ قَوْلُهٗ .

১৭১. আর পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে আমার বাক্য [প্রতিশ্রুতি] সাহায্যের ব্যাপারে আমার রাসূলগণের জন্য– আর তা হলো–আল্লাহর বাণী "لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ" [নিশ্চয় আমি এবং আমার রাসূলগণ বিজয়ী হবে।] অথবা, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী

١٧٢. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ .

১৭২. "اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ" নিঃসন্দেহে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কুরাইশরা বলত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান। হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেশতাগণ যদি আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান হয়ে থাকে তাহলে তাদের জননী কে? তারা উত্তর দিল যে, জিন সরদারগণের কন্যারা হলো তাদের জননী। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেছেন– "وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" অর্থাৎ জিনরা ভালো করেই জানে যে, উক্ত আকিদা পোষণকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

"وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ ...... الخ" আয়াতগুলোর শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন- নবী করীম ﷺ -এর উপর উক্ত আয়াত এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা "سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى" -এর নিকট (মি'রাজের সময়) ছিলেন। এ সময় তাঁর সাথী হযরত জিব্রাঈল (আ.) কিছুটা পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছ? হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে বললেন, আমি আমার নির্ধারিত স্থান হতে একটুও সামনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা রাখি না। "وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ" আমাদের প্রত্যেকেরই আসমানে ইবাদতের এমন একটি স্থান রয়েছে যা সে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

অপরদিকে ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানগণ নামাজে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে জানত না। তারা কিছুটা এলোমেলো হয়ে দাঁড়াত। তাদেরকে তালীম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের ইবাদতের অবস্থা (জিব্রাঈলের মুখে) তুলে ধরেছেন। وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ আর নিঃসন্দেহে আমরা নামাজ পড়ার সময় সারিবদ্ধ হয়ে থাকি।

"وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" আয়াতের ব্যাখ্যা : আর মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ স্পষ্ট স্থাপন করেছে। এর এক ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে মক্কার মুশরিকদের এ ভ্রান্ত আকিদার সমালোচনা করা হয়েছে যে, জিনদের সর্দার কন্যাগণ ফেরেশতাগণের জননী। যেন [আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই] জিন সর্দারদের কন্যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। আর সে সম্পর্কের কারণেই ফেরেশতারা জন্মগ্রহণ করেছেন।

সুতরাং তাফসীরের এক বর্ণনায় এসেছে যে, যখন আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে দাবি করল তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের জননী কে? তারা উত্তরে বলল, তাদের জননী হলো জিন সর্দারদের কন্যা। -[ইবনে কাছীর]

কিন্তু এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, উক্ত আয়াতে তো আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অথচ দাম্পত্য সম্পর্ক তো বংশীয় সম্পর্ক নয়।

এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.) ও যাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত অপর একটি তাফসীরই এ স্থলে সমধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আর তা হচ্ছে- আরবের মুশরিকদের আকিদা এটাও ছিল যে, (মা'আযাল্লাহ) শয়তান আল্লাহর ভাই। আল্লাহ হলেন কল্যাণের স্রষ্টা। অপরদিকে শয়তান (ইবলিস) হলো অকল্যাণের স্রষ্টা।

এখানে তাদের উক্ত বাতিল আকিদাকে খণ্ডন করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর, কুরতুবী ও কাবীর]

"وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" আয়াতে اَلْجِنَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আলোচ্য আয়াতে اَلْجِنَّةُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং-

ক. একদল মুফাস্সির বলেছেন, এখানে اَلْجِنَّةُ -এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। جِنٌّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো গোপন থাকা বা লুকিয়ে থাকা। যেহেতু ফেরেশতারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে সেহেতু তাদেরকে اَلْجِنَّةُ বলা যুক্তিসঙ্গত।

   সুতরাং হযরত মুকাতিল (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে- মক্কার কুরাইশ ও অপরাপর কতিপয় গোত্র বলত যে, "ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান"। তাদের উক্ত আকিদাকে খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের উক্ত আকিদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খ. অপর একদল মুফাস্সিরের মতে, এখানে اَلْجِنَّةُ -এর দ্বারা জিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

   হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা বলত- ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা হন তাহলে তাদের জননী কে? তখন তারা জবাবে বলল, তাদের জননী হলো জিনদের সর্দারগণের কন্যাগণ। এটা হতে স্বভাবতই প্রমাণিত হয় যে, তারা দাবি করেছেন যে, জিন সর্দারদের কন্যাগণের সাথে আল্লাহ তা'আলার (মা'আযাল্লাহ) দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ফেরেশতাগণ জন্মলাভ করেছে।

   অত্র আয়াতে তাদের উক্ত আকিদার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) উল্লিখিত তাফসীরদ্বয়ের সমালোচনা করেছেন এবং নিম্নোক্তভাবে তাদের খণ্ডন করেছেন : প্রথমোক্ত তাফসীরটি এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে তাদের উক্ত আকিদা তথা "ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান"-কে খণ্ডন ও বাতিল করে দিয়েছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত- "وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" -কে তার উপর আত্‌ফ করেছেন। আর عَطْف -এর মধ্যে مَعْطُوْف হবে مَعْطُوْف عَلَيْه ব্যতীত অন্য কিছু। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য এক ও অভিন্ন হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় তাফসীরটিও এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, এতে দাম্পত্য সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে نَسَبٌ-এর কথা। আর نَسَبٌ -এর অর্থ হলো বংশগত সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্ককে نَسَبٌ বলে না, বরং একে বলে مُصَاهَرَتْ বা اِزْدِوَاج।

ইমাম রাযী (র.)-এর মাযহাব : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, এখানে نَسَبٌ -এর দ্বারা বংশগত সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে, আর الجنة -এর দ্বারা জিনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হাসান বসরী (র.) ও যাহহাক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আরবে মুশরিকরা এটাও বলত যে, ইবলিস (শয়তান) আল্লাহর ভাই (মা'আযাল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের স্রষ্টা আর ইবলিস হলো অকল্যাণের স্রষ্টা।

আলোচ্য আয়াতে প্রকৃতপক্ষে তাদের উক্ত আকিদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুহাক্কিকগণ ইমাম রাযী (র.)-এর এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

"وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত اَلْجِنَّةَ -এর ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায়ও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। সুতরাং যারা اَلْجِنَّةَ -এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করেছেন তাদের মতে অত্র আয়াতের তাফসীর হলো- আর ফেরেশতাগণ ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, যারা উক্ত ভ্রান্ত-আকিদা পোষণ করে [যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা-সন্তান] তারা অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আর যারা اَلْجِنَّةَ -এর দ্বারা শয়তান বা ইবলিসকে বুঝিয়েছেন তাদের মাযহাব অনুযায়ী আয়াতখানার তাফসীর হচ্ছে- তোমরা তো জিনকে আল্লাহর সাথে শরিক করে রেখেছ তারা নিজেরাও ভালো করেই জানে যে, আখেরাতে তাদের হাশর হবে অত্যন্ত খারাপ। যেমন- ইবলিস সে তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছে। সুতরাং যে স্বয়ং জানে যে, তাকে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে তাকে খোদার সাথে শরিক করা নিজের বোকামি ছাড়া আর কি?

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফেরদের একটি ভ্রান্ত আকিদার অন্তঃসারশূন্যতা বর্ণনা করেছেন। শাণিত যুক্তির মাধ্যমে তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা শিরকের অক্টোপাশ ছিন্ন করে তাওহীদের পানে ধাবিত হতে পারে। তাদের মগজ ধোলাই হয়।

"وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" **আয়াতের মধ্যস্থিত اِنَّهُمْ -এর যমীরের মারজি' :** আলোচ্য আয়াতে اِنَّهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি'র ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

এক. উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। তখন আয়াতের অর্থ হবে-

اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا يَقُوْلُوْنَ فِى الْمَلٰئِكَةِ وَقَدْ عَلِمَتِ الْمَلٰئِكَةُ اَلْمُشْرِكِيْنَ فِىْ ذٰلِكَ كَاذِبُوْنَ وَاِنَّهُمْ النَّارُ وَمُعَذَّبُوْنَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ - لَمُحْضَرُوْنَ

অর্থাৎ মুশরিকরা ফেরেশতাগণের ব্যাপারে যা বলার বলছে। অথচ ফেরেশতাগণ ভালোভাবেই জানেন যে, উক্ত বক্তব্যে মুশরিকরা মিথ্যাবাদী। তজ্জন্য মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আজাব দেওয়া হবে।

দুই. উক্ত هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْجِنَّةَ [জিন] অর্থাৎ জিন [শয়তানরা] ভালো করেই জানে যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আজাব দেওয়া হবে।

"سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : মুশরিক সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তান-সন্ততির সেই সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে আল্লাহ তা'আলা তা হতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। মূলত এটা ফেরেশতাগণের উক্তি আল্লাহ তা'আলা এখানে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার উপর যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তাকে খণ্ডন করা এবং ফেরেশতাদের মুখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করা এর উদ্দেশ্য। কেননা মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলেছে। সুতরাং আল্লাহর বক্তব্যের পর এখানে এ ব্যাপারে খোদ ফেরেশতাদের বক্তব্য অত্যন্ত সমীচীন হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা তো বলে ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা– কিন্তু এ ব্যাপারে দেখা যাক যে, খোদ ফেরেশতারা কি বলে? কেননা মুশরিকদের অপেক্ষা ফেরেশতারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে অধিক ওয়াকিফহাল থাকার কথা।

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার উপর বহু মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে। যেমন মক্কার কাফেররা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। জিনদের সাথে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বংশগত সম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন– কিন্তু আমার মুখলিস তথা ঈমানদার বান্দাগণের কথা ভিন্ন। তারা আমার সাথে কাউকে শরিক করে না। কাউকে আমার সন্তান-সন্ততি বলে দাবি করে না। কারো সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে না। বরং উপরিউক্ত বিষয়াবলিকে তারা আমার জন্য অশোভনীয় ও অপ্রযোজ্য বলে ঘোষণা দেয়। আমার তাসবীহ পাঠ করে, আমার পূত-পবিত্রতা বর্ণনা কর। আমার প্রশংসা ও গুণগান করে।

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" আয়াতের مُسْتَثْنٰى مِنْهُ কি? এখানে اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ -এর মধ্যে اِلَّا হরফে ইস্তিছনা। আর "عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" হলো مُسْتَثْنٰى কিন্তু তার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে–

১. কেউ কেউ বলেছেন, এটার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো لَمُحْضَرُوْنَ অর্থাৎ "اِنَّهُمْ نَاجُوْنَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَلَا هُمْ يُحْضَرُوْنَ" অর্থাৎ মুখলিস বান্দাগণ জাহান্নামের আজাব হতে নাজাত পাবে; তাদেরকে জাহান্নামে হাজির করা হবে না।

২. কারো কারো মতে, এটা আল্লাহর বাণী– "وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" হতে مُسْتَثْنٰى হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে। কিন্তু ঈমানদারগণ তা করে না।

৩. কেউ কেউ বলেছেন– এটা لَمُحْضَرُوْنَ হতে اِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ হয়েছে। "فَاِنَّهُمْ يُنَزِّهُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا يَصِفُهُ هٰؤُلَاءِ" এ মুশরিকরা আল্লাহর উপর যে অপবাদ দেয় ঈমানদারগণ তা হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।

"وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে দাবি করে এবং সদা-সর্বদা খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত থাকে ফেরেশতাদের খোদাভীতি ও খোদাপ্রীতি এর উল্লেখ করে ধিক্কার দিয়েছেন। ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশের বাইরে এক কদমও নাড়াচাড়া করে না। এমনকি ইবাদত করার জন্য তাদেরকে যে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাও তারা অতিক্রম করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে– "مَا فِى السَّمٰوٰتِ مَوْضِعُ شِبْرٍ اِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ يُصَلِّىْ وَيُسَبِّحُ" আসমানের প্রতি বিঘত জায়গায় একেক জন ফেরেশতা নামাজ ও তাসবীহরত রয়েছেন।

তা ছাড়া ফেরেশতারা আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ করে থাকে অত্যন্ত শৃঙ্খলের সাথে এবং আদব ও মহব্বতের সাথে। শেষোক্ত আয়াতটি দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"وَلَقَدْ سَبَقَتْ ..... لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেন– পূর্ব হতেই আমার রাসূলগণের জন্য আমার বাক্য স্থির হয়ে রয়েছে। এখানে বাক্য দ্বারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে বুঝানো হয়েছে। আর উক্ত বাক্যটি হয়তো আল্লাহর বাণী– "لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ" (অবশ্যই আমি এবং আমার রাসূলগণ বিজয়ী হবে) অথবা, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে– "اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ" নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

রাসূলগণের বিজয়ী হওয়ার অর্থ : উক্ত আয়াতদ্বয়ের সারকথা হলো– এটা পূর্ব হতেই স্থির করে রাখা হয়েছে যে, আমার খাস বান্দাগণ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণই বিজয়ী হবে। এর উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, বহু নবী-রাসূল তো দুনিয়াতে বিজয়ী হতে পারেননি। তাহলে উক্ত আয়াতদ্বয়ের কি অর্থ হবে?

এর উত্তর হচ্ছে– যেসব পয়গাম্বরের কাহিনী আমরা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাদের অধিকাংশের অবস্থা হলো তাঁদের কওম তাঁদের রেসালাত ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত কঠিন আজাবে নিপতিত হয়েছে। অপরদিকে তাদেরকে এবং তাদের অনুসারীদেরকে আজাব হতে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক নবী ও রাসূল এমনও অতিবাহিত হয়েছেন যে, পৃথিবীতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাগতিক বিজয় অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু যুক্তি ও দলিল উপস্থাপনের দিক বিচারে সদাসর্বদা তাঁরাই বিজয়ী ছিলেন। আর আদর্শগত বিজয় সব সময় তাঁরাই লাভ করেছেন। হ্যাঁ, এ বিজয়ের জাগতিক নিদর্শন কোনো বিশেষ হিকমত যেমন পরীক্ষা করা ইত্যাদি এর কারণে আখেরাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত থানবী (র.)-এর উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে, যেমন কোনো নিকৃষ্ট ডাকাত-ছিনতাইকারী যদি কোনো বড় বাদশাহের সাথে রাস্তায় দুর্ব্যবহার করে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে বাদশাহ তার খোদা প্রদত্ত উচ্চ মন-মানসিকতার কারণে তাকে খোশামোদ-তোষামোদ করবে না; বরং বাদশাহ তার রাজধানীতে পৌঁছে উক্ত ডাকাতকে গ্রেফতার করত শাস্তি দিবে। সুতরাং এ সাময়িক বিজয়ের কারণে না ঐ ডাকাতকে বাদশাহ বলা যাবে আর না ঐ নেতা (বাদশাহ)-কে পরাজিত বলা যাবে। বরং প্রকৃত অবস্থার বিবেচনায় ডাকাতটি তার উক্ত সাময়িক বিজয় কালেও পরাজিত। আর বাদশাহ পরাজয়ের সময়ও বাদশাহ-ই বটে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– إِنْ لَمْ يَنْتَصِرُوْا فِيْ الدُّنْيَا يَنْتَصِرُوْا فِي الْأٰخِرَةِ অর্থাৎ তাঁর [নবী রাসূলগণ] দুনিয়াতে সাহায্য প্রাপ্ত তথা বিজয়ী না হলেও আখেরাতে যে বিজয়ী হবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু এটা মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, এ বিজয়– চাই তা দুনিয়াতে হোক অথবা আখেরাতে হোক কোনো সম্প্রদায় শুধুমাত্র বংশের বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা দীনের সাথে নিছক নামের সম্পর্কের দ্বারা অর্জন করতে পারে না; বরং এটা কেবল তখনই লাভ করা সম্ভব যখন মানুষ নিজেকে আল্লাহর সেনাবাহিনীর একজন সদস্য বানিয়ে নিবে। যার অনিবার্য পরিণতি হবে জীবনের প্রতিটি শাখায় আল্লাহর আনুগত্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা।

মোটকথা, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে তার গোটা জীবনে নাফ্স এবং শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যয় করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। আর তার বিজয় চাই জাগতিক হোক অথবা আদর্শিক, দুনিয়ায় হোক বা আখেরাতে– উক্ত শর্তের উপর মওকুফ থাকবে।

অনুবাদ :

١٧٣. وَاِنَّ جُنْدَنَا اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ الْكُفَّارَ بِالْحُجَّةِ وَالنُّصْرَةِ عَلَيْهِمْ فِى الدُّنْيَا وَاِنْ لَمْ يَنْتَصِرْ بَعْضٌ مِنْهُمْ فِى الدُّنْيَا فَفِى الْاٰخِرَةِ.

১৭৩. আর নিশ্চয় আমার সেনাবাহিনী অর্থাৎ ঈমানদারগণ অবশ্যই তারাই বিজয়ী হবে– কাফেরদের উপর দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এবং দুনিয়াতে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে। আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ দুনিয়ায় বিজয়ী না হয়ে থাকে, তাহলে আখেরাতে বিজয়ী হবে।

١٧٤. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اَعْرِضْ عَنْ كُفَّارِ مَكَّةَ حَتّٰى حِيْنٍ تُؤْمَرُ فِيْهِ بِقِتَالِهِمْ.

১৭৪. সুতরাং আপনি তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিন। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন– একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে সময় আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হবে সে সময় পর্যন্ত।

١٧٥. وَاَبْصِرْهُمْ اِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ فَقَالُوْا اِسْتِهْزَاءً مَتٰى نُزُوْلُ هٰذَا الْعَذَابِ.

১৭৫. আপনি তাদের প্রতি দেখুন– যখন তাদের উপর আজাব নাজিল হয়। শীঘ্রই তারাও দেখবে– তাদের কুফরির পরিণাম, তখন তারা বিদ্রূপ করে বলল– এ আজাব কবে নাজিল হবে?

١٧٦. قَالَ تَعَالٰى تَهْدِيْدًا لَّهُمْ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ.

১৭৬. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিয়ে ইরশাদ করেন– আমার আজাব পাওয়ার জন্য এরা কি তাড়াহুড়া করছে?

١٧٧. فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ بِفِنَائِهِمْ قَالَ الْفَرَّاءُ الْعَرَبُ تَكْتَفِىْ بِذِكْرِ السَّاحَةِ عَنِ الْقَوْمِ فَسَاءَ بِئْسَ صَبَاحًا صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ وَفِيْهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ.

১৭৭. যখন আজাব নাজিল হবে তাদের আঙিনায়– তাদের উঠানে– ফাররা নাহবী বলেছেন, আরবরা প্রাঙ্গণের উল্লেখ করে কওমকে বুঝিয়ে থাকে। তখন কতইনা মন্দ হবে– অকল্যাণকর ভোর হবে– তাদের [ভোর] যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে– এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহার করা হয়েছে।

١٧٨. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ.

১৭৮. আর আপনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন।

١٧٩. وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ كَرَّرَ تَاكِيْدًا لِتَهْدِيْدِهِمْ وَتَسْلِيَةً لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৯. আর আপনি দেখুন, শীঘ্রই তারাও দেখবে– তাদেরকে হুমকি দেওয়ার জন্য এবং নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ বাক্যটি দু-বার উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨٠. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ الْغَلَبَةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ بِاَنَّ لَهُ وَلَدًا.

১৮০. আপনার প্রভুর জন্য পবিত্রতা যিনি ক্ষমতার অধিকারী– বিজয়ের অধিকারী– যা তারা বর্ণনা করে তা হতে– এই যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তানসন্ততি রয়েছে।

١٨١. وَسَلَٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ الْمُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللّٰهِ التَّوْحِيْدَ وَالشَّرَائِعَ.

১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি– যারা আল্লাহর পক্ষ হতে তাওহীদ ও আহকাম প্রচার করে থাকেন।

١٨٢. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلَى نَصْرِهِمْ وَهَلَاكِ الْكَافِرِيْنَ.

১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। রাসূলগণকে সাহায্য ও কাফেরদেরকে ধ্বংস করার জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

"فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ" আয়াতে نَزَلَ -এর বিভিন্ন কেরাত : অত্র আয়াতে نَزَلَ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

এক. জমহুর কারীগণের মতে, نَزَلَ মাযী মা'রূফের সীগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

দুই. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, نُزِلَ মাযী মাজহুলের সীগাহ হবে।

"فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ" আয়াতের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : অত্র আয়াতের فَسَاءَ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

এক. জমহুর ক্বারীগণের মতে, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

দুই. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, فَبِئْسَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) سَاءَ -এর স্থলে بِئْسَ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ" আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, মক্কার কাফের ও মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলত, হে মুহাম্মদ ﷺ ! তুমি আমাদেরকে যে আজাবের ভয় দেখিয়ে আসছ তা কখন আগমন করবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতখানা নাজিল করেন– "اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ" তারা কি আমার আজাব পাওয়ার জন্য খুব তাড়াহুড়া করছে? তাহলে অচিরেই তারা তা দেখতে পাবে। মূলত নবী করীম ﷺ কে উপহাস করেই অনুরূপ উক্তি করত। আজাবের সময় অবগত হওয়া মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

"وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আর আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।

এখানে جُنْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাহিনী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? আর তারা কিভাবে বিজয়ী হবে? তা বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

"وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ" আয়াতে আল্লাহর বাহিনী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এখানে "جُنُوْدُ اللّٰهِ" বা আল্লাহর বাহিনী বলে ঈমানদারগণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে কাফেরদের উপর বিজয়ী করবেন– এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

صَفْوَةُ التَّفَاسِيْرِ -এর মধ্যে আল্লামা মোহাম্মদ আলী সাবূনী (র.) লিখেছেন, এখানে আল্লাহর বাহিনী দ্বারা ঈমানদারগণকে বুঝানো হয়েছে। ঈমানদারগণই দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হবেন। দুনিয়াতে তারা অকাট্য দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে বিজয়ী হবেন। আর আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে পার্থিব বিজয়ও লাভ করবেন। আর যদি তাদের সকলের ভাগ্যে দুনিয়ার পার্থিব বিজয় লাভ করা সম্ভব নাও হয়, তথাপি তারা আখেরাতে যে বিজয়ী হবেন তা অবধারিত।

মুফাস্‌সিরগণ আরো উল্লেখ করেছেন যে, ঈমানদারগণের বিজয় সুনিশ্চিত। কোনো কোনো যুদ্ধে তাদের আকস্মিক পরাজয় বিজয়ের পরিপন্থি নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য অথবা তাদের ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে তা করে থাকেন। এর মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত থাকে।

শত্রু ও কাফেরদের বিরুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয়ী হওয়ার পদ্ধতি : ঈমানদারগণ যে, কাফেরদের উপর বিজয়ী হবেন– তা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বহু স্থানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা কখনো কখনো দেখি খোদ রাসূলগণের ভাগ্যেও পার্থিব বিজয় জুটেনি। আর ঈমানদারগণ যে বহু স্থানে পরাজিত হয়েছেন এবং বর্তমানেও হচ্ছেন– তাও তো অস্বীকার করার জো নেই। এর জবাব কি? মুফাস্‌সিরগণ এর দু'টি জবাব দিয়েছেন।

এক. উক্ত বিজয় দ্বারা দলিল ও ও যুক্তিগত বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারগণ দলিল-প্রমাণে ও যুক্তির দিক বিবেচনায় সদা-সর্বদা কাফেরদের উপর বিজয়ী থাকবেন। যদিও সদা-সর্বদা পার্থিব বিজয় তাদের লাভ না হোকনা কেন।

দুই. উক্ত বিজয়ের অর্থ ব্যাপক। তা দুনিয়ার বিজয়ও হতে পারে, আবার আখেরাতের বিজয়ও হতে পারে। সুতরাং যেসব রাসূল পার্থিব বিজয় লাভ করতে পারেননি। তারা পরকালীন বিজয় লাভ করবেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ করার জন্য নামে মাত্র ঈমানদার হলে চলবে না; বরং প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। আল্লাহর প্রকৃত সৈনিক হতে হবে। আর আল্লাহর প্রকৃত সৈনিক তখনই হওয়া যায় যখন কোনো ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি শাখায় আল্লাহর আনুগত্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। মূলত এ গুণটির অভাবেই ঈমানদারদের জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি। বর্তমান বিশ্বের দিকে দিকে ঈমানদারদের পরাজিত-লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবার একমাত্র কারণ এটাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রকৃত সৈনিক হিসেবে কবুল করুন– এ কামনাই করি আজ কায়মনোবাক্যে।

"أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ মক্কার কাফেরদের নিকট দীনের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। তিনি কালিমার দাওয়াত নিয়ে তাদের ধর্ণা দিয়েছিলেন কিন্তু গুটিকতেক ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত তাঁর ডাকে কেউই সাড়া দেননি। বিশেষত প্রভাবশালী, পুঁজিপতিরা ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ল। তাঁরা নানাভাবে তাঁর দাওয়াতকে প্রতিহত করতে লাগল। নবী করীম ﷺ ও তাঁর নিরীহ অনুসারীদের উপর চালানো হয় নির্যাতনের স্টীম রোলার। শত নির্যাতনের মুখেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে ধৈর্যধারণ করার পরামর্শ দিলেন। জিহাদের হুকুম নাজিল না হওয়া পর্যন্ত কিছু দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, অচিরেই কাফেরদের উপর আজাব নেমে আসবে। হুযূর ﷺ তাদেরকে আজাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা তাঁকে পাত্তাই দিল না। বরং উপহাস করে বলল, মুহাম্মদ! সেই আজাব কবে আসবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে ইরশাদ করেন– তারা আমার আজাব পাওয়ার জন্য কি তাড়াহুড়া করছ? সুতরাং জেনে রেখ রাখ, তারা স্বচক্ষেই উক্ত আজাব দেখতে পাবে।

"فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ" : **আয়াতের ব্যাখ্যা :** সুতরাং যখন সেই আজাব তাদের আঙ্গিনায় এসে পড়বে তখন যাদেরকে পূর্ব হতে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের কতইনা মন্দ হবে।

سَاحَة -এর আভিধানিক অর্থ হলো– আঙ্গিনা। আরবিতে প্রবাদ আছে– "نَزَلَ بِسَاحَتِهِ" (তার আঙ্গিনায় নাজিল হলো।) এর অর্থ হলো– কোনো বিপদ এসে পড়া। আর সকাল বেলার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আরবের শত্রুর হামলা সাধারণত সকাল (ভোর) বেলায় হতো।

নবী করীম ﷺ -এরও পবিত্র অভ্যাস ছিল যখন তিনি রাত্রি বেলায় শত্রু-কওমের নিকট পৌঁছতেন তখন সাথে সাথে আক্রমণ করতেন না; বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন খায়বরের দুর্গের উপর সকালবেলা আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

অর্থাৎ 'আল্লাহ মহান, খায়বর বিরান হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আমরা যখন কোনো কওমের আঙিনায় অবতরণ করি তখন যাদেরকে পূর্ব হতে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের সেই ভোর কতই না মন্দ হয়ে থাকে।' –[মা'আরিফ]

"وَتَوَلَّ عَنْهُمْ ..... فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : কাফেরদের নির্যাতনের মুখে কিছু কাল ধৈর্যধারণ করার জন্য নবী করীম ﷺ -কে পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– হে হাবীব! আপনি জিহাদের হুকুম নাজিল না হওয়া পর্যন্ত কিছু কাল মক্কার কাফেরদের হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন। আর আপনি দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও দেখতে পাবে।

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে কিছু দিন সুযোগ দেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ -কে পরামর্শ দিয়েছেন তাদের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাতে যেতে নিষেধ করেছেন। মূলত এর দ্বারা তাদের ঢিল দেওয়া উদ্দেশ্য– যাতে তাদের কুফরিতে আরও তারাক্কী করত কঠোর আজাবের উপযোগী হয়। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ফরমান– "أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا" কাফেরদেরকে খানিকটা সুযোগ দিন।

আলোচ্য আয়াতে حِيْنٌ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

ক. একদল মুফাস্‌সিরের মতে– إِلَى حِيْنٍ -এর অর্থ "إِلَى يَوْمِ بَدْرٍ" অর্থাৎ বদরের দিবস পর্যন্ত আপনি মক্কার কাফেরদেরকে সুযোগ দিন।

খ. কেউ কেউ বলেছেন– "إِلَى حِيْنٍ" দ্বারা فَتْحُ مَكَّةَ (মক্কা বিজয়কে) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সুযোগ দিন।

গ. আরেক দল মুফাস্‌সিরের মতে– "إِلَى حِيْنٍ" -এর অর্থ হলো– إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে রাখুন।

শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণের বিজয় ও কাফেদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-কে আশ্বাস প্রদান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নবীজী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেন–

হে নবী! ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে মোড় নেয় তা আপনি দেখতে থাকুন। অতি শীঘ্রই তাদের উপর যে আজাব নেমে আসবে তা যদ্রূপ আপনি দেখতে পাবেন তদ্রূপ তারাও তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তাদের চোখের সামনেই আপনি বিজয়ী বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন। আর তারা তাদের কুফরির শাস্তি তার ভয়াবহ পরিণতি হাড়ে হাড়ে টের পাবে। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। দুনিয়ায় পরাজয়, লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। আর পরকালে রয়েছে সীমাহীন আজাব।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তা'আলার উক্ত ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধানে মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে শুধু মক্কার বাইরে কয়েকটি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী দেখিনি, বরং মহা বিজয়ীর বেশে সেই মক্কায়ও তাকে প্রবেশ করতে দেখেছে যেখান হতে একদিন তাকে দলবলসহ তারা তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত অহমিকা, অহঙ্কারবোধ মিথ্যা আস্ফালন সেই দিন ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

"سُبْحَانَ رَبِّكَ ..... رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" আয়াতত্রয়ের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্‌ফাতের ইতি টানা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সুন্দর সমাপ্তি বিশ্লেষণের জন্য একটি পুস্তক রচনা করা দরকার। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি আয়াতের মধ্যে সমস্ত সূরার বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

সূরাটির সূচনা হয়েছিল তাওহীদের আলোচনার মাধ্যমে। যার সারকথা হলো– মুশরিকরা আল্লাহর সম্পর্কে যা বলে থাকে– আল্লাহ তা'আলা সেসব হতে পাক-পবিত্র। সুতরাং প্রথম আয়াতটিতে সেই দীর্ঘ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের (আ.) কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় আয়াতে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তৎপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কাফেরদের আকিদা-সন্দেহ-সংশয় ও অভিযোগসমূহের অসারতা প্রমাণ করত বলে দেওয়া হয়েছে যে, পরিশেষে ঈমানদরগণই বিজয়ী হবেন। এ কথাগুলো যে কোনো লোক মনোযোগের সাথে পড়বে সে-ই পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা তার প্রশংসা ও গুণগান করতে বাধ্য হবে। সুতরাং সেই হামদ ও ছানার মাধ্যমেই সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

তা ছাড়া উক্ত আয়াত কয়টিতে ইসলামের বুনিয়াদী আকিদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ ও রেসালাতকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ কর হয়েছে। প্রসঙ্গত আখেরাতের আলোচনাও এসে গিয়েছে। আর এগুলো সাব্যস্ত করাই ছিল আলোচ্য সূরাটির মুখ্য উদ্দেশ্য সাথে সাথে এ তালীমও দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত সে যেন তার প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি ভাষণ এবং প্রতিটি মজলিসকে আল্লাহর মহত্ত্ব ও হামদ-ছানার সাথে সমাপ্ত করে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ স্থলে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে কয়েকবার নামাজ শেষ করার পর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়তে শুনেছি।

"سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ الخ" এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে আল্লামা বাগাবীর (র.) হাওলায় হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাল্লাভর্তি ছওয়াব কামনা করে সে যেন প্রত্যেক মজলিসের পর এই আয়াত কয়টি পাঠ করে– "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ الخ" ইবনে আবী হাতিম (র.) হযরত শা'বীর (র.) মাধ্যমে উক্ত হাদীসখানা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত আয়াত কয়টির মধ্যে নিহিত গূঢ়রহস্য : আলোচ্য আয়াত কয়টিতে আল্লাহ তা'আলা এমন তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যার জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মু'মিন তথা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো–

১. **আল্লাহর পরিচয় :** প্রতিটি মানুষের উচিত স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলাকে চিনা তাঁর পরিচয় লাভ করা। এর জন্য তিনটি গুণ অর্জনের প্রয়োজন।

এক. আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলি শোভনীয় সেগুলো দ্বারা তাকে গুণান্বিত করা। আল্লাহ সর্বশক্তিমান– সর্বশক্তির আকর। সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও তার মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ইত্যাদি।

দুই. যেসব সিফাত তাঁর জন্য শোভনীয় নয় তাদের হতে তাকে পবিত্র জানা। সেসব সিফাত দ্বারা তাঁকে আখ্যায়িত না করা।

তিন. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক না করা। সত্তা সিফাত বা ইবাদত কোনো ব্যাপারেই কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত না করা। رَبِّ الْعِزَّةِ কথাটি হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। اَلْعِزَّةِ -এর মধ্যস্থিত "اَلْ" টি اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হয়েছে। এর অর্থ হলো, সকল ক্ষমতার উৎস হলেন, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। প্রথমোক্ত আয়াতে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ" আয়াতখানায় সত্যিই আল্লাহ তা'আলার এক নিখুঁত পরিচয় ফুটে উঠেছে।

২. **আত্ম পরিচয় :** মানুষ নিজে নিজেকে জানতে হবে। সে– কে? এ সৃষ্টিগত ও তার স্রষ্টার সাথে তার কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত– তা ভালো করে জেনে নেওয়া প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, মানুষ স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং এর জন্য এমন এক সম্পূরকের প্রয়োজন যে তার এ অভাব-জ্ঞানের এ কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করতে পারে। এমন এক পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন যে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে। যে তাকে নির্ভুলভাবে বাতলিয়ে দিবে, যে তার নাফস বা আত্মা কি? তার প্রাপ্য কি? অন্যান্য সৃষ্টজীবের সাথে তার আচার-আচরণই বা কিরূপ হওয়া উচিত? বলাবাহুল্য যে, কেবলমাত্র একজন নবী বা রাসূলই এ দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে পারে। কেননা, ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর জ্ঞান যেমন নিখুঁত ও নির্ভুল তেমনটি পরিপূর্ণও বটে। তিনিই কেবল পথনির্দেশক ও অনুসরণযোগ্য হতে পারেন। দ্বিতীয় আয়াত– "وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ" -এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. **মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া :** একমাত্র ঐশীবাণী ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা জানার কোনো পথ নেই। মূলত মৃত্যুর পরবর্তী শান্তি লাভের জন্য এবং আজাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর রহমতের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশাকেই বড় করে দেখতে হবে। তৃতীয় আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– "وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. صٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ.

১. সোয়াদ আল্লাহ তা'আলাই তার মর্মার্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

٢. وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ اَيِ الْبَيَانِ اَوِ الشَّرَفِ وَجَوَابُ هٰذَا الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ اَيْ مَا الْاَمْرُ كَمَا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ تَعَدُّدِ الْاٰلِهَةِ.

২. শপথ উপদেশপূর্ণ বর্ণনাপূর্ণ ও মর্যাদাবান কুরআনের। শপথের জবাব উহ্য অর্থাৎ বিষয় এমন নয়, যেমন মক্কার কাফেরগণ অসংখ্য মাবুদের দাবি করে।

٣. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فِيْ عِزَّةٍ حَمِيَّةٍ وَتَكَبُّرٍ عَنِ الْاِيْمَانِ وَّشِقَاقٍ خِلَافٍ وَعَدَاوَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَمْ اَيْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ اَيْ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فَنَادَوْا حِيْنَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ بِهِمْ وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ اَيْ لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ نَادَوْا اَيْ اِسْتَغَاثُوْا وَالْحَالُ اَنْ لَا مَهْرَبَ وَلَا مَنْجٰى وَمَا اعْتَبَرَ بِهِمْ كُفَّارُ مَكَّةَ.

৩. বরং যারা কাফের মক্কার অবিশ্বাসীগণ তারা অহংকার ঈমানের বিপরীতে কুফরের সাথে অহংকার ও মুহাম্মদ ﷺ -এর শত্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের আগে আমি কত অসংখ্য জনগোষ্ঠীকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছি। অতঃপর তারা তাদের উপর আজাব অবতরণের সময় আর্তনাদ করতে শুরু করেছে কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। অর্থাৎ সে সময় পলায়নের সময়ও ছিল না। لَاتَ -এর মধ্যে تَاء টি অতিরিক্ত এবং لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ বাক্যটি نَادَوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ অর্থাৎ তারা আর্তনাদ করেছে অথচ তাদের পলায়নের কোনো সুযোগ ছিলনা ও মুক্তির কোনো পথ ছিল না। মক্কার কাফেরগণ তাদের অবস্থা থেকে কোনো উপদেশ গ্রহণ করে না।

٤. وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُنْذِرُهُمْ وَيُخَوِّفُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْبَعْثِ وَهُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ج

৪. তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্কবাণী আগমন করেছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল প্রেরিত হয়েছে যিনি তাদেরকে পুনরুত্থানের পরের জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। আর কাফেররা বলে, এ-তো এক মিথ্যাচারী জাদুকর। قَالَ الْكٰفِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরের স্থলে اِسْمِ ظَاهِرْ রাখা হয়েছে।

٥. اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَىْ كَيْفَ يَسَعُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ عَجِيْبٌ.

৫. সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যখন মহানবী ﷺ মক্কার কাফেরদের বললেন, তোমরা বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তখন তারা পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি বলল। অর্থাৎ পুরা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের জন্যে এক মাবুদ কিভাবে যথেষ্ট?।

٦. وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ مِنْ مَجْلِسِ اِجْتِمَاعِهِمْ عِنْدَ اَبِىْ طَالِبٍ وَسِمَاعِهِمْ فِيْهِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنِ امْشُوْا اَىْ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اُثْبُتُوْا عَلٰى عِبَادَتِهَا اِنَّ هٰذَا الْمَذْكُوْرَ مِنَ التَّوْحِيْدِ لَشَىْءٌ يُّرَادُ مِنَّا.

৬. মক্কার কাফেরদের সর্দার আবূ তালেবের মজলিসে মহানবী ﷺ -এর থেকে قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উক্তি শোনার পর। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি পরস্পর একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও ও তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তাওহীদের এ বক্তব্য বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

٧. مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اَىْ مِلَّةِ عِيْسٰى اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ كِذْبٌ.

৭. আমরা এ ধরনের কথা সাবেক ধর্মে হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মে শুনিনি, এটা মনগড়া ব্যাপার মিথ্যা বৈ নয়।

٨. ءَاُنْزِلَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكِهِ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ الذِّكْرُ الْقُرْاٰنُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۚ وَلَيْسَ بِاَكْبَرِنَا وَلَا اَشْرَفِنَا اَىْ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ وَحْيِىْ اَىِ الْقُرْاٰنُ حَيْثُ كَذَّبُوا الْجَائِىْ بِهٖ بَلْ لَّمَّا لَمْ يَذُوْقُوْا عَذَابِ وَلَوْ ذَاقُوْهُ لَصَدَّقُوا النَّبِىَّ ﷺ فِيْمَا جَاءَ بِهٖ وَلَا يَنْفَعُهُمُ التَّصْدِيْقُ حِيْنَئِذٍ.

৮. আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি উপদেশবাণী কুরআন অবতীর্ণ হলো? অথচ তিনি আমাদের চেয়ে বড়ও না, সম্মানীও না। অর্থাৎ তার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। أَأُنْزِلَ -এর উভয় হামযাকে তাহকীক বা দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল বা উভয় অবস্থায় উভয় হামযার মধ্যখানে আলীফ যুক্ত করে মোট চার প্রকার পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বস্তুতঃ তারা আমার উপদেশ আমার ঐশীবাণী কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান। কেননা তারা ওহীর বাহককে অস্বীকার করেছে। বরং তারা আমার আজাব আস্বাদন করেনি। এবং যখন তারা আজাব আস্বাদন করবে নবী ﷺ -কে তার আনীত বিষয়ে বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখন তাদের সেই বিশ্বাস কোনো ফায়েদা দেবে না।

৯. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْغَالِبِ الْوَهَّابِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا فَيُعْطُونَهَا مَنْ شَاءُوا ـ

৯. না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার নবুয়ত ইত্যাদির রহমতের কোনো ভাণ্ডার রয়েছে? অতঃপর তারা যাকে ইচ্ছা দান করে ও যাকে ইচ্ছা দান করে না।

১০. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا نـ إِنْ زَعَمُوْا ذٰلِكَ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْأَسْبَابِ الْمُوْصِلَةِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَأْتُوْا بِالْوَحْيِ فَيَخُصُّوْا بِهِ مَنْ شَاءُوْا وَ أَمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ ـ

১০. না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? যদি তাদের বিশ্বাস এটা হয় তাহলে তাদের উচিত রশি ঝুলিয়ে আকাশে আরোহণ করা। অতঃপর ওহী নিয়ে এসে তাদের ইচ্ছানুযায়ী যাকে খুশি তাকে দান করা। أَمْ অব্যয়টি উভয়স্থানে هَمْزَةِ اِنْكَارِيْ -এর অর্থে।

১১. جُنْدٌ مَّا اَيْ هُمْ جُنْدٌ حَقِيْرٌ هُنَالِكَ اَيْ فِيْ تَكْذِيْبِهِمْ لَكَ مَهْزُوْمٌ صِفَةُ جُنْدٍ مِّنَ الْاَحْزَابِ صِفَةُ جُنْدٍ اَيْضًا اَيْ مِنْ جِنْسِ الْاَحْزَابِ الْمُتَحَزِّبِيْنَ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ وَاُولٰئِكَ قَدْ قُهِرُوْا وَاُهْلِكُوْا فَكَذٰلِكَ يُهْلَكُ هٰؤُلَاءِ ـ

১১. এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে তারা পরাজিত এক নগণ্য বাহিনী مَهْزُوْمٌ টি جُنْدٌ -এর সিফত مِنَ الْاَحْزَابِ ও جُنْدٌ -এর সিফত। অর্থাৎ এই বাহিনী ঐ বাহিনীর মধ্য থেকে যারা আপনার পূর্বে নবীদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে পরাজিত হয়েছে ও ধ্বংস হয়েছে। তেমনিভাবে তারা ধ্বংসও হবে।

১২. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ تَانِيْثُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنٰى وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ كَانَ يَتِدُ لِكُلِّ مَنْ يَغْضَبُ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَوْتَادٍ وَيَشُدُّ اِلَيْهَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَيُعَذِّبُهُ ـ

১২. তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, قَوْمٍ শব্দটি অর্থগতভাবে মুওয়ান্নাছ, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, ফেরাউন যার প্রতি রাগ করত তাকে চারটি কীলক গেঁড়ে হাত পা বেঁধে শাস্তি দিতো। তাই তাকে ذُو الْاَوْتَادِ বলা হতো।

১৩. وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ الْـَٔيْكَةِ ـ اَيِ الْغَيْضَةِ وَهُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ ـ

১৩. ছামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ অর্থাৎ বাগান ওয়ালা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গোত্র এরাই ছিল বহু বাহিনী।

١٤. إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ لِأَنَّهُمْ إِذَا كَذَّبُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ كَذَّبُوا جَمِيعَهُمْ لِأَنَّ دَعْوَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ فَحَقَّ وَجَبَ عِقَابِ .

১৪. এদের প্রত্যেকেই পয়গাম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। কেননা যখন তারা একজন নবীকে অস্বীকার করল যেন তারা সব নবীকে অস্বীকার করলো। কেননা সব নবীরাই একই তাওহীদের দাওয়াত দিতো ফলে আমার আজাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ صٓ : এই সূরাকে সূরায়ে দাউদও বলা হয় (خَازِنٌ) এতে পাঁচটি কেরাত রয়েছে–

১. জমহুরের নিকট سُكُوْن -এর সাথে অর্থাৎ صَادْ [সোয়াদ]

২. তানভীন ব্যতীত পেশসহ অর্থাৎ صَادُ [সোয়াদু]

৩. তানভীন ছাড়া যের যুক্ত অর্থাৎ صَادِ [সায়াদি]

৪. তানভীন বিহীন যবরযুক্ত صَادَ [সোয়াদা]

৫. তানভীনসহ যেরযুক্ত অর্থাৎ صَادٍ [সোয়াদিন]

তানভীন বিহীন পেশযুক্ত সুরতে উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذِهٖ صَادُ -এই সুরতে صٓ সূরার নাম হবে। তা عَلَمِيَّتْ এবং تَانِيْث -এর কারণে غَيْر مُنْصَرِف হবে। যারা তানভীন বিহীন مَفْتُوْح পড়েছেন তা তিন সুরত হতে পারে।

১. تَخْفِيْفًا ফাতহার উপর মাবনী হবে। যেমন– كَيْفَ ও أَيْنَ

২. جَرِّ تَقْدِيْرِىْ -এর সাথে উহ্য حَرْف قَسَمْ -এর কারণে।

৩. উহ্য ফে'লের কারণে نَصْب যুক্ত হবে অথবা উহ্য হরফে কসমের কারণে। (جَمَل مُلَخَّصًا)

قَوْلُهُ وَالْقُرْاٰنِ : এখানে وَاوْ টি হলো جَارَّهْ قَسَمِيَّةٌ আর اَلْقُرْاٰنِ হলো مُقْسَمٌ بِهٖ আর جَوَاب قَسَمْ -এর মধ্যে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ হলো جَوَاب قَسَمْ মূলে ছিল لَكُمْ أَهْلَكْنَا এরপর لَامْ কে فَصْل كَثِيْر -এর কারণে উহ্য করে দিয়েছেন। যেমন সূরায়ে শাম্স্ এ قَدْ أَفْلَحَ জওয়াবে কসম হতে لَامْ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

২. জওয়াবে কসম হলো إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ

৩. জওয়াবে কসম উহ্য রয়েছে আর তা হলো لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ ইত্যাদি। ইবনে আতিয়া বলেছেন جَوَاب قَسَمْ হলো مَا الْأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُوْنَ যা উহ্য রয়েছে। আল্লামা মহল্লী (র.) كَمَا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ تَعَدُّدِ الْاٰلِهِ কে جَوَاب قَسَمْ মেনেছে যা উহ্য রয়েছে। আর আল্লামা যামাখশরী (র.) إِنَّهٗ لَمُعْجِزٌ কে উহ্য মেনেছেন। আর শায়খ (র.) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ কে উহ্য মেনেছেন এবং বলেছেন যে, এটা يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -এর নজির। (جَمَل مُلَخَّصًا)

قَوْلُهُ اَىْ كَثِيْرًا : এতে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كَمْ টি হলো خَبَرِيَّةٌ যা أَهْلَكْنَا -এর মাফউল হয়েছে। আর مِنْ قَرْنٍ হলো তার تَمْيِيْز ।

قَوْلُهُ وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ : لَاتَ -এর تَا، -এর রুসমুল খতের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ مَنْصُوْبًا লম্বার সুরতে লিখেছেন (ت) যেমনটি বিদ্যমান নুসখায় রয়েছে। আবার কেউ কেউ تَا، কে حِيْنَ -এর সাথে মিলিয়ে লিখেছেন। অর্থাৎ لَا تَحِيْنُ مَنَاصٌ আর এই দ্বন্দ্বের ভিত্তি হলো وَقْف -এ উপর। কেউ কেউ ت -এর উপর ওয়াকফ করেন। তখন তারা (ت) কে লম্বা আকৃতিতে লিখেন। আবার কেউ কেউ لَا -এর উপর ওয়াকফ করেন।

قَوْلُهُ مَنَاصٍ : বাবে نَصَرَ হতে مَصْدَر مِيْمِيٌّ অর্থ পলায়ন করা। আশ্রয় নেওয়া। إِسْم ظَرْف ও হতে পারে। আশ্রয়স্থল, আশ্রয়ের জায়গা, পালানোর জায়গা। এর অর্থ হলো– لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ আর تَا، হলো অতিরিক্ত। বাক্যটি نَادَوْا -এর فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো রাসূলগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ অনেক চিৎকার করবে কিন্তু তাদের কোনো পালানোর জায়গাও থাকবে না এবং মুক্তির জায়গাও থাকবে না। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাদের সেই অবস্থা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

قَوْلُهُ اَىْ لَيْسَ الْحِيْنُ : এই ইবারত দ্বারা আল্লামা মহল্লী (র.) لَاتَ -এর ব্যাপারে খলীল এবং সীবওয়াইহ -এর পছন্দনীয় মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো لَاتَ -এর মধ্যে لَا হলো لَيْسَ অর্থে। আর তার إِسْم এবং خَبَرْ উহ্য রয়েছে। আর সেই إِسْم এবং خَبَرْ হলো حِيْن শব্দটি। উহ্য ইবারত হলো لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ مَنَاصٍ প্রথম حِيْن হলো إِسْم আর দ্বিতীয়টি হলো خَبَرْ আর لَاتَ -এর ت টি نَفِىْ তাকিদের জন্য অতিরিক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : অতিরিক্ত تَقْبِيْح -এর জন্য إِسْم ضَمِيْر -এর পরিবর্তে إِسْم ظَاهِرْ উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ قَالُوْا -এর পরিবর্তে قَالَ الْكَافِرُوْنَ বলেছেন।

قَوْلُهُ عُجَابٌ : বড় আশ্চর্য জিনিস, মুবালাগার সীগাহ অর্থাৎ এরূপ আশ্চর্য বস্তু যা يَقِيْن -এর অনুপোযুক্ত।

قَوْلُهُ اَنِ امْشُوْا : এতে اَنْ হলো تَفْسِيْرِيَّةٌ যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ : এটা اِصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ -এর ইল্লত।

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ : এটা مُقَدَّرٌ থেকে اِعْرَاضٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো اِنْكَارُهُمْ لِذِكْرِىْ لَيْسَ عَنْ عِلْمٍ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِنْهُ

قَوْلُهُ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ : অর্থাৎ عَذَابِىْ সংশয়ের কারণ কে বর্ণনা করার জন্য اِضْرَابِ اِنْتِقَالِىْ হয়েছে অর্থাৎ তাদের সংশয়ের কারণ হলো এই যে, এই সকল লোকেরা এখনও আমার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেনি ﷺ لَوْ ذَاقُوْا لَصَدَّقُوْا النَّبِىَّ

قَوْلُهُ لَمَّا : لَمْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে لَمَّا টা لَمْ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ : فَاء উহ্য শর্তের জবাবে হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) উহ্য ইবারত বের করে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ اِنْ زَعَمُوْا ذٰلِكَ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ

قَوْلُهُ اَىْ هُمْ جُنْدٌ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُنْدٌ হলো উহ্য মুবতাদা খবর এবং تَنْوِيْن টা تَقْلِيْل এবং تَحْقِيْر -এর জন্য হয়েছে। আর مَا টা تَأْكِيْد তাকিদের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ هُنَالِكَ : এটা جُنْدٌ বা مَهْزُوْمٌ -এর ظَرْف হয়েছে। আর مَهْزُوْمٌ অর্থ– হলো مَغْلُوْب [পরাজিত] مَقْهُوْر [ক্রোধে নিপতিত] উদ্দেশ্য হলো কুরাইশ হলো রাসূল ﷺ বিরোধী একটি ছোট লাঞ্ছিত সম্প্রদায় যারা অচিরেই পরাজিত হবে।

قَوْلُهُ صِفَةُ جُنْدٍ اَيْضًا : এখানে جُنْدٌ -এর তিনটি সিফত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম সিফত হলো مَا আর দ্বিতীয় সিফত হলো مَهْزُوْمٌ আর তৃতীয় সিফত হলো مِنَ الْاَحْزَابِ

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ : এটা উল্লিখিত طَرَائِفُ হতে بَدَلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ الخ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর. প্রশ্ন হলো এই যে, إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ কেন বলেছেন অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তো শুধুমাত্র একজন রাসূলকেই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে?

উত্তর. যেহেতু সকল নবী রাসূলের দীনের মূলনীতি ও দাওয়াত একই ছিল, কাজেই এক রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই নামান্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সোয়াদ প্রসঙ্গে :

সূরায়ে সোয়াদ মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত–৮৮, বাক্য ৭৩২, অক্ষর, ৩,০৬৬।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ -এর একখানি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

প্রথমত: পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে তাওহীদ ও রেসালাতের আলোচনার উপর। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং শানের বর্ণনা দ্বারা, যা প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালাত ও নবুয়তের দলিল।

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরায় পূর্বকালের কয়েকজন সত্য সাধক নবী রাসূলগণের ঘটনা স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায়ও হযরত দাউদ (আ.) হযরত সোলায়মান (আ.) এবং হযরত আইউব (আ.)-এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: পূর্ববর্তী সূরার শেষে কাফেরদের একথার উদ্ধৃতি রয়েছে– لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা বলতো যদি আমাদের নিকট কোনো উপদেশমূলক গ্রন্থ নাজিল হতো। তবে আমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা খাঁটি বান্দা হতে পারতাম। তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এবং এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের শপথ যা উপদেশে পরিপূর্ণ।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ১০]

শানে নুযূল : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমি এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পিতৃব্য আবূ তালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও। ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা শোনা ও হেফাজত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কুরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হলো। এতে আবূ জাহল, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করলো যে, আবূ তালিব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে, আবূ তালিবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালিব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র। তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোনো লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়।

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এ কুরায়শ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কুরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেব না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে। আবূ তালিব বললেন, সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন, আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা বলতে চাই, যার দৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জাহল বলে উঠল, বল, সেই কালেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কালেমা নয়, দশ কালেমা বলতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যস "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই সূরা সোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর]

صٓ অন্যান্য মোকাত্তায়াত' অক্ষরের ন্যায় এর অর্থও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। অবশ্য তাফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, صٓ অক্ষরটি আল্লাহ তা'আলার একটি পবিত্র নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন– صَمَدٌ অথবা صَادِقُ الْوَعْدِ থেকে صٓ নেওয়া হয়েছে। অথবা صَدَقَ مُحَمَّدٌ فِىْ كُلِّ مَا اَخْبَرَ بِهٖ عَنِ اللّٰهِ.

তাফসীরকার যাহহ্যাক (র.) বলেছেন, صٓ ব্যবহৃত হয়েছে صَدَقَ اللّٰهُ অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সত্যই বলেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, صٓ অর্থ হলো صَدَقَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, صٓ -এর পরের وَ অব্যয়টি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর জবাব এখানে উহ্য রয়েছে, আর তা হলো [হে রাসূল ﷺ!] আপনি অবশ্যই সত্যবাদী অথবা এই কুরআন অবশ্যই সত্য।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৮০]

قَوْلُهٗ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ : অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের শপথ, যা উপদেশে পরিপূর্ণ, যা জ্ঞানগর্ভ, মহা মূল্যবান গ্রন্থ। যার মহান শিক্ষাই তাঁর সত্যতার প্রমাণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন আকীদা ও বিশ্বাস, বিধি নিষেধ ঈমানদারের জন্যে শুভ পরিণতি, কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী এবং অতি মূল্যবান উপদেশে সমৃদ্ধ রয়েছে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'জিকর' শব্দটি দ্বারা অতি উচ্চ মর্যাদা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ মহা মূল্যবান এবং সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। যেসব কাফেররা পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিশ্বাস করে না এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নবীয়ে কারীম ﷺ-এর রেসালতকে অস্বীকার করে, তারা এর কোনো ক্রটির জন্য তা করে না: بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ অর্থাৎ বরং কাফেররা ঔদ্ধত্য ও সত্য বিরোধিতায় লিপ্ত। অর্থাৎ তারা তাদের অহংকার করে বিদ্বেষের কারণেই পবিত্র কুরআনের সত্যতায় অবিশ্বাস করে এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে। যদি তাদের এ দম্ভ, অহমিকা, বিদ্বেষ ও সত্য বিরোধিতা থেকে তারা রেহাই পেতো, তবে পবিত্র কুরআনের সত্যতায় অবশ্যই বিশ্বাস করতো এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাতকেও অস্বীকার করতো না।

قَوْلُهٗ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ : এ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে এমনিভাবে বহু জাতি সত্যদ্রোহিতা এবং ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস হয়েছে। তারাও এভাবে নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছিল, পরিণামে যখন তাদের উপর আজাব এসেছে, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছে, কিন্তু তা তাদের জন্যে উপকার হয়নি, তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মক্কার কাফেররাও যদি এভাবে তাদের আত্মগরিমা এবং সত্য বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে তাদেরকেও অনুরূপ ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, তখন তাদের হাহাকার আর্তনাদও কোনো কাজে আসবে না।

قَوْلُهٗ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ : [তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল] এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

قَوْلُهُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ : -এর শাব্দিক অর্থ "কীলকওয়ালা ফেরাউন।" এর তাফসীরে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন, এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (র.)-এর তরজমা করেছেন "যার খুটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেন, সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত পায়ে কীলক এঁটে দিতো এবং তার উপরে সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন, সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলতো। কেউ কেউ আরো বলেন, এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। -[কুরতুবী]

اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ এটা مَهْزُوْمٌ مِنَ الْاَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (র.) এ অর্থ অনুযায়ীই তাফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায় ছিল আদ, সামূদ প্রমুখ। তাদের মোকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে? -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ : তাদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ জাতি এবং পেরেকধারী ফেরাউনও রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। আর সামূদ জাতি, লূতের জাতি এবং আইকাবাসীও রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তারা ছিল বিরাট বিরাট বাহিনী। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাই তাদের ব্যাপারে আমার আজাব সাব্যস্ত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর : মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে ইতিপূর্বে যে সব জাতি অনুরূপ অন্যায়ের জন্যে কোপগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে পূর্বের ছয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি; তারা হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিল, তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পৌঁছিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাদের নাফরমানি এতটুকু হ্রাস পায়নি, তাই প্রলয়ঙ্করী বন্যা দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২. আদ জাতি, হযরত হূদ (আ.)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তীব্র বায়ু প্রবাহ দ্বারা ধ্বংস করেছেন।

৩. হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফেরাউন ছিল ক্ষতার মোহে মত্ত। লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তার ঔদ্ধত্য এবং আত্মগরিমা বৃদ্ধি করেছিল। আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সে মন্দ আচরণ করেছিল। সে সত্যকে তার সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়েছিল, পরিণামে শাস্তি আপতিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার দলবল সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছেন।

৪. সামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু সামূদ জাতি তাকে মানেনি, পরিণামে তাদেরকেও ধ্বংস করা হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি গর্জনই তাদের ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

৫. হযরত লূত (আ.)-এর জাতি সাদূম নামক এলাকার অধিবাসী ছিল। তারা ছিল অশ্লীল কর্মে লিপ্ত। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার নবীকে অস্বীকার করেছে, শাস্তি স্বরূপ তারা ধ্বংস হয়েছে।

৬. আইকাবাসী হযরত শুআয়েব (আ.)-এর জাতি, হযরত শুআয়েব (আ.) তার পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ হতভাগ্য জাতি আল্লাহ তা'আলার নবীর হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, পরিণামে তারাও ধ্বংস হয়েছে।

অতএব, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত, যে কোনো সময় তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতে পারে।

অনুবাদ :

১৫. وَمَا يَنْظُرُ يَنْتَظِرُ هٰؤُلَاءِ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً هِىَ نَفْخَةُ الْقِيَامَةِ تَحُلُّ بِهِمُ الْعَذَابَ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا رُجُوْعٍ.

১৫. কেবল তারা মক্কার কাফেরগণ একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, এবং তা হলো কিয়ামতের ফুঁক যা তাদের উপর আজাব নাজিল করবে যাতে কোনো বিরতি থাকবে না। فَوَاقٍ শব্দটি فَا তে যবর ও পেশ উভয়ভাবে পড়বে।

১৬. وَقَالُوْا لَمَّا نَزَلَ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ الخ رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا اَىْ كِتَابَ اَعْمَالِنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ قَالُوْا ذٰلِكَ اِسْتِهْزَاءً.

১৬. যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ الخ অবতীর্ণ হয় তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ আমলনামা হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। তারা এটা ঠাট্টা করে বলে।

১৭. قَالَ تَعَالٰى اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤٗدَ ذَا الْاَيْدِ ط اَىِ الْقُوَّةِ فِى الْعِبَادَةِ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيَقُوْمُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَنَامُ ثُلُثَهُ وَيَقُوْمُ سُدُسَهُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ اِلٰى مَرْضَاتِ اللّٰهِ.

১৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যা বলে আপনি তাতে সবর করুন এবং স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যিনি ইবাদতের মধ্যে বড় শক্তিশালী ছিলেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন ও আরেক দিন ইফতার করতেন, অর্ধরাত্রি ইবাদত করতেন ও রাতের এক তৃতীয়াংশ নিদ্রা যেতেন এবং পুনরায় রাত্রির এক ষষ্টাংশ ইবাদত করতেন সে ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।

১৮. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِتَسْبِيْحِهٖ بِالْعَشِىِّ وَقْتَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَالْاِشْرَاقِ ۷ وَقْتَ الصَّلٰوةِ الضُّحٰى وَهُوَ اَنْ تَشْرِقَ الشَّمْسُ وَيَتَنَاهٰى ضَوْءُهَا.

১৮. আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে সন্ধ্যায় ইশার নামাজের সময় ও সকাল চাশতের নামাজের সময় যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও তাপ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে পবিত্রতা ঘোষণা করতো।

১৯. وَ سَخَّرْنَا الطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط مَجْمُوْعَةً اِلَيْهِ تُسَبِّحُ مَعَهٗ كُلٌّ مِنَ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ لَهٗ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ اِلَى الطَّاعَتِهِ بِالتَّسْبِيْحِ.

১৯. আরো অনুগত করে দিয়েছি পক্ষীকুলকেও যারা তার কাছে সমবেত হতো তার সাথে তাসবীহ পড়ার জন্যে সবাই পাহাড় ও পক্ষীকুল ছিল তাসবীহ পড়ার সাথে তার আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।

٢٠. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ج قَوَّيْنَاهُ بِالْحَرَسِ وَالْجُنُوْدِ وَكَانَ يَحْرُسُ مِحْرَابَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلْثُوْنَ اَلْفَ رَجُلٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَالْاِصَابَةَ فِى الْاُمُوْرِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ الْبَيَانَ الشَّافِىَ فِىْ كُلِّ قَصْدٍ ـ

২০. আমি তার সাম্রাজ্যকে প্রহরী ও সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী, সুদৃঢ় করেছিলাম। প্রতিরাত্রে প্রায় ত্রিশ হাজার প্রহরী তাঁর সিংহাসন প্রহরা দিত। এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা নবুয়ত ও সঠিক সিদ্ধান্তের বিচারশক্তি ফয়সালাকারী বাগ্মিতা ভাবার্থ প্রকাশে অসাধারণ বর্ণনা।

٢١. وَهَلْ مَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ هُنَا التَّعْجِيْبُ وَالتَّشْوِيْقُ اِلٰى اِسْتِمَاعِ مَا بَعْدَهُ اَتٰكَ يَا مُحَمَّدُ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ مِحْرَابَ دَاوٗدَ اَىْ مَسْجِدَهُ حَيْثُ مُنِعُوا الدُّخُوْلَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ لِشُغْلِهٖ بِالْعِبَادَةِ اَىْ خَبَرُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ ـ

২১. হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনার কাছে কি বাকবিতণ্ডাকারীদের সংবাদ পৌঁছেছে, هَلْ প্রশ্নবোধক অব্যয় এবং এটা এখানে বিস্ময় প্রকাশ করার জন্যে বা আগত ঘটনা শোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে যখন তারা দাউদ (আ.)-এর মিহরাব ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল, যখন তাদেরকে হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে লিপ্ত থাকার কারণে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তাদের সংবাদ ও ঘটনা কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?

٢٢. اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ج نَحْنُ خَصْمَانِ قِيْلَ فَرِيْقَانِ لِيُطَابِقَ مَا قَبْلَهُ مِنْ ضَمِيْرِ الْجَمْعِ وَقِيْلَ اِثْنَانِ وَالضَّمِيْرُ بِمَعْنَاهُمَا وَالْخَصْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَاَكْثَرَ وَهُمَا مَلَكَانِ جَاءَا فِىْ صُوْرَةِ خَصْمَيْنِ وَقَعَ لَهُمَا مَا ذُكِرَ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ لِتَنْبِيْهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى مَا وَقَعَ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ اِمْرَاَةً وَطَلَبَ اِمْرَاَةَ شَخْصٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَتَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا ـ

২২. যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করলো তখন তিনি তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দুটিপক্ষ, বর্ণিত আছে যে, خَصْمَانِ দ্বারা فَرِيْقَانِ তথা দুটি দল উদ্দেশ্য যাতে পূর্বের تَسَوَّرُوْا ফে'লের যমীরের সাথে মিলে। অনেকে বলেছেন যে, خَصْمَانِ দ্বিবচনের অর্থে এবং خَصْمٌ এক ও একাধিকের উপর বলা হয়। সে দুজন ফেরেশতা ছিল, যারা বিবদমান দুপক্ষ হিসেবে হযরত দাউদ (আ.) এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের ব্যাপারে কুরআনের উল্লিখিত ঘটনা নিছক সাজানো। যাতে এটা দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের উপর অবগত হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর নিরানব্বইজন স্ত্রী ছিল তবুও তিনি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীকে প্রস্তাব দিলেন যার মাত্র একজন স্ত্রীই ছিল। অতঃপর তিনি তাকে বিবাহ করলেন ও সঙ্গম করলেন।

بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ تَجُرْ وَاهْدِنَآ اَرْشِدْنَا اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ وَسَطِ الطَّرِيْقِ الصَّوَابِ.

একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি অতঃপর আমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না আমাদেরকে সরল পথ মধ্যম সরল পথ প্রদর্শন করুন।

২ৣ. اِنَّ هٰذَآ اَخِىْ نف اَىْ عَلٰى دِيْنِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْمَرْأَةِ وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ نف فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا اِجْعَلْنِىْ كَافِلَهَا وَعَزَّنِىْ غَلَبَنِىْ فِى الْخِطَابِ اَىِ الْجِدَالِ وَاَقَرَّهُ الْاٰخَرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৩. ঘটনাটি শুনুন সে আমার ভাই ধর্মীয় ভাই তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে স্ত্রীকে দুম্বা বলে উল্লেখ করা হয়েছে আর আমার মাত্র একটি দুম্বা। এরপরও সে বলে এটিও আমাকে দিয়ে দাও আমাকে তার মালিক বানিয়ে দাও সে কথাবার্তায় অর্থাৎ বাকবিতণ্ডায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। আমার উপর বিজয়ী হয়েছে এবং অপর পক্ষও এটা স্বীকার করেছে।

٢٤. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ لِيَضُمَّهَا اِلٰى نِعَاجِهٖ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ الشُّرَكَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط مَا التَّاكِيْدُ الْقِلَّةُ فَقَالَ الْمَلَكَانِ صَاعِدَيْنِ فِىْ صُوْرَتِهِمَا اِلَى السَّمَاءِ قَضَى الرَّجُلُ عَلٰى نَفْسِهٖ فَتَنَبَّهَ دَاوٗدُ قَالَ تَعَالٰى وَظَنَّ اَىْ اَيْقَنَ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ اَوْقَعْنَاهُ فِىْ فِتْنَةٍ اَىْ بَلِيَّةٍ بِمَحَبَّةِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا اَىْ سَاجِدًا وَّاَنَابَ.

২৪. দাউদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। مَا অব্যয়টি قَلِيْلٌ -এর তাকিদের জন্যে। অতএব ফেরেশতাদ্বয় তাদের নিজ আকৃতিতে আসমানের দিকে উঠতে উঠতে বললেন, বান্দা নিজের আমলের খেলাফ ফয়সালা দিলেন। অতঃপর হযরত দাউদ (আ.) অবগত হলেন ও বুঝলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, দাউদের খেয়াল হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি অর্থাৎ আমি তার অন্তরে যে মহিলার মহব্বত সৃষ্টি করে তাকে পরীক্ষা করছি অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলো।

٢٥. فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ط وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى اَىْ زِيَادَةُ خَيْرٍ فِى الدُّنْيَا وَحُسْنَ مَاٰبٍ مَرْجِعٍ فِى الْاٰخِرَةِ.

২৫. আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা অর্থাৎ দুনিয়াতে অধিক কল্যাণ ও আখেরাতে সুন্দর আবাসস্থল।

٢٦. يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ تُدَبِّرُ الْاَمْرَ النَّاسِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى اَىْ هَوَى النَّفْسِ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اَىْ عَنِ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلٰى تَوْحِيْدِهٖ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا بِنِسْيَانِهِمْ يَوْمَ الْحِسَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ تَرْكُهُمُ الْاِيْمَانَ وَلَوْ اَيْقَنُوْا بِيَوْمِ الْحِسَابِ لَاٰمَنُوْا فِى الدُّنْيَا .

২৬. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি যাতে মানুষের সমস্যাদির ফয়সালা কর অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর। এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। তা তোমাকে আল্লাহ তা'আলার পথ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের দলিলাদি থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়। যার কারণে তারা ঈমান ত্যাগ করে। যদি তারা হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখতো তবে অবশ্যই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَوَاقٍ : فَاء -এর فَتْحَة এবং ضَمَّة উভয়টি সহই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ اَلرُّجُوْعُ তথা ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। এটা اِسْم فِعْل-এর বহুবচন اَفِيْقَةٌ ও اَفْوِقَةٌ - অর্থ মাঝের বিরতি। দুইবার দুগ্ধদোহনের মাঝের বিরতি। একবার দুগ্ধ দোহনের পরে বাচ্চাকে দুধ পান করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, বাচ্চা দুধ পান করার ফলে উলান পুনরায় দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। দুগ্ধ দোহনকারী বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় দুগ্ধ দোহন করে। এই মধ্যবর্তী বিরতির নাম হলো فَوَاقٍ [কামূস] এখানে উদ্দেশ্য سُكُوْن অবস্থান, অথবা رُجُوْع উদ্দেশ্য, যেমনটি আল্লামা মহল্লী (র.) উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের ফুৎকার কোনো বিরতি ছাড়াই تَسَلْسُل -এর সাথে হবে।

قَوْلُهُ مَالَهَا : مَا হলো نَافِيَة আর لَهَا খবরে মুকাদ্দাম আর مِنْ হলো অতিরিক্ত فَوَاقٍ হলো শাব্দিকভাবে اِسْم مَجْرُوْر এটা مَا -এর اِسْم অথবা مُبْتَدَا مُؤَخَّرٌ হওয়ার কারণে محلا مرفوع হয়েছে। আর مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ টা صَيْحَة -এর সিফত হওয়ার কারণে نَصَب -এর মহলে হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَا الْاَيْدِ : এটা بَيْع -এর ওজনে اٰدَ يَئِيْدُ থেকে مَصْدَر مُفْرَدٌ হয়েছে। قَوِىَ وَاشْتَدَّ اِذَا এটা يَدٌ -এর বহুবচন নয়। (صَاوِىٌ)

قَوْلُهُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ : এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর দীনের মধ্যে শক্তিশালী হওয়ার ইল্লত।

قَوْلُهُ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً : এটা اَلْجِبَالَ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেউ কেউ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْع বলেছেন।

قَوْلُهُ أَوَّابٌ : لَهُ -এর مَرْجِعٌ হযরত দাউদ (আ.)। যেমনটি মুফাসসির (র.)-এর ইবাদত দ্বারা বুঝা যায়। এই সুরতে উদ্দেশ্য হবে যে, পাহাড় এবং বিহঙ্গকুল তাসবীহ পাঠ করার ক্ষেত্রে হযরত দাউদ (আ.)-এর হুকুমের অনুগত ছিল। হযরত দাউদ (আ.)-এর তাসবীহ পাঠ করার কারণে। যখন হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে তাসবীহ পাঠ করার হুকুম করতেন তখন তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে তাসবীহ পাঠে লেগে যেতো। এই সুরতে أَوَّابٌ টা مُسَبِّحٌ -এর অর্থে হবে। দ্বিতীয় সুরত হলো এই যে, لَهُ -এর مَرْجِعٌ আল্লাহ তা'আলাকে বলেছেন তখন সেই সুরতে উদ্দেশ্য হবে হযরত দাউদ (আ.) পাহাড় পর্বত ও বিহঙ্গকুল আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং তাসবীহ পাঠকারী। আল্লামা মহল্লী (র.)-এর ইবারত দ্বারা জানা যায় যে, এটা أَوَّابٌ -এর সেলাহ (جُمَلٌ) এটা হলো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفٌ পূর্বের مَضْمُوْن -এর তাকিদ এবং اِجْمَالٌ -এর تَفْصِيْل -এর জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْحَرَسِ : حَاء -এর পেশ এবং رَاء তাশদীদযুক্ত فَتْحَة সহ حَارِسٌ -এর বহুবচন। আর উভয়টি فَتْحَة সহ خَدَمٌ যার অর্থ সেবক, চাকর -এর ওজনে।

قَوْلُهُ هَلْ اَتَاكَ : هَلْ হলো اِسْتِفْهَامِيَة تَعَجُّبِيَّة অর্থাৎ مُخَاطَبٌ কে তাজ্জবে ফেলার জন্য ভবিষ্যৎ কথা শোনার আগ্রহ দেওয়ার জন্য। এটা এরূপ যখন কোনো আশ্চর্য সংবাদ শোনানো হয় তখন مخاطب কে متوجه করার জন্য বলে থাকে هَلْ تَعْلَمُ؟ এবং مَا وَقَعَ الْيَوْمَ؟ উর্দু পরিভাষায় বলে کچھ معلوم এবং اج ایسا ہوگیا

قَوْلُهُ تَسَوَّرُوْا : এটা مَاضِيٌ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ অর্থাৎ তারা দেয়াল টপকালো, তারা দেয়াল টপকিয়ে প্রবেশ করল। اِذْ تَسَوَّرُوْا উহ্য মুযাফের ظَرْف হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- هَلْ اَتَاكَ نَبَؤُ تَخَاصُمِ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوْا

قَوْلُهُ اِذْ دَخَلُوْا : এটা প্রথম اِذْ থেকে بَدَل হয়েছে এবং تَسَوَّرُوْا -এর بَدَل ও হতে পারে।

قَوْلُهُ خَبَرُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ : এটা نَبَؤُ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ قِيْلَ فَرِيْقَانِ لِيُطَابِقَ مَا قَبْلَهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো تَسَوَّرُوْا বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার হয়েছে। এবং خَصْمَانِ -এর মধ্যে দ্বিবচনের। কাজেই উভয়ের ভিতর مُطَابَقَتْ নেই। অথচ উভয়ের মিসদাক একই। উত্তরের সার হলো এই যে, خَصْمَانِ দ্বারা فَرِيْقَانِ উদ্দেশ্য। এবং প্রত্যেক فَرِيْق কয়েকটি اَفْرَادْ সম্বলিত হয়। তখনই তাকে فَرِيْق বলে। কাজেই উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

অন্য জবাব এভাবেও দেওয়া হয়েছে যে, خَصْم টা মাসদারও একারণে এটা وَاحِدْ ـ تَثْنِيَة ـ جَمْع সকলের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اِثْنَانِ وَالضَّمِيْرُ بِمَعْنَاهَا : উল্লিখিত প্রশ্নের এটা তৃতীয় জবাব। এর সারকথা হলো দেওয়াল টপকে আগমনকারী দুজনই ছিল তবে تَسَوَّرُوْا -এর বহুবচন দ্বারা مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ উদ্দেশ্য। যার اِطْلَاقْ দুয়ের উপরও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَقَعَ لَهُمَا مَا ذُكِرَ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ : এই ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন. দুজন ফেরেশতা উল্লিখিত মাসআলায় বাদী ও বিবাদী সেজে এসেছিল। তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালতে এমন একটি মোকদ্দমা পেশ করল যার শুরু থেকে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, যা সরাসরি মিথ্যা ও গোনাহ ছিল। অথচ ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ তাদের থেকে গোনাহ প্রকাশ পেতে পারে না।

উত্তর. كِذْب এবং مَعْصِيَتْ সে সময় হবে যখন বাস্তবে কোনো ঘটনার সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। এখানে তো সতর্ক করার জন্য একটি فَرَض صُوْرَتْ চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল। এখানে বাস্তবতার বিপরীত মিথ্যার কোনো প্রশ্নই ব্যতীত উঠতে পারে না। এটা এরূপ যে, শিক্ষকে বাচ্চাদেরকে বুঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলে থাকে ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا এবং اِشْتَرٰى بَكْرٌ دَارًا অথচ এখানে প্রহারও নেই এবং বেচাকেনাও নেই। এখানেও হযরত দাউদ (আ.)-কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল। কোনো ঘটনার বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُـهُ وَاَقَـرَّهُ لِاٰخَـرَ : এই ইবারত দ্বারা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো– হযরত দাউদ (আ.) বিবাদীও সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ব্যতীত কি করে একদিকে ফয়সালা দিয়ে দিলেন?

উত্তর. জবাবের সার হলো এরূপ মনে হয় যেন বিবাদী বাদীর দাবিকে মেনে নিয়েছিল। আর যখন বিবাদী বাদীর দাবিকে মেনে নেয় তখন সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না এবং বিবাদীর বর্ণনারও প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُـهُ قَلِـيْـلٌ مَّـاهُمْ : قَلِيْلٌ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর مَا হলো قِلَّتْ-এর তাকিদের জন্য, অতিরিক্ত। আর هُمْ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قَوْلُـهُ زُلْـفٰى : মর্যাদা, স্তর, زُلْفٰى টা قُرْبٰى -এর ওজনে মাসদার। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُـهُ وَمَـا يَـنْـظُرُ هٰـؤُلَآءِ اِلَّا صَيْـحَـةً وَّاحِدَةً مَّـالَـهَـا مِنْ فَـوَاقٍ : তাফসীরকারগণ বলেছেন, هٰؤُلَآءِ দ্বারা মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্যায় আচরণে একথা অনুভূত হয় যে, তারা হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় হুঙ্কারের অপেক্ষা করছে, এর পূর্বে তাদের মধ্যে চেতনা ফিরে আসবে না, সত্যকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত হবে না।

কিয়ামতের জন্যে যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, যখন এ বিশ্ব কারখানা ধ্বংসোন্মুখ হবে, তখনই তারা ঈমান আনবে, কিন্তু তখনকার ঈমান কোনো উপকারেই আসবে না, আর হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গার গর্জন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সে গর্জন হবে বিরামহীন। অথবা এর অর্থ হলো, তারা দুনিয়াতেই কোনো ভয়ঙ্কর গর্জনের অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আজাবের অপেক্ষা করছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে فَوَاقٍ শব্দটির অর্থ হলো অবকাশ।

আবূ ওবায়দা এবং ফাররাও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। একথার তাৎপর্য হলো, এ দুরাত্মা কাফেররা কিয়ামতের দিনের শাস্তি না দেখা পর্যন্ত সঠিক পথে আসবে না।

قَوْلُـهُ وَقَـالُـوْا رَبَّـنَـا عَـجِّـلْ لَّـنَـا قِطَّـنَـا قَبْـلَ يَـوْمِ الْـحِـسَـابِ : তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, সূরা আল হাক্কাহ -এর এ আয়াত– فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ অর্থাৎ আর যার ডান হাতে দেওয়া হবে তার আমলনামা। যখন নাজিল হয়, তখন মক্কার কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, হে পরওয়ারদেগার! হিসাবের দিনের প্রয়োজন নেই, আমাদের আমলনামা এখানেই দিয়ে দাও। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে জান্নাতের কথা বলেছেন, তাতে আমাদের যে অংশ রয়েছে, তা এ পৃথিবীতেই আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক।

হযরত হাসান বসরী (র.), কাতাদা (র.), মুজাহিদ (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, পরকালীন জীবনে যে সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, তা আমাদেরকে দুনিয়াতেই দেওয়া হোক।

আর তাফসীরকার হযরত আতা (র.) বলেছেন, এ উক্তি করেছিল মক্কার কাফের নজর ইবনে হারেস। সে বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি এই নবী সত্য হয়, তবে আমদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৮৯]

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা তিনটি বিষয় অবিশ্বাস করতো, **এক.** তাওহীদ **দুই.** রেসালাত **তিন.** আখেরাত।

আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, কাল কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দেওয়া হবে। যদি ঈমানদার ও নেককার হয় তবে ডান হাতে, আর বেঈমান ও পাপীষ্ঠ হলে বাম হাতে আমলনামা পাবে। তাই দূরাত্মা কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, আমাদের আমলনামা দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হোক, আমরা দেখি তাতে কি রয়েছে। আর যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা ঈমানদার ও নেককার হবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের জন্যে রয়েছে দোজখের কঠিন শাস্তি। তখন কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, কিয়ামতের দিন অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের জান্নাতে যে অংশ রয়েছে, অথবা দোজখে যে শাস্তি রয়েছে তা এখানেই হিসাবের পূর্বেই দিয়ে দেওয়া হোক। কাফেরদের এ বিদ্রূপাত্মক এবং মূর্খতাপ্রসূত উক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পরবর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছে- اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ হে রাসূল ! আপনি তাদের উক্তি সম্বন্ধে সবর অবলম্বন করুন এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা, সে ছিল শক্তিশালী এবং নিশ্চয়ই সে ছিলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি তন্ময় চিত্ত।

قَوْلُهُ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ الخ : কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে অতীত পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। সে মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গাম্বরের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ : [স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী]। প্রায় সমস্ত তাফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। اِنَّهٗ اَوَّابٌ [নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।] বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামাজ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোজা ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোজা রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন। -[ইবনে কাসীর]

ইবাদতের উপরিউক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোজা রাখলে মানুষ রোজার অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোজার কোনো কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোজা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এপদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

قَوْلُهُ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ : এ আয়াতে হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের ইবাদতে ও তাসবীহে শরিক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহ পাঠকে আল্লাহ তা'আলা এখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি নিয়ামত হলো কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহ পাঠে তার বিশেষ কি উপকার হতো?

এর এক উত্তর এই যে, এতে হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মোজেজা প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, মোজেজা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (র.)-এর এক সূক্ষ্ম জবাবে বলেন, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহর ফলে জিকিরের এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতো। ফলে ইবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হতো। সঙ্ঘবদ্ধ জিকিরের আরো একটি উপকারিতা এই যে, এতে জিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সূফী বুজুর্গগণের মধ্যে জিকিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে জিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ জিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়। -[মাসায়েলে সুলুক]

চাশতের নামাজ : بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ জোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عَشِيّ বলা হয়। আর اِشْرَاق -এর অর্থ– সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতকে চাশতের নামাজ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশতের নামাজকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে "সালাতে আওয়াবীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের জন্য এবং সালাতে ইশরাক নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাকাত নফল নামাজের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশতের নামাজ দুই রাকাতে থেকে বার রাকাত পর্যন্ত যতো রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ নিয়মিত পড়ে, তার গুনাহ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন। –[কুরতুবী]

আলেমগণ বলেন : চাশতের নামাজে দুই থেকে বার পর্যন্ত যতো রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকাত হওয়াই শ্রেয়। কেননা চার রাকাত পড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও নিয়ম ছিল।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ : [আমি তাকে হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করেছি।] হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিরূপী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুয়ত। فَصْلَ الْخِطَابِ -এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আ.) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اَمَّا بَعْدُ শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী (র.) যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থই একত্রিত থাকতে পারে।

قَوْلُهُ وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوْا الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদতখানায় বিবদমান দুটি পক্ষ পাঠিয়ে কোনো এক বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আ.) সব ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা দিকে রুজু করতেন এবং কোনো সময় সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, হযরত দাউদ (আ.) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোনো কোনো অনুসন্ধানী ও সাবধানী তাফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গাম্বরের এসব ত্রুটি বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। তাই আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেজ ইবনে কাছীরের মতো অনুসন্ধানী তাফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলা বাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তীদের উক্তির আলোকে এ পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর দৃষ্টি একবার তার সেনাধ্যক্ষ উরিয়ার পত্নীর উপর পড়ে গেলে তার মনে তাকে বিয়ে করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক ভয়ানক বিপজ্জনক অভিযানে প্রেরণ করেন; ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে হযরত দাউদ (আ.) তার পত্নীকে বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে মানবাকৃতিতে বাদী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহুদিদের প্রভাবাধীন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের সামুয়েল কিতাবের একাদশ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। পার্থক্য এতটুকু যে, বাইবেলে খোলাখুলি হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি উরিয়া পত্নীর সাথে বিয়ের পূর্বেই ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তাফসীরী রেওয়ায়েতসমূহে ব্যভিচারের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতটি দেখে এ থেকে ব্যভিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর জুড়ে দিয়েছে। অথচ সামুয়েল কিতাবটিই মূলত ভিত্তিহীন। সুতরাং রেওয়ায়েতটি নিশ্চিতরূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ একে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-ই নয়, আল্লামা ইবনে জাওযী, কাযী আবূ সাঈদ, কাজী বায়যাভী, কাজী আয়ায, ইমাম রাযী, আল্লামা আবূ হাইয়ান আন্দালুসী, খাযেন, যমখশরী, ইবনে হযম, আল্লামা খাফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আবূ তামাম, আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখ খ্যাতনামা তাফসীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) লিখেন–

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। রাসূলে কারীম ﷺ থেকে এ সম্পর্কে অনুসরণীয় কোনো কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাতেম এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদও বিশুদ্ধ নয়।

মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর থেকে উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি প্রমাণের কিছু বিবরণ ইমাম রাযীর তাফসীরে কাবীর এবং জাওযীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ.)-কে ন্যায়বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোনো সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা শাস্তি দিতো। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গাম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

হযরত দাউদ (আ.) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। –[বয়ানুল কুরআন]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। হযরত দাউদ (আ.) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তার মতো সম্মানিত পয়গাম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না। এ কারণেই তিনি পরে হুঁশিয়ার হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। –[রূহুল মা'আনী]

কেউ কেউ বলেন, হযরত দাউদ (আ.) তার সময়সূচি যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তার গৃহের কোনো না কোনো ব্যক্তি ইবাদত, জিকির ও তাসবীহে মশগুল থাকতো। একদিন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোনো মুহূর্ত যায় না, যখন হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, জিকির ও তাসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, দাউদ, এটা আমার দেওয়া তাওফীকের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির পর উপরিউক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তার সময়সূচি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তার পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও জিকিরে মশগুল ছিল না। এতে হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। -[আহকামুল কুরআন]

উপরিউক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি কাল্পনিক নয়– সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয় ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে ছিলেন যাতে হযরত দাউদ (আ.) নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

সে মতে তাদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্নীকে বিয়ে করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলেল মধ্যে তখন কাউকে 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও' এ কথাটি বলা দূষণীয় ছিল না। বরং তখন এধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ভিত্তিতেই হযরত দাউদ (আ.) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেন, ব্যাপারটি এই যে, উরিয়া কোনো এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। হযরত দাউদ (আ.)ও সে মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের মাধ্যমে সতর্ক করেন। কাযী আবূ ইয়ালা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কুরআন পাকের وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত দাউদ (আ.)ও তাকে বিয়ে করেননি। -[যাদুল মাসীর]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ শেষোক্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোনো কোনো উক্তি থেকেও এ দুটি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যা। [রূহুল মা'আনী, তাফসীরে আবূ সাউদ, যাদুল মাসীর, তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি।] কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এগুলোর কোনো একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সুতরাং হাফেজ ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্ভুলটি। তাই এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের অনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের কোনো কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং কেবল কুরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত উপকারিতা অর্জিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে।

قَوْلُهُ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ : অর্থাৎ যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করলো। مِحْرَابٌ আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা কোনো গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কুরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে ছিল না। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَفَزِعَ مِنْهُمْ : [হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।] ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট : অসময়ে দুর্ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণত মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয় : এ থেকে জানা গেল যে, কোনো ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীদের পরিপন্থি নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজে ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই মন্দ। কুরআন পাকে পয়গাম্বরগণের শানে বলা হয়েছে- وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।] অতঃপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ.) ভীত হলেন কেন? জবাব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কায় হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَوْف বলা হয়। দ্বিতীয়ত ভয় কোনো মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَشْيَةٌ বলা হয়। [মুফরাদাতে রাগিব] শেষোক্ত ভয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গাম্বরগণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিত : قَالُوا لَا تَخَفْ তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না। আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং হযরত দাউদ (আ.) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়; বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিতো, কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) আসল ব্যাপার জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবত এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ [এবং অবিচার করবেন না।] আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যত ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই হযরত দাউদ (আ.)-এর মতো মহান পয়গাম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়া। এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিত : এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তার ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক বিচারক ও মুফতিগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। -[রূহুল মা'আনী]

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ হযরত দাউদ (আ.) বললেন, সে তোমার দুম্বাকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ। ১. হযরত দাউদ (আ.) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন বিবাদীর বিবৃতি শুনেননি। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তার ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না। কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তার কাছে আদালতি মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই হযরত দাউদ (আ.) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়, মুফতির পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতির কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয়; বরং প্রশ্ন মুতাবিক জবাব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তর : এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারো কাছে কোনো বস্তু প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুণ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছে এভাবে কোনো কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রার্থিত বস্তু দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুণ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায় সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্বীকার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপঢৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন হয়ে থাকে। যে চায় তার পক্ষে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরি, যারা মক্তব, মাদরাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাঁদা আদায়কারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাঁদা আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে। রাসূলে কারীম ﷺ পরিষ্কার বলেন– لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ অর্থাৎ কোনো মুসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়।

কাজ কারবারে শরিক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন : وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ শরিকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে। এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোনো কাজ-কারবারে শরিক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। কোনো সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামূলী ভেবে করে ফেলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গুনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ : অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ.)-এর ধারণা হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। মোকদ্দমায় বিবরণকে যদিও হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্য বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করতো, তবে ফয়াসালার জন্য হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে আসার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারতো। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ সাধারণ ঘটনা। হযরত দাউদ (আ.)ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসলো এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়।

قَوْلُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ : [অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।] এখানে 'রুকু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এতে এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয়।

রুকুর মাধ্যমে তেলাওয়াতে সেজদা আদায় হয় : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাজে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে যদি রুকুতেই সেজদার নিয়ম করা হয়, তবে সেজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেজদার জন্য রুকু শব্দ ব্যবহার করেছেন; যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, রুকুও সেজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে কতিপয় জরুরি মাসআলা স্মরণ রাখা দরকার।

১. নামাজের ফরজ রুকুর মাধ্যমে সেজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন সেজদার আয়াত নামাজে পাঠ করা হয়। নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করলে রুকুর মাধ্যমে সেজদা আদায় হয় না; কারণ রুকু কেবল নামাজেরই ইবাদত নামাজের বাইরে সিদ্ধ নয়। ২. রুকুর মধ্যে সেজদা তখন আদায় হবে, যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দুতিন আয়াত তেলাওয়াত করার পরে রুকু করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তেলাওয়াত করার পরে রুকুতে গেলে সেজদা আদায় হবে না। ৩. তেলাওয়াতে সেজদা রুকুতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকুতে যাওয়ার সময় সেজদার নিয়ত করতে হবে নতুবা সেজদা আদায় হবে না। অবশ্য সেজদার যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। ৪. তেলাওয়াতে সেজদা নামাজের ফরজ রুকুতে আদায় করার পরিবর্তে নামাজে আলাদা সেজদা করাই সর্বোত্তম। সেজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তেলাওয়াত করার পর রুকুতে যেতে হবে। -[বাদায়ে]

قَوْلُهُ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ : অর্থাৎ নিশ্চয়ই দাউদের জন্য আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.) যে ভুলই করে থাকুন, তার ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকুর পর আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.) বিচ্যুতি যাহোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে পারতেন; কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হলো? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারো মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

قَوْلُهُ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً الخ : হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাজও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য শাসনকার্যের জন্য তাকে একটি বুনিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি।

২. সে মতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা।

৩. এ কর্তব্য পালনের জন্য নাফরমানি খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদন করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ তা'আলার আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামি রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপার দিতে ও কলহ বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্যের জন্য যে সব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সে মতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় কোনো নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোনো কালেই পরিবর্তিত হতে পারে না। যদি কোনো যুগের শাসকবর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোনো যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গাম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারতো? তাই তাকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচারের বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মুমিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মুমিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াত সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং পরকালে চিন্তা থাকবে, সেই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যতো উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্র পথ বের করে নেবে। খেয়াল খুশির উপস্থিতিতে কোনো উৎকৃষ্টতর আইন ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র : এখান থেকে আরো জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তিকে শাসক, বিচারক অথবা কোনো বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহভীতির পরিবর্তে খেয়াল খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোনো উচ্চপদের যোগ্য নয়।

অনুবাদ :

٢٧. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط اَىْ عَبَثًا ذٰلِكَ اَىْ خَلْقُ مَا ذُكِرَ لَا لِشَىْءٍ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَوَيْلٌ وَادٍ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ـ

২৭. আমি আসমান জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা উল্লিখিত বস্তুসমূহ অযথা সৃষ্টি করা মক্কার কাফেরদের ধারণা। অতএব কাফেরদের জন্যে রয়েছে, দুর্ভোগ, জাহান্নাম।

٢٨. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ـ

২৮. আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব।

٢٩. نَزَلَ لَمَّا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّا نُعْطٰى فِى الْاٰخِرَةِ مِثْلَ مَا تُعْطَوْنَ وَاَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ كِتٰبٌ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ هٰذَا اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اَصْلُهُ يَتَدَبَّرُوْا اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الدَّالِ اٰيٰتِهٖ يَنْظُرُوْا فِىْ مَعَانِيْهَا فَيُؤْمِنُوْا وَلِيَتَذَكَّرَ يَتَّعِظَ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ ـ

২৯. উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কার কাফেররা ঈমানদারদেরকে বলল, আমাদেরকে আখেরাতে তোমাদের সমতুল্য দেওয়া হবে। اَمْ অব্যয়টি هَمْزَة اِنْكَارِىْ -এর অর্থে। এটি একটি বরকতময় কিতাব, كِتَابٌ উহ্য মুবতাদা هٰذَا -এর খবর যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এর অর্থসমূহ অনুধাবন করে অতঃপর ঈমান আনে। يَدَّبَّرُوْا মূলত يَتَدَبَّرُوْا ছিল تَا -কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এবং বুদ্ধিমানগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

٣٠. وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط اِبْنَهٗ نِعْمَ الْعَبْدُ ط اَىْ سُلَيْمٰنُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ فِى التَّسْبِيْحِ وَالذِّكْرِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ ـ

৩০. আমি দাউদকে সোলায়মান নামের সন্তান দান করেছি। সে সুলায়মান একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল সর্বাবস্থায় জিকির ও তাসবীহের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।

٣١. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ الصّٰفِنٰتُ الْخَيْلُ جَمْعُ صَافِنَةٍ وَهِىَ الْقَائِمَةُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَاِقَامَةُ الْاُخْرٰى عَلٰى طَرَفِ الْحَافِرِ وَهِىَ مِنْ صَفَنَ يَصْفِنُ صُفُوْنًا الْجِيَادُ جَمْعُ جَوَادٍ وَهُوَ السَّابِقُ ـ

৩১. যখন তার সামনে অপরাহ্নে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হলো, صَافِنَاتٌ শব্দটি صَافِنَةٌ -এর বহুবচন অর্থ ঘোড়া অর্থাৎ ঐ ঘোড়া যা তিন পা ও চতুর্থ পায়ের খুরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। صَفَنَ ـ يَصْفِنُ ـ صُفُوْنًا থেকে নির্গত। اَلْجِيَادُ শব্দটি جَوَادٌ -এর বহুবচন, অর্থাৎ দ্রুত অগ্রগামী।

اَلْمَعْنٰى اِنَّهَا اِنِ اسْتُوْقِفَتْ سَكَنَتْ وَاِنْ رُكِضَتْ سَبَقَتْ وَكَانَتْ اَلْفُ فَرَسٍ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ اَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِاِرَادَتِهِ الْجِهَادَ عَلَيْهَا لِعَدُوٍّ فَعِنْدَ بُلُوْغِ الْعَرْضِ تِسْعَمِائَةٍ مِنْهَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَاغْتَمَّ ـ

যার ভাবার্থ হলো, যদি তাকে থামানো হয় থামে অর যদি চালানো হয় দ্রুত চলে। এক হাজার ঘোড়া ছিল যা জোহরের নামাজের পর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার জন্য তার সম্মুখে পেশ করা হলো। যার মধ্যে নয়শ ঘোড়ার পরিদর্শন করতে করতে সূর্য ডুবে যায় অতঃপর তিনি আসরের নামাজ আদায় করতে পারেননি বিধায় তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন।

٣٢. فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ اَيْ اَرَدْتُ حُبَّ الْخَيْرِ اَيِ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ج اَيْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَوَارَتْ اَيِ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ اَيِ اسْتَتَرَتْ بِمَا يَحْجُبُهَا عَنِ الْاَبْصَارِ ـ

৩২. তখন সে বলল, আমি তো পরওয়ারদেগারের স্মরণে অর্থাৎ আসরের নামাজ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের অর্থাৎ ঘোড়ার মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। এমন কি সূর্য ডুবে গেছে। অর্থাৎ সূর্য এমন বস্তুর আড়াল হয়েছে যদ্দরুন মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

٣٣. رُدُّوْهَا عَلَيَّ ط اَيِ الْخَيْلَ الْمَعْرُوْضَةَ فَرَدُّوْهَا فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَّيْفِ بِالسُّوْقِ جَمْعُ سَاقٍ وَالْاَعْنَاقِ اَيْ ذَبَحَهَا اَوْ قَطَعَ اَرْجُلَهَا تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى حَيْثُ اشْتَغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلٰوةِ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا فَعَوَّضَهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا وَاَسْرَعَ وَهِيَ الرِّيْحُ تَجْرِيْ بِاَمْرِهِ كَيْفَ شَاءَ ـ

৩৩. এগুলোকে সম্মুখে পেশকৃত ঘোড়াসমূহ পুনরায় আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর তিনি তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। سُوْقٌ ـ سَاقٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য এগুলো জবাই করে দিলেন এবং এগুলোর পা কেটে দিলেন। কেননা এগুলোর কারণে তিনি নামাজ থেকে গাফেল হলেন এবং এগুলোর গোশত সদকা করে দিলেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময় আরো উৎকৃষ্ট ও তেজস্ব বস্তু অর্থাৎ বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। যা তার হুকুমে যেভাবে চাই প্রবাহিত হয়।

٣٤. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ اِبْتَلَيْنَاهُ بِسَلْبِ مُلْكِهِ وَذٰلِكَ لِتَزَوُّجِهِ بِامْرَاَةٍ هَوِيَهَا وَكَانَتْ تَعْبُدُ الصَّنَمَ فِيْ دَارِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ وَكَانَ مُلْكُهُ فِيْ خَاتَمِهِ فَنَزَعَهُ مَرَّةً عِنْدَ اِرَادَةِ الْخَلَاءِ وَوَضَعَهُ عِنْدَ امْرَاَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالْاَمِيْنَةِ عَلٰى عَادَتِهِ ـ

৩৪. আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম আমি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেছি। এই পরীক্ষা তার প্রেমিকার সাথে বিবাহের উদ্দেশ্যে ছিল। মহিলাটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অজান্তে তার গৃহে মূর্তিপূজা করতো। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব তার আংটির নিয়ন্ত্রণে ছিল। একদা তিনি টয়লেটে প্রবেশের সময় তার পূর্বের অভ্যাসমতে আংটিখানা তার আমীনা নামক স্ত্রীর হাতে দিলেন।

فَجَاءَهَا جِنِّيٌّ فِيْ صُوْرَةِ سُلَيْمَانَ فَاَخَذَهُ مِنْهَا وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا هُوَ ذٰلِكَ الْجِنِّيُّ وَهُوَ صَخْرًا وْغَيْرُهُ جَلَسَ عَلٰى كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ وَعَكَفَتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَغَيْرُهَا فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ فِيْ غَيْرِ هَيْئَتِهٖ فَرَاٰهُ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ وَقَالَ لِلنَّاسِ اَنَا سُلَيْمَانُ فَاَنْكَرُوْهُ ثُمَّ اَنَابَ رَجَعَ سُلَيْمَانُ اِلٰى مُلْكِهٖ بَعْدَ اَيَّامٍ بِاَنْ وَصَلَ اِلَى الْخَاتَمِ فَلَبِسَهُ وَجَلَسَ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ.

অতঃপর একজন জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতিতে এসে তার স্ত্রী থেকে আংটিখানা নিয়ে নিলেন। এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। এটা ছিল সেই জিন যিনি আংটি নিয়ে নিলেন। এবং সে সাখর বা অন্য কেউ। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর চেয়ারে বসল এবং তার উপর পক্ষীসমূহ ছায়া দিল। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.) তার নিজস্ব আকৃতির খেলাপ বের হলেন ও তার সিংহাসনে জিনকে দেখে লোকদেরকে বলতে লাগলেন যে, আমিই সোলায়মান কিন্তু লোকেরা তা চিনল না। অতঃপর সে রুজু হলো। তিনি কিছুদিন পর আংটি ফিরে পেলে পুনরায় তা পরিধান করে তার সিংহাসনে বসলেন।

٣٥. قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ ج اَيْ سِوَايَ نَحْوَ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَيْ سِوَى اللّٰهِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

৩৫. সোলায়মান দোয়া করলো হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। مِنْ بَعْدِيْ অর্থ سِوَايَ অর্থাৎ আমি ছাড়া যেমন فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ -এর মধ্যে بَعْدِ اللّٰهِ অর্থ- سِوَى اللّٰهِ নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।

٣٦. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً لَيِّنَةً حَيْثُ اَصَابَ اَرَادَ.

৩৬. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো যেখানে সে পৌছাতে চাইতো।

٣٧. وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ يَبْنِي الْاَبْنِيَةَ الْعَجِيْبَةَ وَّغَوَّاصٍ فِي الْبَحْرِ لِيَسْتَخْرِجَ اللُّؤْلُؤَ.

৩৭. আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী আজীব প্রাসাদ নির্মাণ করা ও সাগরের ডুবুরী মুক্তা বের করার জন্যে।

٣٨. وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ مُقَرَّنِيْنَ مَشْدُوْدِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ الْقُيُوْدِ بِجَمْعِ اَيْدِيْهِمْ اِلٰى اَعْنَاقِهِمْ.

৩৮. এবং অন্য আরো অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকতো শৃঙ্খলে তাদের হাত কাধে একত্রিত করে।

٣٩. وَقُلْنَا لَهُ هٰذَا اَعْطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَعْطِ مِنْهُ مَنْ شِئْتَ اَوْ اَمْسِكْ عَنِ الْاِعْطَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ لَا حِسَابَ عَلَيْكَ فِىْ ذٰلِكَ .

৩৯. আমি তাকে বললাম এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব তুমি এগুলো যাকে ইচ্ছা দাও অথবা নিজে রেখে দাও। এর কোনো হিসেবে দিতে হবে না।

٤٠. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ .

৪০. নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। অনুরূপ আয়াত পূর্বে বর্ণিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا : এটা كَلَام مُسْتَأْنِفْ পূর্বের مَضْمُوْن -এর تَقْرِيْر এবং تَاكِيْد -এর জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بَاطِلًا : এটা উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ خَلْقًا بَاطِلًا এটাও জায়েজ যে, خَلَقْنَا -এর যমীরে ফায়েল থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ مَا خَلَقْنَا مُبْطِلِيْنَ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ اَىْ خَلْقُ مَا ذُكِرَ لَا لِشَىْءٍ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কে নির্ধারণ করা অর্থাৎ আকাশ পাতালের অহেতুক সৃষ্টির ধারণা মক্কার কাফেরদের।

قَوْلُهُ كِتَابٌ : এটা هٰذَا উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذَا كِتَابٌ

قَوْلُهُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ : এটা كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ مُبَارَكٌ : এটা উহ্য মুবতাদার দ্বিতীয় খবর। কেউ কেউ مُبَارَكٌ কে كِتَابٌ -এর সিফত বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা জমহুরের নিকট وَصْف غَيْر صَرِيْح -কে وَصْف صَرِيْح -এর উপর مُقَدَّم করা হয় না।

قَوْلُهُ لِيَدَّبَّرُوْا : এটা সম্পর্ক হয়েছে انزلناه -এর সাথে। প্রকাশ্য হলো এই যে, لِيَدَّبَّرُوْا -এর فَاعِلْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এটা تَنَازُعُ الْفِعْلَانِ -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা لِيَدَّبَّرُوْا এবং لِيَتَذَكَّرَ উভয়টি اُولُوا الْاَلْبَابِ-কে স্বীয় ফায়েল বানাতে চায়। বসরীগণের মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয় ফে'লকে আমলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রথমটির জন্য যমীর নিয়ে এসেছেন।

قَوْلُهُ اَىْ سُلَيْمَانُ : এটা نِعْمَ -এর مَخْصُوْص بِالْمَدْحِ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ عُرِضَ : এটা উহ্য ফে'লের ظَرْف হয়েছে উহ্য ইবারত হলো– اُذْكُرْ اِذْ عُرِضَ

قَوْلُهُ الْجِيَادُ : এটা جَوَادٌ -এর বহুবচন। বলা হয়েছে যে, جِيْد অর্থ হলো উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াকে বলে। جَوَادٌ টা নর ও মাদী উভয়ের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى : অর্থাৎ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ -এর অর্থ।

قَوْلُهُ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ : এটা حُبَّ الْخَيْرِ اَحْبَبْتُ -এর مَفْعُوْل بِه আর اَحْبَبْتُ টা اٰثَرْتُ অর্থে হয়েছে। কেননা اَحْبَبْتُ -এর সেলাহ عَنْ আসে না। حُبَّ الْخَيْرِ হলো اَحْبَبْتُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ অতিরিক্ত অক্ষর ফেলে দিয়ে যেমন نَبَاتًا টা عَنْ এবং عَلٰى অর্থে হয়েছে এবং خَيْر অর্থ خَيْل হাদীসে এসেছে اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ অর্থাৎ ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ জড়িত, সম্ভবত এই মুনাসাবাতের কারণেই خَيْل কে خَيْر বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু خَيْل টা كَثِيْرُ الْمَنَافِعِ হয়ে থাকে, একারণেই তাকে خَيْر বলা হয়। (فَتْحُ الْقَدِيْرِ, شَوْكَانِىْ)

قَوْلُهُ أَصَابَ اَىْ أَرَادَ : এখানে أَصَابَ টা أَرَادَ অর্থে হয়েছে। কেননা এখানে أَصَابَ টা فَعَلَ نِعْلَ الصَّوَابِ অর্থে হওয়া বৈধ নয়। আর أَصَابَ টা أَرَادَ অর্থে আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হয়– أَصَابَ الصَّوَابَ فَاَخْطَأَ الْجَوَابَ অর্থাৎ সঠিক উত্তরের ইচ্ছা করেছে কিন্তু উত্তর ভুল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مُقَرَّنِيْنَ : এটা إِسْم مَفْعُول এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ এর وَاحِدْ হলো مُقَرَّنٌ বাবে تَفْعِيْل থেকে অর্থাৎ বাধা, বুনিত।

قَوْلُهُ الْاَصْفَادِ : এটা صَفَدٌ -এর বহুবচন অর্থ– বেড়ি, শিকল।

قَوْلُهُ زُلْفٰى : অর্থ– মর্যাদা, স্তর, নেকট্য। قُرْبٰى -এর মতো মাসদার ইমাম বগভী (র.) লিখেছেন زُلْفٰى ইসিম يُوْصَفُ بِهِ এতে مَصْدَرْ . مُذَكَّرْ . مُؤَنَّثْ . وَاحِدْ . تَثْنِيَة . جَمْع সবই একই রূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ الخ :

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলির মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোনো বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোনো অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্য এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনার পূর্বে কাফেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ অর্থাৎ তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অননুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শাস্তি দিতে বলেন, তিনি কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবেন না? অবশ্যই সে ভালো মন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে, এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালোমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

قَوْلُهُ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... كَالْفُجَّارِ : অর্থাৎ আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব না পরহেজগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? অর্থাৎ এমন কখনো হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলির ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হবে। এ থেকে এ কথা ও বলা যায় না যে, ইসলামি রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না; বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সে মতে ইসলামি রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) অশ্বরাজি পরিদর্শন এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামাজ পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব জবাই করে দেন। কেননা এগুলোর কারণেই আল্লাহ তা'আলার স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামাজ নফল হলে কোনো আপত্তির কারণ নেই। কেননা পয়গাম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন; পক্ষান্তরে তা ফরজ নামাজ হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাজা হতে পারে এতে কোনো গুনাহ হয় না। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তাফসীরটি কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-এর ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ-এর এক উক্তি থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরূপ–

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ قَالَ قَطَعَ سُوْقَهَا وَأَعْنَاقَهَا بِالسَّيْفِ .

আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়মী (র.) মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেন–

"তাবারানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী হযরত সাঈদ ইবনে বশীর (রা.) রয়েছে যাকে শু'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

এ হাদীসের কারণে বর্ণিত তাফসীরটি খুব মজবুত। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গাম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তাফসীরবিদগণ এর জবাবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরিয়তে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কুরবানি করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ তা'আলার নামে কুরবানি করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কুরবানি করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরো একটি তাফসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে জিহাদের জন্য তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনে নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেন, এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন, এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত করো। সে মতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তাফসীর অনুযায়ী عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ বাক্যে عَنْ টি কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَوَارَتْ -এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বুঝানো হয়েছে। এখানে مَسْحٌ -এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কুরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তাফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তাফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী : কেউ কেউ প্রথম তাফসীর অবলম্বন করে আরো বলেছেন যে, আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার পর হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অথবা ফেরেশতাদের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন– رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বুঝানো হয়েছে; সূর্য নয়।

এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার নেই। বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কুরআন ও হাদীসের কোনো দলিল দ্বারা প্রামাণ্য নয়। –[রূহুল মা'আনী]

আল্লাহ তা'আলার স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদা বোধের দাবি : সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো মুবাহ [অনুমোদিত] কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েজ। সূফী বুজুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।

–[বয়ানুল কুরআন]

কোনো সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুজুরে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম (রা.) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামাজ পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন চাদরটি আবূ জুহায়েম (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাজে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। –[আহকামুল কুরআন]

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা.) একবার তার বাগানে নামাজরত অবস্থায় একটি পাখিকে দেখায় মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাজের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ অহেতুক কোনো সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েজ নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয় এরূপ কোনো কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (র.) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসাবে তার বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শে'রানী (র.)-এর মতো অনুসন্ধানী সূফী বুজুর্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেন নি। –[রূহুল মা'আনী]

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশুনা করা শাসনকর্তার উচিত : এ ঘটনা থেকে আরো জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশুনা করা উচিত। কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সুলায়মান (আ.) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদতে মশগুল থাকা ভুল : এ ঘটনা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলা বাহুল্য জিহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ ইবাদতের পরিবর্তে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকহবিদগণ লিখেন, জুমার আজানের পর যেন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েজ নয়, তেমনি জুমার নামাজের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়। যদিও তা তেলাওয়াতে কুরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়।

قوله ولقد فتنا سليمان والقينا الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আরো একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনের রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হলো, এসব বিবরণ কুরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোনো সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেজ ইবনে কাছীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কুরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে কোনোভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে আরো বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তারা এক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের রহস্য তার আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহ রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর হযরত সুলায়মান (আ.) সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরো কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) এ ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন–

"আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পয়গাম্বর বলেই মানে না। বাহ্যত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলা কিছুতেই জায়েজ নয়।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আরো একটি ঘটনা সহহী বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই: একবার হযরত সুলায়মান (আ.) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গাম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিলেন। ফলে সকল বিবির মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন, সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তার সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে হযরত সুলায়মান (আ.) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল। সে মতে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সাউদ, আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ এ তাফসীরবিদও তদনুরূপ তাফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তাফসীর বলা যায় না। কারণ এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.)-এর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আম্বিয়া, কিতাবুল আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুত তাফসীরে সূরা সোয়াদের তাফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِي مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোনো বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর নয়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য পয়গাম্বরের যেমন অন্যান্য আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোনো আয়াতের তাফসীর হওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয় এক তাফসীরে ইমাম রাযী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এতো দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাকে সিংহাসনে বসানো হতো, তখন মনে হতো যেন একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তাফসীরও অনুমানভিত্তিক। কুরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোনো রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্য আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা কোনো বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মতো আল্লাহ তা'আলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ : অর্থাৎ আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না। কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাদের মতে আমার পরে শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হযরত থানভী (র.) ও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি।

কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোনো কোনো জিনকে বশীভূত করে দেয়। এটা তার পরিপন্থি নয়। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জিন বশীভূতকরণের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া : এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গাম্বরগণের কোনো দোয়া আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সুলায়মান (আ.) এ দোয়াটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর হযরত সুলায়মান (আ.) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ। –[রূহুল মা'আনী]

مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ [শৃঙ্খলিত অবস্থায়] জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করতো, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে হযরত সুলায়মান (আ.) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরি নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোনো পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝার জন্য এখানে শিকল ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٤١. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ بِضُرٍّ وَعَذَابٍ اَلَمٍ وَ نَسَبَ ذٰلِكَ اِلَى الشَّيْطَانِ وَاِنْ كَانَتِ الْاَشْيَاءُ كُلُّهَا مِنَ اللّٰهِ تَاَدُّبًا مَعَهٗ تَعَالٰى وَقِيْلَ لَهٗ .

৪১. স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বললেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। بِاَنِّىْ মূলত اَنِّىْ ছিল। যদিও প্রত্যেক কিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয় কিন্তু এখানে আদব রক্ষার্থে যন্ত্রণা ও কষ্টকে শয়তানের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

٤٢. اُرْكُضْ اِضْرِبْ بِرِجْلِكَ ج الْاَرْضَ فَضَرَبَ فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ فَقِيْلَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ . اَىْ مَا يُغْتَسَلُ بِهٖ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاغْتَسَلَ وَشَرِبَ فَذَهَبَ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ كَانَ بِظَاهِرِهٖ وَبَاطِنِهٖ .

৪২. তাকে বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। অতঃপর তিনি পা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে পানির ঝরণা নির্গত হয়। অতঃপর বলা হয় যে, এটা গোসল ও পান করার জন্যে শীতল পানি। অতঃপর হযরত আইয়ূব (আ.) এটা দ্বারা গোসল করলেন ও পান করলেন অতএব তাতে তার জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকার রোগ সুস্থ হয়।

٤٣. وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ اَىْ اَحْيَى اللّٰهُ لَهٗ مَنْ مَاتَ مِنْ اَوْلَادِهٖ وَرَزَقَهٗ مِثْلَهُمْ رَحْمَةً نِعْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى عِظَةً لِاُولِى الْاَلْبَابِ لِاَصْحَابِ الْعُقُوْلِ .

৪৩. আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরো অনেক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার মৃত সন্তানদেরকে জীবিত করে দিলেন ও তাদের মতো আরো অনেক দান করলেন। আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

٤٤. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا هُوَ حُزْمَةٌ مِنْ حَشِيْشٍ اَوْ قُضْبَانٍ فَاضْرِبْ بِّهٖ زَوْجَتَكَ وَقَدْ كَانَ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا مِائَةَ ضَرْبَةٍ لِاِبْطَائِهَا عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَا تَحْنَثْ ط بِتَرْكِ ضَرْبِهَا فَاَخَذَ مِائَةَ عُوْدٍ مِنَ الْاِذْخِرِ اَوْ غَيْرِهٖ فَضَرَبَهَا بِهٖ ضَرْبَةً وَاحِدَةً اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ ط اَيُّوْبُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪৪. তুমি তোমার হাতে এক মুঠো ঘাস ও তৃণলতা নাও এবং তদ্দ্বারা তোমার স্ত্রীকে আঘাত কর। একদিন স্ত্রী তার কাছে দেরিতে আসার কারণে তিনি শপথ করলেন যে, তিনি তাকে একশ বেত্রাঘাত করবেন এবং শপথ ভঙ্গ করো না। তুমি তাকে আঘাত না করে। অতঃপর তিনি ইজখির ইত্যাদির একশটি তৃণশলা নিলেন ও একবার বেত্রাঘাত করলেন নিশ্চয়ই আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। চমৎকার বান্দা আইয়ূব। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। আল্লাহ তা'আলার দিকে।

٤٥. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِي الْأَيْدِيْ أَصْحَابَ الْقُوٰى فِي الْعِبَادَةِ وَالْأَبْصَارِ الْبَصَائِرِ فِي الدِّيْنِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَبْدَنَا وَإِبْرَاهِيْمَ بَيَانٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلٰى عَبْدِنَا .

৪৫. স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী ইবাদতে শক্তিশালী ও দীনের ব্যাপারে বিচক্ষণ আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা অন্য কেরাত মতে عَبْدَنَا এবং ইবরাহীম عَبْدَنَا -এর বর্ণনামূলক পদ ও এর পরবর্তী শব্দসমূহ عَبْدَنَا -এর উপর আতফ হয়েছে।

٤٦. إِنَّا أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ هِيَ ذِكْرَى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ أَيْ ذِكْرُهَا وَالْعَمَلُ لَهَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْإِضَافَةِ وَهِيَ لِلْبَيَانِ .

৪৬. আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। অর্থাৎ আখেরাতের স্মরণ করা ও এটার জন্যে আমল করা। অন্য কেরাতে خَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ ইযাফতে বায়ানিয়্যাহর সাথে।

٤٧. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْمُخْتَارِيْنَ الْأَخْيَارِ جَمْعُ خَيِّرٍ بِالتَّشْدِيْدِ .

৪৭. আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। اَخْيَارٌ - خَيِّرٌ [তাশদীদযুক্ত] এর বহুবচন।

٤٨. وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ هُوَ نَبِيٌّ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَذَا الْكِفْلِ ط اُخْتُلِفَ فِيْ نُبُوَّتِهٖ قِيْلَ كَفَلَ مِائَةَ نَبِيٍّ فَرُّوْا إِلَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ وَكُلٌّ أَيْ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَخْيَارِ جَمْعُ خَيْرٍ بِالتَّثْقِيْلِ .

৪৮. স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা তিনি নবী ছিলেন। এখানে اَلِفْ لَامْ অতিরিক্ত। ও যুলকিফলের কথা যুলকিফলের নবুয়তের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শতাধিক নবীদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। যারা হত্যার ভয়ে পলায়ন করে তার কাছে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। اَخْيَارٌ خَيِّرٌ [তাশদীদযুক্ত] বহুবচন।

٤٩. هٰذَا ذِكْرٌ ط لَهُمْ بِالثَّنَاءِ الْجَمِيْلِ هُنَا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ الشَّامِلِيْنَ لَهُمْ لَحُسْنَ مَاٰبٍ مَرْجِعٍ فِي الْاٰخِرَةِ .

৪৯. এখানে তাদের আলাচনা এক মহৎ আলোচনা। তারা সহ খোদাভীরুদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে উত্তম ঠিকানা।

٥٠. جَنّٰتِ عَدْنٍ بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِحُسْنَ مَاٰبٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مِنْهَا .

৫০. তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। جَنّٰتِ عَدْنٍ এটা حُسْنَ مَاٰبٍ থেকে عَطْفِ بَيَانٍ বা بَدَلْ হয়েছে।

৫১. مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ .

৫১. সেখানে তারা খাটের উপর হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়।

৫২. وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ حَابِسَاتِ الْعَيْنِ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ اَتْرَابٌ اَسْنَانُهُنَّ وَاحِدَةٌ وَّهُنَّ بَنَاتُ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ سَنَةً جَمْعُ تِرْبٍ .

৫২. তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না অর্থাৎ তারা সবাই তেত্রিশ বছরের রমণী। اَتْرَابٌ টা تِرْبٌ-এর বহুবচন

৫৩. هٰذَا الْمَذْكُوْرُ مَا تُوْعَدُوْنَ بِالْغَيْبَةِ وَبِالْخِطَابِ اِلْتِفَاتًا لِيَوْمِ الْحِسَابِ اَىْ لِاَجْلِهٖ .

৫৩. উল্লিখিত এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্য। يُوْعَدُوْنَ গায়েব হিসেবে আর ইলতিফাত হিসেবে খিতাবের সীগাহ ব্যবহৃত।

৫৪. اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ اَىْ اِنْقِطَاعٍ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ رِزْقِنَا اَوْ خَبَرٌ ثَانٍ لِاَنَّ اَىْ دَائِمًا اَوْ دَائِمٌ .

৫৪. এটা আমার দেওয়া রিজিক যা শেষ হবে না। مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ বাক্যটি رِزْقُنَا থেকে حَالٌ বা اِنَّ থেকে দ্বিতীয় খবর অর্থাৎ حَالٌ হিসেবে دَائِمًا আর খবর হিসেবে دَائِمٌ।

৫৫. هٰذَا الْمَذْكُوْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ مستانف لَشَرَّ مَاٰبٍ .

৫৫. এটা উল্লিখিত নিয়ামতসমূহ ঈমানদারদের জন্যে এবং নিশ্চয়ই দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা। এটা جُمْلَةٌ مُّسْتَانِفَةٌ তথা স্বতন্ত্র বাক্য।

৫৬. جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج يَدْخُلُوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ .

৫৬. তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল।

৫৭. هٰذَا اَىِ الْعَذَابُ الْمَفْهُوْمُ مِمَّا بَعْدَهُ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ اَىْ مَاءٌ حَارٌّ مُحْرِقٌ وَّغَسَّاقٌ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَا يَسِيْلُ مِنْ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ .

৫৭. এই আজাব যা পরবর্তী থেকে বুঝা যায় উত্তপ্ত পানি গরম ফুটন্ত পানি ও পুঁজ غَسَّاقٌ সীনে তাশদীদ ও তাশদীদ বিহীন আহলে জাহান্নামের ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ অতএব তারা একে আস্বাদন করুক।

৫৮. وَّاٰخَرُ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ مِنْ شَكْلِهٖ اَىْ مِثْلُ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْحَمِيْمِ وَالْغَسَّاقِ اَزْوَاجٌ اَصْنَافٌ اَىْ عَذَابُهُمْ مِنْ اَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَيُقَالُ لَهُمْ عِنْدَ دُخُوْلِهِمُ النَّارَ بِاَتْبَاعِهِمْ .

৫৮. এই ধরনের উল্লিখিত উত্তপ্ত পানি ও পুঁজের ন্যায় আরো বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। অর্থাৎ তাদের আজাব ও শাস্তি বিভিন্ন প্রকারের। اٰخَرُ একবচন ও বহুবচন তথা اُخَرُ - اٰخَرُ উভয়ভাবে পড়া যাবে।

٥٩. هٰذَا فَوْجٌ جَمْعٌ مُقْتَحِمٌ دَاخِلٌ مَعَكُمْ ج النَّارَ بِشِدَّةٍ فَيَقُوْلُ الْمَتْبُوْعُوْنَ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اَيْ لَاسَعَةَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ.

৫৯. তারা তাদের অনুসারীদের ন্যায় জাহান্নামে প্রবেশের সময় তদেরকে বলা হবে যে, এটা এক দল যারা তোমাদের সাথে কঠিনভাবে জাহান্নামে প্রবেশকারী অতঃপর নেতারা বলবে তাদের জন্য অভিনন্দন নেই অর্থাৎ তাদের শাস্তি হালকা হবে না তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٦٠. قَالُوْا اَيِ الْاَتْبَاعُ بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ط اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ اَيِ الْكُفْرَ لَنَا ج فَبِئْسَ الْقَرَارُ لَنَا وَلَكُمُ النَّارُ.

৬০. তারা অনুসারীরা বলবে, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এর কুফরির সম্মুখীন করেছ। অতএব তোমাদের ও আমাদের জন্য জাহান্নাম কতই না ঘৃণ্য আবাসস্থল।

٦١. قَالُوْا اَيْضًا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا اَيْ مِثْلَ عَذَابِهِ عَلٰى كُفْرِهِ فِي النَّارِ.

৬১. তারা আরো বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। অর্থাৎ তাদের কুফরির শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন।

٦٢. وَقَالُوْا اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَهُمْ فِي النَّارِ مَالَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَشْرَارِ.

৬২. এবং তারা মক্কার কাফেররা জাহান্নামে থাকা অবস্থায় বলবে, আমাদের কি হলো যে, আমরা দুনিয়াতে যাদেরকে মন্দলোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না।

٦٣. اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا بِضَمِّ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا اَيْ كُنَّا نَسْخَرُ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْيَاءُ لِلنِّسْبَةِ اَيْ اَمَفْقُوْدُوْنَ هُمْ اَمْ زَاغَتْ مَالَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ فَلَمْ نَرَهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ وَسَلْمَانَ.

৬৩. আমরা কি তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম سِخْرِيًّا সীনে পেশ ও যের এর সাথে অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করতাম এবং سِخْرِيًّا শব্দটির يَاء নিসবতী। অর্থাৎ তারা কি অনুপস্থিত। না আমাদের দৃষ্টি তাদের থেকে সরে পড়েছে। অর্থাৎ আমরা তাদেরকে দেখছি না এবং তারা হলো দরিদ্র মুসলমানগণ যেমন, আম্মার, বিলাল, সুহাইব ও সালমান (রা.) প্রমুখ।

٦٤. اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ وَاجِبٌ وُقُوْعُهُ وَهُوَ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ كَمَا تَقَدَّمَ.

৬৪. এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। যেমন– পূর্বে বর্ণিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِنُصْبٍ : এ শব্দটির তিনটি কেরাত রয়েছে।

১. نُصْبٍ তথা نُوْنٌ এ পেশ ও صَادْ সাকিন।

২. نَصْبٍ তথা نُوْن -এ যবর ও صَادْ সাকিন।

৩. نُصُبٍ তথা نُوْن ও صَادْ -এ পেশ। অর্থ– দুঃখ, কষ্ট, মসিবত।

اُذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ -এর আতফ عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর ভিত্তিতে اُذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ -এর উপর হয়েছে।

প্রশ্ন. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার সময় اُذْكُرْ না বলার কারণ কি?

উত্তর. হযরত দাউদ (আ.) এবং তার সন্তান হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মধ্যে যেহেতু كَمَال اِتِّصَال রয়েছে। মনে হয় যে উভয়টি একই ঘটনা। এ কারণে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনাকে اُذْكُرْ দ্বারা শুরু করেননি। اُذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ এখানে اَيُّوْبَ টা عَبْدَنَا থেকে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانْ হয়েছে। আর اِذْ نَادٰى এটা اَيُّوْبَ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ : وَاوْ টি হলো আতেফা, উহ্যের উপর এর عَطْف হয়েছে। যে দিকে মুফাসসির (র.) فَاغْتَسَلَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ رَحْمَةً وَذِكْرٰى : উভয়টি عَطْف -এর মাধ্যমে وَهَبْنَا -এ مَفْعُوْل لِاَجْلِهٖ হয়েছে।

قَوْلُهُ ضِغْثًا : এটা হলো حُزْمَةُ حَشِيْشٍ শুকনো ঘাসের আঁটি حُزْمَةٌ হলো আঁটি ফারসিতে বলে دَسْتَه

قَوْلُهُ بِخَالِصَةٍ : এটা উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ بِخَصْلَةٍ خَالِصَةٍ

قَوْلُهُ ذِكْرَى الدَّارِ : এটাকে মুফাসসির (র.) উহ্য هِىَ মুবতাদার খবর বলেছেন। এই সুরতে ذِكْرٰى টা مَحَلًّا مَرْفُوْع হবে। এক কেরাতে ذِكْرَى الدَّارِ কে خَالِصَة -এর مُضَاف اِلَيْه বলেছেন। اِضَافَة بَيَانِيَّة হবে এই সুরতে ذِكْرٰى টা مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে।

قَوْلُهُ اَلْيَسَعَ : তিনি হলেন ইবনে আখতুব ইবনে আজূজ -এর ছেলে।

قَوْلُهُ مُفَتَّحَةً : এটা جَنّٰتِ عَدْنٍ হতে حَالْ হয়েছে। আর جَنّٰتِ عَدْنٍ টা حُسْنَ مَاٰبٍ হতে بَدَلْ বা عَطف بَيَانْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَّكِـِٔيْنَ : এটা لَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلْتِفَاتًا : অর্থাৎ تُوْعَدُوْنَ - (ت) -এর সাথে পড়া হলে غَيْبَتْ থেকে خِطَابْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ হবে।

قَوْلُهُ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ : هٰذَا হলো মুবতাদা এবং حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ হলো مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে। ইবারতে تَقْدِيْم ও تَاْخِيْر হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– هٰذَا حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ فَلْيَذُوْقُوْهُ

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُمْ : قَائِل ফেরেশতা হবে। এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, هٰذَا فَوْجٌ টা كَلَام مُسْتَانِف

قَوْلُهُ بِاَتْبَاعِهِمْ : অর্থাৎ مَعَ اَتْبَاعِهِمْ

قَوْلُهُ بَلْ اَنْتُمْ : অর্থাৎ بَلْ اَنْتُمْ اَحَقُّ بِمَا قُلْتُمْ بِمَا لَنَا

قَوْلُهُ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ : এটা তাদের احقيت -এর ইল্লত হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي النَّارِ : এটা হয়তো زِدْهُ -এর ظَرْف অথবা عَذَابًا -এর সিফত অর্থাৎ عَذَابًا كَائِنًا فِي النَّارِ

قَوْلُهُ وَهُمْ : هُمْ যমীরটি رِجَالًا -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ وَسَلْمًا : এই বাক্য যেহেতু কুফর ও পথভ্রষ্টতার ইমামরা দরিদ্র মুসলমানদের ব্যাপারে বলেছিল, কাজেই মুনাসিব মনে হতো سَلْمَان কে উহ্য করে দেওয়া। কেননা তিনি মদীনায় ঈমান এনেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ الخ : রাসূলে কারীম ﷺ -কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এখানে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে- مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ অর্থাৎ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়ূব (আ.) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ হযরত আইয়ূব (আ.)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করলঃ আমাকে তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্তুতির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হলো। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন, কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গাম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান হযরত আইয়ূব (আ.)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রুগ্ণাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়ূব (আ.)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করতো। এতে তিনি আরো অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগ কি ছিল? কুরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, হযরত আইয়ূব (আ.) কোনো গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনো বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোনো কোনো সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তার সর্বাঙ্গে ফোড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃনাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তাফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তারা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মতো কোনো রোগে পয়গাম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোনো সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরিউক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়। -[রূহুল মা'আনী, আহকামুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا [তুমি তোমার হাতে এক মুঠোর তৃণলতা লও। এ ঘটনার পটভূমি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে এ ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে একশ বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরি করে নিয়ে তদ্দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়ূব (আ.)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন যে, এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে- ১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে লাগতে হবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই। নতুবা হানাফী ফকীহগণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরিউক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। -[ফাতহুল কাদীর]

শরিয়তের দৃষ্টিতে কৌশল: দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোনো অসমীচীন অথবা মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরিয়তসম্মত কোনো কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ। বলা বাহুল্য হযরত আইয়ূব (আ.)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবি এই যে, তিনি তার স্ত্রীকে পূর্ণ একশ বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তার পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত আইয়ূব (আ.)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েজ, যখন একে শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোনো হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ নাজায়েজ। উদাহরণত জাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারো জাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল শরিয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয়তো জাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে। -[রূহুল মা'আনী]

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা : তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি কোনো অসমীচীন ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হতো, তবে হযরত আইয়ূব (আ.)-কে কৌশল শিখানো হতো না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরিয়তের বিধান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা।

أُولِى الْأَيْدِىْ وَالْأَبْصَارِ -এর শাব্দিক অর্থ হলো তারা হস্ত ও দৃষ্টি বিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তারা তাদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকাল চিন্তা ও পয়গাম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ : ذِكْرَى الدَّارِ শাব্দিক অর্থ হলো গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোনো কোনো আল্লাহদ্রোহীদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভোঁতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আ.) : وَالْيَسَعَ [আল ইয়াসা (আ.)-কে স্মরণ করুন।] হযরত আল ইয়াসা (আ.) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গাম্বর। কুরআন পাকে মাত্র দু জায়গায় তার উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। কিন্তু কোথাও তার বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি; বরং পয়গাম্বরগণের তালিকায় তার নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর চাচাতো ভাই এবং তার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর পর তাঁকেই নবুয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার নাম 'ইলশা ইবনে সাকেত' উল্লিখিত হয়েছে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ অর্থাৎ তাদের কাছে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ থাকবে। অর্থাৎ জান্নাতের হুরগণ থাকবে। 'সমবয়স্কা' এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে- সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলা বাহুল্য এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম : দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতূহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালোবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

অনুবাদ :

٦٥. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْكُفَّارِ مَكَّةَ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ مُخَوِّفٌ بِالنَّارِ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِخَلْقِهِ ـ

৬৫. হে মুহাম্মদ ﷺ! বলুন, মক্কার কাফেরদেরকে আমি তো একজন জাহান্নামের সতর্ককারী মাত্র এবং মাখলুকের উপর পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।

٦٦. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى أَمْرِهِ الْغَفَّارُ لِأَوْلِيَائِهِ ـ

৬৬. তিনি আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা। তিনি পরাক্রমশালী তার নির্দেশের প্রতি মার্জনাকারী তার বন্ধুদের প্রতি।

٦٧. قُلْ لَهُمْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ـ

৬৭. আপনি তাদেরকে বলুন, এটি একটি মহাসংবাদ।

٦٨. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ أَيِ الْقُرْاٰنَ الَّذِىْ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَجِئْتُكُمْ فِيْهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِوَحْيٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ـ

৬৮. তোমরা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। অর্থাৎ কুরআন থেকে তোমাদের নিকট আমি যার সংবাদ দিয়েছি ও এতে তোমরা ওহী ছাড়া যা জাননা তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি। এবং উক্ত সংবাদটি হলো مَا كَانَ لِىْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

٦٩. مَاكَانَ لِىْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰى أَيِ الْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ فِىْ شَأْنِ اٰدَمَ حِيْنَ قَالَ اللّٰهُ إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ـ

৬৯. ঊর্ধ্বজগৎ ফেরেশতাদের জগৎ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিল। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন যে, আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছি।

٧٠. إِنْ مَا يُوْحٰى إِلَىَّ إِنَّمَا أَنَا اى انى نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْإِنْذَارِ ـ

৭০. আমার কাছে এই ওহী আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

٧١. أُذْكُرْ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ هُوَ اٰدَمُ ـ

৭১. আপনি স্মরণ করুন যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করবো। তিনি হলেন হযরত আদম (আ.)।

٧٢. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ أَتْمَمْتُهُ وَنَفَخْتُ أَجْرَيْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَصَارَ حَيًّا وَإِضَافَةُ الرُّوْحِ إِلَيْهِ تَشْرِيْفٌ لِاٰدَمَ وَالرُّوْحُ جِسْمٌ لَطِيْفٌ يَحْيٰى بِهِ الْإِنْسَانُ بِنُفُوْذِهِ فِيْهِ فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْإِنْحِنَاءِ ـ

৭২. যখন আমি তাকে সুষম করবো পরিপূর্ণ করবো এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব। অতঃপর সে জীবিত হবে। হযরত আদম (আ.)-এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলার দিকে রূহের নিসবত করা হয়। রূহ একটি অদৃশ্য বিষয় যার বদৌলতে মানুষ জীবিত হয়। তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। একটু ঝুঁকে অভিনন্দন মূলক সেজদা কর।

٧٣. فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فِيْهِ تَاكِيْدَانِ -

৭৩. অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হলো এখানে كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ দ্বারা দুটি তাকীদ এসেছে

٧٤. اِلَّا اِبْلِيْسَ هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

৭৪. কিন্তু ইবলীস জিনদের আদিপিতা সে ফেরেশতাদের মধ্যে থাকত। সে অহংকার করলো, আর সে আল্লাহ তা'আলার ইলমে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٧٥. قَالَ يَٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط اَيْ تَوَلَّيْتُ خَلْقَهُ وَهٰذَا تَشْرِيْفٌ لِاٰدَمَ فَاِنَّ كُلَّ مَخْلُوْقٍ تَوَلَّى اللّٰهُ خَلْقَهُ اَسْتَكْبَرْتَ الْاٰنَ عَنِ السُّجُوْدِ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَتَكَبَّرْتَ عَنِ السُّجُوْدِ لِكَوْنِكَ مِنْهُمْ -

৭৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? যাকে আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি। এটা হযরত আদম (আ.)-এর সম্মানার্থে বলা হয়েছে নতুবা সকল মাখলুক আল্লাহ তা'আলা নিজেই সৃষ্টি করেন। তুমি অহংকার করলে এখন সেজদা থেকে। প্রশ্নবোধক অব্যয় ধমক দেওয়ার জন্য না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। অতএব তুমি অহংকারী হওয়ার কারণে সেজদা থেকে বিরত রয়েছ।

٧٦. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ -

৭৬. সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।

٧٧. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا اَيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ مَطْرُوْدٌ -

৭৭. আল্লাহ তা'আলা বললেন, বের হয়ে যা, এখান থেকে অর্থাৎ জান্নাত বা আসমান থেকে কারণ তুমি অভিশপ্ত।

٧٨. وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ -

৭৮. তোমার প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

٧٩. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ اَيِ النَّاسُ -

৭৯. সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে মানুষের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

٨٠. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۙ

৮০. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের থেকে।

٨١. اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَقْتَ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى -

৮১. নির্দিষ্ট সময় সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের দিবস পর্যন্ত।

٨٢. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ـ

৮২. সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপদগামী করে দেব।

٨٣. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ أَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা ঈমানদার তাদেরকে ছাড়া।

٨٤. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ بِنَصْبِهِمَا وَرَفْعِ الْأُوْلٰى وَنَصْبِ الثَّانِي فَنَصْبُهُ بِالْفِعْلِ بَعْدَهُ وَنَصْبُ الْأَوَّلِ قِيْلَ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُوْرِ وَقِيْلَ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ أُحِقُّ الْحَقَّ وَقِيْلَ عَلٰى نَزْعِ حَرْفِ الْقَسَمِ وَرَفْعِهِ عَلٰى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفُ الْخَبَرِ أَيْ فَالْحَقُّ مِنِّيْ وَقِيْلَ فَالْحَقُّ قَسَمِيْ وَجَوَابُ الْقَسَمِ ـ

৮৪. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাই ঠিক ; আর আমি সত্য বলছি اَلْحَقُّ উভয়টি নসবযুক্ত প্রথমটি পেশ ও দ্বিতীয়টি পরবর্তী ফে'ল দ্বারা নসব, প্রথমটি পূর্বের উল্লিখিত ফে'লের কারণে নসব অথবা মাসদার তথা مَفْعُوْل مُطْلَق হিসেবে নসব অর্থাৎ أُحِقُّ الْحَقَّ অথবা حَرْف قَسَمْ -এর বিলুপ্ত হওয়ার পর নসব অথবা উহ্য খবরের মুবতাদা হিসেবে পেশ অর্থাৎ اَلْحَقُّ مِنِّيْ ـ فَالْحَقُّ قَسَمِيْ এবং জবাবে কসম পরবর্তী বাক্য।

٨٥. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ بِذُرِّيَّتِكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ـ

৮৫. তোমার বংশধর ও মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

٨٦. قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ مِنْ أَجْرٍ جُعْلٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ـ الْمُتَقَوِّلِيْنَ الْقُرْاٰنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ ـ

৮৬. বলুন, আমি তোমাদের কাছে রেসালাতের তাবলীগের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না, আর আমি লৌকিকতাকারী ও কুরআনকে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা নই।

٨٧. إِنْ هُوَ أَيْ مَا الْقُرْاٰنُ إِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ لِلْعٰلَمِيْنَ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ الْعُقَلَاءِ دُوْنَ الْمَلَائِكَةِ ـ

৮৭. এই কুরআন বিশ্ববাসীর ফেরেশতা ব্যতীত মানুষ ও জিন জাতি জন্যে এক উপদেশ মাত্র।

٨٨. وَلَتَعْلَمُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ نَبَأَهُ خَبَرَ صِدْقِهِ بَعْدَ حِيْنٍ أَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَعَلِمَ بِمَعْنٰى عَرَفَ وَاللَّامُ قَبْلَهَا لَامُ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وَاللّٰهِ ـ

৮৮. হে মক্কার কাফেরগণ! তোমরা কিছুকাল কিয়ামত দিবসের পর এর সংবাদ এর সত্যার খবর অবশ্যই জানতে পারবে। عَلِمَ অর্থ عَرَفَ এবং لَتَعْلَمُنَّ -এর লাম উহ্য কসমের অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَتَعْلَمُنَّ ـ

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ : রাসূল ﷺ نَذِيْر [ভীতি প্রদর্শনকারী] ও এবং بَشِيْر [সুসংবাদ দাতা] ও। অথচ এখানে তার সিফত نَذِيْر -এ মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ কি?

এর উত্তর হলো এই যে, ঐ সময় مُخَاطَبْ যেহেতু মুশরিকরা তাদের কারণেই তাঁর نَذِيْر হওয়া। তাই এখানে তার সিফত نَذِيْر -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ -এর মধ্যে حَصْر اِضَافِيْ হয়েছে حَقِيْقِيْ অর্থাৎ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ لَا سَاحِرٌ وَلَا شَاعِرٌ وَلَا كَاهِنٌ وَغَيْرُ ذٰلِكَ - এই حَصْر দ্বারা এই সকল সিফত দ্বারা نَفِيْ করা উদ্দেশ্য। যাকে কাফেররা রাসূল ﷺ -এর জন্য প্রমাণিত করতে ছিল। اِنْذَار ব্যতীত সকল صِفَاتْ -এর নয়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ : হতে اَلْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ পর্যন্ত قُلْ -এর مَقُوْلَه এই مَقُوْلَه -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি صِفَتْ বর্ণনা করেছেন যার সবগুলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর দালালত করে। ১. اَلْوَاحِدُ ২. اَلْقَهَّارُ ৩. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ৪. اَلْعَزِيْزُ ৫. اَلْغَفَّارُ

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ : قُلْ -এর تَكْرَارْ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য হয়েছে যে, مَامُوْر بِهٖ টা جَلِيْلُ الْقَدْرِ এবং عَظِيْمُ الشَّانِ বিষয়। এর দিকে اَمْرًا এবং اِئْتِمَارًا তাওয়াজ্জুহ জরুরি।

قَوْلُهُ اَيِ الْقُرْاٰنِ : এটা هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ -এর মধ্যস্থ هُوَ -এর তাফসীর অর্থাৎ কুরআন আযীমুশ শান এবং كَثِيْرُ الْفَائِدَةِ খবর। যার আমি তোমাদেরকে খবর দিয়েছি। যার মধ্যে এমন খবর নিয়ে এসেছি যা ওহী ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। কাজেই এতে আমার রেসালতের দাবির সত্যায়ন রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ (مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ الخ) : মুফাসসির (র.) هُوَ -এর মারজি' مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ الخ -কে বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং -এর مَرْجِعْ হলো اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً الخ অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى কে مَا لَا يَعْلَمُ -এর ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, ঐ খবর যার জ্ঞান ওহী ছাড়া সম্ভব নয় তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। যাতে আল্লাহ তা'আলা مَلَاِ اَعْلٰى তে ফেরেশতাদেরকে বলেছেন اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আর তা উপর ফেরেশতাদের এই জবাব اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী يَا اِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ -এর জবাবে ইবলীসের اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ বলা উল্লিখিত কথাবার্তা এবং প্রশ্ন ও উত্তর সেই কথাবার্তা যা আকাশে আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাদের মধ্যে হয়েছিল। এই কথোপকথন ও مَلَاِ اَعْلٰى কথাবার্তার খবর দেওয়া ওহী ব্যতীত হতে পারে না, যা রাসূল ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার دَلِيْل تَرْدِيْد -এর প্রমাণ। (صَاوِىْ - جَمَل - فَتْحُ الْقَدِيْرِ شَوْكَانِىْ)

قَوْلُهُ اَلْاٰنَ : এই শব্দ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্ন হলো مِنَ الْعَالِيْنَ অর্থ হলো مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ আর اِسْتَكْبَرْتَ -এর অর্থও হলো অহংকার করা। কাজেই تَكْرَارْ আবশ্যক হচ্ছে।

জবাবের সার হচ্ছে- اَتَرَكْتَ السُّجُوْدَ لِاِسْتِكْبَارِكَ الْحَادِثِ اَمْ اِسْتِكْبَارِكَ الْقَدِيْمِ الْمُسْتَمِرِّ উদ্দেশ্য এই যে, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করা তোমার جِبِلِّىْ এবং تَكَبُّرْ قَدِيْم -এর কারণে হয়েছে অথবা تَكَبُّرْ حَادِثْ جَدِيْد -এর কারণে। কাজেই تَكْرَارْ হয়নি।

প্রশ্ন. رَجِيْم হলো مَطْرُوْد অর্থে যেমনটি শারেহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং সামনে বলেছেন اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ আর لَعْنَتْ -এর অর্থও طَرْد কাজেই এখানে تَكْرَارْ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর. رَجِيْم -এর অর্থ طَرْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ السَّمَاءِ আর লুগাতের অর্থ طَرْدٌ مِنَ الرَّحْمَةِ কাজেই تَكْرَارْ হয়নি।

قَوْلُهُ الْمُتَقَوِّلِيْنَ : এটা বাবে تَفَعُّلٌ -এর تَقَوُّلٌ মাসদার হতে অর্থ বানোয়াট কথা বলা, মিথ্যা কথার মাধ্যমে কাজ নেওয়া।

قَوْلُهُ دُوْنَ الْمَلَائِكَةِ : কুরআন সমগ্র আলমের জন্য উপদেশ। عَالَمٌ -এর মধ্যে মানব, দানব ফেরেশতা সবাই অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে مَلَائِكَةٌ কে دُوْنَ الْمَلَائِكَةِ বলে عَالَمٌ থেকে বের করে দিয়েছেন। কেননা কুরআনকে আলমবাসীর জন্য ذِكْر এবং নসিহত বলা হয়েছে। আর ذِكْر নসিহত ও تَخْوِيْف এটা মানব দানবের জন্য প্রযোজ্য তবে مَلَائِكَة -এর জন্য প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ عَلِمَ بِمَعْنَى عَرَفَ : মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য এই ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রশ্ন হলো عَلِمَ টা مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْل হয়ে থাকে। এখানে مُتَعَدِّيْ بِيَكْ مَفْعُوْل হয়েছে। কেননা تَعْلَمُنَّ -এর শুধুমাত্র একটি মাফউলই রয়েছে। আর তা হলো نَبَأ ; জবাবের সার হলো عَلِمَ টা عَرَفَ অর্থে। আর وَلَتَعْلَمُنَّ -এর মধ্যকার لَامٌ টি جَوَابُ قَسَمٍ আর কসম হলো وَاللهِ যা উহ্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, عَلِمَ টা مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْل হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাফউল হলো بَعْدَ حِيْنٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার সার-সংক্ষেপ : قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ এ সূরার আসল লক্ষ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবি খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলি দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে- ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মতো আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। ২. এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষা লাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গাম্বরের রিসালাত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এরপর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অঙ্কন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহার আবার আসল দাবি অর্থাৎ রিসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ : অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল। অর্থাৎ আমার রিসালাতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিলেন- اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ অর্থাৎ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اِخْتِصَامٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ- ঝগড়া করা, অথবা বাকবিতণ্ডা করা। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোনো আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اِخْتِصَامٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো ছোট বড়কে কোনো প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ : অর্থাৎ যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের উপরিউক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে। -[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ : এখানে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তাফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হলো আল্লাহর কুদরত আরবি ভাষায় يد শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণত এক আয়াতে আছে بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিষেভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন; যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ [আল্লাহর ঘর], হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে 'নাকাতুল্লাহ' [আল্লাহর উষ্ট্র], হযরত ঈসা (আ.)-কে কালেমাতুল্লাহ [আল্লাহর বাক্য] অথবা 'রূহুল্লাহ' [আল্লাহর রূহ] বলা হয়েছে। এখানেও হযরত আদম (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা : وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই। উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রেসালাত ও জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করছি না; বরং আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এথেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সে মতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি উক্তিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-

"লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে اَللّٰهُ اَعْلَمُ [আল্লাহ ভালো জানেন] বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সম্পর্কে বলেছেন- قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা যখন ইবলিসকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তখন সে বলল, এ সুযোগে আমি আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো। এরপর বলেছে, তবে হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি আপনার বন্দেগীর জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে পারবো না। আলোচ্য আয়াতে একথাই ইরশাদ করেছেন- اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তার বন্দেগীর জন্যে তৌফিক দান করেন, যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন, যারা আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট এবং একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবো না।

ইবলিসের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত : বর্ণিত আছে, একবার ইবলিস হযরত গাওসুল আজব শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (র.) -এর নিকট অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র আকৃতি ধারণ করে হাজির হয়ে বলে, হযরত! আমি একজন ফেরেশতা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার বন্দেগীতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, এখন আর আপনার কোনো গুনাহ নেই। যেহেতু নবী ব্যতীত কোনো মানুষ নিষ্পাপ নন, তাই হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) মনে করলেন এ হলো ইবলিস শয়তান, আমাকে প্রতারণার জন্যে হাজির হয়েছে। তাই তিনি পাঠ করলেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম" এ দোয়াটি ইবলীসের ক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্রের ন্যায় কার্যকর হয়।

এ দোয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ইবলিস পলায়নে বাধ্য হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত ইবলিস পলায়নপর অবস্থাতেও হযরত শেখ জিলানী (র.)-কে পুনরায় ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করলো। তার গৃহ দ্বারের বাইরে গিয়ে সে পুনরায় বলে হযরত! আমি অনেক বুজুর্গকে এভাবে প্রতারণা করেছি, কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমি ব্যর্থ হলাম, কেননা আপনি অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম, আপনার ইলমের কারণেই আজ আমি ব্যর্থ হলাম। তখন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) উপলব্ধি করলেন, এটিও ইবলিস শয়তানের আরেকটি চাল, আমি যেন আমার ইলমের কারণে অহংকারী হই তাই সে চায়, তখন তিনি বললেন, হে মিথ্যাবাদী ইবলিস! আমার ইলমের কারণে নয়, বরং শুধু আল্লাহ তা'আলার রহমতেই তোর ধোকা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি।

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.)-এর ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিখ্যাত তাফসীরকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর এক হাজার দলিল পেশ করতেন। একবার তিনি বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (র.)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা নিলেন। হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (র.) তাকে বললেন, আপনাকে কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করতে হবে। ইমাম রাযী (র.) তা নিকট কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি পীর ও মুর্শেদকে বললেন, হযরত! আমার ইলম চলে যাচ্ছে। আমি অনেক কথা ভুলে যাচ্ছি। তখন অক্লান্ত সাধনা এবং কঠোর পরিশ্রমের পর আমি এ ইলম হাসিল করেছিলাম। তখন হযরত নাজমুদ্দিন কোবরা (র.) বললেন, আপনার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর সবকিছু থেকে মুক্ত করতে হবে। শুধু এতাবেই আপনার দিলকে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হবে। ইমাম রাযী (র.) বললেন, হযরত! সারা জীবনের কঠোর সাধনালব্ধ এই ইলম হারাতে আমার বড় কষ্ট হয়, আধ্যাত্মিক সাধনার এই মহান কাজ আপাততঃ মুলতবি থাকুক। কিছুদিন পরই ইমাম রাযী (র.)-এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘণিয়ে এলো। ইবলিস শয়তান তাকে প্রতারিত করতে উপস্থিত হলো। ইমাম রাযী (র.) আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর একে একে এক হাজার দলিল উপস্থাপন করলেন। ইবলিস শয়তান তাঁর পেশকৃত প্রত্যেকটি দলিল খণ্ডন করলো। তখন ইমাম রাযী (র.)-এর বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এই সংকটজনক অবস্থায় কাশফ হলো হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রা.)-এর তিনি তখন অজু করেছিলেন। পানির পাত্রটি ইবলিস শয়তাতের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে ইমাম রাযী (র.)-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'বল, কোনো দলিল ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা এক, তার কোনো শরিক নেই, এর উপর আমার ঈমান রয়েছে, তোমাকে দলিল দেওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ইমাম রাযী (র.) যখন একথা বললেন, তখন ইবলিস শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এবং পছন্দনীয় বান্দাগণ তার বিশেষ রহমতে ইবলিস শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনে একথাই ঘোষণা করেছে- قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ তবে এটি সত্য, আর আমি সত্য কথাই বলছি। অর্থাৎ আমার কথা সত্য, আর আমি সত্যই বলে থাকি। হে ইবলিস! তুই এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি দোজখকে পরিপূর্ণ করে দেবো।

এ ঘোষণা শ্রবণের পর বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা, প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তার পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়া, ইবলিস শয়তানের অনুগামী না হওয়া।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেউ যদি ঈমান না আনে, তবে হে রাসূল! আপনার কর্তব্য হলো, সুস্পষ্ট ভাষায় একটি কথা ঘোষণা করা, আর তা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ. অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

অর্থাৎ আমি যে তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্য আহ্বান করছি অথবা তোমাদের নিকট পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই, আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিকও চাই না, আমি কোনো মিথ্যা কথার দাবিদারও নই। বরং আমি সত্য নবী আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে যে পথ নির্দেশ আসে তা আমি মানুষকে জানিয়ে দেই।

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমাদেরকে বানানো কথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মাসরুক (র.) বলেছেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম, তিনি বলেছেন, যদি কেউ কোনো কথা জানে তবে তা যেন বলে দেয়, আর যদি না জানে তবে বলা উচিত আল্লাহ তা'আলা জানেন, এর বেশি নিজের তরফ থেকে কোনো কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়।

এ আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশ মাত্র যা আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ওহী স্বরূপ অবতীর্ণ হয়, আর আমি তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দেই, আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পবিত্র কুরআনের মহামূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করলে, তোমাদেরই উপকার হবে, এতেই রয়েছে তোমাদের জীবন সাধনার সার্থকতা, সার্বিক কল্যাণ। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ কর, আমার অনুসরণ কর, এটিই সরল সঠিক পথ।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ এবং অচিরেই তোমরা এর ইতিবৃত্ত জানতে পারবে অর্থাৎ যদি তোমরা পবিত্র কুরআনের বাণী এবং আমার আহ্বানের সত্যতা উপলব্ধি করতে না পার তবে মনে রেখো, অদূর ভবিষ্যতে এর সত্যতা তোমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

প্রশ্ন হলো, কবে কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষ ইসলামের সত্যতা, পবিত্র কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করবে।

আর হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে এ সত্য উপলব্ধি করবে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুই কিয়ামত, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন সবই সত্য, আর হযরত হাসান বসরী (র.) এ ব্যাখ্যাই করেছেন। সুদ্দী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা বদরের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ বদরের দিন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর কথাই সত্য, কেননা আল্লাহ তা'আলা সেদিন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্যপন্থিদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং বাতিল-পন্থিদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৩৯-১৪০, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৫৫]
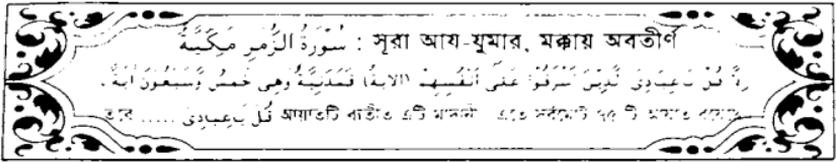
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمِ فِىْ صُنْعِهِ ـ

٢. اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلْنَا فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ اَىْ مُوَحِّدًا لَّهُ ـ

٣. اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط لَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ الْاَصْنَامَ اَوْلِيَآءَ م وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ قَالُوْا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط قُرْبٰى مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى تَقْرِيْبًا اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ فَيُدْخِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ وَالْكَافِرِيْنَ النَّارَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ فِىْ نِسْبَةِ الْوَلَدِ اِلَيْهِ كَفَّارٌ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ ـ

অনুবাদ :

১. কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, তার রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তার কর্মে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে اَلْقُرْاٰنِ মুবতাদা ও مِنَ اللّٰهِ খবর।

২. হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনার প্রতি ও কিতাব যথার্থরূপে নাজিল করেছি। অতএব আপনি শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে অর্থাৎ তাওহীদের বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করুন। بِالْحَقِّ টি اَنْزَلْنَا -এর সাথে সম্পর্কিত।

৩. জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর হকদার নয় যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে মূর্তিসমূহ উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে তারা মক্কার কাফেরগণ এবং তারা বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করে দেয়। زُلْفٰى শব্দটি تَقْرِيْبًا -এর অর্থে মাসদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় বিষয়ে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। অতএব মুসলমানদেরকে জান্নাতে ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী আল্লাহর দিকে সন্তানের নিসবত করে কাফেরকে যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٤. لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا كَمَا قَالُوْا اِتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاتَّخَذُوْهُ وَلَدًا غَيْرَ مَنْ قَالُوْا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ بَنَاتُ اللّٰهِ وَعُزَيْرٌ بْنُ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحُ بْنُ اللّٰهِ سُبْحٰنَهٗ ط تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنِ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِخَلْقِهٖ ـ

৪. আল্লাহ তা'আলা যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, যেমন কাফেররা বলে রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন তবে তার সৃষ্টির মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন অর্থাৎ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতেন, তাদেরকে ব্যতীত যাদের ব্যাপারে কাফেররা বলে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা এবং হযরত উযাইর ও ঈসা আল্লাহর পুত্র। তিনি পবিত্র অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা গ্রহণ করা থেকে পবিত্র তিনি আল্লাহ এক, পরাক্রমশালী। তার সৃষ্টের প্রতি।

٥. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ يُكَوِّرُ يُدْخِلُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ فَيَزِيْدُ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ يُدْخِلُهٗ عَلَى اللَّيْلِ فَيَزِيْدُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِيْ فِيْ فُلْكِهٖ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهِ الْمُنْتَقِمُ مِنْ اَعْدَائِهِ الْغَفَّارُ لِاَوْلِيَائِهٖ ـ

৫. তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। بِالْحَقِّ টি خَلَقَ -এর সাথে সম্পর্কিত। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন ফলে দিবস দীর্ঘ হয় এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন ফলে রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই তার কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়কাল কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিচরণ করে। জেনে রাখুন, তিনি তার নির্দেশে পরাক্রমশালী তার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও তার বন্ধুদের প্রতি ক্ষমাশীল।

٦. خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ اَىْ اٰدَمَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالضَّاْنِ وَالْمَعْزِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط مِنْ كُلٍّ زَوْجَانِ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى كَمَا بُيِّنَ فِىْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ اَىْ نُطَفًا ثُمَّ عَلَقًا ثُمَّ مُضَغًا فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ـ

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে অতঃপর তা থেকে তার যুগল হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু অর্থাৎ উট, গাভী, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি। থেকে আট জোড়া অবতীর্ণ করেছেন। প্রত্যেকটির মধ্যে নর-নারী করে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন সূরায়ে আনআমে বর্ণিত তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক অর্থাৎ এক ফোটা বীর্য অতঃপর জমাট রক্ত অতঃপর এক টুকরো গোশত ত্রিবিধ অন্ধকারে।

هِيَ ظُلْمَةُ الْبَطْنِ وَظُلْمَةُ الرَّحِمِ وَظُلْمَةُ الْمَشِيْمَةِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج فَأَنّٰى تُصْرَفُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ إِلٰى عِبَادَةِ غَيْرِهِ.

অর্থাৎ পেট, রেহেম ও সন্তানের থলির অন্ধকার তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত থেকে ফিরে অন্যের ইবাদতে কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

٧. إِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قف وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ وَإِنْ تَشْكُرُوا اللّٰهَ فَتُؤْمِنُوْا يَرْضَهُ بِسُكُوْنِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا مَعَ إِشْبَاعٍ وَدُوْنَهُ أَيِ الشُّكْرَ لَكُمْ ط وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ وِزْرَ نَفْسٍ أُخْرٰى ط أَيْ لَا تَحْمِلُهُ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ.

৭. যদি তোমরা কুফরি কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরকে পছন্দ করেন না। যদিও তাদের অনেকে কুফরের ইচ্ছা করেছে। পক্ষান্তরে তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ হও অতঃপর ঈমান আন তবে তিনি তোমাদের জন্য তা শুকর পছন্দ করেন। يَرْضَهُ -এর ه সর্বনামে সাকিন ও ইশবা -এর সাথে পেশ হবে। একের পাপের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।

٨. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ أَيِ الْكَافِرَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ تَضَرَّعَ مُنِيْبًا رَاجِعًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً أَعْطَاهُ إِنْعَامًا مِنْهُ نَسِيَ تَرَكَ مَا كَانَ يَدْعُوْا يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَهُوَ اللّٰهُ فَمَا فِيْ مَوْضِعِ مَنْ وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ لِيُضِلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيْلِهِ دِيْنِ الْإِسْلَامِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ن بَقِيَّةَ أَجَلِكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ.

৮. যখন মানুষকে কাফেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে অতঃপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা ভুলে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায় مَنْ -এর স্থলে مَا হবে এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে, যাতে করে অপরকে আল্লাহ তা'আলার পথ ইসলাম ধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করে। لِيُضِلَّ -এর ى -এর মধ্যে যবর ও পেশ উভয়টা পড়া যাবে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল তোমার অবশিষ্ট জিন্দেগী জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই পরিশেষে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

أَمَّنْ بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ هُوَ قَانِتٌ قَائِمٌ بِوَظَائِفِ الطَّاعَاتِ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاعَاتِهِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا فِي الصَّلٰوةِ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ أَيْ يَخَافُ عَذَابَهَا وَيَرْجُوا رَحْمَةَ جَنَّةِ رَبِّهِ ط كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكُفْرِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ أَمْ مَّنْ فَأَمْ بِمَعْنٰى بَلْ وَالْهَمْزَةُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط أَيْ لَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا لَا يَسْتَوِي الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কর্মে লিপ্ত থেকে রুকু সেজদায় তথা নামাজে লিপ্ত থাকে, যে অবস্থায় সে পরকালের আজাব থেকে ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমত জান্নাতের প্রত্যাশা করে। সে কি তার সমান যে কুফর ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করে। أَمَّنْ -এর মীম তাশদীদ বিহীন এবং অন্য কেরাত মতে أَمْ مَنْ এবং أَمْ অর্থ بَلْ ও হামযা। বলুন, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সমান হতে পারে না। যেমন আলেম ও জাহেল সমান হতে পারে না। নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

তাহকীক ও তারকীব

এই সূরারনাম সূরায়ে যুমার। زُمَرٌ শব্দটি زُمْرَةٌ -এর বহুবচন, এর অর্থ জামাত। এই সূরাকে غُرَفٌ ও বলা হয়। এই দুই শব্দই যেহেতু এই সূরায় এসেছে তাই এটা إِسْمُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। زُمَرٌ শব্দটি وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا এবং وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং غُرَفٌ শব্দটি لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ -এর মধ্যে يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ হতে তিন আয়াত পর্যন্ত মদনী। কেউ কেউ এখান থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত মদনী বলেছেন।

قَوْلُهُ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ : এটা উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। অর্থাৎ هُوَ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ এবং বলা হয়েছে যে, এটা মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর جَارْ مَجْرُوْرْ টা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে মুবতাদার খবরর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَنْزِيْلٌ كَائِنٌ مِنَ اللّٰهِ

ফাররা ও কিসায়ী উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْبٌ ও বলেছেন। অর্থাৎ اِقْرَءُوْا تَنْزِيْلَ الْكِتَابِ অথবা اِتَّبِعُوْا تَنْزِيْلَ الْكِتَابِ এবং ফাররা إِغْرَاءٌ -এর ভিত্তিতেও نَصَبٌ বৈধ বলেছেন অর্থাৎ اَلْزَمُوْا تَنْزِيْلَ الْكِتَابِ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ)

قَوْلُهُ مُخْلِصًا : এটা أَعْبُدُ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ زُلْفٰى : এটা يُقَرِّبُوْنَ -এর مَصْدَرٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِ হয়েছে। মূলে يُزْلِفُوْنَ زُلْفٰى ছিল أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا -এর মতো مَصْدَرٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ يُكَوِّرُ : এটা تَكْوِيْرٌ মাসদার হতে اَللَّفُّ . اَللَّيُّ তথা পেচানো, ভাজ করা অর্থে হয়েছে। বলা হয় كَارَ الْعِمَامَةَ عَلٰى رَأْسِهٖ وَكَوَّرَهَا মাথার পাগড়ি পেচিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কুফরির উপর সন্তুষ্ট নন। যদিও কুফরের অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো إِرَادَةٌ এবং مَشِيَّتٌ অস্তিত্বে আসতে পারে না। আর إِرَادَةٌ-এর জন্য رِضَا আবশ্যক নয়। যেমন অকামনীয় কোনো কাজ করার মধ্যে إِرَادَة তো থাকে কিন্তু রেজামন্দি থাকে না।

قَوْلُهُ يَرْضَهُ : مَا যমীরের مَرْجِع হলো شُكْر যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার শোকর কর তবে তিনি তোমাদের শোকরের কারণে খুশি হবেন। يَرْضَهُ মূলে ছিল يَرْضَاهُ শর্তের جَزَاءٌ হওয়ার কারণে أَلِف পড়ে গেছে। يَرْضَهْ-এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে। اَلْإِشْبَاعُ [টেনে] সহ পেশ দিয়ে, اَلْإِشْبَاعُ বিহীন পেশ দিয়ে, هَاءٌ-এর سُكُوْنٌ-এর সাথে।

قَوْلُهُ أَيِ الشُّكْرُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يَرْضَهُ-এর ضَمِيْر مَفْعُوْلِيْ-এর مَرْجِعْ নির্দিষ্ট করা। আর يَرْضَهُ-এর ফায়েল হলো اَللّٰهُ।

قَوْلُهُ خَوَّلَهُ : এটা বাবে تَفْعِيْل-এর تَخْوِيْل মাসদার হতে مَاضِيْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থ- তাকে দান করেছেন, মালিক বানিয়েছেন। مِنْهُ-এর যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ تَرَكَ : نَسِيَ-এর তাফসীর تَرَكَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نِسْيَانٌ-এর لَازِمِيْ অর্থ উদ্দেশ্য। تَرَكَ টা مُؤَاخَذَةٌ-এর জন্য আবশ্যক। আর এ কারণে لَازِمِيْ অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে যে, نِسْيَانٌ-এর উপর مُؤَاخَذَةٌ নেই। প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ

قَوْلُهُ مَا كَانَ يَدْعُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ : مَا-এর মধ্যে তিনটি সুরত বৈধ।

১. مَا টা مَوْصُوْلَةٌ যা اَلَّذِيْ অর্থে আর اَلَّذِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ضَرٌّ [কষ্ট] অর্থাৎ نَسِيَ الضُّرَّ الَّذِيْ كَانَ يَدْعُوْ إِلَى كَشْفِهِ অর্থাৎ আমাদের উহার উপর পুরস্কার দেওয়া এবং তার কষ্ট দূর করার পর সে ঐ تَكَلُّفْ [কষ্ট] কে ভুলে গেছে, যার দূর করার দোয়া করতে ছিল।

২. مَا টা اَلَّذِيْ অর্থে, উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ نَسِيَ الَّذِيْ كَانَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ তথা কষ্ট দূর হওয়ার পর ঐ সত্তাকে ভুলে গেছে যার থেকে কষ্ট দূর করার দোয়া করতে ছিল। কিন্তু এটা তাদের নিকট বৈধ যারা مَا-এর প্রয়োগ ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর জন্য জায়েজ মনে করেন।

৩. مَا টা হলো مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ نَسِيَ كَوْنَهُ دَاعِيًا তথা মসিবত দূর হওয়ার পর সে এটাও ভুলে গেছে যে, আমি কোনো সময় দায়ী ছিলাম।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ : অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ تَخْوِيْلِ النِّعْمَةِ

قَوْلُهُ وَهُوَ اللّٰهُ : মুফাসসির (র.) এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তার নিকট দ্বিতীয় সুরত পছন্দনীয়।

قَوْلُهُ قَانِتٌ : এটা قُنُوْتٌ মাসদার থেকে إِسْمُ فَاعِلٍ অর্থ আনুগত্যের ওয়াযীফা আদায়কারী, বিনয়ী, অনুগত।

قَوْلُهُ إِنَاءٌ : এটা أَنِيٌّ-এর বহুবচন। অর্থ- সময়।

قَوْلُهُ أَمَّنْ : أَمْ টা مُتَّصِلَةٌ ও হতে পারে তার مُقَابِلْ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَلْكَافِرُ خَيْرٌ أَمِ الَّذِيْ قَانِتٌ হামযাটা مَنْ مَوْصُوْلَةٌ-এর উপর প্রবেশ করেছে। مِيْم কে مِيْم-এর মধ্যে إِدْغَامْ করে দেওয়া হয়েছে। অথবা أَم টি مُنْقَطِعَةٌ-এর উহ্য হবে بَلْ হামযার সাথে অর্থাৎ بَلْ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كَغَيْرِهِ এবং تَخْفِيْف-এর সাথেও পড়া হয়েছে। এই সুরতে হামযাটা إِسْتِفْهَامْ إِنْكَارِيْ হবে।

قَوْلُهُ كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِكُفْرِهِ وَغَيْرِهِ : এখান থেকে শারেহ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ-এর مُقَابِل-কে বর্ণনা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে যুমার প্রসঙ্গে :

এ সূরায় ৮ রুকু, ৭৫ আয়াত রয়েছে। তিনটি আয়াত ব্যতীত অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ১,১৯২টি বাক্য ও ৪০০০ অক্ষর রয়েছে। –[তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃ. ৩৮৫]

নামকরণ :

সূরায়ে যুমারের আরো একটি নাম হলো 'সূরাতুল গোরাফ'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে, তবে হযরত হামযা (আ.)-এ হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে যে তিনটি আয়াত রয়েছে, তা মদীনায়ে মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৩, পৃ. ২৩২]

এ সূরার ফজিলত :

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে বাকারা এবং সূরায়ে যুমার তেলাওয়াত করতেন। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ২৩, পৃ. ৭৫]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রেসালাত সম্পর্কীয় ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তৌহিদ সম্পর্কে রয়েছে। যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে। তাদের জন্যে পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলঙ্ক শিরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়ার কথা ঘেষণা করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.), খ. ৬, পৃ. ৫৮-৫৯]

قَوْلُهُ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ : دِيْن শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খাঁটি করুন, যাতে শিকর, রিয়া ও নাম যশের ন্যামগন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত অথবা কারো প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরিক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণস্বরূপ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। –[কুরতুবী]

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল গৃহীত হয় : কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমলের হিসাব গণণা দ্বারা নয় ওজন দ্বারা হয়ে থাকে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং উল্লিখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোনো ইবাদত ও আনুগত্য অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

যে সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۤءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى : এ হলো আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখতো যে, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সবকিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের আকার-আকৃতিতে মূর্তি বিগ্রহ তৈরি করলো। অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানতো যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোনো বুদ্ধি জ্ঞান, চেতনা চৈতন্য ও শক্তি বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের দরবারের মতোই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারো প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করতো, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানি, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতি অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোনো বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কুরআনি আয়াতের অর্থ তাই–

كَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى ‎.

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফেরদের চেয়ে উত্তম ছিল : বর্তমান যুগের বস্তুবাদি কাফেররা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্ন ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম রয়েছে কিন্তু সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধিরও এতো আধিক্য যা পূর্বে কোনোকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফেরের জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ কৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বৈ কি। যে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করা অন্ধ কৃতজ্ঞতা নয় কি? در میان خانه که گم کردیم صاحب خانه را অর্থাৎ আমরা গৃহ্যভ্যন্তরে গৃহ স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।

قَوْلُهُ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا : যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন কল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান হতো তবে তা তার ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা জবরদস্তি সন্তান তার উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তার সৃষ্ট, অতএব তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

قَوْلُهُ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ : تَكْوِيْر -এর অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কুরআন পাক দিবরাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تَكْوِيْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যে যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল : كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কুরআন পাক অথবা যে কোনো আসমানি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোনো বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরজ। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়। কিন্তু কুরআন পাকের তথ্যাবলি অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কুরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

قَوْلُهُ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ : আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিতে اَنْزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাজিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোরও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কুরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে- اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে- وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ : এতে মানব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেন নি; বরং خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণত শিল্পীর মতো একাজ কোনো খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না; বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না।

قَوْلُهُ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোনো ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না। -[ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رِضَاءٌ শব্দের অর্থ মহব্বত করা আপত্তি ব্যতিরেকে কোনো কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سَخَطٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোনো কিছুকে অপছন্দ করা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো কাজ অথবা কোনো মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভালো কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি

পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নদভী (র.) 'উসূল ও যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন-

مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ الْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ وَإِثْبَاتُهُ وَإِنَّ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدْرِهِ وَهُوَ مُرِيْدٌ لَهَا كُلِّهَا وَيَكْرَهُ الْمَعَاصِيْ مَعَ أَنَّهُ تَعَالٰى مُرِيْدٌ لَهَا لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا جَلَّ وَعَلَا .

সত্যপন্থিদের মাযহাব তাকদীরে বিশ্বাস করা। আরো এই যে, ভালো-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও তাকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোনো উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনিই জানেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ : এই বাক্যের পূর্বে কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে أَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তাফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফেরকে বলা হবে- তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَانِتٌ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন- قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাজে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোনো অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোনো বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থি নয়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ : -এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়কেও آنَاءَ اللَّيْلِ বলেছেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারতো যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তো সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জবাব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোনো স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ :

١٠. قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ط اَىْ عَذَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا بِالطَّاعَةِ حَسَنَةٌ ط وَهِىَ الْجَنَّةُ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ط فَهَاجِرُوْا اِلَيْهَا مِنْ بَيْنِ الْكُفَّارِ وَمُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرَاتِ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَمَا يُبْتَلَوْنَ بِهِ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ مِكْيَالٍ وَلاَ مِيْزَانٍ.

১০. বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে আজাবকে ভয় কর। অর্থাৎ তার অনুসরণ কর যারা এ দুনিয়াতে আনুগত্যের মাধ্যমে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য জান্নাত। আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব কাফেরদের থেকে ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে অন্য এলাকায় হিজরত কর। নিশ্চয়ই যারা আনুগত্যের উপর ও তাদের প্রতি নাজিলকৃত বিভিন্ন মসিবতের উপর সবরকারী তাদের পুরস্কার অগণিত। ওজন করা ব্যতীত।

١١. قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ.

১১. বলুন, আমি শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।

١٢. وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَىْ بِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ.

১২. আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্যে।

١٣. قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

১৩. বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।

١٤. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِىْ مِنَ الشِّرْكِ.

১৪. বলুন, আমি শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করি।

١٥. فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ ط غَيْرِهِ فِيْهِ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ وَاِيْذَانٌ بِاَنَّهُ لاَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِتَخْلِيْدِ الْاَنْفُسِ فِى النَّارِ وَبِعَدَمِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْحُوْرِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِى الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنُوْا اَلاَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ.

১৫. অতএব তোমরা আমার পালনকর্তার পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। এটা তাদের প্রতি ধমকমূলক ও তারা যে আল্লাহর ইবাদত করে না তা ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নিজেদেরকে আজীবনের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ও জান্নাতে সজ্জিত হুরসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। যদি তারা ঈমান আনতো এসব নিয়ামত তারা অর্জন করতো জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

١٦. لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ طِبَاقٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ط مِنَ النَّارِ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهُ ط اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَتَّقُوْهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ.

১৬. তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ঈমানদারদেরকে সতর্ক করেন যেন তারা ভয় করে। যার দিকে পরবর্তী বাক্য ইঙ্গিত করে হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।

١٧. وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ الْاَوْثَانَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اَقْبَلُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج بِالْجَنَّةِ فَبَشِّرْ عِبَادِ.

১৭. যারা শয়তানি শক্তির মূর্তিসমূহের পূজা অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।

١٨. اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ط وَهُوَ مَا فِيْهِ صَلَاحُهُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

১৮. যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম যাতে তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান জ্ঞানী।

١٩. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط اَىْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ تُخْرِجُ مَنْ فِى النَّارِ جَوَابُ الشَّرْطِ وَاُقِيْمَ فِيْهِ الظَّاهِرُ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ وَالْمَعْنٰى لَا تَقْدِرُ عَلٰى هِدَايَتِهٖ فَتُنْقِذُهُ مِنَ النَّارِ.

১৯. যার জন্য শাস্তির বাণী অর্থাৎ কুরআনের বাণী নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? اَفَاَنْتَ الخ জওয়াবে শর্ত এবং এতে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য ইসিম আনা হয়েছে এবং হামযা অস্বীকারের জন্য। আর আয়াতের অর্থ হলো, আপনি তাদের হেদায়েতের শক্তি রাখেন না যাতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

٢٠. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِاَنْ اَطَاعُوْهُ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اَىْ مِنْ تَحْتِ الْغُرَفِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَعْدَ اللّٰهِ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ وَعْدَهُ.

২০. কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, অর্থাৎ তার অনুসরণ করে তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। অর্থাৎ উপর ও নিচের উভয় প্রাসাদের নিচে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। وَعْدَ اللّٰهِ উহ্য ফে'ল দ্বারা নসব বিশিষ্ট আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

২১. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ اَدْخَلَهُ اَمْكِنَةَ نَبْعٍ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ ط يَيْبَسُ فَتَرٰىهُ بَعْدَ الْخُضْرَةِ مَثَلًا مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ط فُتَاتًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى تَذْكِيْرًا لِاُولِى الْاَلْبَابِ يَتَذَكَّرُوْنَ بِهٖ لِدَلَالَتِهٖ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقُدْرَتِهٖ.

২১. তুমি কি দেখনি জাননা যে আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি জমিনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তদ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন। অতঃপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তোমরা তা সবুজ রঙের পর হলদে রঙের মতো দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে খড় কুঠায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানের জন্যে উপদেশ রয়েছে। যাতে তারা এটা থেকে নসিহত গ্রহণ করে। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও কুদরতের উপর প্রমাণ বহন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ : এটা تَتَّقُوْا -এর তাফসীর।

قَوْلُهٗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا : এটা جُمْلَةٌ হয়ে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে আর حَسَنَةٌ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهٗ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : এটা মুবতাদা এবং খবর হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَاعْبُدُوْا টা اَمْرُ تَهْدِيْدٍ অর্থাৎ ধমকির জন্য হয়েছে طَلَبُ فِعْلٍ -এর জন্য নয়।

قَوْلُهٗ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ : لَهُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর مِنْ فَوْقِهِمْ হলো حَالٌ আর ظُلَلٌ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهٗ طِبَاقٌ : অর্থাৎ قِطَعٌ كِبَارٌ তথা বড় বড় টুকরা। আগুনের বড় বড় স্ফুলিঙ্গের উপর ظُلَلٌ -এর প্রয়োগ বিদ্রূপাকারে হয়ে থাকে। অন্যথায় তো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে ছায়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ظُلَلٌ শব্দটি ظُلَّةٌ -এর বহুবচন অর্থ ছায়াদার।

قَوْلُهٗ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ : প্রশ্ন. ছায়াদারের উপরে হওয়া বুঝে আসে, তবে ছায়াদারের নিচে হওয়া বুঝে আসে না।

উত্তর. এই সুরত এই হবে যে, যদি উপরের طَبَقَةٌ -এর জন্য فَرْشٌ হয় তবে নিচের তবকার জন্য ছায়াদার হবে। যেমন- বহুতল বিশিষ্ট ইমারতের মধ্যে ছাদ একদলের জন্য فَرْشٌ হয় এবং অন্য দলের জন্য ছাদ হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ تَخْوِيْفٌ : অর্থাৎ تَخْوِيْفُ الْمُؤْمِنِيْنَ এখানে ذٰلِكَ -এর مَرْجِعٌ হলো ذِكْرُ اَحْوَالِ اَهْلِ النَّارِ تَخْوِيْفُ اَهْلِ النَّارِ ذِكْرُ اَحْوَالِ اَهْلِ النَّارِ

قَوْلُهٗ الْاَوْثَانُ : طَاغُوْتٌ -এর কয়েকটি ব্যাখ্যার মধ্যে এটাও একটি। কেউ কেউ طَاغُوْتٌ দ্বারা শয়তান উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেউ কেউ প্রত্যেক সেই مَعْبُوْدٌ কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার উপাসনা করা হয়।

قَوْلُهُ اَقِيْمَ فِيْهِ الظَّاهِرُ مَقَامَ الْمُضْمَرِ : অর্থাৎ مَنْ فِى النَّارِ টা اِسْمُ ضَمِيْرٍ -এর স্থানে রয়েছে। আর এরূপ বৃদ্ধি شَنَاعَتْ কে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। যাতে করে তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যথায় اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ যথেষ্ট ছিল اَفَاَنْتَ -এর মধ্যে হামযাটি اِنْكَارٌ -এর জন্য হয়েছে। আর اَفَاَنْتَ হলো اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ -এর জবাব : হামযাকে পুনরায় আনা হয়েছে اِنْكَارٌ -এর তাকিদের জন্য।

قَوْلُهُ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ : জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে এই উক্তি সেই কথার মোকাবিলায় হয়েছে যা জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহর বাণী لَهُمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

قَوْلُهُ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ : এর উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, وَعَدَهُمُ اللّٰهُ وَعْدًا অর্থাৎ وَعْدًا -এর نَصَبْ দানকারী ফে'ল হলো وَعَدَ উহ্য ফে'ল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ : بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ সবরকারীদের ছওয়াব কোনো নির্ধারিত পরিমাণে নয় অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بِغَيْرِ حِسَابٍ -এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারো কাছে কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের ছওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ ছওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর বালা-মসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোনো ওজন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত ছওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে, হায়! দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতে صَابِرِيْنَ -এর অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صَابِرُوْنَ বলা হয়েছে। কুরতুবী (র.) বলেন, صَابِرٌ শব্দকে অন্য কোনো শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয়– صَابِرٌ عَلٰى كَذَا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী।

قَوْلُهُ قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনে অত্যাচারিত উৎপীড়িত হয়ে সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অগণিত ছওয়াব দান করবেন। আর তা করবেন আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের কারণে। এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন শুধু এক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে একনিষ্ঠভাবে তার বন্দেগী করি, তার বন্দেগীতে কোনো কিছুকে শরিক না করি, আর আমার প্রতি এ আদেশও হয়েছে যেন আমি সর্বপ্রথম মুসলমান হই।

শানে নুযূল : তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলল, আপনি কি কারণে আমাদের নিকট এই নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আপনি কি দেখেননি আপনার পূর্ব পুরুষরা লাত, উজ্জা নামক মূর্তির পূজা করতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ . وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ . অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদত করার জন্যে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে, যেন আমি সর্বপ্রথম মুসলমান হই।

আলোচ্য আয়াতসমূহে দুটি আদেশের উল্লেখ রয়েছে– ১. মুসলমান হিসেবে শুধু এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করা এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করা। ২. আর দ্বিতীয় আদেশ হলো. নবী হিসেবে সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়া। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করেন, আর তা তখনই সম্ভব, যখন সর্বপ্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ আয়াতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের আদেশ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সে ইবাদত হতে হবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার শিরক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাতে লোক দেখানোর তথা রিয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সমগ্র উম্মতকে সতর্ক করা হয়েছে। তৃতীয়ত প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি এ আদেশও হয়েছে যেন তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি, যাতে করে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ আমার আনুগত্যের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে। আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগি এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য চাই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ভয়। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি, তবে আমি এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

কেননা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে কেউ নাজাত পায় না, তাই আমি আল্লাহ তা'আলার কঠিন আজাবকে ভয় করি।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত তখন নাজিল হয়েছে, যখন কাফেরদের তরফ থেকে প্রিয়নবী ﷺ -কে তাঁর পিতা-পিতামহের ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। তখন তাদের কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ . فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ [হে রাসূল ﷺ !] আপনি বলুন, আমি এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করি, তার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ট রেখে। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্থলে যার ইচ্ছা তার বন্দেগি কর।

ইতিপূর্বে শুধু এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করার আদেশ হয়েছিল, আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল ﷺ ! আপনি কাফেরদের একথা জানিয়ে দেন যে, আমি শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করি, আর কারো নয়। তোমরা যার ইচ্ছা তার পূজা কর, তবে এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন এবং যিনি আমাকে তাঁর নবী মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের নিকট পথ প্রদর্শক, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি শুধু তারই বন্দেগি করি, একনিষ্ঠভাবে তার বন্দেগি করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ এবং পরিপূর্ণ সাফল্য। যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া না দাও, সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হও সত্যকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাক, তবে তার পরিণতিতে যে আজাব আসবে, তা ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাক।

قَوْلُهٗ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন যারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে বাঁচাতে পারবেনা, তারাই হবে প্রকৃত সর্বহারা।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে এবং তার পরিবারবর্গের জন্যে জান্নাতে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যদি বান্দা ঈমানদার ও নেককার হয়, তবে সে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানই লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি বান্দা বেঈমান হয়, তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি অন্য কোনো মুমিনকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, সেদিন সে হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত।

অন্য একখানা হাদীসে একথাও বর্ণিত আছে যে, ঐ ব্যক্তিকে দোজখের সে স্থানটিও দেখিয়ে দেওয়া হবে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার ঈমান ও নেক আমলের বরকতে নাজাত দিয়েছেন। এমনিভাবে যাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে তাকে জান্নাতে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দেওয়া হবে, যা সে বেঈমানী ও নাফরমানির কারণে হারিয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ : অর্থাৎ জেনে রাখ এটিই সুস্পষ্ট সর্বনাশ। দুনিয়াতে যদি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাময়িক কিন্তু আখেরাতের সুখ যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি দুঃখও চিরস্থায়ী। যারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা চির দুঃখী হয়, এজন্যেই এক সাহাবী প্রিয়নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কে? তিনি ইরশাদ করেছেন, যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং আখেরাতের জন্যে অধিকতর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর আখেরাতের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যে সুস্পষ্ট সর্বনাশ এবং মহাবিপদ তার বিবরণ স্থান পেয়েছে পরবর্তী আয়াতে- لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ অর্থাৎ তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচেও থাকবে আগুনের আচ্ছাদন, এককথায় উপরে নিচে চতুর্দিক থেকে আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোজখের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা ভোগ করতে থাকবে। ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই এ ভয়াবহ আজাব সম্পর্কে তার বান্দাদেরকে সাবধান করে বলেছেন- يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।' অর্থাৎ এমন কাজ থেকে বিরত থাক, যা আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এমন অপরাধ করো না, যার শাস্তি অনিবার্য। তোমরা যদি আমাকে ভয় করে জীবন যাপন কর, তবে আমার নাফরমানি তথা পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারবে, আর এভাবেই পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ يَعْبُدُوْهَا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিক মূর্তিপূজক তথা অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, যেখানে কাফেরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় বা তাদের শাস্তির ঘোষণা থাকে, তার পাশাপাশি মু'মিনদের উদ্দেশ্যে পুরস্কারের ঘোষণাও স্থান পায়। তাই এ আয়াতে মু'মিনদের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে, ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ অর্থাৎ আর যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, বর্ণিত আছে যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত জায়েদ ইবনে আমর (রা.) হযরত আবূ যর (রা.) এবং হযরত সালমান ফারসী (রা.) সম্পর্কে। অনেকের মতে এ আয়াত যেভাবে উপরোল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত, ঠিক তেমনিভাবে সকল যুগের সেসব লোকও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে আয়াতে উল্লিখিত গুণাবলি রয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছু থেকে যারা নিজেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে যারা মশগুল থাকে, যারা শয়তানের অনুগামী হয় না, যারা শয়তানের পথ পরিহার করে চলে, যা উত্তম তা গ্রহণ করে, আর যা অন্যায় অনাচার তা বর্জন করে, তাদের ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল, তাদেরও পরিণাম হবে শুভ, তারা আখেরাতে লাভ করবে উচ্চমর্যাদা।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর, পারা, ২৩, পৃ. ৮১]

আলোচ্য আয়াতের طَاغُوْتَ শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ হলো- চরম অবাধ্যতা। এজন্যেই শয়তানকে 'তাগুত' বলা হয়, কেননা সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে, অথচ কেউ শয়তানের পূজা করে না, সেক্ষেত্রে এ কথার তাৎপর্য কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাব দিয়েছেন, যেহেতু ইবলিস শয়তানই মানুষকে মূর্তির পূজা করার দুর্বুদ্ধি যোগায়, আর এটিই হলো আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্যতা, তাই 'তাগুত' শব্দটি দ্বারা ইবলিস শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ আর এ সুসংবাদ দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে এবং মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْ عِبَادِ .... وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ : অর্থাৎ অতএব [হে রাসূল!] আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে এবং যা উত্তম তা মেনে চলে। তারাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

শানে নুযূল : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন একজন আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার সাতটি গোলাম রয়েছে, আমি একেক দ্বারে প্রবেশের জন্যে একটি গোলামকে আজাদ করে দিলাম। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে, এরপর পবিত্র কুরআনের হেদায়েত মেনে চলে, তাদের জন্যেই রয়েছে এ সুসংবাদ।

তাফসীরকার আতা (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবূ বকর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হযরত ওসমান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.), হযরত জোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) সমবেত হয়ে তার নিকট আসলেন এবং তার মুসলমান হবার খবরের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি ঈমান এনেছি, তখন তারা সকলেও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে দুটি সুসংবাদ রয়েছে–

১. যারা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েত নসীব করেন।

২. আর তারাই হলো বুদ্ধিমান, অতএব হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া এবং বুদ্ধিমান হওয়া এ দুটিই হলো সুসংবাদ।

হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের জন্যে প্রযোজ্য। এমনিভাবে বুদ্ধিমান হওয়ার সুসংবাদও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তাফসীরকার ইবনে জায়েদ (র.) বলেছে, এ দু'খানি আয়াত তিন ব্যক্তির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগেও তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা হলেন– ১. হযরত জায়েদ ইবনে আমের ইবনে নুফায়েল (রা.) অথবা সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) ২. হযরত আবূযার গিফারী (রা.) ৩. হযরত সালমান ফারসী (রা.)। আর আয়াতে যে উত্তম কথার উল্লেখ রয়েছে, তা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়কে উত্তম বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-নিষেধ যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে এবং তাতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে, তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং তারাই বুদ্ধিমান।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পবিত্র কুরআনে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অথবা ক্ষমা করার অনুমতি রয়েছে তবে ক্ষমা করাই উত্তম। আলোচ্য আয়াতে উত্তম কথা বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ .... وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ : এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাছীর (র.) কর্তৃক গৃহীত উক্তি এই যে, এখানে قول অর্থ আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন অথবা তৎসহ রাসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিল– يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَهُ কিন্তু এ স্থলে اَحْسَنَ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কুরআন রাসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে আসেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারো কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশ তাদেরকে اُولُو الْاَلْبَابِ তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কুরআনের মধ্যেই তাওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছে– خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا এতেও اَحْسَنَ বলে সমগ্র তাওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমিন قَوْل অর্থ কুরআন এবং اِتِّبَاعُ اَحْسَنَ অর্থ সমগ্র কুরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ বলা হয়েছে। এই তাফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরো বলেন যে, কুরআন পাকেও অনেক حَسَنٌ [ভালো] ও اَحْسَنُ [উত্তম] শ্রেণির বিধান রয়েছে। উদাহরণত

প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েজ, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে- وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অনেক ব্যাপারে কুরআন মানুষকে বৈধ দুটি পন্থার যে কোনো একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে। যেমন- وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কুরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে। কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং اَحْسَنْ ও حَسَنْ শ্রেণির দু'পন্থার মধ্য থেকে اَحْسَنْ -কে অবলম্বন করে।

অনেক তাফসীরবিদ এক্ষেত্রে قَوْل -এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথাবার্তা। এতে তাওহীদ, শিরক, কুফর ও ইসলাম, সত্য মিথ্যা ইত্যাদি সবরকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফের, মু'মিন সত্য মিথ্যা ও ভালো মন্দ নির্বিশেষে সব কথাই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তাওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তাওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দুটি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এক. هَدٰهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। দুই. اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত ভালোমন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবূজর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা.) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। হযরত আবূ যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা.) মুশরিক, ইহুদি খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ : يَنَابِيْعُ শব্দটি يَنْبُوْعٌ -এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্দ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারতো। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাজিল করেই ক্ষান্ত হননি, একে সংরক্ষিত করার জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পঁচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কুরআনে পাকে সূরায়ে মু'মিনুনের فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ : ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই مُخْتَلِفًا শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে حَالْ [বর্তমানকাল বাচক] প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ : অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভুসি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলিল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চিনারও জানার উপায় হতে পারে।

অনুবাদ :

٢٢. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَاهْتَدٰى فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط كَمَنْ طُبِعَ عَلٰى قَلْبِهٖ دَلَّ عَلٰى هٰذَا فَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط اَىْ عَنْ قَبُوْلِ الْقُرْاٰنِ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

২২. আল্লাহ তা'আলার যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অতঃপর সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে তবে সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য দুর্ভোগ যাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার স্মরণে কুরআনের বাণী কবুল করা থেকে কঠোর। وَيْلٌ শব্দটি দুর্ভোগ অর্থবোধক শব্দ। وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ বাক্যটি উহ্য খবর এর উপর প্রমাণ বহন করে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

٢٣. اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا بَدَلٌ مِّنْ اَحْسَنَ اَىْ قُرْاٰنًا مُّتَشَابِهًا اَىْ يُشْبِهُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فِى النَّظْمِ وَغَيْرِهٖ مَّثَانِىَ ثُنِّىَ فِيْهِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيْدُ وَغَيْرُهُمَا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ تَرْتَعِدُ عِنْدَ ذِكْرِ وَعِيْدِهٖ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ تَطْمَئِنُّ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ اَىْ عِنْدَ ذِكْرِ وَعْدِهٖ ذٰلِكَ اَىِ الْكِتَابُ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ .

২৩. আল্লাহ তা'আলা উত্তম বাণী তথা কিতাব অর্থাৎ কুরআন كِتَابًا টি اَحْسَنَ থেকে بَدَل নাজিল করেছেন। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটার অনেক বাক্য শব্দ চয়ন ইত্যাদিতে অনেক বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য পুনরায় পুনরায় পঠিত। অর্থাৎ নিয়ামতের ওয়াদা ও আজাবের ধমকিসমূহ ইত্যাদি বার বার পঠিত এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর যখন তার ধমকির বর্ণনা তুলে ধরা হয় যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। অতঃপর তাদের চামড়া ও অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার স্মরণে বিনম্র হয়। যখন তার নিয়ামতের বর্ণনা হয় এই কিতাবই আল্লাহ তা'আলার পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে গোমরাহ করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

٢٤. اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ يَلْقٰى بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَىْ اَشَدَّهٗ بِاَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ مَغْلُوْلَةً يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهٖ كَمَنْ اٰمَنَ مِنْهُ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ اَىْ جَزَآءَهٗ .

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আজাব অর্থাৎ কঠিনতম আজাব ঠেকাবে অর্থাৎ যাকে তার হাতদ্বয় গর্দানের সাথে বেধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে নিরাপদে রয়েছে এরূপ জালেমদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ পরিণাম আস্বাদন কর।

٢٥. كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلِهِمْ فِي اِتْيَانِ الْعَذَابِ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ مِنْ جِهَةٍ لَا يَخْطِرُ بِبَالِهِمْ.

২৫. তাদের পূর্ববর্তীরাও আজাব আসার ব্যাপারে তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আজাব এমনভাবে আসল যা তারা কল্পনাও করতো না। অর্থাৎ তাদের অন্তরে এর ধারণাও হয়নি।

٢٦. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ الذُّلَّ وَالْهَوَانَ مِنَ الْمَسْخِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م لَوْ كَانُوْا اَيِ الْمُكَذِّبُوْنَ يَعْلَمُوْنَ عَذَابَهَا مَا كَذَّبُوْا.

২৬. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব জীবনে বিকৃতি, হত্যা ইত্যাদির দ্বারা অপমান লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের আজাব হবে আরো গুরুতর যদি তারা মিথ্যাবাদীরা এটার আজাব জানতো; অস্বীকার করতো না।

٢٧. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ.

২৭. আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٨. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ اَيْ لَبْسٍ وَاخْتِلَافٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الْكُفْرَ.

২৮. আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত অর্থাৎ ইখতেলাফ ও ইলতিবাস বিহীন, قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا টি حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ যাতে তারা কুফর থেকে বিরত থাকে।

٢٩. ضَرَبَ اللّٰهُ لِلْمُشْرِكِ وَالْمُوَحِّدِ مَثَلًا رَّجُلًا بَدَلٌ مِنْ مَثَلًا فِيْهِ شُرَكَاۤءُ مُتَشٰكِسُوْنَ مُتَنَازِعُوْنَ سَيِّئَةٌ اَخْلَاقُهُمْ وَرَجُلًا سَلَمًا خَالِصًا لِّرَجُلٍ ط هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ط تَمْيِيْزٌ اَيْ لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِجَمَاعَةٍ وَالْعَبْدُ لِوَاحِدٍ فَاِنَّ الْاَوَّلَ اِذَا طَلَبَ مِنْهُ كُلٌّ مِنْ مَالِكِيْهِ خِدْمَتَهُ فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ تَحَيَّرَ مَنْ يَخْدِمُهُ مِنْهُمْ.

২৯. আল্লাহ মুশরিক ও ঈমানদার এর মধ্যে এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, যারা চরিত্রহীন পরস্পর ঝগড়া করে আরেক ব্যক্তির মালিক মাত্র একজন, তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? একাধিক মালিকানাধীন গোলাম ও একক মালিকানাধীন গোলামের মধ্যে সমান হতে পারে না। কেননা যদি একাধিক মালিক এক সাথে একজন গোলাম হতে খেদমত চায় তখন সেই গোলাম পেরেশান হয়ে পড়বে কার খেদমত করবে?

وَهٰذَا مَثَلُ لِلْمُشْرِكِ وَالثَّانِيْ مَثَلُ لِلْمُوَحِّدِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ط وَحْدَهُ بَلْ اَكْثَرُهُمْ اَهْلُ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ .

এবং এটা মুশরিকদের উদাহরণ ও দ্বিতীয় গোলামটি ঈমানদারের উদাহরণ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর; কিন্তু তাদের মক্কাবাসীর অধিকাংশ জানে না। ঐ আজাবকে যেদিকে তারা ধাবিত হয়, ফলে তারা শিরক করে।

৩০. اِنَّكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ سَتَمُوْتُ وَيَمُوْتُوْنَ فَلَا شَمَاتَةَ بِالْمَوْتِ نَزَلَتْ لَمَّا اسْتَبْطَؤُوْا مَوْتَهُ ﷺ .

৩০. হে নবী ﷺ নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে তাদেরও মৃত্যু হবে। অতএব মৃত্যুতে খুশি প্রকাশ করার কোনো অর্থ নেই। যখন মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

৩১. ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ مِنَ الْمَظَالِمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَخْتَصِمُوْنَ .

৩১. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই হে লোক সকল! তোমাদের অধিকার সম্পর্কে তোমাদের পালনকর্তার সাথে কথা কাটাকাটি করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ : এটা كَلَامٌ مُسْتَاْنِفٌ পূর্বে উল্লিখিত اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ -এর জন্য عِلَّتٌ -এর স্থানে হয়েছে। অর্থাৎ ذِكْرٰى কে اُولِى الْاَلْبَابِ -এর সাথে خَاصّ করার ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য হলো– আকাশ থেকে পানি বর্ষণের পর পানির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা কত কত আশ্চর্য ধরনের পরিবর্তন প্রকাশ করেন। তা দেখে জ্ঞানীদের ইসলামের জন্য شَرْحِ صَدْرٍ হয়ে যায়। আর এই شَرْحِ صَدْرٍ জ্ঞানীদের জন্য ذِكْر কবুল করার কারণ হয়। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ) اَفَمَنْ -এর হামযাটি اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِيٌّ আর فَا، হলো عَاطِفَةٌ আর مَعْطُوْف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَكُلُّ النَّاسِ سَوَاءٌ আর مَنْ হলো مَوْصُوْلَه -এর পরবর্তী পূর্ণ জুমলা صِلَه হয়েছে। مَوْصُوْل স্বীয় صِلَه সহ মুবতাদা। তার خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন كَمَنْ طَبَعَ عَلٰى قَلْبِهِ আর এই حَذْف -এর উপর فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ টা বুঝাচ্ছে। আর কেউ কেউ مَنْ কে شَرْطِيَة বলেছেন। আর পরবর্তী বাক্য তার جَزَاء، হয়েছে।

قَوْلُهُ عَنْ ذِكْرِ قَبُوْلِ الْقُرْاٰنِ : এই ইবারত দ্বারা আল্লামা মহল্লী (র.) দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। প্রথম হলো مِنْ টি عَنْ অর্থে হয়েছে। আর এই বাক্যে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো عَنْ قَبُوْلِ ذِكْرِ اللّٰهِ আবার এটাও ঠিক আছে যে, مِنْ টা স্বীয় অবস্থায় হবে এবং تَعْلِيْل -এর জন্য হবে। অর্থাৎ–

قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ مِنْ اَجْلِ ذِكْرِ اللّٰهِ لِفَسَادِ قُلُوْبِهِمْ وَخُسْرَانِهَا

قَوْلُهُ مَثَانِيَ : এটা مَثْنٰى -এর বহুবচন। কিন্তু এটা مُفْرَدٌ -এরও সিফত হতে পারে। যেমন এখানে كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে। كِتَابٌ যদিও مُفْرَدٌ কিন্তু অনেক تَفَاصِيْل -এর جَامِعٌ হওয়ার কারণে একটি مَجْمُوْعَةٌ -এর নাম। কাজেই এর সিফত বহুবচন নেওয়া যেতে পারে। এর নজির আরবের এই উক্তি– اَلْاِنْسَانُ عُرُوْقٌ وَعِظَامٌ وَاَعْصَابٌ

قَوْلُهُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ عِنْدَ ذِكْرِ وَعِيْدِهِ : ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مِنْ টা عِنْدَ অর্থে হয়েছে تَقْشَعِرُّ অর্থ হলো- تَرْتَعِدُ وَتَضْطَرِبُ ফার্সিতে বলে لرزيدن তথা কাঁপা, কম্পন করা। মাসদার اِقْشِعْرَارٌ ফার্সিতে موئے برتن খাস্তন বলা হয় اِقْشَعَرَّ الشَّعْرُ অর্থাৎ قَامَ وَانْتَصَبَ مِنْ فَزَعٍ اَوْ بَرْدٍ তথা ভয় বা ঠাণ্ডার কারণে লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া, শিহরণ জাগা। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ تَرْمِيْمًا وَتَلْخِيْصًا) আল্লামা যামাখশারী বলেন, এটা মূলে ছিল اَلْقَشْعُ অর্থ- শুকিয়ে যাওয়া চামড়া, এটাকে رُبَاعِيٌّ বানানোর জন্য তার শেষে ر। বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে শব্দের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতাকে বুঝায়। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ اَىْ عِنْدَ ذِكْرِ وَعْدِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِلٰى টা عِنْدَ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : অর্থাৎ اَلْكِتَابُ الْمَوْصُوْفُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ

قَوْلُهُ هُدَى اللّٰهِ : অর্থাৎ سَبَبُ فِى الْهُدٰى অথবা মুবালাগার ভিত্তিতে زَيْدٌ عَدْلٌ -এর অন্তর্গত অর্থাৎ এই কিতাব এত পরিমাণ হেদায়েতের কারণ যে, মনে হয় সে নিজেই হেদায়েত।

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ وَيَلْقِيْ بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ : এক নোসখায় يَلْقِىْ -এর স্থানে يَقِىْ রয়েছে مَنْ মওসূলাহ স্বীয় সেলাহ সহ মিলে জুমলা হয়ে মুবতাদ। আর খবর উহ্য রয়েছে। যাকে আল্লামা মহল্লী (র.) كَمَنْ اٰمَنَ مِنْهُ বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারাকে আগুনের জন্য ঢাল বানায়, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে যে, অগ্নি হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।

قَوْلُهُ قِيْلَ لِلظَّالِمِيْنَ : يَقِيْنِى الْوُقُوْعِ হওয়ার কারণে مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর আতফ হয়েছে يَتَّقِىْ -এর উপর। لِلظَّلِمِيْنَ ইসমে জাহের اِسْم ضَمِيْر -এর স্থানে উহার সিফত ظُلْم কে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। অন্যথা قِيْلَ لَهُمْ বলাই যথেষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ : كُفَّار مَكَّة -এর স্থানে মুতলাক كُفَّارٌ বলতো তবে অধিক মুনাসিব হতো। কেননা এই উক্তি মক্কার কাফেরদের সাথে নির্দিষ্ট নয়।

قَوْلُهُ اَىْ جَزَاءَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذُوْقُوْا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ

قَوْلُهُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ : لَوْ হলো شَرْطِيَّة আর كَانُوْا হলো فِعْل نَاقِصْ -এর যমীর হলো اِسْم আর يَعْلَمُوْنَ জুমলা হয়ে كَانَ -এর খবর। كَانَ তার اِسْم ও خَبَرْ মিলে شَرْط হয়েছে। জওয়াবে শর্ত উহ্য রয়েছে যাকে মুফাসসির (র.) مَا كَذَّبُوْا বের করে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর عَذَابَهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, يَعْلَمُوْنَ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا : لَقَدْ -এর মধ্যে উহ্য لَام قَسَمْ -এর জবাবের উপর প্রবেশ করেছে। আর ضَرَبْنَا অর্থ হলো- اَوْضَحْنَا এবং بَيَّنَّا

قَوْلُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا : এটা هٰذَا الْقُرْاٰنِ -এর জন্য حَال مُؤَكِّدَه হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَشَاكِسُوْنَ : এটা اِسْم فَاعِلْ -এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো- ঝগড়াটে। شَكِسَ يَشْكَسُ বাবে كَرُمَ হতে মাসদার شَكَاسَةٌ অর্থ- দুশ্চরিত্র হওয়া। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, اَلتَّشَاكُسُ وَالتَّشَاخُسُ অর্থাৎ اَلْاِخْتِلَافُ

قَوْلُهُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا تَمْيِيْزًا : مَثَلًا টা تَمْيِيْز হয়েছে যা فَاعِلْ থেকে مَنْقُوْل হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَيْ لَا يَسْتَوِيْ مَثَلُهُمَا وَصِفَتُهُمَا

قَوْلُهُ مَيِّتٌ : ইমাম ফররা (র.) বলেন, ى টি তাশদীদসহ অর্থ এমন ব্যক্তি যে এখনো মৃত্যুবরণ করেনি তবে মৃত্যুর নিকটবর্তী। এবং مَيْتٌ তাশদীদবিহীন অর্থ মুরদাহ, মরা লাশ। কেউ কেউ বলেন, উভয়ের অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ : شَرَحَ -এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলি, আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা قَسَاوَتِ قَلْب কুরআনের يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا আয়াতে এবং এস্থলের لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে আমরা شَرْحِ صَدْر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এর লক্ষণ কি? তিনি বললেন-

اَلْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالتَّاَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ .

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান [অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল] থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা। -[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতটি اَفَمَنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোর প্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ : قَسَاوَةْ শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া, কারো প্রতি দয়াদ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিকির ও বিধানাবলি থেকে কোনো প্রভাব কবুল করে না।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ : এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআনই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ তথা উত্তম বাণী। حَدِيْث -এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কুরআনকে উত্তম বাণী বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কুরআন। অতঃপর কুরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে-

১. مُتَشَابِهًا -এর অর্থ কুরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই।

২. مَثَانِيْ এটা مَثْنٰى -এর বহুবচন। অর্থাৎ কুরআন একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৩. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যে ভীত, কুরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে।

৪. ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনো আজাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনো রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহর স্মরণে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হলে তাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠতো। -[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ أَفَمَنْ يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ : এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোনো কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পাকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আজাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

-[নাউযুবিল্লাহ]

তাফসীরবিদ আতা ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ : যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ এবং যে অতীত কালে মরে গেছে তাকে مَيْتٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রুমিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকালের চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গাম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আওতা বহির্ভূত নন, যাতে তার ইন্তেকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়। -[কুরতুবী]

হাশরের আদালতে মজলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে إِنَّكُمْ শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফের, মুসলমান, জালেম ও মজলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ তা'আলা জালেমকে মজলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারো জিম্মায় কারো কোনো হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোনো সৎকর্ম না থাকলে মজলুমের গুনাহ, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কি? তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকারে নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামাজ, রোজা ও হজ জাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারো অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল এসব মজলুম সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে তাদের জুলুমের প্রতিকার দাবি করবে। ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মজলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মজলুমের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করতো। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাতো। অতঃপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যেসব লোকের সাথে তার কাজ কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারো প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না : তাফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, মজলুমের হকের বিনিময়ে জালিমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ, কুফর নয়। কর্মগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা। যদিও তা গুনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালেমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকি থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না; বরং মাজলুমের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

اَلْجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُوْنَ : চব্বিশতম পারা

অনুবাদ :

٣٢. فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدُ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ بِالْقُرْاٰنِ اِذْ جَآءَهٗ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَاوى لِّلْكٰفِرِيْنَ بَلٰى .

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে শিরক ও সন্তানের অপবাদ দিয়ে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য তথা কুরআন আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে? তার চেয়ে কেউ অধিক জালেম নেই কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নাম নয় কি? হ্যাঁ, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।

٣٣. وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ هُوَ النَّبِىُّ ﷺ وَصَدَّقَ بِهٖ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَالَّذِىْ بِمَعْنَى الَّذِيْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ الشِّرْكَ .

৩৩. যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে তিনি হলেন নবী করীম ﷺ এবং যারা সত্য মেনে নিয়েছে অর্থাৎ ঈমানদারগণ। اَلَّذِىْ একবচন اَلَّذِيْنَ বহুবচন অর্থে তারাই তো খোদাভীরু। শিরক থেকে মুক্ত।

٣٤. لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ بِاِيْمَانِهِمْ .

৩৪. তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চইবে। এটা সৎকর্মীদের জন্যে তাদের ঈমানের পুরস্কার।

٣٥. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَءَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَسْوَأَ وَاَحْسَنَ بِمَعْنَى السَّيِّئِ وَالْحَسَنِ .

৩৫. যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহের মার্জনা করেন ও তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। اَسْوَأَ - اَحْسَنَ উভয় ইসমে তাফজীলের অর্থ حَسَنَ - سَيِّئ সিফতের।

٣٦. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط اَىِ النَّبِىَّ ﷺ بَلٰى وَيُخَوِّفُوْنَكَ الْخِطَابُ لَهٗ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط اَىِ الْاَصْنَامِ اَنْ تَقْتُلَهٗ اَوْ تُخَبِّلَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ .

৩৬. আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দা নবী ﷺ -এর পক্ষে যথেষ্ট নন। হ্যাঁ, অবশ্যই যথেষ্ট। অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য মূর্তিসমূহের ভয় দেখায়। অর্থাৎ মূর্তিসমূহ তাকে হত্যা করার ও উম্মাদ করে দেবে ইত্যাদি। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

৩৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ غَالِبٍ عَلٰى اَمْرِهٖ ذِىْ انْتِقَامٍ مِنْ اَعْدَائِهٖ بَلٰى ۔

৩৭. আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা কি তার হুকুমের প্রতি পরাক্রমশালী ও তার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৮. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامَ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ لَا اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ لَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ فِيْهِمَا قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ يَثِقُ الْوَاثِقُوْنَ ۔

৩৮. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? لَئِنْ -এর লাম কসমের জন্য তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ! বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন,তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, যে সমস্ত মূর্তিসমূহের পূজা কর তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? কখনো না। অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি তা আটকে দিতে পারবে? না, কখনো না অন্য কেরাত মতে كَاشِفَاتُ ও مُمْسِكَاتُ ইজাফতের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর করে।

৩৯. قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ عَلٰى حَالَتِىْ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔

৩৯. বলুন! হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় অবস্থায় কাজ কর। আমি আমার অবস্থায় কাজ করছি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

৪০. مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ دَائِمٌ هُوَ عَذَابُ النَّارِ وَقَدْ اَخْزَاهُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ ۔

৪০. কারো কাছে অবমাননাকর আজাব ও চিরস্থায়ী শাস্তি জাহান্নামের আজাব নেমে আসে। আল্লাহ তাদেরকে বদর যুদ্ধে অপমানিত করেছেন। مَنْ ইসমে মাওসূল تَعْلَمُوْنَ -এর মাফঊল বিহী।

৪১. اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ؕ اِهْتِدَاؤُهٗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ فَتَجْبُرُهُمْ عَلَى الْهُدٰى ۔

৪১. আমি আপনার প্রতি সত্যধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে بِالْحَقِّ . اَنْزَلَ -এর সাথে সম্পর্কিত অতঃপর যে সৎ পথে আসে সে নিজের কল্যাণেই হেদায়েত গ্রহণ করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন যে, তাদেরকে জোরপূর্বক হেদায়েত দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَمَنْ اَظْلَمُ اَىْ لَا اَحَدٌ : এই তাফসীরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা যে, فَمَنْ اَظْلَمُ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ টা نَفِىْ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذَّبُوْا بِالصِّدْقِ : মুফাসসির (র.) صِدْق দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর কুরআন যা صَادِقٌ মুবালাগা রূপে صِدْق বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَلٰى : মুফাসসির (র.) بَلٰى বৃদ্ধি করে সুন্নতের অনুসরণ করেছেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পাঠ করে সে যেন বলে بَلٰى কাজেই اَلَيْسَ كَذَا -এর তেলাওয়াতের সময় بَلٰى বলা সুন্নত।

-[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ اَلَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ : اَلَّذِىْ মাওসূলের দুটি সেলাহ রয়েছে। একটি হলো وَاحِدٌ আর তা হলো وَجَاءَ بِالصِّدْقِ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ; আর অপরটি হলো صَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُوْنَ যা جَمْع তথা বহুবচন প্রথম সেলাহ -এর রেয়ায়েতে اَلَّذِىْ -কে مُفْرَدْ নেওয়া হয়েছে। আর অপর সেলাহ এই রেয়ায়েতেই اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -এর মধ্যে جَمْع নেওয়া হয়েছে। اَلَّذِىْ যেহেতু اِسْمِ جِنْس কাজেই তাকে وَاحِدْ ও جَمْع উভয়েরই অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَسْوَءَ وَاَحْسَنَ : এটা اَلسَّيِّئُ وَالْحَسَنُ -এর অর্থে হয়েছে। এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. উল্লিখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যায়নকারী মুমিনগণের অধিক নেককাজের পুরস্কার দিবেন, আর অতি জঘন্য মন্দ কর্মকে ক্ষমা করে দিবেন। এতে নেক আমল ও বদ আমলের উল্লেখ নেই। মুফাসসির (র.) উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধি করে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন যে, اِسْمِ تَفْضِيْل তার অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং اِسْمِ فَاعِلْ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এখন ভালো এবং অধিক ভালো এমনিভাবে মন্দ এবং অতি জঘন্য মন্দ উভয় প্রকার আমল এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَخْبِلَهُ : এটা বাবে نَصَرَ -এর خَبْلًا মাসদার হতে নির্গত অর্থ হলো– জ্ঞানকে বিনষ্ট করে দেওয়া, পাগল বানানো। تَخْبِيْل ও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ : এই উভয়টিই কেরাতে সাবআর অন্তর্ভুক্ত যদি اِضَافَتْ সহ পাঠ করে তবে كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ এবং مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهٖ পড়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের, তাওহীদপন্থি ও মুশরিকের মধ্যকার পার্থক্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, আর একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিরকের অমার্জনীয় পরিণতি অশান্তি-অকল্যাণ এককথায় সর্বনাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানব জীবনে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে জীবনকে সার্থক করতে হলে অবশ্যই মানুষকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ সত্য উদ্ভাসিত হবার পরও যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যেমন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে অপবাদ দেয়, [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক]

এমনিভাবে তাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। অর্থাৎ এ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় জালেম, অতএব কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি তারই হবে। وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهٗ অর্থাৎ এবং তার নিকট সত্য আসার পর সে তা প্রত্যাখ্যান করে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য, কিন্তু এ হতভাগা কাফের মুশরিকরা এ সত্যকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে। এর চেয়ে বড় কোনো অপরাধ হতে পারে না। তাই পৃথিবীতে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নয়।

قَوْلُهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ : অর্থাৎ কাফেরদের আবাসস্থল কি দোজখ নয়? অর্থাৎ এমন কাফেরদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই দোজখে হবে, আর তা তাদের অন্যায় অনাচারের কারণেই হবে।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে বিশেষ সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, হে রাসূল ﷺ ! কাফেররা যদিও আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং পদে পদে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার অপচেষ্টা করে, আপনি এজন্যে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও চিন্তা করবেন না। কেননা তাদের শাস্তির জন্য দোজখই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দোজখের স্থায়ী অধিবাসী করে দিয়েছেন, তারা কখনো দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না।

قَوْلُهٗ وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ : অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী-পরহেজগার।

ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতি : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায়-অনাচার ও তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসারী মুমিনগণের ঈমানও নেক আমলের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর উম্মত ও পূর্বকালের সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের শুভ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রিয়নবী ﷺ -এর সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এ সত্য নিয়ে এসেছেন, পৃথিবীতে যারা তার অনুসরণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তাদের সম্পর্কেই সুসংবাদ হলো- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ অর্থাৎ তারাই মোত্তাকী পরহেজগার। সুদ্দী (র.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন নিয়ে এসেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.), আর তার সত্যায়নকারী হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। অতএব, আয়াতের অর্থ এই হবে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যে সত্য নিয়ে এসছেন, তা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম কবুল করেছেন।

কালবী এবং আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন আনয়নকারী হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সর্বপ্রথম তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

হযরত জুযাজ (র.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন আনয়নকারী হলেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আর তার প্রতি প্রথম ঈমান আনয়নকারী হলেন হযরত আলী (রা.)।

হযরত কাতাদা (র.) এবং মুকাতিল (র.) বলেছেন, সত্যকে নিয়ে এসেছেন প্রিয়নবী ﷺ আর তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন মুমিনগণ।

হযরত আতা (র.) বলেছেন, সত্যকে আনয়নকারী ছিলেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আর যুগে যুগে যারা তাদের অনুসরণ করেছেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্যই রয়েছে আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ যে, তারা হলেন প্রকৃত মোত্তাকী-পরহেজগার।

–[তাফসীরে তাবারী খ. ২৪, পৃ. ৩; তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৭২-৭৩; তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ৩]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.), কাতাদা (র.) হযরত রবী ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সত্য আনয়নকারী হলেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হলেন, সেসব লোক যারা তার প্রতি ঈমান আনে। যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, উর্দূ পারা ২৪, পৃ. ৩; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৮০]

قَوْلُهُ لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ : অর্থাৎ তাদের কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, এটিই নেককারদের পুরস্কার।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে বিশেষ কোনো পুরস্কারের কথা না বলে জান্নাতবাসীগণের আনন্দ বৃদ্ধি করার নিমিত্তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীগণ যখন যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবেন, অনতিবিলম্বে তারা তা পাবেন। হাদীস শরীফে এ বিবরণ স্থান পেয়েছে যে ঐ বস্তুটি তিনি খাচ্ছেন। এমনিভাবে যখন কিছু পরিধান করার ইচ্ছা করবেন, তখন দেখবেন যে তার কাঙ্ক্ষিত পোষাক তিনি পরে আছেন। এটিই হলো নেককার মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তার নেককার বান্দাদেরকে উত্তম এবং উৎকৃষ্টতম পুরস্কার দান করবেন। শুধু তাই নয়; বরং তাদের জীবনের যাবতীয় গুনাহ এবং ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদেরকে নিষ্কলঙ্ক করে তুলবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. অর্থাৎ তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক আমলের জন্যে তাদেরকে ছওয়াব দান করবেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে মুমিন বান্দার কবীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন। কেননা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– أَسْوَأَ الَّذِىْ عَمِلُوْا অর্থাৎ তারা যে মন্দ কাজ করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি মন্দ যা, আল্লাহ তা'আলা সে গুনাহও মাফ করবেন। যখন কবীরা গুনাহ মাফ করা হবে, তখন স্বাভাবিকভাবে সগীরাহ গুনাহও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। আর তাদের নেক আমলের জন্যে উত্তম বিনিময় তথা ছওয়াব দান করবেন।

মুকাতিল (র.) বলেছেন, এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের নেক আমলসমূহের অশেষ ছওয়াব দান করবেন, তবে বদ আমলের কোনো শাস্তি দেবেন না; বরং সেগুলো ক্ষমা করবেন। এটি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৭৪]

قَوْلُهُ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ : কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সেজন্যেই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে কোনো বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কেরাত عِبَادَهٗ বর্ণিত আছে। এ কেরাত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

শিক্ষা ও উপদেশ : وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফেরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপারে এই যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণি তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা পড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য গোনাহ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলির বিপক্ষে কোনো শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোনো উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরি ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ :

٤٢. اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَيَتَوَفَّى الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج اَيْ يَتَوَفَّاهَا وَقْتَ النَّوْمِ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَيْ وَقْتَ مَوْتِهَا وَالْمُرْسَلَةُ نَفْسُ التَّمْيِيْزِ تَبْقٰى بِدُوْنِهَا نَفْسُ الْحَيٰوةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى ذٰلِكَ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ وَقُرَيْشٌ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ ذٰلِكَ.

৪২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার প্রাণ হরণ করেন তার নিদ্রাকালে। অর্থাৎ তাকে নিদ্রার সময় রূহ কবজ করেন অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন তার রূহ হরণ করেন এবং অন্যান্যদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় তথা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ছেড়ে দেন। ছেড়ে দেওয়া রূহ নফসে তামীয যা ব্যতীত নফসে হায়াত বাকি থাকে পক্ষান্তরে এর বিপরীত সম্ভব নয় অর্থাৎ নফসে হায়াত ব্যতীত নফসে তামীয বাকি থাকে না। নিশ্চয়ই এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। অতএব তারা জানবে নিশ্চয়ই এসমস্ত বিবষয়ের উপর শক্তিশালী সত্তা পুনরুত্থানের উপরও সামর্থ্য রাখে। কিন্তু কুরাইশরা এটা চিন্তা করে না।

٤٣. اَمِ بَلِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيِ الْاَصْنَامِ اٰلِهَةً شُفَعَاءَ ط عِنْدَ اللّٰهِ بِزَعْمِهِمْ قُلْ لَهُمْ اَيَشْفَعُوْنَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّكُمْ تَعْبُدُوْنَهُمْ وَلَا غَيْرَ ذٰلِكَ لَا.

৪৩. বরং তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মূর্তিসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে ও তাদের বিশ্বাস মতে মূর্তিসমূহকে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে। আপনি তাদেরকে বলুন, তারা কি সুপারিশ করবে? যদিও তারা সুপারিশ ইত্যাদির এখতিয়ার রাখে না ও তারা বুঝে না তোমরা যে তাদের অর্চনা করছো এবং না অন্য কিছু বুঝে। তারা কিছুই বুঝে না।

٤٤. قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط اَيْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِهَا فَلَا يَشْفَعُ اَحَدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

৪৪. বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীন, অর্থাৎ সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। অতএব তার অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আসমান ও জমিনে তারই সাম্রাজ্য অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

٤٥. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَيْ دُوْنَ اٰلِهَتِهِمْ اشْمَاَزَّتْ نَفَرَتْ وَانْقَبَضَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ج وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَيِ الْاَصْنَامِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ.

৪৫. যখন তাদের অন্যান্য উপাস্য ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য উপাস্য মূর্তিসমূহের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

٤٦. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ ـ بِمَعْنٰى يَا اَللّٰهُ مُبْدِعُهُمَا وَمَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ

৪৬. বলুন, হে আল্লাহ! আসমান জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী, اَللّٰهُمَّ টি يَا اَللّٰهُ -এর অর্থে আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন ঐ ধর্মীয় বিষয়ে যাতে তারা মতবিরোধ করতো। আপনি তাদের মতবিরোধ বিষয়ে আমাকে সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করুন।

٤٧. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ يَظُنُّوْنَ ـ

৪৭. যদি জালেমদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে তবে অবশ্যই তারা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন শাস্তি যা তারা কল্পনাও করতো না।

٤٨. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَيِ الْعَذَابَ ـ

৪৮. আর তাদের সামনে প্রকাশ পাবে, তাদের দুষ্কর্মসমূহ এবং যে আজাবের ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে ঘিরে নেবে।

٤٩. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ اَعْطَيْنَاهُ نِعْمَةً اِنْعَامًا مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ط مِنَ اللّٰهِ بِاَنِّيْ لَهٗ اَهْلٌ بَلْ هِيَ اَيِ الْقَوْلَةُ فِتْنَةٌ بَلِيَّةٌ يُبْتَلٰى بِهَا الْعَبْدُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ التَّخْوِيْلَ اِسْتِدْرَاجٌ وَّامْتِحَانٌ ـ

৪৯. মানুষকে যখন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে, এরপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমাকে এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জানা মতে আমি এটার উপযুক্ত। বরং তাদের এ জাতীয় কথাবার্তা এক পরীক্ষা যা দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। এই নিয়ামত দান তাদের জন্যে পরীক্ষা ও সুযোগ দেওয়া।

٥٠. قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ كَقَارُوْنَ وَقَوْمِهٖ الرَّاضِيْنَ بِهَا فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

৫০. তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও যেমন, কারূন ও তার প্রতি অনুগত কওম তাই বলতো অতঃপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

٥١. فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ط اَىْ جَزَاؤُهَا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاۤءِ اَىْ قُرَيْشٍ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا لا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ عَذَابَنَا فَقُحِطُوْا سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ.

৫১. যে বিপদ তাদের কাছে এসেছে তা তাদের দুষ্কর্মের প্রতিদান। কুরাইশদের যারা পাপী তাদের প্রতিও তাদের দুষ্কর্মের প্রতিদান পৌঁছবে। তারা তাদের শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না। অতএব তাদেরকে সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে অতঃপর তাদের কাছে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

٥٢. اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِبْتِلَاۤءً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

৫২. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে চান রিজিক বৃদ্ধি করেন পরীক্ষামূলক ও যার জন্যে চান পরিমিত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَتَوَفّٰى : এটা বাবে تَفَعُّلٌ হতে مُضَارِعٌ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ -এর সীগাহ, অর্থ– সে রূহ কবজ করে। يَقْبِضُ الْاَرْوَاحَ عِنْدَ حُضُوْرِ اٰجَالِهَا অর্থাৎ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ

قَوْلُهُ اَنْفُسَ : এটা نَفْسٌ -এর বহুবচন অর্থ– রূহ, জান। وَاوْ হলো আর اَللّٰهُ হলো মুবতাদা يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ জুমলা হয়ে খবর حِيْنَ مَوْتِهَا টা يَتَوَفَّى -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে حَرْفِ عَطْف আর اَلَّتِىْ لَمْ تَمُتْ হলো مَعْطُوْف - اَنْفُسَ -এর উপর فِىْ مَنَامِهَا হলো يَتَوَفَّى -এর ظَرْف ; উদ্দেশ্য হলো যে সকল নফসসমূহের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদেরকে শয়নের সময় কবজা করে নেয়। এই অর্থেই হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ

মৃত্যু এবং ঘুমে রূহ কবজা করা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য :

قَوْلُهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ : تَوَفِّىْ শব্দের অর্থ হলো নেওয়া এবং কবজা করা। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, প্রাণীদের রূহ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার تَصَرُّفٌ এবং তারই হুকুমের অধীন। তিনি যখন ইচ্ছা কবজা করেন। এই আল্লাহ তা'আলার تَصَرُّفٌ -এর একটি প্রকাশ্য নমুনা প্রতিটি প্রাণী নিয়মিত অবলোকন করে থাকে। নিদ্রার সময় তার রূহ এক হিসেবে কবজা হয়ে যায়। এরপর জাগ্রত হওয়ার সময় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সর্বশেষে এমন একটি সময় আসবে যে, একেবারেই কবজ হয়ে যাবে। কিয়ামতের পূর্বে আর ফিরে আসবে না।

মাযহারী গ্রন্থকারের তাহকীক : তিনি বলেন, রূহ কবজা করার উদ্দেশ্য হলো– শরীরের থেকে রূহের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। কখনো এই সম্পর্ক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়ভাবেই শেষ করে দেওয়া হয়। এর নাম হলো মৃত্যু। আর কখনো শুধুমাত্র প্রকাশ্য ছিন্ন করে দেওয়া হয় অপ্রকাশ্যভাবে বাকি থাকে। এর প্রতিক্রিয়াটা এই হয় যে, শুধুমাত্র অনুভূতি ও নড়াচড়ার ইচ্ছা যা জীবনের প্রকাশ্য নিদর্শন তা ছিন্ন করে দেয়। আর অপ্রকাশ্য সম্পর্ক বাকি থাকে। যার কারণে সে শ্বাস নেয় এবং জীবিত থাকে।

আয়াতে تَوَفّٰى শব্দটি কবজ অর্থে عُمُوْم مَجَاز -এর ভিত্তিতে উভয় অর্থকে শামিল করে। মৃত্যু এবং নিদ্রা উভয়ের মধ্যে রূহ কবজের এই পার্থক্য যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি অনুপাতেও এ মতের সমর্থন হয়। তিনি বলেন, শয়নকালে রূহ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু একটি ঝলকের মাধ্যমে রূহের সম্পর্ক শরীরের সাথে অবশিষ্ট থাকে। যার ফলে সে জীবিত থাকে। এভাবে ঝলকের সম্পর্কের কারণে সে স্বপ্নে দেখে। এরপর এই স্বপ্ন যদি عَالَم مِثَال -এর দিকে تَوَجُّهٌ -এর সময় দেখে তবে তা সত্য স্বপ্ন হয়ে থাকে। আর যদি শরীরের দিকে ফেরার সময় দেখে তবে এতে শয়তানি تَصَرُّفَات অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই স্বপ্ন رُؤْيَا، صَادِقَة তথা সত্য স্বপ্ন হয় না। -[মা'আরিফ]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর তাহকীক : শাহ সাহেব (র.) বলেন, নিদ্রায় প্রতিনিয়ত জান নিয়ে নেওয়া হয়। এরপর পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এটাই আখেরাতের নিশান। জানা গেল যে, নিদ্রায়ও জান নিয়ে নেওয়া হয়। যেমন মৃত্যুতে জান নিয়ে নেওয়া হয়। যদি নিদ্রায় জান নিয়ে আটকে রাখা হয় তবে সেটাই মৃত্যু। এই জান হলো সেটা যাকে হুশ বলে। আর এক জান হলো সেটা যার দ্বারা নিঃশ্বাস চলে এবং নড়াচড়া করে এবং খাদ্য হজম হয় এই দ্বিতীয় জান মৃত্যুর পূর্বে নিয়ে নেওয়া হয় না। -[তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ]

ইমাম বগভী হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন নিদ্রায় রূহ বের হয়ে যায়। কিন্তু شُعَاعٌ [ঝলক] -এর মাধ্যমে এর বিশেষ সম্পর্ক শরীরের সাথে বিদ্যমান থাকে। যার দ্বারা হায়াত বাতিল হয় না। যেমন সূর্য লক্ষ কোটি মাইল দূরে থেকেও شُعَاعٌ -এর মাধ্যমে জমিনকে গরম রাখে। এর দ্বারা প্রকাশ হয় যে, নিদ্রার সময়ও সেই বস্তুই বের হয় যা মৃত্যুর সময় বের হয়। তবে اِنْقِطَاعٌ -এর সম্পর্ক সেরূপ হয় না যেরূপ মৃত্যুর মধ্যে হয়ে থাকে। -[তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ]

ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, প্রতিটি মানুষের দুটি نَفْس হয়। এক হলো সেই نَفْس تَمْيِيْز بِه যা নিদ্রার সময় শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। যার কারণে فَهْم এবং اِدْرَاك বেকার হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় হলো نَفْس حَيَاتٌ যখন এই نَفْس দূর হয়ে যায় তখন জীবন প্রদীপ নিভে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তির বিপরীত। তার শ্বাস-প্রশ্বাস জারি থাকে। কুশায়রী বলেন, এতে দূরত্ব রয়েছে। কেননা আয়াত হতে যা বুঝা যায় তা হলো এই যে, উভয় সুরতেই نَفْس مَقْبُوْض হলো একই বস্তু। এ কারণেই বলেছেন, فَيُمْسِكُ الَّذِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى অর্থাৎ যার মৃত্যুর সময় এসে যায় তাকে আটকে রাখেন। অন্যথায় ছেড়ে দেন। প্রথম সুরতের নাম মৃত্যু। আর দ্বিতীয় সুরতের নাম নিদ্রা। (فَتْحُ الْقَدِيْرِ شَوْكَانِىْ مُلَخَّصًا)

দার্শনিকগণ এতে মতভেদ করেছেন যে, نَفْس এবং رُوْح উভয়টি কি একই বস্তু না পৃথক বস্তু। এ মাসআলার আলোচনা অতিদীর্ঘ। যার জন্য كُتُب طِبّ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা চাই। কেননা এটা চিকিৎসা বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। রূহ এর ব্যাপারে যতগুলো نَظَرِيَاتٌ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার সবগুলো ধারণা ও কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা সেটাই যাকে পবিত্র কুরআন اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ বলে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْمُرْسَلَةُ نَفْسُ التَّمْيِيْزِ الخ : এর সার হলো نَفْس দু ধরনের- ১. نَفْس تَمْيِيْز ২. نَفْس حَيَاتٌ نَفْس تَمْيِيْز ; نَفْس حَيَاتٌ ব্যতীত অবশিষ্ট থাকতে পারে। তবে نَفْس تَمْيِيْز টা نَفْس حَيَاتٌ ব্যতীত থাকতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম সন্তানের মধ্যে একটি হলো نَفْس আর অপরটি হলো رُوْح আর عَقْل এবং تَمْيِيْز -এর সম্পর্ক نَفْس -এর সাথে। আর নিঃশ্বাসের সম্পর্ক রূহের সাথে যখন মানুষ শুয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার نَفْس কে কব্জা করে ফেলেন। রূহকে কব্জা করেন না। এ জাতীয় উক্তি হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তাহকীকী কথা : বিশুদ্ধ কথা হলো মানুষের মধ্যে রূহ মূলত একটি। তবে তার اَوْصَافٌ হিসেবে একাধিক। (حَاشِيَة جَلَالَيْن)

قَوْلُهُ اَوَ لَوْ كَانُوْا : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ এবং উভয়ের উপর প্রবেশ করেছে। উহ্য ইবারত হলো اَيَشْفَعُوْنَ যেমনটি মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। وَاوْ হলো حَالِيَة এবং لَوْ হলো اَيْ وَاِنْ شَرْطِيَّة আর এই বাক্যটি حَال হওয়ার কারণে نَصْب -এর স্থানে হয়েছে। لَوْ -এর জবাব হলো উহ্য। উহ্য ইবারত হলো كَانُوْا بِهٰذِهِ الصِّفَةِ تَتَّخِذُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ.

قَوْلُهُ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا : মুফাসসির (র.) اَيْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِهَا فَلَا يَشْفَعُ اَحَدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন. لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো সুপারিশের অধিকার হবে না। এবং কেউ কারো সুপারিশ করবে না। অথচ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবীগণ, আলেমগণ, শহীদগণ ও অন্যান্যরা সুপারিশ করবেন।

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, যত প্রকার সুপারিশ হবে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষেই হবে। কাজেই এই সুপারিশ ও আল্লাহ তা'আলার সাথে خَاصّ হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- مَنْ ذَالَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

قَوْلُهُ نِعْمَةً اِنْعَامًا : نِعْمَةً -এর তাফসীর اِنْعَامًا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ -এর مَرْجِعْ কে ঠিক করা যাতে করে যমীর এবং مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَةٌ হয়ে যায়। এটা সেই সুরতে হবে যে, مَا কে كَافَّة বলা হবে এবং مَا -কে مَوْصُوْلَة মানা হলে تَاوِيْل -এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ الْمَقُوْلَةُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো هِيَ যমীর এবং তার مَرْجِعْ - قَوْل -এর মাঝে مُطَابَقَة স্থাপন করা। এ কারণেই قَوْل দ্বারা مَقُوْلَة উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর مَقُوْلَة দ্বারা উদ্দেশ্য এর এই যে, اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ আবার কেউ কেউ هِيَ -এর مَرْجِعْ কে نِعْمَةٌ বলেছেন অর্থাৎ بَلِ النِّعْمَةُ فِتْنَةٌ এই সুরতে تَاوِيْل -এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا اَيْ جَزَائُهَا : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, سَيِّئَاتٌ -এর مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন কল্পে তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি একথা ঘোষণা করা হয় যে, কিয়ামতের দিন পাপীষ্ঠ লোকদের পরিণতি তারা দেখতে পাবে। আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে, আর এটি এমন এক দৃশ্য যা প্রতিনিয়ত মানব জীবনে লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো মানুষের নিদ্রা যা মৃত্যু সদৃশ্য, এরপর জাগ্রত হওয়া হলো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা। এ অবস্থা প্রতিদিনই মানুষের জীবনে আসে অর্থাৎ নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যু এবং পুনর্জীবন লাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের প্রাণও [হরণ করেন] নিদ্রার সময়।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, মানুষ যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার রূহ দেহ থেকে নিজের কাছে নিয়ে যান, যখন নিদ্রার অবসান ঘটে তখন দেহে রূহ ফেরত দেন, নিদ্রিত অবস্থায় যার মৃত্যুর সময় হয়ে যায় তার প্রাণ ফেরত দেওয়া হয় না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মানুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন তার রূহ সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায় তবে দেহের সঙ্গে সঙ্গে রূহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় না; বরং কিছুটা সংযোগ অব্যাহত থাকে, ফলে দেহ এবং জীবন বিনষ্ট হয় না। এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সূর্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে তা কিরণের সাহায্যে পৃথিবীতে স্বীয় প্রভাব বজায় রাখে। মানবাত্মা তার নিদ্রার সময় দেহ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও একটা সম্পর্ক বজায় রাখে, কিন্তু মৃত্যু হলে রূহের সাথে দেহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যেহেতু নিদ্রাকালে দেহ ও রূহের এক প্রকার সম্পর্ক বজায় থাকে তাই ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে, এরপর যখন সে জাগ্রত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে রূহ দেহের মধ্যে ফিরে আসে।

হযরত সোলায়েম ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই, কিছু লোক নিদ্রিত অবস্থায় এমন কিছু দেখে যা সে কখনো কল্পনাও করেনি, যখন সে জাগ্রত হয় তখন ঐ বিষয়টি তার সম্মুখে এসে পড়ে। অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। অথচ কোনো কোনো লোকের স্বপ্নের কোনো গুরুত্বই নেই। হযরত আলী (রা.) একথা শ্রবণ করে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি আপনাকে এর কারণ বলছি। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রূহসমূহকে কবজ করিয়ে নেন, যখন রূহসমূহ আসমানে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যে থাকে। তখন তারা যা দেখে তাই সত্য স্বপ্ন হয়। আর রূহসমূহকে তাদের দেহের দিকে প্রেরণ করা হয়, তখন পথিমধ্যে শয়তানের মুখোমুখি হয়, শয়তান তাদেরকে কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা শুনিয়ে দেন তখন তা মিথ্যা স্বপ্নে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা.) এর একথা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৭৮; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ৮, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৮৬-৮৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানুষের মধ্যে দুটি জিনিস রয়েছে। একটি হলো বিবেক-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি, অপরটি হলো রূহ। মানুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন তার বিবেক বুদ্ধি এবং উপলব্ধি শক্তি থাকেনা, কিন্তু রূহ থেকে যায়, যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন রূহ বিদায় নেয়, দেহ তখন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মানুষের জীবন আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, যে কোনো সময় মানুষের জীবনে আল্লাহ তা'আলার হুকুম জারি হয়ে থাকে।

মানুষের মৃত্যু দু'প্রকার। একটি ক্ষুদ্র এবং সাময়িক, আরেকটি বৃহৎ এবং স্থায়ী। ক্ষুদ্র মৃত্যু হলো নিদ্রা, আর বৃহৎ মৃত্যু হলো যখন মানুষের দেহ থেকে তার রূহকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন তার জীবনের অবসান ঘটে চিরতরে। নিদ্রা বা ক্ষুদ্র মৃত্যু সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ তিনিই সে আল্লাহ তা'আলা যিনি রাত্রিবেলা তোমাদের প্রাণ হরণ করেন। আর দিনে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন, নিদ্রিত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, আর অপরগুলোকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত দেন। অর্থাৎ জাগ্রত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং মৃত্যুর জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সে সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিদ্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার বিছানায় যায়, তখন তার কর্তব্য হলো বিছানাকে ঝেড়ে নেওয়া। কেননা সে জানে না যে তার পরে তাতে কি হয়েছে। এরপর তার কর্তব্য হলো এ দোয়া পাঠ করা- بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ لَهٗ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তোমার পবিত্র নামের বরকতেই আমি শায়িত হই এবং তোমার নামের বরকতেই জাগ্রত হই। যদি তুমি আমার রূহকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কর, তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি আমার রূহকে তুমি ফেরত দেওয়া পছন্দ কর, তবে এভাবেই তার হেফাজত কর, যেভাবে তুমি তোমার নেককার বান্দাদের হেফাজত করে থাক।

এ পর্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ যখন রাতে বিছানায় যেতেন, তখন ডান কাত হয়ে শায়িত হতেন এবং ডান হাতকে তার গাল মোবারকের নীচে রেখে এ দোয়া পাঠ করতেন- اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবন ও মরণ তোমারই হাতে।

এরপর যখন তিনি জাগ্রত হতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার প্রাণ হরণের পর পুনরায় জীবন দান করেছেন, আর তারই নিকট কিয়ামতের দিন হাজির হতে হবে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : অর্থাৎ নিশ্চয়ই এতে আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের বহু নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা করে থাকে। অর্থাৎ যারা চিন্তা করতে অভ্যস্থ, তারা জীবন-মৃত্যু নিদ্রা এবং জাগরণে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের অনেক জীবন্ত নিদর্শন দেখতে পায়। যিনি মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং যিনি প্রতিদিন মানুষকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও নিদ্রার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, আর যিনি মানুষকে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন, তথা মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর করেন, তার পক্ষে সমগ্র মানব জাতিকে কিয়ামতের দিন তার দরবারে হাজির করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। অতএব, প্রতিদিন জাগ্রত হয়ে আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত ও হিকমত উপলব্ধি করা এবং পুনরায় জীবন লাভ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে শোকর আদায় করা যেমন কর্তব্য, ঠিক তেমনিভাবে আরেকটি কর্তব্য হলো এ সত্য উপলব্ধি করা যে, অবশেষে আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে যেমন জীবন উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির জন্যেও আমাদেরকে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করতে হবে। যারা চিন্তাশীল, যারা পরিণামদর্শী, তারা এ পর্যায়ের কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল হয় না।

قَوْلُهُ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۔ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? [হে রাসূল ﷺ!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি তারা কোনো প্রকার ক্ষমতা না রাখে বা কিছুই বুঝতে না পারে তবুও?

কাফের মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তাদের ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, এজন্যে তারা ঠাকুর দেবতাদের উপাসনা করে। কিন্তু তারা এ সত্য উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করবেন শুধু সে-ই সুপারিশ করতে পারে। আর মুশরিক বা তাদের ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করার কোনো অনুমতি বা যোগ্যতা রাখে না। তাদের ঠাকুর দেবতাগুলো হলো জড় পদার্থ, অসহায়, নিরূপায়, সুপারিশ করার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই, তারা বিবেক বুদ্ধিহীন, কিছু বোঝেওনা আর কিছু করতেও সক্ষম নয়, অতএব তাদের সুপারিশ করার প্রশ্নই উঠে না। তাই ইরশাদ হয়েছে- قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا অর্থাৎ কারো নিকট সুপারিশ করার জন্যে সুপারিশকারীর যে গুণাবলির প্রয়োজন তা এ জড়পদার্থের তৈরি মূর্তিগুলোর নেই, অতএব সুপারিশ করার কোনো অধিকারও তাদের নেই। আর কাফের মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুধু যে অপ্রিয় তাই নয়;বরং অভিশপ্তও। তাই তাদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোরই নেই। এরপর ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۔ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি বলুন, সকল সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই এখতিয়ারে আসমান জমিনের রাজত্ব একমাত্র তারই এরপর তোমাদেরকে তারই নিকট ফিরে যেতে হবে।

অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করার চাবিকাঠি শুধু তারই হাতে রয়েছে। অনুমতি ব্যতীত কেউ আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করতে পারে না, তিনি যে আসমান জমিনের মালিক, তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তার দরবারে অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। অতএব, যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, পাপীষ্ঠ তাদের পক্ষে কে সুপারিশ করবে, আর কাফেররা যাদেরকে মানে, তারা জড়পদার্থ, অক্ষম বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার অনুমতি মোতাবেকই সুপারিশ করা সম্ভব হবে, যেমন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ অর্থাৎ আমিই [কিয়ামতের দিন] সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো, আর আমার সুপারিশ সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। আর যে কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের পক্ষে তিনি কি সুপারিশ করবেন? তা তো কখনো সম্ভব নয়। আর কাফেররা একথা যেন মনে রাখে যে, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ অর্থাৎ অবশেষে তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে যেতে হবে। তখনই হবে তোমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মের বিচার যাদেরকে তোমরা সুপারিশকারী মনে কর, তারা দরবারে ইলাহীতে সুপারিশ করার যোগ্য নয়, আর যিনি সুপারিশ করবেন, তার সঙ্গে তোমরা কর শত্রুতা, অতএব তোমদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, তা উপলব্ধি কর।

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য :

قَوْلُهُ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا : -এর শাব্দিক অর্থ নেওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যেহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্ত চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনো শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকি থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' -এর দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে تَوَفّٰى শব্দটি উপরিউক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরিউক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তা দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকি থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না। তিনি আরো বলেন, নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ : সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, আমি কুরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন– اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ : হযরত সুফিয়ান ছওরী (র.) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোকদেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্য সৎকর্ম করতো, এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করতো। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে এরূপ সৎকর্মের কোনো পুরস্কার ও ছওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। –[কুরতুবী]

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ : হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খটকা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও। রূহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন– এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

অনুবাদ :

٥٣. قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا بِكَسْرِ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا وَقُرِئَ بِضَمِّهَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط لِمَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ اَيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

৫৩. বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। لَا تَقْنَطُوْا -এর ن -এর মধ্যে যের, যবর ও পেশ তিনটি পড়া যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোনাহ মাফ করেন যারা শিরক থেকে তওবা করে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٤. وَاَنِيْبُوْا اِرْجِعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا اخلصوا العمل لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ بِمَنْعِهِ اِنْ لَمْ تَتُوْبُوْا.

৫৪. তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তোমাদের কাছে আজাব আসার পূর্বে আমলকে তার জন্যে খাঁটি কর। যদি তোমরা তওবা না কর অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

٥٥. وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ هُوَ الْقُرْاٰنُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ قَبْلَ اِتْيَانِهِ بِوَقْتِهِ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ قَبْلَ.

৫৫. তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিষয় তথা কুরআনের অনুসরণ কর, তোমাদের কাছে অতর্কিত ও অজ্ঞাতসারে আজাব আসার পূর্বে। অর্থাৎ আজাব আসার পূর্বে তার সময়ের ব্যাপারে তোমাদের খবরও হবে না। অতএব তোমরা দ্রুত তওবা কর।

٥٦. اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى اَصْلُهُ يَاحَسْرَتِيْ اَيْ نَدَامَتِيْ عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ اَيْ طَاعَتِهِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَيْ وَاِنِّيْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ بِدِيْنِهِ وَكِتَابِهِ.

৫৬. যাতে কেউ না বলে. হায়, হায় হায় আমার আফসোস! يٰحَسْرَتٰى -এর অর্থ يَا حَسْرَتِيْ অর্থাৎ আমার লজ্জা আমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে অবহেলা করেছি। এবং আমি আল্লাহ তা'আলার ধর্ম ও কিতাবের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। اِنْ অব্যয়টি مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ ও এটা اِنِّيْ -এর অর্থে।

٥٧. اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰنِيْ بِالطَّاعَةِ اَيْ فَاهْتَدَيْتُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ عَذَابَهُ.

৫৭. অথবা যাতে না বলে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে তার আনুগত্যের পথ প্রদর্শন করতেন তবে অবশ্যই আমি হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম ও তার আজাব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হতাম।

٥٨. اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً رَجْعَةً اِلَى الدُّنْيَا فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيُقَالُ لَهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ.

৫৮. অথবা আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি আমার জন্যে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার কোনো এক সুযোগ হতো, তবে আমি সৎকর্মশীল ঈমানদার হয়ে যাব।

٥٩. بَلٰى قَدْ جَاۤءَتْكَ اٰيٰتِىْ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ تَكَبَّرْتَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

৫৯. অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে বলা হবে যে, হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নিদর্শন কুরআন ও এটা হেদায়েতের কারণ এসেছিল অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে ও এটার প্রতি ঈমান আনা থেকে অহংকার করেছিলে। এবং তুমি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে।

٦٠. وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَاْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بَلٰى.

৬০. যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি শিরক ও সন্তানের অপবাদ দ্বারা মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। ঈমান থেকে অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? হ্যাঁ।

٦١. وَيُنَجِّى اللّٰهُ من جهنم الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ بِمَفَازَتِهِمْ اَىْ بِمَكَانِ فَوْزِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ بِاَنْ يُّجْعَلُوْا فِيْهِ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْۤءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৬১. আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকতো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন সাফল্যের সাথে অর্থাৎ তারা জান্নাতের এমন সাফল্যের স্থানে অবস্থান করবে যাতে তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

٦٢. اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ مُّتَصَرِّفٌ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاۤءُ.

৬২. আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।

٦٣. لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهِمَا مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الخ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ.

৬৩. আসমান জমিনের চাবি তারই নিকট। অর্থাৎ উভয়ের খনিসমূহের বৃষ্টি ও শস্য ইত্যাদির চাবি তারই হাতে যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ বাক্যটির সম্পর্ক তথা আতফ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا -এর সাথে এবং উভয় বাক্যের মধ্যবর্তী আয়াতে اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ স্বতন্ত্র বাক্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَا عِبَادِىَ : এখানে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. يَا ، কে ফেলে দিয়ে دَالْ বর্ণে كَسْرَة দিয়ে অর্থাৎ يَا عِبَادِ
২. يَا ، কে অবশিষ্ট রেখে يَا ، -এর উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ يَا عِبَادِىَ

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ : اَسْرَفُوْا টা اِسْرَافٌ মাসদার হতে مَاضِىْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– তারা বাড়াবাড়ি করল, সীমাতিক্রম করল। অর্থাৎ স্বীয় নফসের উপর গুনাহ এবং খেয়ানত করে বাড়াবাড়ি করল। এখানে اِسْرَافٌ দ্বারা اِسْرَافٌ فِى الْمَعْصِيَةِ উদ্দেশ্য। اِسْرَافٌ -এর অর্থ মুতলাক বাড়াবাড়ি করা। اِسْرَاف مُقَيَّدْ যেমন اَسْرَفَ فِى الْمَالِ -এর মধ্যে مَجَازْ হিসেবে ব্যবহার হয়। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত বলেছে। তবে প্রথমটি অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন. اِسْرَافٌ -এর সেলাহ عَلٰى ব্যবহার হয় না?

উত্তর. اِسْرَافٌ যেহেতু খেয়ানতের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই اِسْرَافٌ -এর সেলাহ عَلٰى নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَقْنَطُوْا : এটা বাবে ضَرَبَ এবং نَصَرَ হতে বেশি ব্যবহার হয়। আর বাবে كَرُمَ হতে شَاذْ বা কম ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ هُوَ الْقُرْاٰنُ : এটা اَحْسَنَ -এর তাফসীর। অর্থাৎ আসমানি কিতাবের মধ্যে কুরআন সর্বোত্তম।

قَوْلُهُ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ : এখানে اَنْ এবং যা তার অধীনে রয়েছে। مَفْعُوْل لِاَجْلِهٖ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আল্লামা যমখশারী (র.) -এর উহ্য ইবারত كَرَاهَةَ اَنْ تَقُوْلَ মেনেছেন। আর আবুল বাকা اَنْذَرْنَاكُمْ مَخَافَةَ اَنْ تَقُوْلَ বলেছেন, আর মুফাসসির (র.) بَادِرُوْا উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل বলেছেন। যেমনটি সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ بِالطَّاعَةِ : এক নোসখায় بِالطَّاقَةِ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ : এই ইবারতে সেই কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে মতলক كِذْب উদ্দেশ্য নয়। বরং সেই كِذْب দ্বারা শিরক আবশ্যক হয় সেই كِذْب উদ্দেশ্য। তাই সামনে যেই وَعِيْد বর্ণনা করা হয়েছে তা মতলাক كِذْب -এর নয়; বরং সেই كِذْب যার কারণে كُفْر আবশ্যক হয়।

قَوْلُهُ مَقَالِيْدُ : এটা مِقْلَادٌ বা مِقْلِيْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– চাবি। এটা প্রতিটি বস্তুতে شِدَّتْ تَصَرُّفْ এবং تَمَكُّنْ হতে كِنَايَة হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে মুশরিকদের অন্যায় আচরণের বিবরণ ও তাদের শাস্তির ঘোষণা ছিল। এরপর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষণ পন্থায় প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতসমূহ শ্রবণের পর হয়তো কারো মনে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি হতে পারে, এর পাশাপাশি এ চিন্তাও হতে পারে যে, এত অন্যায়-অনাচারের পর কি আর আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়– قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ .

শানে নুযূল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কিছু মুশরিক যারা মানুষকে হত্যা করেছে, ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে, তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেছে আপনি যা কিছু বলেন তা অত্যন্ত ভালো, আর যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহ্বান করেন, তা-ও নিসন্দেহে উত্তম, কিন্তু আমরা যে বড়ই পাপী, আমাদের পাপাচার মাফ হবে কি? তখন এ আয়াত এবং সূরায়ে ফোরকানের একটি আয়াত নাজিল হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে, মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে।

তাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রিয়নবী ﷺ হযরত হামযা (রা.)-এর ঘাতক ওয়াহশীকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে লোক মারফত আহ্বান জানান, ওয়াহশী জবাব দেয় আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কিভাবে দাওয়াত দিচ্ছেন, কেননা আপনি বলেছেন, যে শিরক করে, যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا অর্থাৎ কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। তখন ওয়াহশী বলল, এ শর্তটি অত্যন্ত কঠিন, যদি তা পূর্ণ করা আমার দ্বারা সম্ভব না হয় তবে অন্য কোনো পথ আছে কি? তখন নাজিল হয়- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করতেও পারেন। তখন ওয়াহশী বললো, মাফ করা না করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন, আমি তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেও ক্ষমা না-ও পেতে পারি, এমন পরিস্থিতিতে আমার কি অবস্থা হবে? তখন আলোচ্য আয়াত- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ নাজিল হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ ঘোষণা শুধু কি ওয়াহশীর জন্যে, না সকল মুসলমানের জন্য? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, সকল মুসলমানের জন্য।

হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের পর বিপদগ্রস্ত হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইয়াশ ইবনে রবীয়া (রা.) এবং ওলীদ (রা.) ইবনে ওলীদ সহ এমন মুসলমানদের ব্যাপারে, যারা প্রথমে ঈমান এনেছিল, কিন্তু ঈমানের কারণে যখন দুঃখ দুর্দশা দেখা দেয় তখন তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে। আমরা বলতাম, আল্লাহ তা'আলা তাদের কোনো আমল কবুল করবেন না, ফরজও নয়, নফলও নয়, আর কোনোভাবেই তাদের তওবাও কবুল হবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) তার নিজের হাতে এ আয়াত লিখে ইয়াশ ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ (রা.) সহ অন্যান্য লোকের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে চলে আসেন। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৯২; তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৮৫-৮৬;]

قَوْلُهٗ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরো কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[কুরতুবী]

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গুনাহ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে কারো নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এই আয়াতটি গুনাহগারদের জন্য কুরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ আয়াতই হলো সর্বাধিক আশার আয়াত।

قَوْلُهُ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ : এখানে উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কুরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওরাত, ইঞ্জীল যাবূর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتٰى...... مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ : এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোনো বৃহত্তম অপরাধী, কাফের পাপাচারীরও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা বলে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হলো মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোনো উপকার হবে না।

কোনো কোনো কাফের ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায় আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম। কেউ সেখানেও তাকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোনো কাজে আসবে না।

উপরিউক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আজাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দুটি বাসনা আজাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে- يَا حَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ এরপর ওজর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ। এরপর আজাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি- মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

قَوْلُهُ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا : আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেজগার হয়ে যেতাম, এখানে কাফেরদের এ উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্য বাধ্য করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোনো পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা ও নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তজ্জন্য সে নিজেই দায়ী।

আল্লাহ তা'আলার দয়া মায়ার একটি দৃষ্টান্ত : হযরত আমের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, তার গায়ে চাদর এবং হাতে কোনো জিনিস ছিল, যা তিনি চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তিনি আরজ করলেন, আমি একটি বৃক্ষের নিচ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, সেখানে পাখির ছানার শব্দ শুনলাম, আমি সেগুলোকে ধরে আমার চাদরে রেখে দিলাম। এরই মধ্যে তাদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘোরফেরা করতে লাগলো, আমি তখন পাখির ছানাগুলোকে তার সম্মুখে রেখে দিলাম। মা পাখিটি এগিয়ে আসলে আমি সবগুলোকে আমার চাদরে

তুলে নিলাম, এখন এসবই আমার কাছে রয়েছে। হুজুর ﷺ আদেশ করলেন, এগুলোকে রেখে দাও, তখন দেখা গেল মা তার ছানাদের আকড়ে ধরে রেখেছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, মা পাখিটি তার বাচ্চাদের উপর কত মেহেরবান তা দেখে তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? শপথ সেই আল্লাহ তা'আলার যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, এই পাখিটি তার ছানাগুলোর উপর যত মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি মেহেরবান। এরপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যাও যেখান থেকে এগুলো ধরে এনেছ সেখানে এগুলো রেখে দাও। নির্দেশ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি সেগুলোকে নিয়ে চলে গেল। –[আবূ দাউদ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা এক জিহাদে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, পথে কিছু লোকের সাথে দেখা হলো। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমাদের কি পরিচয়? তারা আরজ করলেন, আমরা মুসলমান। তাদের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও ছিল, সে রান্না করেছিল, তার সঙ্গে একটি শিশু সন্তানও ছিল। যখন অগ্নি বেশি করে জ্বলে উঠতো তখন সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখতো, এরপর সে হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরআন, আল্লাহ তা'আলা কি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান নন? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন কেন নয়? এরপর সে বলল, মা তার সন্তানদের প্রতি যতটা দয়াবান আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিকতর দয়াবান নন? [অবশ্যই] এরপর সে বলল, মা তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে না। একথা শ্রবণ করে হুজুর ﷺ চিন্তিত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু তাকেই আজাব দেবেন যে অবাধ্য, যে বিদ্রোহী, আর যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকৃতি জানায়। –[ইবনে মাজাহ]

এ পর্যায়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যেসব মুমিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় তারা কি জান্নাতে যাবে? মুতাজেলা ফেরকা এ মত পোষণ করে, যে মু'মিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে যদি তওবা না করে তবে চিরদিন দোজখে থাকবে। তাদের এ মত সঠিক নয়, তারা বিভ্রান্ত। আর মুরজিয়া ফেরকার মত হলো, গুনাহ ছোট হোক বা বড় যদি ঈমান সঠিক থাকে তবে মুমিনের আখেরাতে কোনো আজাবই হবে না। এমতটিও সঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা সেসব আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করা হয় যাতে গুনাহের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত দুটি মতই ভ্রান্ত।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত : সঠিক মত হলো, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আর তা হলো, গুনাহের শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে গুনাহ মাফ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। গুনাহ মাফ হয় তওবার মাধ্যমে অথবা প্রিয়নবী ﷺ -এর শাফায়াতের মাধ্যমে কিংবা কোনো ওলী আল্লাহ তা'আলার সুপারিশ ক্রমে, অথবা শুধু আল্লাহ তা'আলার রহমতে। যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো গুনাহগার মু'মিনকে আজাব দেওয়ার ইচ্ছাও করেন। তবে তা স্থায়ী আজাব হবে না; বরং সাময়িক হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য নেক আমলও করবে সে তার বিনিময় অবশ্যই দেখতে পাবে। আর ঈমান হলো সবচেয়ে বড় নেক আমল এবং সকল নেক আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে ঈমানের উপর, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার বরখেলাফ হওয়া সম্ভব নয়। আখেরাতে ছওয়াব প্রদানের স্থানই হলো জান্নাত। অতএব মুমিন মাত্রই জান্নাতে যাবে। আজাব ভোগ করার পর অথবা কোনো আজাব ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত নসিব করবেন। মুমিনের অবস্থা হলো এই, যদি তার দ্বারা একটি গুনাহ হয়ে যায় তবে সে মনে করে সে পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে, আর উপর থেকে পাহাড় আপতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর কাফের তার গুনাহকে মনে করে একটি মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, একটি ইঙ্গিতেই তাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৯২-৯৩]

قَوْلُهُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ : مَقَالِيدُ শব্দটি مِقْلَادٌ অথবা مِقْلِيدٌ-এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসিতে চাবিকে كَلِيدٌ বলা হয়। আরবি রূপান্তর করে প্রথমে একে اِقْلِيدٌ করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন مَقَالِيدُ ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

চাবি কারো হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - এই কালেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কালেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ইবনে জাওযী এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফজিলত ধর্তব্য হতে পারে। -[রূহুল মা'আনী]

ইমাম ইবনে আবি হাতেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত একখানা হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও বর্ণনা করেছেন, যা আবূ ইয়ালা মুসনাদে সংকলন করেছেন, আর তাবারানী 'আদ দোয়া'য় এবং বায়হাকী 'আল আসমাউস সেফাত' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। হাদীসের বিবরণ এই যে, হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে [আলোচ্য আয়াত] لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, হে ওসমান! তোমার পূর্বে কেউ আমার নিকট এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করেনি। এ আয়াতের তাফসীর হলো একাধিক, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ [আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই] اَللّٰهُ اَكْبَرُ [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ] سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ [পবিত্র আল্লাহ তা'আলা, সমস্ত প্রশংসা তারই] اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ [আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী] لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ [আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো কোনো শক্তি নেই] اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ [তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ] بِيَدِهِ الْخَيْرُ [সকল কল্যাণ তারই হাতে] يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ [তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন] وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ [আর তিনি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান]।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায়ও হযরত উসমান (রা.)-এর প্রশ্ন ও জবাবের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় একথাও রয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এ বাক্যগুলো দশবার করে পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছয়টি নিয়ামত দান করেন। যেমন-

১. ইবলিস ও তার দলবল থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজত করবেন।

২. জান্নাতে তাকে অঢেল ছওয়াব দান করবেন।

৩. হুরগণ তার স্ত্রী হবে।

৪. তার গুনাহ মাফ করা হবে।

৫. সে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে থাকার তৌফিক পাবে।

৬. মৃত্যুর সময় তার নিকট বারজন ফেরেশতা আসবে এবং তাকে সুসংবাদ দান করবে এবং কবর থেকে হিসাবের স্থান পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাকে নিয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন যখন সে ভীত হবে তখন তাকে ফেরেশতাগণ সান্ত্বনা প্রদান করবেন। তার হিসাব সহজ করা হবে। এরপর তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন অন্যরা থাকবে কঠিন বিপদের মুখোমুখি।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৯৬-৯৭; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ২২; তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ৩৬৭]

অনুবাদ :

٦٤. قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ غَيْرَ مَنْصُوْبٌ بِأَعْبُدُ الْمَعْمُوْلِ لِتَأْمُرُوْنِّيْ بِتَقْدِيْرِ أَنْ بِنُوْنٍ وَاحِدَةٍ وَبِنُوْنَيْنِ وَادْغَامٍ وَفَكٍّ.

৬৪. বলুন হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছো? غَيْرَ শব্দটি تَأْمُرُوْنِّيْ -এর মামূল أَعْبُدُ দ্বারা মানসূব হয়েছে। تَأْمُرُوْنِّيْ -এর মধ্যে أن উহ্য রয়েছে ও এতে একটি নূন বা দুটি নূন তথা تَأْمُرُوْنَنِيْ বা ইদগাম এর সাথে পড়বে।

٦٥. وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَاللّٰهِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ يَا مُحَمَّدُ فَرْضًا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

৬৫. আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার কসম মেনে নিলাম যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক স্থির করেন, হে মুহাম্মদ ﷺ তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।

٦٦. بَلِ اللّٰهَ وَحْدَهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ إِنْعَامَهُ عَلَيْكَ.

৬৬. বরং আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করুন এবং তোমায় প্রদত্ত তার নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।

٦٧. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ق مَا عَرَفُوْهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖ أَوْ مَا عَظَّمُوْهُ حَقَّ عَظْمَتِهٖ حِيْنَ أَشْرَكُوْا بِهٖ غَيْرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا حَالٌ أَيِ السَّبْعُ قَبْضَتُهٗ أَيْ مَقْبُوْضَةٌ لَهٗ فِيْ مِلْكِهٖ وَتَصَرُّفِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ مَجْمُوْعَاتٌ بِيَمِيْنِهٖ ط بِقُدْرَتِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ مَعَهٗ.

৬৭. তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থরূপে বুঝেনি। যখন তারা অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে তখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থরূপে চিনেনি ও আল্লাহ তা'আলকে যথার্থ সম্মান দেয়নি। কিয়ামতের দিন গোটা সাত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে অর্থাৎ এর রাজত্ব তারই নিয়ন্ত্রণে ও তারই ইচ্ছায় এবং সব আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে তথা তার কুদরতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরিক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

٦٨. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ النَّفْخَةُ الْأُوْلٰى فَصَعِقَ مَاتَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط مِنَ الْحُوْرِ وَالْوِلْدَانِ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ أَيْ جَمِيْعُ الْخَلَائِقِ الْمَوْتٰى قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ مَا يُفْعَلُ بِهِمْ.

৬৮. শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে মৃত্যুবরণ করবে তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ হুর, গিলমানসমূহ মৃত্যুবরণ করবে না অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর সমস্ত মৃতসমূহ দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে। তাদের সাথে কি ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬৯. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ اَضَاءَتْ بِنُوْرِ رَبِّهَا حِيْنَ يَتَجَلّٰى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَوُضِعَ الْكِتٰبُ كِتَابُ الْاَعْمَالِ لِلْحِسَابِ وَجِيْئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ اَيْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَاُمَّتِهٖ يَشْهَدُوْنَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اَيِ الْعَدْلِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا.

৬৯. পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে। যখন তিনি বিচারের জন্যে সিংহাসনে আসীন হবেন প্রত্যেকের হিসেবের আমলনামা স্থাপন করা হবে। পয়গাম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও তার উম্মতগণ আনা হবে, যাতে তারা সাক্ষ্য দেয় প্রেরিত রাসূলদের দাওয়াত ও তাবলীগের উপর এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের উপর কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

৭০. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ اَيْ جَزَاءَهٗ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ فَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَاهِدٍ.

৭০. প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। অতএব এতে তিনি কোনো সাক্ষীর মুখাপেক্ষী নন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ : এটা মূলত تَأْمُرُوْنَنِيْ اَنْ اَعْبُدَ غَيْرَ اللّٰهِ ছিল اَعْبُدُ-এর মাফউল غَيْرَ اللّٰهِ কে اَعْبُدُ-এর আমেল تَأْمُرُوْنِّيْ-এর উপর مُقَدَّمٌ করে দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে, এই সুরত দুর্বল। তবে দুর্বল বলাটা ঠিক নয়। কেননা اَنْ শব্দের মধ্যে নয়। কাজেই এর আমল বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয় সুরত হলো এই যে, غَيْرَ اللّٰهِ কে تَأْمُرُوْنِّيْ-এর মাধ্যমে مَنْصُوْبٌ মানা হবে। এবং اَعْبُدُ-কে তার থেকে بَدَلٌ মানা হবে। উহ্য ইবারত হবে قُلْ اَفَتَأْمُرُوْنِّيْ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ এই তারকীব بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ-এর অন্তর্গত।

তৃতীয় সুরত غَيْرَ টা উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে অর্থাৎ اَفَتَلْزَمُوْنِّيْ غَيْرَ اللّٰهِ এই সুরতে এর مَا بَعْدَ তার জন্য مُفَسِّرٌ হবে। এছাড়া আরো তারকীব হতে পারে।

قَوْلُهٗ تَأْمُرُوْنِّيْ : এটা مُضَارِعٌ-এর حَاضِرٌ مُذَكَّرٌ جَمْعٌ-এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছো। ى হলো وَاحِدْ مُتَكَلِّمٌ-এর যমীর। আর نُوْنٌ টা اِدْغَامٌ-এ কারণে তাশদীদযুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ : لَامٌ টি جَوَابُ قَسَمٍ-এর জন্য হয়েছে অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَقَدْ আর قَدْ হলো হরফে তাহকীক। اُوْحِيَ হলো فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ আর اِلَيْكَ হলো نَائِبُ فَاعِلٍ-এর স্থলাভিষিক্ত। আর কেউ কেউ বলেন যে, পূর্বাপরের قَرِيْنَةٌ-এর কারণে نَائِبُ فَاعِلٍ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اُوْحِيَ اِلَيْكَ التَّوْحِيْدُ

قَوْلُهٗ فَرْضًا : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের দ্বারা শিরক হতে পারে না। এরপরও لَئِنْ اَشْرَكْتَ কেন বলা হলো?

উত্তর. فَرْضُ مُحَالٍ-এর ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন যে, যদিও রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মত। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন হবে যে, যদি উম্মতই উদ্দেশ্য হয় তবে لَئِنْ اَشْرَكْتَ-এর পরিবর্তে لَئِنْ اَشْرَكْتُمْ বলা উচিত ছিল? এর উত্তর হলো এই যে, অর্থ হলো اُوْحِيَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لَئِنْ اَشْرَكْتَ الخ যেমন আরবে বলা হয়– كسانا الامير حلة অর্থাৎ كَسَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَّا حُلَّةً

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ আয়াতের শানে নুযূল : তেবরানী এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে এসে প্রস্তাব দেয়, আপনি যদি রাজি থাকেন, আমরা আপনাকে এত ধন সম্পদ দেব যে, আপনি মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে যাবেন। অথবা মক্কার রাজত্ব আপনি গ্রহণ করবেন অথবা যে কোনো সুন্দরী স্ত্রী লোককে আপনি বিয়ে করতে চাইলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো, তবে আমাদের একটি মাত্র শর্ত এই যে, আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলবেন না, তাদের সমালোচনা করবেন না। অথবা আপনি যদি পছন্দ করেন তবে এ ব্যবস্থাও হতে পারে যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের পূজা করবেন, আর এক বছর আমরা আপনার মাবুদের পূজা করবো। হুজুর ﷺ তখন তাদেরকে বললেন, যখন আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে জবাব আসবে তখন আমি তোমাদের এ কথার জবাব দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর অপেক্ষা করবো। তখন সূরা কাফিরুন এবং আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

বায়হাকী 'দালায়েলে' হযরত হাসান বসরী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিল, আপনি আপনার পিতা-পিতামহকে পথভ্রষ্ট বলেছেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) তাফসীরকার মোকাতিল (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিল আপনি আপনার পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে আসুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বলেছো?

যারা এ ধারণা করে যে প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করবেন, তাদের ন্যায় বোকা বা মূর্খ আর কেউ হতে পারে না।

হে মুশরিকের দল! তোমরা কি একথা মনে কর যে, আমি স্বভাবধর্ম ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মানবতার কলঙ্ক শিরক গ্রহণ করবো? যা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে শিরকের ভয়াবহ পরিণতির ঘোষণা করা হয়েছে– وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি নিশ্চয়ই ওহী নাজিল করা হয়েছে যে, 'হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মেনে নাও, তবে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে, তোমার জীবন সাধনা হবে ব্যর্থ, আর তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ মুরতাদ হয়, তবে তার বিগত দিনের সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যায়, যেভাবে কোনো কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন কাফের অবস্থায় কৃত গুনাহসমূহ ইসলাম গ্রহণের কারণেই দূরীভূত হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, আর এমন সময় মুসলমান হয়, যখন নামাজের সময় এখনো বাকি রয়েছে, তবে মুরতাদ হওয়ার পূর্বে যে নামাজ আদায় করেছিল, তা-ও বাতিল হয়ে যাবে। তাকে নতুন করে ঐ নামাজ আদায় করতে হবে। ঠিক এভাবে যদি কেউ হজ্জ আদায় করলো, এরপর মুরতাদ হলো এরপর পুনরায় সে মুসলমান হলো, এমন অবস্থায় তাকে দ্বিতীয়বার ফরজ হজ্জ আদায় করতে হবে। আর আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে– لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ অর্থাৎ যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ বরং এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী কর, শুধু তারই সম্মুখে মাথা নত কর, শুধু তার কাছেই আশা কর এবং শুধু তার প্রতিই ভরসা কর আর আল্লাহ তা'আলার শুকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও তথা তিনি যে অনন্ত অসীম নিয়ামত দান করে রেখেছেন, তার জন্যে সর্বদা শোকর আদায় করতে থাক।

প্রকৃত বান্দার কর্তব্য : এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত বান্দার দুটি কর্তব্য একান্ত পালনীয় ১. শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করা, তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা তথা তার যাবতীয় বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। ২. আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অগণিত নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করতে থাকা। যারা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত বান্দা তাদের মধ্যে এ দুটি গুণ অবশ্যই থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ .... وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ : আয়াতের শানে নুযূল : তিরমিযী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, একবার এক ইহুদি ধর্মযাজক প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয় এবং বলে 'হে আবুল কাসেম! আল্লাহ তা'আলা যখন আসমানসমূহকে এ আঙ্গুলের উপর আর জমিন সমূহকে এ আঙ্গুলের এবং সমুদ্রগুলোকে এ আঙ্গুলের উপর আর পাহাড়গুলোকে এ আঙ্গুলের উপর রাখবেন, তখন কি অবস্থা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ : কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অপবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু مُتَشَابِهَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ তা'আলা এগুলো থেকে পবিত্র। سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে' এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা : এ আয়াতের মর্মকথা হলো, আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম, সম্মান এবং মর্যাদা যতখানি করা উচিত ছিল, বান্দারা তা করেনি, আর কিয়ামতের দিন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠোয় থাকবে। আসমানগুলো আল্লাহ তা'আলার দক্ষিণ হাতে থাকবে, আর কাফেররা যে শিরক করে, তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য : ইমাম তাবারী (র.) এ কথাটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, যারা কাফের, তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করেনি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে আর একথা বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যিকার মর্যাদা উপলব্ধি করেছে। অতএব, যারা কাফের, মুশরিক, বেদ্বীন তারা আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি, তার অনন্ত অসীম মহিমা সম্পর্কে যদি তারা সঠিক ধারণা করতো, তবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতো না, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হতো না। -[তাফসীরে তাবারী, খ. ২৪, পৃ. ১৭]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা প্রমাণিত হয় না। কেননা বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম হক হলো, তার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি কেউ তাওহীদে বিশ্বাস না করে তথা শিরক করে, তবে সে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। আল্লাহ তা'আলার শান হলো এই যে, কিয়ামতের দিন আসমান জমিন তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতখানি 'মুতাশাবিহাত' এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলার মহান মর্যাদা সম্পর্কে তার বান্দারা কিছুই জানেনা। আর আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আঁচ করা বান্দার পক্ষে সম্ভবই নয়।

মানুষের সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত, হেকমত, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা করা এবং তার হক আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যতখানি জ্ঞান অর্জন করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য, তার ন্যূনতম সীমা হলো তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেই বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য সম্মান করে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এবং বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ বিশাল বিস্তৃত জমিনকে তার কুদরতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। আর আসমানকে গুটিয়ে তার দক্ষিণ হস্তে নেবেন, এরপর ইরশাদ করবেন, আমিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ, জমিনের রাজা বাদশারা কোথায়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আসমানগুলোকে গুটিয়ে ডান হাতে নিয়ে ইরশাদ করবেন, আজ কোথায় সেই শক্তিশালী লোকেরা? কোথায় অহংকারী লোকেরা? এরপর জমিনগুলোকে গুটিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে ইরশাদ করবেন, আমি-ই বাদশাহ, শক্তিশালী লোকেরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?

আবুশ শেখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন আসমান জমিনকে আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। এরপর ইরশাদ করবেন, আমি-ই আল্লাহ আমি-ই রহমান, আমি-ই বাদশাহ, আমি-ই সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। আমি-ই নিরাপত্তা দানকারী, আমি-ই অভিভাবক, আমি-ই বিজয়ী, আমি-ই পরম শক্তিশালী, আমি-ই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, আমি-ই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি, যখন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আর আমি-ই পুনর্জীবন দান করেছি। আজ বাদশারা কোথায়? বড় বড় শক্তিশালী লোকেরা কোথায়?

ইবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইহুদিরা সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিসমূহকে গণনা করেছে। এরপর আসমান জমিন ও ফেরেশতাগণের সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করেছে। এরপর তারা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করেছে, তখন আলোচ্য আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ নাজিল হয়েছে।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং এমন সব কথা বলেছে, যার জ্ঞান তাদের ছিল না তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনুল মুনজির রবী ইবনে আনাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যখন কুরসীই এত বিরাট বিশাল এবং বিস্তৃত, তখন আরশের কি অবস্থা? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ নাজিল করেছেন।

قَوْلُهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ : অর্থাৎ তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের বর্ণিত শরিকদের বহু উর্ধ্বে। অর্থাৎ কাফের মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরকের যে কথা বলে, তা থেকে তিনি পবিত্র। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : صَعِقَ -এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, এখানে প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে।

–[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : দুররে মানসূরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা– হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মিকাঈল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ.) এবং হযরত আজরাঈল (রা.) এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিঙ্গা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে; আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাছীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে হযরত আজরাঈল (আ.)-এর মৃত্যু হবে। সূরা নামলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صَعِقَ -এর পরিবর্তে فَزِعَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ : অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত পয়গাম্বরও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গাম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কুরআনে আছে مَعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ উম্মতে মুহাম্মদীও থাকবে। যেমন– এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন– কুরআনে বলা হয়েছে– وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

قَوْلُهُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আর পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে, নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠ তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন যেভাবে আসমানে সূর্যকে দেখতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার নূর দেখতেও কোনো সন্দেহ থাকবেনা।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের الْأَرْضُ শব্দ দ্বারা এ জমিনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, যাতে মানুষ এখন বসবাস করছে, বরং এটি হবে অন্য জমিন যাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার জন্যে সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন সেখানে তার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন ঐ জমিন তার নূরে আলোয় ঝলমল করে উঠবে। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২৭, পৃ. ১৯]

হযরত হাসান বসরী (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের نُوْرِ رَبِّهَا শব্দটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেভাবে আলো আধারকে দূরীভূত করে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে জুলুমের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেয় সুবিচারের আলো, এজন্যে সুবিচারকে 'নূর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো সেই নূর যা আল্লাহ তা'আলা সেদিনের জন্য সৃষ্টি করবেন, যেমন চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ২৯-৩০ ; তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ২০৩]

قَوْلُهُ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ : অর্থাৎ আর আমলনামা পেশ করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আমলনামা পেশ করা হবে।

বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– সকল আমলনামা আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে রয়েছে। যখন সময় হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে সমগ্র মানব জাতিকে এক ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, যা আমলননামাগুলোকে উড়িয়ে আনবে এবং মানুষের ডান বা বাম হাতে পৌছাবে। এ আমলনামায় যে কথাটি সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ থাকবে তা হলো– اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا . অর্থাৎ পাঠ কর তোমার আমলনামা, তোমার হিসাবের জন্যে আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَجِاْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ : অর্থাৎ নবীগণ ও স্বাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, নবী রাসূলগণের সম্মুখেই মানুষের হিসাব নিকাশ হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন কোনো দিন যায় না, যেদিন সকাল-সন্ধ্যায় হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মুখে তার উম্মতকে হাজির না করা হয়। তিনি তাদের আকৃতিগুলো এবং আমলগুলো দেখে চিনতে পারেন। এজন্যে কিয়ামতের দিন মানুষের সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একথাও বলেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর উম্মত অন্য পয়গাম্বরগণের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা তাদের উম্মতগণকে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পৌঁছিয়েছিলেন।

তাফসীরকার হযরত আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সাক্ষীগণের উল্লেখ রয়েছে তারা হলেন আমলের বিবরণ লিবিপদ্ধকারী ফেরেশতাগণ। আর কিয়ামতের ময়দানে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে, কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না।

قَوْلُهُ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ : অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেওয়া হবে, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেই সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, কারো খবর দেওয়ার বা সাক্ষী রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত আতা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর জন্যে কোনো লেখক বা সাক্ষীর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। আমলনামা বা সাক্ষী কাফেরদের অপরাধ প্রমাণিত করার জন্যেই থাকবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ২০৪]

কোনো কোনো তাফসীরকার এ পর্যায়ে বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলার আদালতে কারো ছওয়াব কম হওয়া অথবা শাস্তি বেশি হওয়া সম্ভবই নয়। কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, সকলের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন কেউ নেই। কাজেই তিনি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দান করবেন, তাতে এতটুকু কম করা হবে না। -[তাফসীরে মাযহারী, পৃ. ৯৩৩]

এবং প্রত্যেকের সকল আমলের পূর্ণ এবং যোগ্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের ভালো-মন্দ আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নেই। পৃথিবীতে যে নেক আমল করে, তার পুরস্কার অবশ্যই সে পাবে, আর মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হবে, তবে যাকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ক্ষমা করেন, তা হবে মহান দাতার দান।

٧١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعُنْفٍ اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا جَوَابُ اِذَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ الْقُرْاٰنَ وَغَيْرَهُ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ .

٧٢. قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى مَأْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ جَهَنَّمَ .

٧٣. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِلُطْفٍ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا الْوَاوُ فِيْهِ لِلْحَالِ بِتَقْدِيْرِ قَدْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ حَالًا فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا وَجَوَابُ اِذَا مُقَدَّرٌ اَىْ دَخَلُوْهَا وَسَوْقُهُمْ وَفَتْحُ الْاَبْوَابِ قَبْلَ مَجِيْئِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَسَوْقُ الْكُفَّارِ وَفَتْحُ اَبْوَابِ جَهَنَّمَ عِنْدَ مَجِيْئِهِمْ لِيَبْقٰى حَرُّهَا اِلَيْهِمْ اِهَانَةً لَهُمْ .

অনুবাদ :

৭১. কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে বিভিন্ন দলে কঠিনভাবে হাকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا বাক্যটি اِذَا -এর জবাব। এবং জাহান্নামের বন্দীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বর আসেনি? যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ কুরআন ইত্যাদি আবৃত্তি করতো এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতো। তারা বলবে, হ্যাঁ কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির নির্দেশই তথা আল্লাহর বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الخ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭২. বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম।

৭৩. যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত থাকা অবস্থায় এতে পৌছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, وَفُتِحَتْ -এর وَاوْ অবস্থাবোধক অব্যয় এবং এতে قَدْ উহ্য রয়েছে তোমাদের প্রতি সালাম ও তোমরা সুখে থাক, طِبْتُمْ বাক্যটি حَالْ অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। خَالِدِيْنَ অবস্থাবোধক পদ। اِذَا -এর জবাব উহ্য অর্থাৎ دَخَلُوْهَا اِذَا এবং জান্নাতীদেরকে নিয়ে যাওয়া ও তারা যাওয়ার পূর্বে দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া সবই তাদের সম্মানার্থে। জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে হাকিয়ে নেওয়া ও তারা যাওয়ার পর দরজা খোলা যাতে জাহান্নামের গরম তেজ বাকি থাকে, সবই তাদের অপমানের জন্য।

٧٤. وَقَالُوا عَطْفٌ عَلٰى دَخَلُوْهَا الْمُقَدَّرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ بِالْجَنَّةِ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ اَىْ اَرْضَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ نَنْزِلُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ط لِاَنَّهَا كُلَّهَا لَا يُخْتَارُ فِيْهَا مَكَانٌ عَلٰى مَكَانٍ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ الْجَنَّةُ .

৭৪. তারা বলবে قَالُوْا উহ্য دَخَلُوْهَا -এর উপর আতফ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদের প্রতি তার জান্নাতের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির তথা জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। কেননা জান্নাতের কোনো অংশকে কোনো অংশের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। আমলকারীদের পুরস্কার জান্নাত কতইনা চমৎকার।

٧٥. وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَآفِّيْنَ حَالٌ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ يُسَبِّحُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ حَآفِّيْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج مُلَابِسِيْنَ لِلْحَمْدِ اَىْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ بِالْحَقِّ اَىِ الْعَدْلِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْجَنَّةَ وَالْكَافِرُوْنَ النَّارَ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خُتِمَ اِسْتِقْرَارُ الْفَرِيْقَيْنِ بِالْحَمْدِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ .

৭৫. আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। اَلْمَلَائِكَةَ - حَآفِّيْنَ থেকে حَالٌ আর يُسَبِّحُوْنَ জুমলা হয়ে حَآفِّيْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ অর্থাৎ তারা বলে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ তাদের সবার মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। অতএব ঈমানদারদেরকে জান্নাতে ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে স্থান দেওয়া হবে। এবং বলা হবে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার। উভয় দলের তথা জান্নাতী ও জাহান্নামীর অবস্থান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার উপরই সমাপ্ত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعُنْفٍ : এখানে وَاوْ টি عَاطِفَةٌ -এর জন্য। আর سِيْقَ হলো فِعْلٌ مَاضِىْ مَجْهُوْلٌ আর الَّذِيْنَ হলো مَوْصُوْلٌ এবং كَفَرُوْا হলো সেলাহ। এখন মওসূল ও সেলাহ মিলে سِيْقَ -এর نَائِبُ فَاعِلٍ হয়েছে। اِلٰى جَهَنَّمَ টা سِيْقَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। زُمَرًا টা حَالٌ হয়েছে زُمَرٌ শব্দটি زُمْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- দল, জামাত।

قَوْلُهُ بِعُنْفٍ : এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে شِدَّتْ এবং سَخْتِىْ বর্ণনা করার জন্য। কেননা জাহান্নামীদের এটাই মুনাসিব অবস্থা।

قَوْلُهُ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِلُطْفٍ : এখানে لُطْفٌ বৃদ্ধি করা হয়েছে সম্মান ও ইজ্জত বর্ণনা করার জন্য।

প্রশ্ন. জাহান্নামী ও জান্নাতী উভয়ের জন্যই سِيْقَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। জাহান্নামীদেরকে জন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে سَحْبٌ ও سَحْبٌ تَعَنِّيٌ তথা কঠোরতার সাথে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। আর জান্নাতীদের জন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া। শব্দ এক, সীগাহ এক, মাদ্দাহও এক। তদুপরি দু জায়গায় অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ কি?

উত্তর. জাহান্নামীদের জন্য سِيْقَ শব্দের ব্যবহার বিশুদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা যখন তাদের জন্য শাস্তি ও আজাবের ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তাদের حَيْثِيَّتْ [পদমর্যাদা] এমন অপরাধীদের সাথে হবে যাকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ জাতীয় বিদ্রোহী ও অপরাধীকে কঠোরতা ও দ্রুততার সাথে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে করে খুবই দ্রুত তাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য সে সকল লোকদের ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে দ্রুততার সাথে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন হতে পারে? তাদেরকে অনেক ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত। এর উত্তর হলো– اَلَّذِيْنَ رَبَّهُمْ -এর পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো مَرَاكِبُ এখন ইবারত এরূপ হবে سِيْقَ الْمَرَاكِبُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের বাহনকে দ্রুততার সাথে চালানো হবে যাতে তারা স্বীয় শান্তির নিবাসে খুবই দ্রুত পৌঁছে যায়। আর শব্দকে উহ্য মানার قَرِيْنَةٌ হলো এই যে, জান্নাতীদেরকে পদব্রজেই নিয়ে যাওয়া হবে না। বরং কবর থেকে বের হতেই তাদের জন্য বাহন প্রস্তুত রাখা হবে। (جُمَلٌ)

مَا اَجْمَلَ قَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ فِيْ هٰذَا الصَّدَدِ قَالَ : فَاِنْ قُلْتَ كَيْفَ عُبِّرَ عَنِ الذَّهَابِ بِالْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعًا بِلَفْظِ السَّوْقِ؟ قُلْتُ : اَلْمُرَادُ بِسَوْقِ اَهْلِ النَّارِ طَرْدُهُمْ اِلَيْهَا بِالْهَوَانِ وَالْعُنْفِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْاُسَارٰى وَالْخَارِجِيْنَ عَلَى السُّلْطَانِ اِذَا سِيْقُوْا اِلٰى حَبْسٍ اَوْ قَتْلٍ وَالْمُرَادُ بِسَوْقِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَوْقُ مَرَاكِبِهِمْ لِاَنَّهُ لَا يُذْهَبُ بِهِمْ اِلَّا رَاكِبِيْنَ وَحَثُّهَا اِلٰى دَارِ الْكَرَامَةِ وَالرِّضْوَانِ كَمَا يُفْعَلُ بِمَنْ يُشَرَّفُ وَيُكْرَمُ مِنَ الْوَافِدِيْنَ عَلٰى بَعْضِ الْمُلُوْكِ فَشَتَّانَ بَيْنَ السَّوْقَيْنِ .

(اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِ)

قَوْلُهٗ حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا : এখানে حَتّٰى টা اِبْتِدَائِيَّةٌ আর اِذَا جَاءُوْهَا হলো شَرْطٌ আর فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا সর্বসম্মতিক্রমে جَزَاءٌ হয়েছে।

প্রশ্ন. এখানে وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا -এর মধ্যে وَاوْ নেওয়া হয়েছে এর পূর্বে وَاوْ নেওয়া হয়নি। এতে কি সূক্ষ্মতা রয়েছে?

উত্তর. এতে সূক্ষ্মতা হলো এই যে, জেলখানার দরজা সাধারণত বন্ধ থাকে। যখন কোনো অপরাধীকে আনা হয় তখন কিছু সময়ের জন্য খোলা হয়। এরপর সাথে সাথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে আগমনকারীদের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে। কাজেই তার জন্য وَاوْ বিহীন হওয়াই যথোপযুক্ত হয়েছে। এটা মেহমানখানা ও বিচরণ গাহের দরজার বিপরীত। এর দরজা বরা ফটক আগন্তুকের অপেক্ষায় সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। আর এতে আগন্তুকদের সম্মানও রয়েছে। কাজেই وَاوْ সহ হওয়াই এর জন্য যথোপযুক্ত।

এখানে اِذَا -এর জবাবে তিন সুরত হতে পারে–

১. وَفُتِحَتْ হলো جَوَابُ شَرْطٍ আর وَاوْ অতিরিক্ত। এটা কুফীগণ ও আখফাশের মতে।

২. جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। আল্লামা যমখশারী বলেন যে, خَالِدِيْنَ -এর পরে উহ্য মানা হবে। কেননা مُتَعَلِّقَاتُ شَرْطٍ -এর পরে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ কে নেওয়া হয়। উহ্য ইবারত হবে اِطْمَأَنُّوْا আর মুবাররাদ سَعِدُوْا উহ্য মেনেছেন। আর মহল্লী (র.) دَخَلُوْهَا উহ্য মেনেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, جَوَابٌ হলো وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, অতিরিক্ত وَاو সহ।

قَوْلُهُ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য যে, خَالِدِيْنَ টা فَادْخُلُوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর حَالٌ ও ذُو الْحَالِ -এর জমানা এক হয়ে থাকে। অথচ এখানে উভয়ের জমানা এক হয়নি। কেননা دُخُوْلٌ -এর পরে خُلُوْدٌ হবে। সাথে সাথেই নয়।

এর জবাব দিয়েছেন যে, তাদের জন্য خُلُوْدٌ টা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে, তাদের জন্য خُلُوْد কে مُقَدَّرٌ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দিনের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করা হবে। এ আয়াত থেকে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, এরপর নেককার মুমিনদের অবস্থা বর্ণিত হবে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রত্যেকটি মানুষকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমলের হিসাব অবশ্যই হবে, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে কোনো কিছুই গোপন নেই, তিনি প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই নাফরমানদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণকে পুরস্কৃত করা হবে। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে– وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ـ অর্থাৎ আর কাফেরদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, এ আয়াতে সত্যদ্রোহী, দূরাত্মা ভাগ্যাহত কাফের মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যখন বিচার শেষ হবে, তখন কাফেরদেরকে অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তখন অত্যন্ত পিপাসাগ্রস্ত হবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে তারা তখন মূক, বধির, অন্ধ থাকবে, তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে দোজখ। যখন দোজখের অগ্নি অপেক্ষাকৃত কম হবে তখন তা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু] পারা. ২৪, পৃ. ২০]

قَوْلُهُ زُمَرًا : অর্থাৎ দোজখীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে, যেমন কেউ অগ্নিপূজক, কেউ মূর্তিপূজক, কেউ নাস্তিক, কেউ মুনাফিক, কেউ মুরতাদ। এই প্রকারভেদের কারণে কিয়ামতের দিনও তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। আর প্রত্যেক প্রকার কাফেরের এক একটি দল হবে আর এভাবে প্রত্যেক দলকে হাঁকিয়ে দোজখে পৌঁছানো হবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ـ অর্থাৎ কাফেরদের প্রত্যেক দল থেকে আমরা সেসব লোককে বেছে নেব যারা কুফরি ও নাফরমানিতে ছিল অত্যন্ত কঠোর।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বড় বড় কাফেরদের এক দল হবে, আর ছোটদের ভিন্ন দল হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ .... لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ـ : অর্থাৎ অবশেষে যখন তারা দোজখের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার প্রবেশ দ্বারা খুলে দেওয়া হবে এবং দোজখের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল আগমন করেননি? যারা তোমাদের সম্মুখে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং এদিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সাবধান করতেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দোজখের সাতটি প্রবেশ দ্বারই রুদ্ধ থাকবে, কাফেররা দোজখের কাছাকাছি হলে তাদের জন্যে তা খুলে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের লজ্জা এবং অনুতাপ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দোজখের রক্ষীরা তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাঁর প্রেরিত কোনো নবী রাসূল কি তোমাদের এদিন সম্পর্কে সাবধান করেননি?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, দোজখের রক্ষীরা তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট তো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী রাসূল পৌঁছেছিলেন, তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম তোমাদেরকে শুনিয়েছিলেন তবুও কেন শিরক বর্জন করনি? কেননা আল্লাহ তা'আলার বিধানের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ তা'আলার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে বিবেক বুদ্ধিই যথেষ্ট। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকেও প্রেরণ করেছেন, আসমানি গ্রন্থসমূহ নাজিল করেছেন এবং সত্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন, এরপর শিরক ও কুফরের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কোনো যুক্তি থাকে না।

قَوْلُهُ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ : অর্থাৎ তারা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই আগমন করেছিলেন নবী রাসূলগণ, কিন্তু আসলে কাফেরদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ তারা বলবে, পথ-প্রদর্শক নবী রাসূলগণ আগমন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, আমরা তাদের কথা শুনেছি, মেনে চলিনি, তাই কাফেরদের ক্ষেত্রে আজাবের বিধান অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ : অর্থাৎ তাদেরকে হুকুম করা হবে, দোজখের দ্বারে প্রবেশ কর, চিরকাল তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে, কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। অর্থাৎ যখন কাফেররা দোজখের প্রবেশ দ্বারে হাজির হবে, তখন তাদের প্রতি নির্দেশ হবে, তোমরা দোজখে প্রবেশ কর। যারা অহংকারী, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ এবং তাদের ঠিকানা কত মন্দ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে অহংকারীদের আবাসস্থল কত মন্দ। এর তাৎপর্য হলো, কুফরি ও নাফরমানির কারণেই দোজখের শাস্তি হবে আর কুফরি ও নাফরমানির কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, কুফরি করা হয়েছে তাদের অহংকারের কারণে। কেননা এই কাফেররা তাদের অন্তর্নিহিত দম্ভের কারণে নবী রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাদের প্রতি ঈমান আনেনি, এজন্যে তাদেরকে অপমানিত অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়ার জীবনে দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ করেছিলে, আল্লাহ তা'আলার বিধান অমান্য করেছিলে, তার প্রেরিত নবী রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলে, আর তারই পরিণতি স্বরূপ চিরদিন দোজখের আজাব ভোগ করতে থাক।

قَوْلُهُ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا .... فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ : অর্থাৎ আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে আসা হবে। যখন তারা বেহেশতের নিকট উপস্থিত হবে এবং বেহেশতের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বেহেশতের দ্বার রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্য।

পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দিন দোজখীদের যে অবস্থা হবে তা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে বেহেশতবাসীগণের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যারা সেদিন ভাগ্যবান হবেন তাদেরও বহু দল হবে। আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য ভাগ্যবানদের দলকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জান্নাতের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছানো হবে, এরপর যাদের মরতবা অপেক্ষাকৃত কম তাদেরকে আনা হবে। নবীগণ এবং তাদের সাথীগণকে আনা হবে, সিদ্দিক এবং শহীদগণকে আনা হবে, ওলামায়ে কেরাম এবং তাদের সাথীগণকে আনা হবে। এভাবে একের পর এক জান্নাতী লোকদের দলকে পৌঁছানো হবে। জান্নাতের দ্বার প্রান্তে তারা অপেক্ষা করবেন। এ মর্মে যে, সর্বপ্রথম কাকে অনুমতি দেওয়া হয়?

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দ্বারে করাঘাত করবো।

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যখন জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবো, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি কে? আমি বলবো, মুহাম্মদ ﷺ। তখন সে বলবে আমার প্রতি হুকুম হয়েছে আপনার আগমনের পূর্বে কারো জন্যে যেন আমি জান্নাতের দ্বার না খুলি।

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে আরো রয়েছে, সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় হবে। তাদের থুথু, নাকের পানি, প্রস্রাব-পায়খানা কিছুই থাকবে না, তাদের খাবার ও পান পাত্র এবং অন্যান্য আসবাবপত্র স্বর্ণ রৌপ্যের হবে। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর। -[আল হাদীস]

অন্য একখানা হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, প্রথমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় চমকদার হবে।

একথা শ্রবণ করে হযরত উক্কাশা ইবনে মোহসেন (রা.) আরজি পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর একজন আনসারী সাহাবী অনুরূপ দোয়া করার জন্য আরজি পেশ করলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, উক্কাশা তোমার পূর্বে সুযোগ নিয়ে ফেলেছেন। এ সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার কথা আরো বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাতশত একসঙ্গে জান্নাতে যাবে। একজন আরেকজনের হাত ধরে রাখবে, সকলে একসঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় হবে।

ইবনে আবি শায়বায় রয়েছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালক এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আর প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরো সত্তর হাজার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। তাদের নিকট থেকে কোনো হিসাব নেওয়া হবে না এবং তাদের কোনো শাস্তিও হবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ২৪, পৃ. ২২]

মুসনাদে আহমদে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি তার ধন সম্পদের জোড়া আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করে। [অর্থাৎ একই বস্তু দুটি দান করবে] তাকে জান্নাতের সকল দ্বার থেকে ডাকা হবে। জান্নাতের কয়েকটি দ্বার রয়েছে, নামাজিকে 'বাবুস সালাত' থেকে এবং দানবীর ব্যক্তিকে 'বাবুস সাদাকাত' থেকে মুজাহিদ ব্যক্তিকে 'বাবুল জিহাদ' থেকে আর রোজাদারদেরকে 'বাবুর রাইয়্যান' থেকে ডাকা হবে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবূ বকর (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদিও প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দ্বার থেকে কাউকে ডাকা হোক, কিন্তু এমন কেউ কি থাকবে, যাকে প্রত্যেক দ্বার থেকে ডাকা হবে। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, [তা হবে] আর আমি আশা করি যে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ১০৭]

বুখারী শরীফ ও মুসলিমে সংকলিত আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, জান্নাতের আটটি দ্বার থাকবে, তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'বাবুর রাইয়্যান' তাতে শুধু রোজাদাররাই থাকবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে অজু করে পাঠ করবে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" তার জন্যে বেহেশতের আটটি দ্বার খুলে যাবে, যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু] পা. ২৪, পৃ. ২২]

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, যখন জান্নাতীগণকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, জান্নাতের প্রবেশ দ্বারের কাছে তারা একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে, যার নীচ থেকে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। একটি ঝর্ণায় মুমিন ব্যক্তি গোসল করবে, ফলে তার দেহের বহির্ভাগ পবিত্র হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় ঝর্ণার পানি সে পান করবে ফলে সে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করবে। ফেরেশতাগণ জান্নাতের দ্বার প্রান্তে তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে বলবেন- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِيْنَ . অর্থাৎ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্য।

হযরত জুযাজ (র.) বলেছেন- طِبْتُمْ শব্দটির অর্থ হলো, তোমরা দুনিয়াতে শিরক এবং পাপাচার থেকে পবিত্র ছিলে, তাই এ পবিত্র স্থানেও তোমরা আনন্দিত থাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তোমাদের এ স্থানটি পবিত্র।

قَوْلُهُ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ : অর্থাৎ অতএব তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। অর্থাৎ যেহেতু তোমরা শিরক, কুফর এবং যাবতীয় নাফরমানি থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছ, অতএব পবিত্রতম স্থান জান্নাতে প্রবেশ কর, আর জান্নাতে তোমাদের অবস্থান সাময়িক নয়; বরং চিরস্থায়ী হবে। অতএব, এ বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নাফরমানি ও পাপাচার থেকে পবিত্রতা অর্জনই জান্নাতে প্রবেশের চাবিকাঠি হবে।

এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তির উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যার মর্ম হলো, যেহেতু জান্নাত পবিত্র স্থান তাই জান্নাতবাসীগণের আবাসস্থল হিসেবে তা নির্বাচিত হয়েছে যেমন কাফেরদের কুফরি ও নাফরমানিতে অপবিত্রতার জন্যে তারা দোজখে অবস্থানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ : উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগবাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে। -[তাবারানী]

আবূ নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গাম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপ দেখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা শুনে কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ.) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا . এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গাম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-মু'মিন [গাফির]

নামকরণের কারণ : উল্লিখিত সূরাটি اَلْمُؤْمِنُ [আল-মু'মিন] নামে প্রসিদ্ধ। তবে এর আর একটি প্রসিদ্ধ নামও রয়েছে। তা হলো غَافِرٌ (গাফির)। আলোচ্য সূরাটির আটাশ নম্বর আয়াত "وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" [ফেরাউনের বংশধরদের মধ্য হতে এক ঈমানদার ব্যক্তি বলল]। উক্ত আয়াতস্থ مُؤْمِنٌ শব্দটির দ্বারাই আলোচ্য সূরাটির নাম اَلْمُؤْمِنُ বলে রাখা হয়েছে। তাইতো এটি এমন একটি সূরা যাতে ঐ বিশেষ ঈমানদারের আলোচনা স্থান পেয়েছে যে সত্যের ধ্বজাধারী ও বাতিলের আতঙ্কের রূপ ধারণ পূর্বক পর্বতসম সৎসাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তৎকালীন স্বঘোষিত প্রভু ফেরাউন [লা'নাতুল্লাহি আলাইহি]-এর সম্মুখে পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

অপরদিকে সূরাটির তৃতীয় আয়াত (اَلْاٰيَةَ) غَافِرِ الذَّنْبِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِخَلْقِهِ হতে غَافِرٌ শব্দ চয়নে নামকরণ করা হয়েছে غَافِرٌ বলে। এতে বলা হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা সে মহান সত্তা যিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করতঃ তাদের পাপ মার্জনা করেন।

এতদুভয় ব্যতীত এ সূরাটিকে سُوْرَةُ الطَّوْلِ - سُوْرَةُ اٰلِ حٰمٓ এবং ذَاتُ حٰمٓ ও বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কুরআনে হাকীমের সর্বমোট সাতটি সূরার প্রারম্ভে অনুরূপ حٰمٓ [হা-মীম] রয়েছে। এদেরকে একত্রে اَلْحَوَامِيْمُ বলা হয়।

সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) লেখেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরকার আতা ও ইকরামা (র.)ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বায়হাকীর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সাতটি সূরা 'হা-মীম' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিই মক্কায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা যুমারের প্রারম্ভে ওহীর সত্যতা তথা পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা ছিল। আর সূরা যুমারের পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁর বান্দাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য এবং গুণাবলি পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, আর এ সূরাও মহান আল্লাহর এমনি গুণাবলির বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যেমন- তিনি عَزِيْزٌ [পরাক্রমশালী], তিনি عَلِيْمٌ [মহাজ্ঞানী], তিনি غَافِرِ الذَّنْبِ [গুনাহ মার্জনাকারী], তিনি قَابِلِ التَّوْبِ [তওবা কবুলকারী], তিনি شَدِيْدِ الْعِقَابِ [অবাধ্য বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি প্রদানকারী], তিনি অনন্ত অসীম ক্ষমতাবান, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, সমগ্র মানব জাতিকে পরিশেষে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির বিষয়বস্তুর আলোকে বুঝা যায় যে, এটা ইসলামের ঊষালগ্নে অবতীর্ণ হয়। তাফসীর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও যায়েদ (রা.) -এর অভিমত হলো, সূরাটি সূরা যুমার-এর পর পরই নাজিল হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা যুমার নাজিল হয়েছে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে। নাজিল হওয়ার বিন্যাস অনুযায়ী সূরাটি সূরাসমূহের ক্রমধারায় যথাস্থানে স্থাপিত রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কালে মক্কার সামাজিক অবস্থা : সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও ভাবধারার বর্ণনায় তৎকালীন মক্কার সামাজিক অবস্থা অনেকটা ফুটে উঠে। মক্কার কাফের ও মুশরিকরা তখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর আনীত দীন ইসলামকে ঘিরে দু ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

১. মক্কার অধিবাসী। যারা ছোটবেলা হতেই মহানবী ﷺ-কে সত্যবাদী আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আজ তারাই হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে জাগতিক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে নবী জন্মভূমি মক্কা তথা তার প্রত্যন্ত প্রান্তে বিশ্বনবীর আনীত দীনের ও তাঁর সার্বজনীন সংবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সত্যতা চ্যালেঞ্জে বিতর্ক জুড়ে দেয়। শুরু করে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, নানান ধরনের অপ্রাসঙ্গিক উল্টা-পাল্টা প্রশ্নের উত্থাপন। নব নব ভিত্তিহীন অভিযোগের গণজাগরণে তখনকার আকাশ বাতাস ভারি ছিল। ইসলামের দাওয়াত, কুরআনের শিক্ষার এমনকি স্বয়ং নবী করীম ﷺ সম্পর্কে মানুষের মনে ক্রমাগত নানান সন্দেহ-সংশয়ের জাল বুনার গভীর ষড়যন্ত্রে ব্যাপ্ত ছিল গোটা বেদীন শক্তি। তা নিরসনে মহানবী ﷺ ও ঈমানদারগণ যেন শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েন। এরই ফল হলো নবীজির মদীনা হিজরত।

২. ইসলাম বিদ্বেষীরা মহানবী ﷺ -এর রক্ত পিপাসু হয়ে উঠে। নবী করীম ﷺ -কে শহীদ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। এহেন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দৃঢ়সংকল্পে তারা ষড়যন্ত্রের ক্রমধারা অব্যাহত রাখে। একবার তা বাস্তবায়ন করার কল্পে পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। এ পরিসরে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম ﷺ হেরেম শরীফে নামাজেরত ছিলেন, এমন সময় উকবাহ ইবনে আবী মুয়ায়িত অগ্রসর হয়ে মহানবী ﷺ -এর গলায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে তাঁকে পাকাতে ও টানতে লাগল। মূলত গলায় ফাঁস লাগিয়ে নবী করীম ﷺ -কে হত্যা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি সজোরে ধাক্কা মেরে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত উকবার সাথে ধস্তাধস্তির সময় বলছিলেন- "اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ" অর্থাৎ 'তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যে বলছেন আল্লাহ আমার প্রভু!'

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় তিনটি বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরিক নেই। এ তাওহীদের বর্ণনা কোথাও ইসতিদলালী তথা তা দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন এবং কোথাও কোথাও তার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনিভাবে কুফর হতে নিষেধাজ্ঞা, আবার কোথাও তাওহীদের ধারক-বাহকদের প্রশংসা আর সুসংবাদ।

২. বিবাদ সৃষ্টিকারী কাফের মুশরিকদেরকে ধমকি প্রদান। সত্যের ব্যাপারে এ বিবাদ সৃষ্টিকারীরা ব্যাপক। সুতরাং রাসূলকে অস্বীকারকারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠোর শাস্তির ধমকি দেওয়া হয়েছে।

৩. মক্কার কাফের মুশরিক কর্তৃক মহানবী ﷺ -কে নানান লাঞ্ছনা-প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অপপ্রচার এমনকি জীবন নাশের ব্যর্থ পরকল্পনায় রাসূল ﷺ যখন বিচলিত এ দিকে মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের এ অসহায়তাবোধকে দূরীকরণে এবং স্বীয় মিশন পরিচালনায় প্রত্যয়ী থাকার জন্য সান্ত্বনা দেন। তাই এ পরিসরে বর্ণনায় বিস্তারিত স্থান পায় হযরত মূসা (আ.) ও মারদূদ ফেরাউনের মধ্যকার ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের বাণী শুনানো। সাথেই অতীতের পয়গাম্বরগণের প্রেরণ ও সমকালীন নির্যাতন ও বাধাবিপত্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ সূরার রৌনক।

উল্লেখ্য, সূরা মু'মিন হতে সূরা আহক্বাফ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাতটি সূরা حٰمٓ (হা-মীম) দ্বারা শুরু হয় অথচ এ সবগুলোর প্রারম্ভিক আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন আর হলো কুরআন আল্লাহর ওহী।

সূরাটির সারসংক্ষেপ : পূর্বের আলোচনায় এসেছিল যে, আলোচ্য সূরাতে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, অর্থাৎ ক. توحيد তথা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে তাঁর প্রভুত্বে ও ইবাদতে কাউকে শরিক না মানা। খ. ইসলাম ও তার পয়গাম্বরের বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতির সংবাদ দান। গ. বিরুদ্ধবাদীদের হিংসা ও কার্যকলাপে বিচলিত না হতে আল্লাহ কর্তৃক তদীয় রাসূলকে সান্ত্বনা প্রদান ইত্যাদি। কুরআন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এগুলোর যথাস্থানে যথোপযোগী পরিসরে অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও প্রশিক্ষণের ধারায় সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা প্রদত্ত হলো–

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে আজ তোমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যে নৃশংস আচরণ করে আসছ ঠিক শত শত বৎসর পূর্বে ফেরাউন ও তার বাহিনী ক্ষমতার দম্ভে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুগামীদের সাথে অনুরূপ করতে চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদের জেনে রাখা চাই যে, ফেরাউন ও অনুগত বাহিনীর যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তোমাদেরকেও তার ভাগ্য বরণ করতে হবে।

২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে সান্ত্বনামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, জালিমদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের মোকাবিলায় তোমরা নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না এবং হিম্মতহারা হয়ো না। তোমাদের বুকে এ অটুট বিশ্বাস বেঁধে নাও যে, তোমরা যে মহান সত্তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সম্মুখ সফর করছ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে সকল শক্তি ও ক্ষমতা তুচ্ছ। তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।

জালিম তথা তাগুতের হুঙ্কার, অত্যাচার ও ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার বিপরীতে একটি অন্যতম অস্ত্র হলো– إِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট প্রত্যেক অহংকারী হতে যে হিসাব-নিকাশের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না।

একটি মন্তব্য : আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক ভরসা করতঃ সর্বপ্রকার ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দীনের হিতে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে, পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। এ কালের ফেরাউনরাও সে অবস্থায় সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সে কালের ফেরাউনরা। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম-রোলার যতই বেগবান হয়ে আসুকনা কেন তার সবটাই অপূর্ব ধৈর্য সহকারে মোকাবিলা করে দীনের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা উচিত।

৩. সত্য দীনের ব্যাপারে মক্কায় দিবারাত্র যে বিতর্ক চলছিল তা নিরসনকল্পে একদিকে যেমন দলিল ও যুক্তি দ্বারা তাওহীদ ও পরকালের বাস্তবতা প্রমাণ করে দেওয়া হলো। মক্কাবাসী কাফের মুশরিকরা কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই এ মহান সত্যনিষ্ঠ কথাগুলোর বিরুদ্ধে অযথাই কলহ-বিবাদে লিপ্ত তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। বাইরে তারা দেখছিল যে, নবী করীম ﷺ -এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধেই তাদের মূল অভিযোগ-আপত্তি। এজন্যই তারা তা মেনে নিতে পারছিল না। বস্তুত তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বেই লিপ্ত ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহমিকা ও অহঙ্কারবোধই হলো বিশ্ব স্রষ্টার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নেতৃত্ব স্বীকার না করাও আনুগত্য না করার মূল কারণ। তোমাদের কাপুরুষিত ধারণা মতে হযরত মানুষেরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত মেনে ইসলামি দর্শনের উপর চললেই বুঝি তোমাদের নেতৃত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এজন্যই তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছ।

অতএব, কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো– তোমরা মুহাম্মদের বিরোধিতার ধ্বংসশীল প্রাচীর হতে বেরিয়ে তাঁর সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করো। তা না হয় দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদায়ক আজাব ও প্রবঞ্চনা তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। সেদিন অতীতের সব ভুল স্মরণ পড়বে। দম্ভ আর গৌরবের কেল্লা মিসমার হয়ে যাবে। হাজারো আফসোস, অনুতাপ আর অনুনয়-বিনয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারবে না। পরন্তু তোমাদের সামনে তওবারও সুযোগ থাকবে না।

সূরাটির বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত :

১. বায়হাকী প্রিয়নবী ﷺ -এর একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আলে হামীম (অর্থাৎ যে সমস্ত সূরা حٰمٓ [হা-মীম] শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে) সাতটি, আর দোজখের দরজাও সাতটি, ১. জাহান্নাম, ২. হুতামাহ, ৩. লামা, ৪. সাঈর, ৫. সাকার, ৬. হাবীয়াহ ও ৭. জাহীম। যারা এ হা-মীম বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করবে, এর প্রত্যেকটি দোজখের দরজা থেকে তাকে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করবে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী, ৬/১০৯]

২. আল্লামা বাগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তুরই মগজ থাকে, পবিত্র কুরআনের মগজ হলো হা-মীম বিশিষ্ট সূরাসমূহ।

৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, "اٰلُ حٰمٓ" কুরআন মাজীদের রেশমি বস্ত্র অর্থাৎ সৌন্দর্য। -[হাকিম]

৪. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লেখেছেন, 'হা-মীম' আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্যতম।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর, (উর্দু) পারা-২৪, পৃ- ২৫]

৫. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম, ইমাম কাতাদা (র.)ও একথাই বলেছেন।

-[তাফসীরে তাবারী, পারা-২৪, পৃষ্ঠা- ২৬]

৬. **বিপদ-আপদ হতে হেফাজত :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, দিনের শুরুতে যদি কেউ আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত [অর্থাৎ حٰمٓ হতে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত] তেলাওয়াত করে সে উক্ত দিবস সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্ত থাকবে। -[তিরমিযী, মুসনাদে বায়যাবী]

৭. **শত্রুর অনিষ্ট হতে হেফাজত :** হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবূ সুফরাহ (র.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। মহানবী ﷺ কোনো যুদ্ধে রাত্রিবেলা হেফাজতের জন্য বলেছেন- তোমাদের উপর যদি রাত্রে আক্রমণ করা হয়, তাহলে তোমরা حٰمٓ ..... لَا يُنْصَرُوْنَ পড়বে। এর সারকথা হলো حٰمٓ -এর সাথে এ দোয়া করবে যে, "আমাদের দুশমন সফল না হোক।" এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, حٰمٓ শত্রুর ত্রাস হতে নিরাপত্তা পাওয়ার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে কাছীর]

চরিত্র সংশোধনে অত্র সূরার ভূমিকা : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবূ হাতেম হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে সিরিয়ায় একজন প্রভাবশালী সুপুরুষ ছিলেন। কিছু দিন যাবৎ সে আসছিল না। হযরত ওমর (রা.) লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন তারা বলল, আমীরুল মু'মিনীন! তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। সে তো এখন মদ্যপানে ব্যস্ত রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) তাঁর লেখককে ডেকে নিম্নোক্ত ভাষায় একখানা পত্র লেখতে বললেন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আপনারা দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন তার কলবকে ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল করেন। হযরত ওমর (রা.) একজন বাহকের মাধ্যমে উক্ত পত্রখানা পাঠালেন। আর বাহককে বলে দিলেন, সে যেন লোকটির হুঁশ ফিরে আসার পর তার হাতে পত্রখানা দেয়, অন্য কারো নিকট যেন তা সোপর্দ করে না আসে। হযরত ওমরের পত্র পেয়ে লোকটি তা বারংবার পাঠ করতে থাকে এবং ভাবল যে, এতে আমাকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে তো ক্ষমার প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান। অতঃপর কাঁদতে লাগল এবং মদ্যপান হতে ফিরে আসল। এমনি তওবা করল যে জীবনে সে আর মদ স্পর্শ করেনি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. হা-মীম। এটার উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন।

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهٗ اَلْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ اَلْعَلِيْمِ بِخَلْقِهٖ ـ

২. এ কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ) আল-কুরআন মুবতাদা আল্লাহর পক্ষ হতে মুবতাদার খবর যিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজ্যে সর্বজ্ঞাত নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে।

٣. غَافِرِ الذَّنْبِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَقَابِلِ التَّوْبِ لَهُمْ مَصْدَرٌ شَدِيْدِ الْعِقَابِ لِلْكَافِرِيْنَ اَىْ مُشَدِّدُهٗ ذِى الطَّوْلِ ط اَىِ الْاِنْعَامِ الْوَاسِعِ وَهُوَ مَوْصُوْفٌ عَلَى الدَّوَامِ بِكُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الصِّفَاتِ فَاِضَافَةُ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا لِلتَّعْرِيْفِ كَالْاَخِيْرَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ ـ

৩. গুনাহ মার্জনাকারী ঈমানদারদের এবং তওবা কবুলকারী তাদের জন্য [اَلتَّوْبِ শব্দটি] মাসদার। কঠিন শাস্তি প্রদানকারী কাফেরদের জন্য অর্থাৎ কাফেরদের শাস্তিকে কঠোরতা দানকারী। অনুগ্রহকারী অর্থাৎ ব্যাপক অনুগ্রহ প্রদানকারী। প্রোক্ত এসব গুণাবলির দ্বারা তিনি সদাসর্বদা গুণান্বিত। উক্ত সিফাতসমূহের মুশতাক তথা ইসমে ফায়িল-এর ইযাফত মা'রিফা বা নির্দিষ্ট করার জন্য, যেমনটি শেষোক্তটি (ذِى الطَّوْلِ) -এর ক্ষেত্রে হয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٤. مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ لِلْمَعَاشِ سَالِمِيْنَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُمُ النَّارُ ـ

৪. আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে কেউই বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় না। আল-কুরআনের ব্যাপারে তবে কাফেররা মক্কাবাসীদের মধ্য হতে সুতরাং বিভিন্ন দেশে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। জীবিকা উপার্জনে আরাম-আয়েশে থাকা। কেননা তাদের পরিণাম হলো জাহান্নাম।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ كَعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ يَقْتُلُوْنَ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا يُزِيْلُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ نَنْ بِالْعِقَابِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ لَهُمْ اَيْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ .

৫. তাদের পূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিও রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল। এ ছাড়া অন্যান্য জাতিরাও যেমন– আদ, ছামূদ ও অপরাপর জাতিরা তাদের পরে। প্রত্যেক জাতিই তাদের রাসূলের ব্যাপারে ফন্দি এঁটেছিল তাঁকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য আর তারা অযথা-অকারণে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল যেন তারা হটায়ে দিতে পারে, বিদূরিত করতে পারে তা দ্বারা সত্যকে অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। সুতরাং আমার এ শাস্তি প্রদান কেমন হলো? তাদেরকে অর্থাৎ তা যথাস্থানেই পতিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

আয়াতাংশে غَافِرْ . قَابِلْ ও شَدِيْد -এর মহল্লে ই'রাব কি? জমহুর তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতাংশের শব্দত্রয় . قَابِلْ غَافِرْ ও কে 'মাজরূর'-এর মহল হিসেবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ তাদের মতানুসারে এগুলো مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ [মহল্লান মাজরূর]। তবে কিসের বিবেচনায় মাজরূর হবে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে–

১. নাহুশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম ফাররা (র.) বলেছেন– قَابِلِ التَّوْبِ - غَافِرِ الذَّنْبِ ও شَدِيْدِ الْعِقَابِ এরা পূর্ববর্তী اَللّٰهُ শব্দ -এর صِفَتْ হিসেবে অবস্থান করছে। আর আল্লাহ শব্দটি যেহেতু এখানে مَجْرُوْرٌ বা যের বিশিষ্ট হয়েছে সেহেতু এরাও মাজরূর হবে।

২. ইমাম মু'আয (র.) বলেছেন, এখানে শব্দত্রয় غَافِرْ - قَابِلْ ও شَدِيْد তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ শব্দ হতে بَدَلْ হওয়ার কারণে مَجْرُوْرٌ বা যের বিশিষ্ট হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, اَللّٰهُ শব্দ হতেও حَالْ হওয়ার কারণে এগুলো مَنْصُوْبٌ তথা যবর বিশিষ্ট হবে।

'شَدِيْدُ الْعِقَابِ' ইযাফাতে লাফযিয়াহ। অথচ اِضَافَةٌ لَفْظِيَّةٌ মা'রিফার অন্তর্ভুক্ত নয়; সুতরাং এটা কিভাবে اَللّٰهُ শব্দের সিফাত হবে? অত্র আয়াতে شَدِيْدُ الْعِقَابِ টা ইযাফতে লাফযিয়াহ -এর শ্রেণিভুক্ত। এটা দ্বারা تَخْفِيْف তথা হালকাকরণ হলেও تَعْرِيْف বা নির্দিষ্টকরণ অর্জিত হয় না। কাজেই তা কিভাবে اَللّٰهُ শব্দটির সিফাত হতে পারে? কেননা اَللّٰهُ মা'রিফাহ আর মা'রিফার সিফাত মা'রেফাহ হওয়াই শর্ত। মুফাসসিরীনে কেরাম এটার নানানভাবে উত্তর প্রদান করেছেন–

ক. পূর্বেকার দুটি مَعْرِفَةٌ সিফাত তথা اَلْعَزِيْزُ ও اَلْعَلِيْمُ ইত্যাদি এর সাথে হওয়ার কারণে এটা نَكِرَةٌ হয়েও مَعْرِفَةٌ অর্থাৎ اَللّٰهُ শব্দের সিফাত হতে পেরেছে।

খ. এটা اَللّٰهُ এর সিফত নয়; বরং اَللّٰهُ হতে حَالْ (অবস্থাজ্ঞাপক) হয়েছে। আর حَالْ টা نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্টই হয়ে থাকে।

গ. অত্র শব্দটি নাকিরাহ হলেও যেহেতু এদের মধ্যে دَوَامٌ ও اِسْتِمْرَارٌ (সদা-সর্বদা)-এর অর্থ বিদ্যমান সেহেতু এটা মা'রিফার সিফাত হওয়া বৈধ হয়েছে।

ঘ. এটা সিফাত নয়; বরং اَللّٰهُ শব্দ হতে بَدَلْ হয়েছে। কায়েদা রয়েছে– نَكِرَةٌ মা'রিফাহ হতে بَدَلْ হতে পারে।

ঙ. আলোচ্য শব্দটির মধ্যে حَالْ ও اِسْتِقْبَالْ (বর্তমান ও ভবিষ্যতে)-এর অর্থ বিদ্যমান। তাই তা نَكِرَةٌ হয়েও مَعْرِفَةٌ হতে সিফাত হতে পেরেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

"وَهُوَ مَوْصُوْفٌ عَلَى الدَّوَامِ" **বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার কি বুঝাতে চেয়েছেন?** উল্লিখিত বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য আয়াতে غَافِرُ ـ قَابِلُ ও شَدِيْدُ শব্দত্রয় مُشْتَقّ "ইসমে যাত" নয়; আর ইসমে মুশতাক مُضَافٌ হলেও مَعْرِفَةٌ হয় না। তাই এ শব্দত্রয়ও إِضَافَتْ-এর কারণে مَعْرِفَةٌ হবে না। তাহলে কিভাবে এরা একটি مَعْرِفَةٌ তথা اَللّٰهُ-এর সিফত হতে পারে? অথচ مَعْرِفَه-এর صِفَتْ হওয়ার জন্য مَعْرِفَةٌ হওয়া জরুরি।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, اَسْمَاءُ مُشْتَقَّةٌ-এর মধ্যে دَوَامُ ও اِسْتِمْرَارُ তথা সদাসর্বদার অর্থ পওয়া গেলে তারা مَعْرِفَةٌ-এর উপকারিতা দেয় অর্থাৎ মা'রিফা-এর صِفَتْ হওয়ার যোগ্যতা পেয়ে যায়। কাজেই বিজ্ঞ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, আলোচিত গুণাবলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সদাসর্বদা গুণান্বিত হওয়ার কারণে এরা اِسْمُ مُشْتَقّ হওয়া সত্ত্বেও مَعْرِفَهْ হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং اَللّٰهُ যা مَعْرِفَةٌ তার সিফাত হওয়া বৈধ হয়েছে। সুতরাং সহজেই অনুধাবন হলো যে, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) স্বীয় বক্তব্য وَهُوَ مَوْصُوْفٌ عَلَى الدَّوَامِ بِكُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الصِّفَاتِ الخ দ্বারা উপরিউক্ত আলোচনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) شَدِيْدِ الْعِقَابِ-এর তাফসীর مُشَدَّدُهْ দ্বারা কেন করলেন? বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জালালাইনের দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থকার আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) আলোচ্যাংশে شَدِيْدِ الْعِقَابِ-এর তাফসীর করেছেন مُشَدَّدُهْ এর দ্বারা। এর দ্বারা তিনি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি হলো شَدِيْد শব্দটি صِفَتْ مُشَبَّهْ আর সিফতে মুশাব্বাহ তার فَاعِلْ বা কর্তার দিকে إِضَافَتْ করা হলে তা إِضَافَتْ لَفْظِيَّةْ হয়ে থাকে, إِضَافَتْ لَفْظِيَّةْ দ্বারা مَعْرِفَهْ হয় না। এমনকি اِسْتِمْرَارْ ও دَوَامْ-এর অর্থ প্রকাশ করলেও তা মা'রিফার صِفَتْ হতে পারে না। এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেছেন, উল্লিখিত إِضَافَتْ টি إِضَافَتْ لَفْظِيَّةْ হিসেবে নয়; বরং ইযাফতে হাকীকিয়াহ। সুতরাং شَدِيْد শব্দটি এখানে صِفَتْ হিসেবে নয়; বরং ইসমে ফায়েল-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ" **আয়াতাংশের শুরুতে فَاءْ অব্যয়টি কোন অর্থে ব্যবহৃত :** আলোচ্য আয়াতাংশের প্রারম্ভে (فَلَا يَغْرُرْكَ الخ) فَاءْ বর্ণটি উহ্য শর্তের جَزَاءْ তথা শর্তের জবাব নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ ফা'টির নাম فَاءْ جَزَائِيَّةْ বাক্যটি হবে নিম্নরূপ- "وَإِذَا عَلِمْتَ اَنَّهُمْ كُفَّارٌ فَلَا تَحْزَنْ وَيَغْرُرْكَ اَمْهَالُهُمْ فَاِنَّهُمْ مَاخُوْذُوْنَ عَنْ قَرِيْبٍ"

অর্থাৎ যখন তুমি অবগত হবে যে, তারা কাফের, তখন তুমি চিন্তিত হয়ো না এবং তাদেরকে ঢিল দেওয়াটা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ঠেলে দেয়। নিশ্চয়ই তাদেরকে অচিরেই পাকড়াও করা হবে। উক্ত আরবি গোটা অংশটা جَزَاءْ [জাযা] আর جَزَاءْ-এর শুরুতে فَاءْ এসে থাকে।

"فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ" **-এর জবাব কি? :** আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ইরশাদ "فَكَيْفَ كَانَ عِقَابْ" অর্থাৎ সুতরাং আমার আজাব কিরূপ ছিল? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জবাব নিজে না দিয়ে পাঠক চিন্তাবিদের কাছে ছেড়ে দেন। এর জবাব লুপ্ত রয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এর জবাব হলো- كَانَ عَذَابِيْ شَدِيْدًا অর্থাৎ আমার আজাব অত্যন্ত কঠিন ছিল। আসলে এ ধরনের স্থানে পাঠক বা শ্রোতাদের মনোযোগ এ রহস্য উদঘাটনের জন্য বক্তা এরূপ অসম্পূর্ণ বলে থাকে। এটা ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি পাঠ।

حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ-এ حٰمٓ-এর বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : মুফাসসিরীনে কেরাম ও কারীগণ (র.) হতে অত্র حٰمٓ শব্দটিতে নানাবিধ কেরাত বর্ণিত আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো-

১. জমহুর মুফাসসিরীন অপরাপর حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتْ-এর ন্যায় এর মীম বর্ণটিতে সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

২. ইমাম ইবনে আবূ ইসহাক ও আবূ সাম্মাক (র.) দুটি সাকিন এক হওয়ার কারণে حٰمٓ-এর مِيْم-কে যের দিয়ে পড়েছেন। অথবা, তা উহ্য কসমের কারণে যেরবিশিষ্ট হবে।

৩. ইমাম যাওহারী (র.) حٰمٓ -এর মীম অক্ষরটিতে পেশ দিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতে এটা উহ্য مُبْتَدَأ -এর খবর অথবা তা মুবতাদা এবং এর পরবর্তী বাক্য تَنْزِيْلُ الْقُرْاٰنِ الخ উহ্য خَبَرْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হবে।

৪. ইমাম ঈসা ইবনে ওমর সাকাফী (র.) حٰمَ -কে مَنْصُوْبْ পড়েছেন। তাঁর মতে তা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل অথবা, এটা فَتْح (যবর)-এর উপর মাবনী হবে।

'فَلَا يَغْرُرْكَ' আয়াতাংশের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : উক্ত আয়াতাংশে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ فَلَا يَغْرُرْ -এর দুটি رَاء -কে পৃথক পৃথক ইদগাম না করেই পড়েছেন। যেমন নাকি এখানে রয়েছে।

২. আর হযরত যায়েদ ইবনে আলী ও ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র.) উক্ত শব্দের মধ্যে দুটি "ر" -কে ইদগাম করে পড়েছেন। সুতরাং তাঁদের মতের ভিত্তিতে শব্দটি এরূপ হবে– فَلَا يَغُرُّكَ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হা-মীম সম্পর্কিত শানে নুযূল : তাফসীর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, حٰمٓ [হা-মীম] "ইসমে আ'যম" আর الٓرٰ - حٰمٓ এবং ن এগুলো اَلرَّحْمٰنُ -এর হুরূফে মুকাত্তা'আত।

"مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ" **-এর শানে নুযূল :** সাহাবী হযরত আবূ মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ হারিছ ইবনে কায়েস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

মক্কার কুরাইশরা শীতকালে ইয়েমেনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হতো আর গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায়। বায়তুল্লাহর খাদিম হওয়ার সুবাদে গোটা আরবেই তারা বিশেষ মর্যাদা পেত। কাজেই তারা সফরে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হতো। এ কারণেই তাদের সম্পদ ও নেতৃত্ব অটুট থাকত। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর আনীত দীন ইসলামের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব বহাল তবিয়তে থাকার কারণে তারা দম্ভ-অহমিকায় মেতে থাকত। তারা বলত আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপরাধী হিসেবে গণ্য হলে তিনি আমাদের এ ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিতেন।

এতে কিছু কিছু মুসলমানদের মাঝেও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে তাদের সে সংশয় দূরীভূত করেন। আল্লাহ জাল্লাশানুহু এতে ইরশাদ করেন যে, তিনি বিশেষ হেকমত ও মাসলাহাতের কারণে কিছু দিন তাদেরকে অবকাশ প্রদান করেছেন। এতে মুসলমানদের বিচলিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। এ কারণে যে, শীঘ্রই বিরুদ্ধবাদীদের উপর আজাব নাজিল হবে। তারা দুনিয়ার ইতিহাসে ঘৃণিত অধ্যায় রচনা করবে। ওদিকে পরকালে জাহান্নামের অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করবে।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حٰمٓ :

হা-মীম-এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ : হা-মীম-এর অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে হযরত মুফাসসিরীনে কেরামের নানান অভিমত পাওয়া যায়।

১. **জমহুর** তাফসীরকারগণ উক্ত حٰمٓ ও অপরাপর হুরূফে মুকাত্তা'আতের ব্যাপারে বলেন, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন। তবে অনেকের মতে আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ-কে এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। নতুবা আল্লাহ কর্তৃক কাউকে خِطَابٌ বা সম্বোধনে ব্যবহৃত অবোধগম্য শব্দ প্রয়োগ বৃথা প্রমাণিত হবে। মোদ্দকথা, তাঁদের মতে, এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা একমাত্র তাঁরই অবগত। জালালাইন গ্রন্থকার প্রখ্যাত তাফসীরকার শাইখুল ইসলাম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) জমহুরের সাথেই রয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেছেন– وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 'হা-মীম' -এর তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন, (ক) এটি আল্লাহ তা'আলার ইসমে আ'যম। (খ) এটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (গ) 'আর রহমান' শব্দকে সংক্ষিপ্ত করে 'হা-মীম' বলা হয়েছে। অভিধান বিশেষজ্ঞ যুজাজও এ মতই পোষণ করতেন।

৩. প্রখ্যাত তাফসীরকার সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং 'আতা খোরাসানী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহ হাকীম, হামীদ, হাইয়্যুন, হান্নান থেকে 'হা' গ্রহণ করা হয়েছে। আর মালিক, মাজীদ এবং মান্নান এ পবিত্র নামসমূহ হতে 'মীম' গ্রহণ করা হয়েছে, আর এভাবেই 'হা-মীম' হয়েছে।

৪. ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, حٰمٓ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের একটি এবং এটা তোমার রবের কোষাগারের চাবিকাঠি।

৫. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, حٰمٓ কুরআনে কারীমের একটি নাম।

৬. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক বেদুইন নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন حٰمٓ কি? তা আমাদের ভাষায় আছে বলে আমরা জানি না। নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, তা আল্লাহ তা'আলার নামের সূচনা এবং কুরআনের সূরাসমূহের নামের ভূমিকা।

৭. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তা সূরার ভূমিকা।

৮. ইমাম কেসায়ী (র.) বলেছেন, হা-মীম অর্থ হলো যা কিছু হবার তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতে, হা-মীম অর্থ হলো 'হুম্মা'। -[তাফসীরে মাযহারী-১০/২১০]

মূলত: এতসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরও তার প্রকৃত অর্থ অস্পষ্টতার বেষ্টনিতে আবদ্ধ থেকে যায়।

"تَنْزِيْلُ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয় তথা কুরআনে কারীম মুহাম্মদ ﷺ -এর মনগড়া কোনো সংলাপ নয়। হে কুরাইশ তথা মক্কাবাসীরা তোমাদের ধারণা মতে এটা মুহাম্মদের স্বরচিত কোনো গ্রন্থ হবে? না এমন কিছুই নয়। বরং এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সুব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করেছি। সমগ্র মানব ও জিন জাতির হেদায়েতের জন্যে। এতে কোনো সৃষ্টির হাত নেই। এর সব কিছুই মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলারই। এ জন্যই তিনি এটার হেফাজত করছেন, কালের আবর্তনে তাতে কেনো পরিবর্তন হয় না। এতে মহান প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানবজাতির জন্য সাম্রাজ্য পরিচালনার সকল নীতি নির্ধারণ করেছেন। কারো মনের বিরুদ্ধে কোনো ইতিবাচক নীতি বিধান বাধ সাধলেও এ গ্রন্থে প্রণীত শাশ্বত বিধান অটুট থাকবে।

যে আল্লাহর পক্ষ হতে এ মহাগ্রন্থ নাজিল হয়েছে সে সত্তা অসংখ্য গুণের আধার। স্থানের ও সময়ের প্রয়োজনে বিশেষিত গুণগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। যার সূত্রপাত হয় اَلْعَزِيْزُ হতে।

اَلْعَزِيْزُ-এর বিশ্লেষণ : যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর পক্ষ হতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। عَزِيْزٌ (আযীয) এমন সত্তাকে বলে যিনি কিছু করতে চাইলে তাঁকে কোনো শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না। যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অন্য কেউ কিছু করতে চাইলে তাতে তাঁর অনুমতি তথা তৌফিকের প্রয়োজন হয়। তাইতো তিনি পরাক্রমশালী। মোটকথা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। না পারে কেউ তাঁর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হতে আর না পারে তাঁর পাকড়াও হতে পরিত্রাণ পেতে। নিশ্ছিদ্র ইস্পাত কঠিন সিন্দুকের ভেতরের খবর তিনি রাখেন। অথৈ সমুদ্রের গহীন জলরাশির তলদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বেখবর নন তো সপ্তাকাশের উর্ধ্বে তাঁর আরশ কুরসী, লৌহ-কলম। উষালগ্নেও তিনি সূর্যাস্তেও তিনি। সুতরাং তাঁর আদেশ ও আজ্ঞা অমান্য করে কেউ কামিয়াব হতে পারে না। পাবে না সে সফলতা তাঁর মহান রাসূলকে পরজিত করার পরিকল্পনায়। কেউ এমনটি করতে চাইলে তা তার একমাত্র নির্বুদ্ধিতা আর বোকামিরই পরিচায়ক হবে বৈ অন্য কিছু নয়। নিঃসন্দেহে তার বা তাদের এরূপ পরিকল্পনার গুড়েবালি মেখে হাওয়া ভেস্তে যাবে। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তাদের তাবত হীন ষড়যন্ত্র।

عَلِيْم -এর বিশ্লেষণ : যিনি عَلِيْم (আলীম) তথা মহাজ্ঞানী, যাঁর নিকট কোনো কিছু গোপন নেই। যিনি কোনো রূপ ধারণা প্রসূত অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কথা বলেন না। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর রয়েছে মহা প্রজ্ঞাময় নিখুঁত জ্ঞান। সুতরাং সৃষ্টি জগতের কল্পনাশক্তির আওতা বহির্ভূত জগতের যেসব তথ্যাবলি তিনি পরিবেশন করবেন কেবল সেটাই সংশয়াতীতভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এ পরিসরে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারের এ যুগেও কোনো তথ্যবিদ শতভাগ নিষ্কলুষ তথ্যবহুল সমাধান দানে সামর্থ্য হতে পারেনি, পারছে না এবং পারবেও না। তাইতো তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বিশ্ব বিভ্রাটও তত বেশি ঘটছে।

অথচ মহান আল্লাহ জ্ঞাত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি কিসে, কোন সব নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ তাদের কল্যাণের জন্য অতীব জরুরি। তাঁর প্রতিটি শিক্ষাই অকাট্য যুক্তি ও নির্ভুল জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তাতে ভুল-ভ্রান্তির কোনোরূপ আশঙ্কা নাই। এছাড়া মানুষের তৎপরতা ও গতিবিধির কোনো কিছুই তাঁর অজান্তে থাকা অসম্ভব। তাইতো তিনি সবজান্তা। এভাবে মানুষের কাজকর্মের মূল উদ্বোধক যে নিয়ত, মনোভাব ও ইচ্ছা-বাসনা তাও তাঁর নিকট লুপ্ত কিছু নয়। অতএব মানুষের পক্ষে মহা দিব্যিদৃষ্টি সম্পন্ন আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিকে এড়িয়ে তাঁর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

'غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ وَشَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ' আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াত হতে শুরু করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিফাত বা গুণাবলি তুলে ধরেছেন। অত্র আয়াত তারই ধারাবাহিকতা। আল্লাহ বলেন, তিনি "غافر الذنب قابل التوب" অর্থাৎ তিনি ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ মার্জনাকারী এবং তওবা কবুলকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ বাক্যগুলোর তাফসীরে বলেছেন, যে ব্যক্তি কালিমায়ে তাইয়্যিবা পাঠ করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে কালিমায়ে তাইয়্যিবা বিশ্বাস স্থাপনকারীর তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলার এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিশেষ কোনো যুগ নির্দিষ্ট নেই, যে বা যারা, যখন যেখানে যেভাবেই আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তওবা করে, সঠিক তওবা হলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। এটি মহান আল্লাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী ও তওবা কবুলকারী। এর দ্বারা মানুষের মনে আশার আলো জ্বালানো হয়েছে, উৎসাহ দান করা হয়েছে। এস্থানে এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, যেসব লোক তখনো পর্যন্ত আল্লাহ দ্রোহীতায় মগ্ন ছিল, তারা যেন নিরাশ হয়ে না যায়; বরং তারা তখনো আল্লাহদ্রোহীতা হয়ে বিরত থেকে সঠিক পথে আসলে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় পেতে পারে। এ আশা হৃদয়ে পোষণ করত যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

তওবা এবং মাগফেরাতের মধ্যকার পার্থক্য : কোনো লোকর ধারণা 'মাগফেরাত' তথা গুনাহ মাফ করা এবং তওবা কবুল করা একই বস্তু, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়; বরং দুটি বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও কৃত গুনাহের জন্য তওবা না করে আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে غَافِرِ الذَّنْبِ অর্থাৎ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার গুনাহসমূহের উপর পর্দা রেখে দেবেন। ঐ ব্যক্তির গুনাহসমূহ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখবেন। আর غَفْر শব্দটির আভিধানিক অর্থই হলো– পর্দায় ঢেকে রাখা, কোনো কিছু গোপন রাখা।

আসলে মাগফেরাতটা হলো ব্যাপক; অনেক সময় তওবা ব্যতীতই আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি পাপকাজ করে আবার নেক কাজ করে। তার নেক কাজগুলোর কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সে তওবা করার সময় পাক বা নাপাক অথবা তওবার কথা ভুলেই গেল। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির উপর বিপদ আপদ ও দুঃখ-কষ্ট এসে পড়লে তা দ্বারা তার গুনাহ মাফ হয় এবং তার মর্যাদা বেড়ে যায়। এ জন্যই গুনাহ ক্ষমা করার গুণকে তওবা কবুল করার গুণ হতে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

তওবা কবুল হওয়ার জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিস থাকা জরুরি : ১. গুনাহ পরিত্যাগ করা; ২. কৃত গুনাহ এবং নাফরমানির উপর অনুশোচনা করা এবং ৩. আগামীতে গুনাহ বা নাফরমানি না করার দৃঢ়প্রত্যয়সূচক আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। আর ইস্তিগফারের অর্থ হলো– গুনাহ করাকে অপছন্দ করে নিকৃষ্ট জেনে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং প্রথমে তওবা পরে ইস্তিগফার।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কৃত অপরাধ নাফরমানির উপর তওবা ব্যতীত গুনাহ মাফ পাওয়ার সুযোগ এক্ষেত্রে মু'মিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ঈমানদারদের মধ্য হতেও কেবল তাদেরই এ সৌভাগ্য হবে যাদের মন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা অমান্যতার কুটিল হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। মোদ্দাকথা হলো যারা একান্ত বিনয়ী মনে, অনুশোচনার সাথে একনিষ্ঠ আবেগে ঈমানের অবস্থায় তওবা করবে শুধু তাদেরই তওবা কবুল হবে। ফলত তওবাকারী হবে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" অর্থাৎ গুনাহ হতে তওবাকারী এমন যেন তার কোনো গুনাহই নেই, সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তওবা ছাড়া মাগফেরাতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন, না হয় করবেন না। অথচ তওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়।

কাফের মুশরিকদের তওবার স্বরূপ কি? কাফের মুশরিকদের তওবার একটিই মাত্র পন্থা, তা হলো তাদের কৃত ভ্রষ্টতার উপর লজ্জিত হয়ে তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরোধিতা হতে বিমুখ হয়ে আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত বা পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে খালেস মনে আল্লাহকে এক মনে এবং তাঁর রাসূলের আনীত সকল নীতি-বিধানকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসা। অবশ্যই তা হতে হবে "কালিমায়ে তাইয়্যিবা" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করতে হবেই তবে তা তওবা বলে গণ্য হবে। আর মুক্তি পাবে সর্বপ্রকার অপরাধের বোঝায় চাপা পড়া হতে। পাবে আল্লাহর রেজামন্দি আর রাসূলের শাফাআত। কেননা ইরশাদ হচ্ছে– "اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা ব্যক্তির অতীতের সকল অপরাধ ধ্বংস করে দেয়। অতএব, কোনো ব্যক্তি খালেস মনে মুসলমান হওয়ার কোনো প্রকার নেক আমল করা ব্যতীত মারা গেলে সে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার জন্য ইসলাম গ্রহণই হলো সবচেয়ে বড় নেক আমল। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে কালিমার সুধা পান করার তৌফিক দিন।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ : شَدِيْدُ الْعِقَابِ বা কঠোর শাস্তিদাতা। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালাতকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত যেমন অনন্ত, অসীম ঠিক তেমনিভাবে তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা এ শব্দ দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, তিনি যদিও তাঁর ঈমানদার ও অনুগত বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান ও ক্ষমতাশীল পক্ষান্তরে নাফরমান, আল্লাহ দ্রোহী, রাসূল ও তাঁর আনীত দীন ইসলামে বিদ্বেষী কাফেরদের জন্য তিনি অতীব নিষ্ঠুর, কঠোর ও পরাক্রমশালী। অথচ এ সকলকে অবশেষে তাঁর দ্বারে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে এবং জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

অতএব, সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ এবং জীবন থাকতেই মৃত্যু পরবর্তী আলমে বরযখের সে একাকিত্ব আপনজন মানব বন্ধু হতে বিচ্ছিন্ন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। এমনিভাবে দুনিয়ায় থাকতে আখেরাতের সহায়-সম্বল সংগ্রহ করা বাস্তববাদী মানুষের একান্ত করণীয়।

قَوْلُهُ ذِي الطَّوْلِ -এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা বা অনুগ্রহকারী, এখানে উদ্দেশ্য অফুরন্ত নিয়ামতদাতা। কেউ কেউ এর অর্থ শাস্তি না দেওয়া অর্থ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহের বারি সকল মাখলূকাতের উপর প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হয়। সৃষ্ট জীব যা কিছু সুবিধা ভোগ করছে তা সব একমাত্র তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।

চরিত্র সংশোধনে উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রভাব : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) তাঁর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এযীদ ইবনে আসিম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি বড় বীর পুরুষ ছিল। তাঁর বীরত্বের কারণে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। [লোকটি হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে বারবার যাতায়াত করত] কিছু দিন পর লোকটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে বলা হলো, লোকটি মন্দকাজে লিপ্ত হয়েছে, এমনকি মদ্যপায়ী হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে নিম্নোক্তভাবে একটি পত্র পাঠালেন–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ . سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

অর্থাৎ "ওমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের নিকট। তোমাকে সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করছি। যিনি ব্যতীত সত্যিকার মাবুদ নেই। তিনি অপরাধ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, মহা অনুগ্রহের মালিক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।"

এরপর হযরত ওমর (রা.) ঐ ব্যক্তির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে দোয়া করেন এবং অন্যদেরকেও দোয়া করতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে তওবা করার তৌফিক দান করেন আর তার সে তওবা কবুল ফরমান।

যথাসময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর পত্র তার নিকট পৌঁছলে সে এভাবে চিঠিটি পাঠ করতে থাকে غَافِرِ الذَّنْبِ আল্লাহ তা'আলা আমাকে কথা দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন, قَابِلِ التَّوْبِ তিনি আমার তওবা কবুল করবেন, شَدِيْدِ الْعِقَابِ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে কেউ বাধা প্রদানে স্তব্ধ করতে পারবে না। আর পরিশেষে সকলকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি পত্রটি বারংবার পাঠ করেন এবং ক্রন্দন করেন, অবশেষে তিনি তওবা করেন।

ঐ ব্যক্তির তওবা করার সংবাদ হযরত ওমর (রা.)-কে দেওয়া হলে তিনি বললেন, তোমরাও তাই কর অর্থাৎ তওবা কর, আর যখন দেখ কেউ সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে তখন তাকে সঠিক পথে রাখার চেষ্টা কর, তাকে বিনম্র ভাষায় বুঝাও; আর আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া কর, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবা করার তৌফিক দান করেন এবং কোনো অবস্থাতেই তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

কুরতুবী নামক তাফসীর গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইমাম কুরতুবী (র.) এ বিষয়ে অপর একটি ঘটনার উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তা এই যে, হযরত আবূ বকর ইবনে আইয়াশ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (র.)-এর দরবারে এসে আরজ করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। এখন আমার তওবা করার কোনো পথ উন্মুক্ত আছে কি? তখন হযরত ওমর (রা.) "حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ ...... شَدِيْدُ الْعِقَابِ" তেলাওয়াত করলেন এবং তাকে পরামর্শ দিলেন, সৎকর্ম করতে থাক, আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।

দীনের রাহে আহ্বানকারীদের জন্য হেদায়েত : উল্লিখিত ঘটনায় দিনের পথে আহবানকারী ও সংস্কারকারীদের জন্য বিরাট শিক্ষা ও হেদায়েত বা নির্দেশন নিহিত রয়েছে। অতএব, যারা আল্লাহর পথ ভোলা দীশাহীন বান্দাদেরকে আল্লাহর তথা দীনের সহজ সরল পথে দিশা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত থাকছেন, তাদের একান্ত কর্তব্য হবে তারা যেন ঐ বিপথগামী বান্দাদের জন্য দোয়া করার সাথে সাথে বাহ্যিক মিশন পরিচালনা করে। আর নম্রতার সাথে মানুষকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। কেননা দোয়া মানে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি আর নম্রতা অবলম্বন মানে সু ও সদাচরণ দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করে নেওয়া। আর এ হৃদয় জয় করা যদি হয় আল্লাহর রহমতের সাহারায় তবে মানুষ দলে দলে ইসলামকে সুশীতল ও মর্যাদাশীল মহান ধর্ম মনে করে তাতে প্রবেশ করবে, কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে কঠোরতা ও রুক্ষতা আরোপের মাধ্যমে রাগান্বিত স্বরে তাবলীগের মিশন সচল রাখার চেষ্টা করাতে কোনো উপকার তো হবেই না; বরং শয়তান মরদূদের সাহায্য করা বুঝাবে। এতে তারা দীনের পরিধি হতে, মিশনের বৃত্ত হতে আরো দূরে বহুদূরে সরে যাবে।

"لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ" : আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতাংশে দু'টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তাঁর বান্দাদেরকে অবগত করিয়েছেন।

১. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই।

২. পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের পরে সবাইকে অবশ্যই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর হাশর ময়দানে দুনিয়াস্থ কৃতকর্মের তথা পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশ হবে। অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের রেজিস্টারকে দাঁড়িপাল্লায় তোলা হবে। তা হতে কেউ পরিত্রাণ পাওয়ার থাকবে না। মানুষ যখনি পরকালের উপর আস্থাশীল হবে তখন সে আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যকার সম্পর্কের কথা অনুধাবন করতে পারবে। সে উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মাঝে আবিদ তথা উপাসনাকারী ও মাবুদ তথা উপাস্য-এর সম্পর্ক। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকে যখন এ চিন্তার উদ্রেক হবে তখনই সে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারবে। মানুষ বুঝতে পারবে, কি করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আর কোন কাজে অসন্তুষ্ট। অথচ মা'বুদ নির্ধারণে মানুষ চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত। এ পরিসরে সে নেহায়েতই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। তারা স্বহস্তে গড়া মূর্তিগুলোকে মা'বুদের মর্যাদায় পূজা অর্চনা করে। তারা নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায় তাদের উপাসনা করে থাকে। তারা বুঝেও না বুঝার ভান করে আছে। কেননা সে অবলা নির্জীব মাটির পুতুলগুলো তাদের না কোনো উপকার করতে পারে না ক্ষতি করতে পারে। তারা তাদের ভক্ত বেহুদাদের কি হেফাজত করতে পারে যারা নিজেরাই নিজেদের হেফাজতে অক্ষম। নির্বুদ্ধিতার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

"مَا يُجَادِلُ فِيْ آيَاتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" আয়াতের ব্যাখ্যা : مَعْنَى الْجِدَالِ বা جِدَالٌ-এর অর্থ : আয়াতস্থ يُجَادِلُ শব্দটি اَلْمُجَادَلَةُ . اَلْجِدَالُ ক্রিয়ামূল হতে সংগৃহীত। এর অর্থ হলো– ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া, কথার মারপ্যাঁচ দেওয়া। এখানে অর্থ হবে বিতর্ক করা, অহেতুক উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করা, পূর্বাপর সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কোনো একটি শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে তা হতে নানান প্রকারের খুঁটি-নাটি বের করে পর্বতসম সন্দেহ ও দোষক্রটি সৃষ্টি করা যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। কেনো কথার মূল উদ্দেশ্যের অবমূল্যায়ন করতঃ সম্পূর্ণ ভুল অর্থ গ্রহণ করা। মস্তিষ্কের বক্রতার কারণে আসল বিষয়টি না নিজে বুঝবে আর না বা অন্যদেরকে বুঝতে দেবে। তা নিয়ে শুধু শুধুই বির্তকে সময় কাটাবে। তার লক্ষ্যই হলো অহেতুক অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা।

আল্লাহর আয়াতে কাফেরদের বির্তক সৃষ্টির উদ্দেশ্য : মক্কার কাফেররা কুরআন মজিদের আয়াতকে ঘিরে অনর্থক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বির্তক সৃষ্টি করত। এহেন অহেতুক বিতর্ক ও মতবিরোধে কেবল তারাই জড়াতে পারে যাদের এ ঝগড়া-বিবাদের পিছনে অসদুদ্দেশ্য কাজ করে। সৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বিপরীতমত পোষণকারীর বিতর্কে জড়িত হওয়াটা আসল সত্যটা উদঘাটন করে অসত্যের কৃষ্ণ চেহারা হতে পর্দা উন্মোচন করার জন্য হয়ে থাকে। সে আলোচনার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত ধারণা ও বিপরীত মতের মাঝে ব্যাবধান সৃষ্টি করে অবলোকন করতে চায় যে এতদুভয় ধারণার মধ্যে কোনটি নির্ভুল এবং নিরেট তা যাচাই বাছাইয়ের মধ্যে নিশ্চিত হতে চায়। সত্যের বিচারে এ ধরনের বিতর্ক প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়। পক্ষান্তরে যাদের মনের মনিকোঠায় অসৎ উদ্দেশ্যের বীজ ব্যাপৃত থাকে তারা কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই বিতর্কে জুড়ে যায়। বিপক্ষের বক্তব্যকে হাজারো সত্য মিথ্যার প্রলেপে জড়িয়ে বিকল করে দেওয়ার জন্যই তারা বিতর্কের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহর আয়াত তথা কুরআনে কারীমের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিবাদ বিতর্কে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তাদের সে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ষড়যন্ত্র কর্পূরের ন্যায় মহাশূন্যে মিশে যায়।

বিতর্কের শ্রেণিবিভাগ : প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইমাম রাযী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করেছেন- اَلْجِدَالُ বা বিতর্ক দু প্রকার।

১. حَقٌّ তথা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিতর্কে জড়িত হওয়া। এটার দায়িত্বভার নবী-রাসূলগণ (আ.) এবং তাঁদের অনুসারীদের স্কন্ধে বর্তায়। পবিত্র কুরআন মাক্কীদের আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন- وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ "হে রাসূল! আপনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে উত্তম পন্থায় তথা উত্তম কৌশল ও সঠিক যুক্তি পেশ করার মাধ্যমে বিতর্ক করুন।"

এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য বিরোধী পক্ষের সাথে প্রকৃষ্ট যুক্তির মাধ্যমে ও উত্তম উন্নত কৌশল অবলম্বনের দ্বারা বিতর্ক করা যেতে পারে। পরন্তু দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এরূপ বিতর্কে জড়িত হওয়া আম্বিয়া (আ.) -এর কর্মপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাতে সত্য উদ্ভাসিত হয়, আর বাতিল নিপাত যায়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গলায় বিজয়ের মাল্য সোভা পায়, আর পরাজিত তাগুতি শক্তি ভীতু সন্ত্রস্ত হয়ে ধ্বংসের করাল গ্রাসে পরিণত হয়। কুরআনের সাক্ষ্য মতে প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে তর্ক-বহসে লিপ্ত হতে হয়েছে। এ ব্যাপার হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি তার বিরোধীদের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাদের উক্তির প্রসঙ্গ টেনে মহান আল্লাহ বলেন- يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا হে নূহ! তুমি আমদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ। এমনটি বিতর্কে তুমি আমাদের সাথে অতিরঞ্জিত করেছ।

২. বাতিল বা অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে جِدَالْ তথা বিতর্ক করা। কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূল ও সত্যের ধারক-বাহকগণ যখনই সত্যের আহবানে কল্যাণজনক ঘোষণাগুলো মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে ময়দানে অবতীর্ণ হতেন, তখনই এ তাগুতি শক্তি মিথ্যা ও শয়তানি চক্রের হোতারা তা প্রতিহত ও স্তব্ধ করার জন্য অনর্থক ও অনাহুত বিতর্কের সৃষ্টি করত। এ পরিসরে কুরআন ও হাদীসের নিম্নোক্ত মহান বাণীসমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

১. مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا একমাত্র কাফের গোষ্ঠিরাই আল্লাহর আয়াতের বিপক্ষে অযথাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।

২. وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ আর তারা সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা [অসত্য ও অনর্থক] -এ লিপ্ত হয়ে থাকে।

৩. مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ শুধুমাত্র নিছক বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা আপনার সম্মুখে উপমা পেশ করে থাকে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করছেন-

১. لَا تُمَارُوْا فِى الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ الْمِرَاءَ فِيْهِ كُفْرٌ তোমরা কুরআনের বিরুদ্ধে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ো না। কেননা কুরআনের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কুফরি।

২. اِنَّ جِدَالًا فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ কুরআনের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কুফরির নামান্তর।

আল-কুরআনের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি ধ্বংসের নামান্তর : এ ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ -এর কয়েকখানা হাদীস উল্লেখ করছি।

ক. প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একদা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে দুপুর বেলায় উপস্থিত হলেন। হযূর ﷺ লক্ষ্য করলেন, দু' ব্যক্তি একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত, তখন তিনি আমাদের দিকে তশরিফ আনলেন, চেহারা মুবারকে তখন রাগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি ইরশাদ করেন, তোমদের পূর্ববর্তী লোকেরা আসমানি কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধ করায় ধ্বংস হয়েছে।

খ. আমর ইবনে শোয়েবের পিতামহ থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ কিছু লোককে বিতর্কে লিপ্ত দেখে ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশের বিরোধিতায় অন্য অংশকে ব্যবহার করত অথচ পবিত্র কুরআনের একাংশ অপর অংশের সত্যায়ন ও সমর্থন করে। বিরোধ বা তার বিপরীতে অবস্থান করে না। অতএব, তোমরা আল্লাহর কালামের এক অংশকে আরেক অংশ দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান কর না. যদি তোমরা কিছু জান তবে বল. আর যদি না জান তবে যে জানে তার উপর দায়িত্ব অর্পণ কর।

গ. বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, আবূ দাউদ ও হাকিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুরআনে কারীমের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফর।

প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, এরপরও কুরআনে কারীমের ব্যাপারে বিতর্ক করার অর্থ হলো, সত্যকে বাতিলের মাধ্যমে দুর্বল করা আর যারা সত্যকে পরাজিত করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। এ জন্যই এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে- مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا "কাফের ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার আয়াতে কেউ ঝগড়া করে না।" আলোচ্য বিতর্ক বা ঝগড়া যাকে কুরআন ও হাদীস কুফর হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। কুরআনের আয়াতের সমালোচনা করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে বিতর্কের বান তোলা বা কুরআনের কোনো আয়াতের এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা কুরআনের অন্য আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী অথবা সুন্নতের সুস্পষ্ট পরিপন্থি। এটা মূলত تَحْرِيْفُ قُرْاٰنْ তথা কুরআন বিকৃত করণের নামান্তর। কিন্তু কোনো অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বাক্যের তাহকীক অথবা مُشْكِلْ (অপ্রকাশ্য) বাক্যের সমাধান অনুসন্ধান করা কিংবা কোনো আয়াত হতে আহকাম ও মাসায়েল বের করার উদ্দেশ্যে গবেষণা করা উক্ত جِدَالْ -এর পর্যায়ে আসে না; বরং এতে বিরাট পুণ্য নিহিত রয়েছে। -[বায়যাবী, কুরতুবী]

আয়াতে কুফরের অর্থ : তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত আয়াতে কুফর দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

ক. সত্য দীন তথা তৌহীদকে অস্বীকার করা। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে- উক্ত কর্মনীতি কেবল তাদের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব যারা আল্লাহর সত্য দীনকে অস্বীকার করেছে। নবী করীম ﷺ -এর রিসালতকে অস্বীকার করেছে। আর যেসব কাফের দীনকে অস্বীকার করছে অথচ তাকে বুঝার জন্য সৎ উদ্দেশ্যে তা সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াত প্রযোজ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ সব স্বার্থান্বেষী বিবেকান্ধ লোক যারা তা প্রত্যাখ্যান করার পর বুঝার মননে নয়; বরং সমালোচনার হীন উদ্দেশ্যেই সমালোচনা লব্ধ গবেষণা করছে।

খ. আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের নাফরমানি করা। এ অর্থের বিচারে আয়াতের মর্মার্থ এরূপ হবে- "আল্লাহর আয়াতসমূহের বিপরীতে অনুরূপ নীতি কেবল তারাই গ্রহণ করতে পরে যারা আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহকে ভুলে গিয়েছে; আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজির মধ্যেই যে তারা লালিত-পালিত হচ্ছে এ কথা তারা ভুলে বসেছে। যদি তাই না হতো তবে তারা কিরূপে আল্লাহর কালামের সরাসরি বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করতে পারে?

কাফেররা কিভাবে কুরআনে বিতর্কের উত্থাপন করে? অত্র আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাপারে একমাত্র কাফেররাই অনর্থক বিতর্কের উত্থাপন করে।

বস্তুত: এর নেপথ্যে তাদের কোনো সৎ উদ্দেশ্য ছিল না, আর ছিল না সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার সামান্যতম আগ্রহ। ফলে কখনো তারা বলেছে بَلْ هُوَ شَاعِرٌ মুহাম্মদ হলো একজন কবি আর কুরআন তাঁর মহাকাব্য। (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) আবার কখনো এ বলে অপপ্রচারে লিপ্ত হয় যে, মুহাম্মদ হলো একজন দক্ষ জাদুকর আর কুরআন তাঁর জাদুমন্ত্র। কখনো বা বলেছে, মুহাম্মদ একজন জ্যোতির্বিদ আর কুরআন তার জ্যোতির্বিদ্যা। তারা এও বলেছে بَلْ هُوَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ কুরআন হলো, পূর্ববর্তী সম্প্রদায় বা জাতিসমূহের কিচ্ছা কাহিনী মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা এ কুরআনের মাধ্যমেই তাদের অপবাদের মূলোৎপাটন করেন এভাবে وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ . بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ অর্থাৎ এটা কোনো কবির সনাতন কাব্য নয়, না কোনো পাগলের প্রলাপ, এটা কোনো জাদুকরের মন্ত্রও হতে পারে না. এটাতো মহা মর্যাদাবান পঠিত [ঐশী] গ্রন্থ।

"فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতের প্রথমাংশের ভাষ্য ছিল– আল্লাহ তা'আলার আয়াতের ব্যাপারে কেবলমাত্র তারাই অযাচিত বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা ঈমানের উপর কুফরিকে প্রাধান্য দিয়েছে, কৃতজ্ঞতা পরিহার করে অকৃতজ্ঞকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর এ অংশে বলা হলো– "হে রাসূল! দেশ বিদেশে কাফেরদের অবাদ বিচরণ আপনাকে যেন ভ্রমে না ফেলে" অর্থাৎ যারা কাফের যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস রাখে না, তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ কে মানে না, আনুগত্য করে না, তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এমন কি অভিশপ্ত, অথচ তাদের জাগতিক উন্নতি অব্যাহত রয়েছে; তারা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করছে; আর্থিক উন্নতি অগ্রগতি লাভ করছে। যেমন– তখন মক্কার কাফেররা সিরিয়া এবং ইয়েমেনে ব্যবসার উদ্দেশ্য সফর করত। আর এ অবস্থা সকল যুগেই লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহর নাফরমানরা ঈমানদারদের তুলনায় অধিক সম্পদ ও শক্তি অর্জন করে থাকে, পক্ষান্তরে আল্লাহর আনুগত্যকারীরা, রাসূলের অনুসারীরা, সত্যের ধ্বজাধারীরা দারিদ্র পীড়িত অবস্থায় জীবন পরিচালনা করছে, রাতের পর দিন কাটাচ্ছে আহারে, অনাহারে আর অর্ধাহারে। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। "হে রাসূল! কাফেরদের দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমণ আপনাকে যেন ভ্রমে না ফেলে। কেননা অদূর ভবিষ্যতে তাদের শাস্তি অবধারিত। আর মু'মিনরা অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা কাফেরদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটা অবকাশ মাত্র, তারা এ অবকাশের সুযোগ পাচ্ছে শুধু। এ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে যারা যত অধিক শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে পাপাচারে জড়িয়ে পড়বে, তাদের শাস্তি ততই কঠোরতর হবে।

ইবনে আবূ হাতিম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে আবূ মালিক (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইবনে কায়েস সাহমী সম্পর্কে। কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে কারো যেন ভুল ধারণা না হয়, আল্লাহ তা'আলার অপ্রিয় ব্যক্তিরাই যে তাঁর নিয়ামত ভোগ করছে। প্রকৃত অবস্থা হলো, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কয়েকটি দিনই তারা এ নিয়ামত ভোগ করছে। তারা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ হয়ে চিরকালের শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আর মু'মিনগণ সামান্য কয়েকটি দিন বা আখেরাতের একদিনের তুলনায় কয়েক মিনিট মাত্র, কিন্তু তারা পরকালে অনন্তর জীবনের জন্য তারা অভাবনীয় নিয়ামত লাভে ধন্য হবে।

"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা অত্র আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– হে নবী! মক্কার কাফেররা আপনার সাথে যে অন্যায় ও অশোভনীয় আচরণ করেছে তা নতুন কিছু নয়। ইতপূর্বে যে সকল নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের উম্মতেরা তাঁদের সঙ্গে অনুরূপ অন্যায় আচরণ করেছে, তাঁদের মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাঁদেরকে বন্দী করার এমনকি প্রাণনাশের অপপ্রচেষ্টা করেছে, কিন্তু পরিশেষে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং তাদের মূলোৎপাটন করেছেন। অতএব, লক্ষ্য করুন আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়ার এবং তাঁর প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করার পরিণত কত ভয়াবহ হয়েছিল।

আহযাব তথা দলসমূহ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? আলোচ্য আয়াতে اَلْاَحْزَابُ দ্বারা বিশেষ করে عَادٌ - ثَمُوْدٌ ও اَيْكَةٌ (আদ, ছামূদ ও আইকা) জাতিসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আর সাধারণভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঐ সব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে যেসব সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল। সূরায়ে রা'দে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ" .

অর্থাৎ 'তাদের পূর্বে [নবী রাসূলগণকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে হযরত নূহ, আ'দ, ফেরাগওয়ালা ফেরাউন ও ছামূদ (আ.)-এর জাতিসমূহ এবং হযরত লূত (আ.)-এর কওম ও আইকাহবাসীরাও [রাসূলগণকে] মিথ্যাবাদী বলেছিল। এরাই হলো আহযাব।'

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ -এর মহল্লে ই'রাব কি? অত্র আয়াতাংশে সর্বসম্মতভাবে মারফূ' -এর মহল্লে রয়েছে। অর্থাৎ ই'রাবের দিক থেকে এটা رَفْعٌ (রফা')-এর স্থলে রয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে তা রফা-এর স্থলে হয়েছে– সে ব্যাপারে নাহবিদ ও মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তা প্রদত্ত হলো–

১. জমহুরের মতে, এখানে تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ হলো মুবতাদা আর مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الخ হলো তার খবর। সুতরাং এটা মুবতাদা হওয়ার কারণে রফার স্থলে হয়েছে।

২. কারো কারো মতে, এটা মুবতাদা মাহযূফের খবর হওয়ার কারণে রফা'র স্থলে হয়েছে। যেমন– هٰذَا تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে حٰمٓ মুবতাদা এবং تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ এর خَبَرٌ হওয়ার কারণে رَفْعٌ -এর মহলে হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে– "إِنَّ الْقُرْاٰنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَيْسَ مَنْقُوْلًا وَلَا مِمَّا يَجُوْزُ اَنْ يَكْذِبَهُ" অর্থাৎ আল-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যেটা মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। এটা কারো বর্ণনা প্রসূত তথা মনগড়া নয়। আর এ গ্রন্থকে মিথ্যা আখ্যাদানও সঠিক হবে না।

অনুবাদ :

٦. وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اَىْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ بَدَلٌ مِنْ كَلِمَةٍ.

৬. আর তদ্রূপ সত্যে পরিণত হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী অর্থাৎ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ الخ (আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো) কাফেরদের উপর এই যে, তারা জাহান্নামী হবে। এখানে "اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" বাক্যটি كَلِمَةٌ হতে بَدَل হয়েছে।

٧. اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ مُبْتَدَأٌ وَمَنْ حَوْلَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ يُسَبِّحُوْنَ خَبَرُهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ مُلَابِسِيْنَ لِلْحَمْدِ اَىْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ تَعَالٰى بِبَصَائِرِهِمْ اَىْ يُصَدِّقُوْنَ بِوَحْدَانِيَّتِهٖ تَعَالٰى وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا اَىْ وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ كُلَّ شَىْءٍ وَعِلْمُكَ كُلَّ شَىْءٍ فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ الشِّرْكِ وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ النَّارِ.

৭. যারা আরশ বহন করেন– এটা মুবতাদা এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছেন এটা পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে তাসবীহ পাঠ করেন – এটা পূর্ববর্তী বাক্যের খবর তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে অর্থাৎ প্রশংসার সঙ্গে মিশ্রণ করে [তাসবীহ পাঠ করেন] অর্থাৎ তারা বলেন– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ আর তারা আল্লাহ তা'আলার উপব ঈমান রাখেন– তাদেব দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সত্যায়ন করেন। আর তারা ঈমানদারগণের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করেন। তারা বলেন– হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার করুণা এবং জ্ঞান সব কিছুতেই ব্যাপৃত রয়েছে। অর্থাৎ তোমার রহমত বা দয়া সমগ্র বস্তুকে ঘিরে রয়েছে এবং তোমার ইলমও প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত আছে। সুতরাং তুমি ক্ষমা করে দাও তাদেরকে যারা তওবা করেছে। শিরক হতে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে দীন ইসলামের আর তাদেরকে নাজাত দাও দোজখের আজাব হতে অর্থাৎ জাহান্নাম হতে।

٨. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ اِقَامَةٍ نِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ عَطْفٌ عَلٰى هُمْ فِىْ وَاَدْخِلْهُمْ اَوْ فِىْ وَعَدْتَّهُمْ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ.

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও বসবাসের জন্য যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ আর যারা সৎ এটা اَدْخِلْهُمْ অথবা وَعَدْتَّهُمْ -এর যমীর هُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। তাদের পিতামাতার মধ্য হতে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মধ্য হতে তাদেরকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাও নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী তার কার্যে।

٩. وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط اَىْ عَذَابَهَا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৯. আর তুমি তাদেরকে অমঙ্গলজনক কাজ হতে রক্ষা করো অর্থাৎ অমঙ্গলজনক কর্মসমূহের শাস্তি হতে। আব তুমি যাকে অমঙ্গল হতে রক্ষা করবে সেদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার উপর সত্যিই অনুগ্রহ করবে আর এটাই তো বিরাট সাফল্য।

তাহকীক ও তারকীব

"وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ" আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী "وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ" رَبِّكَ-এর كَلِمَةُ শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত।

১. كَلِمَةُ অর্থাৎ একবচনের সাথে, এটা জমহুরের কেরাত।

২. كَلِمَاتُ বহুবচনের সাথে। ইমাম নাফে' ও ইবনে আমের শামী (র.) এরূপ পড়েছেন।

"وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ" আয়াতাংশের বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহ তা'আলার বাণী "وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ" -এর صَلَحَ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. صَلَحَ শব্দটির ل বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হবে। এটাই জমহুরের মাযহাব।

২. صَلُحَ শব্দটির ل বর্ণে পেশ-যোগে পড়া হবে। ইবনে আবী আয়ালা এরূপ মত দিয়েছেন।

"كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" আয়াতের মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ -এর শেষোক্ত اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ বাক্যটির مَحَلُّ الْاِعْرَابِ সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. "اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" বাক্যটি পূর্ববর্তী كَلِمَةُ শব্দ হতে بَدَل (বাদল) হয়েছে। আর যেহেতু كَلِمَةُ শব্দটি حَقَّتْ-এর فَاعِلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে, তাই উক্ত বাক্যটিও رَفْعٌ তথা مَحَلًّا এটা مَرْفُوْعٌ হবে। কেননা بَدَل ও مُبْدَلٌ مِنْهُ -এর ই'রাব একই হয়ে থাকে।

২. "اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" বাক্যটি جُمْلَةٌ تَعْلِيْلِيَّةٌ তথা কারণ-নির্দেশক বাক্য হওয়ার কারণে এটা مَحَلًّا মাজরূর হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে "وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِاَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" আর তদ্রূপ কাফেরদের উপর আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তারা জাহান্নামি হয়েছে।

'وَمَنْ صَلَحَ' -এর মহল্লে ই'রাব : ফেরেশতারা ঈমানদারগণের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন–

"رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ ...... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ".

এ জায়গায় "وَمَنْ صَلَحَ" আয়াতাংশটুকু وَاَدْخِلْهُمْ-এর هُمْ যমীরের উপর আতফ হওয়ার কারণে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে। কেননা, هُمْ যমীরটি اَدْخِلْ ফি'লের مَفْعُوْلٌ হওয়ার সুবাদে মানসূব। আর مَعْطُوْفٌ ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর একই ই'রাব হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অত্র সূরার শুরু হতে মহান রাব্বুল আলামীন এক মহা সত্যকে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আবহমান কাল হতে চলে আসছে। নবী-রাসূলগণ যেখানেই তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার মিশন চালিয়েছেন, তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ছিলেন, সেখানেই তাঁরা বিরোধীদের চরম বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা তাওহীদের নিশানকে ভূলুণ্ঠিত করতে চেয়েছে। দীনের প্রদীপকে নির্বাপিত করে দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, আর চেয়েছে সত্যের ধ্বনিকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিতে। মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত সকলেই সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখান করেছেন। উল্টো দাওয়াতকারী ও তার অনুসারীদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। কিন্তু পরিণামে সত্যকে প্রত্যাখানকারী কাফেররা নিপাত গিয়েছে।

এ পরিসরে আলোচ্য আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। ১. যেভাবে দুনিয়াতে কাফেরদেরকে ধ্বংস করা একান্ত জরুরি ছিল ঠিক তেমনিভাবে আখেরাতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া একান্ত জরুরি। ২. অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফেরদের শাস্তি কার্যকর হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনার উম্মতের কাফেরদের শাস্তিও অবশ্যই হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর ব্যাখ্যায় লেখেছেন, যারা ইতপূর্বে নবী-রাসূলগণকে কষ্ট দিয়েছে, যেভাবে যথাসময়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনার উম্মতের যেসব লোক আপনার বিরোধিতা করে, তাদের প্রতিও কঠিন কঠোর আজাব আসন্ন, যদিও তারা অন্য নবীকে মান্য করে, কিন্তু যতক্ষণ আপনার নবুয়তের প্রতি ঈমান না আনে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সে ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় এবং তারা শাস্তিরযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত।

অতএব পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এ উম্মতের লোকদের একান্ত কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়মানুসারেই বান্দাদের পরিণতি নির্ধারিত হয়। অতীতে যেসব উম্মত আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের উপর চরম শাস্তি আপতিত হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন তারা শাস্তি পেয়েছে আখেরাতের শাস্তিও তাদের জন্য অনিবার্য হয়েছে। যেভাবে অতীত কালের কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ আজো পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, ঠিক এভাবে এ উম্মতের কাফেরদের ব্যাপারেও ঐ শাস্তিই অবধারিত। কেননা তারা সকলে একই অপরাধে অপরাধী যা অমার্জনীয়।

আলোচ্য আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এবং তদীয় সাহাবী (রা.)-কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, দীনের আওয়াজ বুলন্দ করতে গিয়ে তোমরা যে প্রবল বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছ তাতে ঘাবড়িয়ে যাওয়ার কিছুই নেই, নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা এটা শুধু তোমাদের বেলায় নয়, বরং সমস্ত নবী রাসূলগণের বেলায় হয়েছে। সাময়িক ভাবে যদিও তোমরা নির্যাতিত হচ্ছ, তোমাদেরকে অসহায় ভাবছ, পরিণামে তোমরাই হবে চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী, পরিশেষে বিজয়ের মাল্য তোমাদের গলায়ই শোভা পাবে। পক্ষান্তরে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও পরাজিত তো হবেই পরকালেও জাহান্নামের আজাব হতে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ তাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না।

'اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ ...... وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ' : আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার দীন এবং তদীয় রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধবাদী কাফেদেরকে ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি কুরআনের মধ্য যে, কাফেরদের আলোচনার সাথে সাথে মু'মিনদের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। এমনিভাবে জাহান্নামের স্মরণের পাঠে জান্নাতের তথা জান্নাতবাসীদের কথা বলে থাকেন এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি। মূলত ঈমান-কুফর, জান্নাত-জাহান্নাম, মু'মিন-কাফের এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির আলোচনা করার ইচ্ছা করলেই প্রসঙ্গত বিপরীতটার আলোচনা না আনলে ব্যাপারটা খোলাসা হয় না।

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে কুফর, কাফের ও জাহান্নামের বয়ান ছিল সেহেতু আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের শুভ পরিণতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস করত তাঁর অনুসরণ করে তাদের মর্তবা এতই অধিক যে, আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী এবং আরশের চতুষ্পার্শ্বের ফেরেশতাগণ তাদের উপর মুগ্ধ হয়ে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়, ফলে তাদের কল্যাণে ও মুক্তিতে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সে মু'মিন, মুত্তাকীদের চিরস্থায়ী নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত দান করার জন্যে দোয়া করেন, আবেদন নিবেদন করেন। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের নির্দেশ দান করেন, তোমাদের নিজস্ব ইবাদত মুলতবি রাখ এবং রোজাদারদের দোয়ার সময় আমীন আমীন বলতে থাক। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতেও ঘোষণা হয়েছে 'وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ' [ফেরেশতাগণের প্রতি যে আদেশ হয় তাই তারা করেন।] এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, মু'মিনদের জন্য দোয়া করার আদেশ আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহর আরশ বহনকারী এবং তার চারিপার্শ্বের ফেরেশতাদের দোয়া অবশ্যই দরবারে এলাহীতে কবুল হবে, এ সৌভাগ্য একমাত্র নেককার মু'মিনদেরই।

এখানে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আয়াতে সাধারণ ফেরেশতাদের কথা না বলে আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ও তার চতুর্পার্শ্বের অবস্থানকারী বিশেষ ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তার রাজ্যের সাধারণ কর্মকর্তা দূরের কথা যারা তাঁর মহান আরশ ধারণকারী তাঁর বিশেষ করুণা ও সান্নিধ্য প্রাপ্ত সে সকল ফেরেশতারাও বিশেষভাবে তোমাদের ব্যাপারে আগ্রহী ও সহানুভূতি প্রদর্শনকারী।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আরশ বহনকারী ও আরশের চারিপার্শ্বের ফেরেশতাগণ নিজেরাও আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখেন এবং জমিনে যে সকল ঈমানদারগণ রয়েছেন তাদের মাগফেরাত কামনা করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ঈমানের এ মহান শক্তিই সপ্তাকাশের উর্ধ্বে অবস্থানকারী মহীয়ান গরিয়ান ফেরেশতাকুলের সাথে ধূলির ধরার এ মৃত্তিকাময় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে। হাদীসের ভাষায় كُلُّ مُؤْمِنٍ اِخْوَةٌ "সমগ্র মু'মিনরা পরস্পর ভাই" এ সুসম্পর্কের কারণেই আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য লাভে ধন্য ফেরেশতাকুলের মনে জমিনে বসবাস রত এ মানুষগুলোর ব্যাপারে এত উৎসাহ ও হিতকামনা। আল্লাহর দরবারে ঈমানদার মানুষের ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আকুল আবেদন প্রমাণ করে যে, ঈমানী সম্পর্কটা কেমন গভীর হতে পারে।

ফেরেশতাকুল হতে একটি সন্দেহ নিরসন : ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁরা সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি বুঝে না, তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যাপৃত। আয়াতে বলা হয়েছে তারা ঈমান রাখে এর অর্থ এ সময় তাদের কুফরি করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু তারা কুফরি ত্যাগ পূর্বক সেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ করেছেন; বরং এর অর্থ হলো তারা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রভুত্বও সার্বভৌমত্বকে মান্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো নিকট তারা মাথা নত করে না।

ঈমানদার মানুষগুলো যখন ঈমান গ্রহণ করে আল্লাহর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে মেনে নিল আর গায়রুল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করল তখন সত্তাগতভাবে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা যেন একই সমাজভুক্ত হয়ে পড়েছে। -[জুমাল]

আলোচ্য আয়াত হতে একটি সন্দেহ দূরীকরণ : উল্লিখিত আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করছেন। আর সিংহাসনে বসার জন্য কোনো আকৃতিধারী সত্তা হতে হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিরাকার। কেননা আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে ইরশাদ করেছেন- اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ তথা যারা আরশ বহন করে, সূরা اَلْحَاقَّةُ -এর ১৭নং আয়াতে আল্লাহ ফরমান وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ আর কিয়ামত দিবসে আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশ তাদের মাথার উপর বহন করবে।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতারা আরশে অবস্থিত সব কিছুই বহন করে আছেন। বাতিলপন্থিদের দাবির স্বপক্ষে যদি আপাতত মেনে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করে আছেন। আর আরশবহনকারী ফেরেশতারা আল্লাহকেও বহন করে আছেন। তা ছাড়া পরোক্ষভাবে এটাও বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রক্ষণাবেক্ষণও করছেন। অতএব, রক্ষণাবেক্ষণকারী রক্ষণাবেক্ষণকৃতের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা আবিদ [ইবাদতকারী] আর ফেরেশতারা মা'বুদ হওয়া প্রমাণ পাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করছেন এটা মেনে নিলে দুটি বিষয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১. আল্লাহর আকারবিশিষ্ট হওয়া, ২. আল্লাহ ইবাদতকারী- এ দুটি উপলক্ষ ইসলামি আকিদার পরিপন্থি।

এর সমাধান হলো, আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করছেন এরূপ ধারণা ঠিক নয়। এ পরিসরে আল্লাহর ইরশাদ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى [আর-রহমান তথা আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর স্থির রয়েছেন] এটা مُتَشَابِهَاتٌ (মুতাশাবিহাত) -এর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই অবগত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান– فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ . অর্থাৎ সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা ও বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অপব্যাখ্যা উপস্থাপনের মানসে কুরআনে কারীমের মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছু হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর অন্য কেউ এদের সঠিক অর্থ অবগত নয়। এসব ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও আধিপত্য ঐ আরশ এবং আরশের মাধ্যমে যার পরিচালনা করা হয়। তথা গোটা সৃষ্টিকুলের উপর আল্লাহর রাজত্ব বিদ্যমান বুঝাবে। কোনো কিছুই তাঁর আওতা বহির্ভূত নয়।

উক্ত আয়াতে দু ধরনের ফেরেশতার উল্লেখ রয়েছে : আল্লাহ তা'আলার একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি হলো ফেরেশতা। তারা নূরের তৈরি। সৃষ্ট জাহানের নেজাম তথা কাজ-কর্ম পরিচালনার তাগিদে নিজস্ব বিশ্বস্ত বাহিনী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত আদেশ তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে সম্পাদন করেন অতি সুচারুরূপে, যেভাবে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ দু'শ্রেণির ফেরেশতার কথা উল্লেখ করেন।

১. আল্লাহ জাল্লা শানহুর আরশ বহনকারী ফেরেশতা। সূরা আল-হাক্কার আয়াতে এঁদের সংখ্যা আটজন উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশকে তাদের মাথার উপর বহন করবেন। অত্র আয়াতে হয়তো তাদের কথাই বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতারা নিঃসন্দেহে অন্য সকল ফেরেশতা হতে সর্বাধিক সম্মানিত। তবে এটা এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রধান ফেরেশতার সংখ্যা চার। হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আ.)।

   আল্লামা যমখশরী (র.) আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে এটি হাদীস উল্লেখ করেন যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের পদযুগল জমিনের নিম্নদেশে অবস্থিত। আর তাদের মাথাসমূহ আরশ পর্যন্ত প্রসারিত। আল্লাহর ভীতিতে তারা তাদের মাথা কখনো উপরে উঠায় না।

   অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে সালাম করার জন্য অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, অন্যান্য ফেরেশতাদের উপর তাদের অধিক মর্যাদাবান হওয়ার দরুন।

২. ঐ শ্রেণির ফেরেশতারা যারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করে আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "مَنْ حَوْلَهُ" আর যারা তার চারিদিকে অবস্থান করছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র নাজিল হয়েছে–

وَتَرَى الْمَلَٰئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

"আর তুমি আরশের ফেরেশতাদেরকে ঘিরে থাকতে দেখবে। তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যথার্থ তথা সঠিক ফয়সালা করে দিয়েছেন। অনন্তর তাদেরকে বলা হবে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।"

আল্লামা যামাখশারী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ আল-কাশ্শাফে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আরশের চারিদিকে সত্তর হাজার সারি ফেরেশতা রয়েছে, তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আরশের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে থাকে। তাদের পিছনে আরো সত্তর হাজার সারি ফেরেশতা রয়েছে। তারা নিজেদের স্কন্ধের উপর হাত রেখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি পাঠে আরশের চতুস্পার্শ্বে বিচরণ করেন। তাদের পশ্চাতেও রয়েছে আরো 'সত্তর হাজার কাতার ফেরেশতা। তারা সদা সর্বদা ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখে। তারা সকলেই বিভিন্ন তাসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকে।

মোদ্দাকথা, উল্লিখিত দু'শ্রেণির ফেরেশতারা বিশেষভাবে ঈমানদারগণের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা ও সুপারিশ পেশ করে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে অতি মর্যাদাবান হওয়ার সুবাদে আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করে থাকেন।

আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের অবস্থা : আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতারা হলেন অতি মর্যাদাবান, নিষ্পাপ সৃষ্টি। এখন তাঁদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. আল্লামা আলুসী (র.) লেখেছেন, আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে 'মুকাররিবীন' বলা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা হলো চার জন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের টাখনুর নিচ হতে পায়ের তালু পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব। আর কোথাও বর্ণিত আছে- তাঁদের পা পাতালে রয়েছে, আর আসমান তাদের কোমর পর্যন্ত হয়। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করেন-

سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ .

এ ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিনীত অবস্থায় থাকেন, সর্বদা নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, কখনো উপরের দিকে তাকান না। সপ্তম আকাশে যারা রয়েছেন, তাদের থেকেও অধিকতর ভীত থাকেন আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ।

৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ফেরেশতা এবং আরশের মধ্য সত্তর হাজার নূরের পর্দা রয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি নিয়েছেন, প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে, আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার কথা বর্ণনা করি, আর তা হলো তার কানের লতি থেকে বাহু পর্যন্ত সাতশত বছরের সমান দূরত্ব রয়েছে। -[আবূ দাউদ]

৪. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, আরশের চারি পার্শ্বে ফেরেশতাদের সত্তর হাজার কাতার রয়েছে। একের পর এক কাতার দণ্ডায়মান। সকলেই মহান আরশের তওয়াফে রত রয়েছেন। তারা যখন একে অন্যের মুখোমুখি হয় তখন একজন বলেন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'আল্লাহু আকবার।' যখন প্রথম কাতারের ফেরেশতাগণের তকবীর পাঠের আওয়াজ পিছনের কাতারের ফেরেশতাগণ শ্রবণ করেন, তখন তারা (পিছনের কাতারে) উচ্চৈঃস্বরে বলেন,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا اَعْظَمَكَ وَاَجَلَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَنْتَ الْاَكْبَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ رَاجِعُوْنَ اِلَيْكَ .

ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকেন, তাদের হাত কাঁধের উপর থাকে, তাদের সত্তর হাজার কাতার রয়েছে, তাঁরা হাত বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছেন। বাম হাতের উপর ডান হাত রয়েছে, তাঁরা তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের দু'বাহুর মধ্যে তিনশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে। তাদের এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সত্তরটি পর্দা রয়েছে নূরের, সত্তরটি পর্দা রয়েছে সাদা মুক্তার, সত্তরটি পর্দা রয়েছে লালবর্ণের ইয়াকুত পাথরের। সত্তরটি পর্দা রয়েছে সবুজ জমরুদ পাথরের। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু জিনিস রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না।

উক্ত আয়াতে আরশ বহনকারী ও এর চার পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে : আলোচ্য আয়াতে আরশবাহী ও তার চারি পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেন। গুণ তিনটির বর্ণনা নিম্নরূপ-

১. ফেশেতাদের ১ম গুণটি হলো- يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ তারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করেন। কুরআন মাজীদে ফেরেশতাদের ব্যাপারে এরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ অর্থাৎ 'আর আমরা তোমার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণকীর্তন করি।' অপর আয়াতে আছে- وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ 'আর তুমি দেখতে পাবে ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিকে ঘিরে থেকে তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছে।'

উল্লেখ্য, تَسْبِيْحٌ (তাসবীহ) -এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার শানে শোভা পায় না এমন বিষয়াদি হতে তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা। আর حَمْدٌ (হামদ)-এর অর্থ হলো– প্রশংসাও গুণকীর্তন করা, নিয়ামত তথা অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করা। মোদ্দাকথা, মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি যেসব অশোভনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত করে সেগুলো হতে তিনি সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র। কোনো দোষত্রুটি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। অন্য দিকে সকল সৎ গুণাবলির আধার ও উৎস একমাত্র তিনিই। সুতরাং সমস্ত প্রশংসার একক পাপ্য তাঁর অন্য কেউ এতে ভাগীদার নেই।

২. ফেরেশতাদের দ্বিতীয় গুণটি হলো– "وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ" আর তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। মূলত জমিনে অবস্থিত মু'মিনদের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর হয় একমাত্র এ গুণটির ভিত্তিতে।

৩. তারা মু'মিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাদের জন্য সুপারিশ করে থাকেন। এর প্রতিই ইঙ্গিত করছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– "وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا"

শহর ইবনে হাওশাব আরো বলেছেন, ফেরেশতাগণ মানুষের পাপাচার অবলোকন করেন, আর সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার নখদর্পণে রয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবহানুহু মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করেন না বিধায় ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ক্ষমা ও ঔদার্যের প্রশংসা করেন।

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যদিও মানুষ ও ফেরেশতার মাঝে সৃষ্টিগত দিক হতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তথাপি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কও রয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন– إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

তাসবীহ পাঠের সাথে বিশেষিত করার পর ফেরেশতাদেরকে ঈমানের সাথে বিশেষিত করার কি ফায়দা থাকতে পারে? আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ও তার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের গুণাবলির বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমত বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করেন। এরপর দ্বিতীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। অথচ তাসবীহ পাঠকারী হওয়ার দ্বারাই তাদের ঈমানদার হওয়া বোধগম্য হয়। সুতরাং পুনরায় "وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ" বলার মধ্যে কি ফায়েদা থাকতে পারে?

হযরত মুফাস্‌সিরীনে কেরাম এর নানান জবাব দিয়েছেন–

ক. তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ করার পর ঈমানের উল্লেখ করার কারণ হলো, এ ঈমান তথা অন্তরের এ বিশ্বাসই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠে উদ্বুদ্ধ করে। তা না হয় তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করত না, আর না কোনো প্রকার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করত, নাইবা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো।

খ. তাসবীহ পাঠ করা হলো মৌলিক স্বীকারোক্তি যেটা মৌলিক আমল। অপরাদিকে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস যেটা আত্মিক বিষয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা কেবল মৌখিকভাবে আমার গুণগান করছে তাই নয়; বরং তাদের অন্তরে আমার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।

গ. যদিও প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠের দ্বারাই পরোক্ষভাবে ঈমানের সত্যায়ন হয়; তথাপি সুস্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করার জন্য وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ বলা হয়েছে।

ফেরেশতা কি মানুষ হতে উত্তম? যেমন নাকি কেউ কেউ উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা দলিল পেশ করেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আরশ বহনকারী ও তার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ ঈমানদার বান্দাগণের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেন। উক্ত আয়াত দ্বারা কোনো কোনো মুফাসসিরীনে কেরাম মানুষ হতে ফেরেশতা উত্তম বলে দলিল পেশ করেন। তারা বলেন, ইরশাদ হয়েছে–ফেরেশতারা আল্লাহর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাতের সুপারিশ করেন। এটা হতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. ফেরেশতাদের নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন নাই। কেননা আয়াত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন মনে না করে ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাদের নিজেদের জন্যে যদি ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন থাকত তবে প্রথমত: তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত পরে ঈমানদারদের মাগফেরাত কামনা করত। আসলে এটাই হলো নিয়ম। কুরআনের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে এ পদ্ধতিতেই শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" অর্থাৎ 'অতএব, হে রাসূল! আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। অনন্তর আপনি আপনার ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর ঈমানদার নর-নারীদের গুনাহের জন্যও আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা করুন।'

অপর এক হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- প্রথমে তোমার নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর অন্যান্যদের জন্য। সুতরাং ফেরেশতাদের নিজেদের জন্য যদি আদৌ ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হতো, তবে তারা প্রথমত নিজেদের জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং পরবর্তীতে ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাতের কামনা করত। এতে প্রতীয়মান হলো যে, তারা মাগফেরাতের মুখাপেক্ষী নয়। অথচ মানুষ ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী।

২. সাধারণত কেউ অন্যের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট কেবল তখনই ক্ষমার সুপারিশ করতে পারে, যখন সেই তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা তার মর্যাদা বেশি হয়। আর দেখা যাচ্ছে এখানে ফেরেশতারা মানুষের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেছে।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা দু'টির বিচারে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতারা মানুষ অপেক্ষা উত্তম। তথা "اَلْمَلَكُ أَفْضَلُ مِنَ الْبَشَرِ" উল্লেখ্য যে, যদিও আলোচ্য আয়াত দ্বারা কোনো কোনো মুফাসসির ফেরেশতাকুলকে মানুষ অপেক্ষা উত্তম প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তা জমহুরের মতের পরিপন্থি। বিশুদ্ধ মত হলো জমহুরের দৃষ্টিভঙ্গি, আর তা হলো- মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই তারা ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম প্রমাণ করা সঠিক নয়; তা এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

১. ফেরেশতাকুলের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকার কারণে তারা মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ এ ধারণা ও যুক্তি সঠিক নয়। কেননা মহান আল্লাহ তো তাদেরকে গুনাহ করার ক্ষমতাই প্রদান করেন নি। সুতরাং তারা গুনাহ করবে কি করে? আর গুনাহ নাফরমানি বা অপরাধই যখন নেই সে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য যদি তাদেরকে গুনাহ করার ক্ষমতা প্রদান করার পর গুনাহ করা হতে বিরত থাকতে পারত, তাহলে সে পর্যায়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বে প্রস্তাব বাস্তবসম্মত হতো।

২. কখনো কখনো কর্মচারীরাও মনিবের নিকট মনিবের কোনো প্রিয়জনের অপরাধ মার্জনা করে দেওয়ার সুপারিশ করে থাকে। এর দ্বারা ঐ প্রিয়জন অপেক্ষা উক্ত কর্মচারীর অধিক মর্যাদাবান হওয়া প্রমাণিত হয় না।

অতএব কারণে উক্ত আয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের ভাবার্থ : মু'মিনদের জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দোয়া : পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে নেককার মু'মিনদের গুণাবলি এবং তাদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর সে নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য ধন্য, তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ যাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার হামদ পাঠে এবং তাঁর তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকেন, তাঁরা নেককার মু'মিনদের জন্য দোয়া করতে থাকেন, তাঁরা এ দোয়াও করেন যে, মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দোজখের আজাব হতে রক্ষা করেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করত বলেন- "হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও জ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত। তোমার বান্দাদের ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা, পদস্খলন ও অপরাধ কোনোটাই তোমার নিকট গোপন নয়। নিঃসন্দেহে সবই তোমার জানা রয়েছে। তোমার জ্ঞানের ন্যায় তোমার রহমত ও অনুগ্রহ সর্বব্যাপ্ত, সুপ্রশস্ত ও বিশাল। অতএব, তাদের অপরাধের কথা জেনেও তাদের প্রতি দয়া কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।"

অথবা, এর ভাবার্থ এ হতে পার যে, হে আমাদের রব! তুমি তোমার সর্ব ব্যপ্তি জ্ঞানের দ্বারা যাদের ব্যাপারে জান যে, তারা সঠিক তওবা করেছে– সত্যিকার অর্থেই দীন ইসলামের অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি তোমার রহমতের বারি বর্ষণ কর– তাদের সকল অপরাধ মার্জনা কর দাও। জাহান্নামের আজাব হতে তাদেরকে নাজাত দাও।

ফেরেশতারা প্রথমে বলল- فَاغْفِرْ لَهُمْ [ক্ষমা করুন] এরপর বলল "وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ" তোমাদের জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন, অথচ মাগফেরাতের অর্থই হলো আজাব না দেওয়া এর কারণ কি? ঈমানদারদের জন্য দোয়া করার প্রারম্ভে ফেরেশতারা বলল فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ" [সুতরাং যারা তওবা করেছে এবং তোমরা পথ তথা দীন ইসলামের আনুগত্য করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর ক্ষমা করে দেওয়ার অর্থই হলো আজাব হতে পরিত্রাণ দেওয়া, অথচ এর পরও "وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ" [আর তাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে হেফাজত করুন] বলার অর্থ কি?

মুফাসসিরীনে কেরাম এ প্রশ্নের তিনটি জবাব দিয়েছেন–

১. ফেরেশতাদের প্রথমোক্ত বাক্য – فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ এর জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তিদানের বিষয়টি সরাসরি বোধগম্য হয় না; বরং পরোপক্ষভাবে বুঝা যায়। এ জন্য শেষোক্ত বাক্য "وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ" -এর দ্বারা সে প্রার্থনা সুস্পষ্টভাবে সরাসরি বুঝানো হয়েছে।

২. ঈমানদারদের প্রতি ফেরেশতাদের গভীর আগ্রহের কারণে এরূপ হয়েছে। কেননা কোনো ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির অন্তরে মায়ার উন্মেষ হলে সে যখন প্রকৃত প্রভু ও দয়াবান মা'বুদের খেদমতে কিছু বলার সুযোগ পায়, তখন সে কাকুতি-মিনতির সাথে এ কথাটি একবার বলে সান্ত্বনা ও আত্মতৃপ্তি পায় না। আরবি অলংকার শাস্ত্র তথা বালাগাত ও ফাসাহাতের এটাই কামনা। এসব ক্ষেত্রে স্বভাবতই বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ারই কথা।

৩. প্রথমোক্ত ও শোষোক্ত উভয় বাক্য যদিও এক ও অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এতদসত্ত্বেও শেষোক্ত বাক্যটিকে প্রথমোক্ত বাক্যের তাকিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যের জোর সমর্থনের জন্যে দ্বিতীয় বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

'رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ ...... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ' আয়াতের তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরেশতাগণের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে যা তারা মু'মিনদের পক্ষে করেছে, এ আয়াতেও নেককার মু'মিনদের পক্ষে ফেরেশতাগণের আরো দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দান করেছ, তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দান কর এবং তাঁদের পিতা-মাতা, পতী-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হতে যারা (ঈমানদার অবস্থায়) নেক আমল করেছে, তাদেরকে [প্রবেশাধিকার দান কর]।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমান ও নেক আমলের নিরিখেই প্রত্যেকটি মানুষকে বিচার করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করা হবে। মোটকথা, আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান হলো পূর্ব শর্ত। ঈমানের পরেই অন্যান্য কাজকর্মের স্থান। আর ইখলাসের ভিত্তিতেই জান্নাতে মর্তবার পার্থক্য হবে, আত্মীয়-স্বজন বা আপনজন কেউ এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মর্জি হলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের দ্বারাও উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে। যেমন এ আয়াতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য ফেরেশতাগণ নেককার মুসলমানদের পক্ষে দোয়া করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, শুধু তাই নয়; বরং তাদের পিতামাতা সহ সকল ঈমানদার আত্মীয়-স্বজনকেও জান্নাতে স্থান দেওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করবেন। সূরায়ে তূরে এ মর্মে একখানি আয়াত রয়েছে– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ (الْاٰيَةَ) অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততিরাও ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকেও তাদের সঙ্গে মিলিত করবো। অথচ এতে তাদের কর্মফল কিছু মাত্রও কম করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।"

হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর (র.) বলেছেন, ঈমানদার যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্যরা কোথায়? উত্তর দেওয়া হবে যে, তাদের আমল কম হওয়ার কারণে তারা এ স্তরে পৌছতে পারে নি। ঈমানদার ব্যক্তি বলবে আমি যে আমল করেছি তা শুধু আমার জন্যই করি নি; বরং তাদের জন্যও করেছি। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করে দাও। -[ইবনে কাছীর]

জান্নাতীগণের আপনজনদেরকে একত্রিত করা হবে : আল্লামা বাগভি (র.) লিখেছেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বর্ণনা করেছেন, মু'মিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, আমার পিতা-মাতা কোথায়? আমার সন্তান-সন্ততিরা কোথায়? আমার স্ত্রী কোথায়? তখন ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, তারা আপনার ন্যায় আমল করেনি; [তাই এখানে পৌছতে পারেনি]। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করতাম তা তো আমার জন্যেও করতাম এবং তাদের জন্যেও করতাম। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হুকুম হবে, তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও অর্থাৎ জান্নাতী ব্যক্তির আপন জনদেরকেও যেন তার সাথে একত্রিত করা হয়, যাতে করে উভয় পক্ষের নয়ন মনের তৃপ্তি হয়, আর একত্রিত করার জন্যে উচ্চ পর্যায়ের জান্নাতীকে নিম্ন পর্যায়ে আনয়ন করা হবে না; বরং নিম্নস্তরের অবস্থানকারীদের মর্তবা উন্নীত করে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়ায় উচ্চ মর্যাদায় পৌছানো হবে, এরূপে তাদেরকে আপনজনদের সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত মুতরাফ ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, ফেরেশতাগণ মু'মিনদের কল্যাণ কামনা করেন, এ আয়াতেই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাফসীরকারগণ বলেছেন, وَمَنْ صَلَحَ -এর অর্থ হলো আর যে ঈমান এনেছে। কেননা ঈমান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। -[তাফসীরে মাযহারী]

প্রকাশ থাকে যে, وَمَنْ صَلَحَ -এর তাৎপর্য হলো, যার মধ্যে জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্যতা থাকবে একমাত্র সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ফেরেশতাগণের সুপারিশক্রমে জান্নাতে মু'মিনদের মর্তবা উন্নীত হবে। মু'মিনদের আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ সেসব লোকদের ব্যাপারেই উপকারী হবে যাদের মধ্যে ঈমান থাকবে। অতএব, বংশ মর্যাদা আখেরাতে উপকারী হবে না; বরং উপকারী হবে ঈমানী সম্পর্ক।

ঈমানদারদের সুপারিশ কি শুধু অপর ঈমানদারদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই হবে নাকি আজাব হতে মুক্তি দানের জন্যেও হবে? কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা হতে অবগত হওয়া যায় যে, আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনে কেরাম অন্যান্য ঈমানদারগণের জন্য সুপরিশ করবেন। কিছু সংখ্যক বাতিল ফেরকাহ ব্যতীত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিমত নেই। তা ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের মধ্যেও ঈমান বর্তমান থাকা আবশ্যক।

তবে এ বিষয়ে কিছুটা মতানৈক্য বিদ্যমান যে, সুপারিশ শুধু رَفْعُ دَرَجَاتٍ (মর্যাদা বৃদ্ধি)-এর জন্য হবে নাকি জাহান্নাম হতে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করা হবে?

১. ইমাম কা'বী (র.)-এর মতে, ফেরেশতা ও অন্যান্যদের সুপারিশ দ্বারা শুধু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এর দ্বারা গুনাহগারদেরকে আজাব হতে মুক্তি দেওয়া হবে না। আল্লামা কা'বী (র.) দলিল স্বরূপ فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ পেশ করেছেন। কেননা এ আয়াতে ফেরেশতারা শুধু এ সব লোকদের জন্য সুপারিশ করেছেন, যারা শিরক হতে তওবা করত: ঈমান গ্রহণ করে। মু'মিন হয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার পথ অবলম্বন করেছেন। আল্লাহর পথের পথিক তো তাকেই বলা হবে যে পাপ-পঙ্কিলতার রাহ অবলম্বন করে ইবাদতের পথ গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ [হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ঈমানদরগণকে আপনার প্রতিশ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করান] এ সুপারিশও ফাসিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদেরকে জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করেন নি।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ ও অপরাপর সালেহীনের সুপারিশ কেবলমাত্র মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে আজাব হতে মুক্তিদানের জন্য নয়।

২. জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, ফেরেশতা, আম্বিয়া (আ.) ও সালেহীনদের সুপারিশক্রমে অন্যান্য ঈমানদারগণের যে শুধু মর্যাদাই বৃদ্ধি তা নয়; বরং তাদেরকে আজাব হতে পরিত্রাণও দেওয়া হতে পারে কিংবা তাদের আজাবও শিথিল করা যেতে পারে। ইতঃপূর্বেই আমরা এর পক্ষে দলিল পেশ করেছি।

অত্র আয়াত দ্বারা ইমাম কা'বী (র.) কর্তৃক প্রমাণদানের জবাব :

ক. ইরশাদ হচ্ছে- وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا আর তারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আলোচ্যাংশে الَّذِينَ آمَنُوا দ্বারা সমস্ত ঈমনাদারগণকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ফাসিক ও কবীরা গুনাহকারীরাও এর অধীনে আসবে। অতএব, তাদেরও সুপারিশ সাব্যস্ত হলো।

খ. আলোচ্য আয়াতে ক্ষমা করে দেওয়ার অর্থই হলো আজাব হতে মুক্তি দেওয়া। এছাড়া তারা এটাও বলেছে যে, وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ অর্থাৎ 'আর আপনি তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দান করুন।' মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার কি প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে তো ক্ষমা করে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

গ. ইমাম কা'বী (র.) وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ 'যারা তোমার পথের অনুসরণ করেছে-এর দ্বারা ফাসিককে খারিজ করতে চেয়েছেন তা ঠিক না; বরং জমহুর মুফাসসিরগণ এবং মুহাক্কিকগণ এখানে 'পথ'-এর দ্বারা দীনে ইসলামকে বুঝিয়েছেন। আর ফাসিক (প্রকাশ্যে গুনাহগার ঈমানদারগণ)ও যে দীনে ইসলামের অনুসারী তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং ফাসিক ঈমানদারগণও সুপারিশের আওতায় পড়বে।

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ .... الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আয়াতের তাফসীর : আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করেন।

হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে শাস্তি থেকে [সর্ব প্রকার কষ্ট থেকে] রক্ষা করুন। কবর, হাশর, পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। হে পরওয়ারদেগার! সেদিন [কিয়ামতের দিন] যাকে তুমি শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে, এটিই তো বিরাট সাফল্য।

এ স্থানে ফেরেশতাদের দোয়া আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়? আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অতি সান্নিধ্য প্রাপ্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা মু'মিনদের হিতে যে দোয়া করেছেন তাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে-

ফেরেশতাগণের এ দোয়া মু'মিনদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন জীবনের প্রতি মুহূর্ত সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকে, কথা ও কাজে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সচেষ্ট হয়, মহানবী ﷺ -এর অনুসৃত পথে জীবন পরিচালনা করে এবং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ লাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করে। এ আকাঙ্ক্ষাই জীবন সাধনায় সতর্কতা লাভে সহায়তা হবে। কেননা মানুষ যখন কোনো কিছুর লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তা পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টাও করে, তাই আখেরাতের নিয়ামত লাভের আকাঙ্ক্ষার পাশা-পাশি তার জন্য সাধনা ও শ্রম অব্যাহত রাখবে। (হে আল্লাহ! আমাদরকে তৌফিক দিন) এখানে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ পার্থিব জীবনে যত সাফল্যই অর্জিত হোক না কেন, তা প্রকৃত সাফল্য নয়; বরং প্রকৃত সাফল্য হলো আখেরাতের স্থায়ী জিন্দেগীর শান্তি, নাজাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক সাফল্য। কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে সে মহান সাফল্য অর্জন করার জন্যে অনুপ্রাণিত করে। কেননা দুনিয়ার জীবনের সাফল্য তা যে ক্ষেত্রেই হোকনা কেন, তা নিতান্তই সামান্য আর আখেরাতের সাফল্য স্থায়ী এবং উত্তম। ফেরেশতাগণের এ দোয়া থেকে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করার একটা ধারাও শিখতে পারি।

ইমাম রাযী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন, ফেরেশতাগণ সর্ব প্রথমে মু'মিনদের জন্য এ দোয়া করেছেন- وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ [হে পরওয়ারদেগার! মু'মিনদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করো।] এরপর দোয়া করেছেন, وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ [হে পরওয়ারদেগার ! মু'মিনরদেরকে জান্নাত নসিব করো] এরপর আলোচ্য আয়াতে এ দোয়া করেছেন, হে পরওয়ারদেগার মু'মিনদেরকে বাতিল আকীদা এবং অপরাপর অন্যায় ও গর্হিত কাজ হতে রক্ষা কর। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ মু'মিনদেরকে বাতিল আকিদা, মন্দ পথ ও মন্দ মত হতে, মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ হতে রক্ষা কর। কেননা মন্দ কাজের আসন্ন পরিণতি মন্দই হয় যা পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্যকে স্তব্ধ ও ব্যর্থ করে দেয়।

اَلسَّيِّئَاتِ -এর অর্থ : سَيِّئَاتٌ (মন্দ ও অন্যায়) শব্দটি নিম্নোল্লেখিত তিনটি অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

১. বিপদ, আপদ, মসিবত ও কষ্ট তা এ দুনিয়ায় সম্মুখীন হোক, অথবা আলমে বরযখে হোক কিংবা কিয়ামত দিবসে হোক।

২. ভুল আকিদা-বিশ্বাস, মন্দ চরিত্র ও খারাপ আমল।

৩. পথভ্রষ্টতা ও মন্দ আমলের পরিণাম।

"يَوْمَئِذٍ" অর্থ কি এবং এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? يَوْمَئِذٍ শব্দটির শেষে ذ (যাল) বর্ণে যের-এর تَنْوِيْن দিয়ে। এখানে সে তানবীনের ধরনের ভিত্তিতে এর অর্থ হবে, তাই নিম্নে তার تَنْوِيْن-কে চিহ্নিত পূর্বক অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে-

ক. يَوْمَئِذٍ শব্দের শেষোক্ত ذَالٌ-এর তানবীনটি একটি উহ্য বাক্যের পরিবর্তে (তার প্রমাণস্বরূপ)। যে বাক্যটিতে বের করতে হয় বাক্যের পূর্বেকার রীতির (অবস্থার) প্রেক্ষিতে। সুতরাং এখানে يَوْمَئِذٍ মূলে ছিল يَوْمَ إِذْ تَدْخُلُ مَنْ تَشَاءُ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَشَاءُ النَّارَ الْمُسَبَّبَةَ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! সেদিন যাকে ইচ্ছা তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাও এ বদ-আকিদা, মন্দ আমলের কারণে। আর সেদিন হলো কিয়ামত দিবস।

খ. এদিকে সামীন গ্রন্থে রয়েছে- তানবীনটি একটি উহ্য বাক্যের পরিবর্তে কিন্তু বাক্যে এমন কোনো বাক্য নেই যার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে উক্ত তানবীন সে পরিবর্তিত বাক্যের বা কথার উহ্যতার প্রমাণবহ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ حِيْنَئِذٍ মূলে ছিল حِيْنَ إِذَا بَلَغَتِ الرُّوْحُ الْحُلْقُوْمَ এখানে পূর্বে اَلْحُلْقُوْمُ শব্দটি অতিবাহিত হওয়ার কারণে। সুতরাং উক্ত يَوْمَئِذٍ-এ কোনো একটি বাক্য উহ্য মানতেই হচ্ছে তা হলো يَوْمَ إِذْ تُؤَاخَذُ بِهَا "যে দিন তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।"

মোদ্দাকথা হলো, يَوْمَئِذٍ দ্বারা উদ্দেশ্য কেয়ামত দিবস কিন্তু তা উদ্দিষ্ট করণের পদ্ধতিটা ভিন্নতর হয়েছে। -[জুমাল]

কিয়ামত দিবসে سَيِّئَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্যাংশে কিয়ামত দিবসের মন্দ বা অমঙ্গল দ্বারা হাশরের ময়দানের কঠিন অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে সর্ব প্রকার সুখ-শান্তি হতে বঞ্চনা, হিসাব নিকাশ গ্রহণে কঠোরতা। আর সমগ্র জানতার সামনে জীবনের সমুদয় গোপন রহস্য উদঘাটিত হওয়ার অপমান বঞ্চনা। এতদ্ব্যতীত অপরাধীরা সেদিন সেখানে যেসব অপমান, কষ্ট ও কঠোরতার সম্মুখীন হবে তাও এটার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দোয়া হলো বান্দা তার পালনকর্তাকে "ইয়া রাব্বী" বলে ডাকবে : আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণবাচক নাম হলো رب বান্দার দোয়ায় আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বান্দার "يَا رَبِّ" বলে আহবান করাকে সর্বাধিক পছন্দ করেন। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাগণকে দোয়া করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এ গুণবাচক নামটি (يَا رَبِّ) ব্যবহার করতে দেখা যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হলেন প্রতিপালক, তাঁর অপার নিয়ামত রাজি দ্বারা বান্দার লালনপালন করে থাকেন। এ বিচারে আল্লাহর দরবারে বান্দার পাওনা হলো ব্যাপক, বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো, বান্দার চাহিদা মোতাবেক তাকে দান করা।

নিম্নে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও ফেরেশতাদের দোয়া সম্বলিত কতিপয় উদ্ধৃতি প্রদত্ত হলো-

১. আলোচ্যাংশে ফেরেশতাগণ দোয়ায় বলেছেন- "رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا الخ" "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপ্ত।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাণী- "رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ" "হে আমাদের রব! অনন্তর আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত বানাও; আর আমাদের সন্তান-সন্ততি হতেও তোমার অনুগত জাতি বানিয়ে দাও।

৩. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন- "رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"

৪. হযরত নূহ (আ.) বলেছেন- "رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا" "হে আমার পালনকর্তা! আমি দিবা-রাত্রি আমার জাতিকে সত্যের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছি।"

৫. হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছেন- رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ অর্থাৎ 'হে প্রভু! তুমি আমাকে বাদশাহী প্রদান করেছ।'

৬. নবী করীম ﷺ ও তাঁর উম্মতকে দোয়ার তালিম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا الخ" হে আমাদের রব! আমার যদি বিচ্যুতি হয়ে যা কিংবা ভুলে যাই, তাহলে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। আমাদেরকেও দোয়ায় يَا رَبِّ বলে দোয়া করা উচিত।

দোয়ার সুন্নত পদ্ধতি : اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া হলো ইবাদতের মূলাংশ। সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত মাসনূন তরিকা বা নিয়ম অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। দোয়া করার মাসনূন তথা সুন্নত তরিকা হলো- পাক-পবিত্র মন, পোশাক-আশাক ও হালাল খাবার দোয়ার কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। এরপর দোয়া করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে হবে। কিবলামুখী হয়ে নামাজের তাশাহ্হুদের বসার নিয়মে বসবে। রাসূল ﷺ -এর উপর বেজোড় বার দরুদ শরীফ প্রেরণ করতে হবে। [দরূদ হলো পত্রের খামের উপরের টিকেটের ন্যায় টিকেট- মোহর না হলে পত্র প্রাপক পর্যন্ত পৌঁছায় না, তদ্রূপ রাসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ ব্যতীত দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।] ইস্তেগফার করতে হবে। অতঃপর অতি কাতর স্বরে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে মোনাজাত আরম্ভ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দোয়ার প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে সূরায়ে ফাতিহায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইরশাদ হচ্ছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ الخ এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রথমত তাঁর মহান সত্তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করত তাঁর কুদরতে এবং মানশায় সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে নিজ মনের আকুতি মেশানো আরজি পেশ করার শিক্ষা দেন।

আলোচ্য আয়াতে ফেরেশতারাও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। যে কারণে স্বীয় আরজি পেশ করার পূর্বেই তারা আল্লাহর গুণগান করেছে- "اَلَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ...." আল্লাহ তা'আলা ঐ মহান সত্তা যিনি আমাকে পানাহার করান, আমি অসুস্থ হলে আমাকে আরোগ্য দান করেন।

তৎপর তিনি আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করেন- "رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ" হে আমার প্রতিপালক! আমাকে বাদশাহী (হুকুমত) দান করুন আর আমাকে সৎ এবং দীনদার লোকদের দলভুক্ত করুন।"

এ ছাড়া বিবেকও এটাই বলে যে, কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করতে হলে প্রথমে তার মহত্ত্বকে স্বীকার করত তার নিকট আকুতি সহ বিনয় প্রকাশ করা আবশ্যক।

অনুবাদ :

١٠. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ مِنْ قِبَلِ الْمَلٰئِكَةِ وَهُمْ يَمْقُتُوْنَ اَنْفُسَهُمْ عِنْدَ دُخُوْلِهِمُ النَّارَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اِيَّاكُمْ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ فِي الدُّنْيَا اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ.

১০. নিশ্চয়ই যারা কাফের তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলা হবে– ফেরেশতাদের পক্ষ হতে। তারা নিজেদের উপর নিজেরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে, জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। আর তারা ভর্ৎসনা করতে থাকবে। অবশ্যই আল্লাহর ক্রোধ অসন্তুষ্টি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের উপর নিজেদের ক্রোধ অসন্তুষ্টি অপেক্ষা অনেক বড় বেশি। যখন তোমাদের আহ্বান করা হতো তোমাদের দুনিয়ার জীবনে ঈমানের প্রতি অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে।

١١. قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ اِمَاتَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اِحْيَاءَتَيْنِ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا نُطَفًا اَمْوَاتًا فَاُحْيُوْا ثُمَّ اُمِيْتُوْا ثُمَّ اُحْيُوْا لِلْبَعْثِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا بِكُفْرِنَا بِالْبَعْثِ فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنَ النَّارِ وَالرُّجُوْعِ اِلَى الدُّنْيَا لِنُطِيْعَ رَبَّنَا مِنْ سَبِيْلٍ طَرِيْقٍ وَجَوَابُهُمْ لَا.

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দু-বার মৃত্যু দান করেছেন দুটি মৃত্যু দান করেছেন। আর আমাদেরকে দু বার জীবন দান করেছেন দু-বার জীবিত করেছেন। কেননা তারা (প্রথমত) শুক্রকীট অবস্থায় মৃত ছিল। অতঃপর তাদেরকে জীবন দান করা হলো, তারপর পুনঃ মৃত্যুদান করা হলো, আবার পুনরুত্থানের জন্যে জীবিত করা হলো। অতএব, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার অপরাধ। যাই হোক বের হওয়ার জাহান্নাম হতে এবং দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের যাতে আমরা আমাদের প্রভুর আনুগত্য করতে পারি। কোনো পথ আছে কি? অর্থাৎ কোনো উপায় বা মাধ্যম আছে কি? আর তাদের জবাব দেওয়া হবে–'না' কোনো পথ নাই।

١٢. ذٰلِكُمْ اَيِ الْعَذَابُ الَّذِيْ اَنْتُمْ فِيْهِ بِاَنَّهٗ اَيْ بِسَبَبِ اَنَّهٗ فِي الدُّنْيَا اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ج بِتَوْحِيْدِهٖ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ يُجْعَلْ لَهٗ شَرِيْكٌ تُؤْمِنُوْا ط تُصَدِّقُوْا بِالْاِشْرَاكِ فَالْحُكْمُ فِيْ تَعْذِيْبِكُمْ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ عَلٰى خَلْقِهِ الْكَبِيْرِ الْعَظِيْمِ.

১২. তোমাদের এ অবস্থার কারণ অর্থাৎ যে আজাবে এখন তোমরা প্রবিষ্ট আছ তা এ কারণে যে, যখন দুনিয়ায় এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা হতো তোমরা অস্বীকার করতে আল্লাহর একত্ববাদকে। আর যদি তাঁর সাথে শরিক অংশীদার স্থাপন করা হতো তাঁর সাথে অংশীদার মানা হতো তবে তোমরা তার উপর বিশ্বাস করতে অর্থাৎ তোমরা অংশীদার সাব্যস্ত করাকে সত্যায়ন করতে। কিন্তু জেনে রেখো! চূড়ান্ত ফয়সালার বাগডোর তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র সে আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট যিনি সুমহান মর্যাদার অধিকারী তাঁর স্বীয় মাখলুকের উপর বিরাট মহান।

١٣. هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ دَلَائِلَ تَوْحِيْدِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ط بِالْمَطَرِ وَمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ يَرْجِعُ عَنِ الشِّرْكِ.

১৩. তিনি সে মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখিয়ে থাকেন, তাঁর একত্ববাদের প্রমাণাদি। আর তিনিই আকাশ হতে তোমাদের জীবিকার জন্যে পানি অবতারণ করেন, বৃষ্টির মাধ্যমে। আর সে-ই একমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে নসিহত কবুল করে যে রুজু করে শিরক হতে প্রত্যাবর্তন করে।

১৪. فَادْعُوا اللّٰهَ اُعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ اِخْلَاصَكُمْ مِنْهُ ـ

১৪. অতএব, আল্লাহকে আহ্বান করো তাঁর ইবাদত করো আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে শিরক হতে বেঁচে যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে তোমাদের শিরক হতে মুক্ত হওয়াকে।

১৫. رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ اَيْ اَللّٰهُ عَظِيْمُ الصِّفَاتِ اَوْ رَافِعُ دَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ ذُوْ الْعَرْشِ ج خَالِقُهُ يُلْقِي الرُّوْحَ الْوَحْيَ مِنْ اَمْرِهِ اَيْ قَوْلِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يُخَوِّفَ الْمُلْقٰى عَلَيْهِ النَّاسَ يَوْمَ التَّلَاقِ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَاِثْبَاتِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِتَلَاقِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْعَابِدِ وَالْمَعْبُوْدِ وَالظَّالِمِ وَالْمَظْلُوْمِ فِيْهِ ـ

১৫. তিনি উচ্চমর্যাদার অধিকারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুমহান গুণাবলির অধিকারী, অথবা জান্নাতে ঈমানদারদের মর্যাদা সমুন্নতকারী আরশের অধিপতি তার সৃষ্টিকর্তা তিনি অবতীর্ণ করে থাকেন অর্থাৎ ওহী তাঁর নির্দেশে অর্থাৎ তাঁর ভাষ্যে তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার উপরে ইচ্ছা করেন যাতে সে যার উপর অবতীর্ণ করেন ভীতি প্রদর্শন করতে পারে যার উপরে নাজিল হয়েছে সে যেন লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে সাক্ষাতের দিনে [কিয়ামত দিবসে]। اَلتَّلَاقِ শব্দটির শেষে ى সংযোগে এবং ى বাদে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কেননা, সেদিন আসমান জমিনের অধিবাসী, ইবাদতগুজার [উপাসক], মাবুদ [উপাস্য] এবং জালিম ও মজলুমের সাথে সাক্ষাৎ হবে।

তাহকীক ও তারকীব

"اِثْنَتَيْنِ" শব্দটির মহল্লে ইরাব কি? : এখানে اِثْنَتَيْنِ শব্দটি اِمَاتَتَيْنِ-এর صِفَتْ হয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে اَمَتَّنَا-এর مَفْعُوْلْ হওয়ার সুবাদে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে। পরবর্তী اِثْنَتَيْنِ-এরও একই অবস্থা।

"اِذْ تُدْعَوْنَ" -এর মহল্লে ই'রাব কি? "اِذْ تُدْعَوْنَ" আয়াতাংশটুকু مَحَلًّا মানসূব হবে নিম্নবর্ণিত কারণে– ১. اُذْكُرْ উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْلْ হিসেবে। ২. ظَرْف হওয়ার কারণে। ৩. পূর্বোক্ত مَقْتْ-এর مَفْعُوْلْ হিসাবে।

"ذٰلِكُمْ" শব্দটির মহল্লে ই'রাব কি? "ذٰلِكُمْ" শব্দটি মহল্লান مَرْفُوْعْ হয়েছে নিম্নবর্ণিত কারণে– ১. এটা মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে মূলে বাক্যটি হবে "ذٰلِكُمُ الْعَذَابُ الَّذِيْ اَنْتُمْ فِيْهِ بِذَالِكَ السَّبَبِ" অর্থাৎ তোমাদের উপর যেই আজাব নেমে এসেছে তা এ কারণেই এসেছে। ২. এটা একটি উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ "اَلْاَمْرُ ذٰلِكُمْ"

"اَلتَّلَاقِ" শব্দের বিভিন্ন কেরাত : "اَلتَّلَاقِ" শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. اَلتَّلَاقِ শব্দটির শেষে ى ব্যতীত, তাই জমহুরের কেরাত।

২. اَلتَّلَاقِيْ শব্দটির শেষে ى (مُتَكَلِّمْ) যুক্ত করে। তা ইবনে কাছীর (র.) ও ইয়াকূব (র.)-এর কেরাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... فَتَكْفُرُوْنَ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** আলোচ্য আয়াতের একথাটি তখনকার জন্যে যখন কাফেররা দোজখে প্রবেশ করে নিজেদের উপর আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে এবং নিজেদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে আমরা কেন এত পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। তাদের মধ্যে আত্মসমালোচনার সৃষ্টি হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে শিরক, নাস্তিকতা, পরকালে অবিশ্বাস এবং গোটা জীবন নবী রাসূলগণের বিরোধিতায় ব্যয় করে তারা নিজেরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করেছে। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে এনেছে। তখন তারা ক্ষোভে-ব্যথায় নিজেদের অঙ্গুলি কামড়াতে থাকবে– নিজেদের উপর নিজেরই অভিশাপ ও লা'নত দিতে থাকবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের ডেকে বলবে আজকে তো তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে, অথচ যখন তোমাদেরকে ঈমানের পথে ডাকা হতো আর তোমরা ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করতে– যার কারণে আজ তোমরা জাহান্নামী হয়েছ– তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আরো অধিক ক্রোধান্বিত হয়েছেন। কেননা তিনি অতি মহব্বত ও আদর করে তোমাদেরকে সৃষ্ট করেছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনাটা কিভাবে সহ্য করতে পারেন?

অতএব, সময় থাকতেই আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। দুনিয়ার জীবনে কেউ এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তার আখেরাতে দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতীত আর কোনোই গত্যন্তর থাকবে না।

কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নিজেদের উপর ক্রোধ প্রকাশের বিভিন্ন দিক : মুফাসসিরগণ দুনিয়ার জীবনে কৃত নাফরমানির উপর কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নিজেদের উপর ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশের নানান দিক উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, কেয়ামত দিবসে কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবলিস বলবে, "وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ" তোমাদের উপর আমার তো কোনো কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরা যা করেছ তার জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী। সে সময় কাফেররা ক্রোধে ফেটে পড়বে। কিন্তু করার তো কিছুই থাকবে না।

২. সেদিন কাফেররা জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তখন তাদের মনে পড়বে যে, একদিন দুনিয়ায় তারা এ বাস্তব সত্যটিকে প্রগাঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং সে জন্য তারা নিজেদের উপর বিক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হবে।

৩. কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে ভর্ৎসনার বিপরীতে ভর্ৎসনা করবে। তারা বলবে, তোমাদেরকে তো আমরা জবরদস্তি কুফরির দিকে আনয়ন করি নি; বরং তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের সহযোগিতা করে আসছিলে।

৪. কাফেররা নিজেদের উপর নিজেরা ক্ষোভ প্রকাশ করার অর্থ হলো, কাফের নেতৃবৃন্দের উপর তাদের অনুসারীরা বিক্ষুব্ধ হবে। কারণ সে কথিত নেতাদের অনুসরণ করেই তো তারা আজকের এই দিনে মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। জাহান্নামের অনন্ত কালের আজাবে গ্রেফতার হয়।

اَلْمَقْتُ [আল-মাক্ত]-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য :

১. কারখীতে রয়েছে– اَلْمَقْتُ অর্থ হলো– অতীব অবজ্ঞা, ঘৃণা ও শত্রুতা। আর তা আল্লাহ তা'আলার শানে অসম্ভব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কারো অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান, ধমক ও তিরস্কার।

২. আবূ সউদে রয়েছে– اَلْمَقْتُ অর্থ হলো– অতীব আবজ্ঞা, ঘৃণা ও শত্রুতা। আর এখানে মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং তার সান্নিধ্যপূর্ণ অপরিহার্য অর্থ উদ্দেশ্য। তা হলো তাদের উপর নারাজ, অভিসম্পাত ও তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান।

"لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ" আয়াতের বিভিন্ন অর্থ : কাফেররা তাদের দুনিয়ার জীবনের নাফরমানির কারণে কিয়ামত দিবসে নিজেদের উপর বিক্ষুব্ধ হলে ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে; তোমরা তোমাদের উপর যতটুকু ন ক্রোধান্বিত হয়েছ তদপেক্ষা অধিক ক্রোধান্বিত হয়েছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। এ কথাটির দুটি অর্থ হতে পার।

ক. দুনিয়াতে যখন তোমাদেরকে ঈমান আনার জন্য বলা হতো আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে তখন আল্লাহ তা'আল তোমাদের উপর তা অপেক্ষা অধিক ক্রোধান্বিত হতেন অদ্য তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর যতটুকু ক্রোধান্বিত হয়েছে। এমতাবস্থায় اِذْ تُدْعَوْنَ الخ -এর اِذْ যরফের জন্য হবে।

খ. তোমরা আজ নিজেরা নিজেদের উপর যতটুকু বিক্ষুব্ধ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তদপেক্ষা হাজারো গুণ বেশি বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছেন তোমাদের উপর। কেননা তোমাদের কত বড় স্পর্ধা! যখন দুনিয়ায় তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি–আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানানো হতো তখন তোমরা চরম ঔদ্ধত্যের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করতে। উল্টো 'দায়ী ইলাল্লাহ'-আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে। এমতাবস্থায় اِذْ শব্দটি تَعْلِيْل -এর জন্য হবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হলো তার মধ্যে ক্রোধের ফলাফল প্রকাশিত হওয়া তথা তাদেরকে আজাব প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তা বাস্তবায়িত করা। মানুষ কারো উপর ক্রোধান্বিত হলে সাধারণত যা করে থাকে।

"قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا...... خُرُوْجٍ مِنْ سَبِيْلٍ" আয়াতের বিশ্লেষণ : পার্থিব জীবনের রং তামাশায় মগ্ন কাফের গোষ্ঠী কিয়ামত দিবসে ফেরেশতা কর্তৃক তিরস্কৃত হবে। তাঁরা তাদের জঘন্য কুফরির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তখন তারা তা [নাফরমানি] অকপটে স্বীকার করে নেবে আর দুনিয়ার পুনঃ প্রত্যাবর্তন করানোর ব্যাপারে আরজি পেশ করবে মহান স্রষ্টার দরবারে। তারা স্বকাতরে সবিনয় নিবেদন জানাবে এই বলে, হে প্রতিপালক! তুমি সর্বশক্তিমান মহা পরাক্রমশালী, আমরা আমাদের কৃত ভ্রান্তি অনুধাবনে সচেষ্ট, আমরা তো প্রণহীন ছিলাম, আমাদের দুনিয়ার আলো-ছায়ায় কোনো অস্তিত্বই বিদ্যমান ছিল না। তুমি আমাদেরকে দু'বার জীবন দান করেছ আর দু'বার দিয়েছ মৃত্যু। আমার পিতার বীর্যে শুক্রকীটাবস্থায় ছিলাম, মানব রূপ ছিল না তথা এটা মৃত্যুরই নামান্তর। আবার আপনি মৃত্যু প্রদান করলেন দীর্ঘ জীবন দান করার পর তার অবসান ঘটিয়েছেন। এমনিভাবে দু'বার জীবনও দান করেছেন। একবার দুনিয়ার জীবন আর দ্বিতীয়বার পরকালের জীবন। আমরা দুনিয়ার জীবনে অপরাধের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেছি। তোমার বিধি-নিষেধ পালন করিনি; তোমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছি। তোমার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করিনি। আমাদের স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই। আমরা চরম অন্যায় করেছি, নিজেদের প্রতিই মূলত আমরা জুলুম করেছি। যখন ইতোপূর্বে দু' দু' বার জীবন দান করেছ তখন আরেকবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনে আমাদেরকে বর্ধিত কর। তবে এবার আর ভুল হবে না। ভ্রমে ও হেয়ালিপনায় জীবন নাশ করব না। আমরা তোমার ও তোমার রাসূলের নির্দেশিত পথে নিজেদেরকে পরিচালনা করব।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে মোট চারটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তারা শুধু একটিতে তথা পরকালের জীবনকেই অস্বীকার করত। এতদসত্ত্বেও অপরাপর তিনটির উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, তারা তাতে সন্দিহান ছিল। আর উক্ত স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ছিল– আমরা এক্ষণে চতুর্থ প্রকার তথা পুনরুত্থান ও প্রথমোক্ত তিন প্রকারের ন্যায় সন্দেহাতীত বিশ্বাস করলাম। পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আমরা যে অপরাধ করেছি, তা স্বীকার করছি। অতএব, হে রব! এ পরিস্থিতিতে জাহান্নামের আজাব হতে পরিত্রাণ পেয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে কি? যাতে আমরা তোমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারি।

জীবন মৃত্যু দু দু-বার হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : আলোচ্য আয়াতে দু-বার জীবন ও দু-বার মৃত্যুর যে আলোচনা এসেছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লেখেছেন, এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে এক জীবন এবং কিয়ামত দিবসে যখন পুনরুত্থান হবে তখন আরেকটি জীবন লাভ করবে। অতএব, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে একটি মৃত্যু বলা হয়েছে, আর দুনিয়ার নশ্বর দেহ ত্যাগ করে শেষ বিদায়ের অবস্থাকে অপর একটি মৃত্যু বলা হয়েছে। এভাবে দুটি জীবন ও দুটি মৃত্যু হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরায়ে বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

অর্থাৎ তোমরা কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি কর অথচ তোমরা ছিলে মৃত [প্রাণহীন, নির্জীব], এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন (যখন জীবনের অন্তিম সময় আসবে) এরপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন [কিয়ামতের দিন], এরপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে।

'قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ' দ্বারা কবরের আজাব প্রমাণিত হয় : বিরুদ্ধবাদী তথা কাফেররা মৃত্যু পরবর্তী কবরের আজাব অস্বীকার করত, আজও এ মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা অনেক, যারা হাশর, মীযান, কবরের আজাব ইত্যাদিকে অস্বীকার করে। অথচ তা ধ্রুব সত্য। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফেরদের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, যাতে তারা কিয়ামত দিবসে সে ভাষায় ও শব্দে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করবে।

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদের দু দু-বার মৃত্যুদান করেছ, তেমনি দান করেছ দু'-বার জীবন ......।

উক্ত আয়াত হতে কোনো কোনো মুফাসসির কবরের আজাব সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা এভাবে দলিল সাজিয়েছেন যে, কাফেররা আলোচ্য আয়াতে দুটি মৃত্যুর কথা বলেছে। আর উক্ত মৃত্যুর একটি দুনিয়াতে সংঘটিত হয়েছে। তাই কবরে তথা আলমে বরযখে তাদেরকে আরেকটি জীবন প্রদান করা হবে। তাতে আরেকটি মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে। অতএব, বুঝা গেল কাফেরদেরকে কবরে পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

এ ব্যাপারে মুহাক্কিকীনরা যা বলেন : তবে আলোচ্য আয়াতের পর্যালোচনায় মুহাক্কিকীন মুফাসসিরীনে কেরাম বক্তব্য পেশ করেন, এভাবে যদিও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে কবরের আজাব প্রমাণিত হয়েছে, আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পরন্তু অত্র আয়াত দ্বারা কবরের আজাব সাব্যস্ত করাটা অনর্থক প্রয়াস। কারণ তাদের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত মৃত্যুদ্বয়কে গ্রহণ করা হলে জীবনদান নিঃসন্দেহে তিনবার হবে যেটা অত্র আয়াতেরই পরের অংশের اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ' সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং তাদের এ বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া এটাতো কাফেরদের উক্তি আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃতি পেশ করেছেন মাত্র। সুতরাং এটা কিভাবে শরিয়তের দলিল সাব্যস্ত হতে পারে?

দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার আসার আবেদন টালবাহানা মাত্র : কাফেররা যদিও দুনিয়ার বুকে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণই অস্বীকার করে আসছিল, কিন্তু মৃত্যুর পর এ ব্যাপারটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেননা তাদেরকেও তো জীবন দান করা হবে। এ অবস্থা ও দৃশ্য দেখে তাদের ভুলগুলো সামনে ভেসে আসবে সত্য প্রমাণিত হয়ে। তাদের ভ্রান্তিগুলো স্বীকার করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তরও থাকবে না। এটা তাদের ভাবনা, অথচ আফসোস হবে। কেননা প্রকাশ্যত আখেরাতের এ বেষ্টনি হতে বেরুবার কোনো রাস্তা খোলা নেই। তারা এও ধারণা করবে যে, এতো পরিবর্তন পরিবর্ধনকারী মহান আল্লাহর জন্য কোনো অসম্ভব ও মুশকিল কিছু নয় যে, তিনি এতসব পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কৌশলে মহা বিজ্ঞ তার পক্ষে আরেকটি পরিবর্তন সৃষ্টি করা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। যদি এমন হতো অর্থাৎ আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো হতো তবে আমরা প্রচুর পরিমাণে নেক আমল করে হে আল্লাহ তোমার দরবারে ফিরে আসতাম। কিন্তু তাদের এ প্রস্তাবটিকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর একেশ্বর বাদের আহবানের প্রতি কর্ণপাতই করনি; বরং সর্বদা অস্বীকারই

তোমাদের মজ্জাগত অভ্যাস ছিল। পক্ষান্তরে কোনো মিথ্যা (মাটির তৈরি) যে কোনো দেবতার নামের যে কোনো আহ্বানে যে কোনো সময় সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ কর নি। এতেই তোমাদের ভণ্ডামী এবং বদভ্যাসের অনুমান করা সম্ভব। এটা তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হলো যে, যদি তোমাদেরকে সহস্রাবারও দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবুও সে রকম আমল তথা নাফরমানি করে আসবে যেমনটি ইতোপূর্বে করে এসেছ। কেননা আমার প্রিয়বান্দা নবীকূল শিরোমনি তোমাদের নানানভাবে বুঝিয়ে ছিল তোমরা জানতে এ কুরআন সত্যবাণী, তোমাদের লোকেরাই বলেছিল "مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَشَرٍ" এটা কোনো মানবের ভাষা হতে পারে না, এটা তো একমাত্র মহান স্রষ্টারই কালাম। তথাপি তোমরা বুঝেও না বুঝার ভান করে দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আর ছিল একমাত্র জাগতিক হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। সুতরাং এখন তোমদের ভ্রান্তসমূহের এটাই যোগ্য শাস্তি। সর্বোচ্চ আদালত হতে যে সিদ্ধান্ত জাহান্নামের রূপে তোমার জন্য নির্ধারিত তা ভোগ করতেই হবে। এর আপিল প্রত্যাখাত, মুক্তির যে কোনো আকুতি অগ্রাহ্য-অতিরঞ্জিত।

"ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ .... لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ" আয়াতের বিশ্লেষণ : দুনিয়ার জীবনের কৃত অপরাধের স্বীকার করত কাফেররা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করে বলবে– আপনি যেমন আমাদেরকে দু দু-বার জীবন মৃত্যু দান করেছেন, তেমনি যদি আরো একবার আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ প্রদান করতেন, তবে আমরা অতীতের ক্ষতিপূরণ পূর্বক অধিক নেকি অর্জন করে আপনার পবিত্র মহান দরবারে উপস্থিত হতাম।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাফেরদের এ অসময়োচিত অন্যায় আবেদনের জবাবে ঘোষণা করা হবে, কখনো তোমাদেরকে দোজখ থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা হবে না। কেননা এ শাস্তি তোমাদের অপকর্মেরই অনিবার্য পরিণাম। স্মরণ আছে কি? যখনই তেমাদেরকে পৃথিবীতে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি আহবান জানানো হতো তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। শত চেষ্টাতেও তোমাদেরকে সঠিক পথের উপর আনা সম্ভব হয়নি। সত্য বিরোধিতায় তোমরা ছিলে সদা তৎপর। নবী রাসূলগণকে, তাঁদের অনুসারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও তোমরা ছিলে খড়গহস্ত। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা তাতে অস্বীকৃততি জানাতে আর যখন কেউ শিরকের ন্যায় জঘন্য অপরাধের প্রতি ডাকত তখন তোমরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করতে। সত্যকে তোমরা সর্বদা পরিহার করে চলেছ এবং অসত্যকে সর্বক্ষণ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে রেখেছ। এতএব, তোমাদের শাস্তি অবধারিত। তোমরা আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও, একবার নয় সহস্রবার পাঠালেও তোমরা পাপাচারেই লিপ্ত হবে, তাই দোজখের আজাব ভোগ করতে থাক এটিই তোমাদের প্রাপ্য।

আজ ফলাফল প্রাপ্তির দিন, কারো কোনো কথা নেই, কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো কিছুতেই কোনো প্রকার অধিকার নেই। অদ্য ফয়সালা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। যাঁর প্রভুত্ব ও আধিপত্য তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নাওনি। অপর দিকে যাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্বের অংশীদার সাব্যস্ত করার জন্যে তোমরা দৃঢ়তা পোষণ করছিলে, আজ চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যাপারে তাদের একবিন্দু অংশও নেই, সুতরাং আজ আল্লাহর সিদ্ধান্ত হুকুম। অনন্ত কালের জন্য তোমরা জাহান্নামের কারাগারে দণ্ডভোগ করতে থাক, তোমাদের মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। মহাপরাক্রমশালী মর্যাদাবান সুমহান আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তই আজ বলবৎ থাকবে। তাঁকে রুখতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই।

"هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ .... وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ" আয়াতের বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াত দুটিতে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় বিশেষ গুণাবলি ও নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব নিয়ামতের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে তা হতে উপদেশ গ্রহণ পূর্বক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত মানুষের জীবন ধারণের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাটি কি আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন নয়? কেননা আল্লাহ তা'আলাই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ফলে পৃথিবী সজীব হয়; ফল-ফসল উৎপন্ন হয়; আবহমান কাল থেকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন মানুষ দেখতে থাকে কিন্তু তবুও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না; তদুপরি তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করে না। অথচ যে সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার কথা মনে করে সেই উপদেশ গ্রহণ করে আর যে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে বা যে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েই জীবন পরিচালনা করে এমন লোকের শাস্তি অনিবার্য।

সুতরাং আল্লাহর একত্ববাদের উপর যখন প্রমাণ বর্তমান রয়েছে তখন তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে কায়মনে তাঁর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরিক কর না। প্রকৃতপক্ষেই মুসলমান হয়ে যাও। কাফেরদের নিকট এটা অপছন্দনীয় হলেও তার পরোয়া করে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকলে কাফেরদের অসন্তুষ্ট কিছু যায় আসে না।

"وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا" আয়াতাংশে রিজিকের দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত আয়াতাংশে রিজিক رِزْق -এর দ্বারা مَطَر তথা বৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা মানুষকে দুনিয়ায় যত প্রকারের রিজিক প্রদান করা হয় তার সবটাই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শনাবলি হতে একটি। এর দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, তোমরা শুধু এ একটি বস্তুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, কুরআনে মাজীদে তোমাদের সামনে পৃথিবী সম্পর্কে যেই ধারণা পেশ করা হয়েছে তাই সত্য বিশ্ব-দর্শন। বৃষ্টি পাতের উক্ত ব্যবস্থা কেবল তখনই কার্যকর হওয়া সম্ভব যখন জমিন তার মধ্যস্থ প্রত্যেকটি জিনিস-পানি, বাতাস, সূর্য, গ্রীষ্ম, উত্তাপ ও শৈত্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ পাক। আর এ ব্যবস্থা লক্ষ-কোটি বৎসর ধরে শুধু তখনই কার্যকর হয়ে থাকতে পারে ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলতে পারে যখন সেই চিরন্তন আল্লাহ পাক তাকে কার্যকর রাখেন। আর এ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক অবশ্যই এক মহাবিজ্ঞানী ও দয়াবান প্রভুই হতে পারেন যিনি পৃথিবীতে মানুষ, জীব, জানোয়ার ও গাছ-পালা যখন সৃষ্ট করেছেন, সেই সবের প্রয়োজন পরিমাণ পানিও ঠিক তখনই বানিয়েছে এবং সেই পানিকে সুনিয়মিতভাবে যথাসময়ে জমিনের বুকে পৌঁছাবার ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় এ সবকিছু চোখে অবলোকন করেও যে লোক আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা তাঁর সাথে অপর কোনো সত্তাকে আল্লাহর কর্তৃত্বের ব্যাপারে শরিক করে সে নিঃসন্দেহে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরকালের শাস্তি হতে কোনো মতেই সে নিস্তার পাবে না।

"وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ" আয়াতাংশের দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি দেখিয়ে শুধু তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে- যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করার ইচ্ছা করে থাকে। কেননা আল্লাহর প্রতি রুজু করতে চাইলে তার মধ্যে একাগ্রতা, চিন্তা ও ধ্যানের আবির্ভাব হয়ে থাকে। যার পরিণামে সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার দীদার ও সন্তোষ অর্জিত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ বিমুখ–যাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর গাফলতি কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের পর্দা পড়ে রয়েছে তারা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তার চক্ষু দেখতে পাচ্ছে যে, বাতাস হচ্ছে– মেঘ জমাট বাঁধছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তার বিবেকচিন্তা করবে না যে, এ সব কেন হচ্ছে, কে করছে এবং এর ব্যাপারে আর কি করণীয় রয়েছে?

আল্লাহর জন্য দীনকে খালিস করার অর্থ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ" অর্থাৎ আল্লাহর জন্য দীনকে খালিস করত তাঁর ইবাদত কর। এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

১. উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাবি জানানো হয়েছে।

২. এমন ইবাদত প্রত্যাশা করা হয়েছে যা দীনকে আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পরই সম্ভব।

আরবি ভাষার অভিধান গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, عِبَادَةٌ [ইবাদত]-এর দুটি অর্থ বিদ্যমান- ১. পূজা ও উপাসনা। ২. বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ আনুগত্য, আন্তিক আগ্রহ, উৎসাহের সাথে আল্লাহর হুকুম পালন করা।

উপরিউক্ত আভিধানিক প্রামাণ্য ব্যাখ্যানুযায়ী এখানে শুধু আল্লাহ তা'আলার পূজা-উপাসনাই কামনা করা হয় নি; বরং তাঁর আদেশ-নিষেধ মনে-প্রাণে অনুসরণ করার জোর দাবি জানায়।

অপরদিকে دين [দীন] শব্দটিও আরবি ভাষায় প্রধানত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১. আনুগত্য, হুকুম পালন, গোলামী ও দাসত্ব।

২. সেসব আদব অভ্যাস ও নিয়ম-নীতি যেগুলো মানুষ পালন করে চলে।

৩. আধিপত্য, মালিকানা, প্রভুত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনা, হুকুম চালানো এবং অন্যদের উপর নিজেদের ফয়সালা কার্যকর করা।

উপরোল্লিখিত তিনটি অর্থের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, অত্র আয়াতে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো এমন কর্মনীতি, পদ্ধতি ও আচরণ যেটা মানুষ কারো উচ্চতর কর্তৃত্ব মেনে ও কারো আনুগত্য কবুল করে।

আর দীনকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর বন্দেগি করার অর্থ হলো– আল্লাহর বন্দেগির সাথে অন্য কারো বন্দেগি জুড়ে দেবে না; উপাসনা একমাত্র তাঁরই হবে। তাঁরই দেখানো ও নির্দেশিত হেদায়েতের পথে জীবন চালাবে এবং তাঁরই বিধানাবলি ও আদেশ নিষেধ মান্য করবে।

"رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ...... لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনিই আরশের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার উপর ইচ্ছা করেন নিজের নির্দেশে ওহী নাজিল করে থাকেন। যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করিয়ে দেয়।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কতিপয় মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, এখানে دَرَجَاتٌ-এর দ্বারা صِفَاتٌ-কে বুঝানো হয়েছে। অতএব, رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ-এর অর্থ হবে رَفِيْعُ الصِّفَاتِ তথা তার সৎ গুণাবলি সর্বোচ্চ মর্যাদার। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) একে প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এখানে আরশের সুউচ্চ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আরশ বিস্তৃত। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে ঘর কল্পনা করা হলে আরশ হবে তার ছাদের ন্যায়। যেমন সূরায়ে মা'আরিজে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ" আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) আরও বলেছেন যে, এ পঞ্চাশ সহস্র বছরের পরিমাণ হলো সে দূরত্ব যা সপ্তম আকাশ হতে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। জমহুর এ মতকেই গ্রহণ করেছে। কিছুসংখ্যক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, আরশে আযীম হলো ইয়াকুত পাথরের তৈরি। এর পরিধি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব এবং এর উচ্চতা সপ্তম আকাশ হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্ব সম।

رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ-এর অন্য অর্থ হলো رَافِعُ الدَّرَجَاتِ অর্থাৎ আল্লাহভীরু ঈমানদারদের মর্যাদা বুলন্দকারী। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– "نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ" আরো ইরশাদ হয়েছে– هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ইত্যাদি।

মোদ্দাকথা, সমস্ত সৃষ্টিলোকে আল্লাহ পাকের মর্যাদা সর্বোচ্চ। এ বিশ্বলোকে যা কিছু রয়েছে, তা ফেরেশতা হোক বা নবী ওলী কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টিই হোক না কেন, তা অন্য সব সৃষ্টির তুলনায় যতই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হোক না কেন– আল্লাহর সর্বোচ্চ মর্যাদার নিকটবর্তী হওয়ার কথা ধারণাও করা যেতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহ, শাসক, পরিচালক ও পৃথিবীর সিংহাসনের অধিকারী। এমন নয় যে, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর কোথাও গিয়ে আরাম করছেন এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন; বরং তিনি সরাসরি এ বিশ্বলোকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই নন; বরং তার সার্বভৌম শাসক ও পরিচালকও একমাত্র তিনিই।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত দান করে থাকেন। তার অনুগ্রহের ব্যাপারে কারো হাত নেই। অমুককে রূপ-লাবণ্য দেওয়া হয়েছে কেন বা অমুককে স্মরণ শক্তি বা বুদ্ধি মত্তা ও প্রতিভার অসাধারণ শক্তি কেন দেওয়া হয়েছে বলে, যেমন কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, তদ্রূপ অমুককেই কেন নবুয়তের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে এটাও করতে পারে না। আমরা যাকে চেয়েছিলাম তাকে কেন নবী নিযুক্ত করা হয়নি, বলেও আপত্তি জানাবার অধিকার কারো নেই।

মোলাকাতের দিনের তাৎপর্য : কিয়ামতের দিনকে মোলাকাতের দিন বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য হলো–

১. সেদিন হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ সন্তানের মোলাকাত হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বশেষ যে ভূমিষ্ঠ হবে, আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে তারও মোলাকাত হবে।

২. হযরত কাতাদা (র.) বলছেন, সেদিন আসমান জমিনের অধিবাসীগণ একত্রিত হবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির জালিম ও মজলুমের মোলাকাত হবে। কিয়ামত দিবসে সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে সেখানে কেউ আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না, এমনকি ছায়াও থাকবে না। সেদিন সকলেই আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে থাকবে। সেদিন মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আজ রাজত্ব কার? কেউ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার হিম্মত করবে না। কারো কিছুই বলার থাকবে না। সকল প্রাণ নিজ আত্মাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং জবাব দেবেন, لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আজ সর্বময় ক্ষমতা প্রবল প্রতাপান্বিত এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার।

৩. ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসকে 'মোলাকাতের দিন' এ জন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন বান্দারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে ধন্য হবে।

৪. হাকিম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম, ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমগ্র সৃষ্টি জগতকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন; জিন, মানুষ, পক্ষীকুল সকলকেই একত্রিত করা হবে। এরপর সর্বনিম্ন আসমান ফেটে যাবে, এ আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে। তাদের সংখ্যা জিন ও মানুষ থেকে অধিকতর হবে।

উপরিউক্ত হাদীসের সুদীর্ঘ বর্ণনায় সাতটি আসমান ভেঙ্গে পড়া এবং প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীদের একের পর এক অবতরণ এবং অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ করার অবস্থা কি হবে তা মানুষের বোধ শক্তির উর্ধ্বে। সেদিন কবরসমূহ থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে তখন সকলেই সম্মুখে থাকবে, কোনো কিছুরই আড়াল থাকবে না।

"يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ" আয়াতাংশের রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্যাংশ "رُوْحٌ"-এর দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ওহীর মাধ্যমে কাফেরদের মৃত [ঈমানী] আত্মার মধ্যে রূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণেই কাফেরদেরকে মৃত বলা হয়েছে আর ঈমানদারদেরকে বলা হয়েছে জীবিত। পয়গাম্বরদের প্রতি ওহী নাজিল হয়। তাঁদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট ওহী পৌঁছায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

অনুবাদ :

١٦. يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ج خَارِجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ط لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط يَقُوْلُهُ تَعَالٰى وَيُجِيْبُ نَفْسَهُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اَىْ لِخَالِقِهِ .

১৬. সেদিন মানুষ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে তাদের কবর হতে বের হবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? আল্লাহ তা'আলা এটা বলবেন। আর নিজেই নিজের সে প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রবল প্রতাপান্বিত এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার অর্থাৎ এ দিবসেরই [মহাপরাক্রমশালী] সৃষ্টিকর্তার।

١٧. اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ جَمِيْعَ الْخَلْقِ فِىْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ .

১৭. অদ্য প্রত্যককে তার কর্মফল দেওয়া হবে, আজ কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, দুনিয়ার দিনের হিসেবে অর্ধ দিবসে তিনি সমগ্র সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করবেন।

١٨. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ اَزِفَ الرَّحِيْلُ قَرُبَ اِذِ الْقُلُوْبُ تَرْتَفِعُ خَوْفًا لَدَى عِنْدَ الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ط مُمْتَلِئِيْنَ غَمًّا حَالٌ مِنَ الْقُلُوْبِ عُوْمِلَتْ بِالْجَمْعِ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مُعَامَلَةَ اَصْحَابِهَا مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ مُحِبٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ لَا مَفْهُوْمَ لِلْوَصْفِ اِذْ لَا شَفِيْعَ لَهُمْ اَصْلًا فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ اَوْلَهُ مَفْهُوْمٌ بِنَاءً عَلٰى زَعْمِهِمْ اَنَّ لَهُمْ شُفَعَاءَ اَىْ لَوْ شَفَعُوْا فَرْضًا لَمْ يُقْبَلُوْا .

১৮. [হে রাসূল আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সাবধান করে দিন, অর্থাৎ কিয়ামত দিবস, اَلْاٰزِفَة শব্দটি আরবদের উক্তি اَزِفَ الرَّحِيْلُ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। اَزِفَ অর্থ হলো قَرُبَ [নিকবর্তী হয়েছে] যখন প্রাণসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে আসবে নিকট কাছে কণ্ঠনালীর এমতাবস্থায় তারা তা সংযত করতে থাকবে। চিন্তায় পরিপূর্ণ হবে। كَاظِمِيْنَ [কাযিমীনা] এটা قُلُوْب হতে حَال হয়েছে। অপরাপর جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ -এর ন্যায় এটাকে ى ও নূরের দ্বারা جَمْع [বহুবচন] করা হয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারী জালিমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। ভালোবাসাকারী প্রেমিক আর না কোনো সুপারিশকারী রয়েছে যার আদেশ পালন করা অবশ্যকর্তব্য। আলোচ্যাংশে মূলত وَصْف -এর কোনো অর্থ নেই। কেননা তার কোনো সুপারিশকারীই থাকবে না। যেমন- অন্য আয়াতে রয়েছে "فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ" অর্থাৎ তাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। অথবা, এর অর্থ হলো এ হিসেবে যে, তাদের ধারণা মতে তাদের জন্য সুপারিশকারী থাকবে। যদি ধরে নেওয়া হয় তাদের জন্য সুপারিশকারী থাকবে, তবে তাদের সে সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না।

١٩. يَعْلَمُ اَىِ اللّٰهُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ بِمُسَارَقَتِهَا النَّظَرَ اِلٰى مُحَرَّمٍ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ الْقُلُوْبُ .

১৯. তিনি অবগত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন, চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষিদ্ধ হারাম বস্তুর দিকে [লোলুপ দৃষ্টিতে] তাকিয়ে তাকিয়ে তা চুরি করাকে [তিনি তাও অবগত] যেটা বক্ষদেশ লুকিয়ে গোপন রাখে। অন্তরসমূহ।

٢٠. وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُوْنِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ط فَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ شُرَكَاءَ لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمْ الْبَصِيْرُ بِاَفْعَالِهِمْ.

২০. আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে বিচার করবেন, আল্লাহ তা'আলার স্থলে তারা যাদের ডাকতে থাকে তথা ইবাদত করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা, يَدْعُوْنَ শব্দটি ى এবং تَا উভয়ের সাথে পড়া যায় [অর্থাৎ يَدْعُوْنَ ও تَدْعُوْنَ] তাঁকে [আল্লাহকে] ব্যতীত আর তারা হলো দেব-দেবী, তারা কোনো প্রকার ফয়সালা করতে পারে না সুতরাং কিরূপে তারা আল্লাহ তা'আলার শরিক হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা তাদের বক্তব্যসমূহ সর্বদ্রষ্টা অধিক শ্রেতা তাদের কৃতকর্মসমূহে।

তাহকীক ও তারকীব

اِذِ الْقُلُوْبُ الخ আয়াতে كَاظِمِيْنَ -এর মহল্লে ই'রাব কি? এখানে "كَاظِمِيْنَ" শব্দটিতে দু ধরনের ই'রাব হতে পারে।

১. এটা مَحَلًّا মানসূব হবে। এ অবস্থায় দু সম্ভাবনা– ক. হয়তো এটা اَصْحَابُ الْقُلُوْبِ হতে حَالٌ হবে। এ পরিসরে আয়াতের অর্থ হয়– "اِذْ قُلُوْبُهُمْ لَدَى حَنَاجِرِهِمْ كَاظِمِيْنَ عَلَيْهَا" যখন তাদের অন্তরসমূহ কণ্ঠাগত হবে, অথচ তারা সেগুলোকে সংযত করতে ইচ্ছা করবে। খ. না হয় এটা অর্থাৎ كَاظِمِيْنَ টা اَلْقُلُوْبُ হতে حَالٌ হবে। তখন অর্থ হবে– اِذِ الْقُلُوْبُ كَاظِمِيْنَ عَلٰى غَمٍّ وَكَرْبٍ فِيْهَا مَعَ كَوْنِهَا الْحَنَاجِرِ অর্থাৎ 'যখন কণ্ঠাগত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরসমূহ দুঃখে ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে পড়বে।'

২. এটা مَحَلًّا মারফূ' হবে। অর্থাৎ كَاظِمُوْنَ হবে। এমতাবস্থায় এটা اَلْقُلُوْبُ -এর খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ" আয়াতের বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে মানুষের অবস্থার যৎসামান্য বিবরণ প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যককে নবুয়তের গুরুদায়িত্ব প্রদানের জন্যে নির্বাচিত করেছেন। যেন তারা মানুষদেরকে কিয়ামত তথা হাশরের দিবস সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করাতে পারেন। তাদেরকে সাবধান করে দিতে পারেন। সেদিন সমগ্র মানুষ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হবে। তাদের ক্ষুদ্রতর কোনো বিষয়ও আল্লাহ পাকের নিকট গোপন থাকবে না।

আল্লাহর বাণী "هُمْ بَارِزُوْنَ" দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর পবিত্র বাণী "هُمْ بَارِزُوْنَ" -এর তাফসীরে হযরত মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.)-এর তাফসীরে বলেছেন– خَارِجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ অর্থাৎ হাশরের দিবসে লোকসকল তাদের কবরসমূহ হতে বের হয়ে আসবে।

২. মুফতি শফী (র.) লিখেছেন যে, "بَارِزُوْنَ" -এর ভাবার্থ হলো হাশরের ময়দান সম্পূর্ণ সমতল হবে। অথবা পাহাড়-পর্বত, প্রাসাদ অথবা বৃক্ষলতা কিছুই থাকবে না। সুতরাং তখন সৃষ্ট জীব সরাসরি গোচরীভূত হবে।

৩. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এর অর্থ হলো হাশরের ময়দানে সকল সৃষ্টির কৃতকর্ম ও যাবতীয় গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

৪. অথবা কেউ কেউ বলেছেন– এর অর্থ হলো হাশরের ময়দানে মানুষসমূহকে উলঙ্গ করে উঠানো হবে। সুতরাং হাদীস শরীফে রয়েছে "يُحْشَرُوْنَ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا" অর্থাৎ লোকজনকে উলঙ্গ ও নগ্ন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে।

মোদ্দাকথা, হাশরের ময়দানে বান্দার সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।

لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হাশরের দিন কারো কোনো বিষয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট উহ্য থাকবে না। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কাফের ও পাপীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাদেরকে অবগত করালেন যে, তোমরা যত সঙ্গোপনেই গুনাহ কর না কেন তা হাশরের দিন যেদিন তোমাদের প্রতিটি কাজ-কর্মের কড়া-ক্রান্তি হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে বিন্দুমাত্র গোপন রাখতে পারবে না। দুনিয়ার বিচারক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে যেভাবে ফাঁকি সম্ভব হয় হাশরের ময়দানেও আল্লাহর চক্ষুকে অনুরূপ ফাঁকি দিতে পরবে বলে যারা ধারণা করে বসে রয়েছে, তারা চরম ভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত রয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া তাঁর নিকট হতে কোনো কিছুকে গোপন রাখা মোটেই সম্ভবপর হবে না। অবশ্য দুনিয়াতেও সে তাঁর নিকট হতে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় তা নয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের অনেক কিছু আল্লাহ জেনেও না জানার ভাব দেখান। পরীক্ষার স্বার্থে তাদের সবকিছু প্রকাশ করে দেন না। কিন্তু পরকালে হাশরের ময়দানে তিনি সবকিছু ফাঁস করে দেবেন। সকল গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দেবেন, যা দুনিয়োতে করেননি। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে এ একই কথার দিকে ইঙ্গিতবহ।

১. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ সেদিন সমস্ত গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দেওয়া হবে।

২. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ হাশরের দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ই সেদিন গোপন থাকবে না।

৩. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا সেদিন তা নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা প্রকাশ করে দেবে।

৪. "إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ" যেদিন কবরস্থ সব কিছু উত্থিত হবে এবং অন্তরস্থ সবকিছু প্রকাশিত হবে।

মোদ্দাকথা, হাশরের দিন মানুষের সকল গোপন তথ্য প্রকাশিত হবে এবং তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কঠোর প্রতিফল প্রদান করা হবে। হয় তা হবে জান্নাত রূপে না হয় 'জাহান্নাম'।

"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" আয়াতাংশের বিশ্লেষণ : হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সৃষ্টিকুলকে লক্ষ্য করে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করবেন– لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ অর্থাৎ আজকের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পরাক্রমতার প্রভাবে কেউই কিছু বলার সাহস পাবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজেই উত্তরে বলবেন "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" অদ্যকার সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হলেন এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ। এতদ সম্পর্কিত দুটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

ক. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস আবূ দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, একজন ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি সে সময় এসে গেছে, এ ঘোষণার আওয়াজ এতই সুদীর্ঘ হবে যে, জীবিত ও মৃত সকলেই তা শুনতে পারবে। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে আগমন করবেন, তখন একজন ফেরেশতা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘোষণা করবে।

খ. ইমাম কুরতুবী (র.) উল্লেখ করেন যে, আবূ ওয়ায়েল হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সকলকে একটি পরিষ্কার ময়দানে একত্রিত করা হবে যে জমিনে কেউ কোনো দিন কোনো পাপ করে নি। অতঃপর এক আহ্বানকারীকে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলা হবে- "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" তখন সমগ্র মু'মিন ও কাফের এক বাক্যে সমস্বরে বলে উঠবে-"لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" ঈমানদারগণ তাদের আকীদা অনুযায়ী আনন্দের সাথে তা বলবে। অপর দিকে কাফেররা নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বেদনাহত হয়ে তা স্বীকার করে নেবে।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য কতেক বর্ণনায় এসেছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই জবাবে তা বলবেন।

সে যা-ই হোক আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনার সুরে সেদিন উপরিউক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। দুনিয়ায় তো এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক অনেক রয়েছে যারা নিজেদের একচ্ছত্র বাদশাহী ও স্বৈরতন্ত্রের শানাই বাজাতে থাকে। আর অনেক নির্বোধ লোকই তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতেছে। কিন্তু এখন বল, মূলত বাদশাহী, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কার? সর্বময় ক্ষমতার উৎস ও মালিক কে? সত্যিকার পক্ষে কার হুকুম চলে? তা এমন একটা কথা, যা কেউ চেতনা সহকারে শুনতে পেলে সে যত বড় স্বৈরাচারী বাদশাহ ও নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের অধিকারী হোক না কেন তার কলিজা প্রকম্পিত হয়ে উঠবে এবং স্বৈরতন্ত্রের বাষ্প সবই তার মস্তিষ্ক হতে বের হয়ে পড়বে।

এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ্য। সামানী পরিবারের বাদশাহ নসর ইবনে আহমদ নিশাপুরে প্রবেশ করে। একটি দরবার বসাল। আর সিংহাসনে আরোহণ করে নির্দেশ দিল যে, দরবারের কার্যক্রম আরম্ভ হবে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তার কথা শুনে এক বৃদ্ধ লোক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কুরআনের এ আয়াতসমূহ পাঠ করল। বৃদ্ধ তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছলে নসর ইবনে আহমদ বাদশাহের উপর ভয় ও কম্পন আরম্ভ হয়ে গেল। সে প্রকম্পিত অবস্থায় সিংহাসন হতে নেমে আসল। রাজমুকুট মাথার উপর হতে নামিয়ে সিজদায় পড়ে গেল এবং বলল- "হে আল্লাহ! বাদশাহী একমাত্র তোমারই, আমার নয়"।

"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الخ" আয়াতে প্রশ্নকারী ও উত্তর দাতা কে? উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরের দিন উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্য প্রশ্ন পরিবেশন করা হবে এ মর্মে "অদ্যকার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার"। এর উত্তরে বলা হবে- "একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার। অথচ একথার উল্লেখ নেই যে, কে প্রশ্ন করবে আর কেই বা উত্তর দেবে। সুতরাং এতদ সম্পর্কিত মুফাসসিরীনের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

১. কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কেরাম (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ থেকেই হাশরের ময়দানে সমগ্র জনতার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন তুলবেন এবং নিজেই তার জবাব পেশ করবেন। কারণ সেদিন, সেক্ষণে আল্লাহ সুবহানুহুর প্রভাবে কেউ মুখ খোলার সাহস করবে না। শ্রদ্ধেয় ইমাম আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.)-এর এটাই অভিমত।

২. এক দল মুফাসসিরের মতে প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা উভয়ই হবেন ফেরেশতা।

৩. অন্যরা বলেন, প্রশ্নকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আর উত্তর দেবেন হাশরের মাঠে উপস্থিত মানুষরা।

৪. আল্লাহর পক্ষ হতে একজন ঘোষণাকারী উল্লিখিত প্রশ্ন রাখবেন। আর তখনই সমগ্র মু'মিন ও কাফের জবাবে সমস্বরে বলে উঠবে "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" অদ্যকার রাজত্বের মালিক একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার।

হযরত হাসান বসরী (র.) সহ অধিকাংশ তাফসীরকারগণ প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা.) এর নিম্নোক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন সমস্ত জমিনকে বাম হাতে এবং আসমানসমূহকে ডান হাতে ধারণ করে বলবেন "أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ" "আমিই বাদশাহ, সব কিছুর মালিক, প্রতাপশালী ও দাম্ভিকেরা আজ কোথায়?"

কখন বলা হবে "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" ? উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর কখন করা হবে– এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মতে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ যেমন– হযরত জিবরাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত ইসরাফীল এমনকি মালাকুল মউত হযরত আযরাঈল (আ.)ও ইন্তেকাল করবেন। আল্লাহ তা'আলার একক সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত প্রশ্ন রাখবেন–

এখানে প্রিয়নবী ﷺ -এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য, বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, যার মর্ম হলো, তিনজন ফেরেশতা বেহুঁশ হবে না তারা হলেন জিবরাঈল, মীকাঈল এবং আযরাঈল (আ.)। এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদিও তিনি সবই অবগত তবুও জিজ্ঞাসা করবেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা আর কে অবশিষ্ট আছে? মালাকুল মওত বলবেন, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র সত্তা এবং তোমার বান্দা জিবরাঈল, মীকাঈল ও মালাকুল মওত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, মিকাঈলের রূহ কবজ করে নাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, আর কে বাকি রয়েছে? মালাকুল মওত আরজ করবে, হে আল্লাহ তা'আলা! তোমার মহাপবিত্র সত্তা এবং তোমার বান্দা জিবরাঈল ও মালাকুল মওত। আদেশ হবে, জিবরাঈলের রূহ কবজ করে নাও। তখন উক্ত আদেশ কার্যকর হবে। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, এখন কে রয়েছে? তখন হযরত আযরাঈল (আ.) বলবেন, শুধু তোমার পবিত্র সত্তা এবং মালাকুল মওত। আদেশ হবে, তুমিও মৃত্যুবরণ কর, এবার মালাকুল মওতের মৃত্যু হবে। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা তখন ঘোষণা করবেন, আমিই সর্বপ্রথম সমগ্র মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছি, পুনরায় আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করব, আজ দম্ভকারী, জালিমরা কোথায়? আজ ক্ষমতা কার? কিন্তু তখন কেউই জবাব দেওয়ার মতো অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করবেন– لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজ ক্ষমতা) একমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলারই, যিনি মহা পরাক্রমশালী। –[তাফসীরে মাযহারী : ১০/২২৫]

২. জুমহুর মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, কবর থেকে উঠে এসে মানুষদের হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার পর তথা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পর সমগ্র সৃষ্টি পুনরুজ্জীবিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সৃষ্টিকুলের সামনে প্রশ্ন রাখবেন। তাৎক্ষণিক অকপটে সমস্বরে উপস্থিত জনতা ঈমানদার ও কাফের নির্বিশেষে সকলেই জবাব দেবে "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" ঈমানদাররা তো আনন্দের সাথে এ জবাব দেবে। অপরদিকে কাফের বাধ্য নিরুপায় হয়ে দুঃখভারাক্রান্ত মনে, অসহনীয় জ্বালা ক্ষোভ বক্ষে ধারণ করে উক্ত জবাব দেবে। এ পরিসরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ مِثْلَ الْفِضَّةِ لَمْ يَعْصِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا . فَيُؤْمَرُ مُنَادٍ يُنَادِيْ "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" فَيَقُوْلُ الْعِبَادُ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذَا سُرُوْرًا وَتَلَذُّذًا وَيَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ غَمًّا وَانْقِيَادًا وَخُضُوْعًا .

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হাশরের ময়দান হবে রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও স্বচ্ছ। এর মধ্যে কেউই পাপাচারে লিপ্ত হয়নি। তখন এক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবে, আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার? ঈমানদার ও কাফের সকলেই নির্বিশেষে বলে উঠবে মহাপরাক্রমশালী এক অদ্বিতীয় আল্লাহর। ঈমানদারগণ এটা আনন্দ উল্লাসের সাথে বলবেন আর কাফেররা ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে বাধ্য হয়ে বলবে। উক্ত দ্বিতীয় মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর কারণ হলো–

ক. "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" -এর পূর্বে "يَوْمَ التَّلَاقِ" ও "يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ" উল্লেখ করা হয়েছে। "يَوْمَ التَّلَاقِ" অর্থ হলো– মোলাকাত ও একত্রিত হওয়ার দিবস আর "يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ" যেদিন মানুষ তাদের কবর হতে বের হয়ে আসবে তথা পুনরুত্থানের দিন। এ দুটি অবস্থা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে সংঘটিত হবে। আর এসবের যেহেতু "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" -এর উল্লেখ আনা হয়েছে, সেহেতু এ থেকে প্রকাশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য প্রশ্নোত্তরের ঘটনা ও দ্বিতীয় ফুৎকার বা পুনরুত্থানের পর হাশরের ময়দানে উপস্থিত জনতার সামনে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলার কোনো কথা কাজ উদ্দেশ্যহীন হয় না; বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের পিছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। অতএব, তাঁর উল্লেখ্য প্রশ্নোত্তর কালে যদি কোনো শ্রোতাই না থাকবে তবে তা অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খামখেয়ালিপূর্ণ বাক্য ব্যয় বলে মনে হবে। সুতরাং এ অভিমতই বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য। পরিশেষে এটাই সিদ্ধ কথা যে, দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পুনরুত্থানের পরে উপরিউক্ত সুয়াল জবাব সংঘটিত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

"اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" আয়াতের তাফসীর : ইতঃপূর্বে ইরশাদ ছিল, হাশরের মাঠে সর্বসময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানুহু। পরন্তু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েই যে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করবেন তা নয়; বরং প্রতিটি প্রাণকে শুধু তার কর্মের প্রতিদান দেবেন। ভালো কর্মের প্রতি দান ভালো তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি। আর মন্দ ও অযাচিত কর্মের প্রতিদানও হবে মন্দ তথা ভয়াবহ পরিণতি।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ... : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

ক. **প্রত্যেককে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে :** ইরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ "আজকের দিনে প্রত্যেককেই তার কর্মফল প্রদান করা হবে।" অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। সেদিন কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, হবে না কোনো অবিচার আর অনাচার। কারো নেক আমলের ছওয়াব কম করা হবে না, আর কারো পাপ কার্যের শাস্তি অধিক পরিমাণে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা যেমন ওয়াদা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেককে তার কর্মের বিনিময় দেওয়া হবে। সেদিন ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় জুলুম সম্পূর্ণই অচিন্তনীয়।

মূলত ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আজো আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে, তবে দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করেছেন, মানুষ আল্লাহ তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু কিয়ামতের দিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতেই। ইরশাদ হচ্ছে وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আর আমি বান্দাদের জন্যে আদৌ জালিম নই।' বস্তুত আল্লাহ তা'আলা অনন্ত-অসীম দয়াবান, তিনি পারম দয়ালু, তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না, তিনি এটাও ঘোষণা করেছেন- "غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ" অর্থাৎ 'আমার রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।'

খ. **যে কোনো কাজের প্রতিফল অনিবার্য :** মানুষ ভালো মন্দ যা কিছুই করবে অবশ্যই তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" সে যে ভালো কর্ম করবে তার কল্যাণ ভোগ করবে, আর যা কিছু মন্দ কর্ম করবে তার শাস্তিও ভোগ করবে। আরো ইরশাদ হচ্ছে- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ অর্থাৎ কেউ সামান্যতম ভালো কাজ করলে তার প্রতিদান পাবে আর সামান্যতম মন্দ কাজ করলেও তার প্রতিফল পাবে।

মোদ্দাকথা হলো, 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এটাই এ বিষয়ে ইসলামের মূল নীতিমালা ও বিধান।

গ. **মানুষের উপার্জনে সাব্যস্ত করা হয়েছে :** মানুষ যদিও তার কাজকর্মের স্রষ্টা নয়। তথাপি সে তার كَاسِبٌ বা উপার্জনকারী। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বা বিশ্বাস। অন্যভাবে বলা যায়- কোনো কাজ করা ও না করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। ভাল-মন্দ সব কাজেই মানুষ ইচ্ছা করলে তা করতে পারে আবার ইচ্ছা না হলে তা হতে বিরত থাকতে পারে। আর এর উপর বিচার করেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে কিংবা আজাব দেওয়া হবে। মোদ্দাকথা, كَسْبٌ -এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের প্রতিফল নির্ধারণ করা হবে।

ঘ. **মানুষের কর্মের প্রতিফল পাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত :** মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিফল যদিও কম-বেশি বিভিন্নভাবে দুনিয়াতেও দেওয়া হয়ে থাকে তথাপি তার প্রকৃতি প্রতিফল প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত। শুধুমাত্র আখেরাতেই মানুষ তার কর্মের পরিপূর্ণ ন্যায় সঙ্গত প্রতিফল পেতে পারে। দুনিয়ার এ স্বল্প পরিসরে মানুষের ভালো কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা সম্ভব নয়; যেমনি সম্ভব নয় মন্দ কার্মের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা।

"لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ" আয়াতাংশের তাফসীর : ইরশাদ হচ্ছে, আজকের এ দিনে কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, যার যা প্রাপ্য সত্য ও ন্যায় সঙ্গতভাবে সে তাই পাবে। আবদ ইবনে হুমায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গুনাহ তিন প্রকার– ১. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে, ২. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না ও ৩. যে গুনাহ থেকে কোনো কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে। যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে তা হলো এমন গুনাহ যা করার পর বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা ইস্তেগফার করে। আর যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না তা হলো শিরক। আর যে গুনাহ এতটুকুও ছেড়ে দেওয়া হবে না তা হলো মানুষের পরস্পররের প্রতি পরস্পরের জুলুম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা বলার পর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিফল প্রদানের ব্যাপারে কয়েক প্রকারের জুলুম হতে পারে।

১. কেউ পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য ও অধিকারী হবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না।

২. যে লোক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে শাস্তি না দেওয়া।

৩. একজন শাস্তি পাওয়ার মতো নয়, তথাপি তাকে শাস্তি দেওয়া।

৪. কম মাত্রায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক শাস্তি দেওয়া।

৫. একজন যতটা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাকে তা অপেক্ষা অনেক কম দেওয়া।

৬. একজনের অপরাধে অন্য জনেকে দোষী সাব্যস্ত করা।

মোদ্দাকথা, এসবের কোনো জুলুমই আল্লাহ করবেন না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুম করা আমার উপর হারাম করেছি, আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। আরো ইরশাদ করেছেন– হে আমার বান্দাগণ! এ হলো তোমাদের আমলসমূহ, আমি এ সবরের বিনিময় অবশ্যই দান করবো। অতএব, যে কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। আর যে এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু পায় সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

"إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ" আয়াতাংশের তাফসীর : ইরশাদ হচ্ছে– "اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ" "মানুষের নিকট তার হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত এবং বিমুখ। এমনিভাবে "مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ" অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করা এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করার মতোই। কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়ার সাথে সাথেই অনতি বিলম্বে তা কার্যকরী হয়।

আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুততার সাথে হিসাব গ্রহণকারী। হাদীস শরীফে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিনের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করে ফেলবেন।

হিসাব গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলার এতটুকুও বিলম্ব হবে না। তিনি জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবকে একই সময় রিজিক দান করেছেন এবং একজনকে রিজিক দান করার ব্যস্ততায় অপরকে রিজিক দিতে অপারগ হন না। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসকে যেমন একই সময়ে দেখতে পান, সকল শব্দ একই সময় শুনতে পান, ছোট-বড় সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা একই সময় করে থাকেন। কোনো একটি জিনিস তার লক্ষ্যকে এমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না-যার ফলে তিনি অন্য জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য দিতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব একই সময়ে গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে মামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও সেই জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হওয়ার কারণে বিচারকার্যে কোনোরূপ বিলম্ব হবে না। বিচারপতি সকল ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিজেই অবহিত, মামলার প্রতিপক্ষ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত এবং ঘটনার স্পষ্ট সাক্ষ্য খুঁটি-নাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ অনিতিবিলম্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়ে যাবে। কাজেই প্রতিটি মামলার ফয়সালাও মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা তো বিশাল কুদরতের অধিকারী যে, সমগ্র সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করতে তাঁর মুহূর্ত কালেরও প্রয়োজন হয় না।

"وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ" আয়াতাংশের তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা এখানে নবী করীমকে ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, কাফেরদের বিশেষভাবে এবং সকলকে সাধারণভাবে কিয়ামত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– "হে হাবীব! আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন তথা কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মাজীদে বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের নিকট হতে বিন্দুমাত্র দূরে নয়। যে কোনো মুহূর্তেই কিয়ামত তাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে পারে।

কোথাও বলা হয়েছে– "اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ" কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– "اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ" "কিয়ামত নিকটবর্তী, আল্লাহ ব্যতীত তা হতে কেউ রক্ষাকারী নেই।"

মোদ্দাকথা, উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা লোকদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতকে দূরবর্তী মনে করে তারা নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে না পড়ে। সুতরাং আর এক মুহূর্তেও বিলম্ব না করে তারা যেন আত্মসংশোধন করে নেয়।

কেউ কেউ "يَوْمَ الْاٰزِفَةِ" -এর দ্বারা মৃত্যুর দিনকে বুঝিয়েছেন। কেননা "اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ" অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুবরণ করতেই তার কিয়ামত আরম্ভ হয়ে যায়। কাফেরদের এ বিশ্বাস ছিল তাদের বাতিল উপাসনা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে; কিন্তু তাদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোই থাকবে না। কাউকেই এর অনুমতি দেওয়া হবে না। অথচ অনুমতি ব্যতীত সেদিন কেউ কোনো কথা বলার সাহস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, বিপদগ্রস্ত এবং ক্রন্দনরত থাকবে। যারা দুনিয়াতে নাফরমানি করে নিজেদের প্রতি চরম জুলুম করে তারা সেদিন সর্বাধিক অসহায় হবে। তাদের কোনো বন্ধুও থাকবে না এবং তাদের কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।

"مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ" আয়াতাংশ দ্বারা সুপারিশ সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে বাতিলপন্থিদের দলিল এবং তার খণ্ডন : উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা মু'তাযিলা ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা ধৃষ্টতা পোষণ করতঃ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হাশরের দিন জালিম তথা কাফের ও ফাসেক কারো জন্যই কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। আর থাকলেও তার সুপারিশ অগ্রাহ্য হবে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো যে সকল ঈমানদার তার বদ আমলের কারণে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে, সে সকল গুনাহগার মু'মিনদের সুপারিশ কবুল করবেন । কুরআন হাদীসের বহু বাণী দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে সে বাতিলপন্থিদের প্রামাণ্য এ দলিলের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হচ্ছে–

১. উক্ত আয়াতে ظَالِمِيْنَ দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে শিরক মহা জুলুম। আর মুশরিক ও কাফিরদের পক্ষে এ সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রকার দ্বিমত পোষণ করেনি। এর কারণ হলো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে ঈমানদার হওয়া পূর্বশর্ত।

২. আর ظَالِمِيْنَ দ্বারা যদি ঈমানদার ফাসেক উদ্দেশ্য হয়, তবে "لَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ" -এর অর্থ হবে তাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী হবে না যার সুপারিশ মেনে নিতে আল্লাহ তা'আলা বাধ্য হবেন। ইচ্ছা সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন হবে। আয়াতে "سِبَاقْ سِيَاقْ" তথা পূর্বাপর অবস্থার আলোকে প্রথমোক্ত দলিলই অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।

"وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ" আয়াতের তাফসীর :

কোনো কিছুই আল্লাহ পাকের অজানা নয় : ইরশাদ হচ্ছে– 'তিনি (আল্লাহ তা'আলা) অবগত রয়েছেন মানুষের গোপন দৃষ্টি এবং তাদর অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে ভাবনার উদয় হয় তিনি তাও অবগত।'

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনে কেরাম চক্ষুর খেয়ানত বলতে এর চুরিকে বুঝিয়েছেন।

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে গমন করল অথবা অন্য কোথাও কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করল যা তার জন্যে হারাম, যাকে দেখল সে হয়তো তাকে দেখেনি আল্লাহ তা'আলা তা দেখেছেন, শুধু তাই নয়; বরং তখন তার মনে যে বাবনার উদয় হয় সে গোপন বিষয় সম্পর্কেও মহান আল্লাহ জ্ঞাত। মোটকথা পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাত নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোখের চোর হলো সে ব্যক্তি যে বহু মানুষের সাথে বসা থাকা অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে যখন কোনো বেগানা [অপরিচিতা গায়রে মাহরাম] রমণী অতিবাহিত হয়, তখন অন্যদের অগোচরে এ মহিলার প্রতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, সে ব্যক্তি হলো চোখের চোর যে বেগানা মহিলার পতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি দেয়। আর লোকেরা তা দেখে নিলে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এমনিভাবে বরংবার করতে থাকে।

আল্লামা মুফতি শফী (র.) স্ব-প্রণীত মা'আরিফুল কুরআন নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, চক্ষু বা দৃষ্টির খেয়ানতের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি লোকদের অগোচরে এমন কোনো বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তার জন্য হারাম। যেমন কোনো বেগনা মহিলার প্রতি কামভাবে দৃষ্টি দেওয়া। অতঃপর অন্য কাউকে দেখলে দৃষ্টি ফিরেয়ে নেওয়া। অথবা [আড় চোখে] এমনভাবে তাকাবে যে, কেউ দেখে তা বুঝতেই পারে না। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে ও দৃষ্টিতে এর কোনোটাই গাপন নয়।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই জানেন, সবই তাঁর আয়ত্বে। উম্মে মা'বাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন প্রিয়নবী ﷺ -কে এ দোয়া করতে শুনেছি–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خِيَانَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফেকী হতে পবিত্র রাখ এবং আমার আমলকে রিয়া (হিংসা) থেকে এবং আমার রসনাকে মিথ্যাবাদী থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত থেকে, কেননা তুমি চক্ষুগুলোর খেয়ানতও জ্ঞাত এবং অন্তরসমূহে যেসব ভাবনা গোপন থাকে তাও তুমি জ্ঞাত। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর–৫/৩৮৪]

"وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ..... هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ" **আয়াতের তাফসীর :** আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসের একমাত্র ন্যায়পরায়ণ মহাপ্রজ্ঞাময় বিচারক হবেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কারো কল্পনাও করা যায় না। কেননা সঠিক জ্ঞান না থাকলে সঠিক বিচার করা যায় না, আর ক্ষমতা না থাকলে সঠিক বিচারের বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, কোনো কিছুই তাঁর অবিদিত নয়; আর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর বিচার কার্যকরী হতেও কোনো প্রকার বাধা থাকে না। তাই ইরশাদ হচ্ছে- وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ الخ আর আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে বিচার কার্য সমাধা করেন। কেননা তিনি মহা জ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর এ জন্যেই তাঁর বিচার হয় সঠিক ও নির্ভুল, হিকমতপূর্ণ, তাৎপর্য মণ্ডিত। "আল্লাহ তা'আলার স্থলে কাফেররা যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুই ফয়সালা করতে পারে না।"

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার স্থলে যাদেরকে ডাকে যেমন- মূর্তি, শয়তান প্রভৃতিকে তারা ডাকে, তারা কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিতে পারে না। কেননা ফয়সালা করার শক্তিই তাদের মধ্যে নেই। সঠিক ফয়সালা করার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা তাদের নেই এবং ফয়সালা কার্যকর করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাও তাদের মধ্যে নেই।

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন তাই কারো চক্ষুর চুরিও তাঁর অগোচরে থাকে না। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেসব লোকের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ডাকে। আর তাদের সমালোচনাও হয়েছে এ মর্মে যে, যারা কিছু দেখেও না, শোনেও না এমন জড় পদার্থকে কাফিররা উপাস্য মনে করে, এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করা এবং তাঁর স্থলে জড় পদার্থকে ঠাকুর দেবতা বানিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করা শুধু যে নির্বুদ্ধিতা তাই নয়; বরং মানবতার চরম অবমাননা এবং চূড়ান্ত অধঃপতন।

অনুবাদ :

٢١. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّفِىْ قِرَاءَةٍ مِنْكُمْ وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ مِنْ مَصَانِعَ وَقُصُوْرٍ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اَهْلَكَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ عَذَابِهِ.

২১. তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তো তার তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখতে পেত। তারা শক্তিমত্তার দিক দিয়ে এদের হতে অধিক ছিল– এক কেরাতে مِنْهُمْ -এর স্থলে مِنْكُمْ রয়েছে এবং জমিনে নিদর্শনাদি স্থাপনের দিক দিয়ে যেমন শিল্প-কারখানা ও প্রাসাদসমূহ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করলেন তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন তাদের গুনাহের দরুন। আর তাদেরকে কেউ রক্ষাকারী ছিল না আল্লাহ হতে (অর্থাৎ) আল্লাহর আজাব হতে।

٢٢. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

২২. তা এই যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ আগমন করতেন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ নিয়ে– অতঃপর তারা কুফরি করল [তারা অস্বীকার করল] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা।

٢٣. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ.

২৩. আর নিশ্চয় আমি মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে।

٢٤. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا هُوَ سٰحِرٌ كَذَّابٌ.

২৪. ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট– সুতরাং তারা বলল, সে জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

٢٥. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْا اِسْتَبْقُوْا نِسَاءَهُمْ ط وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ هَلَاكٍ.

২৫. অনন্তর যখন সে হক সহ তাদের নিকট আগমন করল সত্য নিয়ে আমার পক্ষ হতে, তখন তারা বলল, মূসা (আ.)-এর উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করে দাও। আর জীবিত রাখো অবশিষ্ট রাখো তাদের কন্যা সন্তানদেরকে, তবে কাফেরদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ হবেই ধ্বংস [বিফল]।

٢٦. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكُفُّوْنَهُ عَنْ قَتْلِهِ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ط لِيَمْنَعَهُ مِنِّىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ مِنْ عِبَادَتِكُمْ اِيَّاىَ فَتَتَّبِعُوْنَهُ.

২৬. আর ফেরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আ.)-কে খুন করবো– কেননা লোকেরা তাকে মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হতে বারণ করত। সে যেন তার রবকে ডাকে আমার [আক্রমণ] হতে তাকে রক্ষা করার জন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, সে তোমার দীনকে পরিবর্তন করে দেবে, তোমাদেরকে আমার ইবাদত হতে ফিরিয়ে নেবে। আর তোমরাও তার অনুসরণ করে বসবে।

أَوْ أَنْ يَظْهَرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ وَفِى قِرَاءَةٍ أَوْ وَفِى أُخْرَى بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَضَمِّ الدَّالِ.

অথবা, সে জমিনে ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি করবে। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে। এক কেরাতে و -এর পরিবর্তে أَوْ হয়েছে। আবার অপর এক কেরাতের يَظْهَرَ -এর ي ও ه -এর মধ্যে যবর রয়েছে এবং (اَلْفَسَادُ -এর) د -এর মধ্যে পেশ রয়েছে।

٢٧. وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

২৭. আর হযরত মূসা (আ.) বললেন– তার জাতিকে লক্ষ্য করে, তিনি ফেরাউনের ঐ কথা শুনেছিলেন। আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার রবের নিকট যিনি তোমাদেরও রব, প্রত্যেক অহঙ্কারীর (অনিষ্ট) হতে হিসাব-নিকাশের দিনের উপর যার বিশ্বাস নেই।

তাহকীক ও তারকীব

أَوَلَمْ يَسِيرُوا "أَوَلَمْ يَسِيرُوا الخ" আয়াতাংশে মা'তূফ আলাইহি ও اِسْتِفْهَامٌ-এর জবাব কি? উল্লিখিত আয়াতাংশে অর্থাৎ فِى الْأَرْضِ -এর মধ্যে হামযাটি اِسْتِفْهَامٌ -এর জন্য এসেছে এবং وَاوْ (ওয়াওটি) হরফে আতফ। তাই اِسْتِفْهَامٌ -এর হামযাহ তার জবাব কামনা করে এবং হরফে আতফ তদপূর্বে مَعْطُوفْ عَلَيْهِ হওয়াকে চায়। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে, اِسْتِفْهَامٌ -এর জবাবটি কি এবং এখানে مَعْطُوفْ عَلَيْهِ টা কি হতে পারে। যাহোক এখানে اِسْتِفْهَامٌ -এর জবাব হলো فَيَنْظُرُوا كَيْفَ আর مَعْطُوفْ عَلَيْهِ -এর পূর্বে উহ্য রয়েছে। বাক্যটি হবে এমন "أَقَعَدُوا فِى الْبُيُوتِ وَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ" كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ الخ "كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ الخ؟" আয়াতে "كَيْفَ" -এর মহল্লে ই'রাব কি এবং كَيْفَ -এর جَوَابٌ কি? আয়াতে কারীমা– "كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ" -এর মধ্যে كَيْفَ পদটি كَانَ -এর خَبَرٌ مُقَدَّمٌ (হওয়ার কারণে মহল্লান মানসূব হয়েছে)। আর "عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ" হলো كَانَ -এর اِسْمٌ. كَانَ তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়েছে يَنْظُرُوا -এর مَفْعُولٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হয়েছে। আর كَيْفَ -এর جَوَابٌ হলো "كَانُوا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا"

كَانُوا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً আয়াতে مِنْهُمْ -এর একাধিক কেরাত প্রসঙ্গে : অত্র আয়াতে مِنْهُمْ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. ইবনে আমের শামী (র.) এখানে مِنْكُمْ পড়েছেন।

২. জমহুর ক্বারীগণ এখানে مِنْهُمْ পড়েছেন।

أَوْ أَنْ يَظْهَرَ "أَوْ أَنْ يَظْهَرَ" আয়াতাংশে বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী "أَوْ أَنْ يُظْهِرَ" -এর أَوْ -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত রয়েছে।

১. কূফার ক্বারীগণ ও ইয়াকূব (র.) أَوْ পড়েছেন।

২. অন্যান্য ক্বারীগণ أَوْ-এর স্থলে وَ দিয়ে পড়েছেন।

আবার "يُظْهِرَ" -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ يُظْهِرَ - ي -এর উপর পেশ এবং ه -এর নিচে যের যোগে (بَابُ اِفْعَالٌ) হতে পড়েছেন।

২. নাফে, ইবনে কাছীর ও আবূ আমর প্রমুখ ক্বারীগণ يَظْهَرَ . ي ও ه অক্ষরদ্বয়ের উপর যবর দিয়ে পড়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমোক্ত কেরাত অনুযায়ী اَلْفَسَادَ -এর د অক্ষরে পেশ হবে এবং শেষোক্ত কেরাত অনুযায়ী যবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : উল্লিখিত আয়াতসমূহের দ্বারা হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যকার সংশ্লিষ্ট কাহিনীর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনা আলোকপাত করা হলো–

হযরত মূসা (আ.) -এর জন্মগ্রহণকালে মিশরের বাদশা তথা ফেরাউন ছিল ওলীদ ইবনে মুস'আব। হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে সে ফেরাউনের এক স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জ্যোতিষীরা বলে ছিল যে, বনূ ইসরাঈলে অচিরেই এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে আপনার সিংহাসনের পতন অনিবার্য। ফেরাউন তখন বনূ ইসরাঈলের যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। হত্যার ভয়ে জন্মের পর হযরত মূসা (আ.)-এর মা তাঁকে সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। সিন্দুক ফেরাউনের প্রাসাদের পার্শ্বে গিয়ে ভিড়ে। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সিন্দুকটি তুলে নেন। নিঃসন্তান আসিয়ার অনুরোধে ফেরাউন শিশুটিকে লালনপালনের দায়িত্ব নেয়।

ফেরাউনের ঘরেই হযরত মূসা (আ.) ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করেন । এ সময়ে এক কিবতীকে হত্যা করতঃ ভয়ে তিনি মিসর ছেড়ে মাদইয়ান চলে যান। তথায় হযরত শোআয়েব (আ.)-এর ঘরে আশ্রয় পান। হযরত শোআয়েব (আ.)-এর এক কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দীর্ঘ আট বৎসর তথায় অবস্থানের পর সস্ত্রীক মিসরের উদ্দেশ্যে গমন করেন। পথিমধ্যে তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তদীয় ভাই হারুনকেও নবুয়ত দান করতঃ তাঁর সহযোগী নির্ধারণ করা হয়।

মিসরে তখন প্রধানত দুটি সম্প্রদায় ছিল– কিবতী ও বনূ ইসরাঈল। ফেরাউন ছিল কিবতী বংশোদ্ভূত। স্বভাবতই সে রাষ্ট্রতন্ত্রে কিবতীদের প্রতি ছিল সদয় আর ইসরাঈলীদের প্রতি ছিল ভীষণ বিশ দাঁতের। মিশরে প্রত্যাবর্তন করে হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার দলবলকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি নির্যাতিত বনূ ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার জোর দাবি জানান। ফেরাউন যে মুশরিক ছিল তাই নয়; বরং সে নিজেকে 'বড় মা'বুদ' হিসেবে দাবি করে।

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তাঁর নবুয়ত মেনে নেয়নি। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল যে, তুমি সত্য নবী হলে কোনো মোজেজা দেখাও। হযরত মূসা (আ.) লাঠিকে ছেড়ে দিলে তা বিশালকায় অজগর সর্প হয়ে যেত। তাঁর বগলকে মোজেজা হিসেবে পেশ করতেন যা হতে সূর্যের ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হতো। এ ঐশ্বরিক ও অলৌকিক কাণ্ড দেখে ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে জাদুকর আখ্যা দিল। অতঃপর তৎকালের সেরা সত্তর হাজার জাদুকরের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হলো। আল্লাহ প্রদত্ত মোজেজার মোকাবিলায় জাদুকররা পরাস্ত হয়ে সবাই ঈমান আনয়ন করল। কিন্তু ফেরাউন ও তার সহযোগীরা তথা মন্ত্রীপরিষদ ঈমান আনল না।

হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনীয়দের উপর নানা ধরনের আজাব নাজিল করেছেন। কোনো আজাব নাজিল হলেই তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ছুটে আসত। বলত যে, আপনি দোয়া করতঃ এ আজাবটি দূর করে দিলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো; কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার বরকতে আজাব সরে গেলে পুনরায় তারা কুফরির প্রতি ফিরে আসত।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনীয়দের সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করল। ফেরাউন তার সভাসদগণের এক মজলিসে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ঘোষণা দিল। মজলিসে উপস্থিত এক সদস্য– যে গোপনে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষে ওকালতি করল এবং তাঁকে হত্যা করা হতে ফেরাউনকে নিবৃত্ত করল। আল্লাহর কঠোর আজাব সম্পর্কে ফেরাউনকে ভয় দেখাল। এদিকে হযরত মূসা (আ.)ও তাতে কিছুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি তাঁর দাওয়াতি কাজে অটল রইলেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সমর্থকদের ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। গভীর রজনীতে হযরত মূসা (আ.)-কে বনূ ইসরাঈলদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈলদের সঙ্গে করে শেষ রাত্রে মিসর হতে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। খবর পেয়ে ফেরাউন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলের পিছু ধাওয়া করল। সামনে নীল-নদ, পেছনে ফেরাউনের বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী। বনূ ইসরাঈলের লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়ল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। আল্লাহর আদেশে হযরত মূসা (আ.) নীল-নদে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। সাথে সাথে বনূ ইসরাঈলের বারটি গোত্রের জন্য বারটি রাস্তা হয়ে গেল। সে রাস্তা দিয়ে বনূ ইসরাঈলের লোকেরা নদী পার হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে ফেরাউন সদলবলে নদী গর্ভের রাস্তায় পা বাড়াল। কিন্তু মাঝ দরিয়ায় যাওয়ার পর রাস্তাটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। ফেরাউন তার সুবিশাল বাহিনীসহ নদী বক্ষে নিমজ্জিত হলো। হযরত মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈলকে নিয়ে শামের পথে যাত্রা করেন।

'اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا اِلخ' আয়াতের ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফেরও মুশরিকদেরকে পূর্ববর্তী নবীদের কাওমসমূহের অবস্থা হতে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তাদের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে খবরদার করেন। তাই মক্কার কাফেরদেরকে আসন্ন ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। রাসূলের উপর ঈমানের আহ্বান জানান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মক্কাবাসী যখন প্রিয়নবী ﷺ-কে মিথ্যা জ্ঞান করে ও তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করে, তখন আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– এ কাফেররা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না? যদি তারা ভ্রমণ করত তবে দেখত যে, ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বহু জাতির আগমন ঘটেছিল। পৃথিবীতে তারা অনেক কীর্তি রেখেছে যা তাদের স্মরণিকা হিসেবে আজো বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু যখন তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ উপস্থিত হন তখন তাঁরা তাঁদেরকে মিথ্যা জ্ঞান করে, আল্লাহ সুবহানুহূর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাদেরকে, যেমন– আদ, ছামূদ এবং হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি প্রভৃতি। যদি মক্কাবাসী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে মিথ্যারোপ করে, তবে তারাও নিষ্কৃতি পাবে না। হে মক্কাবাসী! যদি তোমাদের বর্তমান আচরণ অব্যাহত থাকে, তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত এবং তোমাদের ধ্বংসও অনিবার্য। কেননা সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত এবং আল্লাহ তা'আলার নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহ তা'আলার কঠিন-কঠোর শাস্তি হতে কে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তাই তারা রক্ষা পায়নি; রক্ষা করলে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রক্ষা করতে পারতেন, যদি তারা তাঁর নিকট তওবা-ইস্তেগফার করে হাজির হতো, কিন্তু তারা তা করেনি এবং রক্ষাও পায়নি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلخ আয়াতের ব্যাখ্যা : প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা : অত্র আয়াত দুটিতে আল্লাহ তা'আলা স্বদীয় রাসূল ﷺ-কে অবগত করাচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতি মিশনের বিরোধিতা ও মিথ্যারোপ করাটা। আর এর হোতা ছিল ফেরাউন, হামান ও কারূন। তাদের নিষ্ঠুরতার কথা তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনার বাণী শোনান। ইরশাদ হচ্ছে–

"আর নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন, হামান এবং কারূনের নিকট, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যারোপ করে, তারা বলে এতো এক জাদুকর, অত্যন্ত মিথ্যাবাদী।"

ইতঃপূর্বে ফেরাউন, হামান আর কারূনের নিকট হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি অনেক মোজেজা এবং দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এত কিছুর পরও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের উপর নির্মম অত্যাচার করেছে। হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এক বিস্ময়কর লাঠি প্রদান করেছিলেন, এমনিভাবে 'يَدٌ بَيْضَاءُ' তথা চন্দ্রোজ্জ্বল হাত দান করেন। আরো বহু মোজেজা। এসব মোজেজা দেখে ঈমান আনা তো দূরে থাক; বরং তারা তাঁকে জাদুকর আর মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল।

অতএব, হে রাসূল! যদি মক্কার কাফেররা আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে করুক এটা কোনো নতুন বিষয় নয়; বরং যারাই এ কাফের মুশরিকদেরকে সহজ সরল পথের দিকে আহ্বান করেছেন তাদের সকলকেই মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত যারাই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী রাসূলগণের সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছে তারই ধ্বংস হয়েছে। যেমন ফেরাউন ও তার দলবল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, আর কারূনকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হয়।

সংক্ষেপে ফেরাউন, কারূন এবং হামানের পরিচিতি :

ফেরাউন : এটা মিসরের বাদশাহের উপাধি ছিল। আয়াতে বর্ণিত ফেরাউনের প্রকৃত নাম 'রাইয়্যান' (رَيَّانُ)। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জমানার ফেরাউনের নাম ছিল 'ওলীদ'। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন নিজেকে দাম্ভিকতার বশে ও দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজের জাতিকে তথা কিবতী সম্প্রদায়; বরং গোটা মিসরে ঘোষণা করেছিল- "اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى" "আমি তোমাদের বড় প্রভু।" পরিশেষে সে সদলবলে নীল নদে ডুবে মারা যায়। বর্তমানে তার লাশ মিসরের পিরামিডে মমি অবস্থায় আছে।

হামান : হামানই সে ফেরাউনের মন্ত্রী ছিল এবং তার কেবিনেটের প্রধান ছিল।

কারূন : কারূন সে আমলের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। এমনকি সে ব্যবসায়ীদের বাদশা ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর আহ্বানে জাকাত প্রদানের অস্বীকার করে, ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর অভিশাপে ভূগর্ভস্থ হয়ে পড়ে। কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে থাকে : হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সত্য দীন নিয়ে তাঁর জাতির নিকট উপস্থিত হন, তখন ফেরাউনের পরামর্শ দাতারা বলল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হোক আর তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হোক যেন মেয়েদেরকে পরিচারিকা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফেরাউন এ পন্থা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বেও গ্রহণ করেছিল, যাতে করে হযরত মূসা (আ.)-কে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। ফেরাউন তখন বনী ইসরাঈলদের নব্বই হাজার নবজাতককে হত্যা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম যখন হয় তখন তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে পয়দা করেন এবং তাঁর হেফাজত করেন। এমনকি জালিম ফেরাউনের বাড়িতে রেখেই তাঁর লালনপালন করেন। তখন ফেরাউনের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। আর যখন হযরত মূসা (আ.) সত্য দীন নিয়ে আগমন করলেন তখন ফেরাউনের তরফ থেকে নতুন করে পুরানো কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো যে, বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা এবং কন্যাদেরকে জীবিত রাখা হোক। এবারের কর্মসূচির কয়েকটি লক্ষ্য হলো-

ক. বনী ইসরাঈলের জনসংখ্যা যাতে হ্রাস পায় এবং তারা কখনো বিদ্রোহী হতে সক্ষম না হয়, খ. এভাবে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যায়। গ. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেন এ ধারণা জন্মে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কারণেই আমাদের যত দুঃখ-দুর্দশা, এ ধারণার কারণে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করবে, ফলে হযরত মূসা (আ.) দুর্বল অসহায় হয়ে পড়বেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি ঘটে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীরা মিসরের রাজত্বের অধিকারী হন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ 'আর কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।'

এতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্য রয়েছে সান্ত্বনা, যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের চক্রান্তও নস্যাৎ হবে। কেননা কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েই থাকে।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী-২৪/৬২]

'اٰيَاتٌ' ও 'حَقٌّ' -এর অর্থ এবং হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ : اَلْاٰيَاتُ -এর বহু অর্থ হয়ে থাকে। যেমন- দলিল, চিহ্ন, নিদর্শন, মু'জিযা, কুরআনে মাজীদের আয়াত ইত্যাদি। এখানে নিদর্শনাদি ও মোজেজাকে বুঝানো হয়েছে। اَلْحَقُّ অর্থ- সত্য। এখানে তা দ্বারা সত্য দীন তথা তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে। এটা মূলত বাতিলের বিপরীত।

মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ : আল্লাহ তা'আলার একটি চিরাচরিত নীতি হলো তিনি কোনো কওমের নিকট নবী ও রাসূল পাঠানোর সময় তাকে এমন কতিপয় মোজেজা দান করেন যা উক্ত কওমের জন্য উপযোগী। তথা যে জাতি যে বিষয়ে সর্বাধিক পারদর্শী হয় সে কওমের নবীকে সে বিষয়ে ততোধিক পারদর্শী করে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে মিশরে জাদু বিদ্যা চরম উন্নতি লাভ করেছিল, সেহেতু হযরত মূসা (আ.)-কে এমন মোজেজা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি সে যুগের সেরা জাদুকরদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি মোজেজা দান করেছেন। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিরণ দেওয়া হলো।

১. **লাঠি :** কথিত আছে এটা তিনি তাঁর শ্বশুর নবী হযরত শোআয়েব (আ.) হতে লাভ করেন। তাকে মাটিতে ফেলে দিলে আল্লাহর নির্দেশে তা বিশাল অজগর সাপে পরিণত হয়ে যেত। আবার হাত দিয়ে ধরলে পুনরায় লাঠি হয়ে যেত।

২. **উজ্জ্বল হাত :** তিনি যখন হাত উপরে উঠাতেন তখন বগল হতে আল্লাহর হুকুমে প্রখর আলো বিচ্ছুরিত হতো।

৩. **তুফান :** হযরত মূসা (আ.)-এর অভিশাপের কারণে সমগ্র মিসরে ভয়াবহ তুফানের সৃষ্টি হয়েছিল।

৪. **দুর্ভিক্ষ :** হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ার কারণে মিশরের উপর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল।

৫. **পঙ্গপাল :** সারা মিশরে পঙ্গপাল বিস্তার লাভ করে। তাদের সমস্ত ফসলাদি পঙ্গপালে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

৬. **বেঙে :** সারা মিসর বেঙে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘর-বাড়ি এমনকি খাদ্য-দ্রব্যও বেঙে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

৭. **রক্ত :** মিসরীয়দের শরীর, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় সব কিছু রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিল। সর্বত্রই ছিল রক্তের বিরক্তি।

৮. **উকুন :** সমগ্র মিসর একবার উকুনে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের খাদ্য-দ্রব্যেও ছিল উকুন আর উকুন। উকুনের অত্যাচারে তারা অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

৯. **ফল-ফলাদির উৎপাদন কম :** হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তাদের ফল-ফলাদির উৎপাদন কমে গেল।

প্রকাশ থাকে যে, যখনই কোনো আজাব দেখা দিত তখন মিসরীয়রা হযরত মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হতো। হযরত মূসা (আ.)-কে বলত আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আজাবটা অপসারিত হয়, তাহলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করবো। কিন্তু আজাব সরে যাওয়ার পর পুনরায় তারা কুফরি করত; ঈমান আনত না।

"وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ ..... وَلْيَدْعُ رَبَّهُ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তোমরা আমাকে বাধা দিও না, আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। সে তার প্রতিপালককে ডাকুক, দেখি তার প্রতিপালক কি করতে পারে। মূসাকে আর এমন স্বাধীনতা দেওয়া যায় না, যদি এমন স্বাধীনতা সে ভোগ করতে থাকে তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, সে তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দেবে। এ ছাড়া তার অবাধ স্বাধীনতার কারণে সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব, তাকে আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার সুযোগ দেওয়া যায় না।

ফেরাউনের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা দেখে এবং সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করে বেশ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতিপালক তাদের থেকে প্রতিরোধ গ্রহণ করতে পারেন বলে তারা ভয় করছিল।

আল্লামা বগভী (র.) লেখেছেন– ফেরাউন এ কথাটি এজন্য বলেছে যে, তার পরিষদবর্গের কিছু লোক হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছিল। কেননা তাদের ধারণা ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হবে। তারা ফেরাউনকে বলত, আপনি যদি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করেন তবে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করতে অক্ষম এজন্যে তাকে হত্যা করেছেন। এতে জনমনে আপনার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হতে কেউ ফেরাউনকে বারণ করে ছিল কি? উপরিউক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনকে কেউ হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ব্যাপারে বারণ করেছে, আসলে প্রকৃত ব্যাপারটি কি? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মাঝে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

১. একদল মুফাসসিরের মতে এ কথাটি বলে ফেরাউন এ ধারণা দিতে চাচ্ছিল যে, কিছু লোক তাকে বাধা দিয়েছে বলেই সে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করছে না। কেউ যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সে কবে কোন দিন তাকে শেষ করে ফেলত।

২. অন্য একদল মুফাসসিরের মতে ফেরাউনের নিকটস্থ অনেকেই তাকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করতে বাধা দিচ্ছিল। তার নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ হতে পারে।

ক. হযরত মূসা (আ.)-এর হত্যার জের ধরে ফেরাউনের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে, যাতে তাদেরও অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে।

খ. তারা অন্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল। যদিও নানাবিধ কারণে তা প্রকাশ করেছিল না।

গ. সভা-পরিষদগণ চেয়েছিলেন যে, ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর আমরা এ দিকে আমাদের সুবিধা বানিয়ে নেই।

ঘ. তাদের ধারণা ছিল হযরত মূসা (আ.) মূলত ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্য নয় এবং তিনি ফেরাউনের কোনো ক্ষতিও করতে পারবেন না।

মূলত আসল ব্যাপার হলো, হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হতে ফেরাউনকে বাইরের কোনো শক্তিই বাধা দিয়ে রাখে নি; বরং তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রাসূলের গায়ে হাত দিতে বাধা প্রদান করেছে ও তাকে বিরত রেখেছে।

'إِنِّيٓ أَخَافُ .... فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ' আয়াতের ব্যাখ্যা শান্তি লাভের পন্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন স্বীয় মন্ত্রীসভায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার প্রস্তাব উপস্থান করেছে। আর আলোচ্য আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ফেরআউন বলছে, যদি আমি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা না করি তবে তোমরা যে ধর্ম-বিশ্বাসে রয়েছ তাতে সে পরিবর্তন ঘটাবে। অথবা, সে পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করবে। নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষাকল্পে দেশ ও জাতির স্বার্থে তাকে হত্যা করা একান্ত জরুরি।

আল্লামা কান্ধলভী (র.) লেখেছেন, এটি বড়ই বিস্ময়কর বিষয় যে, বাতিলপন্থিরা আল্লাহর নবীর হেদায়েতকে 'ফ্যাসাদ' অশান্তি বলে আখ্যায়িত করেছে, অথচ আল্লাহর নবীর হেদায়েত মেনে চললে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে শান্তি লাভ করা যায়, শান্তি লাভের একমাত্র পন্থাই হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, এটিই শান্তি লাভের পন্থা। কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট, যারা আদর্শচ্যুত, যারা দিশেহারা তারা শান্তির পথকেই অশান্তি বলে বেড়ায় আর এ অবস্থা শুধু সে যুগের ফেরাউনদের নয়; বরং সকল যুগের ফেরাউনদের এ একই চিন্তাধারা।

বস্তুত যুগে যুগে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, যখনই এবং যারাই সত্যদীনকে বাধা দিয়েছে তা হয় তাদের অহঙ্কারের কারণে অথবা ক্ষমতা হারা হবার আশঙ্কায়। বদরের যুদ্ধের দিবসে রণাঙ্গনে উমাইয়া ইবনে খালফ আবূ জেহেলকে এ প্রশ্নটিই করেছিল যে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র নবুয়তের দাবিদার মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তোমার অন্তরের কথাটি কি? এখানে আমি ব্যতীত আর অন্য কেউ নেই, সুতরাং তুমি নির্দ্বিধায় তোমার অন্তরের কথাটি বলতে পার। তখন আবূ জেহেল বলেছিল, 'আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ ﷺ সত্য কথাই বলে', তখন উমাইয়া ইবনে খালফ বলল, 'তবে তা মেনে নিতে বাধা কোথায়?' আবূ জেহেল বলেছিল, যদি তাকে মেনে নেই তবে আমাদের নেতৃত্ব থাকে কোথায়? এ একই অবস্থাই হয়েছিল ফেরাউনের।

আলোচ্য আয়াতে দীন বদলিয়ে দেওয়ার যে কথাটি বলা হয়েছিল তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা এ ভয়েই ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এখানে দীন অর্থ হলো রাষ্ট্রব্যবস্থা। ফেরাউনের এ উক্তির অর্থ হলো إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُغَيِّرَ سُلْطَانَكُمْ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ ব্যক্তি তোমাদের রাষ্ট্র প্রভুত্বকে পরিবর্তন করে দেবে। অন্য কথায় ফেরাউন ও তার পরিবারবর্গের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মিসরে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও চলমান সমাজ ব্যবস্থাই ছিল সারা দেশের দীন। হযরত মূসা (আ.)-এর ইসলামি দাওয়াতে ফেরাউন এ দীনেরই পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছিল।

"وَقَالَ مُوْسٰى .... بِيَوْمِ الْحِسَابِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করছে। আল্লাহর দীনের দায়ীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এ কথা হযরত মূসা (আ.) অবগত হন। পরিশেষে নির্ভীকচিত্তে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা দেন, "যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে না এমন সব অহঙ্কারী লোক থেকে আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের পানাহ চাই।"

আলোচ্য বিষয়টিতে দুটি সমান সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এদের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো কারণ পাওয়া ভার।

১. হযরত মূসা (আ.) হয়তো নিজেই তখন দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ফেরাউন তাঁর উপস্থিতিতেই তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। আর তিনি তখনই ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে প্রকাশ্যভাবে এ কথাগুলো বলেছেন।

২. হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতেই ফেরাউন তার সরকারের দায়িত্বশীলদের মজলিসে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল আর এ কথার খবর পরে তার কর্ণগোচর হয়েছিল। অতঃপর তিনি সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের সমাবেশে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন।

উপরোল্লিখিত দুটি অবস্থার মধ্যে আসল ঘটনার সময় যে অবস্থাই থাকুক না কেন, হযরত মূসা (আ.)-এর কথাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফেরাউনের ভয় প্রদর্শনে তার মনে বিন্দুমাত্র শঙ্কা সঞ্চারিত হয়নি। তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে ফেরআউনের ধমকি তার মুখের উপরই নিক্ষেপ করলেন। কুরআনে মাজীদের যেখানে এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা হতে স্বতঃই বুঝতে পারা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে এ জবাবই দেওয়া হয়েছিল, সেসব জালিমদেরকে যারা বিচার দিনে একবিন্দু ভয় না করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

উল্লিখিত আয়াতের শব্দাবলি হতে অর্জিত ফায়দা : হযরত মূসা (আ.) যখন অবগত হলেন যে, ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। তখন তিনি দ্ব্যর্থকণ্ঠে নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করলেন- "إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ" "আমি প্রত্যেক ঐ অহঙ্কারী যে আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা তার নিকট হতে আমার প্রভুর পানাহ গ্রহণ করছি- যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক।"

হযরত মূসা (আ.) -এর এ উক্তির শব্দাবলিতে কতিপয় বিশেষ ফায়িদা নিহিত রয়েছে, নিম্নে আমরা সেগুলোর উপর আলোকপাত করছি।

১. আলোচ্যাংশে হযরত মূসা (আ.) এমন দাম্ভিক মানুষ হতে আল্লাহর পানাহ চেয়েছেন, যে বিচার দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না। তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যেভাবে জিন শয়তান হতে পানাহ চেয়ে থাকি তেমনি মানুষ শয়তান হতেও আল্লাহর পানাহ চাওয়া প্রয়োজন।

২. হযরত মূসা (আ.) "بِرَبِّكُمْ" তোমাদেরও রব বলে তাদেরকে অবহিত করলেন যে, আমার ন্যায় তোমাদেরও উচিত তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাঁর উপর ভরসা করা।

৩. এখানে বক্তব্যে إِنِّيْ শব্দটি তাকিদের অর্থ বুঝায়। তা হতে আমরা শিখতে পরি যে, বিপদে অধীর না হয়ে; বরং জোরালো কণ্ঠে তাকে রুখে দাঁড়ানো উচিত। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) কে তৎকালীন মহা শক্তিধর ফেরাউন হত্যার হুমকি দেওয়া স্বত্বেও তার ভাষায় কোনোরূপ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় নি।

৪. হযরত মূসা (আ.) "رَبَّ فِرْعَوْنَ" না বলে رَبِّكُمْ বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুধু ফেরাউনেরই রব নন; বরং সকলেরই রব।

৫. হযরত মূসা (আ.) সরাসরি ফেরাউনের অনিষ্ট হতে আশ্রয় না চেয়ে বলছেন- "مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ الخ" প্রত্যেক অহঙ্কারী মাতাল হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়েছেন। তা হতে বুঝা যায় যে, দোয়ার মধ্যে এরূপ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

৬. ফেরাউন বলেছিল, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করব।' তার সাথে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল "وَلْيَدْعُ رَبَّهُ" আর হযরত মূসা (আ.) যেন তার রবকে আহ্বান করে।

জবাবে হযরত মূসা (আ.) জানিয়ে দিলেন, আমি তো আমার রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। তবে জেনে রাখ, তিনি শুধু আমারই রব নন; বরং তোমাদেরও রব তিনিই। সুতরাং তিনি আজ যেভাবে তোমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন, ঠিক সেভাবে ইচ্ছা করলে তোমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতঃ আমাকেও রাজত্ব ও ক্ষমতা দান করতে পারবেন। প্রকৃতার্থে তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত কলকাঠি।

হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউনীয়রা যেসব কষ্ট দিয়েছে : বিগত আয়াত কটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউনীয়রা তিন ধরনের কষ্ট দিয়েছে।

১. হযরত মূসা (আ.) তাদের নিকট আগমন করার প্রথম পর্যায়েই ফেরাউনীয়রা তাকে মিথ্যাবাদী ও জাদুকর বলে আখ্যা দিল। তাই ইরশাদে বারী- "فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ"

২. তারা বনূ ইসরাঈল তথা হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করেছিল। আর কন্যা সন্তানদেরকে তাদের সেবা করার নিমিত্তে জীবন্ত রেখেছিল। ইরশাদ হচ্ছে- "قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ"

৩. তারা হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার মাধ্যমে স্বীয় স্বৈরশাসনকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিল।

٢٨. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ قِيْلَ هُوَ ابْنُ عَمِّهِ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ اَىْ لِاَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ط وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ج اَىْ ضَرَرُ كِذْبِهٖ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ط بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ عَاجِلًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُشْرِكٌ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ.

অনুবাদ :

২৮. আর ফেরআউনের সম্প্রদায়ের এক মু'মিন ব্যক্তি বলল, কথিত আছে তিনি ফেরাউনের চাচাত ভাই- নিজের ঈমানকে গোপন রেখে; তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, এখানে اَنْ শব্দটি لِاَنْ [কারণ বুঝানো]-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে বলে, আমার রব আল্লাহ অথচ সে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছে- অর্থাৎ প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ সহ তোমাদের প্রভুর নিকট হতে, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যা তার উপরই পতিত হবে অর্থাৎ তার মিথ্যার ক্ষতি তাকেই বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার একাংশ তোমাদের ভোগ করতে হবে অর্থাৎ যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছে তার অংশবিশেষ শীঘ্রই এসে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘন- কারীকে হেদায়েত দান করেন না- মুশরিককে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে।

٢٩. يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ غٰلِبِيْنَ حَالٌ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَاْسِ اللّٰهِ عَذَابِهٖ اِنْ قَتَلْتُمْ اَوْلِيَاءَهٗ اِنْ جَآءَنَا ط اَىْ لَا نَاصِرَ لَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى اَىْ مَا اُشِيْرُ عَلَيْكُمْ اِلَّا بِمَا اُشِيْرُ بِهٖ عَلٰى نَفْسِىْ وَهُوَ قَتْلُ مُوْسٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ طَرِيْقَ الصَّوَابِ.

২৯. হে আমার জাতি! আজ তোমাদের রাজত্ব, তোমরা জয়ী- বিজয়ী এটা حَالٌ [হাল] হয়েছে জমিনে- মিশরের জমিনে সুতরাং কে আমাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করবে, আল্লাহর শাস্তি হতে, যদি তোমরা তাঁর বন্ধুদেরকে হত্যা কর যদি তা আমাদের উপর এসে পড়ে অর্থাৎ তখন আমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। ফেরাউন বলল, যা কিছু আমি বুঝছি তাই তোমাদের নিকট পেশ করছি। অর্থাৎ আমি নিজের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি; তোমাদেরকে শুধু সে পরামর্শই দিচ্ছি। আর তা হলো হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা। আর সে পথই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যা সত্য ও সঠিক। অর্থাৎ সঠিক পথ।

তাহকীক ও তারকীব

مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ কিসের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে? وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ এখানে مِنْ হরফে জারটি একটি উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। মূলত বাক্যটি এভাবে হবে وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ كَائِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ -এর তারকীব নিম্নরূপ হবে قَالَ ফে'ল رَجُلٌ মাওসূফ مُؤْمِنٌ প্রথম সিফাত, كَائِنٌ শিবহে ফে'ল مِنْ হরফে জার اٰلِ فِرْعَوْنَ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। মওসূফ তার সিফাতদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে فَاعِلٌ এখন قَالَ ফে'ল তার فَاعِلٌ মিলে جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ হয়েছে।

"وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ" -এর মহল্লে ই'রাব কি? উল্লিখিত আয়াতাংশ "وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ" তৎপূর্ববর্তী رَجُلًا মাফউল হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ এটা جُمْلَة حَالِيَة বা অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য।

"ظَاهِرِيْنَ" শব্দটির মহল্লে ইরাব কি? "ظَاهِرِيْنَ" শব্দটি لَكُمْ -এর যমীরে মাজরূর হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ .... مِنْ رَبِّكُمْ" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : অভিশপ্ত ফেরাউন যে পরামর্শ সভায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল, সে সভায় স্বীয় ঈমান গোপন করে উপস্থিত ছিল ফেরাউন গোত্রীয় এক মু'মিন কিবতী। সে ফেরাউন ও তার দলবলকে উপদেশ দিয়েছিল যে, তোমরা কি এমন লোককে হত্যা করতে চাও, যে বলে আমার প্রতিপালক কেবল এক আল্লাহ তা'আলা, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন। তাঁর তরফ থেকে সে অনেক মোজেজা অনেক দলিল প্রমাণসহ উপস্থিত হয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হওয়ার দাবি করে। স্বীয় নবুয়তের পক্ষে মোজেজাসমূহ দেখাচ্ছে। আর প্রমাণ পেশকারীর বিরোধিতা করা, আর এ বিরোধিতা এমন পর্যায়ের যে, তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হবে– এতএব, তা কোনো প্রকারেই বৈধতা পাবে না।

ফেরাউনের বংশের ঈমানদার ব্যক্তিটি কে? হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যকার সংঘাতের বর্ণনা করতে গিয়ে ফিরাউন ও তার অনুসারীদের সাথে এমন এক ব্যক্তির দীর্ঘ সংলাপের আলোচনা করা হয়েছে যে ফেরাউনের বংশের এবং তার পরামর্শ সভার পদস্থ সদস্য ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা দেখে ঈমান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কৌশলগত কারণে তখনো পর্যন্ত নিজের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। উপরিউক্ত সংলাপের সময় অনিবার্যভাবে তার ঈমানের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।

মুফাসসিরীনে কেরামের মধ্য হতে মুকাতিল, সুদ্দী এবং হাসান প্রমুখগণ বলেছেন যে, এ ব্যক্তি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। এ ব্যক্তিই কিবতী হত্যার দায়ে যখন ফেরাউনের পরামর্শ সভায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছিল তখন দৌড়ে এসে হযরত মূসা (আ.)-কে সংবাদ পৌছিয়ে সাবধান করেন এবং শীঘ্রই মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লেখেছেন, এ মু'মিন ব্যক্তি ছিল কিবতী, আর এ ব্যক্তি সম্পর্কেই 'সূরা কাসাসে' ইরশাদ হয়েছে– "وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَسْعٰى" 'আর শহরের শেষ প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল।' এখানে رَجُلٌ দ্বারা এলোককে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যদি এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের হতো তবে ফেরাউন তার বক্তব্য শ্রবণ করে ধৈর্যের পরিচয় দিত না; বরং তার প্রতি জুলুম-অত্যাচার করত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, ফেরাউনের বংশে এ এক ব্যক্তিই ঈমানদার ছিল এবং ফেরাউনের স্ত্রী হযরত 'আসিয়া' দ্বিতীয় ঈমানদার ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি হলো সে যে হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবহিত করে ছিল। ফেরাউনের বংশে এ তিন জনই মু'মিন ছিলেন।

কোনো কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, তার নাম হাবীবে নাজ্জার, কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়; বরং হাবীব হলো সে ব্যক্তির নাম যার আলোচনা সূরা ইয়াসীনে করা হয়েছে।

এ ব্যক্তির নামের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরাম বহু মতামত পেশ করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, তার নাম ছিল খাবুর।

২. কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলী ছিল, তার নাম ছিল জাকাইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করতেন।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম شَمْعَانُ (শাম'আন)। সুহাইলী (র.) বলেছেন যে, এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত।

৪. কারো কারো মতে, তার নাম حِزْقِيْلُ ছিল, ইমাম ছা'লাবী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ মতটিই বর্ণনা করেছেন। একখানা হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– বান্দাদের মধ্যে কতিপয় صِدِّيْقِيْنَ রয়েছেন। একজন হলেন হাবীবে নাজ্জার, যার উল্লেখ সূরা ইয়াসীনে রয়েছে। দ্বিতীয় হলো اٰلِ فِرْعَوْنَ [আলে ফিরআউন]-এর মু'মিন ব্যক্তি এবং তৃতীয়জন হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। আর আবূ বকর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। –[কুরতুবী]

"يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ" হতে গৃহীত ফায়দা : আল্লাহর বাণী "يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ" হতে জানা যায় যে, কেউ যদি লোকদের সামনে স্বীয় ঈমান প্রকাশ না করে অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, তবে সে ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীসমূহ হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখে স্বীকার করবে, ঈমানদার হতে পরবে না। অবশ্য মৌখিক স্বীকৃতির জন্য জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তার ঈমান সম্পর্কে অবহিত হতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে মুসলিমের ন্যায় আচরণ করতে পারবে না।

নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার সময় কে কাফেরদেরকে বলেছিল اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ الخ? হাদীস শরীফে এসেছে মক্কার কাফেররা যখন নবী করীম ﷺ -এর উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেছিল তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে অনুরূপ উক্তি করেছিলেন। সুতরাং তিনি বলেছিলেন– "اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ" "আল্লাহ আমার প্রভু" বলার কারণে তোমরা কি একজন লোকের প্রাণ নাশ করবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত ওরওয়াহ ইবনে জোবায়ের (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি আমাকে বলুন, মক্কার কাফেররা প্রিয় নবী ﷺ -এর সাথে সর্বাধিক মন্দ আচরণ কোনটি করেছিল? হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, একদা রাসূল ﷺ কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে সালাতে রত ছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে আবূ মুয়ীত রাসূল ﷺ -এর দিকে অগ্রসর হলো। সে রাসূল ﷺ -এর চাদরটি তাঁর গর্দান মোবারকে পেঁচিয়ে নিল এবং সজোরে টানতে লাগল এতে তাঁর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, ঠিক এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা.) আগমন করলেন এবং সজোরে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে গর্দান ধরে হুজুর ﷺ -এর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, "اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ" (তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করছ, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক এক আল্লাহ তা'আলাই।)

হযরত আলী ও আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত আলী (রা.) অনেক্ষণ ক্রন্দন করেন, তাঁর অশ্রুতে দাড়িগুলো ভিজে যায়। এরপর বললেন, আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ফেরাউনের বংশের ঐ ব্যক্তি উত্তম ছিল? না আবূ বকর? সব লোক নীরব ছিল। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা জবাব কেন দিচ্ছ না? আল্লাহর শপথ! হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি ঘণ্টা ফেরাউনের বংশীয় মু'মিনের সারা জীবনের থেকে উত্তম কেননা, সে তো তার ঈমান গোপন রেখেছিল, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর ঈমানের কথা ঘোষণা করে ছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী ১০/২২৩]

'وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ' আয়াতে بَيِّنٰتٌ -এর অর্থ : بَيِّنٰتٌ -এর দ্বারা এখানে তিনটি বিষয় বুঝানো হয়েছে।

১. এমন সব উজ্জ্বল দলিল ও প্রমাণ, যা হতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল ও সত্য।

২. এমন সব সুস্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শনাদি যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত ও নিয়োগপ্রাপ্ত।

৩. জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারাদি সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট হেদায়েত যা দেখে প্রত্যেক সুস্থ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী মানুষ বুঝতে পারে যে, কোনো মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর মানুষ এরূপ পবিত্র শিক্ষা পেশ করতে পারে না।

"وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا ..... كَذَّابٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ সমর্থনকারী ফেরাউন বংশীয় তথা কিবতী ঈমানদার লোকটি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। সে বলেছে যে, হযরত মূসা (আ.) যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তা হলে তাতে তোমাদের ক্ষতি কি? তার মিথ্যার বোঝা সে নিজেই বহন করবে।

এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া স্বত্বেও তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তবে তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়াই তোমাদের উচিত হবে। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি সত্যবাদীও হতে পারেন। তা হলে তাঁর উপর হস্তক্ষেপ করে তোমরা আল্লাহর আজাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদীও মনে কর কবুও তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকেন, তা হলে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাকে সামলাবেন। প্রায় এ ধরনের কথাই ফেরাউনকে লক্ষ্য করে ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ.) বলেছেন–

"وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ" (اَلدُّخَانُ) "তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনলে আমাকে আমার অবস্থায়ই ছেড়ে দাও।"

লক্ষ্যণীয় যে, ফেরাউনী সমাজের এ মুমিন ব্যক্তি কথার শুরুতেই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তার ঈমান আনার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে নি; বরং শুরুতে সে এমনভাবে কথা বলছিল যে, মনে হচ্ছিল সেও ফেরাউনী আদর্শের একজন লোক এবং নিছক নিজ জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সে এরূপ কথা বলছে। কিন্তু ফেরাউন ও তার দরবারী যখন কিছুতেই হেদায়েতের পথে ফিরে আসছিল না, তখন পরিশেষে সে তার ঈমানের গোপন রহস্য উন্মোচন করে দিল। তার বক্তব্যের পরবর্তী অংশে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে।

"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ" নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়েতের কল্যাণ দান করেন না।

আলোচ্য ব্যাখ্যাংশ দুটি অর্থ বহন করছে–

১. তোমরা যদি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রাণ-প্রদীপ নির্বাপিত করতে উদ্যত হও এবং তাঁর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে নিজেদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর। তা হলে মনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কখনই সাফল্যের পথ দেখাবেন না।

২. একই ব্যক্তির চরিত্রে ন্যায়বাদিতার ন্যায় ভালো গুণ এবং মিথ্যা কথা ও মিথ্যা অপবাদের ন্যায় খারাপ গুণ একত্রিত হতে পারে না। তোমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছ যে, হযরত মূসা (আ.) এক অতীব পবিত্র চরিত্র ও পূর্ণ মাত্রায় মহান নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। এরূপ অবস্থায় এক দিকে তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবি করার মতো মিথ্যুক হবেন, আর অপরদিকে আল্লাহ তাঁকে এত উচ্চমানের সুমহান চরিত্র বৈশিষ্ট্য দান করবেন, এমন কথা তোমাদের মন মগজে স্থান পেল কি ভাবে?

"وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهٗ" উক্তি হতে প্রতীয়মান হয় যে, তার মিথ্যার ক্ষতি শুধু তার সাথে সীমাবদ্ধ। অন্যের দিকে তা সংক্রামিত হবে না। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? : হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে উক্ত মুমিন ব্যক্তিটি বলেছেন যে, "وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهٗ" যদি হযরত মূসা (আ.) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তা হলে এর প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হবে। তা হতে বুঝা যায় যে, পাপীর পাপের প্রতিফল কেবল সে-ই ভোগ করে থাকে অন্যদের প্রতি তা প্রসারিত হয় না।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো উক্ত উক্তিটি আল্লাহর বাণী– "لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى" [কেউই কারো পাপের বোঝা বহন করবেনা] এর মতো। সুতরাং উক্তিটি যথাস্থানে ঠিকই আছে।

এর মর্মকথা হলো, হযরত মূসা (আ.) নবুয়তের দাবি করছেন, এ ব্যাপারে যদি তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, আর ব্যাপারটি এরূপ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নবী করে পাঠান নি অথচ তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে, আল্লাহ তাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন। তা হলে তার শাস্তি বিধান করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তোমরা তাকে সমর্থন না করলেও হতো। কেননা, সে এমন প্রতাপশালী নয় যে, তোমাদের উপর তা চাপিয়ে দিতে পারবে– আর না সে এরূপ কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাকে হত্যা করার জন্য তোমাদের এত ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কি প্রয়োজন।

উক্ত মু'মিন ব্যক্তির يُصِبْكُمْ كُلُّ الَّذِىْ الخ **না বলে** يُصِبْكُمْ بَعْضُ الخ **বলার কারণ কি?** উক্ত মু'মিন ব্যক্তিটি ফেরাউন কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনার কথা শুনে তার প্রতিবাদ করতে যেয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন– আর হযরত মূসা (আ.) যদি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদীই হয়ে থাকেন তা হলে তিনি তোমাদের ব্যাপারে আজাবের যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার কিয়দংশ অবশ্যই এসে পড়বে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হযরত মূসা (আ.) যদি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন– আর মূলত তিনি সত্যবাদীই ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিশ্রুত আজাবের আংশিক আসবে কেন? বরং পুরোটাই আসা উচিত। সুতরাং তিনি– "يُصِبْكُمْ كُلُّ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ" না বলে "يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ" বললেন কেন?

মুফাসসিরীনে কেরাম এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন :

১. আলোচ্যাংশে উক্ত মুমিন ব্যক্তির উক্তি– "يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ" -এর অর্থ হলো– হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের দাবি যদি সত্য হয় আর তোমরা তার বিরোধিতা করতে থাক তবে অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আজাব হতে নিষ্কৃতির কোনো পথই নেই। তবে মোদ্দাকথা, হযরত মূসা (আ.)-এর আনুগত্য না করে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনাই যদি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তা হলে আল্লাহর আজাব যে অনিবার্য হয়ে পড়বে তা বুঝিয়ে দেওয়াই আলোচ্য উক্তির মূল উদ্দেশ্য।

২. হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার সমর্থক মুশরিকদেরকে দুপ্রকার আজাবের ভয় দেখিয়েছিলেন। এক প্রকার দুনিয়ার আজাব এবং অপর প্রকার হলো আখেরাতের আজাব। এখানে উক্ত মুমিন লোকটি بَعْضُ -এর দ্বারা প্রতিশ্রুত আজাবের আংশিক আজাব তথা দুনিয়ার আজাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) "مِنَ الْعَذَابِ عَاجِلًا" -এর দ্বারা এর তাফসীর করে এদিকেই ইশারা করেছেন। কেননা দুনিয়ার আজাবকে "اَلْعَذَابُ الْعَاجِلُ" এবং পরকালের আজাবকে "اَلْعَذَابُ الْاٰجِلُ" বলা হয়ে থাকে।

৩. আবূ ওবাইদ নাহুবিদ বলেছেন যে, بَعْضُ শব্দটি কোনো কোনো সময় كُلّ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– লবিদের নিম্নোক্ত শ্লোকটি بَعْضُ শব্দটিতে كُلّ -এর অর্থে হয়েছে–

تَرَّاكَ اَمْكِنَةً اِذَا لَمْ اَرْضَهَا ٭ اَوْ يَرْتَبِطُ بَعْضَ النُّفُوْسِ حِمَامُهَا

"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ ...... كَذَّابٌ" **আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অপ্রকাশ্য রাখার কারণ :** উক্ত আয়াতাংশে মুমিন ব্যক্তিটি বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়েত করেন না। এখানে তিনি সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদী তা ইচ্ছাকৃতভাবেই সনাক্ত করেন নি।

এর কারণ হলো, মূলত এর দ্বারা তো তিনি ফেরাউনকেই বুঝিয়েছেন। অথচ বক্তব্যটি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, ফেরাউন ভেবেছে এর দ্বারা তিনি হযরত মূসা (আ.)-কেই বুঝিয়েছেন। আর প্রকাশ্যভাবে তখন ফেরাউনকে ঐরূপ বিশেষণে আখ্যায়িত করলে তিনি চিহ্নিত হয়ে যেতেন। কাজেই اِبْهَامْ তথা অপ্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করেছেন। মূলত ফেরাউনই সীমালঙ্ঘনকারী ও প্রভুত্বের দাবিতে মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে আল্লাহর হেদায়েত হতে বঞ্চিত রইল।

"قَالَ فِرْعَوْنُ .... سَبِيْلَ الرَّشَادِ"? **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশের তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন– "اَىْ مَا اُشِيْرُ عَلَيْكُمْ اِلَّا بِمَا اُشِيْرُ بِهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَهُوَ قَتْلُ مُوْسٰى" অর্থাৎ, সেই মু'মিন ব্যক্তিটির দীর্ঘ ভাষণের জবাবে ফেরাউন বলল, আমার নিজের জন্যে যা পরামর্শ তা তোমাদের জন্যও প্রযোজ্য। আর আমার পরামর্শ হলো হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা। আর তোমরা তো অবগত আছ, আমি তোমাদেরকে সদাসর্বদা সঠিক পথের নির্দেশনাই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ, আমার মতে, যেটা তোমাদের হিতে মঙ্গলজনক তাহলো প্রারম্ভিক অবস্থাতেই হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা যুক্তিযুক্ত।

ফেরাউনের উক্ত জবাব হতে অনুমান করা যায় যে, তার দরবারে এ প্রভাবশালী ও পদাধিকারী আন্তরিকভাবে মু'মিন হয়ে গিয়েছে। অথচ সে এখনো পর্যন্ত টেরই পায়নি। এ কারণে সে উক্ত ব্যক্তির কথা শুনে কোনোরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নি। অবশ্য সে এ কথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, তার অভিমত জেনে নেওয়ার পরও সে নিজের মত পরিবর্তনে সম্মত নয়।

৩০. وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ اَىْ يَوْمِ حِزْبٍ بَعْدَ حِزْبٍ ـ

৩১. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِثْلَ بَدَلٌ مِنْ مِثْلِ قَبْلَهُ اَىْ مِثْلَ جَزَاءِ عَادَةِ مَنْ كَفَرَ قَبْلَكُمْ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ـ

৩২. وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَاِثْبَاتِهَا اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْثُرُ فِيْهِ نِدَاءُ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ بِالْعَكْسِ وَالنِّدَاءُ بِالسَّعَادَةِ لِاَهْلِهَا وَالشَّقَاوَةِ لِاَهْلِهَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ ـ

৩৩. يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ج عَنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ اِلَى النَّارِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ مِنْ عَاصِمٍ ج مَانِعٍ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ـ

৩৪. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ مُوْسٰى وَهُوَ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ فِىْ قَوْلٍ عُمِّرَ اِلٰى زَمَانِ مُوْسٰى اَوْ يُوْسُفُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ يُوْسُفَ بْنِ يَعْقُوْبَ فِىْ قَوْلٍ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ط حَتّٰىٓ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ ـ

অনুবাদ :

৩০. আর যে লোকটি ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার জাতি! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আজাবের দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশঙ্কা করছি। অর্থাৎ এক জাতির দিনের পর আরেক জাতির দিন

৩১. নূহ, আদ, সামুদ জাতি এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল; অত্র আয়াতের مِثْلَ শব্দটি পূর্বোক্ত আয়াতের مِثْلَ হতে بَدَلٌ হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদেরকে দুনিয়াতে আজাব প্রদানের যে চিরাচরিত রীতি চলে এসেছে তার ন্যায়– আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর জুলুম করার ইচ্ছা পোষণ করেন না।

৩২. আর হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি কিয়ামত দিবসের। اَلتَّنَادِ -এর শেষে ى সহ এবং তা পরিহার করে উভয়ভাবে পড়া যায়। يَوْمَ التَّنَادِ -এর অর্থ– কিয়ামত দিবস। সেদিন জান্নাতিরা জাহান্নামিদেরকে এবং জাহান্নামিরা জান্নাতিকে খুব বেশি ডাকাডাকি করবে। সৌভাগ্যশালীদেরকে সৌভাগ্যের ব্যাপারে এবং দুর্ভাগাদেরকে দুর্ভাগা হিসেবে আহ্বান করা হবে ইত্যাদি।

৩৩. যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে হিসাব, নিকাশের স্থান হতে জাহান্নামের দিকে। তোমাদের জন্য থাকবে না আল্লাহ হতে– অর্থাৎ আল্লাহর আজাব হতে কোনো রক্ষাকারী বিপদ প্রতিহতকারী। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়েতকারী কেউ নেই।

৩৪. ইতঃপূর্বে তোমাদের নিকট হযরত ইউসুফ (আ.) এসেছিলেন– অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে। আর তিনি ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)। একদল মুফাসসিরদের মতে তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অথবা অন্য এক দলের মতে তিনি হলেন হযরত ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)। সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ– অর্থাৎ প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ নিয়ে– কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তার ব্যাপারে তোমরা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করতে। অবশেষে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তখন তোমরা বললে– কোনো প্রমাণ ছাড়াই।

لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ط اَيْ فَلَنْ تَزَالُوْا كَافِرِيْنَ بِيُوْسُفَ وَغَيْرِهٖ كَذٰلِكَ اَيْ مِثْلَ اِضْلَالِكُمْ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُشْرِكٌ مُّرْتَابٌ شَاكٌّ فِيْمَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنٰتُ .

তাঁর পরে আল্লাহ আর কাউকে রাসূল করে পাঠাবেন না। অর্থাৎ সুতরাং তোমরা হযরত ইউসুফ (আ.) ও অন্যান্যদের সকলকেই অস্বীকার করতে থাকলে। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তোমাদেরকে গোমরাহ করেছেন আল্লাহ তা'আলা গোমরাহ করে থাকেন সীমালঙ্ঘনকারীকে মুশরিককে সন্দেহকারীকে সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে যে সন্দেহ পোষণ করে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ التَّنَادِ **বাক্যাংশটির মহল্লে ইরাব কি?** "يَوْمَ التَّنَادِ" বাক্যাংশটুকু দু'কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে–

১. এটা পূর্ববর্তী اَخَافُ ফেলের مَفْعُوْل فِيْه হয়েছে।

২. অথবা এটা পূর্ববর্তী اَخَافُ ফে'লের مَفْعُوْل بِه হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ - يَوْمِ التَّنَادِ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিনের আজাবের ভীতি প্রদর্শন করছি।

مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ **আয়াতাংশটুকুর নাহবী তারকীব কি?** আল্লাহর বাণী– "مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَاصِمٌ" -এর মূল রূপ হবে- لَيْسَ عَاصِمٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ثَابِتًا لَكُمْ সুতরাং لَيْسَ ফে'লে নাকেস। عَاصِمٌ ইসমে লাইসা "مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ" জার মাজরূর মিলে عَاصِمٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ আর "ثَابِتًا لَكُمْ" লাইস এর খবর, لَيْسَ তার ইসেম ও খবরের সাথে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে নাকেসাহ।

يَوْمَ التَّنَادِ **বাক্যাংশের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গ :** "يَوْمَ التَّنَادِ" -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), যাহ্হাক ও ইকরামাহ প্রমুখ ক্বারীগণ اَلتَّنَادِ -এর د অক্ষরে তাশদীদ যোগে পড়েছেন।

২. হযরত হাসান, ইয়াকূব, ইবনে কাসীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ اَلتَّنَادِ -এর শেষে ى অক্ষরকে বলবৎ রেখে يَوْمَ التَّنَادِ পড়েছেন।

৩. অন্যান্য ক্বারীগণ د কে তাখফীফ করতঃ এর শেষভাগ হতে ى -কে হযফ করে اَلتَّنَادِ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ الخ" **আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ফেরাউনের পরামর্শ পরিষদের সদস্য সে মু'মিন ব্যক্তি আরো এগিয়ে বলল, হে জাতি! পৃথিবীতে সকল যুগেই দূত হত্যা করাকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হতো, তোমরা আল্লাহ সুবহানুহুর দূততে হত্যা করার পরিকল্পনা করছো এমতাবস্থায় তোমাদের পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুধাবন যোগ্য। যদি তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয় তবে তা হবে তোমাদের অন্যায় অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি আদ এবং ছামূদ জাতি এবং তোমাদের পর হযরত লূত (আ.)-এর জাতি পরিশেষে নমরুদরা আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করেছে তখনই তাদের প্রতি আজাব এসেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি জুলুম করেন নি। যদি কোনো অপরাধ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় অথবা কোনো জালিমকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় কিংবা কোনো ব্যক্তির নেক আমলের ছওয়াব কম দেওয়া হয় বা কোনো অপরাধীকে তার অপরাধের চেয়ে অধিক শাস্তি দেওয়া হয় তবে তাকে জুলুম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা কোনো ভাবেই বান্দার প্রতি জুলুম করেন না।

اَلْاَحْزَابُ বহুবচনের শব্দ দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : মহান আল্লাহ ফেরাউনের পরামর্শ সভার ঈমানদার ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন- "وَقَالَ الَّذِيْ آمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ" ঈমানদার ব্যক্তিটি বলল, আমি আশঙ্কা করছি যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় তোমাদের তাগ্যেও দুর্দিন নেমে আসবে।

اَلْاَحْزَابُ শব্দটি حِزْبٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ দল বা জাতি। জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন- "اَىْ يَوْمَ حِزْبٍ بَعْدَ حِزْبٍ" অর্থাৎ সেই দুর্দিন এক জাতির পর অন্য জাতির উপর আপতিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই দুর্দিন ঐ সকল জাতির উপর একদিনে আসেনি; বরং একেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলে যুগের আবর্তনে সমকালীন জাতিসমূহের উপর এসেছে। "مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ" -এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

মোদ্দাকথা, اَلْاَحْزَابُ -এর দ্বারা বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের বিদ্রোহী জাতিসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ" দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায় কিসের উপর দলিল পেশ করেছেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ" অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানুহু বান্দাদের উপর জুলুম করার ইচ্ছা পোষণ করেন না। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর এমনকি তাঁর কোনো সৃষ্টির উপরই জুলুম করেন না।

মু'তাযিলার দলিল : যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর জুলুম করেন না সেহেতু তিনি বান্দাদের সকল কাজ-কর্মের স্রষ্টা হতে পারেন না। কেননা উদাহরণস্বরূপ কুফর ও অন্যান্য মন্দ কাজের স্রষ্টা যদি তিনি হন তা হলে সে জন্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেওয়া জুলুম হবে। অথচ তিনি তো জুলুম করেন না। কাজেই তিনি সেগুলোর স্রষ্টা নন।

দ্বিতীয়তঃ সৎকর্মশীলদেরকে ছওয়াব প্রদান করা এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে আজাব দেওয়া আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব। তিনি এটার ব্যতিক্রম করতে পারেন না। কেননা না হয় এটা ইনসাফের পরিপন্থি ও জুলুম হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তো জুলুম করেন না।

তারা আরো বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা যদিও জুলুম করেন না তথাপি তিনি জুলুম করার ক্ষমতা রাখেন। নতুবা তা বর্জনের কারণে তিনি প্রশংসার পাত্র হতে পারতেন না।

"وَيٰقَوْمِ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : কেয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের জন্যে প্রত্যেকটি মানুষের ডাক পড়বে, প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। ঈমান ও নেক আমল থাকলে পুরস্কার তথা চিরসুখ ও শান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ হবে। পক্ষান্তরে ঈমান না থাকলে চিরশাস্তি ও চির দুঃখের কেন্দ্র দোজখ অবধারিত হবে। জান্নাতিরা! জান্নাতে প্রবেশের পর এবং দোজখীরা দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেককে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে বেহেশতের অধিবাসীরা তোমরা চিরদিন বেহেশতে থাকবে, কখনো বেহেশতের সুখ-শান্তি হতে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না, আর দোজখবাসীদেরকে বলা হবে, হে দোজখবাসীরা! তোমরা চিরদিন দোজখে থাকবে, তোমাদের মৃত্যু নেই এবং দোজখ থেকে কখনো ছাড়া পাবে না।

اَلتَّنَادُ -এর অর্থ এবং কেয়ামত দিবসকে "يَوْمَ التَّنَادِ" বলার কারণ : اَلتَّنَادِ শব্দটি د অক্ষরটির উপরে জবর হবে। এটা اَلتَّنَادِىْ -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বাবে تَفَاعُلٌ থেকে। "اَلتَّنَادِىْ" অর্থ হলো একে অপরকে আহ্বান করা। কেয়ামতের দিবসকে يَوْمَ التَّنَادِ বলার কারণ হলো, সেদিন বহু আহ্বান সংঘটিত হবে। আর তা হবে এক মহাদিবস। কেননা আহ্বান ও ডাকাডাকির আধিক্য তথা একে অপরকে অধিক পরিমাণে আহ্বান ও ডাকাডাকি করা ঘটনার গুরুত্বকে বুঝিয়ে থাকে।

সুতরাং সর্বপ্রথম শিঙ্গায় ফুৎকার হবে। যার দ্বারা মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ" অর্থাৎ, সেদিন নিকটস্থ স্থান হতে একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে- সেদিন সকলেই যথার্থভাবে সেই হুংকারের বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে।

সর্বশেষ আওয়াজ হবে হিসাব নিকাশের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ" সেদিন আমি প্রতিটি মানুষকে তার ইমাম (নেতা)-এর সাথে ডাকব।

আবার জান্নাতিরা জাহান্নামিদেরকে এবং জাহান্নামিরা জান্নাতিদেরকে ডাকাডাকি করবে। সুতরাং সূরায়ে আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ الخ" আ'রাফবাসীগণ আহ্বান করবে। "وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ الخ" - জাহান্নামিগণ আহ্বান করবে। "وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ الخ" বেহেশতবাসীগণ আহ্বান করবে।

পরিশেষে মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে জবাই করার সময় একটি আওয়াজ হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- "يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ" "হে জান্নাতিরা চিরদিন জান্নাতে অবস্থান কর, আর মৃত্যু হবে না এবং হে জাহান্নামিরা চিরদিন জাহান্নামে পড়ে থাক, আর তোমাদের মৃত্যু হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে- "হে আল্লাহদ্রোহীরা তোমরা দণ্ডায়মান হও।" এর দ্বারা তাকদীর অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হবে। এর পর জান্নতিরা জাহান্নামিদেরকে এবং জাহান্নামিরা জান্নাতিদেরকে আর আ'রাফের অধিবাসীরা উভয় দলকে আহ্বান করে স্বীয় বক্তব্য পেশ করবে। এর প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ও দুর্ভাগার নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করে তাদের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। যেমন- বলা হবে, অমুকের পুত্র অমুক সৌভাগ্যশালী ও কৃতকার্য হবে। এর পর আর দুর্ভাগ্য হওয়ার আশঙ্কা নেই। অমুকের পুত্র অমুক দুর্ভাগা ও অকৃতকার্য হয়েছে। এখন আর তার সৌভাগ্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। -[মাযহারী]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমল ওজন করার পর সৌভাগ্য ও হতভাগ্য হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হবে।

-[মুসনাদে বায়যার ও বায়হাকী]

হযরত আবূ হাজ্জে আ'রাজ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি নিজে নিজেকে লক্ষ্য করে বলতেন, হে আ'রাজ কেয়ামতের দিন আহ্বান করে বলা হবে- হে অমুক প্রকারের গুনাহকারী দাঁড়াও তখন তুমি তাদের সাথে দাঁড়াবে। আবার ঘোষণা করা হবে, অমুক শ্রেণির গুনাহগার দাঁড়াও, তখন তুমি তাদের সাথে দাঁড়াবে। পুনরায় ঘোষণা করা হবে, অমুক প্রকারের গুনাহকারী দাঁড়াও, তখনা তুমি দাঁড়াবে। আর আমার তো মনে হয় প্রত্যেক প্রকারের গুনাহগারদের ই'লানের সময়ই তোমাকে তাদের সারিতে দাঁড়াতে হবে। কেননা, তুমি সব ধরনের অপরাধেই জড়িত হয়েছ। -[মুযহেরী]

অবশ্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) বলেছেন যে, এখানে "يَوْمَ التَّنَادِ" -এর দ্বারা সেই দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেদিন ফেরাউন ও তার সমর্থকদের উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হবে। অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন বিপদের দিন ঘনিভূত হবে যখন তোমরা সাহায্যের জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি করবে। কিন্তু তা কোনো কাজেই লাগবে না। লোহিত সাগরে ডুবার সময় ফেরাউন ও তদীয় জাতির এ পরিণতিই হয়েছিল।

হযরত ইসরাফীল (আ.) কতবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের জন্য তিনবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।

১. نَفْخَةُ الْفَزَعِ **তথা ভয়-ভীতির ফুৎকার :** এ ফুৎকারের কারণে সমস্ত মাখলূকাত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

২. نَفْخَةُ الصَّعْقِ **বেহুঁশ হওয়ার ফুৎকার :** প্রথম ফুৎকার তথা نَفْخَةُ الْفَزَعِ বা ভয়-ভীতির ফুৎকারের পর তা দীর্ঘায়িত হয়ে نَفْخَةُ الصَّعْقِ -এর রূপ নেবে। এর কারণে সমগ্র জীব বেহুঁশ হয়ে পড়বে ও পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করবে।

৩. نَفْخَةُ النَّشْرِ **বা পুনর্জীবিত হওয়ার ফুৎকার :** এ ফুৎকারের কারণে সমগ্র জীবজগত তথা মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও প্রাণীকূল পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের প্রতি ধাবিত হবে।

বর্ণিত হাদীসেও نَفْخَةُ الْفَزَعِ বা প্রথম ফুৎকারের সময় লোকদের এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ির, ছুটাছুটির বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে- "يَوْمَ التَّنَادِ" "وَهُوَ الَّذِى يَقُولُ اللّٰهُ يَوْمَ التَّنَادِ" আর এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতেও "يَوْمَ التَّنَادِ" -এর দ্বারা প্রথম ফুৎকারের কারণে লোকদের অস্থিরতা বশত এদিক সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটির ব্যাপারটা বুঝানো হয়েছে।

"يَوْمَ تُوَلُّوْنَ ..... هَادٍ" **আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর :** ফেরাউনের সভাসদের সে মু'মিন সদস্য ব্যক্তিটি তাদেরকে কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন- হে আমার জাতি! ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়নপর হবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভুলের মধ্যে রাখেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শক নেই।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিনকে ভয় কর যখন তোমরা দোজখের আজাব থেকে পলায়ন করবে, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, যখন শিঙ্গার ফুৎকার শ্রবণ করে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, এরপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে মানুষ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে, আলোচ্য আয়াতে তখনকার কথাই বলা হয়েছে।

ইবনে জারীর, আবূ ইয়া'লা, বায়হাকী, আবুশ শেখ, আবদ ইবনে হোমায়েদ (র.) নিজ নিজ সংকলনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আদেশ দিয়ে বলবেন, শিঙ্গায় ফুঁক দাও, যাতে ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়। নির্দেশ মোতাবেক হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। আসমান জমিনের অধিবাসীগণ সে আওয়াজ শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তবে আল্লাহ তা'আলা যার সম্পর্কে ইচ্ছা করবেন তাকে (ভয়-ভীতি) হতে রক্ষা করবেন। হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ঐ ফুঁককে অব্যাহত রাখবেন, আওয়াজকে সুদীর্ঘ করবেন, মাঝখানে বিরতি দিয়ে দম নেবেন না। ফলে এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কথা তাদের মায়েরা ভুলে যাবে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের গর্ভপাত হয়ে যাবে, চরম আতঙ্কের কারণে শিশুদের চুল পর্যন্ত সাদা হয়ে যাবে। শয়তান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করবে, ঘোরপাক খাবে। পলায়নপর হয়ে যখন গোটা পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে পৌঁছবে তখন ফেরেশতাগণ তাদের চেহারায় প্রহার করে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেবেন। মানুষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে তখন পরস্পরের মধ্যে ডাকাডাকি হবে। আর এটিই হলো সেদিন যাকে আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ التَّنَادِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেদিন মানুষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নপর হবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে কোনো অবস্থাতেই রেহাই পাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং জাহ্হাক (র.) يَوْمَ التَّنَادِ শব্দটিতে د (দাল) এর উপর তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন। এর অর্থ পলায়ন এবং ছড়িয়ে পড়ার দিন। যেভাবে উষ্ট্র তার মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করে ঠিক এভাবে মানুষ কেয়ামতের দিন পৃথিবীতে পলায়নপর হবে।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মোবারক (র.) যাহ্হাক (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম (সর্বনিম্ন) আসমানকে ফেটে যাওয়ার আদেশ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ আসমান ফেটে যাবে এবং তাতে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তার এক প্রান্তে থাকবেন। পুনরায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক তারা পৃথিবীতে অবতরণ করে দুনিয়াবাসীকে ঘেরাও করবেন। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সষ্ঠ এবং সপ্তম আসমানেরও একই অবস্থা হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আসমান ফেটে যাবে এবং ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। এরপর আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন নাজিল হবেন। দোজখ তাঁর বাম দিকে হবে এবং জান্নাত ডান দিকে। দোজখের ভয়াবহ অবস্থা দেখে জমিনের অধিবাসীরা পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু জমিনের যে প্রান্তেই পৌঁছবে, সেখানেই দেখবে ফেরেশতাগণের সাতটি কাতার বর্তমান রয়েছে তখন বাধ্য হয়ে লোকেরা যেখান থেকে পলায়ন করেছে সেখানেই ফিরে আসবে। আলোচ্য আয়াতে সে ভয়াবহ দিনের কথাই বলা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সূরায়ে ওয়াল ফাজরে এ সম্পর্কে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে- وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى "এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন এবং ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবেন, সেদিন দোজখকে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ (সত্য) উপলব্ধি করবে, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?"

এমনিভাবে সূরা আর রাহমানে সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা এভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে।

"يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ" .

'হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করতে পার তবে তা কর কিন্তু তোমরা তা কখনো করতে পারবে না শক্তি ব্যতীত, [আর সে শক্তি তোমাদের নেই]।

অর্থাৎ আমার পৃথিবীতে থেকে আমার যাবতীয় নিয়ামত ভোগ করে আমার অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ থাকার কোনো যুক্তি নেই। যদি তোমরা আমার দাওয়াত অমান্য করতেই চাও তবে আসমানে ও জমিনের এ চৌহদ্দি হতে বেরিয়ে যাও, আর তা কখনো তোমরা পারবে না।

"وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ الخ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আয়াতের বক্তব্যটি হতে পারে হযরত মূসা (আ.)-এর অথবা সে মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্যের শেষাংশ যেটা তার পূর্বেকার ভাষণের পরিপূরক। বলা হচ্ছে-

হে মিশরবাসী! ইতঃপূর্বে তোমাদের নিকট হযরত ইউসুফ (আ.) যখন প্রকাশ্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। তাঁর ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই স্বীকার কর যে, তিনি অতি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি তদানীন্তন বাদশাহের স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে তোমাদেরকে ক্রমাগত সাত বৎসর কালীন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হতে মুক্তি দিয়েছেন, তোমাদের গোটা জাতিই একথা মাথা পেতে স্বীকার করে যে, তার শাসনামল অপেক্ষা অধিক সুবিচার, ইনসাফ ও মঙ্গলময় অবস্থা মিশরের ভাগ্যে আর কখনো সম্ভব হয়নি। আফসোস! তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ গুণাবলি জেনে ও মেনে নেওয়ার পরও তোমরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর উপর ঈমান আনলে না। তার পরলোক গমনের কারণে সে তোমরাই বললে- ভালোই হলো, সকল ঝামেলা মিটে গেল, এখন আর কোনো রাসূল আসবে না, রাসূলদের উপদেশ বর্ষণে আর বিরক্ত হতে হবে না।

আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (র.) হযরত শাহ সাহেব (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মিশরবাসী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যখন মিশরের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন তারা বলে, হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত বরকতময় ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যতে এমন মোবারক সত্তা হয়তো আর কখনো আসবেন না। জীবদ্দশায় তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে আর এখন তাঁর জন্য আক্ষেপ করছে, অর্থাৎ যখন নিয়ামত তাদের কাছে ছিল তখন তারা তাঁর কদর করেনি। -[ফাওয়াদে ওসমানী, পৃ- ৬১০]

"وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ الخ" **-এর মধ্যে** يُوْسُفُ **-এর দ্বারা কাউকে বুঝানো হয়েছে?** উক্ত আয়াতে ইউসুফের দ্বারা কোন ইউসুফকে বুঝানো হয়েছে- এতদসম্পর্কিত দু'টি অভিমত পাওয়া যায়-

১. আল্লামা জামাখশরী (র.) বলেছেন যে, তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ঔরষজাত পুত্র ইউসুফ নন; বরং তিনি হলেন ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর প্রপৌত্র এবং ইউসুফ (আ.)-এর দৌহিত্র। তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে প্রায় বিশ বৎসর পর্যন্ত হেদায়েত করেছিলেন।

২. জমহুর মুফাসসিরের মতে উল্লিখিত ইউসুফ হলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরষজাত পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)। সূরা ইউসুফে যার বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের ফেরাউন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন এক না ভিন্ন ভিন্ন? হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগে যেই ফেরআউন মিশরে রাজত্ব করত সেই একই ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও ছিল কি-না? এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং-

ক. জমহুরের মতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন একজন ছিল না; বরং হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে অপর এক ফেরাউন ছিল। ইতিহাস বলছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের ফেরাউনের নাম ছিল ওলীদ ইবনে মুসআব (وَلِيْدُ بْنُ مُصْعَبٍ) অপরদিকে হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউনের নাম ছিল আর রাইয়ান (الرَّيَّانُ)। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

অনুবাদ :

٣٥. اِلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ مُعْجِزَاتِهٖ مُبْتَدَاٌ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ بُرْهَانٍ اَتٰهُمْ ط كَبُرَ جِدَالُهُمْ خَبَرُ الْمُبْتَدَاِ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِضْلَالِهِمْ يَطْبَعُ يَخْتِمُ اللّٰهُ بِالضَّلَالِ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ بِتَنْوِيْنِ قَلْبٍ وَدُوْنَهٗ وَمَتٰى تَكَبَّرَ الْقَلْبُ تَكَبَّرَ صَاحِبُهٗ وَبِالْعَكْسِ وَكُلِّ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ لِعُمُوْمِ الضَّلَالِ جَمِيْعُ الْقَلْبِ لَا لِعُمُوْمِ الْقُلُوْبِ.

৩৫. যারা বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহর নিদর্শনাবলির ব্যাপারে– তাঁর মোজেজাসমূহের ব্যাপারে, এ আয়াতাংশ মুবতাদা। বিনা দলিল-প্রমাণে তাদের নিকট না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত অপ্রিয় তাদের এই ঝগড়া, এটা মুবতাদার খবর– আল্লাহ তা'আলার নিকট (অপ্রিয়) এবং ঈমানদারদের নিকট ও তদ্রূপ অর্থাৎ যদ্রূপ এদেরকে গোমরাহ করেছেন মোহর করে দেন– মোহরাঙ্কিত করে দেন আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীর প্রত্যেকটি অহঙ্কারী উদ্ধত প্রকৃতির অন্তরে قَلْب শব্দটি তানভীন যোগে এবং তানভীন ব্যতীত উভয় ভাবেই পড়া যায়। আর যখন অন্তর অহঙ্কারী হয়ে পড়ে তখন অন্তর ওয়ালাও অহঙ্কারী হয়ে যায়। আবার অন্তর ওয়ালা [ব্যক্তি] যখন অহঙ্কারী হয়ে পড়ে তখন তার অন্তরও অহঙ্কারী হয়ে যায়। উভয় কেরাত অনুসারেই كُلّ শব্দটি সমস্ত অন্তরে গোমরাহীর ব্যাপ্তি বুঝানোর জন্য হয়েছে। সবলোকের অন্তরই গোমরাহ এটা বুঝানোর জন্য হয়নি।

٣٦. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا بِنَاءً عَالِيًا لَّعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ.

৩৬. আর ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি কর সুউচ্চ প্রাসাদ সম্ভবতঃ আমি পথে পৌঁছে যেতে পারি।

٣٧. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ طُرُقَهَا الْمُوْصِلَةَ اِلَيْهَا فَاَطَّلِعَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى اَبْلُغُ وَبِالنَّصْبِ جَوَابًا لِابْنِ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ اَىْ مُوْسٰى كَاذِبًا ط فِىْ اَنَّ لَهٗ اِلٰهًا غَيْرِىْ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذٰلِكَ تَمْوِيْهًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط طَرِيْقِ الْهُدٰى بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ خَسَارٍ.

৩৭. আসমানের পথে– অর্থাৎ ঐ পথসমূহে যেগুলো আসমানে পৌঁছে দেয়। অতঃপর তাকিয়ে দেখতে পারি اَطَّلِعَ শব্দটি اَبْلُغُ -এর উপর আতফ হয়ে মারফূ ও হতে পারে। আবার اِبْنِ নির্মাণ কর [এ আদেশাজ্ঞা] এর جَوَاب হওয়ার কারণে مَنْصُوْب ও হতে পারে– হযরত মূসা (আ.)-এর মা'বুদের দিকে আর নিঃসন্দেহে আমি তাকে মনে করি– অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী এ ব্যাপারে যে, আমি ব্যতীত ও [নাকি]তার [অন্য একজন] মাবুদ রয়েছে। ফেরাউন তার অনুসারীদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য এরূপ বলেছিল। আর এ ভাবেই ফেরাউনকে তার অপকর্মসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখানো হলো এবং তাকে সঠিক-সরল পথ হতে বিরত রাখা হলো। (অর্থাৎ) হিদায়েতের পথ হতে [صُدَّ শব্দটির] ص অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট হতে পারে তেমনি পেশবিশিষ্টও হতে পারে। আর ফেরাউনের সমস্ত ষড়যন্ত্র (তার নিজের) ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হলো [تَبَاب-এর অর্থ] ক্ষতি বা ধ্বংস।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ" বাক্যাংশের মহল্লে ইরাব কি? : اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الخ পূর্ববর্তী শব্দ مُسْرِفٌ হতে بَدَل হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع তথা مَرْفُوْع-এর মহল্লে রয়েছে।

তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, مُسْرِفٌ হলো (একবচন) অথচ "اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ" হলো বহুবচন। সুতরাং একবচন হতে বহুবচন কিভাবে بَدَل হতে পারে?

এর জবাবে বলা হবে, مُسْرِفٌ শব্দটি যদিও শব্দের দিক বিবেচনায় একবচন কিন্তু এখানে অর্থের দৃষ্টিতে বহুবচন হয়েছে। অর্থাৎ مُسْرِفٌ দ্বারা প্রত্যেক مُسْرِفٌ কেই বুঝানো হয়েছে। এ বিচারে তা হতে বহুবচনের শব্দ بَدَل হওয়া জায়েজ হয়েছে।

كَبُرَ ফে'লের ফায়েল কে? مَقْتًا মানসূব হওয়ার কারণ কি? : আল্লাহর বাণী– كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ الخ -এর মধ্যে كَبُرَ -এর ফায়েল হলো পূর্বোক্ত আয়াতাংশের ভাবার্থ তথা "اَلْجِدَالُ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ" (বিনা প্রমাণে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া।)

আর مَقْتًا শব্দটি তামঈয হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হবে– "كَبُرَ جِدَالُ الْمُشْرِكِيْنَ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ مَقْتًا"

"عَلٰى كُلِّ قَلْبِ" আয়াতে قَلْب -এর বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহর বাণী– "كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ الخ" -এর قَلْب শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. হযরত আমর ইবনে যাকওয়ান (রা.) قَلْب শব্দটিকে তানবীনের সাথে পড়েছেন। এ পরিস্থিতিতে مُتَكَبِّرٍ ও جَبَّارٍ শব্দদ্বয় قَلْب -এর সিফাত হবে। অর্থ হবে– "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দাম্ভিক ও আত্মাভিমানী অন্তরে গোমরাহীর মোহর মেরে দেন।"

বস্তুত উল্লিখিত কেরাতদ্বয়ের পার্থক্যের কারণে আয়াতের অর্থের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) লিখেছেন যে, কলবের অধিকারী তথা ব্যক্তি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হলে অনিবার্যভাবে কলব ও দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হবে। আবার কলব অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হলে স্বভাবতঃই কলবের অধিকারী তার অনুসারী হয়ে পড়ে। কাজেই কলবের অধিকারী (ব্যক্তি) অহঙ্কারী হওয়া আর কলব অহঙ্কারী হওয়া একই কথা।

২. জমহুর ক্বারীগণ قَلْب শব্দটিকে তানবীন ব্যতীত যের যোগে পড়েছেন। অর্থাৎ এর পরে অথবা পূর্বে একটি শব্দ উহ্য মেনেছেন। তবে এমনিতে قَلْب কে مُتَكَبِّر -এর দিকে اِضَافَتْ করেছেন। মূলত বাক্যটি এরূপ হবে– "عَلٰى كُلِّ قَلْبِ شَخْصٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ" অথবা "كُلِّ ذِيْ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ الخ" ইমাম জামাখশারী (র.) দ্বিতীয় তারকীবটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দাম্ভিক ও ঔদ্ধত্য ব্যক্তির অন্তরে গোমরাহীর মোহর অঙ্কন করে দেন।

فَاَطَّلِعَ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত : জালালাইন দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) উক্ত فَاَطَّلِعَ শব্দের মধ্যে দুটি কেরাতের উল্লেখ করেছেন–

১. فَاَطَّلِعُ শব্দটি اَبْلُغُ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে।

২. فَاَطَّلِعَ শব্দটি اِبْنِ আমরের সীগাহ-এর জবাব হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। অর্থাৎ এখানে فَاَطَّلِعَ -এর فَا -এর পরে একটি اَنْ উহ্য থেকে اَطَّلِعَ কে نَصْب প্রদান করেছে। যেমন নিম্নের শ্লোকটি লক্ষ্যণীয়–

يَا نَاقُ سِيْرِيْ عَنَقًا فَسِيْحًا ۞ اِلٰى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيْحَا -

এখানে "فَنَسْتَرِيْحَا" শব্দটি سِيْرِيْ শব্দের জবাব হওয়ার কারণে তার فَ -এর পরে একটি اَنْ উহ্য থেকে এর শেষাক্ষরে নসব প্রদান করেছে। –[জামাল]

اَلْأَسْبَابُ ـ اَلصَّرْحُ ـ اَلْمَقْتُ শব্দাবলির অর্থ :

ক. আবূ সালেহ (র.) বলেছেন– "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ" -এর অর্থ হলো– "طُرُقَ السَّمٰوٰتِ" অর্থাৎ আসমানের পথসমূহ।

খ. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইমাম জুহরী (র.) এর মতে– "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ" -এর অর্থ হলো "اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ" অর্থাৎ আকাশমণ্ডলের দ্বারসমূহ। আগত শ্লোকটি লক্ষ্যণীয়– وَمَنْ هَابَ اَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ * وَلَوْ رَامَ اَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمٍ سُلَّمٍ এখানে "اَسْبَابَ السَّمَاءِ" -এর দ্বারা "اَبْوَابَ السَّمَاءِ" কে বুঝানো হয়েছে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন– "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ" -এর অর্থ হলো সেসব উপাদান যা দ্বারা আসমান তৈরি করা হয়েছে।

اَلصَّرْحُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– اَلظُّهْرُ সুতরাং صَرْحُ الشَّئِ -এর অর্থ হবে ظُهْرُ الشَّئِ বা বস্তুর প্রকাশ্য অংশ। তবে পারিভাষিক অর্থে সামান্য মতানৈক্য বিদ্যমান।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এর আভিধানিক অর্থ হলো– রাজ প্রাসাদ।

খ. কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো– সুউচ্চ ইমারত।

গ. একদল মত প্রকাশ করেছেন, এর অর্থ হলো– ঘরের ছাদ। তবে এখানে ইমারতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلْمَقْتُ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে–

ক. اَلْغَضَبُ তথা ক্রোধ বা ঘৃণা।

খ. নাফরমানি, পাপ।

গ. অপমানকর অবস্থা ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ...... اٰمَنُوْا" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহর নিদর্শনাদির ব্যাপারে যারা বিবাদে লিপ্ত হয় তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বিচারে পথভ্রষ্ট করা হয় ঐ সকল লোকদেরকে যাদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিন ধরনের ত্রুটি বর্তমান থাকে।

১. তারা নিজেদের দুষ্কৃতিতে সীমালঙ্ঘন করে যায়। গুনাহের কাজগুলো তাদের এতই ভালো লাগতো যে, নীতি সংশোধনের কোনো দাওয়াত ও প্রচেষ্টাকেই কবুল করতে তারা আদৌ প্রস্তুত হতো না।

২. আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণার পরিবর্তে বাঁকা-বাকা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করতে চায়। অথচ এ বিতর্কের ভিত্তি কোনো বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন দলিল প্রমাণের উপর নয়; না কোনো আসমানি কিতাবের সনদের উপর; বরং প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত জিদ ও হঠকারিতাই হলো তার একমাত্র ভিত্তি।

৩. নবী-রাসূল সম্পর্কে তাদের আচরণ হবে শঙ্কা ও সন্দেহপূর্ণ। আল্লাহর নবী তাদের সামনে যত অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়েই আসুক না কেন তারা চিরাচরিত নিয়মেই তাঁদের নবুয়তে সংশয় পোষণ করে। আর আল্লাহর একত্ববাদ ও আখেরাত সম্বলিত যেসব তত্ত্ব ও তথ্য তাঁরা পেশ করে থাকেন তার প্রতি তারা সদা সন্দেহ প্রবণ হয়ে থাকে।

মূলত যখন মানব সমাজের কোনো অংশের লোকদের মধ্যে এ তিন প্রকারের দোষ-ত্রুটি সমবেত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গোমরাহীর গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। সে স্তর হতে কোনো শক্তিই তাদেরকে উত্তোলন করে আনতে সক্ষম হয় না।

আলোচ্য আয়াত হতে গৃহীত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য আয়াত হতে ইমাম রাযী (র.) তিনটি মাসআলা বের করেছেন–

১. যারা বিনা সনদে বিনা দলিলে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে ঝগড়া করে– আলোচ্য আয়াতে তাদের কুৎসা রচনা করা হয়েছে। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, দলিল-প্রমাণ বা সুস্পষ্ট সনদের ভিত্তিতে তর্ক-বিতর্ক করা উত্তম ও সত্য পন্থা। তাতে অন্ধ আনুগত্যের অবসান করা হয়।

২. আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো কোনো বান্দার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকেন; কিন্তু এ সিফাতটি আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যাখ্যাবহ। যেমন– غَضَبٌ - تَعَجُّبٌ ও حَيَاءٌ - (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

কোনো কোনো বান্দার প্রতি এ ঘৃণা যেমন আল্লাহর মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি তা সৃষ্টি হয়েছে ঈমানদার লোকদের মাঝে। –[কাবীর]

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ" "এভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।"

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে আল্লামা কুরতুবী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ কুরতুবীতে বলেছেন– ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন হযরত মূসা (আ.) ও ঈমানদার ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, তেমনি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহঙ্কারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন, ফলে সে আলোর পথ দেখতে পায় না, না সে সত্যকে গ্রহণ করে।

আয়াতে مُتَكَبِّرٌ ও جَبَّارٌ শব্দদ্বয় قَلْب -এর صِفَةٌ বা বিশেষণ হয়েছে। কারণ সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে قَلْب বা অন্তর। অন্তর হতেই ভাল-মন্দ কর্মের উদ্ভব ঘটে। এ কারণেই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ".

মানুষের দেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহই নষ্ট হয়ে যায়। খবরদার (তোমাদের জেনে রাখা দরকার) তা হলো কলব বা অন্তর। –[কুরতুবী]

মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন– যার অন্তরে অহঙ্কার ও স্বৈরতন্ত্রের বীজ রোপিত রয়েছে তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর অঙ্কিত করেন ফলে সে ন্যায় ও সত্যকে চিনে না, না অন্যায় ও অসত্যকে ঘৃণা করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ" "এভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহঙ্কারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।" হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, স্বৈরাচরীদের নিদর্শন হলো অন্যায়ভাবে হত্যা করা। –[ইবনে কাছীর]

"وَقَالَ فِرْعَوْنُ .... وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا" আয়াতের ব্যাখ্যা : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একজন মর্দে মু'মিনের উপদেশের উল্লেখ ছিল। এ উপদেশ ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। বুদ্ধিমান মাত্রেরই মনে এসব উপদেশ দাগ কাটে। ফেরাউন ঐ মর্দে মু'মিনের যুক্তিপূর্ণ কথার কোনো প্রকার জবাব প্রদানে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয়, তাই সে অসহায় হয়ে পড়ে,তখন সে তার ফেরাউনী ভাব প্রকাশ করতঃ প্রধানমন্ত্রী হামানকে একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দেয়। আলোচ্য আয়াতে ফেরাউনের এ নির্দেশেরই উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্লেষণ : উক্ত আয়াতে ফেরাউনের দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউন মন্ত্রী হামানকে বলেছে– আমার জন্য গগনস্পর্শী প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে করে আমি আকাশপথে ভ্রমণ করে আসমানের দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি এবং মূসার প্রভুকে দেখতে পারি (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ)। ফেরাউনের এ মন্তব্য দ্বারা তার মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়, সে এটাও জানে না যে, পৃথিবী থেকে আসমানের দূরত্ব কতখানি, এ ব্যাপারেও সে অজ্ঞাত যে, প্রাসাদ যত সুউচ্চই হোক না কেন, তার উপর আরোহণ করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। ফেরাউন এ-ও বলেছিল, অবশ্য আমি জানি মূসা মিথ্যাবাদী, আর সে যে সব কথা বলে তাও অসত্যের প্রলেপে বেষ্টিত। যেমন সে বলে, মহান আল্লাহ তাকে রাসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, আমার মনে হয় এ কথাও অসত্য, শুধু তাই নয়; বরং তাঁর নবুয়তের দাবিই মিথ্যা, এতদ্ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক যে একজন বলে সে দাবি করে তার এ দাবিতেও সে মিথ্যাচারিতায় ভুগছে; আমিতো মনে করি না যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু আছে। –[নাঊযুবিল্লাহে মিন যালিকা]

আত্ম বিস্মৃতিই ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হয় : মানুষ যখন কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং অবশেষে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তার বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়, সে মন্দকেই উত্তম মনে করে, যা অশোভনীয়। ফেরাউনেরও এ একই অবস্থা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার সকল চক্রান্ত শুধু যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তা নয়; বরং তা তার ধ্বংসকেই নিশ্চিত করেছে এজন্যে কুরআনে মাজীদের অন্যত্র মু'মিনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে–

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাই তো পাপাচারী।"

এ আত্মবিস্মৃতিই পথভ্রষ্টতার প্রথম সোপান, এরপর মানুষ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তখন সে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে তাই করতে পারে। প্রথমতঃ ভাল-মন্দের মাঝে সে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। এ অবস্থা কিছুদিন অব্যাহত থাকার পর সে মন্দকেই উত্তম মনে করে থাকে। এমনিভাবে অসত্যকে সত্য; অসুন্দরকে সুন্দর এবং যা অশোভনীয় তাকে শোভন মনে করে। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতাংশে ইরশাদ হয়েছে– "وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ تَبَابٍ"

অর্থাৎ, তার অন্যায় অনাচারের কারণে তাকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার যাবতীয় ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, পরিশেষে সে তার সমস্ত সৈন্য সামন্তসহ তাকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করা হয়।

এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি, সত্যদ্রোহীতা, সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সর্বদা ব্যর্থ-পরিণামই হয়। যখন কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ধ্বংসের পথ বেছে নেয় আর সে পথকেই কল্যাণের পথ মনে করে, তাদের এ মনে করার কারণে অকল্যাণ কখনো কল্যাণে পরিণত হয় না; বরং তাদের জন্য তা সর্বনাশই ডেকে আনে।

আসমানে আরোহণ করার জন্য ফেরাউনের সেই আদিষ্ট ইমারত নির্মাণ করা হয়েছিল কিনা? ফেরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে এমন একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিল যার দ্বারা সে আসমানে আরোহণ করতঃ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভুকে তাকিয়ে দেখতে পারে। কিন্তু সত্যি-সত্যিই ফেরাউনের জন্য অনুরূপ কোনো ইমারত স্থাপন করা হয়েছিল কি-না এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

ক. একদল মুফাসসিরের মতে অনুরূপ সুউচ্চ একটি ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছেই তা ধ্বসে পড়ে।

মুহাক্কিকগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে উক্ত ইমারত ধ্বসে পড়ার জন্য আল্লাহর আজাব আসা আবশ্যক ছিল না; বরং যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হলো, প্রত্যেক ইমারতের উচ্চতাকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ভিত্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ ইমারত এমন উঁচুতে গিয়ে ধ্বসে পড়েছিল যখন আর সে ভিত্তি তাকে বরদাশত করতে পারছিল না। পরন্তু এতেও ফেরাউন ও হামানের নির্বুদ্ধিতাই প্রমাণিত হয়।

খ. একদল মুফাস্সিরের মতে ফেরাউনের জন্য উক্ত ইমারত নির্মাণ করা হয়নি। কেননা মূলতঃ ফেরাউন নিজেও জানত যে, এমন ইমারত তৈরি করা সম্ভব নয়– যা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সে শুধু তার অনুসারীদেরকে বোকা বানানোর জন্য এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই সে এটা বলেছে।

সুতরাং কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়না যে, ফেরাউনের নির্দেশিত অনুরূপ ইমারত তৈরি করা হয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.) কি দাবি করেছিলেন যে, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন? মূলত হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট এমন দাবি করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশে রয়েছেন; বরং ফেরাউন নিজেই অনুরূপ একটি ধারণার বশীভূত হয়ে মন্ত্রী হামানের নিকট আসমানে উঠে হযরত মূসা (আ.)-এর রবকে তাকিয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল। আর হযরত মূসা

(আ.) তো আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেছেন এবং তাদের উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মূসা (আ.) যে সব বক্তব্য পেশ করেছেন তা হতে নিম্নে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া হলো–

১. "رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রব।

এটা সত্য যে, ফেরাউন আসমানে আল্লাহর সন্ধানে যেতে চেয়েছে– এ হতে দলিল উপস্থাপন করতঃ কতিপয় বাতিল পন্থিরা আল্লাহ তা'আলা আসমানে রয়েছেন এবং তথায় অবস্থান করতঃ পৃথিবী পরিচালনা করছেন বলে দাবি করে থাকে। অথচ হকপন্থি তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্মিলিত অভিমত হলো আল্লাহ তা'আলা নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান-বিরাজমান। তিনি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গণ্ডিভূত নন। আর ফেরাউনের উক্ত বাতিল উক্তির দ্বারা কেবল বাতিলপন্থিরাই দলিল পেশ করতে পারে।

ফেরাউনের উপরিউক্ত উক্তি– "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى" দ্বারা মুশাববেহীন ও অপরাপর বাতিল মতবাদীরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করে থাকে–

ক. হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি– "رَبُّ السَّمٰوٰتِ" হতে আল্লাহ আসমানে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

খ. ফেরাউন অবশ্যই হযরত মূসা (আ.) হতে অবগত লাভ করে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর খোদা আসমানে রয়েছেন।

গ. সাধারণত আস্তিকদের ধারণা হলো আল্লাহ তা'আলা আসমানে অবস্থান করেন। ফেরাউন ও এই একই আকিদায় বিশ্বাসী ছিল।

২. رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى – আমাদের রব তো তিনি যিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের জীবন-যাপনের দিক নির্দেশনা দান করেছেন। –[সূরায়ে তোয়া-হা]

৩. رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا (আমার রব তিনি) যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব, মাশরিক-মাগরিব ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুরও রব তিনি। –[সূরায়ে শু'আরা]

অনুবাদ :

৩৮. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ بِاِثْبَاتِ الْيَاءِ وَحَذْفِهَا اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ تَقَدَّمَ ـ

৩৮. আর ঈমানদার ব্যক্তিটি বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর। (اِتَّبِعُوْنِ-এর শেষে) ى বহাল রেখে এবং উহ্য রেখে দুভাবেই পড়া যায়। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেব। এটার তাফসীর পূর্বে করা হয়েছে।

৩৯. يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ تَمَتُّعٌ يَزُوْلُ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ـ

৩৯. হে আমার জাতি! এ পার্থিব জীবন তো শুধু কিছুটা উপভোগের বস্তু মাত্র, অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতই হলো স্থায়ী আবাসস্থল।

৪০. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ وَبِالْعَكْسِ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ رِزْقًا وَاسِعًا بِلَا تَبْعَةٍ ـ

৪০. যে কেউ মন্দ-গর্হিত কাজ করবে সে তার সমান প্রতিফল পাবে। আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ নেক আমল করবে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। يَدْخُلُوْنَ শব্দটির ى তে পেশ যোগে এবং خ টা যবর যোগে হবে। আবার এর বিপরীতে ى তে যবর দিয়ে এবং خ তে পেশ দিয়েও পড়া যেতে পারে। বেহেশতে তাদেরকে অগণিত রিজিক প্রদান করা হবে। বিপুল পরিমাণ রিজিক প্রদান করা হবে, কোনোরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত।

৪১. وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ـ

৪১. আর হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ দোজখের দিকে।

৪২. تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَالِبِ عَلٰٓى اَمْرِهٖ الْغَفَّارِ لِمَنْ تَابَ ـ

৪২. তোমরা আমাকে আহ্বান করছো আমি যেন আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করি আর তাঁর সঙ্গে এমন কিছুকে শরিক করি যার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান আমার নেই, অথচ আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি মহা পরাক্রমশালী– যিনি তাঁর সর্ব বিষয়ে বিজয়ী অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর জন্য যে তওবা করে। তাঁর প্রতি রুজু করে।

৪৩. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لِاَعْبُدَهٗ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا اَيْ اِسْتِجَابَةُ دَعْوَةٍ وَّلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ مَرْجِعَنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ الْكَافِرِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ

৪৩. আর এ কথা নিশ্চিত যে, স্বতঃসিদ্ধ তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছো তার ইবাদত করার জন্য দুনিয়াতে কোথাও কোনো প্রয়োজনে সে আহূত হওয়ার যোগ্য নয়, অর্থাৎ কবুল হওয়ার মতো আর না আখেরাতে– আর আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল গন্তব্যস্থল– আল্লাহর দিকে। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারীরা কাফেররা তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

٤٤. فَسَتَذْكُرُوْنَ إِذَا عَايَنْتُمُ الْعَذَابَ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ ط وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ قَالَ ذٰلِكَ لِمَا تَوَعَّدُوْهُ بِمُخَالَفَتِهِ دِيْنَهُمْ.

৪৪. অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে– যখন তোমরা স্বচক্ষে আজাব প্রত্যক্ষ করবে– আমি তোমাদেরকে যা বলছি। আর আমার কাজ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি এ কথা তখন বলেন, যখন তাদের দীনের বিরোধিতা করার কারণে তারা তাকে ভীতি-প্রদর্শন করেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

"يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ" উক্তিটির প্রবক্তা এবং "اِتَّبِعُوْنِىْ" -এর মধ্যকার কেরাত : "يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ" উক্তিটি কার– এ ব্যাপারে হযরত মুফাস্সিরীনে কেরামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে এটা ফেরাউনের বংশীয় মুমিন ব্যক্তির উক্তি। আলোচনার ধারাবাহিকতার আলোকে এ মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি। –[বায়যাবী, সাবী]

اِتَّبِعُوْنِىْ-এর মধ্যে দুটি কেরাত প্রসিদ্ধ–

১. ইবনে কাসীর, ইয়াকুব ও সাহল (র.) প্রমুখ ক্বারীগণের মতে– اِتَّبِعُوْنِىْ-এর ى অক্ষরটি বলবৎ রেখে।

২. اِتَّبِعُوْنِ-এর শেষাংশ হতে ى -কে বিলুপ্ত করে।

اَلرَّشَادِ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : اَلرَّشَادِ শব্দটির মধ্যে দু ধরনের কেরাত রয়েছে–

১. জমহুরের মতে– اَلرَّشَادِ শব্দের ش অক্ষরটি তাশদীদবিহীনভাবে পড়া।

২. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ও ইমাম জামাখশারী (র.) প্রমুখ কারীগণ اَلرَّشَّادِ -এর ش অক্ষরটিকে তাশদীদ যুক্ত করে পড়েছেন।

"يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ اَهْدِكُمْ" আয়াতাংশে اَهْدِكُمْ -এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী– "يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ اَهْدِكُمْ" -এর মধ্যে اَهْدِكُمْ শব্দটি اِتَّبِعُوْنِىْ আমর এর জবাব হওয়ার কারণে জযমের মহল্লে অর্থাৎ مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে। মূলত শব্দটি ছিল– "اَهْدِيْكُمْ" জযমের মহল্লে হওয়ার কারণে ى অক্ষরটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

جَرَمَ শব্দটির অর্থ কি? এর মহল্লে ই'রাব কি? : "لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ" -এর মধ্যে لَا جَرَمَ শব্দটি فِعْل مَاضِىْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো حَقَّ এবং وَجَبَ অর্থাৎ এটা বাস্তব ও সতঃসিদ্ধ তথা আপনা-আপনিই সাব্যস্ত।

لَاجَرَمَ -এর ফায়েল হলো এটার পরবর্তী বাক্যের বিশ্লেষণ। অর্থাৎ–

"حَقَّ وَ وَجَبَ دَعْوَتُكُمْ لِىْ اِلٰى مَنْ لَا اِسْتِجَابَةَ لِدَعْوَتِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ" "তোমাদের দাওয়াত আমার জন্য এমন সত্তার দিকে সাব্যস্ত হয়েছে ইহ-পরকালের কোথাও যার দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

নাহশাস্ত্র বিশারদ ফাররা (র.) বলেছেন যে, لَا جَرَمَ শব্দটি لَابُدَّ ও لَا مَحَالَةَ -এর ন্যায় একটি শব্দ; কিন্তু এটা বিকৃত হয়ে কসমের অর্থে হয়েছে এবং পরবর্তীতে حَقَّ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, جَرَمَ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– قَطْعٌ (কর্তন ও বিচ্ছিন্ন করা) সুতরাং لَا جَرَمَ -এর অর্থ হবে "لَا قَطْعَ" যা ভাবার্থে গিয়ে وَجَبَ -এর অর্থ প্রকাশ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ ...... بِغَيْرِ حِسَابٍ" আয়াতের ব্যাখ্যা : ইত্যকার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন তার জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল- "وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ" "আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই বাতলাচ্ছি।" তার জবাবে মু'মিন লোকটি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন- ফেরাউনের কথা মিথ্যা, তার প্রদর্শিত পথ সর্বনাশ ডেকে আনবে ; বরং তোমরা আমার প্রদর্শিত পথে চল। আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে নিয়ে চলব, মুক্তির পথের সন্ধান দেব। ফেরাউনের পথে নয়; বরং আমার প্রদর্শিত পথেই তোমরা প্রকৃত সুপথ এবং সত্যিকার কল্যাণ লাভ করবে।

আলোচ্যাংশে سَبِيْلَ الرَّشَادِ -এর অর্থ হলো কল্যাণ ও ছওয়াবের পথ এবং এমন পথ যা কল্যাণ ও ছওয়াবের প্রতি পৌঁছায়। رَشَادٌ শব্দটি غَيٌّ -এর বিপরীত। সুতরাং এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরাউন ও তার সমর্থকরা যে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হলো غَيٌّ বা ভ্রষ্ট ও বাতিল পথ।

তিনি আরো বললেন- "হে আমার জাতি! তোমরা এই নশ্বর জগতের মায়ায় ডুবে থেকো না। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, স্বাদ-আহলাদ দু'দিনের মাত্র। মৃত্যুর আক্রমণ এর উপর যবনিকা টেনে দেবে। পরলোকের জীবনই স্থায়ী জীবন। ইহলোকে থাকা অবস্থায় পরলোকের স্থায়ী বসবাসের উত্তম আয়োজন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় সেথায় চরম কষ্ট ভোগ করতে হবে।

স্মরণ রেখো, আখেরাতের সুখ-সুবিধায় আমলের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা বেশি। মন্দ এবং অসৎ কাজ করলে অবশ্যই তদনুরূপ শাস্তি এবং প্রতিফল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে নর-নারী নির্বিশেষে যে কেউ নেককাজ করবে সে বেহেশতের স্থায়ী নিবাসে প্রবেশ করবে। সে অগণিত স্বর্গীয় আস্বাদন ভোগ করতে থাকবে।

আল্লাহর বাণী- "يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ" -এর দুটি অর্থ হতে পারে-

১. তাদেরকে এমন রিজিক দেওয়া হবে যা গুণে-মানে ও পরিমাপে উভয়দিক দিয়েই তাদের ধারণার বহির্ভূত হবে। কোনো দিন তাদের কল্পনায়ও আসে না যে, তাদের সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসিতার জন্য এরূপ জীবনোপকরণ প্রদান করবে।

২. জান্নাতিদেরকে অফুরন্ত রিজিক প্রদান করা হবে। এ দ্বারা তাদের জীবনোপকরণের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মোটকথা, খাওয়া-পরা ও ভোগ-বিলাসিতা চরম মাত্রায় পৌঁছবে।

يٰقَوْمِ مَالِيْٓ اَدْعُوْكُمْ ..... اَصْحٰبُ النَّارِ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : উক্ত মু'মিন ব্যক্তিটি তার কওম তথা ফেরাউন ও তার ভক্তদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলল- হে আমার জাতি! এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তো তোমাদিগকে তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের পথে আহ্বান করছি। অথচ তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আজাব ও গজব হতে বাঁচাতে চেয়েছি অথচ তোমরা আমাকে সে দিকেই ঠেলে দিতে চাচ্ছ।

তোমরা তো আমাকে কুফর-শিরকে লিপ্ত হতে বলছ। আল্লাহকে অস্বীকার করতে বলছ; আমি যাকে জানিনা, যার বৈধতার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই তাকে আল্লাহর শরিক করতে এবং শিরক করতে তোমরা আমাকে প্রলুব্ধ করছ। এমনভাবে আল্লাহর রোষে ফেলে আমার সর্বনাশ করতে চাচ্ছ। অথচ আমি সর্বশক্তিমান মার্জনাপ্রিয় আল্লাহর প্রতি তোমাদেরকে ডাকছি। যাতে তোমরা তার রোষের কবল হতে মুক্তি পাও এবং তার অনন্ত ক্ষমা ও মার্জনা পাও, আমি সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

"لَا جَرَمَ اَنَّمَا ..... فِى الْاٰخِرَةِ" আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে :

১. তাদেরকে তো লোকেরা জবরদস্তি করে মাবুদ বানিয়েছে ; নচেৎ তারা নিজেরা না এ দুনিয়ায় মাবুদ হওয়ার দাবি করে, না আখেরাতে তারা এ দাবি নিয়ে উঠবে যে, আমরাও তো মাবুদ ছিলাম, তোমরা আমাদেরকে মান্য করো নি কেন? তার কৈফিয়ত দাও।

২. তাদেরকে ডাকার মধ্যে না এ দুনিয়ায় কোনো ফায়িদা রয়েছে, না পরকালে এর বদৌলতে কোনো কল্যাণ লাভ করা যাবে। কেননা, এদের তো কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই। কাজেই তাদের ডাকলে কোনো ফল হবে না।

৩. "যাদের দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো আহ্বান নেই"– এর অর্থ হলো, তাদের প্রভুত্ব মেনে নেওয়ার জন্য দুনিয়ার মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার অধিকার না দুনিয়ায় তাদের আছে, আর না আখেরাতে থাকবে।

আর আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরতে হবে। সীমালঙ্ঘনকারী লোক জাহান্নামী হবে। অর্থাৎ এ দুনিয়ায় যারা বাড়াবাড়ি করে, সীমালঙ্ঘন করে তিনি তাদেরকে নিশ্চয় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরূপ লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের আসল অধিবাসী।

আলোচ্যাংশে 'সীমালঙ্ঘন করার' অর্থ হলো– সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে মাবুদ মেনে নেয়; অথবা– নিজেই মাবুদ হয়ে বসে, খোদাদ্রোহী হয়ে দুনিয়ায় স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার আচরণ অবলম্বন করে এবং পরে নিজের সত্তার উপর, আল্লাহর সৃষ্ট জীব ও মানুষের উপর, এমনিভাবে দুনিয়ার যেসব জিনিসের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সকলের উপর জুলুম ও নিপীড়ন চালায়, সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও ইনসাফের সমস্ত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে বাইরে চলে যায়।

"فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ ...... بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : মু'মিন লোকটি স্বীয় জাতিকে লক্ষ্য করে বলল– "হে আমার জাতি! আজ তোমরা আমায় গুরুত্ব দিচ্ছ না, আমার কথা তোমাদের ভালো লাগছে না। কিন্তু মনে রেখ– অদূর ভবিষ্যতে এমনও একদিন আসবে যেদিন তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে। তখন কিন্তু আমার কথা তোমাদের স্মরণ হবে। বলবে– দুনিয়ায় একটি লোকও আমাদেরকে অদ্যকার দুর্গতি ও কঠিন আজাব হতে রক্ষা করার জন্য কতই না প্রয়াস-প্রচেষ্টা করেছিল। হায়– আমরা যদি তখন তার কথা শুনতাম-মানতাম, তবে আজ আমাদেরকে এ শাস্তি, জাহান্নামের এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। তখনকার অনুতাপ কিন্তু কোনো কাজেই আসবে না।

আমি তোমাদেরকে বুঝালাম, আমার কর্তব্য পালন করলাম, এখন তোমরা জান আর তোমাদের কর্ম জানে। আমি কিন্তু আমার বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম। তোমরা আমার উপর নির্যাতন করতে উদ্যত হও তো তিনিই আমার মদদ করবেন, সাহায্য করবেন। সকলের কীর্তিকলাপ তাঁর সম্মুখে সুস্পষ্ট, কারো কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। অতএব, যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করতঃ সকল সমস্যা সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভক্ত মু'মিনের কর্তব্য।

উক্ত বাক্যাংশ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ কথাগুলো বলার সময় সেই মু'মিন ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ সত্য ভাষণের পরিণামে ফেরাউনের গোটা রাষ্ট্র শক্তিই প্রবল বিক্রমে তার উপর লেলিহান শিখার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ও কঠিন শাস্তি দেবে। তাকে শুধু তার সম্মান ও পদমর্যাদা হতে বঞ্চিত করা হবে না। তার জীবন হতেও তাকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু এ সব জেনে বুঝেও সে কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেই নিজের কর্তব্য পালন করল। এ কঠিন মুহূর্তে সে এরূপ করাকেই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করেছিল।

মা'আরিফুল কুরআনের গ্রন্থকার মুফতি শফী (র.) লেখেন– ফেরাউন বংশীয় মু'মিন লোকটি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে– তার কওমকে উদ্দেশ্য করে যেই ভাষণ দিয়েছিল– এটা সেই উপদেশমূলক ভাষণের শেষাংশ। সুতরাং তিনি কওমের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আজ তো তোমরা আমার কথা শুনছ না– মানছনা। কিন্তু যখন আজাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করবে তখন তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। কিন্তু তখন স্মরণ করলে কোনো কাজ হবে না। দীর্ঘ ভাষণের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন তার ঈমান প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন আশঙ্কাবোধ করলেন যে, তারা তাঁর উপর চড়াও হতে পারে, এ জন্য বললেন, আমি আমার বিষয়াদি ও কাজ-কর্ম আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম, তিনি তাঁর বান্দার হেফাজতকারী।

হযরত মুকাতেল (র.) বলেছেন যে, উক্ত মু'মিন লোকটি আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। লোকেরা যখন তার পিছু ধাওয়া করল তখন তিনি পালিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন। তারা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে নি।

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা বায়যাবী (র.) উল্লেখ করেছেন– উক্ত মুমিন ব্যক্তি ফেরাউনের বাহিনীর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার তাগিদে পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। তাঁকে পাকড়াও করার জন্য একদল লোককে ফেরাউন তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়। ফেরাউনের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী পাহাড়ে চড়ে তাঁকে দেখতে পান যে, তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন আর হিংস্র প্রাণীরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর চতুষ্পার্শে পাহারা দিচ্ছে। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সকলকে হত্যা করল।

অনুবাদ :

৪৫. فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا ج بِهٖ مِنَ الْقَتْلِ وَحَاقَ نَزَلَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ قَوْمِهٖ مَعَهٗ سُوْٓءُ الْعَذَابِ الْغَرَقِ ـ

৪৫. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন অর্থাৎ তাকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র তারা রচনা করেছিল তা হতে আর আপতিত হলো ফেরাউনের দলের উপর ফেরাউনের লোকদের উপর যাদের মধ্যে ফেরাউন নিজেও ছিল। কষ্টদায়ক আজাব অর্থাৎ নিমজ্জন।

৪৬. ثُمَّ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا يُحْرَقُوْنَ بِهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج صَبَاحًا وَمَسَاءً وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ نف يُقَالُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ اَمْرٌ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَشَدَّ الْعَذَابِ عَذَابَ جَهَنَّمَ ـ

৪৬. তারপর তাদেরকে উপস্থিত করা হবে অগ্নির সম্মুখে– তা দ্বারা তাদেরকে জ্বালানো হবে। সকাল-সন্ধ্যা– সকালে এবং সন্ধ্যায়– আর যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, বলা হবে– প্রবেশ কর হে ফেরাউনের দল! অন্য এক কেরাতে اَدْخِلُوْا -এর হামযাহ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট এবং خ অক্ষরটি যের বিশিষ্ট। [خ এ যের হওয়া অবস্থায় এটা ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ বুঝা যাবে– কঠোর আজাবে জাহান্নামের আজাবে।

৪৭. وَاذْكُرْ اِذْ يَتَحَاجُّوْنَ يَتَخَاصَمُ الْكُفَّارُ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا جَمْعُ تَابِعٍ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ دَافِعُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا جُزْءًا مِّنَ النَّارِ ـ

৪৭. আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তারা ঝগড়া করবে অর্থাৎ কাফেররা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে– জাহান্নামে, তখন দুর্বলরা সবলদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম– تَبَعً এটা تَابِعٌ -এর বহুবচন– সুতরাং তোমরা কি প্রতিহতকারী হবে– প্রতিরোধকারী হবে– আমাদের উপর হতে আংশিক সামান্য জাহান্নামের আজাব হতে?

৪৮. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ط اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَاَدْخَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ وَالْكَافِرِيْنَ النَّارَ ـ

৪৮. সবলরা উত্তরে বলবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করেছেন। সুতরাং ঈমানদারদেরকে জান্নাতে আর কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন।

৪৯. وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا اَىْ قَدْرَ يَوْمٍ مِّنَ الْعَذَابِ ـ

৪৯. জাহান্নামীরা জাহান্নামের কর্মকর্তাদেরকে বলবে– "তোমরা তোমাদের প্রভুকে বল, যেন লাঘব করে দেয় আমাদের হতে একদিন অর্থাৎ এক দিনের সমপরিমাণ আজাব।

৫০. قَالُوْٓا اَىِ الْخَزَنَةُ تَهَكُّمًا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ ـ

৫০. উত্তরে তারা বলবে অর্থাৎ জাহান্নামের কর্মকর্তারা তিরস্কার করে বলবে– তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ প্রকাশ্য মোজেজা সহ–

قَالُوْا بَلٰى ط اَىْ فَكَفَرْنَا بِهِمْ قَالُوْا فَادْعُوْا اَنْتُمْ فَاِنَّا لَا نَشْفَعُ لِكَافِرٍ قَالَ تَعَالٰى وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ اِنْعِدَامٍ .

তারা বলবে হ্যাঁ! আগমন করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাদেরকে অস্বীকার করেছিলাম– কর্মকর্তাগণ বলবেন– তাহলে ডাক– তোমরা নিজেরাই। আমরা কোনো কাফেরের জন্য সুপারিশ করতে পারব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন– কাফেরদের আহ্বান তো নিষ্ফল হবেই– বিফল।

৫১. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ جَمْعُ شَاهِدٍ وَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيْبِ .

৫১. নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে সাহায্য করব আর ঈমানদারগণকে দুনিয়ার জীবনে এবং সে দিবসেও সাহায্য করব যে দিবসে স্বাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে– اَشْهَادُ শব্দটি شَاهِدٌ -এর বহুবচন। আর তারা হলেন ফেরেশতাগণ। যারা সাক্ষ্য দেবে যে, রাসূলগণ আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে লোকদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। অথচ কাফেররা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে– তাদের রেসালতকে অস্বীকার করেছে।

৫২. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ عُذْرُهُمْ لَوِ اعْتَذَرُوْا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اَىِ الْبُعْدُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ .

৫২. সে দিন কাজে আসবে না – لَا تَنْفَعُ শব্দটি ى যোগেও হতে পারে এবং ت যোগেও হতে পারে জালিমদের ওজর– তথা অপারগতা প্রকাশ করা। যদি তারা ওজর পেশ করেও। আর তাদের জন্য লা'নত অর্থাৎ রহমত হতে বঞ্চনা– আর তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট নিবাস। আখেরাতে অর্থাৎ আখেরাতের কঠোর শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا আয়াতাংশে اَلنَّارُ শব্দটির মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর বাণী– "اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ الخ" -এর মধ্যস্থিত اَلنَّارُ -এর মহল্লে ইরাবের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. এটা رَفْع -এর মহল্লে হবে। এমতাবস্থায়–

ক. এটি উহ্য مُبْتَدَا -এর خَبَر হবে।

খ. এটা سُوْءُ الْعَذَابِ হতে بَدَل হবে।

গ. অথবা اَلنَّارُ মুবতাদা হবে। আর তার خَبَر হবে "يُعْرَضُوْنَ" -

২. اَلنَّارُ মহল্লান মানসূব হবে। এমতাবস্থায় এটা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হবে, যেই ফে'লের তাফসীর يُعْرَضُوْنَ ফে'লটি করে। অর্থাৎ "يَصْلَوْنَ النَّارَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا" -

৩. اَلنَّارُ টা مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে। এমতাবস্থায় এটা عَذَابِ শব্দটি হতে بَدَل হবে। ইমাম ফাররা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا আয়াতাংশের "كُلٌّ" -এর মহল্লে ইরাব কি? : আল্লাহর বাণী– "اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا" -এর মধ্যে كُلٌّ শব্দটির মহল্লে ইরাবের ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

১. كُلٌّ শব্দটি خَبَر হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। ইমাম اَخْفَشْ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. كُلٌّ শব্দটি اِنَّا -এর تَاكِيْد হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেসায়ী, ফাররা ও ঈসা প্রমুখ নাহুবিদগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ الخ আয়াতাংশে। أَدْخِلُوْا -এর একাধিক কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী- أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ -এর মধ্যস্থিত أَدْخِلُوا -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. أَدْخِلُوا -এর হামযাহ যবরবিশিষ্ট এবং خ যের বিশিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় এটা بَاب إِفْعَالٌ হতে আমরের সীগাহ হবে। এটা হামজা, কেসায়ী, নাফে ও হাফস (র.)-এর কেরাত।

২. অপরাপর কারীগণ اُدْخُلُوْا পড়েছেন। অর্থাৎ হামযা ও خ উভয় অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এটা বাবে نَصَرَ হতে আমরে হাজেরের সীগাহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা : হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে ফেরাউন বংশীয় একজন মু'মিনের ঘটনা এসে পড়েছে। বিশ্বস্ত বর্ণনানুযায়ী তিনি ছিলেন ফেরাউনের রাজ দরবারের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা, পরামর্শ পরিষদের সদস্য এবং ফেরাউনের চাচাত ভাই। শুরু থেকেই তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এক কিবতীকে হত্যা করার অপরাধে যখন এক সময় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য ফেরাউনের সভাসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তখন তিনিই শহরের উপকণ্ঠে দৌড়ে গিয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মিশর ত্যাগ করার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) মিশর ত্যাগ করে মাদইয়ানে চলে যান। সেখানেই হযরত শোআয়েব (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ ঘটে। বলাবাহুল্য, তথায় তিনি নবুয়তের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনের সংঘাত যখন চরম আকার ধারণ করল এবং ফেরাউন বুঝল যে, ভয়-ভীতি ও প্রলোভন কোনোটাতেই হযরত মূসা (আ.)-কে দমানো যাচ্ছে না, কোনো কৌশলেই হযরত মূসা (আ.)-কে কাবু করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন সে রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা আহ্বান করল। সভায় নিজের মত প্রকাশ করে ফেরাউন বলল যে, "হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাকে হত্যা করা না হলে সে গোটা সামাজিক কাঠামোকেই ওলট-পালট করে ছাড়বে।

মু'মিন লোকটি পূর্ব হতেই যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন তথাপি এতদিন পর্যন্ত তা গোপন রেখে ছিলেন। তিনি ফেরাউনের উপরিউক্ত প্রস্তাব শুনে আর বরদাশত করতে পারলেন না। তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ করলেন। যদি সত্যিই তারা এটা করতে অগ্রসর হয় তাহলে এর পরিণাম যে মোটেই ভালো হবে না তাও তিনি বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস হতে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বললেন যে, নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করার কারণে নূহ, আদ, ছামূদ ইত্যাদি জাতিসমূহের উপর আল্লাহর আজাব ও গজব নেমে এসেছিল; ধরাপৃষ্ঠ হতে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সময় থাকতে সাবধান হও, হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতা হতে ফিরে আস; তাঁকে মান্য করতে না পারো তো অন্তত হত্যা করার দুঃসাহস করিও না, অন্যথায় পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় একই ভয়াবহ পরিণাম তোমাদের জন্যও অপেক্ষমান। মনে রেখ হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলে শুধু যে রাষ্ট্র ক্ষমতাই তোমাদের হাত ছাড়া হবে তাই নয়; বরং তোমাদের গোটা জাতিই ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যাবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। কওমের লোকদের দীনের দাওয়াত দিলেন। ঈমান আনলে তাদের কি লাভ হবে এবং ঈমান হতে বিমুখ হয়ে থাকলে ইহকাল ও পরকালে তাদের কি ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে তাও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন- وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ "আমি আমার সবকিছু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম। বান্দারা সকলেই আল্লাহর নজরে রয়েছে।" আমি যা করলাম তাও তিনি দেখলেন আর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তোমরা যা করবে তাও তিনি অবশ্যই দেখবেন।

তাঁকে হত্যা করার জন্য ফেরআউন তার লোকজনকে লেলিয়ে দিল। তিনি পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। ফেরাউনের বাহিনী তাঁকে পাকড়াও করার জন্য পাহাড় পর্যন্ত গেল। তারা দেখল যে, তিনি নামাজরত আর হিংস্র বন্য প্রাণীরা চতুর্দিক দল বেঁধে তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। তারা ভয়ে ফিরে আসল। কিন্তু ফেরাউন তাদের সকলকেই হত্যা করে ছাড়ল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার বাহিনীর হাত হতে সেই মু'মিন লোকটিকে রক্ষা করলেন। অপরদিকে ফেরাউন ও তার দলবলকে নীলনদে ডুবিয়ে মারলেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে– فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ সুতরাং আল্লাহ ফেরাউন ও তার বাহিনীর ষড়যন্ত্র হতে তাকে হেফাজত করলেন। আর ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে নিকৃষ্ট আজাবে নিক্ষেপ করলেন।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ ...... الْعَذَابِ আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তির নসিহতের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আলমে বরজখ তথা মধ্যলোকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে অবস্থিত জগতের নামই আলমে বরজখ যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হোক কিংবা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হোক কিংবা অগ্নিতে দগ্ধ করা হোক। সংক্ষেপে আলমে বরজখের শাস্তিকে কবরের আজাব বলা হয়। কবরের আজাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেভাবে নিদ্রা জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি একটি অবস্থার নাম, ঠিক তেমিনভাবে দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝামাঝি সময় যেখানে অতিবাহিত করতে হয় তা-ই হলো আলমে বরজখ বা মধ্যলোক। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটে আর রুহ আলমে বরজখে চলে যায়। এতদসত্ত্বেও রুহের সঙ্গে দেহের একপ্রকার সম্পর্ক অব্যাহত থাকে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হয় এবং তিনটি প্রশ্ন করা হয়–

১. তোমার প্রতিপালক কে? ২. তোমার ধর্ম কি? ৩. নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করা হয়, ইনি কে?

মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেবে কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি কাফির হয় তবে জবাবে বলবে– হায় আক্ষেপ! আমি জানি না।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার জীবন এবং কবরের জীবনে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ দেখে, শুনে, কথা বলে কিন্তু এ চক্ষু দিয়ে দেখে না এবং এ কর্ণ দিয়েও শ্রবণ করে না, নিদ্রিত হওয়ার কারণে এসব ইন্দ্রিয়ের শক্তি তখন অকেজো হয়ে থাকে, মৃত্যুর পর যখন মানুষ চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় এবং আলমে বরজখে পৌঁছে যায় তখন সে ঈমান ও কুফর তথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও নাফরমানির প্রকৃত রূপ প্রকাশ্যে দেখতে পায়।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি যখন কবরে মুনকির-নকীরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে অবসর পায় তখন একটি অতি সুন্দর, আকর্ষণীয় আকৃতি দেখতে পায়, মু'মিন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। এমনিভাবে কাফের বা অপরাধী ব্যক্তিদের সম্মুখেও তাদের আমল দৃশ্যমান হয়ে হাজির হয় তবে সে দৃশ্য হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তখন তাকে জবাব দেওয়া হয়– আমি তোমার আমল। এটি হলো আলমে বরজখের প্রাথমিক অবস্থা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হয়, তবে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত বা দোজখে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। যদি সে ব্যক্তি মু'মিন হয় তবে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখে তার আনন্দ বৃদ্ধি পায়, আর যদি সে কাফের হয় তবে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফেরাউন সম্প্রদায়ের রূহগুলো কৃষ্ণবর্ণের পাখির উদরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। দৈনিক দু'বার তাদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয়, এটিই হবে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা।

উল্লিখিত আয়াত কবরের আজাবকে সাব্যস্ত করে : আল্লাহর বাণী- "اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا الخ" আলমে বরযখের তথা কবরে আজাব হওয়ার কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাষায় আজাবের দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন, একটি হলো কম মাত্রার আজাব, কেয়ামত আগমনের পূর্বে ফেরাউন তার দলবলসহ এ আজাবে ভুগছে। এ আজাব দেখেই তারা ছটফট করছে ও হা-হুতাশ করছে এ বলে যে। এ দোজখেই শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে। অতঃপর হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশের পর তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট সেই আসল শাস্তিই দেওয়া হবে। অর্থাৎ সে দোজখেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যার দৃশ্য তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সময় হতে আজ পর্যন্ত নিত্য দেখানো হচ্ছে এবং কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেখানো হবে।

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে-

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ـ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (بُخَارِىْ ، مُسْلِمْ وَالْمُسْنَدُ لِاَحْمَدَ)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তার শেষ অবস্থানস্থল দেখানো হয়ে থাকে। যদি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতের অবস্থান স্থল দেখানো হয়, অপরদিকে জাহান্নামি হলে জাহান্নামের অবস্থানস্থল দেখানো হয়। তাকে বলা হয় এটা সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ তোমাকে পুনর্জীবিত করার পর কেয়ামতের দিন তুমি যাবে। -[বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ]

তাফসীরে খাজেনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণিত রয়েছে-

اَرْوَاحُ اٰلِ فِرْعَوْنَ فِىْ اَجْوَافِ طُيُوْرٍ سُوْدٍ يُعْرَضُوْنَ عَلَى النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ تَغْدُوْ وَتَرُوْحُ اِلَى النَّارِ وَيُقَالُ يَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ـ هٰذِهٖ مَنَازِلُكُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ـ

ফেরআউন ও তার সমর্থকদের পাপাত্মাসমূহকে কালো পাখির আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় দুবার জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর জাহান্নামকে দেখিয়ে তাদেরকে বলা হয়- হে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা! এটাই তোমাদের ঠিকানা, আবাসস্থল। কেয়ামতের পর এখানেই তোমরা প্রবিষ্ট হবে।

কাজেই অত্র আয়াতও উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কবরে কাফেরদের এমনকি গুনাহগার পাপী ঈমানদারদেরও আজাব হবে। আর এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। অবশ্য মু'তাজিলাহ ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যকে উপেক্ষা করতঃ এর বিরোধিতা করে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের মতামত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কবরের আজাব সম্পর্কিত একটি অভিযোগ ও এর জবাব : বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আয়েশা (রা.) মদীনায় এক ইহুদি রমণীকে কিছু দান করেছিলেন। রমণীটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য দোয়া করল যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দান করেন। ঘটনাটি নবী করীম ﷺ -এর কর্ণগোচর হলো। নবী করীম ﷺ কবরের আজাবের কথা অস্বীকার করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বললেন যে, আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, কবরের আজাব সত্য।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আলোচ্য আয়াত দ্বারা কবরের আজাব সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে নবী করীম ﷺ কবরের আজাব কিভাবে অস্বীকার করলেন? কেননা এ আয়াতখানা তো মক্কী জীবনে নাজিল হয়েছে আর উপরিউক্ত ঘটনাটি ঘটেছে মদনী যুগে।

মুফাস্সিরগণ উপরিউক্ত প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন :

১. এ আয়াতে শুধুমাত্র ফেরাউন ও তার অনুসারীদের আজাবের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য কাফেরদের কবরে আজাব হবে কি-না তা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এজন্য নবী করীম ﷺ প্রথমতঃ মনে করেছিলেন যে, অন্যান্য কাফেরদের কবরে আজাব হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, অপরাপর কাফেরদেরকেও কবরে আজাব দেওয়া হবে।

২. আলোচ্য আয়াতে তো কাফেরদের কবর আজাবের কথা বলা হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ ঈমানদারগণের কবরের আজাবকে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, ঈমানদার পাপীদেরও কবরের আজাব হবে তখন তা সকলকে জানিয়ে দিলেন।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে কাফেরদের নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক হবে- তার উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াতে কাফেররা সাধারণতঃ দুই দলে বিভক্ত ছিল। নেতৃবৃন্দ ও অনুসারী বৃন্দ : প্রথমোক্ত প্রভাবশালী নিজেদের পার্থিব স্বার্থে শেষোক্ত দলকে ব্যবহার করেছে, তাদেরকে ফুসলিয়ে প্রলোভিত করে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গিয়েছে। তাদেরকে সত্যপন্থিদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে।

জাহান্নামের কঠোর আজাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেই দুর্বল অনুসারীরা নেতাদের নিকট ধরনা দেবে, তাদের মোড়ল মাতব্বর প্রধানদের বলবে- দুনিয়াতে তো আমরা তোমাদের কথায় উঠা-বসা করেছি। তোমাদেরই নির্দেশিত পথে চলেছি। আজ কি তোমরা আমাদের এ আগুনের অংশ বিশেষ বহন করবে, লাঘব করতে পারবে?

উত্তরে তাদের নেতারা বলবে- কি বলব বল- আমাদের সকলেরই পোড়া কপাল; আমাদেরকে আমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কিছুতেই তা হতে অব্যাহতি নেই। আমাদের সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই জাহান্নামে রয়েছি। আল্লাহ যে আমাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। তার বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক করার সাধ্য কারো নেই।

"وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ .... اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ" আয়াতদ্বয়ের বিস্তারিত তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা কাফের দোজখীদের জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য জান্নাতের প্রহরী ফেরেশতাদের কাছে আকুতি জানানোর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, ফেরেশতারা যেন তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেন। ইরশাদ হচ্ছে-

কাফের নেতা-নেত্রীদের থেকে নিরাশ হওয়ার পর দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের বলবে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ কর যেন তিনি অন্ততঃ একটি দিন আমাদের প্রতি আজাব লাঘব করেন। অর্থাৎ তারা বলতে চাইবে, এক দিবসের সময়ের সমান যদি আজাব মুলতবি রাখা হয় তবে তাও হবে আমাদের জন্যে বিরাট নিয়ামত।

আর দোজখীদের আলোচ্য ফরিয়াদের জবাবে ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ বৃথা, সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন যত আর্তনাদই করোনা কেন তোমাদের জন্যে তা উপকারি হবে না, আমরা তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারব না, আল্লাহ তা'আলার হুকুম তোমাদের শাস্তি বিধান করাই আমাদের কাজ। সুপারিশ বা অনুরোধ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। তোমাদের নিকট কি কোনো নবী-রাসূল আগমন করে নি? তাঁরা কি কোনো সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ মোজেজা প্রদর্শন করেন নি, তারা দোজখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ প্রদর্শন করেননি? তখন দোজখীরা বলবে, হ্যাঁ! অবশ্যই তাঁরা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মান্য করিনি; বরং তাঁদের বিরোধিতা করেছি। ফেরেশতাগণ তখন বলবেন, তাহলে এখন আর আক্ষেপ-অনুশোচনা করে কি লাভ?

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কাফেরদের দোয়া আখেরাতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত, আর ঈমান আনয়ন সম্ভব ছিল দুনিয়াতে, কিন্তু তারা তা করেনি।

তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন এজন্যে যে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার কারোই নেই।

اِنَّا لَنَنْصُرُ .... الْاَشْهَادُ আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফেররা দোজখে একে অন্যকে দোষারোপ করবে, লা'নত দেবে, পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথার উল্লেখ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রেরিত নবীগণকে এবং মু'মিনদেরকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন এবং আখেরাতেও। আর এ কথাও ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর রাহে যত সমস্যা দেখা দেয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তা সমাধা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতে ও রহমতে সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করেন। নবী-রাসূলগণকেই নয়; বরং তাদেরকে যারা সাহায্য করেন, আল্লাহ তা'আলা সে মু'মিনদেরকেও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এজন্যই নবী-রাসূলগণ যত বাধা-বিপত্তিরই সম্মুখীন হন না কেন, অবশেষে তাঁরা সাফল্য লাভ করেন। আর সত্যদ্রোহীদেরকে আল্লাহ তা'আলা শুধু যে ব্যর্থ করেন তাই নয়; বরং তাদের প্রতি লা'নত করেন অর্থাৎ তাদেরকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করেন।

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যদি আম্বিয়া (আ.)-কে বিরোধীদের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ সাহায্যই করতেন না কোনো নবী শহীদ হতেন আর না কেউ দেশত্যাগ করতেন। যেমন– হযরত ইয়াহইয়া, জাকারিয়া এবং শোআয়েব (আ.)-কে বিরোধীরা শহীদ করেছে আর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ বিরোধীদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) ইবনে জারীরের হাওলায় এর জবাব দিয়েছেন যে, এ আয়াতে সাহায্যের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতখানার অর্থ হবে নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণ ও ঈমানদার বান্দাগণ-এর পক্ষে কাফেরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি। চাই তাদের উপস্থিতিতে তাদের নিজের হাতে অথবা তাদের মৃত্যুর পর। আর এটা সকল নবী রাসূলগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং যেই সব জাতি নবী-রাসূলগণকে হত্যা করেছে তাঁদের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় কি ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তা কারো অজানা নয়। হযরত ইয়াহিয়া, যাকারিয়া ও শোআয়েব (আ.)-এর হত্যাকারীরা তাদের শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন। নমরুদকে আল্লাহ তা'আলা কি মর্মান্তিকভাবেই না হত্যা করেছেন। নবী করীম ﷺ -এর উপর যারা নির্যাতন করেছিল তাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা খোদ মুসলমানদের দ্বারাই শায়েস্তা করিয়ে ছেড়েছেন। পরিশেষে নবী করীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীরাই বিজয়ী হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা অধিকাংশ নবী রাসূলগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ দু'চারজন নবী-রাসূল ব্যতীত অধিকাংশ নবী-রাসূলগণই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভে ধন্য হন।

"يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ" দ্বারা উদ্দেশ্য এবং এটাকে يَوْمُ الْاَشْهَادِ বলার কারণ : আলোচ্যাংশে "يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ" দ্বারা কেয়ামতের দিবসকে বুঝানো হয়েছে।

আর اَشْهَادٌ হলো شَاهِدٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ সাক্ষীগণ। যেহেতু কেয়ামতের দিবসে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হবে সেহেতু উক্ত দিবসকে يَوْمُ الْاَشْهَادِ বলা হয়েছে।

সেদিন ফেরেশতা, নবী রাসূলগণ ও ঈমানদারগণ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। ফেরেশতাগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে বলবেন যে, তাঁরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেছেন। আল্লাহর বাণী ও দীনের দাওয়াত তাদের কওমের নিকট পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) তাদের উম্মতগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন এবং ঈমানদারগণ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا"

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– "وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ"

(১) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ (২) لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ :

আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার সমন্বয় : আলোচ্যাংশে প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'কেয়ামতের দিন জালিম তথা কাফেরদের ওজর পেশ করা তাদের কোনো উপকারে আসবে না।' আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে ওজর পেশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বাহ্যতঃ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।

মুফাসসির আল্লাম এর সমাধান পেশ করতে গিয়ে প্রথমোক্ত আয়াতটির তাবীল করেছেন। সুতরাং তারা এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, "যদি কেয়ামতের দিন কাফেরদের ওজর পেশকরার সুযোগ দেওয়াও হয় তাহলেও সেই ওজর পেশ করা তাদের কোনো উপকারে আসবেনা।" কিন্তু মূলত তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগই দেওয়া হবে না। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধিতার অবসান হলো।

অনুবাদ :

٥٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى التَّوْرَاةَ وَالْمُعْجِزَاتِ وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى الْكِتٰبَ التَّوْرَاةَ .

৫৩. আমি অবশ্যই হযরত মূসা (আ.)-কে হেদায়েত দান করেছি তাওরাত এবং মোজেজাসমূহ। আর বনু ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছি– হযরত মূসা (আ.)-এর পর আল-কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের।

٥٤. هُدًى هَادِيًا وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ تَذْكِرَةً لِاَصْحَابِ الْعُقُوْلِ .

৫৪. হেদায়েত– পথপ্রদর্শক এবং উপদেশ বিবেকবানদের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ।

٥٥. فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِنَصْرِ اَوْلِيَاۤئِهٖ حَقٌّ وَّاَنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ لِيُسْتَنَّ بِكَ وَسَبِّحْ صَلِّ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ هُوَ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ وَالْاِبْكَارِ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ .

৫৫. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন– হে মুহাম্মদ ﷺ! নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার তার বন্ধুদের সাহায্য করার ব্যাপারে সত্য আর– আপনি ও আপনার অনুসারীগণ আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর্গত– আপনি আপনার ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন– যাতে লোকেরা আপনার অনুসরণে ইস্তেগফার করতে পারে। আর আপনি তাসবীহ পাঠ করুন (অর্থাৎ) নামাজ পড়ুন সম্পৃক্ত হয়ে আপনার রবের প্রশংসাসহ বিকালে– সূর্য ঢলে যাওয়ার পরবর্তী সময়কে عَشِيٌّ বলে এবং সকালে (অর্থাৎ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে।

٥٦. اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيَاتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ بُرْهَانٍ اَتٰهُمْ لا اِنَّ مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ تَكَبُّرٌ وَطَمَعٌ اَنْ يَعْلُوْا عَلَيْكَ وَمَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ط فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط مِنْ شَرِّهِمْ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمْ الْبَصِيْرُ بِاَحْوَالِهِمْ .

৫৬. নিশ্চয় যারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে অর্থাৎ আল কুরআনের ব্যাপারে– দলিল ব্যতীত প্রমাণ ছাড়া তাদের নিকট অনুপস্থিত নেই তাদের অন্তরে তবে অহঙ্কার – দাম্ভিকতা এবং তোমার উপর বিজয়ী হওয়ার লোভ অথচ তারা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা– সুতরাং আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় পার্থনা করুন– তাদের অনিষ্ট হতে– নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা তাদের কথা-বার্তা এবং সর্বদ্রষ্টা তাদের অবস্থার।

٥٧. وَنَزَلَ فِيْ مُنْكِرِى الْبَعْثِ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِبْتِدَاۤءً اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَهِيَ الْاِعَادَةُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَيِ الْكُفَّارِ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَهُمْ كَالْاَعْمٰى وَمَنْ يَعْلَمُهٗ كَالْبَصِيْرِ .

৫৭. আর পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে– নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি প্রথমবার মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বিরাট কাজ– দ্বিতীয়বার আর তা হলো পুনরায় জীবিত করন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেররা তা অবগত নয়। সুতরাং তারা অন্ধের ন্যায়। আর যারা এটা অবগত রয়েছে তারা হলো চক্ষুষ্মান।

٥٨. وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَ لَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ هُوَ الْمُحْسِنُ وَلَا الْمُسِيْٓئُ فِيْهِ زِيَادَةُ لَا قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ تَذَكُّرُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا .

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না আর (সমান হতে পারে) না যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে তারা– অর্থাৎ মুহসিন সৎকর্মশীল এবং দুষ্কৃতিকারী সমান হতে পারে না– এখানে لَا অক্ষরটি অতিরিক্ত খুব কমই নসিহত কবুল করে থাকে– উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। تَتَذَكَّرُوْنَ শব্দটি ى -এর দ্বারা হতে পারে এবং ت যোগেও হতে পারে। অর্থাৎ তারা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

٥٩. اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا .

৫৯. নিশ্চয় কেয়ামত আসন্ন, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, সংশয় নেই কিন্তু এ বিষয়টি অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না– কেয়ামত সম্পর্কে।

٦٠. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اَىْ اُعْبُدُوْنِىْ اُثِبْكُمْ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعْدَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْخَاءِ وَبِالْعَكْسِ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ صَاغِرِيْنَ .

৬০. আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, শুধু আমাকেই তোমরা ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত কর। আমি তোমাদেরকে ছওয়াব প্রদান করব। এর পরবর্তী বাক্য দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদত হতে বিমুখ হয়। শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে– ى অক্ষরটি জবর বিশিষ্ট এবং خ অক্ষরটি পেশ বিশিষ্ট। আর এর বিপরীতে অর্থাৎ ى পেশ বিশিষ্ট এবং خ জবর বিশিষ্টও হতে পারে। জাহান্নামে অপমানিত অবস্থায়– লাঞ্ছিত হয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

নাহবী তারকীবে "اَتَاهُمْ" শব্দটির মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর পবিত্র বাণী- اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ -এর মধ্যে "اَتَاهُمْ" শব্দটি سُلْطَانٍ শব্দের সিফাত হয়েছে। আর سُلْطَانٌ শব্দটি غَيْرِ -এর মুযাফ ইলাইহি হওয়ায় মাজরূর হয়েছে। সুতরাং "اَتَاهُمْ" ও জুমলা হয়ে بِتَاوِيْلِ مُفْرَدٍ পূর্ববর্তী سُلْطَانٌ -এর সিফাত হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হবে।

"لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" বাক্যাংশটুকুর তারকীবে মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর বাণী– "لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" মুবতাদা, আর তৎপরবর্তী اَكْبَرُ الخ -এর خَبَرٌ সুতরাং مُبْتَدَا হওয়ার কারণে এটা مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

"اَسْتَجِبْ" শব্দটির তারকীবে মহল্লে ইরাব কি? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" এখানে اَسْتَجِبْ শব্দটি اُدْعُوْنِىْٓ আমরের [সীগার] জবাব হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে।

سَيَدْخُلُونَ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী- "سَيَدْخُلُونَ" -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে

১. سَيَدْخُلُونَ -এর ى অক্ষরটি যবরযোগে এবং خ অক্ষরটি হবে পেশযোগে। অর্থাৎ এটা بَاب نَصَرَ হতে مُضَارِعْ مَعْرُوْف -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ হবে। অর্থ হবে- শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে।

২. سَيُدْخَلُونَ -এর ى অক্ষরটি পেশ যোগে এবং خ অক্ষরটি যবরযোগে হবে। এ পরিসরে এটা بَاب نَصَرَ হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ হবে। অর্থ হবে "শীঘ্রই তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ..... بِاللّٰهِ আয়াতের শানে নুযূল : আল্লাহর বাণী- "إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الخ" ইহুদিদের শানে নাজিল হয়েছে। সুতরাং আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন যে, একবার কতিপয় ইহুদি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে অহেতুক দাজ্জাল সম্পর্কে তর্ক-বচসা জুড়ে দিল। তারা বলল যে, দাজ্জাল তাদের মধ্য হতেই আবির্ভূত হবে। তারা দাজ্জালের ব্যাপারটিকে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থাপন করল। কোনোরূপ দলিল প্রমাণ ছাড়াই তারা দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনায় বাড়াবাড়ি করতে লাগল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন- "إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰهُمْ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ الخ" নিশ্চয় যারা বিনা প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার আয়াতের ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে অহংকার পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে। তারা আপনার উপর বড়ত্ব জাহির করতে চায়। অথচ তাদের এ চাওয়া কোনো দিনও পূরণ হবে না। কোনো দিনও আপনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। তবে আপনি তাদের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কেননা তারা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে।

কা'বে আহবার (রা.) বলেছেন, এ আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। ইহুদি অপর দিকে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, এবং এটাকে অসম্ভব মনে করেছে তাদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে- "لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" অর্থাৎ তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এ বিশাল ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা কোনো কঠিন কাজ নয়। সুতরাং যখন তিনি আসমান-জমিনের এ বিশালতা স্বত্ত্বেও সেটাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন, এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

'وَلَقَدْ اٰتَيْنَا ...... الْبَابِ' আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে হেদায়েত দান করেছিলেন কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় সর্বশক্তি ব্যয় করেছে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক নিয়ে ফেরাউন তাঁর মোকাবিলা করেছে, কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফেরাউন ও তার দলবল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে অথচ বনী ইসরাঈলরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর হেদায়েত মেনে চললো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করলেন। তারা উন্নতি লাভ করল। এ দ্বারা এদিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'হে মুহাম্মদ! আপনার সাথেও আমি এরূপ আচরণই করব। আপনাকে মক্কানগরী ও কুরাইশ গোত্রের নবুয়তের জন্যে দাঁড় করিয়েছি। অতঃপর আমি আপনাকে আপনার অবস্থার উপর অসহায় একাকিত্বে ছেড়ে রাখি নি। এ জালিমরা আপনার প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার করবে তার সুযোগ রাখি নি; বরং আমার স্বীয় সত্তাই আপনার পৃষ্ঠপোষক। আপনাকে পথ দেখিয়ে অবশ্যই চরম সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেব। মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন- "আর আমি বনী ইসরাঈলকে তাওরাতের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। যা পথ-প্রদর্শক এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে তাতে উপদেশ। গুণী-জ্ঞানী লোকেরা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"

অর্থাৎ যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে অমান্যকারী লোকেরা, এ নিয়ামত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়েছে। আর তাঁর প্রতি আনুগত্য ঈমানদার বনূ ইসরাঈলদেরকে কিতাবের ধারক-বাহক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"فَاصْبِرْ اِنَّ .... وَالْاِبْكَارِ" আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন. এজন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনার সাফল্যকে প্রতিহত করার শক্তি কারোই হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে প্রিয় হাবীব! আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন অবশেষে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবেই। আল্লাহ তা'আলা যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। এর বিপরীত কখনো হবে না। হে রাসূল! আপনার বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত। তাছাড়া আপনার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অনুগামী উম্মতদিগকেও দুনিয়া আখেরাতে অসাধারণ মর্যাদা দান করবেন। তবে শর্ত হলো– আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ এবং প্রসন্নতা লাভের জন্য তাদেরকে সব ধরনের পরিস্থিতিতে সবরের উন্নত আদর্শ পেশ করতে হবে। যত ঝড় আসুক না কেন তাদেরকে সত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা নিবেদন, গুণ মহিমা কীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে।

মুসনাদে হিন্দ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) উল্লেখ করেছেন, নবী করীম ﷺ দিবা-রাত্রি শত শতবার ইস্তেগফার করতেন। প্রত্যেক মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি তার মর্যাদানুপাতে গুরুত্ব রাখে। সুতরাং সকলের পক্ষেই এ ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা অপরিহার্য।

কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে যেই পূর্বাপর পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ -কে ইস্তেগফার করার জন্য বলা হয়েছে তা চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে "ذَنْبٌ" বা অপরাধ বলতে ধৈর্যহীনতার সেই অবস্থা ও ভাবধারাকে বুঝানো হয়েছে যা কঠিন বিরুদ্ধতার পরিবেশে, বিশেষ করে নিজের অনুসারীদের নিপীড়িত অবস্থা দেখে নবী করীম ﷺ -এর মনে জেগে উঠেছিল। তিনি মনে মনে আকস্মিক মোজেজা মতো কিছু একটা দেখিয়ে কাফের সমাজকে ঈমানদার বানাতে চেয়েছিলেন। কিংবা অপেক্ষমান ছিলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে অনতিবিলম্বে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হোক যাতে বিরুদ্ধতার এ তুফান এসে যাবে। তাঁর মনের এ কামনা মূলত কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। সে জন্য বিশেষ কোনো তওবা ইস্তেগফারের প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ কে আল্লাহ তা'আলা যেই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছিলেন এবং সেই দিক বিবেচনায় রাসূল ﷺ -এর মন-মানসিকতা যতটা উন্নত হওয়ার কথা ছিল সে নিরিখে এই সামান্য ধৈর্যহীনতা ও তার মর্যাদার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা হানিকর মনে করেছিলেন। এ কারণে বলা হয়েছে যে, আপনি যে দুর্বলতা দেখালেন সে জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং পাহাড়ের মতো অটল হয়ে নিজের নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার মতো উচ্চ মর্যাদার লোকদের জন্য এটাই শোভনীয়।

"وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الخ" অর্থাৎ এ হামদ ও তাসবীহ তথা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনাই হলো এমন একটা উপায় যার দরুন আল্লাহর উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তারা আল্লাহর পথের যাবতীয় বাধা বিঘ্নসমূহের মোকাবিলা করার শক্তি লাভ করে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার দুটি অর্থ হতে পারে।

১. সব সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে থাকে।

২. উক্ত বিশেষ সময় সালাত আদায় করে।

দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে এ কথাটি দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর এ সূরাটি নাজিল হওয়ার কিছুকাল পরই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা আরবি ভাষায় عَشِيٌّ শব্দটি সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর হতে রাত্রের প্রাথমিক অংশ পর্যন্তকার সময়কে বলা হয়। আর এতে যোহর হতে ই'শা এ চার ওয়াক্ত সালাত শামিল রয়েছে। আর اِبْكَارٌ -এর দ্বারা পূর্বাকাশে আলো ফুটে উঠার পর হতে সূর্যোদয়কালীন সময়টিকে বুঝায়। এটা ফজরের সালাতের সময়।

নবী করীম ﷺ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অপরাধের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো কেন? : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এমনকি সকল নবীগণই নিষ্পাপ। তবুও এখানে কেন নবী করীম ﷺ কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ" আপনি আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"? মুফাসসিরে কেরাম (র.) এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

১. এর দ্বারা ইজতেহাদী ভুল [গবেষণাগত ভুল] কে বুঝানো হয়েছে। যা মূলত কোনো অপরাধ নয় (বরং ছওয়াবেরই কারণ)। তথাপি নবীর শানের খেলাফ হওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

২. এখানে ذَنْب এর পর مُضَاف اِلَيْه তথা اُمَّة শব্দ মাহজুফ রয়েছে। অর্থাৎ "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ اُمَّتِكَ" আপনার উম্মতের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩. এখানে ذَنْب -এর দ্বারা অপরাধ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো উত্তম পন্থা পরিহার করা। সুতরাং কোনো কোনো কাজে উত্তম পন্থা পরিহার করার কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. অপরাধের কারণ নয়; বরং উম্মতকে তা'লীম দেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ কে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেন নবী করীম ﷺ -এর অনুকরণে তাঁর উম্মত ইস্তেগফার করার পদ্ধতি শিখে নিতে পারেন। আর বলাই বাহুল্য যে, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া নবী করীম ﷺ -এর দায়িত্ব ছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ..... الْبَصِيْرُ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- যারা আল্লাহর কথায় তর্ক করতে যায়, আল্লাহর তাওহীদ, আসমানি কিতাব, পয়গাম্বরদের মোজেজা এবং হেদায়েত প্রভৃতি সম্বন্ধে অযথা কলহ করে। অমূলক ও ভিত্তিহীন কথার অবতারণা করতঃ সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়- তাদের হাতে যুক্তি প্রমাণ বলতে কিছুই নেই। উল্লিখিত বিষয়াদির সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। তবুও তারা বিরোধিতা করে। আসলে তাদের অহঙ্কারই এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশে প্রলুব্ধ করে। তারা নিজেকে পয়গাম্বরের অপেক্ষা উচ্চ এবং উন্নত মনে করে, পয়গাম্বরদের কথা মানতে তাদের সম্মুখে মাথা নত করতে তাদের অহংকার বাধে। তারা পয়গাম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা কমপক্ষে তাদের সমান এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন থাকতে চায়।

বলাবাহুল্য তাদের এ মনোবাঞ্ছা কস্মিনকালেও পূরণ হওয়ার নয়। কিছুতেই তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। তারা ভালো করেই জেনে রাখুক- একদা এই পয়গাম্বরের সম্মুখেই তাদের মাথা হেট করতে হবে। অন্যথায় চরম অপমান এবং দুর্ভোগ তাদের অদৃষ্টে অনিবার্য বলে জানবে।

দীন-ধর্ম এবং সত্যের এরূপ বিরুদ্ধাচারী শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর স্মরণ নেওয়া, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনাই কাম্য এবং সর্বাপেক্ষা অমোঘ অস্ত্র। অতএব, এরূপ পরিস্থিতিতে নির্দেশিত এই অস্ত্র ব্যবহারে যেন ভুল না হয়।

এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল রয়েছেন; বরং তারা যা কিছু বলছে এবং যা কিছু করছে সবই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত রয়েছেন। সুতরাং তিনি সময় মতো তাদের বিহিত ব্যবস্থা করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবেন না।

আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে কাফেরদের বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ : কাফেরদের দলিল ও যুক্তি-প্রমাণহীন বিরোধিতা এবং তাদের অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্কের আসল কারণ হলো, আল্লাহর আয়াতসমূহে যে সব মহাসত্য এবং মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর কথা তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে তা তাদের বোধগম্য হয় না বলেই তারা নিষ্ঠা সহকারে এটা বুঝার জন্য বুঝি এ সব তর্ক-বিতর্ক করছে; বরং এদের এরূপ আচরণের আসল কারণ হলো, তাদের বর্তমানে আরব দেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকৃত হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারাও এমন ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবে যার মোকাবিলায় তারা নিজেদেরকে সর্দারী লাভের অধিকতর যোগ্য মনে করত। এটা তাদের আত্মাভিমানের দরুন তারা বরদাশত করতে রাজি ছিল না। এ জন্যই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোনো কথাই বলতে না দেওয়ার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে কাজ করতেছিল। আর এ উদ্দেশ্যে হীন ও লজ্জাকর কাজ-কর্ম করতে ও উপায় অবলম্বন করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করত না।

তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ যাকে বড় বানিয়েছেন সে-ই বড় ও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে। আর এ ছোট লোকেরা নিজেদের বড়ত্ব কায়েম রাখার জন্য যেসব চেষ্টা করছে, তা সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। -[কুরতুবী]

পূর্বে আলোচ্য আয়াতে "اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الخ" -এর শানে নুযূলে বলা হয়েছে জনৈক ইহুদি দাজ্জাল সম্পর্কে নবী ﷺ-এর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, সুতরাং এখানে হাদীসের বর্ণনানুসারে দাজ্জালের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

দাজ্জাল প্রসঙ্গ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজে প্রিয়নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ঘটনার চেয়ে বড় আর কোনো ঘটনা ঘটবে না।

-[মুসলিম শরীফ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- এমন কোনো নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে মিথ্যুক, কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। খুব ভালো করে জেনে রাখ! দাজ্জাল কানা হবে (এক চক্ষু বিশিষ্ট) তোমাদের প্রতিপালক এমন নন। দাজ্জালের দু'চক্ষুর মধ্যখানে ك ف ر অর্থাৎ কাফের লেখা থাকবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলবনা? প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে (কিছু না কিছু) বলেছেন। নিঃসন্দেহে সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে, তার সঙ্গে জান্নাতও থাকবে এবং দোজখও থাকবে, সে যাকে জান্নাত বলবে আসলে তাই হবে দোজখ। আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করি, যেমন নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দাজ্জাল যখন বের হবে তখন তার সাথে পানিও থাকবে, অগ্নিও থাকবে। লোকেরা যে বস্তুকে পানি মনে করবে তা-ই হবে অগ্নি আর যে বস্তুকে অগ্নি মনে করবে তা-ই হবে সুশীতল মিষ্টি পানি। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দাজ্জালকে পায়, তার কর্তব্য হবে অগ্নির আকৃতিতে যা থাকবে তাতে ঝাঁপ দেওয়া, নিঃসন্দেহে তা হবে সুশীতল পবিত্র পানি।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত আরেকখানি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দাজ্জালের বাঁ দিকের চক্ষু থাকবে না, তার চুল হবে কোকড়ানো। তার সাথে জান্নাতও থাকবে এবং দোজখও। তার দোজখই প্রকৃত অবস্থায় হবে জান্নাত আর তার জান্নাত হবে আসলে দোজখ। -[মুসলিম শরীফ]

হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর সম্মুখে দাজ্জালের আলোচনা হয়। তখন তিনি ইরশাদ করেন, যদি দাজ্জাল আমার জীবদ্দশায় বের হয়ে আসে তবে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলা করবো। যদি আমার জীবদ্দশায় সে না বের হয় তবে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার মোকাবিলায় দায়িত্ব পালন করবে। তার চক্ষু ফুলে থাকবে, আমি তাকে আবদুল ওজ্জাহ ইবনে কতনের ন্যায় দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে পায় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করে তার প্রতি দম করে। এ আয়াত সমূহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে রক্ষাকবচ হবে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যস্থল থেকে বের হবে। ডানে বামে অনেক কিছু ধ্বংস করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অবিচল থেক। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে কতদিন জমিনে অবস্থান করবে? তিনি ইরশাদ করেন, চল্লিশ দিন, তবে তার একদিন এক বছরের সমান হবে। আর একদিন এক মাসের সমান হবে, আর একদিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর বাকি দিনগুলো স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনগুলোর সমান হবে। আমরা আরজ করলাম যেদিন এক বছরের সমান হবে সেদিন কি আমাদের একদিনের নামাজ যথেষ্ট হবে। তিনি ইরশাদ করলেন: না; বরং তোমরা সময়ের হিসাব করে নেবে। প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। এভাবে এক বছরের সমান নামাজ তথা আঠারশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দাজ্জাল যখন বের হবে তখন একজন ঈমানদার ব্যক্তি সম্মুখের দিক থেকে তার দিকে আসবে, দাজ্জালের প্রহরী ঐ মু'মিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? মু'মিন বলবে, ঐ ব্যক্তির নিকট যেতে চাই যে বের হয়েছে। প্রহরী বলবে, আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? মু'মিন বলবে, আমাদের প্রতিপালকের নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই। প্রহরী বলবে, এ ব্যক্তিকে হত্যা কর। তখন তাদের মধ্যে একজন বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কি এ আদেশ দেননি যে আমার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না। একথা শ্রবণ করে ঐ প্রহরী মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না; বরং তাকে নিয়ে দাজ্জালের নিকট চলে যাবে। মু'মিন দাজ্জালকে দেখেই বলবে, হে লোক সকল! এই হলো সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন। তখন দাজ্জাল আদেশ দেবে, এ লোকটির মাথা ভেঙ্গে দাও। হুকুম মোতাবেক লোকেরা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তির উদর এবং পৃষ্ঠদেশ চিরে ফেলবে। দাজ্জাল বলবে, তুমি এখনো আমার প্রতি ঈমান আনবেনা? মু'মিন বলবে, তুমি প্রতারক, তুমি মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল আদেশ দেবে একে করাত দিয়ে চিরে ফেল। দজ্জালের লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে শরীরের মধ্যখান দিয়ে চিরে ফেলবে। এরপর দাজ্জাল তার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে বলবে, উঠ মু'মিন জীবিত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মু'মিন জীবিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, দাজ্জাল তখন বলবে, এখন তো তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে। মু'মিন বলবে, এখন তো তোমার সম্পর্কে আমার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে তুই-ই দাজ্জাল। এরপর মু'মিন বলবে, হে লোক সকল! শোন, আমার পর এ দাজ্জাল আর কারো সঙ্গে এ ব্যবহার করতে পারবে না। দাজ্জাল ঐ মু'মিন ব্যক্তিকে জবাই করতে চেষ্টা করবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার গর্দানকে তাম্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে দেবেন, ফলে ছুরি বা তলোয়ার কার্যকর হবে না। যখন দাজ্জাল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে তখন সে আদেশ দেবে, তার হাত-পা বেঁধে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছে। বাস্তব অবস্থা এই যে, সে জান্নাতে থাকবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সে সবচেয়ে বড় শহীদ বলে পরিগণিত হবে। -[মুসলিম শরীফ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: ইস্পাহান নামক স্থানে সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে, আর তারা খুব মূল্যবান চাদর পরিহিত থাকবে অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হবে। -[মুসলিম শরীফ]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দজ্জাল মদীনা শরীফে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে কিন্তু মদীনা শরীফে প্রবেশ তার জন্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এজন্যে মদীনা শরীফের নিকটস্থ কোনো মরুভূমিতে সে অবতরণ করবে। এক ব্যক্তি যে তখন অত্যন্ত উত্তম হবে, মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে তার নিকটে পৌঁছবে, দাজ্জাল বলবে, আমি যদি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে দ্বিতীয়বার জীবিত করে দেই তবুও কি তোমরা আমার কথায় সন্দেহ করবে? লোকেরা বলবে, আল্লাহর শপথ! আজ থেকে অধিক পরিমাণে তোর সম্পর্কে আমার জ্ঞান কখনো হয়নি। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে কিন্তু ব্যর্থ হবে। -বুখারী, মুসলিম

হযরত আবূ বকর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাজ্জালের কোনো প্রকার প্রভাব মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করবেনা। সেদিন মদীনা মনাওয়ারার সাতটি দ্বার হবে। প্রত্যেক দ্বারে দু'জন ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাজ্জাল একটি প্রাচ্য দেশ থেকে যাকে খোরাসান বলা হয়, বের হবে, তার অনেক অনুসারী থাকবে। -[তিরমিযী]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মুকুটধারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি দাজ্জালের অনুসারী হবে। লোকেরা তার পেছনে পেছনে চলতে থাকবে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেদিন সত্তর হাজার ইহুদি মুকুটধারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাজ্জালের অনুসারী হবে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী ﷺ আমার গৃহে তশরিফ আনয়ন করেন, সেখানে দাজ্জালের আলোচনা হয়, তিনি ইরশাদ করেন, দাজ্জালের সম্মুখে তিন বছর এমন আসবে যে এক বছর তো আসমান থেকে তিন ভাগের একভাগ বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে, আর জমিনের এক তৃতীয়াংশে ফসল উৎপন্ন হবে না; দ্বিতীয় বছর দু'তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং জমিনেও ফসল দু'তৃতীয়াংশ কম উৎপন্ন হবে। আর তৃতীয় বছর এক ফোটা বৃষ্টিও হবে না এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে; সমস্ত জীব-জন্তু মারা যাবে; দাজ্জালের তরফ থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ফেতনা হবে যে, সে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট যাবে এবং বলবে, যদি আমি তোমার উটগুলো জীবিত করে দেই, এরপরও কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবে না? সে গ্রাম্য ব্যক্তিটি বলবে, কেন নয়? তখন দজ্জাল শয়তানদেরকে উষ্ট্রের আকৃতি দেবে; এক ব্যক্তির ভ্রাতা এবং পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, দাজ্জাল সে ব্যক্তিকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা এবং ভ্রাতাকে জীবিত করে দেই তবু কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবেনা? সে বলবে, কেন নয়? তখন দাজ্জাল শয়তানদেরকে তার পিতা এবং ভ্রাতার আকৃতি দিয়ে উপস্থিত করবে; এ কথা বলার পর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর নিজস্ব কোনো কাজে তশরিফ নিয়ে যান; কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন, লোকদেরকে দেখলেন যে, তারা চিন্তিত, তখন তিনি ঘরের দরজার পাল্লা ধরে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসমা! কি হয়েছে! আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা শুনে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, যদি সে আমার জীবদ্দশায় আসে তবে আমি তার মোকাবিলা করবো। অন্যথায় প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নেগাহবান। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আটা তৈরি করি কিন্তু রুটি তৈরির আগেই ক্ষুধার্ত হয়ে যাই। এমন পরিস্থিতিতে সেদিন মু'মিনদের কী অবস্থা হবে? তখন ﷺ ইরশাদ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার নামের তসবীহ পাঠ মু'মিনদের জন্যে যথেষ্ট হবে, যেমন আসমানের অধিবাসীদের জন্যে যথেষ্ট হয়। [অর্থাৎ রুটি, পানির তখন প্রয়োজনই হবে না]। -[আহমদ ও বাগভী]

হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে এত বেশি জিজ্ঞেস করেছি যা আর কেউ করেনি। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমি আরজ করলাম লোকেরা বলে, দাজ্জালের সঙ্গে রুটির পাহাড় এবং পানির সমুদ্র চলমান থাকবে; তিনি তখন ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্যে এ কাজটি আরো সহজ।

"لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ ...... لَا يَعْلَمُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আপাতঃ দৃষ্টিতে আসমান-জমিনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা শতগুণে বড় স্বীকার করতে হয়। সুতরাং যে সর্বশক্তিমান আসমান-জমিনের ন্যায় বিশাল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এ ক্ষুদ্রায়তন মানুষকে প্রথম বারে অথবা মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করতে বাধা কোথায়? তাজ্জবের বিষয় এমন সুস্পষ্ট সত্যকেও অনেকে বুঝতে পারে না।

এখানে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যেসব মহা সত্য মেনে নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত কথা, তা মেনে নেওয়াতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। আর তাকে অমান্য করা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম পরকাল সম্পর্কিত আকীদাকে পেশ করে তার স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা এ আকীদার কারণেই সর্বাপেক্ষা বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। তাকে তারা দুর্বোধ্য ও অনুধাবনের অতীত মনে করেছিল।

এ আয়াতখানা পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার দলিল : যেসব ইসলামি আকীদার সাথে তৎকালীন কাফের-মুশরিকদের লালিত আকীদার সংঘর্ষ বেঁধেছিল এটা তাদের অন্যতম। কাফেরদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জীবিত হয়ে উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যে সব লোক এ ধরনের কথা-বার্তা বলে প্রকৃতপক্ষে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। তাদের যদি বুদ্ধি থাকত তথা যেই বুদ্ধি আছে তা যদি কাজে লাগাত, তাহলে এ কথা বুঝতে পারা তাদের জন্য মোটেই কঠিন হতো না যে, যে মহান আল্লাহ এই বিরাট বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি মোটেই কঠিন কাজ নয়।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ ..... مَا تَتَذَكَّرُونَ **আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর :** যারা আখেরাতের সম্ভাব্যতা, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার বিষয় অনুধাবন করতে পারে না– তারা মূলতঃ অন্ধ, তাদের জ্ঞান চক্ষুর আলো হারিয়ে গেছে। অপর পক্ষে যারা তা বুঝতে সক্ষম তারা হলো চক্ষুষ্মান। সুতরাং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কোনোদিন এক সমান হতে পারে না। তদ্রূপ ঈমানদার এবং কাফেরও সমপর্যায়ের হতে পারে না। মূলতঃ কাফেররা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে।

মোদ্দাকথা, একজন অন্ধ, যে সরল পথটিও দেখতে পায় না, আর একজন দৃষ্টি সম্পন্ন লোক যে স্বচক্ষে সরল-সঠিক পথ দেখে চলে, উভয় কি কখনো সমান হতে পারে? কিংবা ঈমানদার সাধু সজ্জন এবং অসৎ প্রবৃত্তির কাফের কখনো এক হতে পারে? যদি তা না হয় তাহলে একান্ত ন্যায়বিচারের খাতিরেই একদা সকলকে পৃথক পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করতঃ তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান এবং প্রভেদ প্রকাশ করে দেওয়ার প্রয়োজন কোনো ন্যায়দর্শী বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই অস্বীকার করতে পারে না। বলাবাহুল্য এ অনিবার্য প্রয়োজনই কেয়ামতের এবং বিচারদিনের আয়োজনে বাধ্য করেছে।

إِنَّ السَّاعَةَ ..... لَا يُؤْمِنُونَ **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, কেয়ামত অবশ্যই আসবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকজনই তা বিশ্বাস করে না।

আলোচ্য আয়াতখানা, কিয়ামতের সুস্পষ্ট দলিল। পূর্ববর্তী বাক্যে কেয়ামতের সম্ভাব্যতার উপর দলিল পেশ করা হয়েছিল। আর এ বাক্যে বলা হচ্ছে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

জ্ঞান, বিবেক ও ইনসাফের এটাই দাবি, পরকাল হতেই হবে। এটা না হওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও ইনসাফের বিপরীত। মূলত যারা অন্ধভাবে জীবন-যাপন করে এবং নিজেদের খারাপ চরিত্র ও দুষ্কৃতিসমূহের দ্বারা আল্লাহর জমিনকে ফেতনা-ফ্যাসাদে ভরে দেয়। তারা তাদের এ অনাচারের কোনো খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে না, অপরদিকে দুনিয়ায় যারা চক্ষু খুলে চলাফেরা করে ও ঈমান এনে নেক আমল করে, তারা তাদের এ ভালো আচরণের কোনো ভাল ফল দেখা হতে বঞ্চিত থাকবে। কোনো বুদ্ধিমান মানুষই কি তা মেনে নিতে পারে? এটা তো সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের বিপরীত। সুতরাং এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, পরকালে অস্বীকার করা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের বিপরীতই হবে। কেননা পরকাল না হওয়ার অর্থ ভালো-মন্দ সকল মানুষই মরে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। উভয় একইরূপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। এতে কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফেরই বিরোধিতা হয় না, নৈতিক চরিত্রের ও মূল শিকড় কেটে যায়। কেননা ভালো ও মন্দ লোকের পরিণতি এক ও অভিন্ন হলে খারাপ চরিত্রের লোককেই বড় বুদ্ধিমান মেনে নিতে হয়। এ জন্য যে, সে মৃত্যুর পূর্বে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নিয়েছে। অপরদিকে ভাল চরিত্রের লোককে বড়ই নির্বোধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। কেননা সে খামাখাই নিজের উপর নানাবিধ নৈতিক বাঁধন চাপিয়ে নিয়েছে এবং নিজেকে তার অধীনে পরিচালিত করে নিজের জীবনকে অহেতুক কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

'وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي الخ' **আয়াতখানার ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, তোমরা অন্যান্যদের কেন ডাকতে যাবে, তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো স্বতন্ত্র ক্ষমতা কিংবা আদৌ ক্ষমতাই যাদের নেই, তাদের ডেকে কি লাভ? তোমরা শুধু আমাকেই ডাকো। আমারই কাছে তোমাদের মিনতি জানাও। আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব। তোমাদের মিনতি মঞ্জুর করব, আর তা করার ক্ষমতা একমাত্র আমারই রয়েছে।

আল্লাহর দরবারে মিনতি এবং প্রার্থনাও তাঁর বন্দেগী তথা উপাসনার অন্তর্গত। যারা অহংকারের বশে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী হতে বিমুখ থাকে, তাদের কল্যাণ নেই, মঙ্গল নেই, তারা চরম অপমানের সঙ্গে জাহান্নামের কারাগারে প্রবেশ করবে।

দোয়ার হাকীকত : دُعَاءٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো, আহ্বান করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনো আল্লাহ তা'আলার সাধারণ স্মরণকেও দোয়া বলা হয়ে থাকে। অত্র আয়াত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা এতে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে দোয়া করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে তা কবুল হওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি যারা দোয়া করবে না তাদেরকে আজাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ" অর্থাৎ ইবাদতই হলো দোয়া আর দলিল স্বরূপ তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- "إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ الخ" অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত বা দোয়া হতে বিমুখ হয় তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হযরত কাতাদাহ (র.) কা'বে আহ্বার (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী যুগে এ বৈশিষ্ট্য নবীগণ (আ.)-এর জন্য খাস ছিল। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য একে আম [ব্যাপক] করে দেওয়া হয়েছে।

দোয়া এবং ইবাদতের তাৎপর্য : মূলত: দোয়া এবং ইবাদতের মর্ম কাছাকাছি, পাশাপাশি। আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে কিছু চাওয়া হলো দোয়া, আর আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মিনতি প্রকাশ করা হলো ইবাদত। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের জন্যে শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করা, অন্যকোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করাই হলো বন্দেগীর পরিপূর্ণ রূপ।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজনের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দরবারে চায় এমনকি, যদি তাদের জুতোর ফিতাও ছিড়ে যায় তা-ও তারা আল্লাহর কাছেই চায়। -[তিরমিযী শরীফ]

আর হযরত সাবেত বুনানীর (র.) বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি তারা লবণও আল্লাহ তা'আলার নিকটই চায়।

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- দোয়া ইবাদত, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে- "اَلْكَرَمُ هُوَ التَّقْوٰى وَالْحَسَبُ هُوَ الْإِيْمَانُ"

[পরহেজগারীই সম্মান, পরহেজগারী ব্যতীত কোনো সম্মান নেই, আর ঈমানই হলো বংশ, ঈমান ব্যতীত কোনো বংশ পরিচয় নেই।]

আলোচ্য হাদীসেরও এ অর্থই হতে পারে (১) দোয়াই ইবাদত (২) ইবাদতই দোয়া। হয়তো এর তাৎপর্য হলো দোয়া এবং ইবাদতের মর্মকথা একই, কেননা প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতেই থাকে দোয়া। আর দোয়া ও ইবাদতের যোগ্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ নয়, যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ"

'আর আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করো না।'

যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার নিকট চাওয়ার স্থলে আমার প্রশংসায় মশগুল থাকে তাকে আমি সে ব্যক্তির চেয়ে বেশি দান করি যে আমার নিকট চেয়ে থাকে।

তিরমিযী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, [আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন] যে ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত আমার জিকির এবং আমার নিকট চাওয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে এমন দান করি, যেটা যারা চেয়ে থাকে তাদের চেয়ে উত্তম হয়।

এ পৃথিবীতে মানুষ নানা প্রয়োজনের জিঞ্জিরে আবদ্ধ, তাই মানুষকে সর্বদা নিজের প্রয়োজনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকতে হয়, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় কিন্তু তার গৃহীত ব্যবস্থা সর্বদা যে সফল হবে এমনও নয়, তাই কোনো উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যা একান্ত জরুরি তা হলো, ঐ একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করা। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করার শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা প্রকাশ্যে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার মর্জির উপর। অতএব, কোনো কাজের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা-তদবির যেমন জরুরি, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করাও একান্ত জরুরি।

দোয়ার ফজিলত ও মাহাত্ম্য : হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। -[তিরমিযী শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর দান প্রাপ্তির জন্যে আরজি পেশ কর, কেননা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যেন তাঁর নিকট আরজি পেশ করা হয়। আর উত্তম ইবাদত হলো আল্লাহ তা'আলার দানের অপেক্ষা করা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চায় না আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর এজন্যই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

"নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে তারা অপমানিত অবস্থায় দোজখে প্রবেশ করবে।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দোয়া করার ব্যাপারে দুর্বলতার পরিচয় দিও না, কেননা দোয়ার বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধ্বংস করেন না। -[ইবনে হাব্বান ও হাকেম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- দোয়া হলো মু'মিনের হাতিয়ার, দীন ইসলামের খুঁটি, আসমান ও জমিনের নূর। -[হাকিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- যার জন্যে দোয়ার দুয়ার খোলা হয়েছে তার জন্যে রহমতের দুয়ারও খুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে যা কিছু চাওয়া হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো, সর্বপ্রকার বালা-মসিবত থেকে নিরাপত্তার জন্যে আরজি পেশ করা। -[তিরমিযী]

দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমাদের মধ্যে যার জন্যে দোয়ার দরজা খোলা হয়েছে তার জন্যে কবুলিয়তের দরজাও খোলা হয়েছে। -[ইবনে আবি শায়বা]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল, যখন বান্দা হাত তুলে তাঁর কাছে কিছু চায়, তখন বান্দাকে শূন্য হস্তে ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- যদি কোনো মুসলমান এমন দোয়া করে যাতে গুনাহের কোনো কথা না থাকে এবং কোনো আত্মীয়তার হক্ব বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা না থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর একটি অবশ্যই দান করেন।

১. তার দোয়া অনতিবিলম্বে কবুল করা হয়।

২. অথবা আখেরাতে তাকে দান করার জন্যে তার দোয়া সংরক্ষিত থাকে।

৩. তার কাম্য বস্তুর সমান কোনো বিপদ তার উপর থেকে দূর করে দেওয়া হয়।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি আমরা অনেক দোয়া করি তবুও আমরা এর বিনিময় পাব? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক কিছু আছে, তিনি অবশ্যই দান করবেন। -[আহমদ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- যদি দোয়াতে গুনাহ অথবা আত্মীয়তার হক্ব নষ্ট করার কোনো কথা না থাকে তবে বান্দার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। তবে শর্ত হলো সে যদি দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া না করে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ পর্যায়ে তাড়াহুড়া করার তাৎপর্য কি? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, বান্দা বলতে থাকে, আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি (অর্থাৎ বার বার দোয়া করেছি) কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখি না। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়। (অর্থাৎ দোয়া অব্যাহত রাখা জরুরি, কখনো কাম্য বস্তুর জন্যে তাড়াহুড়া করা সমীচীন নয়। যখন আল্লাহ তা'আলার মর্জি হবে তখনই তিনি দান করবেন। -[মুসলিম শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- দোয়া সেই বিপদাপদের ব্যাপারেও উপকারী হয় যা এখনও আপতিত হয়নি তবে ভবিষ্যতে হবে। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা সর্বদা দোয়া করতে থাক।
-[তিরমিযী শরীফ]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল এবং হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করে আল্লাহ তা'আলা তার আরজি কবুল করেন, অথবা তার দোয়ার সমান কোনো বিপদ দূর করে দেন। অবশ্য এর জন্যে শর্ত রয়েছে, দোয়াতে যেন কোনো গুনাহের কথা না থাকে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্ট করারও কোনো কথা না থাকে। -[তিরমিযী]

যাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয় : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তিনটি দোয়া কবুল হয়, যে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ১. পিতার দোয়া (সন্তান-সন্ততির জন্যে), ২. মজলুমের দোয়া (জালেমের বিরুদ্ধে), ৩. মুসাফিরের দোয়া। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।

১. রোজাদারের দোয়া, ইফতারের সময়।

২. ন্যায়বিচারক রাষ্ট্রনায়কের দোয়া।

৩. মজলুমের দোয়া। মজলুমের বদদোয়া মেঘমালার উপর উঠানো হয়, তার জন্যে আসমানের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও কিছু সময় পরে হোক। -[তিরমিযী]

হযরত আবূ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: কোনো মুসলমান তার মুসলমানের ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে যে দোয়া করে তা কবুল হয়। যখন সে তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে দোয়া করে তখন তার নিকটবর্তী ফেরেশতা আমীন বলে অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলা যেন তাই করে দেন আর তোমার জন্যেও এমনটি যেন হয়।

-[মুসলিম শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন: কয়েকটি দোয়া কবুল হয়ে থাকে যেমন- ১. মজলুমের দোয়া প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত, ২. হাজীর দোয়া বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত, ৩. রুগ্ন ব্যক্তির দোয়া সুস্থ হওয়া পর্যন্ত, ৪. কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন- সর্বাধিক শীঘ্র যে দোয়া কবুল হয় তা হলো, কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে অন্য মুসলমান ভাইয়ের দোয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: সর্বাধিক শীঘ্র যে দোয়া কবুল হয় তা হলো, কোনো অনুপস্থিত মুসলমান ভাইয়ের জন্যে দোয়া। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তসমূহ :

১. পানাহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে হারাম বস্তুসমূহ পরিহার করা এক কথায় যাবতীয় বিষয়ে হারাম পন্থা পরিহার করা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: মানুষ সুদীর্ঘ সফর করে, তার চুল থাকে এলোমেলো, বালু মিশ্রিত, এমন অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত তুলে এবং বলে, হে পরওয়ারদেগার! হে পরওয়ারদেগার! কিন্তু তার খাবার হারাম পন্থায় অর্জিত, পোষাক পরিচ্ছদও হারাম পন্থায় রোজগার করা এবং তার প্রতিপালনও হয়েছে হারাম রোজগার দ্বারা। এমন অবস্থায় দোয়া কিভাবে কবুল হবে? -[মুসলিম শরীফ]

২. দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে আরেকটি শর্ত হলো, দোয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে মনকে হাজির করতে হবে অর্থাৎ দোয়া শুধু মৌখিক হবে না; বরং তা আন্তরিক হতে হবে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস বা একীন নিয়ে দোয়া কর, মনে রেখ গাফেল অন্তরের দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। -[তিরমিযী শরীফ]

৩. কোনো ব্যাপারে দোয়া করতে হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দোয়া করে, সে যেন এভাবে না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে মাফ করে দিও'; বরং সংকল্পের সুদৃঢ়তা বজায় রেখে পূর্ণ একীন নিয়ে এবং মনের আগ্রহ নিয়ে দোয়া করবে [অর্থাৎ এ বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন।] কেননা আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দান করেন তা তাঁর নিকট বড় কিছু হয় না। -[মুসলিম শরীফ]

দোয়ার আদব : হযরত ফোজালা ইবনে ওবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী ﷺ মসজিদে অবস্থান করেছিলেন, এক ব্যক্তি আগমন করল এবং নামাজ আদায়ের পর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিও এবং আমার প্রতি রহম কর। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে নামাজি! তুমি (দোয়া করার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করে ফেলেছ, যখন তুমি নামাজ আদায় করলে, এরপর বসে যাবে, এরপর আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির উল্লেখ করে তুমি তাঁর শানে হামদ পেশ করবে, এরপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, এরপর তুমি দোয়া করবে। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুক্ষণ পর অন্য এক ব্যক্তি এসে নামাজ আদায় করল, নামাজ আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ পেশ করল, এরপর নবী করীম ﷺ -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করল, তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নামাজ আদায় করেছিলাম, যখন আমার নামাজের শেষ বৈঠক পূর্ণ করলাম, তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার শানে হামদ পেশ করলাম, এরপর নবী করীম ﷺ -এর প্রতি দরূদ পেশ করে দোয়া করলাম, তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন- তোমার যা ইচ্ছা দরবারে এলাহীতে চাও তোমাকে দান করা হবে।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, আসমান জমিনের মধ্যে দোয়াকে থামিয়ে রাখা হয় যতক্ষণ তুমি প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি দরূদ পাঠ না কর, দোয়ার কোনো অংশ উর্ধ্বে গমন করে না। -[তিরমিযী]

হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া কর তখন হাতকে ছেড়ে দোয়া করবে, হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে দোয়া করো না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তোমরা হাত খুলে দোয়া কর, হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে দোয়া করো না। আর দোয়া শেষ করে দু'হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নিও।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ দোয়াতে উভয় হাত উঠাতেন, যতক্ষণ মুখমণ্ডলে হাতগুলো ফিরে না নিতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত নিচে নামাতেন না। -[তিরমিযী শরীফ]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ অর্থপূর্ণ ভাষায় দোয়া করা পছন্দ করতেন, আর অন্য শব্দগুলো পরিহার করতেন। -[আবূ দাউদ শরীফ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ দোয়ার সময় এতখানি হাত উঠাতেন যে দু'বগলের সাদা অংশ দেখা যেত।

সায়েব ইবনে এজিদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দোয়া করতেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন।

হযরত ইকরামা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দোয়ার অবস্থা হলো এই, তোমরা দোয়ায় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলবে। -[আবূ দাউদ শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, (দোয়াতে) নির্দিষ্ট স্থানের উপর হাত তোলা বিদআত। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বক্ষ বরাবর হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন, তদুর্ধ্বে উত্তোলন করতেন না।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ যদি কারো নাম উল্লেখ করতেন তবে তার জন্যে দোয়া করতেন। এ পর্যায়ে শুরুতে নিজের জন্যে দোয়া করতেন। -[তিরমিযী]

قَوْلُهُ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের প্রতি আমরা কুরবান হয়ে যাই যে, তিনি আমাদেরকে দোয়া করার হেদায়েত করেছেন এবং দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জন্যে বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) নিজের দোয়ায় একথা বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি সেই পবিত্র সত্তা, যার দরবারে ঐ বান্দা প্রিয় যে অধিক পরিমাণে দোয়া করে। আর সে বান্দা অপ্রিয় যে দোয়া করে না অথচ মানুষের চরিত্র হলো এই যে, তার নিকট চাওয়া হলে সে অসন্তুষ্ট হয়।

হযরত কাব আহবার (রা.) বর্ণনা করেন, এ উম্মতকে তিনটি এমন জিনিস দান করা হয়েছে যা অন্য কোনো উম্মতকে ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার উম্মতের উপর সাক্ষী হিসেবে থাক, কিন্তু সমগ্র মানব জাতির উপর আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে সাক্ষী করেছেন। পূর্বকালের নবীগণকে বলা হতো যে, দীন ইসলামে কোনো সংকীর্ণতা নেই আর এ উম্মতকে বলা হয়েছে, তোমাদের ধর্মে কোনো ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রত্যেক নবীকে বলা হতো, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাক কবুল করবো কিন্তু এ উম্মতকে বলা হয়েছে তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

আবূ ইয়া'লাতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলেছেন যে, চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি আমার জন্যে এবং একটি আপনার জন্যে, আর একটি আপনার এবং আমার মধ্যে। আর একটি হলো আপনার এবং অন্যান্য বন্দাদের মধ্যে। যে চরিত্রটি বিশেষ করে আমার জন্যে তা হলো শুধু আমারই বন্দেগী কর, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর যা শুধু আপনার তা হলো, আপনার প্রত্যেক ভালো কাজের আমি পরিপূর্ণ বদলা দেব। আর যা আমার এবং আপনার মাঝে রয়েছে তা হলো আপনি দোয়া করবেন, আমি কবুল করবো। আর যে চরিত্রটি আপনার এবং আমার অন্যান্য বান্দাদের মধ্যে রয়েছে তা হলো, আপনি তাদের জন্যে তাই পছন্দ করবেন, যা নিজের জন্যে পছন্দ করেন। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: দোয়া হলো ইবাদতের মূলকথা, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

মুসনাদে আহমদে আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা আনসারী (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর তরবারির খাপ থেকে একটি ছোট কাগজ বের হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, তুমি তোমার প্রতিপালকের রহমতের সময়গুলোর সন্ধান করতে থাক, হয়তো এমন সময় তুমি দোয়া করবে যখন তাঁর রহমত উপচে পড়বে। আর সে সুযোগে হয়তো তুমি এমন কল্যাণ লাভ করবে যার পর আর কখনো তোমার কোনো প্রকার আক্ষেপ থাকবে না।

উক্ত আয়াতখানা একটি হাদীসে কুদসীর বিরোধী, সুতরাং এর জবাব কি? অত্র আয়াত- اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ الخ -এর মধ্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য বলা হয়েছে এবং যারা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করা হতে বিমুখ থাকে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

অথচ হাদীসে কুদসীতে এসেছে- "مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ" অর্থাৎ যে আমার নিকট প্রার্থনা করা হতে বিমুখ থেকে আমার স্মরণে মশগুল থাকে আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের হতে উত্তম বস্তু দান করি।

আপাতঃদৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত ও উক্ত হাদীসখানা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মনে হয়। কিন্তু মূলত এদের মধ্যে কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। মুফাস্সিরগণ নিম্নোক্তভাবে আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার বাহ্যিক বিরোধ অবসানের চেষ্টা করেছেন :

১. উক্ত আয়াতে দোয়া দ্বারা মূলত ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং জালালাইনের মুফাসসির (র.) "اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" -এর তাফসীরে বলেছেন- "اُعْبُدُوْنِىْ اُثِبْكُمْ" তোমরা আমার ইবাদত কর, আমি তোমাদের ছাওয়াব দান করব। অপরদিকে উল্লিখিত হাদীসে কুদসীতে যেই 'ذِكْر' বা স্মরণের কথা বলা হয়েছে তাও ইবাদত। অতএব, আয়াত ও হাদীসের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই।

২. আর যদি আয়াতে "اُدْعُوْنِىْ" -এর দ্বারা দোয়ার অর্থও গ্রহণ করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা ওয়াজিব মনে হলেও মূলতঃ দোয়া করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব- এটাই ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত। তবে এ আয়াতে যে দোয়া পরিত্যাগকারী জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে নিজেকে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী মনে করে দাম্ভিকতার সাথে তাঁর নিকট দোয়া করা হতে বিরত থাকে। এটা কুফরের আলামত। এ কারণেই সে জাহান্নামী হবে।

মোটকথা, দোয়া- যা মোস্তাহাব- তা হতে আল্লাহর স্মরণে মশগুল ও বিভোর থাকা অবশ্যই উত্তম। কেননা আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণের মাধ্যমে মা'রিফাতে ইলাহী তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়। তবে তা হলো বিশেষ স্তরের লোকদের জন্য যারা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী- 'আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য তাদের জন্য। অন্যথায় আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করাই উত্তম। উদাহরণতঃ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করার পরিবর্তে তাঁর ধ্যানে তপস্যায় রত ছিলেন। কিন্তু এখন বিপদে আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকদের দোয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অহঙ্কারের ভয়াবহ পরিণতি : যারা অহঙ্কারের কারণে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে চরম অপমানিত অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের জন্যে কঠিন অপমানজনক শাস্তি অবধারিত। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ পর্যায়ে মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন অহঙ্কারী লোকদেরকে পিপীলিকার মতো করে একত্রিত করা হবে। দোজখের "বালাওস" নামক কারাগারে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। জ্বলন্ত অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। অন্য দোজখীদের শরীরের পুঁজ, মল-মূত্র তাদেরকে ভক্ষণ করতে দেওয়া হবে। এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, আমি রুমে কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলাম। একদিন আমি একটি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করলাম যা পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ার দিক থেকে ভেসে আসছিল।

'হে আল্লাহ! আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার মারেফাত হাসিল করা সত্ত্বেও অন্যদের কাছে আশা করে।'

'হে আল্লাহ! আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলে।'

একটু পর পুনরায় উচ্চারিত হয়, 'আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার মারেফাত হাসিল করা সত্ত্বেও অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এমন কাজ করে যাতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।' একথা শ্রবণ করে ঐ বুজুর্গ বলেন, আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করি, তুমি কে? জিন না মানুষ? জবাব আসে আমি মানুষ, তুমি সে সব দিক থেকে তোমার ধ্যান পরিবর্তন কর যা তোমার জন্যে উপকারি হবে না, আর এমন কাজে মশগুল হও যা তোমার কাজে আসবে।

অনুবাদ :

٦١. اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِسْنَادُ الْاِبْصَارِ اِلَيْهِ مَجَازِىٌّ لِاَنَّهُ مُبْصَرٌ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

৬১. তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রশান্তির জন্য রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন আর দিনকে উজ্জ্বল করেছেন . দিনের দিকে اِبْصَارٌ -এর নিসবত রূপকার্থে করা হয়েছে কেননা, এটা (مُبْصَرٌ) দৃষ্টিদানকারী নয়; বরং এতে দৃষ্টিদান করা হয়- দেখা হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর অতিশয় অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষগুলো শুকরিয়া আদায় করে না - আল্লাহর, যদ্দরুন তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।

٦٢. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ م لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ فَكَيْفَ تُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ.

৬২. তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রভু- সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তবু তোমরা কোথা হতে ফিরে যাও? সুতরাং দলিল-প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তোমরা কিভাবে ঈমান হতে বিমুখতা প্রদর্শন করছ।

٦٣. كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ اَىْ مِثْلَ اَفْكِ هٰؤُلَاءِ اُفِكَ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ مُعْجِزَاتِهِ يَجْحَدُوْنَ.

৬৩. এমনিভাবে তারা ফিরে গিয়েছিল অর্থাৎ এদের ন্যায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল (ঈমান হতে) যারা আল্লাহর আয়াত তথা তাঁর মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করত।

٦٤. اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً سَقْفًا وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬৪. তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়েছেন এবং আসমানকে বানিয়েছেন গম্বুজ স্বরূপ- ছাদস্বরূপ যিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন। সুতরাং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। আর যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসসমূহের রিজিক দান করেছেন। সেই আল্লাহই তোমাদের রব। বিশ্বলোকের প্রভু সেই আল্লাহ অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা।

٦٥. هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ اُعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط مِنَ الشِّرْكِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, কাজেই তাঁকেই আহ্বান করো - তাঁর ইবাদত করো। তাঁর জন্য দীনকে নির্ভেজাল করতঃ শিরক হতে বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

তাহকীক ও তারকীব

فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ আয়াতাংশে صُوَرَ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী- فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -এর صُوَرَ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. صِوَرَ -এর ص অক্ষরটি যেরযোগে হবে। এটা আবূ রাজীন ও আশহাব, আকীলী (র.)-এর কেরাত।

২. صُوَرَ -এর ص অক্ষরটি পেশযোগে হবে। এটা জমহুর ক্বারীগণের কেরাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ ..... لَا يَشْكُرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির আরাম এবং বিশ্রামের জন্যে, তার সুখ-শান্তির জন্যে রাতকে সৃষ্টি করেছেন, এমনিভাবে দিনকে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ দিনের আলোতে নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় এবং জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিনের আলোতে সে চলাফেরা করতে পারে। সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়, এ ক্লান্তি দূর করার জন্যে চাই একটু অখণ্ড বিশ্রাম, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের সে বিশ্রাম এবং সুখ-শান্তির জন্যে সৃষ্টি করেছেন রাত। অতএব, মানব মনে আল্লাহ তা'আলার এসব দানের উপলব্ধি থাকা উচিত এবং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে এসব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– "اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ" 'নিশ্চয় মানুষ বড় জালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ।' তবে সবাই যে, জালিম এবং অকৃতজ্ঞ তা-ও নয়; বরং সামান্য সংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকরগুজার থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ 'আর অতি সামান্য সংখ্যক লোকই শোকরগুজার।'

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এতে রাত্র ও দিনকে তাওহীদের দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কেননা এর নিয়ামত আসা-যাওয়ায় প্রমাণ করে যে, পৃথিবী ও সূর্যের উপর একই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংস্থাপিত। এ দুটি আবর্তন মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সে এক আল্লাহই এ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি পূর্ণ যৌক্তিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে এ বিশ্ব ব্যবস্থাকে এমনভাবে বানিয়েছেন যে, তা তাঁর সৃষ্টি সব জীবের জন্যে কল্যাণকর হয়েছে।

২. এতে আল্লাহকে অস্বীকারকারী ও আল্লাহর সাথে শিরককারী মানুষকে দিনরাতের এ বিরাট নিয়ামত সম্পর্কে অনুভূতি দেওয়া হয়েছে। মানুষ এ নিয়ামত হতে কল্যাণ লাভ করেও দিনরাত তাঁর সাথে গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এটা যে কত বড় নাশুকরির ব্যাপার তা বুঝানো হয়েছে।

মানুষের কর্তব্য : মানুষের এ জীবন ও জীবনের যথার্সবস্ব আল্লাহ তা'আলারই দান। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার দরবারে সর্বক্ষণ শোকরগুজার থাকা, কিন্তু মানুষ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দান নিয়ে ব্যস্ত, মহান দাতা সম্পর্কে উদাসীন। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ, এটিই মানুষের দুর্ভাগ্য। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ" . অর্থাৎ যদি তোমরা আমার শোকরগুজার হও, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো। পক্ষান্তরে যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে মনে রেখো, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়, আর নাফরমানি ও অকৃতজ্ঞতায় শাস্তি অবধারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শুধু দান নিয়ে ব্যস্ত হওয়া এবং দাতাকে ভুলে যাওয়া অভদ্রতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোকরগুজারির তাৎপর্য হলো, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দানের কথা উপলব্ধি করা এবং রসনা দ্বারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তিনি তাঁর দান ব্যবহারের জন্যে যে রীতি-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, কখনো এর বরখেলাফ না করা।

"ذٰلِكُمْ رَبُّكُمْ .... يَجْحَدُوْنَ" আয়াতদ্বয়ের বিস্তারিত তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– দিবারাত্রির সৃষ্টি মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। যদি শুধু দিন বা শুধু রাত হতো তবে মানুষের কত অসুবিধা হতো তা ভাবতেও কষ্ট হয়। আর শুধু দিবারাত্রিই নয়; বরং মানুষের জীবন ও জীবনের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দান। অতএব, শুধু এক আল্লাহ

তা'আলার বন্দেগি করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য, তাই এ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

এই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগি করো। এমন অবস্থায় তোমরা তাঁর ইবাদত না করে কোথায় চলে যাচ্ছ? তোমরা কিভাবে বিপথগামী হও? কিভাবে তাঁর সঙ্গে শরিক কর? যিনি তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি তোমাদের জীবনের যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন, যাঁর অফুরন্ত নিয়ামত তোমরা ভোগ করে চলেছ, এ সমস্ত নিয়ামতের দাবি হলো তোমরা শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করবে, তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, কিন্তু তোমরা কিভাবে তাঁর নাফরমানি কর? কিভাবে তাঁর স্থলে অন্যকিছুকে উপাস্য মনে কর? মূলত যারা আল্লাহ তা'আলার কথাকে অস্বীকার করে তাদের নিজেদের হস্তে নির্মিত মূর্তির সম্মুখে তারা মাথা নত করে, যা কোনো কিছুকেই সৃষ্টি করে না; বরং নিজেই অন্যের (সৃষ্টির) সৃষ্টি; এমন অসহায় বস্তুর সম্মুখেও মানুষ মাথানত করে। এর চেয়ে লজ্জার, অপমানজনক এবং দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে?

"اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ ...... رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার এমন নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে যা সমগ্র মানব জাতি ভোগ করে এবং যে নিয়ামতসমূহ সকলেই দেখতে পায়, ফলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা সহজ হয় তাই ইরশাদ হচ্ছে–

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বাসোপযোগী করেছেন, এটি মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। যদি মাটি কাঁদার ন্যায় নরম হতো অথবা পাথরের ন্যায় শক্ত হতো, তবে মানুষ তাতে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতে সক্ষম হতো না।

বস্তুত জমিনকে আল্লাহ তা'আলা ফরাশের মতো বিছিয়ে রেখেছেন এবং পাহাড়গুলোকে তার উপর বসিয়ে দিয়েছেন যাতে করে জমিন স্থির থাকে। কেননা জমিনের নিচে পানি রয়েছে, তরীর মতো সে নড়াচড়া করত। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির বাসোপযোগী করার লক্ষ্যে জমিনের উপর পাহাড় রেখে তাকে স্থির-নিশ্চল করে রেখেছেন, যেন মানুষ তার উপর আবাসস্থল নির্মাণ করতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, বিশ্রাম করতে পারে, রাতের বেলা সুখ-নিদ্রায় বিভোর হতে পারে এবং দিবাভাগে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, শুধু তাই নয়; বরং হে মানব জাতি! উপরের দিকে তাকাও, লক্ষ্য কর কিভাবে আল্লাহ তা'আলা নীলাভ আকাশকে গম্বুজের ন্যায় তৈরি করে রেখেছেন, এর জন্যে কোনো খুঁটি ব্যবহার করা হয়নি, আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হাতেই বিশাল বিস্তৃত আসমানকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন যাকে মানুষের জন্যে ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আর তাতেই তিনি রেখে দিয়েছেন দীপ্তিময় সূর্য, আলোকময় চন্দ্র এবং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জও। আর ঐ আসমান থেকেই মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বারি বর্ষণ করেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই মেঘমালা আকাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে, যখন যেখানে নির্দেশ হয়, সেখানেই বারি বর্ষিত হয়। এসব কিছু মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের কয়েকটি মাত্র যা দেখে মানুষ এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতে পারে এবং তাঁর প্রতি শোকরগুজার হতে পারে।

আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কত সুন্দর, সুশৃঙ্খলভাবে সঠিক স্থানে স্থাপন করেছেন।

মানুষের সৃষ্টি-সৌন্দর্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– "لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ" 'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একথা বলে তালাক দিয়েছিল, যদি তুমি চন্দ্র থেকে সুন্দরী না হও, তবে তোমাকে তিন তালাক। তদানীন্তন কালের ওলামায়ে কেরাম এ মত প্রকাশ করলেন যে, একথা দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে জমানার সুবিখ্যাত আলিম ইমাম শাফিয়ী (র.) বললেন, না একথা দ্বারা তার স্ত্রী তালাক হয়নি। তিনি দলিল হিসেবে এ আয়াত পেশ করলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে মানুষ যে চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর একথা প্রমাণিত হয়। অতএব, তার স্ত্রী তালাক হয়নি।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, আর এমন সুন্দর আকর্ষণীয় আকৃতি অন্য কোনো সৃষ্টিকে তিনি দান করেননি। এজন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের শোকরগুজার হওয়া কর্তব্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ..." 'আর আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।' সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মানুষ হাত দিয়ে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে এবং এরপর মুখে পুরে দেয়। খাদ্য গ্রহণের জন্যে তার মাথা নত করতে হয় না, অথচ সমস্ত প্রাণীজগত তার মুখ দিয়েই খাদ্য গ্রহণ করে এবং এজন্যে মাথাকে নত করতেই হয় কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয় না। এটি একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এ জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে শোকর আদায় করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারাতে ইরশাদ করেন- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ .... الخ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের বন্দেগি কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও। হয়তো তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। সেই প্রতিপালক, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্যে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন আর আসমান থেকে তিনি বারিবর্ষণ করেছেন। আর তা দ্বারা তিনি তোমাদের উপজীবিকা হিসেবে ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা এসব কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কোনো কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করো না। তিনিই মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতিপালক, আর কত মহান বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা, সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তিনিই লালন-পালন করেন, সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই, মাহাত্ম্য তাঁরই, সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই।

"هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ...... الْعٰلَمِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। প্রকৃত ও মূল জীবন তো তাঁরই। তিনি স্বজীবিত, নিজ শক্তি বলে চিরঞ্জীব। অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর। তিনি ছাড়া অন্য সবের জীবন প্রদত্ত জিনিস, তা অস্থায়ী, মৃত্যুশীল ও ধ্বংসমুখী।

فَادْعُوْهُ الخ উপরে যে দাবি পেশ করা হয়েছে তার আলোকে এ সত্য কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে দীন শব্দের অর্থ হলো- এমন ধর্মনীতি, পদ্ধতি ও আচরণ যা মানুষ কারো উচ্চতর কর্তৃত্ব মেনে কারো আনুগত্য কবুল করে গ্রহণ করে।" আর দীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে তাঁর বন্দেগি করার অর্থ হলো- আল্লাহর বন্দেগির সাথে অপর কারো বন্দেগিকে শামিল করবে না; বরং উপাসনা একমাত্র তাঁরই করা হবে, ইবাদত শুধুমাত্র তাঁরই করতে হবে, তাঁরই হেদায়েত মেনে চলবে, তাঁরই বিধান ও আদেশ নিষেধ পালন করবে।"

আল্লাহ তা'আলার জন্য দীনকে খালেস করে তাঁদের বন্দেগি তোমাদেরকে করতে হবে। কেননা খালেস ও অবিমিশ্রিত বন্দেগি পাওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, অপর কেউ বন্দেগি পাওয়ার অধিকারী নয়, আল্লাহর সাথে তারও পূজা উপাসনা করা ও তার আইন মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো খালেছ ইবাদত করে, তবে সে নিতান্ত ভ্রমে নিপতিত। অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহর বন্দেগির সাথে অপরের বন্দেগি মিশায় তবে তাও সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো সেই হাদীস যা ইবনে মারদুইয়া ইয়াজিদুর রাক্কাশী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা নিজেদের ধন-সম্পদ এ উদ্দেশ্যে দান করি যেন আমাদের সুনাম-সুখ্যাতি হয়। তখন কি আমাদের কোনো ছওয়াব হবে? নবী করীম ﷺ বললেন না। লোকটি বলল, যদি আল্লাহর নিকট হতে ছওয়াব পাওয়া এবং দুনিয়ার সুখ্যাতি লাভ করা দুই-ই উদ্দেশ্য হয়? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন- "اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَقْبَلُ اِلَّا مَنْ اَخْلَصَ لَهٗ" আল্লাহ তা'আলা কোনো আমলই কবুল করেন না, যতক্ষণ না তা খালেসভাবে তাঁরই উদ্দেশ্যে হবে।"

অনুবাদ :

٦٦. قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ دَلَائِلُ التَّوْحِيْدِ مِنْ رَّبِّيْ ز وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

৬৬. হে রাসূল! আপনি বলুন! আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর [অর্থাৎ] তোমরা যাদের ইবাদত কর। আল্লাহ ব্যতীত। কেননা আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এসেছে– একত্ববাদের প্রমাণাদি– আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আর রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

٦٧. هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ بِخَلْقِ أَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ دَمٍ غَلِيْظٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا بِمَعْنَى أَطْفَالًا ثُمَّ يُبْقِيْكُمْ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ تَكَامُلَ قُوَّتِكُمْ مِنَ الثَّلَاثِيْنَ سَنَةً إِلَى الْأَرْبَعِيْنَ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا بِضَمِّ الشِّيْنِ وَكَسْرِهَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ الْأَشُدِّ وَالشَّيْخُوْخَةِ فَعَلَ ذٰلِكَ بِكُمْ لِتَعِيْشُوْا وَلِتَبْلُغُوْا أَجَلًا مُّسَمًّى وَقْتًا مَحْدُوْدًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ دَلَائِلَ التَّوْحِيْدِ فَتُؤْمِنُوْنَ .

৬৭. আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে তা হতে সৃষ্টি করার মাধ্যমে অতঃপর বীর্য হতে শুক্রকীট হতে এরপর রক্তপিণ্ড হতে জমাট রক্ত হতে তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করেন– এখানে طِفْل (একবচনের) শব্দটি أَطْفَال (বহুবচন)-এর অর্থে হয়েছে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত রাখেন যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যে পৌঁছতে পার। পরিপূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পার। যা ত্রিশ হতে চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লাভ হয়ে থাকে। তারপর (তোমাদেরকে বৃদ্ধি দান করেন) যেন তোমরা বার্ধক্যে পৌঁছতে পার – এ স্থানে شُيُوْخًا শব্দটির শীন অক্ষরটি পেশবিশিষ্টও হতে পারে এবং যেরযোগেও হতে পারে। অবশ্য তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার পূর্বেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে– পূর্ণ শক্তিতে এবং বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই। তোমাদের সঙ্গে এরূপ করা হয়েছে যেন তোমরা সুখী জীবনযাপন করতে পার। আর এটা এজন্য যে, যাতে তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত ওয়াক্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পার। আর যাতে তোমরা বুঝতে পার তাওহীদের প্রমাণাদির ফলে ঈমান গ্রহণ কর।

٦٨. هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَإِذَا قَضٰى أَمْرًا أَرَادَ إِيْجَادَ شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا بِتَقْدِيْرِ أَنْ أَيْ يُوْجَدُ عَقِبَ الْإِرَادَةِ الَّتِيْ هِيَ مَعْنَى الْقَوْلِ الْمَذْكُوْرِ .

৬৮. তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (অর্থাৎ) কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন– তখন তিনি বলেন, হও, অমনি তা হয়ে যায়। فَيَكُوْنُ শব্দটির ن অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট হবে। অথবা এর পূর্বে أَنْ উহ্য মেনে একে যবর যোগেও পড়া যাবে। অর্থাৎ ইচ্ছা করা মাত্রই হয়ে যায়। আর উল্লিখিত كُنْ -এর অর্থ হলো [মূলত] ইচ্ছা করা।

তাহকীক ও তারকীব

"شُيُوخًا" শব্দের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী- "ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا" -এর মধ্যস্থিত شُيُوخًا শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে-

১. জমহুর ক্বারীগণ শীন (ش) অক্ষরটির নিচে যের যোগে شِيُوخًا পড়েছেন।

২. হজরত আবূ আমর ও নাফে প্রমুখ ক্বারীগণ "ش" -এর উপর পেশযোগে "شُيُوخًا" পড়েছেন।

"فَيَكُونُ" শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী- "فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" -এর "فَيَكُونُ" শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. জুমহুর ক্বারীগণ فَيَكُونُ -এর ن অক্ষরটিকে পেশযোগে পড়েছেন।

২. ইবনে আমের (র.) ن অক্ষরটিকে যবর যোগে فَيَكُونَ পড়েছেন। তারা فَ -এর পরে একটি أَنْ -কে উহ্য মেনে থাকেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"قُلْ إِنِّي نُهِيتُ الخ" আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, শায়বা ইবনে রবীয়াহ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বললো, আপনি আপনার নতুন ধর্মের কথা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্ম মেনে চলুন।' তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ১০, পৃষ্ঠা- ৩৫৭]

তাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দেন যে, তোমরা যাদের পূজা কর, আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে আমাকে তাদের পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এসে গেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করার প্রশ্নই উঠেনা। আমার পক্ষে তাওহীদের সত্য মতবাদ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়, আমাকে শিরক থেকে দূরে থাকার এবং এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তাবেদার বান্দা হয়ে জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন হয়।

পূর্বের সাথে "قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الخ" আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সামনে তাঁর কতিপয় গুণাবলির উল্লেখ করতঃ তাদেরকে খালেস ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং সারা জাহানের একমাত্র তিনিই প্রতিপালক তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যিনি রাব্বুল আলামীন, সারা জগতের পালনকর্তা, একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে, তারই নিকট মাথানত করতে হবে। অন্য কারো ইবাদত করা চলবে না- অন্য কারো নিকট মাথানত করা যাবে না।

"قُلْ إِنِّي نُهِيتُ الخ" আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি মক্কার মুশরিকদেরকে বলে দিন, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য নিদর্শনাদির উপস্থিতির পর তিনি ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত বন্দেগী করার প্রশ্নই উঠে না। এ কারণেই তা হতে দূরে থাকার এবং একমাত্র তারই অনুগত বান্দা ও তাবেদার হয়ে থাকার ও তদনুযায়ী জীবন-যাপন করার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও কোমল এবং সহজ সরল ভাষায় মুশরিক ও বিধর্মীদেরকে দেব-দেবীদের মোহ হতে সরিয়ে ঈমান ও একত্ববাদের দিকে আকৃষ্ট করা। অতএব, তাদের দেব-দেবীদের প্রত্যক্ষ কোনো সমালোচনা না করে পরোক্ষভাবে তাদের ইবাদতে নবী করীম ﷺ -এর অপারগতার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'তাওহীদের অকাট্য দলিলাদি আল্লাহর পক্ষ হতে আমার নিকট পৌঁছে যাওয়ার পর কিভাবে আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তথাকথিত মাবুদের ইবাদতে মশগুল হতে পারি? আমাকে তো তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তোমরা যাদের ইবাদত করছ আল্লাহকে বাদ দিয়ে, তাদের উপাসনার পক্ষে কি আদৌ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে? পারবে কি সামান্যতম যুক্তিরও অবতারণা করতে?

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ الخ" আয়াতের যোগসূত্র : পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাবি করা হয়েছে, গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে বারণ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে তার দলিল পেশ করা হয়েছে। মানুষের জন্ম বৃত্তান্তের ধারাবাহিকতার ইতিহাস তুলে ধরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটা কার কাজ। কে তোমাদের আদি পিতা আদম (আ.)-কে এক মুষ্টি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিল? কে-ইবা এক ফোঁটা নাপাক বীর্য হতে হৃষ্ট-পুষ্ট তুল-তুলে একটি শিশু সৃষ্টি করে? কে এই দুর্বল শিশুটির গায়ে সিংহসম শক্তির যোগান দিয়ে তাকে সুন্দর-সুঠাম করে তোলে? আবার কে এত শক্তিধর লোকটিকে সম্পূর্ণ হীনবল করে বার্ধক্যে পৌঁছিয়ে দেয়? এ সব প্রশ্নের একমাত্র জবাব আল্লাহ। এ সব আল্লাহর কুদরত। কাজেই ইবাদত পাওয়ার যোগ্যও হবেন কেবল তিনিই; অন্য কেউ নয়।

"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ .... وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির আদি ইতিহাসও সৃষ্টিতত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাই ইরশাদ হচ্ছে–

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন, আর অন্য মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়। এজন্যে যে, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করে, ঐ খাদ্য দ্বারা রক্ত তৈরি হয়, আর ঐ রক্তকে আল্লাহ তা'আলা শুক্রে পরিণত করেন, আর শুক্র বিন্দু থেকে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন। সে শুক্র বিন্দুকে তিনি প্রথমে জমাট রক্ত, পরে গোশত, অস্থি এবং চর্মে পরিণত করেন, এরপর তাতে মানবাকৃতি দান করেন, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তাকে মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে বের করে আনেন। কুরআনে কারীমের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন–

"وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ" -

'আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বের করে এনেছেন তোমাদের মায়ের উদর থেকে, এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতেনা, আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্তর, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।'

আর শৈশবের পরে আসে কৈশোর, এরপর ঐ কিশোরই যৌবনে পদার্পণ করে। সে পূর্ণ শক্তি অর্জন করে, কিন্তু সে শক্তি চিরদিন স্থায়ী হয় না, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরই একজন যুবক বার্ধক্যে উপনীত হয়। তার সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে, এরই মধ্যে কারো মৃত্যুও হয়ে যায়, আর কেউ বার্ধক্যের দুর্বলতা, অসুস্থতাসহ জীবনের গ্লানি টেনে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো এই, মানুষ তার জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার অগণিতদানে ধন্য, এর কোনটি মানুষ অস্বীকার করতে পারে? এর কোনো পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কোনো ভূমিকা রয়েছে কি? অবশ্যই নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করা বা তাঁর সাথে শিরক করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এজন্যে কুরআনে কারীমে শিরককে জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" দ্বিতীয়তঃ মানুষের সৃষ্টি, তার ক্রমবিকাশ, তার উন্নতি, পরিবৃদ্ধি সবই এক আল্লাহ তা'আলারই নিয়ন্ত্রণাধীন, এতে অন্য কারো তো দূরের কথা, মানুষের নিজেরও কোনো হাত নেই।

মানুষের একান্ত কর্তব্য : অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। মানুষের আনুগত্যের সর্বপ্রথম হকদারই হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা, তাই মানুষ মাত্রকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয় আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আর এটিই ইসলাম। ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করাই হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। এটিই হলো পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা, আলোচ্য আয়াতে এ মহান শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে মানব-সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের মাধ্যমে। আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তার অস্তিত্বের কথা, জীবন ও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থার কথা, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা মহান দানের কথা, যাতে করে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ অনুগত ও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। কিভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। অতএব, পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে এবং এর উপর কিভাবে মানুষ আমল করবে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বনবী ﷺ। তাই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এটিই মানব জীবনের সাফল্য লাভের একমাত্র পথ।

মানব জীবনের স্তরসমূহ : ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরের অত্র আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, মানব জীবনে তিনটি স্তর রয়েছে–

১. اَلْمَرْحَلَةُ الطُّفُوْلَةُ [**শৈশবকাল**] : এটা ব্যক্তি জীবনের প্রথম পর্যায়। এ সময় সে দ্রুত বাড়তে থাকে।

২. مَرْحَلَةُ بُلُوْغِ الْاَشُدِّ [**যৌবনকাল**] : এ পর্যায়ে সে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে– পূর্ণ বয়সে পৌঁছে। এ সময়ে সে পরিপূর্ণরূপে বাড়তে থাকে। এ বয়সে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায় না। একেই কুরআনে মাজীদে "لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ" বলা হয়েছে।

৩. اَلْمَرْحَلَةُ الشَّيْخُوْخَةُ [**বৃদ্ধকাল**] : এ স্তরে দুর্বলতা ও ঘাটতি প্রকাশ পায়। কুরআনে মাজীদে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে– "ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا" -

তবে দার্শনিকগণ আরো দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে–

৪. اَلْمَرْحَلَةُ الْجَنِيْنَةُ [**উন্মেষকাল**] : এটা শৈশবের পূর্বেকার অবস্থা।

৫. اَلْمَرْحَلَةُ الْبَرْزَخِيَّةُ [**বরযখকাল**] : এটা মৃত্যুর পরবর্তী কাল হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

"وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُّسَمًّى" আয়াতাংশে "اَجَلٌ" [নির্দিষ্ট সময়] দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে "اَجَلٌ مُّسَمًّى" বা নির্দিষ্ট সময়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর সময়, না হয় সেই সময় যখন সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

প্রথম অর্থে এর তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করায়ে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়ে যান। যা তিনি প্রত্যেকের প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই নির্দিষ্ট সময় আগমনের পূর্বে সারাটি দুনিয়া একত্রিত হয়ে কাউকেও মারতে চাইলে মারতে পারবে না অপরদিকে সেই নির্দিষ্ট সময় এসে গেলে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে কাউকে জীবিত রাখতে চাইলে তা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে তার তাৎপর্য হবে, এ বিশ্বজগত এজন্য রচনা করা হয় নি যে, তোমরা মরে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে; বরং জীবনের বিভিন্ন স্তর হতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এজন্যে অগ্রসর করে নিয়ে যান যেন তোমরা সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সম্মুখে হাজির হতে পার।

"هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ..... فَيَكُوْنُ" আয়াতের ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার অপরিসীম কুদরতের বর্ণনা করেন। ইরশাদ হচ্ছে–

মানুষের জীবন ও মরণ এক কথায় সব কিছুই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর জন্যে কোনো কিছুই কঠিন নয়। এমনকি, মানুষের জীবন ও মৃত্যু বা কোনো কিছুই করতে তাঁকে আদৌ কোনো বেগ পেতে হয় না। আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা হলো এমন, তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে শুধু বলেন, 'হও', সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। এতটুকু বিলম্ব হয় না, এটিই তাঁর মহান কুদরতের অন্যতম জীবন্ত নিদর্শন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যেভাবে পৃথিবীতে মানুষকে জীবন দেওয়া এবং মৃত্যুমুখে পতিত করা অত্যন্ত সহজ, ঠিক এমনিভাবে মৃত্যুর পর মানুষকে নব জীবন দান করা এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির করাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষে আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। অতএব কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এজন্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ‌.

'আর তোমরা সে আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট অবশেষে তোমরা একত্রিত হবে।'

হযরত মুফাসসিরীনে কেরাম অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনটি বিকল্প ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ক্রমধারা পরিবর্তনের বিষয়টি উপরে ব্যক্ত করা হয়েছে তা না মানুষের কোনোরূপ দৈহিক বিকৃতি সাধিত হবে আর নাই বা মানুষ ক্ষত-বিক্ষত ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। কেননা এটা সংঘটনের জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো হাতিয়ার বা অস্ত্রের প্রয়োজন পড়বে না; বরং "হয়ে যাও", বলা মাত্রই তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

২. মানুষের জীবন ও মৃত্যু দানের ব্যাপারে আল্লাহকে কোনো শ্রমই স্বীকার করতে হয় না; বরং "হয়ে যাও" বললেই তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির যেই ধীর গতির কথা কুরআনে মাজীদে ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে তা হলো দৈহিক সৃষ্টি। কিন্তু তাতে মুহূর্তকালের মধ্যেই রূহ ফুঁকিয়ে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। অর্থাৎ এর জীবন দান ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র। "জীবন লাভ কর" বলা মাত্রই তা জীবিত হয়ে যায়।

৩. যদিও মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে একটি ধীরগতি ও ধারাবাহিক স্তর বিন্যাসের ব্যবস্থা রেখেছেন যেমন নর-নারীর মিলনের ফলে নারীর গর্ভে নরের বীর্য পৌঁছে এবং তা অনেকগুলো স্তর পার হয়ে একটি (প্রাণ সম্পন্ন) শিশুর আকারে বের হয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এর ব্যতিক্রম করতঃ "كُنْ" (হয়ে যাও) বলার মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন– মাতা-পিতা ব্যতীত হযরত আদম (আ.)-কে এবং পিতা ছাড়া হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করতঃ প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন– তা জগতকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

মুফাসসির (র.) طِفْلٌ -এর ব্যাখ্যা اَطْفَالٌ -এর দ্বারা কেন করেছেন? "ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا" আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করেছেন– بِمَعْنَى اَطْفَالًا অর্থাৎ এখানে طِفْلٌ (একবচনের) শব্দটি اَطْفَالٌ (বহুবচন)-এর অর্থে হয়েছে।

এর কারণ হচ্ছে– طِفْلٌ তৎপূর্ববর্তী يُخْرِجُكُمْ -এর كُمْ যমীরে মাফউল হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমতাবস্থায় বের করেন যে, তোমরা তখন শিশু। নাহুর নিয়ম অনুযায়ী حَالٌ ও ذُوالْحَالِ -এর বচন একরূপ হতে হয়। অর্থাৎ ذُوالْحَالِ একবচন হলে حَالٌ ও একবচন হতে হয়। আর ذُوالْحَالِ বহুবচন হলে حَالٌ ও বহুবচন হতে হয়। সুতরাং এখানে যেহেতু ذُوالْحَالِ তথা كُمْ যমীরটি বহুবচন, সেহেতু حَالٌ তথা طِفْلٌ ও বহুবচন (اَطْفَالٌ)-এর অর্থে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'আলা اَطْفَالٌ না বলে طِفْلٌ বললেন কেন? এর জবাব এই যে, طِفْلٌ শব্দটি মূলত স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ এবং একবচন ও বহুবচন সকলের জন্য সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে এটা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে মজীদের অন্যত্রও এটা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ফরমান– وَالطِّفْلُ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا আর সেই সকল শিশু যারা বালেগ হয় নি।

শৈশব ও যৌবনের মেয়াদ কতটুকু? মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, ভূমিষ্ট হওয়ার পর হতে ছয় বৎসর পর্যন্ত হলো শৈশব কাল।

আর ত্রিশ হতে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পরিপূর্ণ শক্তির সময় তথা এ সময়ে যৌবনের পূর্ণতা লাভ ঘটে। একেই কুরআন মাজীদে اَشُدٌّ বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٦٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ أٰيٰتِ اللّٰهِ ط الْقُرْاٰنِ أَنّٰى كَيْفَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْإِيْمَانِ .

৬৯. তুমি কি তাদেরকে দেখছ না যারা বিতর্কে লিপ্ত হয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অর্থাৎ কুরআনে কারীম সম্পর্কে কোথায় কিভাবে– ফিরে যাচ্ছে– ঈমান হতে।

٧٠. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالْبَعْثِ وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عُقُوْبَةَ تَكْذِيْبِهِمْ .

৭০. যারা অস্বীকার করে কিতাবকে (অর্থাৎ) আল-কুরআন এবং অস্বীকার করে তাকেও যা সহ আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি– যেমন– একত্ববাদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি। আর তারা হলো মক্কার কাফেররা। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তি– পরিণতি।

٧١. إِذِ الْأَغْلٰلُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ إِذْ بِمَعْنٰى إِذَا وَالسَّلٰسِلُ ط عَطْفٌ عَلَى الْأَغْلَالِ فَتَكُوْنُ فِي الْأَعْنَاقِ أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ مَحْذُوْفٌ أَيْ فِيْٓ أَرْجُلِهِمْ أَوْ خَبَرُهٗ يُسْحَبُوْنَ أَيْ يُجَرُّوْنَ بِهَا .

৭১. যখন তাদের গলায়ও শিকল-বেড়ি পরানো হবে– এখানে إِذْ শব্দটি إِذَا -এর অর্থে হয়েছে। আর শৃঙ্খল اَلسَّلَاسِلُ শব্দটি اَغْلَالٌ -এর উপর আত্ফ হয়েছে। সুতরাং (এমতাবস্থায়) শৃঙ্খল ও গলায় পরানো হবে। অথবা, اَلسَّلَاسِلُ মুবতাদা এর খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ "فِيْٓ أَرْجُلِهِمْ" [তাদের পায়ে বেড়ি হবে।] অথবা, এর خَبَرٌ হলো পরবর্তী يُسْحَبُوْنَ অর্থাৎ [বেড়ি পরিয়ে] তাদেরকে টেনে নেওয়া হবে।

٧٢. فِي الْحَمِيْمِ أَيْ جَهَنَّمَ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ يُوْقَدُوْنَ .

৭২. ফুটন্ত পানিতে অর্থাৎ জাহান্নামে অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে পোড়ানো হবে।

٧٣. ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ تَبْكِيْتًا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ .

৭৩. এরপর তাদেরকে বলা হবে তিরস্কার করে যাদেরকে তোমরা [আল্লাহর সাথে] শরিক করতে তারা কোথায়?

٧٤. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط مَعَهٗ وَهِيَ الْأَصْنَامُ قَالُوْا ضَلُّوْا غَابُوْا عَنَّا فَلَا نَرَاهُمْ بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ط أَنْكَرُوْا عِبَادَتَهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ أُحْضِرَتْ قَالَ تَعَالٰى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَيْ وَقُوْدُهَا كَذٰلِكَ أَيْ مِثْلَ إِضْلَالِ هٰٓؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِيْنَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ .

৭৪. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত [অর্থাৎ] আল্লাহর সাথে। আর তারা হলো দেব-দেবীর প্রতিমাসমূহ। তারা বলবে তারা তো হারিয়ে গেছে– অদৃশ্য হয়ে গেছে আমাদের হতে সুতরাং আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না; বরং ইতঃপূর্বে আমরা কাউকে ডাকতাম না– তারা প্রতিমাপূজার কথা অস্বীকার করবে। অতঃপর তাদেরকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা [অন্যত্র] ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অর্থাৎ জ্বালানি হবে। তদ্রূপ অর্থাৎ এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার ন্যায় আল্লাহ কাফিরদেরকে বিপথগামী করে থাকেন।

٧٥. وَيُقَالُ لَهُمْ اَيْضًا ذٰلِكُمُ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مِنَ الْاِشْرَاكِ وَاِنْكَارِ الْبَعْثِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ تَتَوَسَّعُوْنَ فِى الْفَرَحِ -

৭৫. তাদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলা হবে– তোমাদের তা অর্থাৎ শাস্তি এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-অহঙ্কার করতে– যেমন শিরক করতে, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে আর এ কারণে যে, তোমরা আনন্দে বাড়াবাড়ি করতে– আনন্দ-ফূর্তিতে ডুবে থাকতে।

٧٦. اُدْخُلُوْآ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ع فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

৭৬. তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর তথায় চিরদিন থাকবে। সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল! বাসস্থান অহঙ্কারীদের তথা কাফেরদের।

তাহকীক ও তারকীব

"اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا" বাক্যাংশটুকু তারকীবে কি হয়েছে? আল্লাহর বাণী– "اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا" বাক্যাংশটুকুর তারকীবে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. এটা (اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا) পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ -এর بَيَانْ হয়েছে।

২. বা اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ -এর صِفَتْ হয়েছে।

৩. এটা পূর্ববর্তী اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ -এর اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ হতে بَدَل হয়েছে?

৪. কিংবা اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ হতে ذَمّ (হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ) হয়েছে।

৫. অথবা, একটি উহ্য مُبْتَدَأٌ (যেমন هُمْ) -এর خَبَرٌ হয়েছে।

৬. اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ হলো মুবতাদা আর "فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ" হলো তার خَبَرٌ -

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমোক্ত পাঁচটি অবস্থায় "فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ" স্বতন্ত্র বাক্য হবে।

"اَلسَّلَاسِلُ" -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী "اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ" -এর মধ্যস্থিত اَلسَّلَاسِلُ শব্দটির মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা.) আবূ যাওয়া (র.) প্রমুখগণ اَلسَّلَاسِلَ -এর ل অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়েছেন।

২. কতিপয় কারীগণ ل অক্ষরটিকে যেরযোগে اَلسَّلَاسِلِ পড়েছেন।

৩. জুমহুর ক্বারীগণ اَلسَّلَاسِلُ শব্দটির ل অক্ষরটি পেশ-যোগে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এটাই اَلْاَغْلَالُ -এর উপর আতফ হবে। অথবা, মুবতাদা কিংবা খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ .... أَنّٰى يُصْرَفُوْنَ" আয়াতের শানে নুযূল : জমহুর মুফাসসিরীনে কেরামের মতে আলোচ্য আয়াতখানা মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং ইবনে জায়েদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, উক্ত আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পরবর্তী আয়াত খানাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কেননা তাতে ইরশাদ হয়েছে– "اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهٖ"

"যারা আল-কিতাবকে অস্বীকার করেছে এবং আমি রাসূলগণকে যেই সব আকীদা-বিশ্বাস সহ প্রেরণ করেছি তাদেরকেও অস্বীকার করেছে।"

এটা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তারা হলো মক্কার মুশরিকরা। কেননা তারাই তো সরাসরি কুরআন মাজীদকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রাসূলে কারীম ﷺ যেসব তথ্যাদি নিয়ে এসেছেন বিশেষ করে তাওহীদ ও পুনরুত্থানকে তারা তা সরাসরি অস্বীকার করেছে।

কতিপয় মুফাসসিরে কেরাম যেমন ইবনে সীরিন, আবূ কুবায়েল ও ওকবাহ ইবনে আমের প্রমুখগণ বলেছেন যে, উক্ত আয়াত কাদরিয়াদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে সীরিন (র.) বলেছেন যে, এটা যদি কাদরিয়াদের ব্যাপারে নাজিল না হয়ে থাকে তা হলে তা কাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে তা আমি জানি না।

ওকবাহ ইবনে আমির বলেছেন, আয়াতখানা কাদরিয়াহ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

আবূ কুবায়েল (র.) বলেছেন যে, কাদরিয়ারাই (কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে) ঈমানদারদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কাদরিয়াহ একটি বাতিল গোমরাহ দল। তারা তাকদীরকে অস্বীকার করে থাকে। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের নিন্দা করে গিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সুবহানুহু উল্লিখিত আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ কে লক্ষ্য করে কাফের-মুশরিকদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

"হে রাসূল! আপনি কি তাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না যারা আল্লাহর আয়াত তথা কুরআনে কারীমের সম্পর্কে মিছামিছি বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা ঈমান হতে বিমুখতা প্রদর্শন পূর্বক কোথায় চলে যাচ্ছে?"

অর্থাৎ উপরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পরও কি তোমরা এ লোকগুলোর ভুল দৃষ্টি ও ভুল আচরণের মূল উৎস কোথায় এবং কোথায় মাখিয়ে এরা গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে তা কি তোমরা বুঝতে পার না?

প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও আল্লাহর নবী রাসূলগণের উপস্থাপিত আদর্শ-নীতি ও শিক্ষাকে মেনে না নেওয়া এবং আল্লাহর আয়াতসমূহে গভীর মনোনিবেশ ও দায়িত্বানুভূতি সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করার পরিবর্তে ঝগড়াটে মনোভাব নিয়ে তার মোকাবিলা করা– এটাই হলো তাদের গোমরাহ ও বিপথগামী হওয়ার মূল কারণ। এটাই তাদের সরল-সঠিক পথে ফিরে আসার সকল সম্ভাবনাকে খতম করে দিয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য : উল্লিখিত আয়াত ও তৎপরবর্তী কয়েকটি আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো, যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে ঝগড়া এবং অযথা তর্ক-বিতর্ক করে তাদেরকে আখেরাতের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া এবং এরূপ অপকর্মের দরুন তাদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন করা।

"إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْ .... يُسْجَرُوْنَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : কেয়ামত দিবসে কাফের ও মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে এবং তা তারা প্রত্যক্ষ করবে– তারা এ ভয়াবহ পরিণতি তখন দেখতে পাবে, যখন কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের গলদেশে শিকল বেড়ি থাকবে, তাদেরকে জন্তুর ন্যায় দোজখের দিকে টেনে নেওয়া হবে, কখনো ফুটন্ত পানিতে আবার কখনো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, দোজখের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে তখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এ কাফেরদেরকে দোজখের অগ্নির ইন্ধন বানানো হবে।

মোটকথা, কাফেরদেরকে দোজখে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে, কখনো ফুটন্ত পানিতে, আবার কখনো জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি সীসা নির্মিত কোনো গোলা আসমান থেকে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়, যার দূরত্ব পাঁচশত মাইল, তবে সে গোলাটি রাত পর্যন্ত জমিনে পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করতে আনুমানিক দশ বারো ঘন্টার প্রয়োজন হবে)। কিন্তু যদি দোজখের ভেতরে কোনো গোলা নিক্ষেপ করা হয় তবে তার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে চল্লিশ বছরের প্রয়োজন হবে (অর্থাৎ, দোজখের গভীরতা আসমান জমিনের দূরত্ব থেকে অনেক বেশি)। –[তাফসীরে মাযহারী– ১০/২৬২]

হামীম কি জাহান্নামের অভ্যন্তরে না বাইরে? حَمِيْم বলা হয় ফুটন্ত গরম পানিকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আয়াতে উল্লিখিত ফুটন্ত গরম পানির ঝর্ণা কোথায় থাকবে, জাহান্নামের ভিতরে না বাইরে? কুরআনে মাজীদের আয়াত হতে বাহ্যতঃ এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমত হামীমে (ফুটন্ত গরম পানিতে) নিক্ষেপ করা হবে। এর পর তাদেরকে জাহীম তথা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং তা হতে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, حَمِيْم জাহান্নামের বাইরে কোথাও অবস্থিত। সূরায়ে সাফ্‌ফাতে বলা হয়েছে– "ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ" অর্থাৎ হামীমে পানি পান করানোর পর পুনরায় তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

মোদ্দাকথা, যখন জাহান্নামীরা তৃষ্ণায় চটপট করতে থাকবে তখন তাদের সেই গরম পানির ঝর্ণার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। পানি পান করানোর পর পুনরায় তাদেরকে জাহান্নামে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

অপরদিকে কতিপয় আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, حَمِيْم জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ"

"এই সেই জাহান্নাম, অপরাধী তথা কাফেররা যাকে অস্বীকার করে– কাফেররা সেই জাহান্নাম এবং হামীম (ফুটন্ত গরম পানির ঝর্ণা)-এর মাঝে প্রদক্ষিণ করবে।"

আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হামীম জাহান্নামের অভ্যন্তরেই কোথাও হবে। এতদসংক্রান্ত অন্য একটি আয়াত নিম্নরূপ– "فَذُوْقُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ"

উক্ত আয়াত হতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হামীম জাহান্নামের ভেতরেই থাকবে।

পরস্পর বিরোধী আয়াতসমূহের মধ্যকার সমন্বয়ন সাধন : মুফাসসিরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উপরিউক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্ব নেই। কেননা জাহান্নামের বহু তাবকাহ হবে। এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হবে। এদের এক স্তরের নাম হবে 'হামীম'। সুতরাং তা পৃথক একটি স্তর হওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামের অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। আবার পৃথক হওয়া স্বত্তেও তা জাহান্নামের একটি স্তর হওয়ার কারণেও জাহান্নামের অন্তর্ভুক্তও বলা যেতে পারে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নামীদেরকে শিকল দ্বারা বেঁধে কখনো জাহীমে (অগ্নিকুণ্ডে) আবার কখনো হামীমে (ফুটন্ত গরম পানি)-এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : জাহান্নামীদেরকে শাসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে, যাদের পূজা করতে, ডাকতে, আজ তোমাদের সেই সমস্ত শরিক এবং ঠাকুর দেবতারা কোথায়? তাদেরকে ডাক, তারা যেন আসে, তোমাদের এ বিপদে তোমাদের সাহায্য করুক, মুক্তি দেক।

কাফেররা তখন অনুশোচনার সুরে বলবে হায়! আজ তারা আমাদের ছেড়ে গিয়েছে, তাদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। বলাবাহুল্য, কাফেররা হঠাৎ নিজ মুখে এক স্বীকারোক্তি করার পর সচেতন হবে এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা করে বলবে, কই আমরা তো কখনো কোনো শরিকই মানি নি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকি নি! আসলে দুনিয়াতেও কাফেরদের অবস্থা তথৈবচ ছিল। কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর রাসূলের সত্যতা স্বীকার করে ফেলে আবার তা অস্বীকার করে বসত। পরকালেও তদ্রূপ করবে। অবশ্য সেদিন জাহান্নামীদের সামনে তাদের উপাস্যদেরকেও হাজির করা হবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ জাহান্নামের জ্বালানি হবে।"

"ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : تَفْرَحُوْنَ শব্দটি فَرَحٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো খুশি হওয়া এবং আনন্দিত হওয়া। আর تَمْرَحُوْنَ শব্দটি مَرَحٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো- "ধন-সম্পদের কারণে অহঙ্কারী ভাব নিয়ে অন্যদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা। مرح সর্বাবস্থায় হারাম এবং নিন্দনীয়। আর فَرَحٌ অর্থাৎ আনন্দ উল্লাস অর্থাৎ সম্পদের গরিমায় আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে সুখ-সম্ভোগ করা এবং এতে আনন্দিত হওয়া হারাম ও নাজায়েজ। অত্র আয়াতে فَرَحٌ -এর দ্বারা একেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- কারুনের কাহিনী বর্ণনাতেও এ অর্থে فَرَحٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ" "বেশি খুশি হয়ো না [ধন-দৌলত ও প্রাচুর্যের আধিক্যের কারণে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়িও না], আল্লাহ তা'আলা এরূপ মাত্রাতিরিক্ত উপভোগকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

আরেক ধরনের فَرَحٌ (আনন্দ) হলো, দুনিয়ার নেয়ামত ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ তা'আলার দান মনে করে এদের উপর খুশি হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েজ বরং মোস্তাহাব ও আদিষ্ট। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে فَرَحٌ -এর দ্বারা একেই বুঝানো হয়েছে। "فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا" অর্থাৎ এর উপর সন্তুষ্টচিত্তে খুশি হওয়া উচিত।

উল্লিখিত আয়াতে فَرَحٌ -এর সাথে কোনোরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। কিন্তু فَرَحٌ -এর সাথে "بِغَيْرِ الْحَقِّ" (অন্যায়ভাবে) কথাটিকে শর্তারোপিত করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ স্বাদ-আস্বাদন ও সুখ-সম্ভোগের উপর খুশি হওয়া হারাম অপরদিকে বৈধ সুখ-সম্ভোগের উপর খুশি হওয়া আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা ছওয়াব ও ইবাদত।

গ্রন্থকার (র.) স্বীয় বক্তব্য إِذْ অর্থাৎ إِذَا -এর দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন? মুহতারাম গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, "إِذِ الْاَغْلَالُ" -এর মধ্যে إِذْ শব্দটি إِذَا -এর অর্থে হয়েছে। বস্তুতঃ এর দ্বারা তিনি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্নটি হলো- আলোচ্য আয়াতে পরকালের কথা বলা হয়েছে- যা ভবিষ্যতে হবে। এর পূর্বে "فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ" শীঘ্রই তারা জানবে- এর দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু إِذْ শব্দটি সাধারণতঃ مَاضِىْ তথা অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ إِذَا শব্দটি ভবিষ্যৎ কালের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এখানে ভবিষ্যৎ কালের বিষয়ে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও إِذْ কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, এখানে إِذْ শব্দটি إِذَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতকালে সংঘটিত বিষয়াদিতে যেমন আমাদের কোনো প্রকার সংশয় নেই তেমনি ভবিষ্যতের অনুষ্ঠিতব্য বিষয়াদির ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোনোরূপ সন্দেহ নেই। এ নিশ্চিত সত্য জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের বহু স্থানে অতীতকালে ব্যবহৃত বহু শব্দকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে ব্যবহৃত করেছেন। এটা সে সব স্থানগুলোর একটি।

ذَم -এর দ্বারা دُخُوْل -কে নির্দিষ্ট না করে مَثْوٰى -কে নির্দিষ্ট করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ" অর্থাৎ অহঙ্কারী তথা কাফেরদের আবাসস্থল কতোইনা নিকৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলেন নি যে, "فَبِئْسَ مَدْخَلُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ" কাফেরদের প্রবেশ করা [বা প্রবেশস্থল] কতইনা নিকৃষ্ট। অর্থাৎ مَثْوٰى কে ذَم দ্বারা বিশেষিত করেছেন مَدْخَلُ কে নয়। কারণ হলো مَثْوٰى স্থায়ী, কিন্তু مَدْخَلُ স্থায়ী নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

অনুবাদ :

৭৭. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِعَذَابِهِمْ حَقٌّ ج فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ فِيْهِ اِنِ الشَّرْطِيَّةُ مُدْغَمَةٌ وَمَا زَائِدَةٌ تُؤَكِّدُ مَعْنَى الشَّرْطِ اَوَّلَ الْفِعْلِ وَالنُّوْنُ تُؤَكِّدُ اٰخِرَهُ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِيْ حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَيْ فَذَاكَ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ فَنُعَذِّبُهُمْ اَشَدَّ الْعَذَابِ فَالْجَوَابُ الْمَذْكُوْرُ لِلْمَعْطُوْفِ فَقَطْ .

৭৭. অতএব হে রাসূল ﷺ ! আপনি সবর অবলম্বন করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক-সত্য- তাদেরকে আজাব দেওয়ার ব্যাপারে- এখন হয়তো অবশ্যই আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো- এখানে اِنْ শর্তজ্ঞাপক -এর ن -কে مَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর مَا হলো অতিরিক্ত। ফে'লের প্রথমে এসে এটা শর্তের অর্থের উপর তাগিদ দেয়। আর ن ফে'লের শেষে হয়ে তাকিদের অর্থ প্রদান করে। এর কিয়দংশ যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদের ব্যাপারে দিচ্ছি অর্থাৎ আজাব। আপনার জীবদ্দশায়। আর শর্তের জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَذَاكَ সুতরাং তা অর্থাৎ তবে তাই হবে। অথবা, আপনাকে মৃত্যু দান করবো- তাদেরকে আজাব দেওয়ার পূর্বেই। আর তখন তাদেরকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তখন আমি তাদেরকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ করবো। কাজেই উল্লিখিত جَوَابٌ শুধু مَعْطُوْفٌ -এর জন্যই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ نَتَوَفَّيَنَّكَ শুধু اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ -এর জবাব হয়েছে।

৭৮. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط رُوِيَ اَنَّهُ تَعَالٰى بَعَثَ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ نَبِيٍّ اَرْبَعَةُ اٰلَافِ نَبِيٍّ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَاَرْبَعَةُ اٰلَافِ نَبِيٍّ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ مِنْهُمْ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج لِاَنَّهُمْ عَبِيْدٌ مَرْبُوْبُوْنَ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ بِنُزُوْلِ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِ قُضِيَ بَيْنَ الرُّسُلِ وَمُكَذِّبِيْهَا بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ اَيْ ظَهَرَ الْقَضَاءُ وَالْخُسْرَانُ لِلنَّاسِ وَهُمْ خَاسِرُوْنَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ .

৭৮. হে রাসূল ﷺ ! আপনার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের মধ্য হতে কারো কারো কথা ঘটনা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো কথা কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী পাঠিয়েছেন, চার হাজার বনূ ইসরাঈল হতে এবং বাকি চার হাজার অন্যান্য সমস্ত মানুষ হতে। আর কোনো রাসূলেরই এ ক্ষমতা ছিল না যে- তাদের মধ্য হতে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থান করবে। কেননা তাঁরা আল্লাহর বান্দা এবং প্রতিপালিত। সুতরাং যখন আল্লাহর আদেশ আসবে কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে- তখন ফয়সালা করে দেওয়া হবে রাসূলগণ এবং তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথভাবে আর তখন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ তখন ফয়সালা এবং ক্ষতি প্রকাশিত হবে। অথচ তারা তৎপূর্বেও সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

তাহকীক ও তারকীব

"فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ" শব্দটির তাহকীক : فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ -এর মধ্যে ف হরফে আতফ, এর পর শর্তজ্ঞাপক إن রয়েছে। এর ن কে مَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। مَا শব্দটি হলো অতিরিক্ত এটা শর্তের অর্থকে তাকিদ করে।

نُرِيَنَّكَ -এর ك অক্ষরটি خِطَابٌ -এর জন্য হয়েছে। نُرِيَنَّ এটা بَابُ إِفْعَالٌ হতে جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ -এর সীগাহ আর ن হলো نُونُ تَاكِيْد بَاثْقِيْلَة -

"مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا" আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : "مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا" এবং "مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ" বাক্যে مِنْهُمْ শব্দটি بَعْض -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। উভয় مِنْهُمْ -ই একটি উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوعٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন– কাফেরদের অন্যায় অত্যাচারে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অবশেষে বিজয় দান করবেন এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করবেন। এটি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। 'আমি তাদেরকে যে সব কথা দিচ্ছি' অর্থাৎ তাদের যে শাস্তির কথা ঘোষণা করছি তার কোনোটি হয়তো আপনাকে দেখিয়ে দেব, যেমন বদরের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয়ে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের পরাজয় এবং অপমানজনক শাস্তি প্রিয়নবী ﷺ -কে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে– অথবা তাদের কোনো কোনো শাস্তি দেখার পূর্বেই আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবো, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আখেরাতে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে আর তাদের আমার নিকট অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেব, এটি নির্ঘাত সত্য। শাস্তি থেকে তাদের রেহাই নেই, হয় আপনার জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করবে, অথবা যদি এরই মধ্যে আপনার ওফাত হয় তবে আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত।

কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতীক্ষায় থাকা : আপাত দৃষ্টিতে "رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ" -এর শান বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো নির্দোষদেরকে যাদের উপর জুলুম করা হয়েছে– তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া সেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান দয়া ও স্নেহের বিরোধী নয়। অপরাধী ও দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তি দেওয়া কারো নিকটই দয়া ও মমতার পরিপন্থি নয়।

মোটকথা, নবী করীম ﷺ কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব লোক ঝগড়া-ঝাটির দ্বারা আপনার সাথে মোকাবিলা করে এবং নিকৃষ্ট ধরনের উপায় অবলম্বন করতঃ আপনাকে নীচ ও হীন করতে চায়, তাদের কথা-বার্তা ও কর্মতৎপরতার জন্য আপনি সবর প্রদর্শন করুন।

যারা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এ দুনিয়ায় আপনার জীবদ্দশায়ই শাস্তি দেব– এটা অত্যাবশ্যক নয়। এখানে কেউ শাস্তি পাক আর না-ই পাক আমার পাকড়াও হতে কেউই নিস্তার পেতে পারে না। মরে গিয়ে তো তাকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন সে স্বীয় কর্মফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভোগ করবে।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, যখন নবী করীম ﷺ মক্কার মুশরিক কর্তৃক নির্যাতন ও মিথ্যারোপের শিকার হয়েছিলেন তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতখানা নাজিল করেন। সুতরাং বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করুন। এতে আপনার উপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু তাতে বিচলিত হয়ে পড়লে চলবেনা; বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। এ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কাফেরদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করবেন তা আল্লাহ তা'আলার ভালো করেই জানা আছে। তিনি সময় মতো সুচারুরূপেই তা সম্পাদন করবেন। সে ব্যাপারে আপনার চিন্তা করা লাগবে না। আপনি শুধু নির্দেশিত পন্থায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে চলতে থাকুন। আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রাখুন। পরিণামে বিজয় মাল্য আপনার গলায়ই শোভা পাবে। আর কাফেররা যে নিপাত যাবে- কুফর ও শিরকের কারণে কি ভয়াবহ পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তা শীঘ্রই তারা টের পাবে।

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ .... وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন- হে রাসূল! আপনার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, নবী রাসূল প্রেরিত হওয়া নুতন কিছু নয়; বরং বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সরল-সঠিক পন্থা প্রদর্শনের নিমিত্তে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তন্মধ্যে আপনি শুধু অন্যতম রাসূল নন; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাদের মধ্যে কারো কারো কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, আর কারো কারো কথা বর্ণনা করিনি। তাদের প্রত্যেকেই যে সত্য ছিলেন, একথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। তাই অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে- "لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" "আমরা নবীগণের সত্যতার ব্যাপারে কোনো প্রকার পার্থক্য করিনা।" সকলকেই সত্য বলে জানি, তাঁরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত, এ কথার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি। এটিই প্রকৃত মু'মিনের কথা। এটিই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের এ উদার নীতিই তাকে বিশ্ব-জনীন জীবন বিধান রূপে পরিগণিত করেছে। পক্ষান্তরে, ইহুদিরা বনী ইসরাঈলী নবী ব্যতীত আর কাউকে মানে না, তদুপরি বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে তারা শত্রুতা রাখে। অপরপক্ষে, খ্রিস্টানরা নবুয়তের স্তর থেকে তাঁকে উন্নীত করে তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলে যা তাদের বলা উচিত নয়। ইসলাম যে পরিপূর্ণ, পূর্ণ পরিণত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত একমাত্র জীবন বিধান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো এই যে, ইসলাম নবী-রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। পবিত্র কুরআনের চিরস্থায়ী ঘোষণা হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সমস্ত নবী রাসূলগণই সত্য, এ পর্যায়ে এটিই শেষ কথা।

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. 'আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত কোনো নিদর্শন পেশ করার ক্ষমতা কোনো রাসূলেরই নেই।'

মোজেজা প্রসঙ্গে : মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বিশেষ বিশেষ মোজেজা প্রদর্শনের আবদার করতো। তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ মোজেজা প্রদর্শন করা নবীর কাজ নয়, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কোনো নবীই মোজেজা প্রদর্শন করতে পারে না। মোজেজা মূলত আল্লাহ তা'আলার কুদরত এবং ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, আর তা তাঁর অনুমতিক্রমে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্জি মোতাবেক যখন ইচ্ছা, যেখানেই ইচ্ছা, যে নবীর দ্বারা ইচ্ছা মোজেজা প্রকাশ করেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরুদের তৈরি অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের মাঝে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলীদের জন্যে পথ তৈরি করে দেন। এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে করীম ﷺ -এর আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তাঁর দোয়ায় সপ্তম হিজরিতে খায়বরে অস্তমিত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এছাড়া মে'রাজের ঘটনার ন্যায় বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এসব কিছুই এক আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, মর্জি এবং শক্তিতেই হয়।

অতএব, হে রাসূল! মক্কার কাফেররা আপনার নিকট যে মোজেজার আবদার করে তা যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কোনো হেকমতের কারণে প্রদান না করেন, তবে আপনি ব্যথিত এবং চিন্তিত হবেন না; বরং সবর অবলম্বন করুন। ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ .

'যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হবে তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা করা হবে, তখন এ বাতিলপন্থিরা সর্বস্বান্ত হবে।'

অর্থাৎ যখন কোনো জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির আদেশ হবে তখন সঠিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। কাফেরদের শাস্তি হবে, আর মু'মিনগণ লাভ করবে বিজয়। বাতিলপন্থি, মিথ্যাবাদী, সত্য-বিরোধী এবং সত্যদ্রোহীরা সেদিন হবে সর্বস্বান্ত।

মক্কার যে সব কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে, বিস্ময়কর মোজেজা সমূহ দেখেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শত্রুতাবশতঃ নতুন নতুন মোজেজার আবদার করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে রয়েছে এ সান্ত্বনা যে, অদূর ভবিষ্যতে এমনও সময় আসবে যখন অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির আদেশ হবে। তখন তারা নিঃশ্চিহ্ন হবে এবং সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যের অনুসারীদের বিজয় লাভ হবে, যেমন বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন, এরপর অষ্টম হিজরিতে অনুষ্ঠিত মক্কা বিজয়ের দিনও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক সাফল্য দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا" : ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করেছি, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি ইরশাদ করেছেন: এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। এরপর আরজ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা কত? তিনি ইরশাদ করেছেন: তিনশত তের। এ হাদীস ইবনে রাহবীয়া তাঁর মুসনাদে, ইবনে হাব্বান তাঁর গ্রন্থে এবং হাকেম মোস্তাদরাকে হযরত আবূ লুবাবার সূত্রে বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী– ২৪/৮৮]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন যে, পবিত্র কুরআনে মোট সাতাশজন নবী রাসূলের নামোল্লেখ করা হয়েছে। মূলত নবী-রাসূলগণের সংখ্যার ইলম এক আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। যাঁদের উল্লেখ করা আল্লাহ তা'আলার মর্জি হয়েছে, কুরআনে কারীমে তিনি তাঁদের উল্লেখ করেছেন। এজন্যেই এ আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে–

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط

তবে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তাফসীরে জালালাইনে এ ব্যাপারে একটি বিরল বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। এতে রয়েছে নবীগণের মোট সংখ্যা আট হাজার। এঁদের মধ্যে চার হাজার বনূ ইসরাঈলের এবং অবশিষ্ট চার হাজার অন্যান্য মানুষ হতে নির্বাচিত হয়েছে। বায়যাবী ও কাশশাফে এ বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের সংখ্যা সংক্রান্ত হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-এর বর্ণনাকেই মুফাসসির ও মুহাক্কিকগণ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

অনুবাদ :

٧٩. اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ قِيْلَ الْاِبِلُ هُنَا خَاصَّةً وَالظَّاهِرُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ .

৭৯. আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু– কথিত আছে যে, এখানে নির্দিষ্টভাবে উটকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু গাভী ও ছাগল উদ্দেশ্য হওয়া প্রকাশ্য। যাতে তোমরা এদের কোনো কোনোটির উপর আরোহণ কর এবং কোনোটি ভক্ষণ কর।

٨٠. وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ مِنَ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالْوَبَرِ وَالصُّوْفِ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ هِيَ حَمْلُ الْاَثْقَالِ اِلَى الْبِلَادِ وَعَلَيْهَا فِي الْبَرِّ وَعَلَى الْفُلْكِ السُّفُنِ فِي الْبَحْرِ تُحْمَلُوْنَ .

৮০. আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার– দুগ্ধ, মাংস, পশম ও লোম ইত্যাদি। আর যাতে তাদের উপর সওয়ার হয়ে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পার আর তা হলো শহর হতে শহরে বোঝা বহন করে নিয়ে যাওয়া। আর তাদের উপর স্থলে এবং নৌকায় সমুদ্রের মধ্যে নৌকায়। তোমাদের পরিবহন করা হয়।

٨١. وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهٖ تُنْكِرُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ وَتَذْكِيْرُ اَيِّ اَشْهَرُ مِنْ تَانِيْثِهٖ .

৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কোন নিদর্শনকে– যা তাঁর একত্ববাদের উপর দলিল তোমরা অস্বীকার করবে? এখানে তাদেরকে তিরস্কার এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। اَيٌّ শব্দটি এর স্ত্রীলিঙ্গ (اَيَّةٌ) হতে প্রয়োগে অধিক প্রসিদ্ধ।

٨٢. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ مِنْ مَصَانِعَ وَقُصُوْرٍ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

৮২. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? তারা তো এদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশি ছিল, এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অনেক বেশি চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে বহু শিল্প ও প্রাসাদ নিদর্শন স্বরূপ রেখে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল, শেষ পর্যন্ত তা তাদের কোন কাজে আসল?

٨٣. فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَرِحُوْا اَيِ الْكُفَّارُ بِمَا عِنْدَهُمْ اَيِ الرُّسُلِ مِنَ الْعِلْمِ فَرَحَ اِسْتِهْزَاءٍ وَضِحْكٍ مُنْكِرِيْنَ لَهٗ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَيِ الْعَذَابُ .

৮৩. যখন তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ আসত প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ সহ খুশি হলো অর্থাৎ কাফেররা যা তাদের নিকট ছিল অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট ইলম হতে ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের আনন্দ এবং তাকে অস্বীকার করার ছলে [কৌতুকের হাসি] হাসত। অতঃপর পরিবেষ্টন করল অর্থাৎ পতিত হলো তাদের উপর যাকে নিয়ে তারা উপহাস করেছিল অর্থাৎ আজাব।

٨٤. فَلَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا اَىْ شِدَّةَ عَذَابِنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ .

৮৪. সুতরাং যখন তারা আমার কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করল অর্থাৎ আমার শাস্তির কঠোরতা তারা বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম আর তাঁর সাথে যাদেরকে শরিক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম।

٨٥. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا ط سُنَّتَ اللّٰهِ نَصَبُهٗ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مِنْ لَفْظِهٖ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ج فِى الْاُمَمِ اَنْ لَّا يَنْفَعُهُمُ الْاِيْمَانُ وَقْتَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ تَبَيَّنَ خُسْرَانُهُمْ لِكُلِّ اَحَدٍ وَهُمْ خَاسِرُوْنَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ .

৮৫. আমার আজাব প্রত্যক্ষ করার পর তাদের ঈমান কোনো উপকারে আসল না। আল্লাহর চিরন্তন নীতি এখানে سُنَّةَ [সুন্নাত] শব্দটি তা হতে নির্গত একটি উহ্য فِعْل -এর কারণে مَصْدَرْ [তথা مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ] হওয়ায় নসব বা যবরবিশিষ্ট হয়েছে। যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত রয়েছে, তা কোনো উপকারে আসেনি। আর তখন কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সকলের সামনে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অবশ্য তৎপূর্বেও সর্বদা তারা ক্ষতিগ্রস্তই ছিল।

তাহকীক ও তারকীব

"فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" আয়াতাংশে দুটি مَا কোন অর্থে হয়েছে? : "فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ" -এর مَا শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে–

১. مَا শব্দটি এখানে نَافِيَةْ [না জ্ঞাপক] হবে। অর্থাৎ তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজেই আসল না।

২. এটা প্রশ্নবোধক হবে। অর্থ হবে তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজে আসল ?

আবার "مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" -এর ما ও দুটি অর্থে হতে পারে–

১. উক্ত مَا শব্দটি مَوْصُوْلَهْ হবে। এর অর্থ হবে– "الَّذِىْ كَانُوْا يَكْسِبُوْنَهٗ" অর্থাৎ তারা যা উপার্জন করত। ، যমীরকে হজফ করা হয়েছে।

২. উক্ত مَا মাসদারের অর্থবোধক হবে। আয়াতের অর্থ হবে– "مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ كَسْبُهُمْ" অর্থাৎ তাদের উপার্জন [করা] তাদের কোনো উপকারে আসে নি।

"سُنَّتَ اللّٰهِ" -এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী "سُنَّتَ اللّٰهِ" মহল্লান মানসূব হয়েছে। আর এটা মানসূব হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে–

১. এটা হতে গঠিত এর পূর্বে অবস্থিত একটি فِعْل -এর مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হওয়ার দরুন। বাক্যটি হবে– قَدْ سَنَّ سُنَّةَ اللّٰهِ الخ

২. এটা تَحْذِيْرْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبْ হয়েছে। সুতরাং বাক্যটি হবে– "اِحْذَرُوْا يَا اَهْلَ مَكَّةَ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ" "হে মক্কাবাসীরা! অতীত জাতিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার গৃহীত নীতিকে ভয় কর। প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।"

"فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ" আয়াতাংশে اَيَّ-এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী "فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ؟" -এর মধ্যে اَيَّ শব্দটি تُنْكِرُوْنَ ফে'লের مَفْعُوْلٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। اَيَّ প্রশ্নবোধক হওয়ার কারণে এটা বাক্যের শুরুতে হয়েছে এবং ফে'লের পূর্বে হওয়া জায়েজ হয়েছে। কেননা اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধক শব্দের জন্য বাক্যের প্রারম্ভে হওয়া- (صَدَارَتُ كَلَامٍ) নির্ধারিত।

তবে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, اَيَّ না হয়ে যদি اَيُّهَا হতো, তাহলে এটা مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হতো।

"لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا" আয়াতাংশে مِنْ -এর অর্থ : আল্লাহর বাণী- "لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا" -এর মধ্যস্থিত مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض (অংশ বিশেষ)-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ ঐ পশুদের একাংশের তথা কতিপয়ের উপর যেন তোমরা সওয়ার হতে পার।

"اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ الخ" আয়াতাংশে **হামযাহ-এর** مَدْخُوْلٌ কি? আল্লাহর বাণী اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا الخ -এর মধ্যে হামযাহ -এর مَدْخُوْلٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো "عَجَزُوْا" মূলত বাক্যটি হলো, اَعَجَزُوْا فَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ الخ অর্থাৎ তারা কি অক্ষম হয়ে গেছে- যে কারণে তারা জমিনে ভ্রমণ করেনি।

"فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ" আয়াতাংশের **তারকীব কর** : আল্লাহর বাণী "فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ" -এর তারকীব নিম্নরূপ- ف হরফে আতফ لَمْ يَكُ ফে'লে নাকেসের خَبَرٌ হয়েছে এবং اِيْمَانُهُمْ এর اِسْمٌ হয়েছে। يَنْفَعُهُمْ বাক্য হয়ে لَمْ يَكُ ফে'লে নাকেস এর ইসম ও ফে'লসহ জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে নাকেসাহ হয়েছে।

আল্লাহর বাণী "هُنَالِكَ" -এর মহল্লে ই'রাব : هُنَالِكَ শব্দটি ظَرْفُ مَكَانٍ তথা স্থানাধার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রূপকার্থে ظَرْفُ زَمَانٍ কালাধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ظَرْفٌ হওয়ার কারণে এটা مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ ..... اَللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা** : ইরশাদ হচ্ছে, মানুষের উপকারেই আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তু, উট, ঘোড়া প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্য হতে মানুষ কোনো কোনো জন্তুর মাংস আহার করে, কোনো কোনোটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে, তার পৃষ্ঠে বোঝা চাপিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। তাদের চামড়া, পশম এমন কি হাড়-গোড় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। স্থলে তাদের পীঠে এবং জলে নৌকার বুকে আরোহণ করে দূর-দূরান্তে যাত্রা করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কতভাবে তাঁর নিদর্শনাদি মানুষকে দেখিয়ে থাকেন, তবুও মানুষের দৃষ্টি চেতন পায় না, আল্লাহ তা'আলা আরো নিদর্শনাদি দেখাতে থাকবেন, দেখা যাক মানুষ তার কোন নিদর্শন কত অস্বীকার করতে পারে?

অত্র আয়াতের তাৎপর্য হলো, তোমরা যদি শুধু তামাশা দেখার জন্য ও চিত্তা-বিনোদনের জন্যই মোজেজা দেখার দাবি না করে থাক; বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদ ও পরকাল মেনে নেওয়ার জন্য যে দাওয়াত তোমাদেরকে দিতেছেন এটা সত্য কি-না তারই নিশ্চয়তা লাভ করতে চাও, তাহলে সে জন্য আল্লাহর এই নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট। যা দিবস-রজনী প্রতি মুহূর্ত তোমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় আসছে। প্রকৃত ব্যাপার বুঝাবার জন্য এ নিদর্শনরাজি বর্তমান থাকতে অন্য কোনো নিদর্শনের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কাফেরদের মোজেজার দাবির জবাবে বলা হয় তৃতীয় বক্তব্য। কুরআনে মাজিদের একাধিক স্থানে ইতঃপূর্বে এ জবাব উদ্ধৃত হবে।

বান্দার উপর আল্লাহর নিয়ামতরাজি তাঁর একত্ববাদের দলিল : পৃথিবীতে যেসব জন্তু ও পশু মানুষের খেদমত করছে, বিশেষ করে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট ও ঘোড়া এ সবকে সৃষ্টিকর্তা এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন যে, এগুলো অনায়াসে মানুষের পালিত সেবক হতে পারছে। এটা দ্বারা মানুষের বহু প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। তারা এতে সওয়ার হচ্ছে। তাদের দ্বারা ভার বহনের কাজ নিচ্ছে। চাষাবাদের কাজে এদের ব্যবহার করছে। তাদের দুধ বের করে পান করে এবং তা হতে দধি,

মাখন, ঘি, পনির, লাসসি, ও নানা প্রকারের হালুয়া মিঠাই তৈরি করছে। মানুষ তাদের গোশত ভক্ষণ করে, তাদের চর্বি ব্যবহার করছে, তাদের লোম, পশম, খাল, আতুড়ি, রক্ত ও গোবর প্রত্যেকটি জিনিসই মানুষের উপকারে আসে। এটা কি স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাকে দুনিয়ায় পয়দা করার পূর্বেই তার এ অসংখ্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করার জন্যই এই পশুগুলোকে বিশেষ পরিকল্পনায় এসব গুণের আকার করে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেন এগুলোর দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ পানি দ্বারা ভরে দিয়েছেন, কেবল অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ বানিয়েছেন। ভূ-পৃষ্ঠের এ স্থলভাগে মানব ছড়িয়ে পড়া ও তাদের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসায়ের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য পানি, নদী, সমুদ্র ও বাতাসের নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক যেন জাহাজ ও নৌকা চলাচল করতে পারে। জমিনের উপর এমন দরকারি দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি হওয়ারও প্রয়োজন ছিল যা ব্যবহার করে মানুষ জাহাজ চালাতে সক্ষম হতে পারে। এসব হতে এ কথাটি প্রমাণিত হয়না যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক দয়াময় সুবিজ্ঞ আল্লাহই মানুষ, জমিন, পানি, নদী-সাগর, বাতাস এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী বানিয়েছেন। মানুষ যদি শুধু জাহাজ চলাচলের ব্যাপারটিই চিন্তা করে তবে তাতে তারকাসমূহের অবস্থিতি ও গ্রহের নিয়ামত আবর্তন হতে যে সাহায্য লাভ করা যায় তাও অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, কেবল জমিনই নয়, আসমানের সৃষ্টিকর্তাও সেই এক ও লা শরীক আল্লাহ।

সেই সাথে এ কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যে মহান সুবিজ্ঞ আল্লাহ এত অগণিত জিনিস ও দ্রব্যাদি মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য দান করেছেন এবং তার স্বার্থ সুবিধার্থে এ সব জিনিস সংগ্রহ করে দিয়েছেন তিনি এমন অন্ধ ও বধির হবেন যে, তিনি মানুষের নিকট হতে এ সবের কখনো হিসাব গ্রহণ করবেন না, কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ কি এটা চিন্তা করতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও তাওহীদের উপর দলিল পেশ করার প্রশ্ন রেখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো তার নিদর্শনাদি তাওহীদের প্রমাণাদি তোমাদের সামনে পেশ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও পেশ করতে থাকবেন। সুতরাং তাদের কোনোটাকে অস্বীকার করতে পারবে? অর্থাৎ তাদের কোনোটিকেই তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না। এ সব নিদর্শনাবলি সুস্পষ্ট ও অকাট্য। তাদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার কোনোরূপ অবকাশ নেই।

"لِتَرْكَبُوْا وَلِتَبْلُغُوْا" ফে'লদ্বয়ে লামে তা'লীল দাখিল করা এবং অন্যান্য ফে'লে না করার ফায়দা : আল্লাহ তা'আলার বাণী اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الخ -এর মধ্যে "لِتَرْكَبُوْا" ও لِتَبْلُغُوْا ফে'লদ্বয়ে লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য فِعْلٌ -এর মধ্যে লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়নি– এর ফায়দা কি?

এর ফায়িদা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লামা যামাখশরী (র.) তাফসীরে কাশশাফে উল্লেখ করেছেন যে, হজের অনুষ্ঠানে এবং জিহাদে পশুর উপর সওয়ার হওয়া হয়তঃ ওয়াজিব, না হয় মোস্তাহাব। হজ ও জিহাদ উভয় দীনি প্রয়োজন ও কর্তব্য। এ জন্যই এদের ব্যাপারে লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে পানাহার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি মুবাহ বা জায়েজ। সেহেতু তাদের জন্য লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয় নি।

কুরআনে মাজীদের অন্যস্থানেও এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূরায়ে আনআমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–"وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের উপর আরোহণ করতে পার এবং তারা তোমাদের জন্য সৌন্দর্যবর্ধক হয়। এখানে لِتَرْكَبُوْا -এর উপর লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু "زِيْنَةً" -এর উপর লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা "فِى الْفُلْكِ" না বলে "عَلَى الْفُلْكِ" বলেছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ" তথা ঐ পশুদের উপর এবং নৌকার উপর তোমাদেরকে সওয়ার করা হয়।

অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা فِى الْفُلْكِ না বলে عَلَى الْفُلْكِ বলেছেন কেন?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, নৌকায় উত্তোলিত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপারে فِىْ ও عَلٰى দুটোই ব্যবহার করা চলে যেমন– "وَضَعَ فِى الْفُلْكِ" এবং "وَضَعَ عَلَى الْفُلْكِ" দুভাবে বলাই জায়েজ ও সহীহ। কিন্তু عَلٰى শব্দটি যেহেতু اِسْتِعْلَاءٌ বা উচ্চ মর্যাদা-এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে, সেহেতু এখানে আল্লাহ তা'আলা "فِى الْفُلْكِ" -এর পরিবর্তে "عَلَى الْفُلْكِ" বলেছেন। কেননা উভয় প্রয়োগের মধ্যে এটা উত্তম।

"اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا ..... مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" আয়াতের তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করলে দেখতে পেত– অতীতে তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ঐশ্বর্য সম্পদের অধিকারী হয়েও বহু জাতি আল্লাহর আজাব হতে মুক্তি পায় নি। অতএব, তারা রেহাই পাবে কি করে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত, বান্দার প্রতি তাঁর অসংখ্য অগণিত নিয়ামতরাজির উল্লেখ করেছেন। আর যারা সেগুলোর অস্বীকার করে কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য উক্ত আয়াতে হুমকি ও ধমকি উচ্চারণ করা হয়েছে।

ইমাম রাযী (র.)-এর ফায়িদা উল্লেখ করতে যেয়ে লিখেছেন যে, একমাত্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লোভে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে অনর্থক তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে। এ সকল পার্থিব সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় হকের সামনে যারা মাথানত করতে প্রস্তুত নয়, তারা দুনিয়ার বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে দিল। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের এই কর্মকৌশল ও হীন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বাতিল ও ফাসেদ। কেননা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। কেউই দুনিয়াতে চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে দেখলেই এর ভুরি ভুরি নজির পাওয়া যাবে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর সাথে হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল তাদের কি ভয়াবহ পরিণতিই না হয়েছিল। এর প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করা হয়েছে– "اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا الخ" অর্থাৎ কাফেররা কি জমিনে ভ্রমণ করে নি যে, তারা সেই লোকদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়ে গিয়েছে? তাদের সংখ্যা তো মক্কার কাফেরদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। শক্তিমত্তার দিক দিয়েও তারা এদের অপেক্ষা ছিল অধিক। তারা জমিনে এই লোকদের অপেক্ষা অধিক চাকচিক্যময় ও জাঁকজমক পূর্ণ চিত্র-স্থাপত্যশিল্প ও প্রমোদমালা রেখে গিয়েছে। কিন্তু এসব কিছু তাদের কোনো কাজে আসে নি, আল্লাহর আজাব ও গজব হতে তাদের সংখ্যার আধিক্য, অধিক শক্তিমত্তা ও শিল্পকলা তাদেরকে নাজাত দিতে পারে নি।

সুতরাং পূর্ববর্তীদের ইতিহাস হতে শিক্ষাগ্রহণ করে মক্কার মুশরিক ও কাফেরদের উচিত আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে এদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাদের মেনে নেওয়া আর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাদের ইহ-পরকালীন কল্যাণ।

"فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ..... بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে যে, অতীত উম্মতদের কাছে যখন তাদের পয়গাম্বর আল্লাহর নির্দশনাদি নিয়ে আসতেন তখন তারা বলত এ সমস্ত নিদর্শনাদি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা যা জানি তাই যথেষ্ট, এ বলে তারা তাদের ভ্রান্ত প্রত্যয় আকীদা-বিশ্বাস এবং কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকত এবং এতে গর্ববোধ ও গর্ব প্রকাশ করত। তারা তাদের নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ভ্রান্ত প্রত্যয়ের তুলনায় পয়গম্বরদের শিক্ষা-দীক্ষাকে তুচ্ছ মনে করত। তাঁদের বিদ্রূপ করত। বলাবাহুল্য, তাদের এ ঠাট্টা-বিদ্রূপই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

"فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" অর্থাৎ সেই অপরিণামদর্শী এবং অস্বীকারকারীদের নিকট যখন আল্লাহর রাসূল তাওহীদ ও ঈমানের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল তখন তারা নিজেদের ইলমকে আম্বিয়ায়ে কেরামের ইলম হতে উত্তম মনে করে নবীগণের ইলমকে প্রত্যাখ্যান করতে লাগল। এ ইলম যার উপর কাফেররা খোশ ও মগ্ন ছিল এবং যার মোকাবিলায় নবী-রাসূলগণের ইলমকে প্রত্যাখ্যান করত– এটা হয়তঃ এ কারণে ছিল যে, তারা ছিল বদ্ধ মূর্খ, তারা অসত্য এবং বাতিলকে সত্য ও সহীহ মনে করে বসেছিল। যেমন– ইউনানী দর্শনে ইলাহ সম্পর্কীয় অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা এই ধরনের যার স্বপক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। এদেরকে বদ্ধ মূর্খতাই বলা চলে। তাদেরকে জ্ঞান নামে আখ্যায়িত করা জ্ঞানের কলঙ্ক ছাড়া আর কি?

অথবা, তাদের উক্ত ইলম দ্বারা পার্থিব বিদ্যাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কলা সম্পর্কীয় বিদ্যা। এতে বাস্তবিকই তারা অভিজ্ঞ ছিল। সূরায়ে রূমের একটি আয়াতে নিম্নোক্তভাবে তাদের এ ইলেমের উল্লেখ করা হয়েছে– "يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ" অর্থাৎ তারা দুনিয়ার পার্থিব জীবন এবং তাকে ভোগ করার ব্যাপারে তো কিছু জ্ঞান রাখে। কিন্তু আখেরাতে যেখানে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে, যেখানকার শান্তি ও অশান্তি স্থায়ী হবে, তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাস । আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার এ পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর অর্থ হবে– তারা যেহেতু কেয়ামত এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতের শাস্তি ও দুর্গতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও গাফেল সেহেতু তাদের এ পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর খুশি হয়ে এতে মগ্ন হয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের (আ.) ইলমের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেছে না।

এর তাফসীরে সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) তাফসীরে যিলালে বলেন– ঈমান ও আদর্শহীন জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো বিপর্যয়ের নামান্তর এটা মানুষকে গোমরাহ ও অন্ধ করে ছাড়ে। আদর্শবিহীন জড় জ্ঞান মানুষকে বিভ্রান্তির অতল তলে তলিয়ে দেয়। কেননা এ পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী নিজেকে সত্যিকার জ্ঞানী মনে করে। সে মনে করে যে, সত্য ও ন্যায়ের হুকুমই দিতেছে অথচ এটা যে নিরেট অসত্য, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা বুঝাবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই। তার জ্ঞানের পরিসর যে একেবারেই সীমিত ও অপূর্ণ তা যদি সে বুঝার চেষ্টা করত তাহলে আর বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকত না এবং নবী-রাসূলগণের ঐশী জ্ঞানের মোকাবিলায় কখনো নিজেদের ইলমকে যথেষ্ট মনে করত না, নবী-রাসূলগণের জ্ঞানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহস দেখাতো না।

সুতরাং তাদের নিজেদের ভ্রান্তিপূর্ণ ও অত্যন্ত সীমিত ও পরিমিত জ্ঞানকে নবীগণের ঐশীজ্ঞান যা পরিপূর্ণ ও নির্ভুল– তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, প্রত্যাখ্যান করা তাদের জ্ঞানের অন্তরঃসারশূন্যতা ও তাদের অপরিণাম-দর্শীতাকেই প্রমাণ করে।

জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) একটি অভিনব তাফসীর করেছেন। তিনি বলেছেন– রাসূলগণ যখন প্রকাশ্য মোজেজাসহ তাদের নিকট আসল তখন তাদের উপস্থাপিত ইলমকে দেখে কাফেররা উপহাসের হাসি হাসল এবং তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং তাঁর মতে عِنْدَهُمْ -এর هُمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো রাসূলগণ। অথচ অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতে এই هُمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফেররা।

عِنْدَهُمْ -এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা এবং উভয় সম্ভাবনার আলোকে عِلْم -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" অর্থাৎ "যখন তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসলেন তখন তারা তাদের নিজস্ব ইলম নিয়েই নিমগ্ন রইল।"

আলোচ্য আয়াতে عِنْدَهُمْ -এর যমীরের দুটি مَرْجِعْ হতে পারে–

১. উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফেররা। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত।

২. এর যমীরের مَرْجِعْ হলো রাসূলগণ।

প্রথমোক্ত অভিমত অনুযায়ী যদি মেনে নেওয়া হয় যে, عِنْدَهُمْ -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফেররা– তাহলে এর অর্থ কি হবে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন–

এক. ইলম দ্বারা সেই ইলমকে বুঝানো হয়েছে যাকে কাফেররা প্রকৃত ইলম বলে মনে করত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে নিছক অনুমান ভিত্তিক বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তারা বলত–

(١) وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ.
১. যুগই তো আমাদের ধ্বংস করে থাকে।

(٢) وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا.
২. আল্লাহ চাইলে না আমরা শিরক করতাম না আমাদের পূর্বপুরুষগণ।

(٣) مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ.
৩. জরাজীর্ণ হওয়ার পর কে তাকে জীবিত করেন?

৪. "আর যদি আমার রবের প্রতি আমাকে ফিরে যেতে হয় তাহলে আবশ্যই আমি দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম নেয়ামত লাভ করব।"

وَلَئِنْ رُدِدْتُّ إِلٰى رَبِّىْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا .

মোটকথা, তারা এসব কল্পনা প্রসূত কথা-বার্তার দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করত এবং নবীগণের ইলেম তথা ঐশীবাণীকে প্রত্যাখ্যান করত। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ" প্রত্যেকেই নিজেদের ইলম ও জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত।

দুই. এখানে ইলম দ্বারা দার্শনিকদের ইলমকে বুঝানো হয়েছে। তারা নবী-রাসূলগণের ইলমের মোকাবিলায় নিজেদের ইলমকে উত্তম মনে করত এবং রাসূলগণের ইলমকে প্রত্যাখ্যান করত ও তার বিরোধিতা করত। কথিত আছে যে, দার্শনিক সক্রেটিস কয়েকজন নবীর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তাকে নবীগণের নিকট যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, আমরা নিজেরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। সুতরাং হেদায়েত লাভের জন্য আমাদের কারো নিকট যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তিন. এটা দ্বারা পার্থিব জগতের বাস্তব ইলমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি সংক্রান্ত ইলম এ প্রকারের ইলমের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে রূমে ইরশাদ করেছেন-

"يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" .

অর্থাৎ, তারা বৈষয়িক জগত ও তা হতে কল্যাণ লাভের বিষয়ে বাহ্যত কিছু জ্ঞান রাখে। অথচ পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ- একেবারেই উদাসীন, বিলকুল গাফেল। তাদের ইলমের বহর এতটুকুই।"

সুতরাং এর পর রাসূলগণ যখন তাদের নিকট এসে ঐশীবাণী উপস্থাপন করলেন তখন তারা নিজেদের ইলমকে যথেষ্ট মনে করল এবং রাসূল যেই ইলম তাদের নিকট পেশ করলেন তাকে অস্বীকার করল, প্রত্যাখ্যান করল।

আর যদি عِنْدَهُمْ -এর هُمْ এর مَرْجِعْ রাসূলগণ হন তাহলে আয়াতের অর্থ হবে- "রাসূলগণ যখন প্রকাশ্য মোজেজাসসহ কাফেরদের নিকট আসল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত ইলেম কাফেরদের নিকট পেশ করলেন তখন তারা উপহাস করে তা প্রত্যাখ্যান করল।" অত্র আয়াতের উক্ত তাফসীর- তখনই প্রযোজ্য হবে যখন فَرِحُوْا -এর যমীর-এর মারজি' (مَرْجِعْ) হবে কাফেররা। আর فَرِحُوْا -এর যমীরের مَرْجِعْ যদি রাসূলগণ হয় তাহলে অর্থ হবে- "যখন রাসূলগণ প্রকাশ্য মোজেজাসহ আগমন করলেন, [আর কাফেররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল] তখন রাসূলগণ স্বীয় ইলম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন, আর কাফেররা যে আজাবের ব্যাপারে উপহাস করল সেই আজাব তাদের উপর পতিত হলো।"

"فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ" **উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা :** আজাব এসে পড়ার পর তারা ঈমান গ্রহণ করল, কিন্তু এ সময় ঈমান গ্রহণ করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস শরীফে এসেছে- "يَقْبَلُ اللّٰهُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ" অর্থাৎ মৃত্যুর কম্পন ও রূহ টেনে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন। কিন্তু যখন মৃত্যুর গরগরা আরম্ভ হয় তখনকার তওবা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা তখনকার ঈমান হলো اِضْطِرَارِىْ তথা অস্বাভাবিক বাধ্যগত ঈমান। অথচ বান্দাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ঈমান গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে- যাকে "اِيْمَانْ اِخْتِيَارِىْ" বলে।

মোটকথা, আজাব আসার পূর্ব মুহূর্তে যখন আল্লাহর প্রতাপ এবং তাঁর আজাব তাদের চোখের সম্মুখে মূর্ত হয়ে উঠে, তখন তাদের চেতনা হয়, ভুল ভাঙ্গে, তাদের ঠাকুর দেবতা এবং শিরক যে ভুল, এ কথা বুঝতে পেরে তারা তখন ঈমান আনে এবং তওবা করে। অথচ সময় তখন পার হয়ে গেছে। আল্লাহর আজাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান এবং তওবা কোনো কাজেই আসে না। কেননা দেখার পর তো আপনা-আপনিই, শত অনিচ্ছা স্বত্বেও মানুষ সত্যকে বিশ্বাস করতে বাধ্য এ বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, মর্যাদা নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. حٰمٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ.

১. হা-মীম -এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٢. تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُبْتَدَأٌ.

২. এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এখানে تَنْزِيْلٌ মুবতাদা এবং পরবর্তী আয়াতের كِتٰبٌ -এর খবর।

٣. كِتٰبٌ خَبَرُهٗ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ بُيِّنَتْ بِالْاَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا مِنْ كِتٰبٍ بِصِفَتِهٖ لِقَوْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِفُصِّلَتْ يَعْلَمُوْنَ يَفْهَمُوْنَ ذٰلِكَ وَهُمُ الْعَرَبُ.

৩. এটা এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত অর্থাৎ এতে বিধানাবলি, ঘটনাবলি ও নসিহতসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত। কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। قُرْاٰنًا শব্দটি كِتٰبٌ থেকে তার সিফতসহ حَالٌ আর لِقَوْمٍ শব্দটি فُصِّلَتْ -এর সাথে সম্পর্কিত। জ্ঞানী লোকদের জন্যে যারা বুঝে এবং তারা হলো আরববাসী।

٤. بَشِيْرًا صِفَةُ قُرْاٰنًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ سِمَاعَ قَبُوْلٍ.

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে بَشِيْرًا শব্দটি قُرْاٰنًا -এর সিফত অতঃপর তাদের অধিকাংশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা শুনে না কবুল করার জন্যে শুনে না।

٥. وَقَالُوْا لِلنَّبِيِّ قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ اَغْطِيَةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ ثِقْلٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ خِلَافٌ فِي الدِّيْنِ فَاعْمَلْ عَلٰى دِيْنِكَ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ عَلٰى دِيْنِنَا.

৫. এবং তারা মহানবী ﷺ-কে বলে, আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে পর্দায় আবৃত যে বিষয়ের দিকে আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দেন। এবং আমাদের কর্ণে আছে বোঝা অর্থাৎ আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনাদের মাঝে রয়েছে অন্তরাল। ধর্মের ভিন্নতা অতএব আপনি আপনার ধর্মের কাজ করুন, আমরা আমাদের ধর্মের কাজ করি।

٦. قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ بِالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّلْمُشْرِكِيْنَ.

৬. বলুন, আমিও তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু একমাত্র মাবুদ। অতএব তার দিকে ঈমান ও আনুগত্যের সাথে নিবিষ্ট হও। এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। وَيْلٌ শব্দটি দুর্ভোগ মূলক শব্দ।

٧. الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ تَاكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ ـ

৭. যারা জাকাত আদায় করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। هُمْ যমীর তাকিদের জন্যে।

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ مَقْطُوْعٍ ـ

৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছেও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَنْزِيْلٌ : মাসদার যা اِسْمِ مَفْعُوْلٌ অর্থে হয়েছে, মুবতাদা, আর كِتَابٌ হলো খবর।

সংশয় : تَنْزِيْلٌ হলো نَكِرَه -এর মুবতাদা হওয়া কিভাবে বৈধ হতে পারে?

নিরসন : مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হলো تَنْزِيْلٌ -এর সিফত। যার কারণে تَخْصِيْص হয়ে মুবতাদা হওয়া সহীহ হয়ে গেছে। উহ্য ইবারত হবে اَلْمُنَزَّلُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَوْلُهُ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ : এটা كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ كِتَابٍ بِصِفَتِهِ : অর্থাৎ قُرْاٰنًا টা كِتَابٌ থেকে حَالٌ হয়েছে।

সংশয় : كِتَابٌ হলো نَكِرَه এটা ذُو الْحَالِ হতে পারে না। যেহেতু ذُو الْحَالِ -এর জন্য مَعْرِفَة হওয়া জরুরি।

নিরসন : فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ যেহেতু كِتَابٌ -এর সিফত। কাজেই كِتَابٌ -এর ذُو الْحَالِ হওয়া বৈধ হয়েছে حَالٌ مِنَ الْكِتَابِ بِصِفَتِهِ -এর এই উদ্দেশ্য; بِصِفَتِهِ -এর بَا، টি سَبَبِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ لِقَوْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِفُصِّلَتْ : এটাও একটি সংশয়ের জবাব।

সংশয় : কুরআনের আয়াত তো সকলের জন্যই مُفَصَّلٌ এবং সুস্পষ্ট, এরপরও قَوْمٍ عَاقِلٍ -এর সাথে কেন تَخْصِيْص করেছেন?

নিরসন : যদিও কুরআনি আয়াত فِىْ نَفْسِه সকলের জন্যই مُفَصَّلَة এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু যেহেতু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানগণই এর দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন তাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কে تَخْصِيْص করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَشِيْرًا صِفَةُ قُرْاٰنًا : بَشِيْر হলো قُرْاٰن -এর সিফত উভয়টিই كِتَابٌ থেকে حَالٌ অথবা نَعْت হওয়া, আরবের تَخْصِيْص এই জন্য হয়েছে যে, আরবগণ কুরআনকে কোনো মাধ্যম ব্যতীত অনুধাবনকারী এবং প্রথম مُخَاطَبٌ অনারবের বিপরীত।

قَوْلُهُ قَالُوْا : এটা وَقْرٌ -এর প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করেছে। এর দ্বারা বধির উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُوْنَ : এর আতফ হয়েছে لَا يُؤْتُوْنَ -এর উপর اَلَّذِيْنَ -এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে هُمْ যমীরে ফসলকে حَصْر -এর জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ تَاكِيْد : এর এক অর্থ তো এটাই যে, দ্বিতীয় هُمْ টা প্রথম هُمْ -এর تَاكِيْد হয়েছে। এবং تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ তে রয়েছে যে, كَافِرُوْنَ টা مُشْرِكِيْنَ -এর تَاكِيْد হয়েছে। মনে হয় যেমন এটা এই প্রশ্নের জবাব যে, যখন তাদের صِفَتِ شِرْك কে বর্ণনা করে مُشْرِكِيْنَ বলে দিল তখন পুনরায় هُمْ كَافِرُوْنَ -এর কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তরের সার হলো كَافِرُوْنَ টা مُشْرِكِيْنَ -এর تَاكِيْد কাজেই অহেতুক হয়নি।

قَوْلُهُ مَمْنُوْن : এটা বাবে نَصَرَ -এর مَنٌّ থেকে اِسْمِ مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। অর্থ– কম করা হলো, কর্তন করা হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা [ফুসসিলাত] হা-মীম আস সেজদা প্রসঙ্গে :

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এতে ৬টি রুকু, ৫৪টি আয়াত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ : এ সূরার নাম সূরাতুল সেজদা, সূরা হা-মীম সেজদা, সূরাতুল মাসাবীহ এবং এ সূরাকে সূরা ফুসসিলাত'ও বলা হয়।

এ সূরার **ফজিলত :** হযরত রাসূলে কারীম ﷺ প্রত্যেক রাত্রে এ সূরা এবং সূরা মুলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুমিন তাওহীদ, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন এবং কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। আর এ সূরায় প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি মৃত্যুর পর সে জীবন আসবে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়নে অনীহা প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

قَوْلُهُ حٰمٓ : হা-মীম এর অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবগত রয়েছেন। একে হরফে মোকাত্তাআত বলা হয়। এ সম্পর্কে সূরায়ে বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তিনটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। ১. এটি হলো আল্লাহ তা'আলার ইসমে আজম। ২. এটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩. হা-মীম আর রাহমানের সংক্ষিপ্ত রূপ। অভিধানবেত্তা জুযাজ (র.) এ মতই পোষণ করতেন। আর সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) এবং আতা খোরাসানী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম হাকীম, হামীদ হাইয়্যান, হালীম, হান্নান থেকে 'হা' গ্রহণ করা হয়েছে আর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম মালিক, মাজিদ এবং মান্নান থেকে মীম গ্রহণ করা হয়েছে তাই হা-মীম হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৯৩৫]

পারস্পরিক স্বাতন্ত্রের জন্যে 'আল হা-মীম, অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরো কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণ সূরা মুমিনের হামীমকে 'হা-মীম আল মুমিন এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা-মীম' আস-সিজদাহ অথবা হা-মীম ফুসসিলাতও বলা হয়। এ সূরার এ দুটি না সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরাইশ গোত্র, তাদের সামনে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে। তারা কুরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসংখ্য মোজেজা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জবাবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াত আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কুরআন আরবি ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কুরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ - تَفْصِيْل -এর আসল অর্থ বিষয়বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কুরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলি, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থিদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আজাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন পাকের আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারি হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কুরাইশরা এসব সত্ত্বেও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব : আলোচ্য সূরায় কুরাইশ কাফেরদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামি আন্দোলনেকে নস্যাৎ করার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর ন্যায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজন স্বীকৃতি কুরাইশ সরদার হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে যান। ফলে কুরাইশ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেজ ইবনে কাছীর মুসনাদে বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূণ্য বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আসসীরাত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃতি করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ স্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃতি করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কুরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের কাছে কতাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধ প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, [ওতবার ডাক নাম] আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতাও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোনো একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান? আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কুরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কুরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোনো কাজ করবো না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোনো জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব। সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা ফুসসিলাত তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করতে করতে যখন فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন ওতবা তার মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদার আয়াতে পৌছে সিজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন, আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম! আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল খবর এই–

إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ وَاللّٰهِ مَا هُوَ بِالسِّحْرِ وَلَا بِالشِّعْرِ وَلَا بِالْكَهَانَةِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيْعُوْنِيْ وَاجْعَلُوْهَا لِيْ خَلُّوْا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيْهِ فَاعْتَزِلُوْهُ فَوَاللّٰهِ لَيَكُوْنَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِيْ سَمِعْتُ نَبَأٌ فَإِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيْتُمُوْهُ بِغَيْرِكُمْ وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ.

অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায় তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবিলা ও তাকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। কেননা তার এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কুরাইশদের সহযোগিতা ব্যতীত তাকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব ও তার ইজ্জত হবে তোমাদেরই ইজ্জত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ : এক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পরি না। দুই. আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কুরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কুরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে আছে– وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহফেও রয়েছে।

এর জবাব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারগ, আমাদের অন্তরে আরবণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কুরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারগই সাব্যস্ত করেনি; বরং এর সারমর্ম যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়; বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। –[বয়ানুল কুরআন]

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গাম্বরসুলভ জবাব : কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির; বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবিলায় কোনো কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ তা'আলা নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মোজেজা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী ছওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ। অর্থাৎ তারা জাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর জাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরজ হওয়ার পূর্বেই কাফেরদের জাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে কাছীর এর জবাবে বলেন যে, আসলে জাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাজের সাথে ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুজ্জাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় জাকাত ফরজ ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কি না : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধানাবলি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করুক। ঈমানের পরে ফরজ কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব তাদের উপরে যখন জাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জবাব এই যে, অনেক ফিকহবিদদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাদের মতে আয়াতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে জাকাত না দেওয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি। বরং তাদের জাকাত না দেওয়ার ভিত্তিগদতহ০ক ছিল কুফর এবং জাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে জাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া।

–[বয়ানুল কুরআন]

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামি বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জবাবে বলেন যে, কুরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরিবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কুরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করতো। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ : مَمْنُوْنٍ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোনো সময় কোনো অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোনো ওজরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করতো, তার ওজর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে শরহুস সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা.) থেকে এবং রাজীনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

অনুবাদ :

٩. قُلْ اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ الْاُوْلٰى لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ الْاَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ط شُرَكَاءَ ذٰلِكَ رَبُّ مَالِكُ الْعٰلَمِيْنَ جَمْعُ عَالَمٍ وَهُوَ مَا سِوَى اللّٰهِ وَجُمِعَ لِاخْتِلَافِ اَنْوَاعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ تَغْلِيْبًا لِلْعُقَلَاءِ .

৯. বলুন, তোমরা কি অস্বীকার কর সে সত্তাকে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে রবি ও সোমবারে এবং তার জন্যে সমকক্ষ শরিক স্থির কর? اَئِنَّكُمْ শব্দটির মধ্যে দ্বিতীয় হামযাকে তাহকীক ও তাসহীল এবং উভয় অবস্থার মধ্যে উভয় হামযার মধ্যে আলিফের সাথে পড়া যাবে। তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা মালিক عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ -এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সমস্ত কিছুকে আলম বলা হয়। عَالَمٌ বিভিন্ন প্রকৃতির ধরনের হওয়ার কারণে عَالَمِيْنَ বহুবচন আনা হয়েছে। জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানহীন বস্তুর চেয়ে অধিক হওয়ার কারণে عَالَمِيْنَ কে ى ও ن দিয়ে বহুবচন করা হয়েছে।

١٠. وَجَعَلَ مُسْتَاْنِفٌ وَلَا يَجُوْزُ عَطْفُهٗ عَلٰى صِلَةِ الَّذِيْ لِلْفَاصِلِ الْاَجْنَبِيِّ فِيْهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا بِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ وَالزُّرُوْعِ وَالضُّرُوْعِ وَقَدَّرَ قَسَّمَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا لِلنَّاسِ وَالْبَهَائِمِ فِيْٓ تَمَامِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط اَيِ الْجَعْلُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهٗ فِيْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَالْاَرْبِعَاءِ سَوَآءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ اَيْ اِسْتَوَتِ الْاَرْبَعَةُ اِسْتِوَاءً لَا تَزِيْدُ وَلَا تَنْقُصُ لِّلسَّآئِلِيْنَ عَنْ خَلْقِ الْاَرْضِ بِمَا فِيْهَا .

১০. তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। উক্ত বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ তথা স্বাতন্ত্র্য বাক্য। এবং এটাকে পূর্বের اَلَّذِيْ ইসমে মাওসূলের সেলার উপর আতফ করা বৈধ হবে না। কেননা তাদের মধ্যখানে সম্পর্কবিহীন বাক্য দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। তাতে কল্যাণ, বরকত রেখেছেন। অধিক পানি ও ফলমূল ও দুগ্ধজাত প্রাণী দিয়ে এবং তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। বণ্টন করেছেন, এতে বসবাসকারী মানুষ ও পশুপাখির জন্যে পূর্ণ চারদিনের মধ্যে। অর্থাৎ পর্বতমালা স্থাপন ও খাদ্যের ব্যবস্থা সবকিছু পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন করেছেন। এবং جَعْلِ جِبَالٍ -এর সাথে যা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবস্থা দুদিনে তথা মঙ্গল ও বুধবার করেছেন। পৃথিবী ও এটার বস্তুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের জন্যে। سَوَآءً শব্দটি مَفْعُوْل مُطْلَق -এর মাসদার হিসেবে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتَوَتِ الْاَرْبَعَةُ اِسْتِوَاءً তথা পূর্ণ চারদিন সমান ছিল এতে কোনো কম ও বেশি ছিল না।

١١. ثُمَّ اسْتَوٰٓى قَصَدَ اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ بُخَارٌ مُرْتَفِعٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا اِلٰى مُرَادِيْ مِنْكُمَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط فِيْ مَوْضِعِ الْحَالِ اَيْ طَائِعَتَيْنِ اَوْ مُكْرَهَتَيْنِ .

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, এবং এটা ছিল ধোঁয়া ঊর্ধ্বগামী ধূম্রকুঞ্জ অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস তোমাদের ব্যাপারে আমার হুকুম পালনের দিকে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। طَوْعًا ও كَرْهًا উভয়টি অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ طَائِعَتَيْنِ ও مُكْرَهَتَيْنِ -এর অর্থে।

قَالَتَا أَتَيْنَا بِمَنْ فِيْنَا طَائِعِيْنَ فِيْهِ تَغْلِيْبُ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ أَوْ نُزِّلَتَا لِخِطَابِهِمَا مَنْزِلَتَهُ .

তারা বলল, আমরা আমাদের সাথে বস্তুসমূহ নিয়ে স্বেচ্ছায় আসলাম। এখানে জ্ঞানী পুংলিঙ্গের প্রাধান্য দিয়ে طَائِعِيْنَ শব্দটিকে ى ও ن দ্বারা বহুবচন আনা হয়েছে। এবং উভয়কে সম্বোধনের মধ্যে জ্ঞানীদের স্থলে রাখা হয়েছে।

১২. فَقَضٰهُنَّ الضَّمِيْرُ يَرْجِعُ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّهَا فِيْ مَعْنَى الْجَمْعِ الْآئِلَةِ إِلَيْهِ أَيْ صَيَّرَهَا سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ الْخَمِيْسِ وَالْجُمُعَةِ فَرَغَ مِنْهَا فِيْ أٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْهُ وَفِيْهَا خُلِقَ أٰدَمُ وَلِذَالِكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا سَوَاءً وَوَافَقَ مَا هُنَا أٰيَاتُ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَأَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ط الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ بِنُجُوْمٍ وَحِفْظًا ط مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ أَيْ حَفِظْنَاهَا عَنِ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِيْنِ السَّمْعَ بِالشُّهُبِ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ فِيْ مُلْكِهِ الْعَلِيْمِ بِخَلْقِهِ .

১২. অতঃপর তিনি দুদিনে বৃহস্পতি ও শুক্রবার আকাশমণ্ডলীকে সপ্ত আকাশ করে দিলেন। জুমার দিনের শেষ প্রান্তে তিনি এটার সৃষ্টির সমাপ্ত করলেন। এবং এই দিনেই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। তাই এখানে سَوَاءً তথা পূর্ণ দিন বলেননি। فَقَضٰهُنَّ -এর যমীর اَلسَّمَاء -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, কেননা سَمَاء ভবিষ্যৎ হিসেবে বহুবচন অর্থাৎ আসমানকে সাত আসমান করে দিলেন। অতএব উক্ত আয়াতের মর্মার্থ 'আসমান জমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, আয়াতের সাথে মিল হয়েছে। এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। এতে অবস্থানকারীদের প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আমি দুনিয়ার আসমানকে প্রদীপমালা তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। حِفْظًا শব্দটি উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হিসেবে মানসূব হয়েছে অর্থাৎ حَفِظْنَاهَا حِفْظًا عَنِ اسْتِرَاقِ الشَّيْطَانِ السَّمْعَ بِالشُّهُبِ তথা আমি অগ্নি শিখা দ্বারা এটাকে সংরক্ষণ করেছি, যাতে শয়তান গোপনে চুরি করে কোনো প্রত্যাদেশ শুনতে না পারে। এটা পরাক্রমশালী, তার রাজত্বে সর্বজ্ঞ তার সৃষ্টজগত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা।

১৩. فَإِنْ أَعْرَضُوْا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَنِ الْإِيْمَانِ بَعْدَ هٰذَا الْبَيَانِ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ خَوَّفْتُكُمْ صٰعِقَةً مِثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَ أَيْ عَذَابًا يُهْلِكُكُمْ مِثْلَ الَّذِيْ أَهْلَكَهُمْ .

১৩. অতঃপর তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান থেকে এই বয়ানের পরও তবে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলাম এই কঠোর আজাব সম্পর্কে আদ ও সামূদের আজাবের মতো। অর্থাৎ এমন আজাব যা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।

١٤. إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَيْ مُقْبِلِينَ عَلَيْهِمْ وَمُدْبِرِينَ عَنْهُمْ فَكَفَرُوا كَمَا سَيَأْتِي وَالْإِهْلَاكُ فِي زَمَنِهِ فَقَطْ أَنْ أَيْ بِأَنْ لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّٰهَ ط قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَلٰى زَعْمِكُمْ كٰفِرُونَ.

১৪. যখন তাদের নিকট সম্মুখ ও পিছন দিক থেকে রাসূলগণ এসেছিলেন অর্থাৎ ধারাবাহিকতার সাথে নবীগণ এসেছিলেন অতঃপর তারা অস্বীকার করেছে। যেমন সামনে বর্ণিত হবে। আজাব দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগেই তাদের ধ্বংস হওয়া ও এরপর নয়। এবং তারা বলতো যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না। তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের ধারণা মতে তোমাদের রিসালাতের প্রতি পূর্ণ অস্বীকারকারী।

١٥. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوٓا لَمَّا خُوِّفُوا بِالْعَذَابِ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط أَيْ لَا أَحَدَ كَانَ وَاحِدُهُمْ يَقْلَعُ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ مِنَ الْجَبَلِ يَجْعَلُهَا حَيْثُ يَشَآءُ أَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوا بِاٰيٰتِنَا الْمُعْجِزَاتِ يَجْحَدُونَ.

১৫. আর আদ জাতি পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং তারা বলল, যখন তাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করা হলো আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে? অর্থাৎ কেউ নেই। তাদের মধ্যে একা এক ব্যক্তি পাহাড় থেকে বড় পাথর বহন করে ইচ্ছাধীন যে কোনো স্থানে নিয়ে যেত। তারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর। অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলি মোজেজাসমূহ অস্বীকার করতো।

١٦. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا بَارِدَةً شَدِيدَةَ الصَّوْتِ بِلَا مَطَرٍ فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِهَا مَشْؤُومَاتٍ عَلَيْهِمْ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ الذُّلِّ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى أَشَدُّ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ بِمَنْعِهِ عَنْهُمْ.

১৬. অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝাঞ্ঝাবায়ু প্রচণ্ড শব্দ বিশিষ্ট ঠাণ্ডা বৃষ্টি বিহীন বায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে نَحِسَاتٍ শব্দটিকে ح বর্ণে যের ও সাকিন উভয়ভাবে পড়া যাবে। অর্থাৎ তাদের জন্য অশুভ দিন যেন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আজাব আস্বাদন করাই। আর পরকালের আজাব তো আরো লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা তাদের থেকে আজাবকে দূর করার জন্যে কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

١٧. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنٰهُمْ بَيَّنَّا لَهُمْ طَرِيقَ الْهُدٰى فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى اِخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ الْمُهِيْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

১৭. আর ছামূদ জাতি, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম তাদেরকে হেদায়েতের পথের বর্ণনা দিয়েছিলাম অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই কুফরিকে পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আজাবের বিপদ এসে ধৃত করলো।

١٨. وَنَجَّيْنَا مِنْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ.

১৮. এবং আমি এটা থেকে উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও আল্লাহকে ভয় করতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَئِنَّكُمْ : এতে চারটি কেরাত রয়েছে। তবে মুফাসসির (র.)-এর ইবারত দ্বারা শুধুমাত্র দুটি কেরাত জানা যাচ্ছে। প্রথম হামযা তো সর্বদা مُحَقَّقْ হয়ে থাকে। অবশ্য দ্বিতীয় হামযাতে تَحْقِيْق এবং تَسْهِيْل উভয়ই জায়েজ। উভয় সুরতে উভয় হামযার মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি করে। এই দুই কেরাত হয়ে গেল। অথচ تَرْكُ اِدْخَالِ اَلِفٍ -এর সুরতে দুটি কেরাত আরো রয়েছে। এভাবে চার কেরাত হয়ে যায়। কাজেই মুফাসসির (র.) যদি وَتَرْكُهُ বৃদ্ধি করতেন তবে চারো কেরাতের দিকে ইঙ্গিত হয়ে যেত। আসল ইবারত এই হওয়া উচিত ছিল اِدْخَالُ اَلِفٍ وَتَرْكُهُ (اَىْ اِدْخَالُ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْاُوْلٰى بِوَجْهَيْهَا

قَوْلُهُ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ : হামযাটা اِسْتِفْهَامِيَّة اِنْكَارِىْ হয়েছে اِنَّ এবং لَامِ تَاكِيْد -এর জন্য। হামযাটা صَدَارَتْ কে চাওয়ার কারণে مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে। আর كُمْ হলো اِنَّ -এর اِسْم আর لَامْ টা تَاكِيْد -এর জন্য। আর تَكْفُرُوْنَ كَلَام টা জুমলা হয়ে اِنَّ -এর খবর হয়েছে। আর تَجْعَلُ -এর عَطْف হয়েছে تَكْفُرُوْنَ -এর উপর।

قَوْلُهُ لَهُ : এটা تَجْعَلُوْنَ -এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আর اَنْدَادًا হলো প্রথম মাফউল ذٰلِكَ হলো মুবতাদা। আর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো اَلَّذِىْ স্বীয় صِلَه -এর সাথে مُتَّصِفْ হওয়ার সাথে [উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা।]

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ : এতে বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী وَاوْ টি عَاطِفَة -এর জন্য। এবং جَعَلَ -এর আতফ خَلَقَ -এর উপর হয়েছে। তবে আবুল বাকা ও অন্যান্যরা وَاوْ টা عَاطِفَة হওয়ার ব্যাপারে اِنْكَارْ করেছেন। এবং وَاوْ -কে اِسْتِنَافِيَة মনে করে বাক্যকে مُسْتَانِفْ বলেছেন। অস্বীকারের কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, যদি جَعَلَ -এর আতফ خَلَقَ -এর করা হয় তবে اَلَّذِىْ মওসূলের অধীনে প্রবেশ করার কারণে সেলাহ এর অংশ হবে আর এটা জায়েজ নেই। কেননা يَجْعَلُوْنَ لَهُ الخ টা جُمْلَة مُعْتَرِضَة হয়েছে। আর সেলাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে صِلَة -এর মধ্যে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِىْ জায়েজ নেই।

কেউ কেউ جَعَلَ -এর আতফ خَلَقَ -এর উপর জায়েজ বলেছেন। এবং আবুল বাকা এর অস্বীকারের এই উত্তর দিয়েছেন যে, এই দুই আতেফা জুমলার মাঝে আগত বাক্য مُعْتَرِضَة -এর সদৃশ। আর দুই مَعْطُوْف বাক্যের মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة অনেক স্থানেই পতিত হয়। কাজেই বিশুদ্ধ কথা হলো خَلَقَ -এর উপর جَعَلَ -এর আতফ হওয়ার উপর কোনো اِعْتِرَاضْ নেই। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ فِيْ يَوْمَيْنِ : অর্থাৎ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمَيْنِ কেননা يَوْم -এর অস্তিত্ব সূর্য উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সাথে হয়ে থাকে, আর সেই সময় সূর্যের অস্তিত্বই ছিল না। তবে يَوْم -এর অস্তিত্ব কিভাবে হচ্ছিল?

قَوْلُهُ جَمَعَ لِاخْتِلَافِ اَنْوَاعِهِ : ফায়েদা উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. عَالَمٌ হলো اِسْمِ جِنْس যার اِطْلَاقْ হয়ে থাকে مَاسِوَى اللّٰهِ -এর উপর। আর جَمْع -এর জন্য কমপক্ষে তিন اَفْرَادْ হওয়া জরুরি। অথচ عَالَمٌ মাত্র একটি।

উত্তর. عَالَمٌ -এর যেহেতু বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন– عَالَم جِنّ ـ عَالَم اِنْس ـ عَالَم اٰخِرَت ـ عَالَم دُنْيَا ـ عَالَم مَلَائِكَة ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হিসেবে اَلْعَالَمِيْنَ কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ تَغْلِيْبًا لِلْعُقَلَاءِ : এই ইবারত দ্বারাও একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : عَالَمٌ হলো ذَوِي الْعُقُوْل এবং غَيْر ذُو الْعُقُوْل উভয়ের সমষ্টির নাম। আর عَالَمٌ -এর মধ্যে অধিকাংশই হলো غَيْر ذَوِي الْعُقُوْل কাজেই এর বহুবচন يَاء এবং نُوْنْ দ্বারা না হওয়া চাই। কেননা يَا এবং نُوْنْ দ্বারা ذَوِي الْعُقُوْل -এর বহুবচন আসে।

নিরসন : عَالَمٌ -এর মধ্যে যদিও ذَوِي الْعُقُوْل -এর তুলনায় غَيْر ذَوِي الْعُقُوْل -এর সংখ্যার আধিক্য অনেক বেশি। কিন্তু জ্ঞান এমন এক মূল্যবান জওহার যা সকল সিফতের উপর প্রাধান্য পায়। আর ঐ সিফতের মোকাবিলায় সমস্ত সিফতই বেহুদা ও অর্থহীন। তাই ذَوِي الْعُقُوْل -এর স্বল্পতা সত্ত্বেও غَيْرُ ذَوِي الْعُقُوْل -এর উপর প্রাধান্য দিয়ে يَاء এবং نُوْن দ্বারা বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ تَمَامِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ : দুদিন সাবেক যাতে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে এবং দু'দিন لَاحِقْ যাতে জীবিকা নির্ধারণের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে উভয়টি মিলে সর্বমোট চারদিন হলো। শুধু জীবিকা নির্ধারণই চারদিন নয়। কেননা সামনে سَبْع سَمٰوَات সৃষ্টির আলোচনা আসছে। উহার সৃষ্টির সময়ও দুদিন বলা হয়েছে। যদি تَقْدِيْر اَقْوَاتْ তথা জীবিকা নির্ধারণের সময় চার দিন মেনে নেওয়া হয়। যেমন বাহ্যত বুঝা যায় তবে اَيَّام تَخْلِيْق -এর সামষ্টিক সংখ্যা আট হয়ে যাবে। অথচ সমগ্র সৃষ্টিতে ছয় দিনের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

قَوْلُهُ سَوَاءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ : سَوَاءً টা اِسْتَوَتْ উহ্য ফে'লের مَصْدَرٌ بِلَفْظِهٖ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে এবং জুমলা হয়ে اَيَّامٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِلسَّائِلِيْنَ : এর সম্পর্ক হয়েছে سَوَاءً -এর সাথে অর্থাৎ مُسْتَوِيَةٌ لِلسَّائِلِيْنَ اَيْ جَوَابُ السَّائِلِيْنَ فِيْهَا কেউ কেউ لِلسَّائِلِيْنَ -এর সম্পর্ক উহ্যের সাথে করেছেন। উহ্য ইবারত হলো– هٰذَا الْحَصْرُ لِلسَّائِلِيْنَ (تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ) سَوَاءً لَا يَتَغَيَّرُ بِسَائِلٍ بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ (صَاوِيْ)

قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ : প্রশ্ন. এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আসমানের সৃষ্টি পৃথিবীর সৃষ্টির পরে হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا দ্বারা এর বিপরীত বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্বে আকাশের সৃষ্টি হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী বিস্তৃত করা। অর্থাৎ পৃথিবীর মূল উপাদানের সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে তবে জমিনের বিস্তৃতি পরে হয়েছে কাজেই কোনো দ্বন্দ্ব বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ مُرَادِيْ : অর্থাৎ تَاثِيْرٌ فِي السَّمَاءِ وَتَاثِيْرٌ فِي الْاَرْضِ যা আমার উদ্দেশ্য তার تَكْمِيْل করো।

قَوْلُهُ طَائِعِيْنَ فِيْهِ تَغْلِيْبُ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ الخ : ফায়দা. এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা।

সংশয় : أَرْض এবং سَمَاء টা لَا يَعْقِلُ হওয়ার কারণে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর হুকুমে হয়েছে। কাজেই طَائِعَتَيْنِ বলা উচিত ছিল।

নিরসন : أَرْض এবং سَمَاء যদিও مُؤَنَّثْ তবে এই উভয়টি ذَوِي الْعُقُوْلِ এবং غَيْر ذَوِي الْعُقُوْلِ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কাজেই ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ذَوِي الْعُقُوْلِ-কে غَيْر ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে جَمْع مُذَكَّرْ-এর বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَنَزَّلْنَا : এতে উল্লিখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব রয়েছে। এর সার হলো اِئْتِيَا বলে যখন জমিন ও আসমানকে مُخَاطَب বানানো হয়েছে। তখন যেন তাদেরকে ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এ কারণেই এর বহুবচন وَاوْ এবং نُوْن দ্বারা নেওয়া হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর উক্তি اَوْ نَزَّلْنَا لِخِطَابِهِمَا مَنْزِلَتَهُ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই।

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِيْ مَعْنَى الْجَمْعِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : فَقَضٰهُنَّ-এর যমীর اَلسَّمَاءُ-এর দিকে ফিরেছে যা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর হুকুমে হয়েছে। কাজেই তার চাহিদা ছিল فَقَضَاهَا বলা।

নিরসন : নিরসনের সার হলো سَمَاء টা قَضَاء এবং تَصْيِيْر-এর পরে যেহেতু সপ্তাকাশে পরিণত হওয়ার ছিল তাই مَا يَؤُوْلُ-এর ভিত্তিতে বহুবচন মেনে فَقَضٰهُنَّ কে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ الْآئِلَةُ اِلَيْهِ : এটা اَلْ يَؤُوْلُ হতে اِسْم فَاعِلْ-এর সীগাহ অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারী।

قَوْلُهُ وَافَقَ : এটা فِعْل مَاضِي আর مَا هُنَا হলো তার فَاعِلْ আর اِيَاتْ হলো وَافَقَ-এর মাফঊল।

قَوْلُهُ اَمْرَهَا الَّذِيْ اُمِرَ بِهِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ : এখানে اَمْرَهَا মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মওসূফ আর الَّذِيْ হলো اِسْم مَوْصُوْل আর اُمِرَ হলো فِعْل مَاضِي مَجْهُوْل আর بِهِ হলো اُمِرَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর مَنْ হলো نَائِب আর فِيْهَا হলো مَوْجُوْدٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে صِلَة হয়েছে। এখন مَوْصُوْل এবং صِلَة মিলে اُمِرَ-এর نَائِب مَوْصُوْلَه আর اَلطَّاعَة হলো فَاعِلْ হয়েছে। ফে'ল তার مُتَعَلِّقْ এবং نَائِب فَاعِلْ কে নিয়ে مُبَيَّنْ হয়েছে। আর مِنْ হলো بَيَانِيَّه আর اَلطَّاعَةِ মা'তূফ আলাই ও মা'তূফ মিলে وَالْعِبَادَةِ হলো এখন مُبَيِّنْ ও مُبَيَّنْ মিলে اَلَّذِيْ-এর صِلَة হয়েছে। সেলাহ এবং মওসূল মিলে সিফত হয়েছে اَمْرَهَا-এর। এখন مَوْصُوْف এবং صِفَت মিলে اَوْحٰى-এর مَفْعُوْل بِهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ شُهُبٌ : এটা شِهَابٌ-এর বহুবচন। অর্থ– অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উজ্জ্বল নক্ষত্র।

قَوْلُهُ لَنْ : اَنْ-এর মধ্যে তিনটি কারণ হতে পারে–

১. এটা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ-এর সুরতে ضَمِيْر شَانْ তার উহ্য اِسْم হবে অর্থাৎ اَنَّهُ لَا تَعْبُدُوْا

২. مَصْدَرِيَّةٌ نَاصِبٌ لِلْمُضَارِعِ . لَا نَاهِيَة

৩. এটা مُفَسِّرَة কেননা مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ টা قَوْل হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেননা اَنْ مُفَسِّرَه-এর জন্য জরুরি হলো যে, তার পূর্বে قَوْل অথবা قَوْل-এর সমার্থবোধক অথবা قَوْل-এর উপর দালালতকারী কোনো শব্দ হওয়া। যদি مَجِيْئِ رَسُوْل-এর দালালত قَوْل-এর উপর না মানা হয় তবে اَنْ تَفْسِيْرِيَّة মানা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا : এর عَطْف হয়েছে فَاسْتَكْبَرُوْا-এর উপর।

قَوْلُهُ صَرْصَرًا : صَرٌّ-এর অর্থ– তুষার, বরফ, শীতের প্রকোপ, লু-হাওয়ার গরম বাতাস, তপ্ত হাওয়া। আল্লামা খাযেন বাগদাদী (র.) লিখেন صَرٌّ-এর মধ্যে দুটি দিক রয়েছে–

১. অধিকাংশ মুফাসসির (র.) এবং তাবাতাবেঈদের মতে صَرٌّ অর্থ অত্যধিক ঠান্ডা, কনকনে শীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ (র.) এটাই বলেছেন।

২. গরম লু-হাওয়া যা ধ্বংসকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এরূপও একটি বর্ণনা রয়েছে। আহলে লোগাতের মধ্য থেকে ইবনে আম্বারী ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা কাজী বায়যাবী (র.) বলেন, এ ব্যবহার ঠাণ্ডার জন্যই প্রচলিত। যেমন– صَرْصَرٌ এটা মূল মাসদার। যা صِفَتٌ হিসেবে ব্যবহার হয় (لُغَاتُ الْقُرْآنِ مُلَخَّصًا) মুফাসসির (র.) بَارِدَةٌ شَدِيْدَةٌ الصَّوْتِ বলে উভয় অর্থকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مَشْئُوْمٌ : এটা سَعِيْدٌ -এর বিপরীত অর্থ– হতভাগ্য, অমঙ্গল চিহ্নিত, জঘন্য, অকল্যাণ।

قَوْلُهُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى : اَخْزٰى মূলত مُعَذَّبٌ -এর সিফত عَذَابٌ -এর দিকে مُبَالَغَةً রূপে اِسْنَادِ مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা আজাব হলো অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ, স্বয়ং অপমান নয়। سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ بَيَّنَّا لَهُمْ طَرِيْقَ الْهُدٰى : এই বাক্যটি فَهَدَيْنَاهُمْ -এর তাফসীর। এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এখানে هِدَايَةٌ দ্বারা اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ উদ্দেশ্য اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ مِنْهَا : অর্থাৎ مِنَ الصَّاعِقَةِ الَّتِىْ نَزَلَتْ بِثَمُوْدٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, এমন মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরিক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকুতে এভাবে উল্লিখিত রয়েছে–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেওয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোনটির পর কোনটি এবং কোন কোন দিনে সৃজিত হয়েছে : বয়ানুল কুরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কুরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোনটির পরে কোনটি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে **এক**. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, **দুই**. সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াত এবং **তিন**. সূরা নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত–

أَأَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا .

বাহ্য দৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা সূরা বাকারা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। –[বয়ানুল কুরআন, সূরা বাকারা]

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাই মাওলানা থানভী (র.) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতির ভাষা নিম্নরূপ–

فَسَوَّاهُنَّ فِى يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَى الْاَرْضَ وَدَحْيُهَا اَنْ اَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعٰى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالرِّمَالَ وَالْجَمَادَ وَالْاٰكَامَ مَا بَيْنَهُمَا فِى يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ . فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى دَحَاهَا .

ইবনে কাছীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃতি করেছেন–

মদীনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও সোমবার, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীরের মতে হাদীসটি غَرِيْبٌ [অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দুর্বলসূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে– وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অর্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিশারদগণ উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাছীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর ঘটনা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল– اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً –[মাযহারী]

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনোটিকেই কুরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাছীর মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কুরআনের আয়াতকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্র করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেগেছে।

তৃতীয়ত জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলী সৃজনে দুদিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দুদিনের বর্ণনা নেই। বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চারদিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযি'আতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল কুরআনের বক্তব্য অবাস্তব নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এপর দুদিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদনদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْأَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে- وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ এতে তাফসীরবিদগণ একমত যে, এই চারদিন প্রথমোক্ত দুদিনসহ, পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কুরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْأَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ বলার পর যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হতো তবে মোট চারদিন আপনা আপনিই জানা যেত, কিন্তু কুরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হলো মোট চার দিন। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চারদিনন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। দুদিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের خَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا বাক্যের আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا : ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কুরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরি ছিল না; বরং ভূ-গর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীবজন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاۤءً لِّلسَّاۤئِلِيْنَ : اَقْوَاتٌ শব্দটি قُوْتٌ -এর বহুবচন। অর্থ- রিজিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। -[যাদুল মাসীর]

হযরত হাসান ও সুদ্দী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিজিক ও রুজি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাতও দ্রব্য পোশাক-পরিচ্ছেদ বিভিন্নরূপে হয়েছে। কোনো ভূখণ্ডে গম, কোনো ভূখণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা কোথাও পাট, কোথাও সেব, কোথাও আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহহাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোনো ভূখণ্ডই অন্য ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতা মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোনো কোনো ভূখণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূগর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ বাক্যটি অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোনো সময় চার থেকে কম ও কোনো সময় চার থেকে কিছু বেশিও হতে থাকে; কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِّلسَّائِلِينَ -এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জারীর ও দুররে মানসূরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চারদিনে হয়েছে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

ইবনে যায়েদ প্রমুখ কোনো কোনো তাফসীরবিদ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِلسَّائِلِينَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سَائِلِينَ -এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سَائِلِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

ইবনে কাছীর এ তাফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কুরআনে এ আয়াতের অনুরূপ– وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

قَوْلُهُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ : কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়। বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তাফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোনো রূপক অর্থ নেই। বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জবাব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তাফসীরে বাহরে মুহীতে এ তাফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তাফসীর উদ্ধৃত করে কারো কারো এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জবাব সেই ভূখণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জবাব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহর বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে 'বায়তুল মামুর' বলা হয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ : অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! যদি তবুও তারা [সত্য গ্রহণে] বিমুখ হয়, তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির আজাবের ন্যায় আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।

আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত, কুদরত এবং অনন্ত করুণার নিদর্শনসমূহ দেখার পরও যদি মক্কার কাফেররা ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত না হয়, তবে হে রাসূল ﷺ ! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আদ এবং ছামূদ জাতি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে যেভাবে আজাব ভোগ করেছে এবং নিশ্চিহ্ন হয়েছে ঠিক তেমনি আজাব সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। আদ ও ছামূদ জাতি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছিল, হযরত হূদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন আদ জাতির নিকট এবনিভাবে ছামূদ জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত সালেহ (আ.) কিন্তু আদ ও ছামূদ জাতি নবীগণের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার স্থলে তাদের বিরোধিতা করে, সত্যদ্রোহীতার অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরাও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি কর, তাঁর রাসূলের বিরোধিতা কর তবে কোপগ্রস্ত আদ ও ছামূদ জাতির ভয়াবহ পরিণতি তোমাদের হতে পারে।

قَوْلُهُ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ .... بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ : অর্থাৎ তাদের নিকট যখন তাদের সম্মুখ এবং পশ্চাত এক কথায় সবদিক থেকে নবী রাসূলগণ এ নির্দেশ নিয়ে আসেন যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করো না, তারা বলেছিল, যদি আমাদের প্রতিপালক এমন ইচ্ছা করতেন তবে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।

আলোচ্য আয়াতের مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ [সম্মুখ পশ্চাৎ থেকে] কথার তাৎপর্য হলো, নবী রাসূলগণ মানুষকে সত্য গ্রহণের আহ্বানের পাশাপাশি অতীতে যারা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের যে শাস্তি হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে তথা আখেরাতে তাদের কি শাস্তি হবে তারও উল্লেখ করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো নবী রাসূলগণ তাদের অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে উত্তমভাবে তাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, নবী-রাসূলগণ সর্বদিক থেকে তাদের নিকট আগমন করেছেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

قَوْلُهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ : অর্থাৎ কাফেররা বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, মানুষ কি করে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হবে? অতএব রেসালাতের দাবিকে আমরা সত্য মনে করি না এবং আপনাদের বর্ণিত বিষয়গুলোকে আমরা মানি না। এভাবে আদ ও ছামূদ জাতির দূরাত্মা কাফেররা হযরত হূদ (আ.) এবং হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, আপনারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, মানুষ হিসেবে সকলেই সমান, আপনাদেরকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না। এরপরই আদ ও সামূদ জাতির প্রতি আসমানি আজাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

হতভাগা আদ ও ছামূদ জাতির এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এ মর্মে যে, যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে না মান তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে বিশেষ সান্ত্বনা এ মর্মে যে, হে রাসূল ﷺ ! মক্কার কাফেররা যদি আপনাকে অবিশ্বাস করে তবে তাতে দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই, কেননা ইতিপূর্বে যখনই কোনো নবী রাসূল এসেছেন তখনই কাফেররা তাদের সঙ্গে এমন আচরণই করেছে যা মক্কার কাফেররা আপনার সাথে করছে। আর আদ ও ছামূদ জাতি এমন ধ্বংসাত্মক আচরণ করেই ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আদ জাতির অন্যায় অনাচার, দম্ভ-অহংকার এবং তাদের শাস্তির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً : আর আদ জাতির ব্যাপার এই যে, তারা অযথা পৃথিবীতে বড়াই করতো এবং বলতো, আমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কে?

আদ জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল, তারা পাহাড়ের বড় বড় পাথরকে উঠিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতো, তাদের দৈহিক শক্তির দম্ভ ছিল অনেক বেশি, তারা বলতো আমাদের কোনো ভয় নেই, আমরা যে কোনো বিপদের মোকাবিলা করতে পারি, আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারে এমন কেউ নেই, কাজেই আমাদেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে কোনো লাভ হবে না। কারো কোনো আজাবের ভয়কে আমরা পরওয়া করি না। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. অর্থাৎ তবে কি তারা লক্ষ্য করে না? নিশ্চয়ই যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতো।

অর্থাৎ তারা যখন নিজেকে শক্তিশালী বলে দাবি করে তখন এ সত্য ভুলে যায় যে, পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেকে শক্তি দান করেছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন।

মূলত, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, অর্থাৎ তারা মনে মনে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের সত্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও দম্ভ অহমিকার কারণে তা অস্বীকার করতো, তাদের এ হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا : এটা صَاعِقَةً এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও ছামূদের صَاعِقَةً বলে বর্ণিত হয়েছে। صَاعِقَةً শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صَاعِقَة বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صَاعِقَة ছিল। একাই رِيحٌ صَرْصَرٌ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝাঞ্ঝাবায়ু যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। -[কুরতুবী]

যাহহাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হতো। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুত যে কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব এসেছে তা বুধবারেই এসেছে। -[কুরতুবী, মাযহারী]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

قَوْلُهُ فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ : ইসলামের নীতি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোনো দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝাঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরি হয় না।

-[মাযহারী, বয়ানুল কুরআন]

অনুবাদ :

١٩. وَ اذْكُرْ يَوْمَ يُحْشَرُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ الْمَفْتُوْحَةِ وَضَمِّ الشِّيْنِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ يُسَاقُوْنَ.

১৯. এবং আপনি স্মরণ করুন যেদিন আল্লাহ তা'আলার শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। يُحْشَرُ শব্দটির শুরুতে ى ও ن এবং ش বর্ণে পেশ এবং أَعْدَاءُ -এর মধ্যে ফাতহার সাথে পড়বে।

٢٠. حَتّٰى إِذَا مَا زَائِدَةٌ جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

২০. তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। إِذَا مَا -এর مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত।

٢١. وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَا شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَيْ أَرَادَ نُطْقَهُ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ قِيْلَ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْجُلُوْدِ وَقِيْلَ هُوَ مِنْ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالَّذِيْ بَعْدَهُ وَمَوْقِعُهُ تَقْرِيْبُ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى إِنْشَائِكُمْ اِبْتِدَاءً وَإِعَادَتِكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَحْيَاءً قَادِرٌ عَلٰى إِنْطَاقِ جُلُوْدِكُمْ وَأَعْضَائِكُمْ.

২১. তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন দিয়েছ? তারা বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে কথাবলার শক্তি দিয়েছেন। যাকে ইচ্ছা করেন বাকশক্তি দেওয়ার তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। বর্ণিত আছে যে, وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ উক্তিটি ত্বকসমূহের উক্তি বা আল্লাহ তা'আলার উক্তি যেমন, আগত বাণী وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ টি আল্লাহ তা'আলার উক্তি। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উদ্দেশ্য পূর্বের তার বাণী أَنْطَقَنَا اللّٰهُ কে প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে আল্লাহ মানুষকে কোনো নমুনা ছাড়া এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে পারেন তিনি তোমাদের ত্বকসমূহকে বাকশক্তি দানেও সক্ষম।

٢٢. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ عِنْدَ ارْتِكَابِكُمُ الْفَوَاحِشَ مِنْ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ لِأَنَّكُمْ لَمْ تُوْقِنُوْا بِالْبَعْثِ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ عِنْدَ اسْتِتَارِكُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.

২২. তোমরা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সময় কোনো কিছু গোপন করতে না, এ ধরনের বশর্বতী হয়ে যে, তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না। কেননা তোমরা পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে না। তবে তোমরা ধারণা কর যে, তোমাদের গোপন করার সময় তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ তা'আলা জানেন না।

২৩. ذٰلِكُمْ مُبْتَدَأٌ ظَنُّكُمُ بَدَلٌ مِنْهُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ نَعْتُ الْبَدَلِ وَالْخَبَرُ اَرْدٰكُمْ اَيْ اَهْلَكَكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

২৩. তোমাদের এই ধারণাই যা তোমরা তোমাদের প্রভুর ব্যাপারে ধারণা কর, তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে ذٰلِكُمْ মুবতাদা ظَنُّكُمْ এটা থেকে بَدَلٌ - الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ টি بَدَلٌ থেকে সিফত আর اَرْدٰكُمْ টি খবর। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।

২৪. فَاِنْ يَّصْبِرُوْا عَلَى الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَثْوًى مَّنْزِلٌ لَّهُمْ ط وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا يَطْلُبُوا الْعُتْبٰى اَيِ الرِّضٰى فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ اَلْمَرْضِيِّيْنَ.

২৪. অতঃপর যদি তারা সবর করে আজাবের উপর তবুও তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর যদি তারা সন্তুষ্টি কামনা করে ওজর পেশ করে তবে তাদের ওজর কবুল করা হবে না। তারা সন্তুষ্টি প্রাপ্তদের মধ্য থেকে নয়।

২৫. وَقَيَّضْنَا سَبَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ بِقَوْلِهِمْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ وَهُوَ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ فِيْ جُمْلَةِ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ هَلَكَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ع اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ.

২৫. আমি তাদের জন্য কিছু সাথী শয়তানদের থেকে নির্ধারণ করে তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি, অতঃপর তারা তাদের সামনের ও পিছনের আমলসমূহ অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয়াদি, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও আখেরাতের বিষয়াদি অর্থাৎ তাদের আক্বীদা কোনো হিসাব ও পুনরুত্থান নেই ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে দিয়েছিল। এবং সে সমস্ত লোকদের ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলার শাস্তির আদেশ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الخ বাস্তবায়িত হলো, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَحْشُرُ : এটা جَمْع مُتَكَلِّم -এর সীগাহ نُوْن বর্ণে যবর এবং شِيْن বর্ণে পেশ দিয়ে। এই সুরতে اَعْدَاءُ -এর শেষ হামযাটি মাফউল হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। দ্বিতীয় কেরাত যেটাকে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে মুফাসসির (র.) ও شِيْن বর্ণটি যবর দিয়ে مُضَارِع مَجْهُوْل -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। এই সুরতে اَعْدَاءُ -এর শেষ হামযাটি نَائِب فَاعِل হওয়ার কারণে مرفوع হবে।

قَوْلُهُ اِلَى النَّارِ : অর্থাৎ اِلٰى مَوْقِفِ الْحِسَابِ

قَوْلُهُ يُسَاقُوْنَ : আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) يُوْزَعُوْنَ -এর তাফসীর করেছেন يُحْبَسُ اَوَّلُهُمْ عَلٰى اٰخِرِهِمْ দ্বারা। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য একই।

قَوْلُهُ يُوْزَعُوْنَ : এটা وَزْعٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ তাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ অগ্রগামীদেরকে আটকে রাখা হবে যাতে সকলে একত্রিত হয়ে চলে। এর দ্বারা كَثْرَتْ -এর দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَسْتَعْتِبُوْا : এটা اِسْتِفْعَالٌ -বাব اِسْتِعْتَابٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْزُوْم -এর جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। কাশশাফ গ্রন্থকারের তাফসীর বেশি সুস্পষ্ট। আল্লামা মহল্লী (র.) এটাকেই পছন্দ করেছেন অর্থাৎ যদি তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ভাজন হওয়ার কামনা করে। অর্থাৎ এখানে اِسْتِعْتَابٌ টা عُتْبٰى হতে গঠিত হয়েছে اِعْتَابٌ থেকে নয়। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ভাজন হওয়ার কামনা অন্য কারো থেকে নয়। বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার থেকেই কামনা করেছেন।

قَوْلُهُ قَيَّضْنَا : অর্থাৎ هَيَّأْنَا এবং قَدَّرْنَا এটা مَاضِى مَعْرُوْف -এর جَمَعْ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। মাসদার تَقْيِيْضٌ বাবে تَفْعِيْل মূলবর্ণ قَيْضٌ আর قَيْضٌ অর্থ হলো ডিমের খোসা। যেহেতু ডিমের খোসা ডিমের সাথে লেগে থাকে এই مُنَاسَبَتْ -এর কারণে تَقْيِيْض -এর অর্থ হয়েছে সাথে লাগিয়ে দেওয়া, চাপিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ فِىْ أُمَمٍ : এখানে فِىْ টা مَعَ অর্থেও হতে পারে। عَلَيْهِمْ -এর ضَمِيْر مَجْرُوْر হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ كَائِنِيْنَ مَعَ جُمْلَةِ أُمَمٍ

قَوْلُهُ مِنْ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ : এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, يَشْهَدَ টা نَزْعِ خَافِضْ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর সেই خَافِضْ হলো مِنْ কেননা تَسْتَتِرُوْنَ টা مُتَعَدِّى بِنَفْسِه হয়নি।

قَوْلُهُ عِنْدَ اِسْتِتَارِكُمْ اَىْ مِنَ النَّاسِ : অর্থাৎ مَعَ عَدَمِ اِسْتِتَارِكُمْ مِنْ اَعْضَائِكُمْ এখানে اَعْضَاء থেকে اِسْتِتَارْ -এর শুধুমাত্র একটি সুরতই রয়েছে যে, ঐ فِعْل কেই পরিত্যাগ করা হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا : প্রশ্ন. যখন মুশরিকদের জন্য সর্বাবস্থায়ই خُلُوْدٌ فِى النَّارِ টা دَائِمِىْ এবং لَازِمِىْ তথা অত্যাবশ্যক। চাই সবর করুক বা না করুক, তদুপরি اَنْ يَصْبِرُوْا -এর সাথে مُقَيَّدٌ করার হেতু কি?

উত্তর. আয়াতে উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, فَاِنْ يَّصْبِرُوْا اَوْ لَا يَصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ইলম এবং شهرت -এর কারণে مُقَابِلْ কে حَذْف করে দেওয়া হয়েছে। কেননা যখন সবরের সুরতে ঠিকানা জাহান্নাম হবে তখন সবর না করার সুরতে তো بِطَرِيْقِ اَوْلٰى ই ঠিকানা জাহান্নাম হবে।

قَوْلُهُ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ اَىْ لِلْقُرَيْشِ : কাজেই فِىْ اُمَمٍ বলা বৈধ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ : এটা وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ الخ : আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোনো গোনাহ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত-পা দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়। বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোনো অপরাধ ও গোনাহ করার কোনো পথই

উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তাওহীদ ও রেসালাত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন তার জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলা বাহুল্য, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান : সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরজ করলাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি যা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোনো সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হবো না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. অর্থাৎ ভালো কথা তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে- بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ اُنَاضِلُ অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি তোমাদের সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। -[মাযহারী]

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোনো পুণ্যকাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনো পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে। -[কুরতুবী]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ .... كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ - **আয়াতের শানে নুযূল :** বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কা'বা শরীফের নিকট সাকাফ গোত্রের দুইজন এবং কোরায়েশ গোত্রের একজন অথবা দুইজন কোরাইশী ও একজন সাকাফী একত্রিত হয়। এই তিনজনেরই পেট বেশ মোটা ছিল, তাতে চর্বি জমেছিল তবে বুদ্ধি কম ছিল। তাদের একজন বলল, তোমরা কি জান আল্লাহ তা'আলা আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা চিৎকার করে বললে শুনেন, আর চুপে চুপে বললে শুনেন না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, যদি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললে শুনেন তবে নিম্নস্বরে বললেও শুনবেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, সাকাফী লোকটি ছিল আবদ ইয়ালাইল। আর কুরাইশী দু'জন ছিল রবীয়া এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। তাদের এ কথাবার্তার পরই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা কি চিন্তা করেছিলে? যে তোমাদের চক্ষু কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে বস্তুতঃ তা তোমরা তখন কল্পনাও করনি; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমরা এ ভুল ধারণা করতে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন না। এজন্যেই তোমরা নির্ভয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে লিপ্ত ছিলে। আর তোমাদের এ ভুল ধারণাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যদি তোমরা একথা বিশ্বাস করতে যে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন তবে তার নাফরমানি করার ধৃষ্টতা তোমরা দেখাতে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ : অর্থাৎ অতএব, তারা যদি সবর অবলম্বন করে তবুও দোজখই হবে তাদের ঠিকানা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পৃথিবীতে ধৈর্যধারণ করলে অনেক বিপদ দূর হয়ে যায়। বিখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব কথাটিকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন?

رنج کا خوگر ہوا انسان تومٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں ۔

অর্থাৎ যদি বিপদাপদে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে তা দূরীভূত হয়ে যায়, আমার জীবনে এত কঠিন সমস্যা এসেছে যে সবই সহজ হয়ে গেছে।

যাহোক এ অবস্থা দুনিয়ার ব্যাপারে হতে পারে কিন্তু আখেরাতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যদি কাফেররা সবরও করে তবুও তাদের বিপদ কম হবে না, দোজখই থাকবে তাদের ঠিকানা, দোজখের শাস্তিও অব্যাহত থাকবে।

قَوْلُهُ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে এ শাস্তির কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ـ

আর এ নাফরমানদের জন্যে আমি কিছু এমন সহচর নির্ধারণ করেছি যারা তাদের চরম ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কীর্তিকলাপকে সুন্দর এবং শোভনীয় করে দেখাত। তারা তাদের যাবতীয় অসৎ কর্মকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করতো। আর ভবিষ্যতের প্রশ্নে তথা আখেরাতের ক্ষেত্রে ঐ সহচররা বলতো, জান্নাত, দোজখ, কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এসব কিছুই নেই, দুনিয়ার জীবনই সত্য, আর এজীবনকে যেভাবে পার ভোগ কর, দুনিয়া কখনো শেষ হবে না। এভাবে তাদেরকে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকার সুযোগ দিত তাদের ঘৃণ্য কীর্তিকলাপকে এ দুষ্ট সহচররা অত্যন্ত লোভনীয় মোহনীয় করে তুলত। পরিণামে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার একটি ঘোষণা বাস্তবায়িত হলো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রথম দিন ইবলিস শয়তান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ অর্থাৎ আমি তোকে এবং তোর অনুসারীদেরকে দিয়ে দোজখকে পরিপূর্ণ করে দেব। আর এ শাস্তি নতুন কিছু নয়; বরং তাদের পূর্বে যারা পৃথিবীতে ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তা জিন হোক বা মানুষ তাদেরও এমন শাস্তি হয়েছিল। إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ـ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত।

অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য :

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

১. অসৎ সংসর্গ মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, মন্দ সাথী মানুষকে মন্দ কাজে আকৃষ্ট করে এবং ঐ মন্দ সংসর্গের কারণে ভালো মন্দ হয়ে যায়, পরিণামে তার জীবনে আসে ধ্বংস, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সে হয় সর্বস্বান্ত, অতএব অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে।

২. যখন মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাকে অন্যায় মনে করে না, বরং তাকে সুন্দর, শোভনীয় এবং যুক্তিপূর্ণ মনে করে। আর অন্যায় কাজের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের কাজটিই করে মন্দ সহচরেরা, আর এভাবেই মানুষের জীবনে ধ্বংস নেমে আসে, দুনিয়া-আখেরাত দু'জাহানে তার শাস্তি হয় অবধারিত।

৩. যেহেতু মন্দ কাজকে মন্দ মনে করা হয় না তাই তা বর্জন করার চিন্তাও করা হয় না, পরিণামে এমন লোকেরা কখনও ঘৃণ্য কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। সারা জীবন মন্দ কাজেই লিপ্ত থাকে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের হাশর তেমনই হবে যেমন তোমাদের মৃত্যু হবে, আর তোমাদের মৃত্যু তেমনই হবে যেমন তোমাদের জীবন হবে।"

অতএব, যার এ জীবন মন্দ হবে তার পরজীবনও মন্দ, অপমানজনক এবং বিপদজনক হবে [আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন।]

অনুবাদ :

٢٦. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ اِئْتُوْا بِاللَّغَطِ وَنَحْوِهِ وَصِيْحُوْا فِيْ زَمَنِ قِرَاءَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ فَيَسْكُتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ.

২৬. মহানবী ﷺ -এর কুরআন পড়ার সময় কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং হট্টগোল সৃষ্টি কর তার ﷺ পড়ার সময় শোর ও হট্টগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা বিজয়ী হও। অতঃপর তিনি কুরআন পড়া থেকে নিশ্চুপ হয়ে যাবেন।

٢٧. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَأَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَيْ اَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ.

২৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন, আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আজাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও খারাপ কাজের প্রতিফল দেব। অর্থাৎ তাদের কর্মের মন্দ ফলাফল দেব।

٢٨. ذٰلِكَ اَيِ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ وَاَسْوَءُ الْجَزَاءِ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَاِبْدَالِهَا وَاوًا النَّارُ ج عَطْفُ بَيَانٍ لِلْجَزَاءِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ ذٰلِكَ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ط اَيْ اِقَامَةٌ لَا اِنْتِقَالَ مِنْهَا جَزَاءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ يَجْحَدُوْنَ.

২৮. এটা অর্থাৎ কঠিন শাস্তি ও মন্দ পরিণাম আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের শাস্তি, জাহান্নাম। جَزَاءُ শব্দটির দ্বিতীয় হামযাকে হামযা বা وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়বে। اَلنَّارُ টি اَلْجَزَاءُ -এর আতফে বায়ান, এবং এটা ذٰلِكَ -এর খবর। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব এটা থেকে তারা স্থানান্তরিত হবে না। এটা আমার আয়াতসমূহ কুরআন অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ। جَزَاءً শব্দটি উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব।

٢٩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي النَّارِ رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَيْ اِبْلِيْسَ وَقَابِيْلَ سَنَّا الْكُفْرَ وَالْقَتْلَ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا فِي النَّارِ لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ اَيْ اَشَدَّ عَذَابًا مِنَّا.

২৯. কাফেররা বলবে, জাহান্নামে হে আমাদের পালনকর্তা যেসব জিন ও মানুষ অর্থাৎ ইবলিশ শয়তান ও কাবিল, তারা উভয়ে কুফর ও হত্যার প্রথা চালু করেন আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, তাদেরকে আমরা জাহান্নামে পদদলিত করব। যাতে তারা আমাদের চেয়ে জাহান্নামে নিম্নস্তরে অবস্থান করে অধিক শাস্তিতে অপমানিত হয়।

٣٠. إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا عَلَى التَّوْحِيْدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّا تَخَافُوْا مِنَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهٗ وَلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا خَلَّفْتُمْ مِنْ اَهْلٍ وَّوَلَدٍ فَنَحْنُ نَخْلُفُكُمْ فِيْهِ وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা, অতঃপর তাওহীদ ও তাদের উপর ওয়াজিবকৃত হুকুম আহকামের উপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, তাদের মৃত্যুর সময় এবং বলে তোমরা ভয় করো না মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থার ব্যাপারে ও চিন্তা করো না দুনিয়াতে তোমাদের রেখে যাওয়া সন্তান-সন্তুতিদের ব্যাপারে। কেননা এদের ব্যাপারে আমি তোমাদের খলীফা। এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।

٣١. نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اَىْ نَحْفَظُكُمْ فِيْهَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج اَىْ نَكُوْنُ مَعَكُمْ فِيْهَا حَتّٰى تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ تَطْلُبُوْنَ.

৩১. আমরা ইহকালে ও পরকালে তোমাদের বন্ধু অর্থাৎ দুনিয়াতে আমি তোমাদেরকে হেফাজত করব এবং পরকালে তোমাদের সাথে থাকব তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি কর, তোমরা চাও।

٣٢. نُزُلًا رِزْقًا مُهَيَّأً مَنْصُوْبٌ بِجَعَلَ مُقَدَّرًا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ اَىِ اللّٰهِ.

৩২. এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। তৈরিকৃত রিজিক। نُزُلًا শব্দটি উহ্য جَعَلَ ফে'লের মাফঊল হিসেবে মানসূব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ : এটা قَالَ -এর ظَرْف হয়েছে। অর্থাৎ عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ قَالَ

قَوْلُهٗ وَالْغَوْا : اَلْغَوْا টি বাবে نَصَرَ . سَمِعَ ও فَتَحَ -এর সীগাহ। অর্থ- অহেতুক কথা বলা, বকবক করা। চেচামেচি করা।

قَوْلُهٗ اَللَّغَطُ : অর্থ- হৈ চৈ করা, অহেতুক কথা বলা। এটা لَغْوٌ -এর সমার্থক।

قَوْلُهٗ اَىْ اَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : আল্লাহ তা'আলার বাণী- لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেররা তাদের আমলের মতো প্রকারের জঘন্য প্রতিদান পাবে। যেমন সে সকল মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর সাথে উপহাস করেছিল পরকালে তাদেরকে জঘন্যতম ধরনের উপহাস করা হবে। অথচ উদ্দেশ্য এটা নয়।

নিরসন : বাক্যটি উহ্য মুযাফের সাথে রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ

قَوْلُهُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ الخ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ধারণ করা। আর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ এবং فَلَنُذِيْقَنَّهُمْ

ذٰلِكَ হলো মুবতাদা আর جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ তার খবর আর اَلنَّارُ হলো جَزَاءٌ থেকে بَدْلٌ অথবা عَطْف بَيَانٌ এটাও হতে পারে যে, ذٰلِكَ الْاَمْرُ হলো উহ্য মুবতাদার খবর আর جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ হলো পূর্বের بَيَانٌ তবে প্রথমটি উত্তম।

প্রশ্ন. اَلنَّارُ কে جَزَاءٌ থেকে بَدْلٌ বলা সহীহ নয়। কেননা بَدْلٌ সহীহ হওয়ার আলামত হলো যে, যদি بَدْلٌ কে مُبْدَلٌ مِنْهُ -এর স্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে অর্থ ঠিক থাকবে। অথচ এখানে এরূপ হয়নি, কেননা بَدْلٌ কে مُبْدَلٌ مِنْهُ -এর স্থানে রাখার পর উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, ذٰلِكَ النَّارُ اَعْدَاءُ আর এটা সহীহ নয়। কাজেই مَرْجُوْح ই'রাব হতে رَاجِع ই'রাবের দিকে ফিরে যাওয়া জরুরি। اَلنَّارُ কে هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর বলা হবে অথবা اَلنَّارُ কে মুবতাদা বলা হবে। তার পরবর্তী অংশ অর্থাৎ وَلَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ কে উহার খবর বলা হবে।

প্রশ্ন. لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ -এর মধ্যে فِيْهَا -এর যমীরের مَرْجِع হলো اَلنَّارُ আর نَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নাম আর জাহান্নাম হলো مَوْصُوْفٌ بِصِفَةِ الْخُلْدِ এখন فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ -এর অর্থ হলো– دَارُ الْخُلْدِ -এর মধ্যে دَارُ الْخُلْدِ রয়েছে। আর এটা ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ হয়েছে যা জায়েজ নেই।

উত্তর. বাক্যের মধ্যে تَجْرِيْد হয়েছে تَجْرِيْد বলা হয় কোনো اَمْر ذِيْ صِفَتْ থেকে তারই مُوَافِقٌ মুবালাগার ভিত্তিতে অন্য একটি اَمْر ذِيْ صِفَتْ -এর اِنْتِزَاع করা। যেমনিভাবে এখানে اَلنَّارُ দ্বারা دَار اٰخِرَة -এর اِنْتِزَاع করে তার নাম دَارُ الْخُلْدِ রেখে দিয়েছে। কাজেই এটা ঠিক আছে।

قَوْلُهُ جَزَاءً : এটা উহ্য ফে'লের মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ يُجْزَوْنَ جَزَاءً

قَوْلُهُ بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ : **প্রশ্ন.** بِاٰيٰتِنَا -এর মধ্যে بَاء টি কিরূপ?

উত্তর. হয়তো بَاء টি অতিরিক্ত। অথবা يَجْحَدُوْنَ টা يَكْفُرُوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। এই সুরতে بَاء টি تَعْدِيَة -এর জন্য হবে।

قَوْلُهُ فِي النَّارِ : এটা قَالَ -এর ফায়েল اَلَّذِيْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ كَائِنِيْنَ فِي النَّارِ

قَوْلُهُ اَرِنَا : اَرِنَا এটা اَمْر -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ نَا হলো جَمْع مُتَكَلِّم -এর যমীর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো رُؤْيَة بَصَرِيَّة আর হামযাটা تَعْدِيَة اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ -এর জন্য হয়েছে نَا যমীর হলো প্রথম مَفْعُوْل আর اَلَّذِيْن দ্বিতীয় মাফউল। اَرِنَا -এর মূল ছিল اَرْئِيْنَا অর্থাৎ بَصِّرْنَا رَائِيْنَ بِاَبْصَارِنَا - يَاء হরফে ইল্লত যা لَام كَلِمَة ফে'লটা হরফে ইল্লত উহ্য থাকার উপর مَبْنِيْ হওয়ার কারণে حَذْف হয়ে গেছে। দ্বিতীয় হামযা যা عَيْن كَلِمَة উহার كَسْرَة কে তার পূর্বের رَاء কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যা كَلِمَة، نَا এখন তার ওজন اَرِنَا হয়ে গেছে। বিদ্যমান হামযাটি শব্দের নয় বরং تَعْدِيَة -এর জন্য হয়েছে।

خَوْف এবং حُزْن -এর মধ্যকার পার্থক্য :

قَوْلُهُ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا : আগত ভবিষ্যত কষ্টের কারণে মানুষের যেই অবস্থা হয় তাকে خَوْف বলে। আর অতীতকালে কোনো উপকারী বস্তু ছুটে যাওয়ার কারণে যে অবস্থা হয় তাকে حُزْن বলা হয়।

قَوْلُهُ اَنْ اَيْ بِاَنْ : এখানে اَنْ হলো مَصْدَرِيَّة আর بَاء উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ قَائِلِيْنَ لَهُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا حُزْنٌ -

قَوْلُهُ اَبْشِرُوْا : এটা বাবে اِفْعَالٌ -এর اِبْشَارٌ মাসদার হতে اَمْر -এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। অর্থ– তোমাদের সুসংবাদ হোক।

قَوْلُهُ نَحْنُ اَوْلِيَائُكُمْ : এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার كَلَامٌ ও হতে পারে। আবার ফেরেশতাদের কথাও হতে পারে।

قَوْلُهُ نُزُلًا : এটা تَدَّعُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে نُزُلٌ সেই খাবারকে বলা হয় যা মেহমানের জন্য যিয়াফতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ : অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। –[কুরতুবী]

নীরবতার সাথে কুরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব, হৈ-হল্লোড় করা কাফেরদের অভ্যাস : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরো জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরাও তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরাও খানা-পিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যত এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা কাফেদের আলামত ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাফেরদের অপচেষ্টা ব্যর্থ : দূরাত্মা কাফেররা মানুষকে পবিত্র কুরআন থেকে দূরে রাখার এ অপচেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পবিত্র কুরআন স্ব-মহিমায় সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে, বিগত চৌদ্দশত বছরে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার প্রচার প্রসারে কখনো ভাটা পড়েনি, আধুনিক বিশ্বের চারশত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। হাফেজগণ তা কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন, কারীগণ তাদের সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন আবৃত্তি করে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত রাখছেন। অনুবাদকগণ অনুবাদ করে এবং তাফসীরকারগণ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা পেশ করে তার মর্মবাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, আর এ অবস্থা ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, তার মহান বাণী, বিশ্ব মানবের নামে আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ পয়গাম, বিশ্ব কল্যাণের মূর্ত প্রতীক, যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন পবিত্র কুরআনও থাকবে।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . অর্থাৎ অতএব, আমি এ কাফেরদেরকে কঠিন আজাব আস্বাদন করাব, আর নিশ্চয়ই আমি তাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের শাস্তি প্রদান করব।

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনের প্রচারে কাফেরদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ অপকর্মের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন যে, কাফেরদেরকে তাদের অপরাধের জন্যে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের জঘন্যতম অন্যায়ের জন্যে কঠোরতর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

ذٰلِكَ جَزَاۤءُ اَعْدَاۤءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاۤءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ . অর্থাৎ এটি আল্লাহ তা'আলার দুশমনদের শাস্তি, দোজখ, সেখানে তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল রয়েছে, অর্থাৎ তারা চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতো।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, কাফেররা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় হট্টগোল করে, চিৎকার করে, তালি বাজিয়ে মানুষকে পবিত্র কুরআন শ্রবণে বাধা দিতো, এজন্য তাদের চিরস্থায়ী শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কর্তব্য : এ পর্যায়ে মুমিনদের কর্তব্য নির্দেশ করে ইরশাদ হয়েছে– وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . অর্থাৎ আর যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

অতএব, মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য হলো, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় তার আদব রক্ষা করা তথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা যত্ন সহকারে এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভ করা যাবে।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে রেডিও টেলিভিশনের ন্যায় প্রচার মাধ্যমে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়। এ পর্যায়ে মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য হলো সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। যারা এ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে অন্য আয়াতে– فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ . অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কুরআনে কারীম শ্রবণ করে এবং তার উত্তম কথাগুলো মেনে চলে, এরাই সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ الخ : সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কুরআন, রেসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তাওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আজাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল পুরোপুরিভাবে শরিয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ : বলা হয়েছে– إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহ তা'আলাকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে [এটা হলো মূল ঈমান] অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে [এটা হলো সৎকর্ম]। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। اِسْتِقَامَتْ শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঈমান ও তাওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তাফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা.) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ করেছেন খাঁটি আমল করা। হযরত ওমর (রা.) বলেন اَلْاِسْتِقَامَةُ أَنْ تَسْتَقِيْمَ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَا تَرُوْغَ رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম اِسْتِقَامَةٌ –[মাযহারী]

তাই আলেমগণ বলেন, اِسْتِقَامَةٌ সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তাফসীরে কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রতিপালনাধীন, তার রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন, যা শোনার পর অন্য কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাস করার প্রয়োজন থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর, অতঃপর তাতে অবিচল থাক। –[মুসলিম]

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

একারণেই হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) اِسْتِقَامَةٌ -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, ফরজ কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اِسْتِقَامَةٌ এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, اِسْتِقَامَةٌ -এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রা.) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে জারীর এই তাফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ : ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী ইবনে জাররাহ বলেন, তিন সময়ে হবে– প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, আমি তো বলি যে, মুমিনের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরিউক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সিজদা তেলাওয়াত করত আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকতো, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ : অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত যখন কোনো বড় লোকের মেহমান হয়। –[মাযহারী]

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে কোনো পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোনো কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। –[মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ : অথাৎ এটি হলো অত্যন্ত ক্ষমা প্রিয় করুণাময় প্রভুর আপ্যায়ন।
বস্তুতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা, তার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া, এই নিয়ামত নজিরবিহীন।
তাই হাদীসে শরীফে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়বান্দাদেরকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রদানের পর ইরশাদ করবেন হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আরো কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তখন জান্নাতবাসীগণ আরজ করবে, হে পরওয়ারদিগার! সবই তো তুমি দান করেছ, আর আমাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এরপর ঘোষণা করা হবে– رِضَائِیْ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি দান করলাম, এরপর আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আহমদ, নাসায়ী সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা সুয়ূতী (র.)। এ হাদীসে হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন- (مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ (اَلْحَدِيْثُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মোলাকাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার মোলাকাতকে পছন্দ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি, তিনি ইরশাদ করলেন, বিষয়টি মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়; বরং যখন কোনো মুমিনের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সুসংবাদ দাতা ফেরেশতা তার নিকট আসে এবং তার জন্যে যেসব নিয়ামত রয়েছে তার সুসংবাদ দান করে। তখন ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়াকে সর্বাধিক পছন্দ করে, আর তাই আল্লাহ তা'আলাও তার উপস্থিতিকে পছন্দ করেন।

পক্ষান্তরে কোনো পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু হাজির হয় তখন আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে ফেরেশতা এসে তার পরিণতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করে, এমন অবস্থায় সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়া অপছন্দ করে, তাই আল্লাহ তা'আলাও এমন ব্যক্তির উপস্থিতিকে অপছন্দ করেন।

জান্নাতীদের আপ্যায়ন : জান্নাতে নেককার মুমিনদের আপ্যায়নের যে অসাধারণ ব্যবস্থা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে হাদীস শরীফে। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হবেন মেজবান, আর জান্নাতীগণ হবেন তার মেহমান, অতএব মেহমানদারীর যে শান হবে তা শুধু বর্ণনাতীতই নয়; বরং কল্পনাতীতও।

ইবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা জান্নাতে যখনই কোনো পাখি দেখে তার গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা ভাজা গোশত হয়ে তোমাদের সম্মুখে এসে পড়বে।

হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, কোনো জান্নাতী ব্যক্তি যখনই পাখীর গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখনই উড়ন্ত পাখী তার দস্তরখানে আহার্য হিসেবে এসে পড়বে। কিন্তু সেখানে অগ্নিও থাকবে না ধোয়াও থাকবে না। জান্নাতীগণ সে পাখির গোশত পেট ভরে আহার করবে, এরপর পাখিটি পুনরায় উড়ে চলে যাবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ২৮৮]

অনুবাদ :

٣٣. وَمَنْ أَحْسَنُ أَيْ لَا أَحَدَ مِنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৩৩. তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার? যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করে ও সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার কথার চেয়ে কারো কথা উত্তম নয়।

٣٤. وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط فِيْ جُزْئِيَّاتِهِمَا لِأَنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِدْفَعْ أَيِ السَّيِّئَةَ بِالَّتِيْ أَيْ بِالْخَصْلَةِ الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ كَالْغَضَبِ بِالصَّبْرِ وَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْإِسَاءَةِ بِالْعَفْوِ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ أَيْ فَيَصِيْرُ عَدُوُّكَ كَالصَّدِيْقِ الْقَرِيْبِ فِيْ مَحَبَّتِهِ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَالَّذِيْ مُبْتَدَأٌ وَكَأَنَّهُ الْخَبَرُ وَإِذَا ظَرْفٌ لِمَعْنَى التَّشْبِيْهِ .

৩৪. সব ভালো পরস্পর সমান নয় ও সব মন্দও তার সংখ্যার মধ্যে পরস্পর সমান নয়। কেননা এদের মধ্যে একে অপরের চেয়ে বড়। আপনি মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। যেমন ক্রোধকে ধৈর্য দ্বারা, মুর্খতাকে সহনশীলতার মাধ্যমে ও অত্যাচারকে ক্ষমার মাধ্যমে জবাব দিন। অতঃপর আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। অতঃপর আপনার এই চরিত্রের কারণে, আপনার চরম শত্রু বন্ধু হিসেবে পরিণত হবে। এখানে اَلَّذِىْ মুবতাদা এবং كَاَنَّهُ খবর এবং اِذَا শব্দটি তাশবীহের অর্থ প্রদান করে কালবাচক পদ হয়েছে।

٣٥. وَمَا يُلَقّٰهَا أَيْ يُؤْتِي الْخَصْلَةَ الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ ثَوَابٍ عَظِيْمٍ .

৩৫. এ চরিত্র তারাই লাভ করে এই উত্তমটি তাদেরই দান করা হয় যারা সবর করে। এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

٣٦. وَإِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الزَّائِدَةِ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ أَيْ أَنْ يَصْرِفَكَ عَنِ الْخَصْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَيْرِ صَارِفٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَجَوَابُ الْأَمْرِ مَحْذُوْفٌ أَيْ يَدْفَعْهُ عَنْكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ .

৩৬. اِمَّا শব্দটি শর্তজ্ঞাপক অব্যয় اِنْ ও অতিরিক্ত অব্যয় مَا দ্বারা যৌগিক এবং مَا কে اِنْ -এর সাথে ইদগাম করা হয়েছে। যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কোনো কুমন্ত্রণা অনুভব করেন। অর্থা যদি কোনো বিরতকারী আপনাকে কোনো সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তবে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট শরণাপন্ন হোন। فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ শর্তের জওয়াব এবং জওয়াবে আমর উহ্য অর্থাৎ يَدْفَعُهُ عَنْكَ অর্থাৎ যাতে আপনার কাছ থেকে এটা দূর হয়। নিশ্চয়ই তিনি কথাবার্তা সর্বশ্রোতা, কাজকর্মের প্রতি সর্বজ্ঞ।

٣٧. وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اَيِ الْاٰيٰتِ الْاَرْبَعَ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ

৩৭. তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, এবং আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা কর যিনি এগুলো অর্থাৎ চার নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তারই ইবাদত কর।

٣٨. فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا عَنِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ اَيِ الْمَلٰۤئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ يُصَلُّوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ لَا يَمَلُّوْنَ ـ

৩৮. অতঃপর তারা যদি এক আল্লাহ তা'আলার সেজদা থেকে অহংকার করে তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে অর্থাৎ ফেরেশতারা দিবারাত্রি তারই পবিত্রতা বর্ণনা করে তার সালাত আদায় করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

٣٩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً يَابِسَةً لَا نَبَاتَ فِيْهَا فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ تَحَرَّكَتْ وَرَبَتْ ط اِنْتَفَخَتْ وَعَلَتْ اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ط اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৩৯. তার আরেক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর শুকনা, কোনো ক্ষেতবিহীন পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন এতে পানি, বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন এটা তরতাজা হয়ে শস্য-শ্যামল, স্ফীত ও উত্থিত হয়। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর সক্ষম।

٤٠. اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ مِنْ اَلْحَدَ وَلَحَدَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِالتَّكْذِيْبِ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ط فَنُجَازِيْهِمْ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ط اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ ـ

৪০. নিঃসন্দেহে যারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে কুরআনকে অস্বীকার করে বক্রতা অবলম্বন করে يُلْحِدُوْنَ ক্রিয়াটি اَلْحَدَ বা لَحَدَ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া। তারা আমার নিকট গোপন নয়। অতঃপর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। কিয়ামতের দিবসে যে ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে নিরাপদে থাকবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর। নিশ্চয় তিনি পর্যবেক্ষণকারী তোমরা যা কর। তাদের প্রতি ধমকমূলক এটা বলা হয়েছে।

٤١. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ الْقُرْاٰنِ لَمَّا جَآءَهُمْ ج نُجَازِيْهِمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لا مَنِيْعٌ ـ

৪১. নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট জিকির কুরআন আসার পরও অস্বীকার করে, আমরা তাদের প্রতিদান দেব নিশ্চয়ই এটা এক সম্মানিত বিরল গ্রন্থ।

٤٢. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط أَيْ لَيْسَ قَبْلَهُ كِتَابٌ يُكَذِّبُهُ وَلَا بَعْدَهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ أَيِ اللّٰهِ الْمَحْمُودِ فِي أَمْرِهِ .

৪২. এতে কোনো বাতিল নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। অর্থাৎ তার আগে ও পরে এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা তাকে অস্বীকার করে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত তার কর্মসমূহে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

٤٣. مَا يُقَالُ لَكَ مِنَ التَّكْذِيبِ إِلَّا مِثْلَ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ط إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ لِلْكَافِرِينَ .

৪৩. আপনার ব্যাপারে তাই বলা হয় অস্বীকার মূলক যা বলা হতো পূর্ববর্তী রাসূলগণকে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা ঈমানদারদের প্রতি ক্ষমাশীল ও কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দাতা।

٤٤. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أَيِ الذِّكْرَ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا هَلَّا فُصِّلَتْ بُيِّنَتْ آيَاتُهُ ط حَتّٰى تَفْهَمَهَا أَ قُرْآنٌ أَعْجَمِيٌّ وَ نَبِيٌّ عَرَبِيٌّ ط اِسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ مِنْهُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَقَلْبِهَا أَلِفًا بِإِشْبَاعٍ وَدُونَهُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَشِفَاءٌ ط مِنَ الْجَهْلِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ ثِقْلٌ فَلَا يَسْمَعُونَهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط فَلَا يَفْهَمُونَهُ أُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أَيْ هُمْ كَالْمُنَادٰى مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَفْهَمُ مَا يُنَادٰى بِهِ .

৪৪. আর যদি আমি একে অর্থাৎ এই কুরআনকে অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তখন তারা অবশ্যই বলতো, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়নি কেন? যাতে আমরা এটা বুঝতাম এটা কি ব্যাপার যে, কুরআন অনারব ভাষায় আর রাসূল আরবি ভাষী? এটা তাদের পক্ষ থেকে অস্বীকারমূলক প্রশ্ন। أَأَعْجَمِيٌّ -এর মধ্যে দ্বিতীয় হামযাকে প্রথম হামযার সাথে বা আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে বা উভয় হামযার মধ্যখানে আলিফ যুক্ত করে বা আলিফবিহীন অর্থাৎ إِشْبَاعٌ বা إِشْبَاعٌ বিহীন পড়া যাবে। বলুন, এটা বিশ্ববাসীদের জন্য পথভ্রষ্টতা থেকে [হেদায়েত ও] অজ্ঞতার প্রতিকার। এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেনি তাদের কানে রয়েছে বধিরত্ব বোঝা, ফলে তারা শুনে না এবং এটা তাদের কাছে অন্ধত্ব ফলে তারা এটা বুঝে না। এবং এ সমস্ত লোক যেন তাদেরকে দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। অর্থাৎ তারা দূর থেকে আহ্বানকৃত ব্যক্তির ন্যায়, তারা শুনে না ও বুঝে না যে, তাদেরকে কি বলা হয়।

٤٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ كَالْقُرْاٰنِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاخِيْرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط فِى الدُّنْيَا فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَاِنَّهُمْ اَىِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِهٖ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ مُوْقِعُ الرِّيْبَةِ.

৪৫. আমি মূসাকে কিতাব তাওরাত দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতেও কুরআনের ন্যায় কেউ বিশ্বাস ও কেউ অস্বীকার করে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে মাখলুকের হিসাব-নিকাশ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত বিলম্ব করার উপর পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে অবশ্যই তাদের মধ্যে দুনিয়াতে ফয়সালা হয়ে যেত। সে বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে। এবং তারা কুরআনের অস্বীকার কারীগণ কুরআন সম্বন্ধে এক দ্বিধাপূর্ণ সন্দেহে লিপ্ত।

٤٦. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ عَمِلَ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا اَىْ فَضَرَرُ اِسَاءَتِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِقَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের উপকারের জন্যেই সৎকর্ম করে আর যে অসৎকর্ম করে তা তার উপরই বর্তাবে অর্থাৎ সে অসৎ কর্মের অনিষ্টতা তার নিজেরই ক্ষতি করবেন। এবং আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নয়। অর্থাৎ জুলুমকারী নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا : مَنْ হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ মুবতাদা। মুফাসসির (র.) لَا اَحَدَ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مَنْ টা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে। اَحْسَنُ হলো খবর। قَوْلًا টা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। عَمِلَ صَالِحًا হলো جُمْلَة حَالِيَة

قَوْلُهٗ فِىْ جُزْئِيَّاتِهِمَا لِاَنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ : এই ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর جُزْئِيَّات এবং اَجْزَاء মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। আর পার্থক্য বর্ণনা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো -এর মধ্যে এটা বলা যে, দ্বিতীয় لَا টা تَاسِيْس -এর জন্য হয়েছে تَاكِيْد -এর জন্য নয়। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, تَاسِيْس টা تَاكِيْد থেকে উত্তম। কেননা تَاكِيْد দ্বারা পূর্ববর্তী مَضْمُوْن -এর تَاكِيْد হয় যা কোনো নতুন ইলম নয়। আর تَاسِيْس দ্বারা নতুন ইলম, নতুন ফায়দা অর্জিত হয়। আর নতুন বিষয় জানা পুরনো বিষয়ের তাকিদের মোকাবিলায় সর্বাবস্থায়ই উত্তম।

اَجْزَاءٌ এবং جُزْئِيَّاتٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : কোনো বস্তুর اَعْضَاء এবং حِصَّه [অংশ] কে اَجْزَاء বলা হয়। اَجْزَاء হলো جُزْء -এর বহুবচন। যেমন خَالِد একটি বস্তু এটা অনেক اَجْزَاء দ্বারা مُرَكَّبٌ; যেমন তার হাত আছে, পা আছে, নাক আছে, কান আছে, চোখ আছে। মোটকথা খালেদ ভিতর এবং বাহির -এর অনেকগুলো اَجْزَاء -এর সমষ্টিতে গঠিত। اَجْزَاء -এর সাথে مُرَكَّبٌ হয়ে যে বস্তু তৈরি হয় তাকে جُزْئِىْ বলা হয়। আর অনেক جُزْئِيَّاتٌ মিলে যে সমষ্টি তৈরি হয় তাকে نَوْع বলা হয়। যেমন অনেক মানুষের اَفْرَاد -এর সমষ্টিকে نَوْع বলা হয়। এরই উপর কিয়াস করে حَسَنَة এবং سَيِّئَة কে বুঝে নিবে।

نَوْع হলো একটি حَسَنَة আর سَيِّئَة হলো আরেকটি نَوْع ; প্রতিটি نَوْع-এর অধীনে অনেক أَفْرَادٌ হয়ে থাকে। যাকে ঐ نَوْع -এর جُزْئِيَّاتٌ বলা হয়। এ কারণেই حَسَنَة অর্থাৎ নেকীর অনেক أَفْرَادٌ রয়েছে। যা পরস্পর একটি অপরটির হতে أَعْلٰى এবং أَدْنٰى হয়ে থাকে। যেমন ঈমান, শোকর, নামাজ, রোজা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মানুষের সহমর্মিতা, সুন্নতের পাবন্দী, মোস্তাহাবের উপর আমল, এগুলো সবই حَسَنَة অর্থাৎ নেক কর্মের أَفْرَادٌ বা একক, আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত নেক কর্মগুলোর মধ্যে কোনোটি কোনোটি হতে উপরের স্তরের। যেমন ঈমান সবচেয়ে উপরের স্তরের। এরপর অন্যান্য ফরজসমূহ, এরপর ওয়াজিব, এরপর সুন্নত ও মোস্তাহাবসমূহ এরপর أَوْلٰى এবং أَفْضَلُ -এর নম্বর। হাদীস শরীফেও এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ . (مشكوة صـ١٢)

যেমনিভাবে নেক কাজের অনেক أَفْرَادٌ এবং جُزْئِيَّاتٌ রয়েছে, অনুরূপভাবে سَيِّئَة তথা মন্দকর্মেরও অনেক أَفْرَادٌ রয়েছে। তন্মধ্যে কোনোটি কোনোটি অপেক্ষা أَعْلٰى এবং أَدْنٰى যেমন কুফর, শিরক, ফরজ কর্ম পরিত্যাগ করা, ছিনতাই, চুরি, এতিমের মাল ভক্ষণ, গালিগালাজ, বদ ধারণা, বদ নজর, রাস্তায় ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখা, ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা, ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা, ইস্তেঞ্জা করার সময় কেবলার দিকে إِسْتِقْبَالْ বা إِسْتِدْبَارْ করা। কাবার দিকে থুথু ফেলা, পা বিছিয়ে রাখা এই সবগুলোই মন্দকর্মের أَفْرَادٌ বা একক। তবে মর্যাদাগত দিক থেকে সবগুলো সমান নয়। বরং পরস্পর একটি অপরটি থেকে أَعْلٰى এবং أَدْنٰى হয়েছে। একথা কেউ জানে না যে শিরক ও কুফর এর বিপরীতে কেবলার দিকে ফিরে বা পেছন দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা বা কেবলার দিকে থুথু ফেলা এবং পা বিছিয়ে রাখার কোনোই حَيْثِيَّتْ [অবস্থান] রাখে না।

উল্লিখিত আয়াতে لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর মধ্যে যদি حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর সমতা না হওয়াকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় তবে দ্বিতীয় لَا কে শুধুমাত্র تَاكِيْد -এর জন্য মানা হবে। কেননা এখন আসল ইবারত এরূপ হবে যে, لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ এই ইবারত দ্বারা حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর মধ্যে عَدَم مُسَاوَاتٌ বুঝা গেল। এখন যদি لَا বৃদ্ধি করে তবে তা দ্বারা عِلْم عَدَم مُسَاوَاتٌ -এর تَاكِيْد হবে যা প্রথম থেকেই জানা গেছে। নতুন ইলম এবং নতুন ফায়দা নয়।

আর যদি لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর جُزْئِيَّاتٌ -এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। তবে এটা একটা নতুন ইলম হবে। কেননা حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর মাঝের পার্থক্য তো প্রথম لَا দ্বারাই বুঝা গেছে। আর এখন দ্বিতীয় لَا দ্বারা حَسَنَاتٌ এবং سَيِّئَاتٌ -এর جُزْئِيَّاتٌ -এর মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। এই সুরতে لَا টা تَاسِيْس -এর জন্য হবে تَاكِيْد -এর জন্য নয়। এই নতুন ফায়দা বর্ণনা করার জন্য মুফাসসির (র.) لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর তাফসীরে فِيْ جُزْئِيَّاتِهِمَا -এর বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : জমহুরের নিকট إِنَّنِيْ টা দুটি نُوْن -এর সাথে হয়েছে। আর ইবনে আবি লায়লা একটি نُوْن -এর সাথে إِنِّيْ পড়েছেন। অর্থাৎ সে গর্ব বড়ত্ব ও অহঙ্কারের সাথে বলে যে, আমি মুসলমান।

قَوْلُهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ : حَمِيْم অর্থ গরম পানি বলা হয় إِسْتَحَمَّ অর্থাৎ إِغْتَسَلَ بِالْحَمِيْمِ তথা গরম পানি দ্বারা গোসল করেছে। এখন মুতলাক গোসল করাকে إِسْتِحْمَامٌ বলতে লাগলো। চাই গরম পানি দ্বারা হোক বা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা হোক। আবার حَمِيْم অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলা হয়।

قَوْلُهُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ : এটা إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ শর্তের جَوَابٌ হয়েছে। আর فَاسْتَعِذْ আমরের জবাব উহ্য রয়েছে। যাকে আল্লামা মহল্লী (র.) يَدْفَعُهُ বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَنْزَغَنَّكَ : এটা نَزْغٌ মসদার থেকে مُضَارِع بَانُون تَاكِيْد ثَقِيْلَة -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ ك হলে, মাফঊলের যমীর অর্থ তোমার ওয়াসওয়াসা আসে।

قَوْلُهُ خَلَقَهُنَّ اَيِ الْاٰيَاتِ الْاَرْبَعَ : সংশয় : خَلَقَهُنَّ -এর জায়গায় خَلَقَهُمَا টা অধিক স্পষ্ট ছিল কেননা যাদের জন্য সেজদা তারা তো দুটিই অর্থাৎ চন্দ্রও সূর্য। কাজেই خَلَقَهُمَا হওয়া উচিত ছিল।

নিরসন : চন্দ্র সূর্য কে সেজদা করা নাজায়েজ হওয়া এবং তাদের মধ্যে মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা না থাকার ইল্লত হলো তাদের মাখলুক হওয়া। কেননা মাখলুক যতই বড়ত্বের অধিকারী হোক না কেন সে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। خلقهن -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর নিয়ে বলে দিয়েছেন যে, চন্দ্র ও সূর্য ও দিন রাতের মতো মাখলুক এবং সৃষ্টির প্রতিক্রিয়ার অধীন।

قَوْلُهُ وَمِنْ اٰيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ الخ : مِنْ اٰيَاتِهٖ হলো خَبَر مُقَدَّمْ এবং اَللَّيْلُ এবং اَلنَّهَارُ এবং যা তার উপর আতফ করা হয়েছে তা مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ الخ : এখানে مِنْ اٰيَاتِهٖ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর اَنَّ স্বীয় مَدْخُول সহ بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ -এর মধ্যে اَمْر টা تَخْيِيْر -এর জন্য নয়; বরং تَهْدِيْد তথা ধমকির জন্য হয়েছে। এর قَرِيْنَة হলো بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

قَوْلُهُ تُجَازِيْهِمْ : এটা উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, اِنَّ -এর خَبَرْ উহ্য রয়েছে। আর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হলো اِنَّ -এর اِسْم

قَوْلُهُ مَنِيْعٌ : منيع টা فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ -এর ওজনে হয়েছে। অর্থাৎ যেটা পরিবর্তন পরিবর্ধন গ্রহণ করা থেকে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ أَأَعْجَمِيٌّ : এটা উহ্য مُبْتَدَأ -এর খবর। যাকে মুফাসসির (র.) قُرْاٰن বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَعْجَمِيٌّ : এর মধ্যে يَاء টা مُبَالَغَةٌ فِى الْوَصْفِ -এর জন্য হয়েছে। যেমন اَحْمَرِيٌّ -এর মধ্যে হয়েছে। كَلَام اَعْجَمِيٌّ ঐ كَلَامٌ কে বলে যা বুঝে আসে না। أَأَعْجَمِيٌّ -এর মধ্যে প্রথম হামযা হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىٌّ দ্বিতীয় হামযার মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে যেদিকে আল্লামা মহল্লী (র.) بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَقَلْبِهَا اَلِفًا بِالْاَشْبَاعِ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন প্রথম কেরাত তো সুস্পষ্ট যে, উভয় হামযাকে مُحَقَّقْ পড়া হবে। দ্বিতীয় কেরাত হলো এই যে, দ্বিতীয় হাযমাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে اِشْبَاعْ অর্থাৎ مَدّ طَوِيْل لَازِمْ -এর সাথে পড়বে। اَعْجَمِيٌّ আর وَدُوْنَهُ -এর শব্দ سَبَقَتْ قَلَمٌ হয়েছে। এরপর دُوْنَهُ -এর সম্পর্ক قَلْبٌ -এর সাথে হয়েছে। অর্থাৎ دُوْنَ قَلْبِ اَلِفٍ এই সুরতে এটা অন্য কেরাতের بَيَانْ হবে। কেননা قَلْب -এর সুরতে مَدّ لَازِمْ তো রয়েছে এরপর بِدُوْنَ الْمَدِّ কিভাবে হতে পারে?

পাঁচটি কেরাত ধারাবাহিকভাবে এই যে, ১. উভয় হামযার মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় হামযাকে تَسْهِيْل করে পাঠ করা।

২. اَلْمَدُّ الطَّوِيْلُ সহকারে দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করা।

৩. দুই হামযার মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি না করে দ্বিতীয় হামযাকে تَسْهِيْل করে পাঠ করা।

৪. এক হামযায়ে খবরিয়্যার সাথে اَعْجَمِيٌّ পড়া।

৫. اَلِفْ বৃদ্ধি না করে هَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ রূপে পাঠ করা।

قَوْلُهُ عَمِلَ : عَمِلَ উহ্য ফে'ল মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, فَلِنَفْسِهٖ টা উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আবার এটাও সহীহ যে, لِنَفْسِهٖ টা উহ্য মুবতাদার খবর হবে। উহ্য ইবারত হবে فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ لِنَفْسِهٖ

قَوْلُهُ بِذِىْ ظُلْمٍ : এটা একটি সংশয়ের নিরসন।

সংশয় : আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ দ্বারা كَثْرَتِ ظُلْمٍ -এর نَفِيْ হয় তবে نَفْسِ ظُلْمٍ -এর نَفِيْ হয় না।

নিরসন : ظَلَّامٌ টা صِيغَةُ نِسْبَتْ এটা صِيغَةُ مُبَالَغَة নয়। অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ظُلْم -এর مَنْسُوْب নন। যেমন- تَمَّارٌ এবং خَبَّازٌ -এর মধ্যে تَمَّارٌ খেজুর বিক্রেতাকে বলে। বেশি খেজুর বিক্রেতাকে নয়। এমনিভাবে خَبَّازٌ রুটি তৈরিকারীকে বলে। বেশি রুটি তৈরি কারীকে নয়। মুফাসসির (র.) بِذِيْ ظُلْمٍ দ্বারা এই জওয়াবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ : এটা মুমিনের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনোভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা সে মানুষকে নামাজের দিকে আহ্বান করে। একারণেই হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াজ্জিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَا إِلَى اللّٰهِ বাক্যের পর عَمِلَ صَالِحًا বলে আজান ইকামতের মধ্যস্থলে দু'রাকাত নামাজ বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজান ও ইকামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। -[মাযহারী]

হাদীসে আজান ও আজানের জবাব দেওয়ার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে আজান দেওয়া হয়। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ : এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অত্যন্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জবাবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। -[মাযহারী]

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জবাবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই তবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। -[কুরতুবী]

আজানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে। -[বুখারী শরীফ]

হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুয়াজ্জিনের [আজানের] আওয়াজ যত দূর যাবে যত জিন, মানুষ বা জীব জন্তু তা শ্রবণ করবে, কিয়ামতের দিন সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। -[বুখারী শরীফ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইমাম জিম্মাদার, মুয়াজ্জিন আমানতদার, হে আল্লাহ! ইমামদেরকে হেদায়েত কর, আর মুয়াজ্জিনদেরকে মাগফেরাত দান কর। -[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় সাত বছর যাবত আজান দেয়, তার জন্যে দোজখ থেকে নাজাতের ঘোষণা লিপিবদ্ধ করা হয়। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ স্থানে থাকবে- ১. সেই গোলাম যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং তার মনিবের দায়িত্বও পালন করে। ২. সেই ব্যক্তি যে মানুষের ইমামতি করে এবং লোকেরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ৩. সে ব্যক্তি যে দিনে রাতে পাঁচবার আজান দেয়। -[তিরমিযী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বার বছর আজান দেয় তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়, প্রত্যেক আজানের জন্যে ৬০টি নেকি লিপিবদ্ধ হয়, আর ইকামতের জন্য ৩০টি নেকি লিপিবদ্ধ হয়।

-[ইবনে মাজাহ]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ পর্যায়ে হযরত ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমি মুয়াজ্জিন হতাম তবে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো, আর সে অবস্থায় আমি রাত্রের নফল নামাজ এবং দিনের নফল রোজার জন্যেও এত ব্যাকুল হতাম না। আমি শুনেছি যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মুয়াজ্জিনদের মাগফেরাতের জন্যে তিনবার দোয়া করেছেন, আমি আরজ করেছি, হুজুর আমাদেরকে আপনি দোয়াতে স্মরণ করলেন না? অথচ আমরা আজান জারি করার জন্যে জিহাদ করে থাকি। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, কিন্তু হে ওমর! এমনও সময় আসবে যখন মুয়াজ্জিনের কাজটি নিতান্ত দরিদ্র এবং অনাথ লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়বে। শোন হে ওমর! যাদের গোশত এবং চর্ম দোজখের উপর হারাম মুয়াজ্জিনও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা ২৪, পৃষ্ঠা-৭৮]

এ আয়াতে সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করে এবং যারা সৎকাজ করে আর একথা জানিয়ে দেয় যে, আমি একজন মুসলমান।

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যাঁরা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বন করেছেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ। সেজন্যে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ মত পোষণ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর যেহেতু মুয়াজ্জিনগণ মানুষকে নামাজের জন্যে আহ্বান করে থাকেন, সেজন্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং হযরত ইকরিমা (রা.) হযরত মুজাহিদ (র.) এবং কায়েস ইবনে আবি হাজেম বলেছেন, এ আয়াত মুয়াজ্জিনদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেন, এ আয়াত সে সব লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে। এ মত পোষণ করেন হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত মুকাতেল (র.) এবং অন্যান্য অনেক তাফসীরকারগণ।

মূলতঃ মুয়াজ্জিনগণের ফজিলত ও মাহাত্ম সর্বত্র স্বীকৃত। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যার কিছুটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শুধু মুয়াজ্জিন নয়, বরং যে কেউ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর দিকে ডাকে, তার ফজিলতের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি পীর মুর্শিদও হতে পারেন, দ্বীনি কিতাবের গ্রন্থকারও হতে পারেন, ওয়ায়েজ বা মোদাররেসও হতে পারেন, ন্যায়বিচারক, মুজাহিদও হতে পারেন, যদি কেউ মানুষকে ইসলামের দিকে আন্তরিকভাবে আহ্বান করে এবং নিজেও ইসলামি বিধি-বিধানের উপর আমল করে তবে সে-ই হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি, তার মরতবা হবে সর্বোচ্চ।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর, তাফসীরে মাজেদী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তাঁরাই হলেন আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁরাই হলেন সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং প্রিয়। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং অন্যদেরকে আনুগত্যের জন্য আহ্বান করেছেন এবং সর্বদা নেক আমল করেছেন, নিজের মুসলমান হওয়ার কথা সর্বত্র ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে তাঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত প্রতিনিধি। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ২৪, পৃ. ৭৮]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নবী রাসূলগণের দাওয়াত। এরপরের স্থান হলো ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতের, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ অর্থাৎ আলেমগণ হলো নবীগণের উত্তরাধিকারী। প্রিয়নবী ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন– عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ আমার উম্মতের ওলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায়।

যেহেতু আমাদের প্রিয়নবী ﷺ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তারপর অন্য কোনো নবী আগমনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাঁর দীনের প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের প্রতি, তাই ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতি কর্মসূচিই হলো উত্তম। আর এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত বা আহ্বান করা হলো সর্বোত্তম কাজ আর যা সর্বোত্তম কাজ তা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য, অতএব মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা অবশ্য কর্তব্য।

–[তাফসীরে কাবীর, খ. ২৬, পৃ. ১২৫-২৬]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি সৎকাজ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু ভালো কথা বললেই হবে না, বরং ভালো কাজও করতে হবে, যদি শুধু ভালো কথাই বলা হয়, সে অনুযায়ী কাজ না করা হয় তবে তাতে বরকত হয় না। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, পৃ. ৯২৮]

وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আর সে বলে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

কখনো কখনো বুঝা যায়, যদি ওয়াজ বয়ান ভালো হয় এবং নেক আমলও হতে থাকে তখন মানব অন্তরে তার কু-প্রবৃত্তির কারণে অহংকার সৃষ্টি হয়, সে নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করতে থাকে, তার ইলম, আমল এবং দাওয়াতি কর্মসূচির বড়াই করতে থাকে। ঐ ব্যক্তির মনের এ অবস্থা তার সমূহ ধ্বংসের কারণ হয়, এজন্যে আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে এই রোগের চিকিৎসা স্বরূপ বিনয় অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও সৎকাজ করে, সে একথা বলে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার অগণিত অনুগত গোলামদের অন্যতম, আল্লাহ তা'আলার অনুগত লোকদের সংখ্যা অগণিত, আমিও তাদের মধ্যে একজন। আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দান করেছেন বলেই আমি তার অনুগত হতে পেরেছি। এটি আমার কোনো গুণ নয়, তাঁরই তৌফিক, তাঁরই দয়া।

আয়াতের মর্মকথা : আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো তিনটি বিষয়–

১. মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা, সত্যের নির্দেশ দেওয়া এবং অসত্য থেকে বিরত রাখা অবশ্য কর্তব্য।

২. কিন্তু এ কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নিজেও সৎকাজ করতে হবে। মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ভালো কাজ, কিন্তু যে পর্যন্ত নির্দেশ দাতা নিজে আমল না করে বরং শুধু অন্যকেই আহ্বান করে তার সে আহ্বান ফলপ্রসু হয় না।

৩. মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা তথা দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করা এবং সর্বদা নেক আমল করার কারণে কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, কখনো মনে যেন দম্ভ অহংকার সৃষ্টি না হয়, নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় এবং ভালো মনে করা সমীচীন নয়; বরং বিনীতভাবে একথা প্রকাশ করা উচিত যে, আমিও আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের একজন।

বর্তমান যুগের মানুষের কর্তব্য : যেভাবে মক্কা মুয়াজ্জমায় কাফেররা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল, আর এজন্যে তখন মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো অত্যন্ত বড় কাজ ছিল, বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান নামধারী, লোকেরাই ইসলামের বিরোধিতা করে। ইসলাম একটি পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান, জীবনের সকল অঙ্গন ও এর আওতাধীন রয়েছে, জীবনের কোনো স্তর বা কোনো দিক ইসলামের বাইরে নয়, যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনের কোনো দিককে ইসলামি বিধি-নিষেধের

বাইরে রাখতে চায় সে পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারে না। এজন্যেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে কোনো কোনো লোককে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রয়োগের কথা স্বীকার করতে রাজি নন, মানব জীবনের এ অঙ্গনকে ইসলামের বিধি-নিষেধ থেকে দূরে রাখতে ইচ্ছুক। এতো হলো বিশ্বাসগত ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্বাস ঠিকই আছে, কিন্তু কার্যতঃ তার বাস্তবায়ন অনুপস্থিত। যেমন- সুদ, ঘুষ প্রভৃতি ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এবং অবৈধ, কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সুদ এবং ঘুষের আদান-প্রদান অহরহ চলছে। এতদ্ব্যতীত, নারী সমাজের ব্যাপারে ইসলামের বিধি-নিষেধ সর্বজনবিধিত, তাদের পর্দায় রাখার ব্যাপারে কুরআনে কারীমের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ অর্থাৎ এবং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান কর আর প্রাচীন জাহেলিয়া যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা নামাজ কায়েম করবে, এবং জাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে।

বর্তমান যুগে এসব নির্দেশ অহরহ লঙ্ঘন করা হয়। ইসলামের এসব বিধান অমান্য করতে কারোই কোনো প্রকার ভয় হয় না, অথচ এর অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি এমন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। নারীকে বেপর্দা করে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হয়েছে এবং এতে করে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা দিয়েছে নৈতিক অবক্ষয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারী, মদ্যপানের সময় মদ্যপায়ী এবং চুরি করার সময় চোর মুমিন থাকে না। মানুষ যখন এমনি অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান দূরে সরে পড়ে। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- গুপ্তস্থান ও রসনার পাপই মানুষকে সবচেয়ে বেশি দোজখের দিকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ ব্যভিচার ও মিথ্যাবাদিতা মানুষের জন্যে কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ উম্মত সর্বদা সুখে-শান্তিতে থাকবে, যতদিন তাদের মধ্যে অবৈধ সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি না পাবে। কিন্তু অবৈধ সন্তান জন্মের হার বেড়ে যাবে তখন সমগ্র উম্মতের উপরই আজাব নাজিল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। -[বুখারী শরীফ]

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে জনপদে সুদখোরী এবং ব্যভিচার প্রকাশ্যে হতে থাকে, তবে মনে করবে সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত করেছে। প্রিয়নবী ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন- مَتَى يَفْشُو الزِّنَا يَكْثُرُ الْهَرْجُ অর্থাৎ যখন কোনো সমাজে ব্যভিচার বেড়ে যাবে তখন হত্যাকাণ্ডও বেড়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত লাভ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় সৃষ্টি করে দেবেন। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার বেড়ে যাবে, তাতে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে। আর যে সম্প্রদায় ওজনে ফাঁকি দেবে তাদের রিজিক কমে যাবে। আর যারা সত্য বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে। আর যারা প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করবে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দুশমনকে চড়াও করে দেবেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলার আজাবের যে সব কারণ ও উপকরণের কথা প্রিয়নবী ﷺ বলে গেছেন, তার কোনটি বর্তমান সমাজকে বিষাক্ত সর্পের ন্যায় দংশন করেনি? বর্তমান অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করা হলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, প্রিয়নবী ﷺ যেন এ যুগের জন্যেই এসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

বস্তুতঃ বর্তমানে বর্বরতার যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে, একথা আদৌ অত্যুক্তি নয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে- فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ অতএব, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর যে কোনো বিপদ বা কঠিন শাস্তি আসতে পারে।

বর্তমান যুগে মুসলিম জাতির উপর যে দুর্গতি নেমে এসেছে, এটি সে বিপদই যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্কবাণী করেছেন। অতএব, বর্বরতার যুগে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা যেমন উত্তম এবং অবশ্য কর্তব্য ছিল, ঠিক তেমনিভাবে আজো তা সর্বাধিক উত্তম ও অবশ্য কর্তব্য। প্রতিটি মুসলমানের বিশেষত ওলামায়ে কেরামের জন্যে এ কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। আর এর ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনাতীত।

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েজ নয় : لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোনো নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমা বলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, ইবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোনো উম্মত ও শরিয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরিয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কুরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ : এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবূ বকর আহকামুল কুরআনে লিখেন, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রথম আয়াত অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-এর শেষে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক (র.) তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ لَا يَسْئَمُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)ও তাই বলেছেন। এ কারণে মাসরূক, আবূ আব্দুর রহমান, ইবরাহীম নাখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহকামুল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, হানাফী মাযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

কুফরের বিশেষ প্রকার 'ইলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান : اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালাত ও তাওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করতো, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আজাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার ইলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اِلْحَادٌ ও لَحْدٌ -এর আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা কবরকেও একারণেই لَحْد বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কুরআনি আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে ইলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে ইলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে ইলহাদ হচ্ছে কুরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কুরআন সুন্নত ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও ইলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, اَلْاِلْحَادُ هُوَ وَضْعُ الْكَلَامِ عَلٰى غَيْرِ مَوْضِعِهِ। আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইতো। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কুরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কুরআনের বিধানাবলিকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, ইলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ মুখে কুরআন ও কুরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিতাবুল খেলাফে বলেন, كَذَالِكَ الزَّنَادِقَةُ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ وَقَدْ كَانُوْا يُظْهِرُوْنَ الْإِسْلَامَ অর্থাৎ সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা ইলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলিকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান : আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরি বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয় যে, যে কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোনো ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করি। কিন্তু কুরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফিকহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরি বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল যেমন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়া, ফজরের দু'রাকাত ও জোহরের চার রাকাত ফরজ হওয়া, রমজানের রোজা ফরজ হওয়া, সুদ, মদ ও শুকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে এমন কোনো অর্থ উদ্ভাবন করে যদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপে ও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এটা প্রকৃত প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا عُلِمَ مَجِيْئُهُ بِهٖ ضَرُوْرَةً অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীম ﷺ -এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্বল্যমানরূপে তার কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, অর্থাৎ আলেমগণ তো জানেনই সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত ও জাজ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিকে অস্বীকার করা।

অতএব যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

বর্তমান যুগে কুফর ও ইলহাদের ব্যাপকতা : বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলি সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নবশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞ। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহবিহীন বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামি মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরিয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলির পরিবর্তন করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরিউক্ত প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না; বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মাত্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না।

হযরত শাহ আব্দুল আজীজ (র.) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কুরআনের আয়াতে ইলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার : **এক.** যে অর্থ কুরআন-হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অকাট্য ইজমার পরিপন্থি, এটা নিঃসন্দেহে কুফর এবং **দুই.** যা কুরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চয়তার নিকটবর্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থি। এটা গোমরাহী ও পাপাচার [ফিসক] কুফর নয়। এ দুপ্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কুরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ফিকহবিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার ও ছওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذكر বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে ان الذين كفروا বাক্যটি পূর্ববর্তী إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ বাক্য থেকে بدل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম এই যে, তারা যেহেতু আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আজাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

قَوْلُهُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ : এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। হযরত কাতাদা ও সুদ্দী (র.) বলেন, আয়াতে باطل বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদদিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনোদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোনো প্রকার শয়তানই কুরআন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কুরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবূ হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই প্রয়োজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে হোক, যে কোনো বাতিল কুরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোনো বাতিলপন্থিদের সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও ইলহাদ করার সাধ্যও কারো নেই।

তাবারীর তাফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কুরআনে ইলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দুটিই। এক. খোলাখুলিভাবে কুরআন কোনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. বাহ্যত ঈমান দাবি করা কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কুরআনের অর্থে বিয়োজন সাধন করা। একে مِنْ خَلْفِهِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারো নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলির পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো নেই। যখনই কোনো হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কুরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কুরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বুঝে। কুরআন চৌদ্দশ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষকে বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বলে আল্লাহ তা'আলা কেবল কুরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ সম্ভারের হেফাজত করাও আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্ব। তনি আপন রাসূল ও তার প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোনো বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। ফলে সে ব্যর্থও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি? إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বাক্যে لَهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে এবং কুরআন কেবল ভাষার নাম নয়। বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ -এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের হেফাজত করেছেন। ফলে কারো মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কুরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

قَوْلُهُ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ : আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে أَعْجَمُ বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবি নয়, তাকে আজমি বলা হবে যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুত أَعْجَمِيٌّ বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবি ভাষা ব্যতীত অপর কোনো ভাষায় কুরআন নাজিল করতাম তবে কুরাইশরা অভিযোগ করতো যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতো, রাসূল তো আরবি আর কিতাব হলো কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ : এখানে কুরআনের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে– **এক.** কুরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে, **দুই.** কুরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা লোভ-লালসা ইত্যাদি রোগ যে কুরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কুরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কুরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফল হয়।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে أَنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে أَنْتَ تُنَادٰى مِنْ بَعِيْدٍ অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কুরআনের নিদর্শনাবলি শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌঁছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

অনুবাদ :

٤٧. اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط مَتٰى تَكُوْنُ لَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ وَفِي قِرَاءَةٍ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا اَوْعِيَتِهَا جَمْعُ كِمٍّ بِكَسْرِ الْكَافِ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِيْ قَالُوْا اٰذَنَّاكَ ؕ اَيْ اَعْلَمْنَاكَ الْاٰنَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ج اَيْ شَاهِدٍ بِاَنَّ لَكَ شَرِيْكًا .

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর দিকেই ফিরানো হয়। কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। সব ফলই আবরণ মুক্ত হয় অন্য কেরাতে ثَمَرَاتٌ রয়েছে এবং اَكْمَامٌ শব্দটি كِمٌّ -এর [ك-এর মধ্যে যের দ্বারা এর] বহুবচন; আল্লাহর জ্ঞানেই। এবং কোনো নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না আল্লাহর ইলম ছাড়া। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরিকরা কোথায়? সেদিন তারা উত্তর দেবে যে, আমরা আপনাকে ঘোষণা দিয়েছি যে, আমরা আপনার নিকট জানিয়ে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। আমরা কেউ এটা স্বীকার করিনি যে, আপনার শরিক আছে।

٤٨. وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ قَبْلُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَصْنَامِ وَظَنُّوْا اَيْقَنُوْا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ مَهْرَبٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّفْيُ فِي الْمَوْضَعَيْنِ مُعَلِّقٌ عَنِ الْعَمَلِ وَقِيْلَ جُمْلَةُ النَّفْيِ سُدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ .

৪৮. পূর্বে দুনিয়াতে তারা যে সমস্ত মূর্তিকে আহ্বান করত পূজা করত তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, বিশ্বাস করে নেবে যে, তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। আজাব থেকে পলায়নের কোনো স্থান নেই। আর حَرْفُ نَفْيٍ তথা না-বোধক অব্যয় পূর্বের দুই স্থানে অর্থাৎ ১. مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ২. مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ -এর মধ্যে আমল থেকে নিষ্ক্রিয় এবং না-বোধক বাক্যটি (جُمْلَةُ النَّفْيِ) পূর্বের اٰذَنَّا ফে'লের দুই মাফঊলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

٤٩. لَا يَسْاَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ز اَيْ لَا يَزَالُ يَسْاَلُ رَبَّهُ الْمَالَ وَالصِّحَّةَ وَغَيْرَهُمَا وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ الْفَقْرُ وَالشِّدَّةُ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَهٰذَا وَمَا بَعْدَهُ فِي الْكَافِرِيْنَ .

৪৯. মানুষ কল্যাণ কামনায় ক্লান্ত হয় না। অর্থাৎ মানুষ সর্বদা তার রবের নিকট সম্পদ, সুস্থতা ইত্যাদির উন্নতি কামনা করতে থাকে। আর যদি তাকে অমঙ্গল দারিদ্র ও কষ্ট মসিবত স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর রহমত থেকে এবং এরপর সে অকৃতজ্ঞশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

٥٠. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَذَقْنٰهُ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً غِنًى وَصِحَّةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ شِدَّةٍ وَبَلَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ اَيْ بِعَمَلِيْ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ج اَيِ الْجَنَّةُ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ز وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ شَدِيْدٍ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسَمٍ.

৫০. لَئِنْ -এর ل কসমের জন্যে আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ [ধনরত্ন, সুস্থতা আস্বাদন করাই, দুঃখ -দুর্দশা কষ্ট, মসিবত স্পর্শ করার পর, তখন সে বলে, এটা আমার প্রাপ্য অর্থাৎ আমার কর্মের বিনিময়ে এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্যে কল্যাণ জান্নাত রয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত করব ও তাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব। পূর্বের দুই ফে'লের মধ্যে ل বর্ণটি কসমের জন্যে।

٥١. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ الْجِنْسِ اَعْرَضَ عَنِ الشُّكْرِ وَنَا بِجَانِبِهٖ ج ثَنٰى عِطْفَهٗ مُتَبَخْتِرًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيْمِ الْهَمْزَةِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ كَثِيْرٍ.

৫১. এবং আমি যখন মানুষের প্রতি اَلْاِنْسَانُ দ্বারা মানুষ জাতি উদ্দেশ্য অনুগ্রহ করি, তখন সে কৃতজ্ঞতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ অহংকার করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে। نَا ফে'লের মধ্যে ভিন্ন কেরাত মতে হামযাকে পূর্বে নিয়ে আসবে অর্থাৎ نَاٰى পড়বে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে অধিক দোয়া কামনাকারী হয়।

٥٢. قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ اَيِ الْقُرْاٰنُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَيْ لَا اَحَدَ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ خِلَافٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْحَقِّ اَوْقَعَ هٰذَا مَوْقِعَ مِنْكُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ.

৫২. বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় যেমনটা মুহাম্মদ ﷺ বলেন। অতঃপর তোমরা একে অস্বীকার কর, তার চাইতে কে অধিক পথভ্রষ্ট যে সত্য থেকে দূরে থেকে কুরআনের বিরোধিতায় লিপ্ত? অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কেউ নেই। উক্ত আয়াতে বিরোধিতাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য مِنْكُمْ -এর স্থলে مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ বলা হয়েছে [অর্থাৎ مَنْ اَضَلُّ مِنْكُمْ না বলে مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ বলা হয়েছে। কেননা مَنْ اَضَلُّ مِنْكُمْ বলা দ্বারাই তাদের অবস্থা প্রকাশ হয় না।]

٥٣. سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنَ النَّيِّرَاتِ وَالنَّبَاتِ وَالْاَشْجَارِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مِنْ لَطِيْفِ الصَّنْعَةِ وَبَدِيْعِ الْحِكْمَةِ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ اَيِ الْقُرْاٰنُ الْحَقُّ ط

৫৩. শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেখাব, আমার নিদর্শনাবলি দিগদিগন্তে আসমান ও জমিনের প্রান্তে এবং এই নিদর্শনসমূহ হলো তারকা-নক্ষত্র, তৃণলতা ও গাছপালা ইত্যাদি এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শন দেখিয়েছি নিপুণ কারিগরি ও জ্ঞান দানের মাধ্যমে ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য।

اَلْمُنَزَّلُ مِنَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ فَيُعَاقَبُوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ بِهٖ وَبِالْجَائِىْ بِهٖ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ فَاعِلُ يَكْفِ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ بَدَلٌ مِنْهُ اَىْ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ فِىْ صِدْقِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَا يَغِيْبُ عَنْهُ شَىْءٌ مَا .

পুনরুত্থান, হিসাব ও শাস্তি ইত্যাদির সত্যায়নে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এ কুরআন ও এর বাহককে অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা। بِرَبِّكَ বাক্যটি يَكْفِ -এর ফায়েল এবং اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ টি رَبِّكَ থেকে بَدَلٌ অর্থাৎ আপনার সত্যায়নের ব্যাপারে তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার রব থেকে ক্ষুদ্র কোনো বস্তুও লুক্কায়িত নয়।

৫৪. اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِنْ لِقَاۤءِ رَبِّهِمْ ط لِاِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ اَلَآ اِنَّهٗ تَعَالٰى بِكُلِّ شَىْءٍ مُحِيْطٌ عِلْمًا وَقُدْرَةً فَيُجَازِيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ .

৫৪. জেনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের অবিশ্বাসের কারণে। শুনে রাখ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ইলম ও কুদরত দ্বারা। অতএব তিনি তাদের কুফরির শাস্তি প্রদান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لَا يَعْلَمُ غَيْرُهٗ : এর দ্বারা এই حَصْرٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা اِلَيْهِ يُرَدُّ -এর পূর্বে আনার দ্বারা বা مُقَدَّم করার দ্বারা বুঝা যায় অন্যথায় তো يُرَدُّ اِلَيْهِ হতো।

قَوْلُهٗ مَا تَخْرُجُ مِنْ اَكْمَامِهَا : مِنْ অব্যয়টি ফায়েলের উপর অতিরিক্ত হয়েছে। ثَمَرَةٌ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। আর উভয়টিই কেরাতে সাব'আর অন্তর্ভুক্ত। جِنْس -এর হিসেবে اَفْرَاد আর نَوْع -এর হিসেবে جَمْع হয়েছে। اَكْمَام শব্দটি كِمٌّ -এর বহুবচন। খেজুর ইত্যাদির খোসাকে كِمٌّ বলা হয়।

قَوْلُهٗ وَالنَّفْىُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ : এখানে مَوْضِعَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اٰذَنّٰكَ مَا مِنَّا এবং وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ مِنْ شَهِيْدٍ উল্লিখিত উভয় স্থানেই نَفِى টা فِعْل -এর মধ্যে শাব্দিকভাবে আমল করার প্রতিবন্ধক, مَحَلًّا প্রতিবন্ধক নয়। আর সেই উভয় فِعْل হলো اٰذَنّٰكَ এবং ظَنُّوْا - اٰذَنّٰكَ টা اَعْلَمْنَاكَ -এর অর্থে হয়েছে কাজেই এটা اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্গত এবং ظَنُّوْا -ও اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্গত। আর اِفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর মধ্যে تَعْلِيْق -এর অর্থ হলো শব্দের মধ্যে আমলকে রহিত করে দেওয়া– অর্থের মধ্যে নয়। আর এ আমল রহিতকরণ সে সময় হয়ে থাকে যখন এই ফে'লগুলো اِسْتِفْهَام , نَفِى বা اِبْتِدَاءٌ لَا -এর পূর্বে পতিত হয়। মুফাসসির (র.) اٰذَنّٰكَ -এর তাফসীর اَعْلَمْنَاكَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اٰذَنّٰكَ টা اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ الخ : মুফাসসির (র.) এখানে বলতে চাচ্ছেন যে, যদি উল্লিখিত فِعْل -গুলোকে مُتَعَلِّقٌ عَنِ الْعَمَلِ মানা না হয় তবে উভয় স্থানেই جُمْلَةٌ مَنْفِيَّةٌ -কে দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত মানতে হবে। ظَنُّوْا -এর প্রথম মাফউল এবং দ্বিতীয় মাফউলের স্থলাভিষিক্ত এবং اٰذَنّٰكَ-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। اٰذَنّٰكَ -এর كَافْ ضَمِيْر হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهٗ مَحِيْصٌ : এটা حَيْصٌ হতে ظَرْفُ مَكَانٍ হয়েছে। অর্থ হলো আশ্রয়স্থল। حَاصَ يَحِيْصُ حَيْصًا অর্থ اَلْفِرَارُ وَالْهَرَبُ তথা পলায়ন করা।

قَوْلُهٗ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ : এখানে ইযাফতটা اِضَافَةُ مَصْدَرٍ اِلَى الْمَفْعُوْلِ হয়েছে। আর جَارٌ مَجْرُوْرٌ মিলে يَسْاَمُ -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا لِيْ : এতে لَامٌ -টি اِسْتِحْقَاقٌ -এর জন্য হয়েছে। মুফাসসির (র.) بِعَمَلِيْ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন :

قَوْلُهُ فَلَنُنَبِّئَنَّ : এটা বাবে تَفْعِيْل হতে مُضَارِعْ بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة হয়েছে। অর্থ– আমরা অবশ্যই সতর্ক করব অবশ্যই বলে দেব। উভয় ফে'লের মধ্যে لَامُ قَسَمٍ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَنَاءَ : اَلِفْ -কে হামযার উপর مُقَدَّمْ করে অর্থাৎ . نَ যা قَالَ -এর ওযনে হয়েছে। আর দ্বিতীয় কেরাত হলো نَأَ হামযাকে اَلِفْ -এর উপর مُقَدَّمْ করে যা رَمٰى -এর ওজনে হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاٰى : এটা مَاضِيْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, মূলবর্ণ نَاٰى বাবে فَتَحَ অর্থ– দূর হয়ে গেল, চেহারা ফিরিয়ে নিল, পার্শ্ব খালি করল। যেহেতু আয়াতে مُتَعَدِّىْ بِالْبَاءِ হয়েছে তাই তার অনুবাদ হবে সে পার্শ্ব ফিরিয়ে নিল। কোনো কোনো কেরাতে نَاءَ بِجَانِبِهٖ এসেছে। এর মূলবর্ণ (نوء) বাবে نَصَرَ হতে অর্থ– অহংকারের সাথে পার্শ্ব ফিরিয়ে নিল।

قَوْلُهُ عَطْفَهُ : عَطْفٌ অর্থ– পার্শ্ব, কিনারা। বহুবচনে اَعْطَافٌ، عِطَافٌ، عُطُوْفٌ ; বলা হয় ثَنٰى عَنِّىْ عِطْفَهُ অর্থাৎ সে আমার থেকে পার্শ্ব খালি করল।

قَوْلُهُ لَا اَحَدَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنْ -টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ -এর মধ্যে مَنْ اَضَلُّ

قَوْلُهُ اَوْقَعَ هٰذَا : অর্থাৎ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ এটা اِعْرَاضْ -কারীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য مِنْكُمْ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। অন্যথায় مَنْ اَضَلُّ مِنْكُمْ বলাই যথেষ্ট ছিল। যেহেতু مِنْكُمْ দ্বারা তাদের অবস্থা বুঝা যায় না তাই مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ এনেছেন।

একটি সংশয় ও তার জবাব : قَوْلُهُ سَنُرِيْهِمْ -এর মধ্যে سِيْن টা فِعْل -কে ভবিষ্যতকালের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়। এতে বুঝায় যায় যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শনাবলি দেখাবেন। অথচ اٰيَاتُ قُدْرَتْ এখনও তো বিদ্যমান রয়েছে এবং দৃষ্টিগোচরও হচ্ছে।

উক্ত সংশয়ের জবাব হচ্ছে– বাক্যে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ– سَنُرِيْهِمْ عَوَاقِبَ اٰيَاتِنَا

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ : হামযা উহ্য ইবারতের উপর প্রবেশ করেছে আর وَاوْ -টি হলো عَاطِفَةْ; উহ্য ইবারত হলো- اَتَحْزَنُ عَلٰى اِنْكَارِهِمْ وَمُعَارَضَتِهِمْ لَكَ وَلَمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ এটা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ হয়েছে। بَاءْ টা فَاعِلْ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে مَفْعُوْلْ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ يَكْفِيْكَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে তা সে তারই উপকারার্থে করে, আর যে মন্দ কাজ করে তার শোচনীয় পরিণতি কিয়ামতের দিন তাকেই ভোগ করতে হবে, তখন কেউ প্রশ্ন করল, কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন কবে আসবে? তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ [কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে।]

অর্থাৎ কিয়ামত কবে হবে? কোন দিন হবে? কোন মুহূর্তে হবে, তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কারোই কোনো জ্ঞান নেই, যে যত বড় জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন, এ প্রশ্নের জবাবে শুধু বলবে, আমি জানি না। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ কিছুই জানে না। মক্কার কাফেররা প্রায়ই বিদ্রূপ করে এ প্রশ্ন করত, যে কিয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় দেখানো হয় সে কিয়ামত কবে আসবে? তারই উত্তরে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, এ সম্পর্কে আর কেউ কিছু বলতে পারে না। –[তাফসীরে কাবীর, খ, ২৭, পৃ. ১৩৬]

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِىْ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ : যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করত না, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করত, তাদেরকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টজগতের সম্মুখে ভর্ৎসনা করে জিজ্ঞাসা করা হবে, দুনিয়ার জীবনে যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে, যাদের পূজা-অর্চনা করতে, তারা এখন কোথায়?

মুশরিকরা তখন জবাবে বলবে, আমরা পূর্বেই আরজ করেছি, আমাদের মধ্যে কেউ আর এখন শিরকের কথা স্বীকার করে না, শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় না। অর্থাৎ মুশরিকরা যখন দোজখের আজাব স্বচক্ষে দেখবে, তখন শিরকের কথা অস্বীকার করবে। কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের 'শহীদ' শব্দটিকে 'শাহেদ' অর্থে গ্রহণ করে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের মাঝে শিরকে বিশ্বাস করে এমন লোক দেখতে পাই না, সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, শিরকের দাবিদার বা শিরকে বিশ্বাসী এখন আর কেউ নেই। কেননা সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে, প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হয়েছে, পরকালীন জীবনের হিসাব-নিকাশের কথা যারা দুনিয়াতে অস্বীকার করত তারা আজ হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হয়েছে, বাস্তবের কষাঘাত তাদেরকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করেছে, তাই সেদিন তারা বলবে, আমাদের মধ্যে শিরকে বিশ্বাসী কেউ নেই। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ১০, পৃ. ৩০০, তাফসীরে কাবীর খ. ২৭, পৃ. ১৩৬-৩৭]

قَوْلُهُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ : "তারা যাদের ডাকাত তারা উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছে যে তাদের নাজাত নেই।" কাফের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের ইবাদতের স্থলে যাদের উপাসনা করত, যাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্দিনে তারা কাজে লাগবে, সে উপাস্যরা সেদিন উধাও হয়ে যাবে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে, আজ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নেই। কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে কথাটিকে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে- وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا 'সেদিন পাপিষ্ঠরা দোজখকে দেখবে এবং একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর দোজখ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই।' -[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা। ২৫, পৃ. ২]

قَوْلُهُ لَا يَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ الخ : "উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণের প্রার্থনা মানুষ কখনো ক্লান্তি বোধ করে না, আর যদি কোনো দুঃখ তাকে স্পর্শ করে তবে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে।"

মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি : এ আয়াতে মানুষের বিচিত্র প্রকৃতির একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যখন একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে তখন তার লোভ বেড়ে যায়, সে অর্থসম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এজন্যে প্রার্থনা করতে থাকে, এ পর্যায়ে কোনো সংকোচ বা ক্লান্তি বোধ করে না, সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হলেও তার "আরো চাই" ভাব কমে না, কোনো অবস্থাতেই সে পরিতৃপ্তি লাভ করে না, কিন্তু যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, কোনো দুঃখকষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হয়ে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانُ শব্দটি সম্পর্কে তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, কাফের, অকৃতজ্ঞ মানুষ, লোভ-লালসায় যার মন পরিপূর্ণ। আর ঐ স্থলে خَيْر শব্দটির অর্থ হলো ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য এবং জাগতিক উন্নতি।

অতএব, আয়াতের মর্মকথা হলো যারা কাফের অকৃতজ্ঞ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ পাওয়ার পরও তারা তুষ্ট হয় না। অথচ তাদেরকে কোনো প্রকার দুঃখ স্পর্শ করলেই তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিরাশ, ভগ্ন-চিত্ত, দারুণ ক্ষোভ তাদেরকে পেয়ে বসে।

পক্ষান্তরে, মুমিনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি আস্থাশীল, আল্লাহ পাকের রহমতের আশায় আশান্বিত মুমিন আল্লাহ পাকের প্রতি সে পূর্ণ ভরসা রাখে, মুমিন যদি নিয়ামত লাভ করে তবে সে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকরগুজার হয়, করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনে ভরে উঠে, আর যদি কোনো দুঃখকষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে আশা করে যে, আল্লাহ পাক এজন্যে ছওয়াব দান করবেন, তাই সে সবর অবলম্বন করে। কিন্তু যারা তাওহীদে বিশ্বাসী নয়, যারা আখিরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, তারা কখনো মনের শান্তি লাভ করে না, মনের শান্তি লাভ হয় মনের মালিক আল্লাহ পাকের স্মরণে, তাঁর আদেশ পালনে। এর কোনো বিকল্প নেই।

قَوْلُهُ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ : অর্থাৎ কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো নিয়ামত, ধনসম্পদ ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আরো দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরো বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে

থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে عَرِيْضٍ অর্থাৎ প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ বলেছেন। অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতিমিনতি, কান্নাকাটি ও বারবার বলা উত্তম। -[বুখারী ও মুসলিম] সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এ স্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তাদের এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

قَوْلُهُ سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ : অর্থাৎ আমি আমার কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শনাবলি তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। اٰفَاقٌ শব্দটি اُفُقٌ -এর বহুবচন, অর্থ- দিগন্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরো নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার একেকটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তাভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যার কোনো সমকক্ষ হতে পারে না। (فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ۚ

১. হা-মীম।

٢. عٓسٓقٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

২. আইন, সীন, কাফ এটার মর্মার্থ আল্লাহই ভালো জানেন।

٣. كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاِيْحَاءِ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَ اُوْحِىَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اَللّٰهُ فَاعِلُ الْاِيْحَاءِ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ .

৩. এমনিভাবে অর্থাৎ এই ওহি অবতীর্ণ করার ন্যায় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেন, আল্লাহ হলেন اِيْحَاءٌ -এর فَاعِلٌ যে আল্লাহ পরাক্রমশীল তাঁর রাজত্বে ও প্রজ্ঞাময় তাঁর সৃষ্টিতে।

٤. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَهُوَ الْعَلِىُّ عَلٰى خَلْقِهٖ الْعَظِيْمُ الْكَبِيْرُ .

৪. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসাবে। এবং তিনি সমুন্নত তার মাখলুকের উপর ও মহান বড়।

٥. تَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ بِالنُّوْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ فَوْقِهِنَّ اَىْ تَنْشَقُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ فَوْقَ الَّتِىْ تَلِيْهَا مِنْ عَظَمَتِهٖ تَعَالٰى وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اَىْ مُلَابِسِيْنَ لِلْحَمْدِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ لِاَوْلِيَآئِهٖ الرَّحِيْمُ بِهِمْ .

৫. আসমান উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, تَكَادُ শব্দটি ت বা ى দ্বারা উভয়রূপে পড়া যায়। يَتَفَطَّرْنَ শব্দটি ن -এর সাথে এবং অন্য কেরাত মতে ت দ্বারা এবং ط -এর মধ্যে তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। تَتَفَطَّرْنَ অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আসমানের উপরের স্তর ফেটে নিচে পড়ে যাবে। আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে অর্থাৎ তাসবীহ ও তাহমীদ উভয়টি একসাথে বর্ণনা করে سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলতে থাকে। এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, তাঁর বন্ধুদের প্রতি পরম করুণাময়। তাঁদের সাথে।

৬. وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَىِ الْاَصْنَامَ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ مُحْصٍ عَلَيْهِمْ لِيُجَازِيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ تُحَصِّلُ الْمَطْلُوْبَ مِنْهُمْ مَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ.

৬. যারা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহকে অভিভাবক বানিয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। এবং আপনি তাদের জিম্মাদার নন। যে, তাদের কাছ থেকে লক্ষ্য অর্জন করবেন, বরং আপনার দায়িত্ব হলো দাওয়াত পৌঁছানো।

৭. وَكَذٰلِكَ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاِيْحَاءِ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ تُخَوِّفَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ وَسَائِرَ النَّاسِ وَتُنْذِرَ النَّاسَ يَوْمَ الْجَمْعِ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُجْمَعُ فِيْهِ الْخَلْقُ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ ط فَرِيْقٌ مِنْهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ النَّارِ.

৭. আর এমনিভাবে এই প্রত্যাদেশের ন্যায় আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি সতর্ক করেন ভয় দেখান মক্কা ও তার আশপাশের লোকদের অর্থাৎ মক্কাবাসী ও সকল লোকদের এবং লোকদেরকে সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিনের ব্যাপারে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে যেদিন সমস্ত সৃষ্টজীবকে একত্র করা হবে। যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৮. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَىْ عَلٰى دِيْنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْاِسْلَامُ وَلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهِ ط وَالظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ يَدْفَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ.

৮. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে এক উম্মতে এক ধর্মের তথা ইসলামের অনুসারী পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন আর জালেমদের কাফেরদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। যে তাদের থেকে শাস্তি দূরীভূত করবে।

৯. اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَىِ الْاَصْنَامَ اَوْلِيَاءَ ج اَمْ مُنْقَطِعَةٌ بِمَعْنٰى بَلِ الَّتِىْ لِلْاِنْتِقَالِ وَالْهَمْزَةِ لِلْاِنْكَارِ اَىْ لَيْسَ الْمُتَّخَذُوْنَ اَوْلِيَاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ اَىِ النَّاصِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْفَاءُ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

৯. তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে মূর্তিসমূহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে اَمْ অব্যয়টি بَلْ -এর অর্থ প্রদান করে, যা পরিবর্তিত হওয়ার অর্থে এবং হামযা অস্বীকার করার অর্থে আসে। অর্থাৎ তারা যাকে অভিভাবক স্থির করেছে তা বাস্তব অভিভাবক নয়; বরং আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক অর্থাৎ যিনি ঈমানদারকে সাহায্যকারী এবং فَاللّٰهُ -এর ف আতফের জন্যে। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حٰمٓ ـ عٓسٓقٓ : কতিপয় মুফাসসির বলেন, এটা সূরা শূরা -এরই অপর নাম, এ কারণেই এটাকে পৃথক পৃথক দুটি আয়াতরূপে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, উভয়টি মিলে একটি নাম, কিন্তু অন্যান্য حٰمٓ সংবলিত সূরার সাথে مُمَاثَلَتْ ও مُوَافَقَتْ -এর জন্য পৃথক পৃথক লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلَ ذٰلِكَ الْإِيْحَاءِ : অর্থাৎ مِثْلَ مَا فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ مِنَ الْمَعَانِيْ ; এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَذٰلِكَ -এর كاف টি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে نَصَبٌ -এর স্থানে হয়েছে। অর্থাৎ- يُوْحِيْ اِيْحَاءً مِثْلَ ذٰلِكَ الْإِيْحَاءِ অর্থাৎ এ সূরার ওহি করার মতো আপনার প্রতি فِي الْوَقْتِ ওহি প্রেরণ করেন এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের নিকটও এভাবেই ওহি পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন. পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ওহি প্রেরণের কথা ব্যক্ত করার জন্য أَوْحٰى ফে'লে মাযী -এর সীগাহ ব্যবহার করা উচিত ছিল, مُضَارِعٌ -এর সীগাহ يُوْحِيْ নয়।

উত্তর. مُضَارِعٌ -এর সীগাহ অতীতের অবস্থা বর্ণনার ভিত্তিতে اِسْتِمْرَارُ وَحْيٍ -কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর مُضَارِعٌ টা مَاضِيْ -এর অর্থে হয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) أَوْحٰى উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ : এখানে فَرِيْقٌ হলো মুবতাদা আর فِي الْجَنَّةِ হলো তার খবর।

প্রশ্ন. فَرِيْقٌ তো نَكِرَةٌ এটা কি করে مُبْتَدَأٌ হওয়া বৈধ হলো?

উত্তর. মুফাসসির (র.) مِنْهُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَرِيْقٌ মাওসূফের সিফাতটি উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- فَرِيْقٌ كَائِنٌ مِنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ; কাজেই এখন তার মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আর فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ -এর মধ্যেও এই তারকীবই হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা শূরা প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, চারটি আয়াত, মতান্তরে, সাতটি আয়াত ব্যতীত সকল আয়াতই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এতে ৫ রুকূ', ৫৩ আয়াত, ৮৮৬ বাক্য এবং ৩, ৫৮৮ অক্ষর রয়েছে।

-[তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪০৫]

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে সূরা শূরা এবং এতদ্ব্যতীত সূরা হা-মীম আইন-সীন ক্বাফও বলা হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় সত্য-বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের প্রমাণ, পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার পর প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, "কাফেরদের নির্যাতনে ব্যথিত হবেন না।"

قَوْلُهُ حٰمٓ ـ عٓسٓقٓ : হামীম, আইন-সীন-ক্বাফ হলো হরফে মুকাত্তাআত। [এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিস্তরিত আলোচনা হয়েছে।] ইবনে জারীর এ সূরার প্রথম অক্ষরগুলো সম্পর্কে একটি ঘটনা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঘটনাটি হচ্ছে-

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়, তখন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট হামীম, আইন-সীন-ক্বাফ, এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে মাথা নিচু করে রাখলেন, এরপর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বারও একই প্রশ্ন করল, তিনি পুনরায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। সে তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করল, কিন্তু তিনি এর কোনো জবাব দিলেন না। তখন হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমি তোমাকে বলছি, আর আমি জানি তিনি জবাব দেওয়া কেন পছন্দ করছেন না, তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে, যাকে আব্দুল এলাহ বা আব্দুল্লাহ বলা হয়। সে প্রাচ্যের কোনো নদীর তীরে অবতরণ

করবে এবং সেখানে দুটি শহর আবাদ করবে, নদী দুটিকে ঐ শহর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। যখন আল্লাহ পাক তার পতনের ইচ্ছা করবেন এবং তারও সময় শেষ হয়ে আসবে, তখন ঐ দুটি শহরের একটির উপর আগুন জ্বলে উঠবে, আর ঐ শহরটিকে তম্মীভূত করে দেবে। সেখানকার লোকেরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে, তাদের কাছে মনে হবে এখানে কিছুই ছিল না, অতি প্রত্যুষে সেখানে সকল সত্যদ্রোহী, অহংকারী লোকেরা একত্র হবে এবং তখনই আল্লাহ পাক তাদের সহ ঐ শহরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর এটিই হবে হা-মীম, আইন-সীন-ক্বাফের অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। 'আইন' অক্ষর দ্বারা আদল বা সুবিচারকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সীন অক্ষরটির তাৎপর্য হলে অদূর ভবিষ্যতে হবে, আর ক্বাফের তাৎপর্য হলো একটি ঘটনা ঘটবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবিষ্ট লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এ অক্ষরগুলোর অর্থ শ্রবণ করেছ? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি শুনেছি। 'হা-মীম' আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। 'আইন' -এর তাৎপর্য হলো বদরের যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী কাফেররা আজাবের স্বাদ ভোগ করেছে। আর 'সীন' -এর তাৎপর্য হলো, জালেমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে। আর 'ক্বাফ' -এর তাৎপর্য তিনি বলতে পারেননি। তখন হযরত আবূ জর (রা.) দণ্ডায়মান হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনিও সেভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, আর ক্বাফ -এর তাৎপর্য হলো, গজব আসন্ন যা তাদেরকে সর্বস্বান্ত করবে। -[তাফসীরে তাবারী খ. ২৫, পৃ. ৫; তাফসীরে দুররুল মনসূর খ. ৬, পৃ. ২৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু], পারা ২৫, পৃ. ৫]

মূলত হা-মীম আইন সীন ক্বাফ এবং এমনি অন্যান্য মুকাত্তাআত অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন, একথা বলাই উত্তম। -[তাফসীরে কবীর খ. ২৭, পৃ. ১৪১]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ হে রাসূল! যেভাবে আপনার প্রতি এ জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ সূরা নাজিল করেছি এবং ইতঃপূর্বেও আপনার প্রতি অন্যান্য সূরা নাজিল করেছি, এভাবেই অতীতের নবী-রাসূলগণের নিকটও ওহি প্রেরিত হয়ে এসেছে। মানবজাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করা এবং তাঁদের নিকট ওহী নাজিল করা আল্লাহ পাকের চির শাশ্বত নিয়ম।

قَوْلُهُ يَتَفَطَّرْنَ : এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোনো বস্তুর উপর ভারী বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, এটা অবাস্তবও নয়। কেননা এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম দেহও বহুসংখ্যক একত্র হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى : اُمُّ الْقُرٰى -এর অর্থ সকল জনপদ এবং শহরের মূল ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বুঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَيَّ وَلَوْلَا اَنِّيْ اُخْرِجْتُ مِنْكَ لَمَا خَرَجْتُ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে আল্লাহর সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হতো, তবে আমি কখনো স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

قَوْلُهُ وَمَنْ حَوْلَهَا : অর্থাৎ মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশেপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম তথা সমগ্র বিশ্বও হতে পারে। তাফসীরে নূরুল কুরআনের ভাষায়- মক্কার চতুর্দিক বলতে সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একমত। মক্কা মোয়াজ্জমা হলো পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে অবস্থিত। মক্কা মোয়াজ্জমা সারা পৃথিবীতে সর্বোত্তম স্থান। আর এ শহরের ফজিলতের জন্যে একথাই যথেষ্ট যে, কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে এক লক্ষ নামাজের ছওয়াব হয়।

প্রিয়নবী ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য : প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন আমাকে অন্যান্য সমস্ত নবীগণের উপর বিশেষভাবে পাঁচটি ফজিলত দান করা হয়েছে। যথা–

১. সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। [অন্যান্য নবীগণ বিশেষ কোনো এলাকার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাই আলোচ্য আয়াতে وَمَنْ حَوْلَهَا দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে]।

২. আমার উম্মতের জন্যে আমার শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে [অর্থাৎ প্রিয়নবী ﷺ -কে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে]।

৩. এক মাসের পথ সম্মুখের দিকে এবং এক মাসের পথ পেছনের দিকে দুশমনের অন্তরে আমার ভয় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এভাবে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্যে মসজিদে এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেওয়া হয়েছে [অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ইবাদতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এর যে কোনো অংশ দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে]।

৫. আমার জন্যে মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্যেই হালাল করা হয়নি। وَمَنْ حَوْلَهَا শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের পরিধি ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের হেদায়েতের জন্যেই তিনি প্রেরিত।

দ্বিতীয়ত অন্যান্য নবীগণ যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকাবাসীর হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদের যুগের জন্যেই তারা নবী ছিলেন, অর্থাৎ যতদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন, ততদিনই তাঁদের নবুয়ত ছিল। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ শুধু যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তাই নয়; বরং সর্বকালের জন্যে তিনি নবী এবং রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন। যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই নবী, তিনিই রাসূল কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

١٠. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ مَعَ الْكُفَّارِ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الدِّيْنِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ مَرْدُوْدٌ إِلَى اللّٰهِ ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ قُلْ لَهُمْ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ أَرْجِعُ .

١١. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مُبْدِعُهُمَا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا حَيْثُ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ج ذُكُوْرًا وَإِنَاثًا يَذْرَؤُكُمْ بِالْمُعْجَمَةِ يَخْلُقُكُمْ فِيْهِ ط فِي الْجَعْلِ الْمَذْكُوْرِ أَيْ يُكَثِّرُكُمْ بِسَبَبِهِ بِالتَّوَالُدِ وَالضَّمِيْرُ لِلْأَنَاسِيِّ وَالْأَنْعَامِ بِالتَّغْلِيْبِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج اَلْكَافُ زَائِدَةٌ لِأَنَّهُ تَعَالٰى لَا مِثْلَ لَهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا يُقَالُ الْبَصِيْرُ بِمَا يُفْعَلُ .

١٢. لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج أَيْ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهِمَا مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ ابْتِلَاءً إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

١٣. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوْحًا هُوَ أَوَّلُ أَنْبِيَاءِ الشَّرِيْعَةِ وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

অনুবাদ :

১০. যে বিষয়ে অর্থাৎ ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে কাফেরদের সাথে তোমরা যা মতভেদ করেছ, তার ফয়সালা আল্লাহর নিকটই সমর্পিত। কিয়ামতের দিন তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আপনি তাদেরকে বলুন, ইনি আল্লাহ! আমার পালনকর্তা, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই। প্রত্যাবর্তন করি।

১১. তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা কোনো নমুনা ছাড়াই সর্বপ্রথম আবিষ্কারক তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে যুগল সৃষ্টি করেছেন। তিনি হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে থেকে জোড়া নর-মাদি সৃষ্টি করেছেন। يَذْرَؤُكُمْ শব্দটি ذ দ্বারা, অর্থ يَخْلُقُكُمْ অর্থাৎ উল্লিখিত পদ্ধতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। كُمْ সর্বনাম মানুষ ও প্রাণী উভয়ের দিকে ফিরানো হয়েছে। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় كَمِثْلِهِ -এর ك অতিরিক্ত। কেননা আল্লাহর কোনো সদৃশ নেই। তিনি সর্ব শ্রবণকারী, যা বলা হয় পর্যবেক্ষণকারী যা করা হয়।

১২. আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে অর্থাৎ আসমান ও জমিন উভয়ের সঞ্চিত ধনের যেমন- বৃষ্টি ও ফসল ইত্যাদির চাবি তাঁর নিকট। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন পরীক্ষামূলক এবং যার জন্যে ইচ্ছা পরিমিত করেন পরীক্ষার জন্যে। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

১৩. তিনি তোমাদের জন্যে দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন হযরত নূহ (আ.)-কে। হযরত নূহ (আ.) আহকামে শরিয়তের ব্যাপারে প্রথম নবী। এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)-কে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।

هٰذَا هُوَ الْمَشْرُوْعُ الْمُوْصٰى بِهٖ وَالْمُوْحٰى إِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ كَبُرَ عَظُمَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط مِنَ التَّوْحِيْدِ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ اِلَى التَّوْحِيْدِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ يُقْبِلُ عَلٰى طَاعَتِهٖ.

এবং তাদের প্রতি এই নির্দেশিত পথ ও মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি প্রেরিত ওহি হলো, তাওহীদ তথা একত্ববাদ। আপনি মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত জানান, তা তাদের নিকট দুঃসাধ্য বড় মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওহীদের জন্যে মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাঁর আনুগত্যের অভিমুখী হয় তাকে হেদায়েত দান করেন।

١٤. وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اَىْ اَهْلُ الْاَدْيَانِ فِى الدِّيْنِ بِاَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ اِلَّا مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغْيًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۢ بَيْنَهُمْ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاْخِيْرِ الْجَزَاۤءِ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط بِتَعْذِيْبِ الْكَافِرِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ ۢ بَعْدِهِمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مُرِيْبٍ مُوْقِعٍ فِى الرِّيْبَةِ.

১৪. আহলে দীন ধর্মের ব্যাপারে তখনই মতভেদ করেছে, অর্থাৎ কেউ ঈমান এনেছে এবং কেউ কুফরি করেছে যখন তাদের নিকট তাওহীদের জ্ঞান এসেছে, তাদের কাফেরদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের কারণে যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত শাস্তি বিলম্ব করার অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে কাফেরদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়ার ফয়সালা হয়ে যেত। আর যাদেরকে তাদের পরে কিতাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাগণ তারাও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে।

١٥. فَلِذٰلِكَ التَّوْحِيْدِ فَادْعُ ج يَا مُحَمَّدُ النَّاسَ وَاسْتَقِمْ عَلَيْهِ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ج فِىْ تَرْكِهٖ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ اَىْ بِاَنْ اَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط فِى الْحُكْمِ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط

১৫. সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি মানুষকে এই তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন এবং এর উপর অবিচল থাকুন যেমন আপনার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটা পরিত্যাগ করে আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা।

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط فَكُلٌّ يُجَازِىْ بِعَمَلِهٖ لَا حُجَّةَ خُصُوْمَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط هٰذَا قَبْلَ اَنْ يُّؤْمَرَ بِالْجِهَادِ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج فِى الْمَعَادِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ .

আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। অতএব প্রত্যেককে তাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। এই বিধান জিহাদের হুকুম আসার পূর্বের। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে ফয়সালার জন্যে আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

١٦. وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ نَبِيِّهٖ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ بِالْاِيْمَانِ لِظُهُوْرِ مُعْجِزَتِهٖ وَهُمُ الْيَهُوْدُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ بَاطِلَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ .

১৬. যারা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাঁর নবীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, নবীর মু'জিযাসমূহ প্রকাশ হওয়ার কারণে তা মেনে নেওয়ার পর এবং তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায় তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার নিকট বাতিল। আর তাদের উপর আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

١٧. اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلَ وَالْمِيْزَانَ ط الْعَدْلَ وَمَا يُدْرِيْكَ يُعْلِمُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ اَىْ اِتْيَانُهَا قَرِيْبٌ وَلَعَلَّ مُعَلِّقٌ لِلْفِعْلِ عَنِ الْعَمَلِ وَمَا بَعْدَهٗ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ .

১৭. আল্লাহ তা'আলা সত্যসহ কিতাব কুরআন নাজিল করেছেন بِالْحَقِّ টি اَنْزَلَ -এর সাথে সম্পর্কিত। এবং তিনি মীযান ইনসাফ ও ন্যায়ের মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। আপনি কি জানেন? সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন নিকটবর্তী। لَعَلَّ অব্যয়টি পূর্বের فِعْل অর্থাৎ يُدْرِى -এর আমলকে রহিতকারী অথবা لَعَلَّ -এর পরবর্তী বাক্য يُدْرِى -এর দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

١٨. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ج يَقُوْلُوْنَ مَتٰى تَاْتِىْ ظَنًّا مِنْهُمْ اَنَّهَا غَيْرُ اٰتِيَةٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ خَائِفُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ط اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ يُجَادِلُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ .

১৮. যারা তার প্রতি ঈমান আনে না তারা তাকে দ্রুত কামনা করে। তারা বলে, কিয়ামত কখন আসবে? এবং তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এবং যারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, এটা সত্য। জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

١٩. اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ حَيْثُ لَمْ يُهْلِكْهُمْ جُوْعًا بِمَعَاصِيْهِمْ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ ج مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا يَشَاۤءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ عَلٰى مُرَادِهٖ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهٖ.

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু চাই বান্দা নেককার হোক বা বদকার, তাই তিনি বান্দার পাপের কারণে তাদেরকে অনাহারে ধ্বংস করেন না। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল তাঁর উদ্দেশ্যে ও পরাক্রমশালী তাঁর হুকুমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ : উক্ত আয়াতে ذٰلِكُمْ অর্থাৎ ذٰلِكُمُ الْحَاكِمُ الْعَظِيْمُ الشَّاْنُ মুবতাদা ও এর পরবর্তী বাক্যসমূহ তার খবর। অর্থাৎ اَللّٰهُ প্রথম খবর, رَبِّىْ দ্বিতীয় খবর, তেমনিভাবে شَرَعَ لَكُمْ একাদশতম খবর। ذٰلِكُمْ -এর খবর এগারোটি যথাক্রমে, ১. اَللّٰهُ ২. رَبِّىْ ৩. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ৪. اِلَيْهِ اُنِيْبُ ৫. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ ৬. جَعَلَ لَكُمْ ৭. لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ৮. هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ৯. لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ ১০. يَبْسُطُ الرِّزْقَ ১১. شَرَعَ لَكُمْ ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ يَذْرَؤُكُمْ : এটা বাবে فَتَحَ হতে مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন, বৃদ্ধি করছেন।

قَوْلُهٗ فِيْهِ : উল্লিখিত جَعَلَ হলো ضَمِيْر مَجْرُوْر -এর مَرْجِعْ অর্থাৎ فِىْ ذٰلِكَ الْخَلْقِ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ অর্থাৎ সৃষ্টির এই পদ্ধতি [تَوَالُدْ وَتَنَاسُلْ] -এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে প্রথম থেকে সৃষ্টি করে চলে আসছেন। অথবা فِيْهِ -এর যমীরের مَرْجِعْ মায়ের গর্ভাশয় বা رِحْم অথবা فِىْ টা بَاءْ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের জোড়া বানানোর কারণের মাধ্যমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কেননা এই زَوْجِيَّتْ বা জোড়াই বংশ-বৃদ্ধির কারণ। -[ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهٗ يَذْرَؤُكُمْ : كُمْ যমীরের مَرْجِعْ মানুষই। জানোয়ারদেরকে كُمْ দ্বারা تَغْلِيْبًا অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অন্যথায় يَذْرَؤُهَا হওয়া উচিত ছিল।

قَوْلُهٗ الْكَافُ زَائِدَةٌ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. আয়াতের প্রকাশ্য ভাব দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর সদৃশ রয়েছে। কেননা আয়াতের অনুবাদ হলো তার সদৃশ্যের কোনো সদৃশ নেই। অর্থাৎ مِثْل তো রয়েছে, তাঁর مِثْل -এর কোনো مِثْل নেই। অথচ তাঁর কোনো مِثْل -ই নেই। কেননা তিনি তো নিরাকার।

উত্তর. كَمِثْلِهٖ -এর মধ্যে অতিরিক্ত كَافْ টি শুধুমাত্র তাকিদের জন্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- لَيْسَ مِثْلَهٗ شَىْءٌ

قَوْلُهٗ مَقَالِيْدُ : এটা مِقْلَادٌ বা مِقْلِيْدٌ বা اِقْلِيْدٌ -এর বহুবচন, অর্থ- চাবি।

قَوْلُهٗ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا : এখানে شَرَعَ -টি سَنَّ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ جَعَلَ لَكُمْ طَرِيْقًا وَاضِحًا

قَوْلُهٗ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ : এটা সেই اِجْمَالْ -এর বিস্তারিত বিবরণ যার উল্লেখ كَذٰلِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ -এর মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে এবং لَكُمْ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنَ التَّوْحِيْدِ : **প্রশ্ন.** মুফাসসির (র.) مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ -এর তাফসীর مِنَ التَّوْحِيْدِ দ্বারা করেছেন, অথচ এতে সকল اُصُوْل এবং فُرُوْع অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর. যেহেতু তাওহীদ হলো عِمَادُ الدِّيْنِ তথা দীনের স্তম্ভ এবং اُصُوْلُ الْاُصُوْلِ যা সকল اُصُوْل এবং فُرُوْع -কে অন্তর্ভুক্ত করে, এ কারণেই তার উপর اِكْتِفَاءْ করেছেন।

قَوْلُهٗ يَجْتَبِىْ : এটা اِجْتِبَاءْ হতে নির্গত, এর অর্থ নির্বাচন করা ও বেছে নেওয়া। এ কারণেই তাওফীক দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهٗ بَغْيًا : এটা تَفَرَّقُوْا ফে'লে মুছবাতের مَفْعُوْلٌ لَهٗ যা اِسْتِثْنَاءْ দ্বারা বুঝা যায়।

قَوْلُهُ لَفِيْ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيْبٍ : অর্থাৎ অস্থিরকারী সংশয়, পেরেশানিতে জড়িতকারী সন্দেহ।
قَوْلُهُ رِيْبَةٌ : অর্থাৎ দুর্ভাবনা, বিরক্তি, পেরেশানি।
قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ : এটা হলো প্রথম মুবতাদা, আর حُجَّتُهُمْ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর دَاحِضَةٌ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। দ্বিতীয় মুবতাদা তার খবরকে নিয়ে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।
قَوْلُهُ اَيْ اِتْيَانُهَا : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।
প্রশ্ন. قَرِيْبٌ -কে কেন مُذَكَّرٌ নেওয়া হয়েছে। অথচ সেটা سَاعَةٌ স্ত্রীলিঙ্গের সিফাত হয়েছে। কাজেই قَرِيْبَةٌ হওয়া উচিত ছিল।
উত্তর. বাক্যটিতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مَجِيْئُ السَّاعَةِ কাজেই قَرِيْبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَجِيْئُ।
قَوْلُهُ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ : এখানে وَاو টি হলো عَاطِفَةٌ আর مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হলো মুবতাদা مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে আর يُدْرِيْكَ বাক্য হয়ে তার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গাম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ পয়গাম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.) ও সর্বশেষ আমাদের রাসূল ﷺ এবং মাঝখানে পয়গাম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লিখিত রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত স্বীকার করত। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর ভক্ত ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরে এ দুজন পয়গাম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহযাবেও পয়গাম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচজন পয়গাম্বরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী ﷺ -এর নাম প্রথমে এবং হযরত নূহ (আ.)-এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া ﷺ যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন; কিন্তু নবুয়ত বণ্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল পয়গাম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে। –[ইবনে মাজাহ, দারেমী]

قَوْلُهُ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ : এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যে দীন বা ধর্মমতে পয়গাম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরজ এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম : এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ এবং তাতের বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গাম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস যেমন তাওহীদ, রিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত যেমন– নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধান মেনে চলা। এছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মতো অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশীধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গাম্বরগণের শরিয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কুরআনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا অতএব পয়গাম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলিতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরো কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন– وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর। –[তাফসীরে মাযহারী]

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গাম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বুঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণও দূরে সরে

পড়ে, সে ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরো বলেন, يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগলটি পালের পেছনে অথবা এদিকে-ওদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা, পৃথক না থাকা। -[তাফসীরে মাযহারী]

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গাম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تَفَرُّقٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোনো বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজাতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এ মতভেদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল থেকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত।

قَوْلُهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ : অর্থাৎ তাওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন মনে হয়। এর কারণ খেয়াল-খুশি ও শয়তানি শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে- اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ অর্থাৎ সরলপথ প্রাপ্তির দু'টই উপায়। এক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল পথের জন্য মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন- পয়গাম্বর ও ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে- اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্য খাঁটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গাম্বর সম্পর্কে কুরআনে مُخْلَصٌ [অর্থাৎ মনোনীত] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সত্যধর্মের হেদায়েত দান করেন। يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ বাক্যের অর্থ তা-ই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব মুশরিকদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত কঠিন মনে হওয়ার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

قَوْلُهُ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কুরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গাম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে সরল পথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক, উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রাসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) বলেন, দশটি বাক্য সংবলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নজির। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। যথা-

প্রথম বিধান- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ অর্থাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তাওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন।

দ্বিতীয় বিধান- وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোনো দিকেই যেন কোনোরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ অর্থাৎ সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় বিধান وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরোয়া করবেন না।

চতুর্থ বিধান قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাজিল করেছেন সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী।

পঞ্চম বিধান- أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের কোনো মকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عَدْلٌ -এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধিবিধান যেন তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি এরূপ নয় যে, কোনো বিধান মানব আর কোনোটি অমান্য করব। অথবা কোনোটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনোটির প্রতি করব না।

ষষ্ঠ বিধান- اللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সকলের পালনকর্তা।

সপ্তম বিধান- لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোনো লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে, আমার তাতে কোনো লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলিলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

অষ্টম বিধান- لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্কবিতর্কের কোনো অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বিতর্ক নেই।

নবম বিধান- اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন।

দশম বিধান- وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

قَوْلُهُ اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ : অভিধানে لَطِيفٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর অনুবাদ করেছেন, 'দয়ালু' এবং মুকাতিল (র.) করেছেন, 'অনুগ্রহকারী'।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই ইমাম কুরতুবী (র.) لَطِيفٌ শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ তা'আলার রিজিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহর রিজিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিজিক দেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার রিজিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিজিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিজিক বণ্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধনসম্পদের রিজিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিজিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিজিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পার স্বরূপ হলো, তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিজিক একযোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাজত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাজতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না। -[তাফসীরে মাযহারী]

একটি পরীক্ষিত আমল : মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী (র.) বলেন, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ আয়াতটি নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিজিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরো বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

অনুবাদ :

২০. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ حَرْثَ الْأٰخِرَةِ اَىْ كَسْبَهَا وَهُوَ الثَّوَابُ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ج بِالتَّضْعِيْفِ فِيْهِ الْحَسَنَةُ اِلَى الْعَشَرَةِ وَاَكْثَرَ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا لا بِلَا تَضْعِيْفٍ مَا قُسِّمَ لَهٗ وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

২০. যে ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা পরকালের ফসল তথা আখেরাতের কল্যাণ ও ছওয়াবের কামনা করে আমি তার জন্যে সেই ফসল দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেই। অর্থাৎ ছওয়াবের দশগুণ ও এর চাইতে অধিক পর্যন্ত বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে, আমি তাকে এর কিছু অংশ অতিরিক্ত ব্যতীত তার জন্যে নির্ধারণ করা অংশই দান করি। সে সমস্ত লোকদের জন্যে পরকালে তার কোনো অংশই বাকি থাকবে না।

২১. اَمْ بَلْ لَهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ شُرَكٰٓؤُا هُمْ شَيَاطِيْنُهُمْ شَرَعُوْا اَىْ الشُّرَكَاءُ لَهُمْ لِلْكُفَّارِ مِنَ الدِّيْنِ الْفَاسِدِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ كَالشِّرْكِ وَاِنْكَارِ الْبَعْثِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ اَىْ الْقَضَاءِ السَّابِقِ بِاَنَّ الْجَزَاءَ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّعْذِيْبِ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ.

২১. তাদের মক্কার কাফেরদের কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু শরিক দেবতা তাদের শয়তানসমূহ আছে, যারা অর্থাৎ শরিকসমূহ এদের কাফেরদের জন্যে এমন ফাসেদ বিধান-ধর্ম প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যেমন শিরকের বিধান, পুনরুত্থানের অস্বীকার ইত্যাদি। যদি কিয়ামতের দিনের সিদ্ধান্তকর একটি ঘোষণা না থাকত, অর্থাৎ পূর্বের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, প্রতিদান কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। কাফেরদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দানের মাধ্যমে মুমিন ও তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় জালেমদের কাফেরদের জন্যে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

২২. تَرَى الظّٰلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُشْفِقِيْنَ خَائِفِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا فِى الدُّنْيَا مِنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يُّجَازُوْا عَلَيْهَا وَهُوَ اَىْ الْجَزَاءُ عَلَيْهَا وَاقِعٌ بِهِمْ ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا مُحَالَةَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ج اَنْزَهُهَا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَنْ دُوْنَهُمْ لَهُمْ مَا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ.

২২. আপনি কিয়ামতের দিন জালেমদেরকে দেখতে পাবেন ভীতসন্ত্রস্ত দুনিয়াতে তাদের পাপকর্মসমূহের জন্যে। যার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। নিশ্চয় তাদের কর্মের শাস্তি কিয়ামতের দিন তাদের উপর পতিত হবেই। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের উদ্যানে অবস্থান করবে। জান্নাতের উদ্যানসমূহ অন্যের তুলনায় অধিক মনোরম তাদের জন্যে রয়েছে তাই যা তারা চাইবে তাদের পালনকর্তার নিকট। এটাই হচ্ছে আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ।

٢٣. ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ مِنَ الْبِشَارَةِ مُخَفَّفًا وَّمُثَقَّلًا بِهٖ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط قُلْ لَّآ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ط اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ لٰكِنْ اَسْاَلُكُمْ اَنْ تَوَدُّوْا قَرَابَتِىَ الَّتِىْ هِىَ قَرَابَتُكُمْ اَيْضًا فَاِنَّ لَهٗ فِىْ كُلِّ بَطْنٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَرَابَةً وَمَنْ يَّقْتَرِفْ يَكْتَسِبْ حَسَنَةً طَاعَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط بِتَضْعِيْفِهَا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلذُّنُوْبِ شَكُوْرٌ لِلْقَلِيْلِ فَيُضَاعِفُهٗ.

২৩. এটাই হচ্ছে সেই নিয়ামত, আল্লাহ তা'আলা তার সেসব বান্দাদেরকে যার সুসংবাদ দেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। يُبَشِّرُ শব্দকে ش অক্ষরে তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপে পঠিত রয়েছে বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর অর্থাৎ দাওয়াতে রিসালতের তথা দীন প্রচারের উপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। اِلَّا الْمَوَدَّةَ টি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ কেবল আমি তোমাদের নিকট চাই যে, তোমরা আমার আত্মীয়তার হক আদায় কর যা তোমাদেরই আত্মীয়তার সৌহার্দ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুরাইশ বংশের প্রত্যেক গোত্রেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। যে কেউ হাসানা পুণ্য কাজ করে আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেই। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পাপসমূহ গুণগ্রাহী সামান্য নেক আমলের প্রতিও; অতএব তিনি তাতে বাড়িয়ে দেন।

٢٤. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ج بِنِسْبَةِ الْقُرْاٰنِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ يَرْبِطْ عَلٰى قَلْبِكَ ط بِالصَّبْرِ عَلٰى اَذَاهُمْ بِهٰذَا الْقَوْلِ وَغَيْرِهٖ وَقَدْ فَعَلَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ الَّذِىْ قَالُوْهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ يُثَبِّتُهٗ بِكَلِمٰتِهٖ ط الْمُنَزَّلَةِ عَلٰى نَبِيِّهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ.

২৪. বরং তারা বলে যে, اَمْ অব্যয়টি بَلْ-এর অর্থে তিনি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছেন, আল্লাহর দিকে কুরআনের নিসবত করে আল্লাহ তা'আলা চাইলে আপনার অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারতেন তাদের এ জাতীয় মিথ্যা অভিযোগের উপর সবর ও ধৈর্য ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বস্তুত আল্লাহ তাই করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যাদাবিকে মিটিয়ে দেন এবং তার নবীর উপর নাজিলকৃত নিজ বাক্য দ্বারা ও ওহীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।

٢٥. وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ مِنْهُمْ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ الْمُتَابِ عَنْهَا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ.

২৫. তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তওবাকৃত পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তিনি তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কেও জানেন। يَفْعَلُوْنَ -কে ى ও ت উভয়ের সাথে পড়া যাবে।

٢٦. وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يُجِيْبُهُمْ اِلٰى مَا يَسْأَلُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ .

২৬. তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন যারা তার উপর ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা যা চায় তা কবুল করেন তিনি তাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

٢٧. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ جَمِيْعُهُمْ لَبَغَوْا جَمِيْعُهُمْ اَىْ طَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِالتَّخْفِيْفِ وَضِدِّهٖ مِنَ الْاَرْزَاقِ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاۤءُ ط فَيَبْسُطُهَا لِبَعْضِ عِبَادِهٖ دُوْنَ بَعْضٍ وَيَنْشَأُ عَنِ الْبَسْطِ الْبَغْيُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ .

২৭. যদি আল্লাহ তার সব বান্দাদের রিজিকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাজিল করেন। يُنَزِّلُ ফে'লকে زَا অক্ষরে তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পড়া যাবে। অতএব তিনি তার অনেক বান্দাদেরকে অধিক রিজিক দান করেন এবং অনেককে অধিক রিজিক দেন না। আর রিজিকের প্রাচুর্যতা অহংকার সৃষ্টি করে। তিনি নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন।

٢٨. وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْمَطَرَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا يَئِسُوْا مِنْ نُزُوْلِهٖ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ط يَبْسُطُ مَطَرَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْمُحْسِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْحَمِيْدُ الْمَحْمُوْدُ عِنْدَهُمْ .

২৮. তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মানুষ বৃষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন অর্থাৎ বৃষ্টি ছড়িয়ে দেন। এবং তিনিই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক অনুগ্রহকারী প্রশংসিত বান্দাদের নিকট।

٢٩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ خَلْقَ مَا بَثَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ فِيْهِمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ ط هِىَ مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ لِلْحَشْرِ اِذَا يَشَاۤءُ قَدِيْرٌ فِى الضَّمِيْرِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ عَلٰى غَيْرِهٖ .

২৯. তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব ছড়িয়ে দিয়েছেন এদের সৃষ্টি। دَابَّةٍ বলা হয় পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণীকে যেমন, মানুষ ইত্যাদি। তিনি যখন ইচ্ছা, এদের সবাইকে একত্র করতে সক্ষম। جَمْعِهِمْ -এর সর্বনাম هُمْ দ্বারা জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন সকল ধরনের প্রাণী উদ্দেশ্য; কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়ে هُمْ আনা হয়েছে। যদি জ্ঞানহীনদের প্রাধান্য দিত তখন جَمْعِهَا আনা হতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَة দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আমলকারীদের আমলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আখিরাতের জন্য আমল করবে, তবে তার আমলে اَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আর যার আমল শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য হবে, তাকেও দুনিয়া হতে কিছু অংশ যা তার ভাগ্যে রয়েছে তাকে দেওয়া হবে। তবে এ জাতীয় লোকেরা পরকালে কোনো কিছুই পাবে না।

قَوْلُهُ مَنْ : এটা اِسْم شَرْط যা মুবতাদা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে আর نَزِدْ لَهٗ হলো جَوَاب شَرْط

قَوْلُهُ هُوَ الثَّوَابُ : পরকালের জন্য আমলকে حَرْث তথা শস্যক্ষেত্রের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। আর حَرْث হলো مُشَبَّهٌ এরপর مُشَبَّه -কে উহ্য করে দিয়েছে, আর مُشَبَّه بِه -কে অবশিষ্ট রেখেছে। এটা اِسْتِعَارَه تَصْرِيْحِيَّة হয়েছে। حَرْث-এর মূল অর্থ হলো اِلْقَاءُ الْبَذْرِ فِى الْاَرْضِ রূপকভাবে উৎপন্ন শস্যকে حَرْث বলে দিয়েছেন। اِسْتِعَارَة -এর ভিত্তিতে ছওয়াব তথা আমলের প্রতিদানের উপরও প্রয়োগ করা হয়।

قَوْلُهُ الْحَسَنَةَ : এটা تَضْعِيْف -এর مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ : মুফাসসির (র.) اَمْ -কে بَلْ -এর অর্থে নিয়েছেন যা شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ الخ হতে اِنْتِقَالٌ -এর জন্য হয়েছে। অন্যান্য মুফাসসিরগণ بَلْ এবং هَمْزَه -এর সাথে উহ্য মেনেছেন, যা تَوْبِيْخ -এর জন্য হয়েছে। আর ইমাম কুরতুবী (র.) اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ -কে اَلَهُمْ شُرَكَاءُ অর্থে নিয়েছেন। اَمْ-এর মধ্যে مِيْم টি হলো صِلَه আর هَمْزَه টা تَقْرِيْع -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ شَرَعُوْا : شَيَاطِيْن -এর দিকে شَرَعُوْا -এর اِسْنَاد টা مَجَازِيْ হয়েছে। شَيَاطِيْن যেহেতু কাফেরদের গোমরাহির কারণ, কাজেই এটা مُسَبَّب -এর اِسْنَاد সবেবর দিকে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يُجَازُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- يَخَافُوْنَ مِنْ جَزَاءِ مَا كَسَبُوْا

قَوْلُهُ يُبَشِّرُ اللّٰهُ : এটা اَلْبَشَارَةُ হতে, شِيْن বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপে পঠিত। তাশদীদবিহীন হওয়ার সুরতে اِبْشَار বাবে اِفْعَال হতে, আর তাশদীদযুক্ত হলে বাবে تَفْعِيْل থেকে।

قَوْلُهُ الْمَوَدَّةَ : এটা مَصْدَر مَنْصُوْب বাবে سَمِعَ অর্থ- বন্ধুত্ব, মহব্বত, বন্ধুত্ব করা।

قَوْلُهُ الْقُرْبٰى : এটা زُلْفٰى এবং بُشْرٰى -এর ওজনে اِسْم مَصْدَرٌ অর্থ আত্মীয়তা, নৈকট্যতা। বাবে نَصَرَ হতে মাসদার- قَرَابَةٌ

قَوْلُهُ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى : এতে দুটি মত রয়েছে- ১. اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হবে। কেননা اَجْرًا হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর জিনস থেকে হয়নি। অর্থাৎ لَا اَسْئَلُكُمْ اَجْرًا قَطُّ ২. مُسْتَثْنٰى مُتَّصِل হবে অর্থাৎ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا هٰذَا وَهُوَ اَنْ تَوَدُّوْا اَهْلَ قَرَابَتِى الَّذِيْنَ هُمْ قَرَابَتُكُمْ

قَوْلُهُ فِى الْقُرْبٰى : এটা جَارّ এবং مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَال হয়েছে। অর্থাৎ اٰبِتَةً فِى الْقُرْبٰى

قَوْلُهُ يَقْتَرِفْ : এর মূল হলো اَلْقَرْفُ অর্থাৎ اَلْكَسْبُ বলা হয়- فُلَانٌ يَقْرِفُ لِعِيَالِهٖ كَسْبًا [এর বাব হলো ضَرَبَ] এই আয়াতের مِصْدَاقٌ নির্ধারণে কঠিন মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে উত্তম হলো যা মুজাহিদ এবং কাতাদা (র.) উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হলো এই যে, اِنَّكُمْ قَوْمِىْ وَاَحَقُّ مَنْ اَجَابَنِىْ وَاَطَاعَنِىْ فَاِذَا قَدْ اَبَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاحْفَظُوْا حَقَّ الْقُرْبٰى وَصِلُوْا رَحِمِىْ وَلَا تُؤْذُوْنِىْ অর্থাৎ তোমরা আমার সম্প্রদায়! যারা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে এবং আমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে তাদের থেকে তোমরা অধিক হকদার। এখন যখন তোমরা তা অস্বীকার করে দিয়েছ অন্তত পক্ষে আমার আত্মীয়তার খেয়াল রাখ এবং আমার সাথে আত্মীয়তাসুলভ আচরণ কর এবং আমাকে কষ্ট দিয়ো না। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ يُجِيْبُهُمْ : মুফাসসির (র.) يَسْتَجِيْبُ -এর তাফসীর يُجِيْبُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, سِيْن টা تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। যেমন- اِسْتَعْظَم যা تَعَظَّمَ অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قل لَّا اَسَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى : এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয়-বাৎসল্যের প্রয়োজন তো তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোনো পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোনো শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নজির দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন–

وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

অর্থাৎ কোনো এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোনো দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্য এটা কোনো দোষ নয়; বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি বলেন– مجهه ميں ايك عيب بڑا هے كه وفادار هوں ميں এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গাম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোনো বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের সেরা পয়গাম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, আমি এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পত্র লিখলে তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ وَسَطَ النَّاسِ فِىْ قُرَيْشٍ لَيْسَ بَطْنٌ مِنْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا وَقَدْ وَلَدُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ اِنِّىْ لَا اَسْئَلُكُمْ اَجْرًا عَلٰى مَا اَدْعُوْكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى تَوَدُّوْنِىْ لِقَرَابَتِىْ مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوْنِىْ بِهَا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাজত কর। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ আরো বর্ণনা করেন– يَا قَوْمِ اِذَا اَبَيْتُمْ اَنْ تُتَابِعُوْنِىْ فَاحْفَظُوْا قَرَابَتِىْ مِنْكُمْ وَلَا تَكُوْنُ غَيْرُكُمْ مِنَ الْعَرَبِ اَوْلٰى بِحِفْظِىْ وَنُصْرَتِىْ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাজত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাজিল হলে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তানসন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই আল্লামা সুয়ূতী ও হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তানসন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গাম্বরগণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তাফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত : উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোনো গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোনো হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশি হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যার যত নিকটবর্তী সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরি হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোনো সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও ছওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলেমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন–

يَا رَاكِبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مِنًى * وَاهْتِفْ بِسَاكِنِ خَيْفِهَا وَالنَّاهِضِ

سَحَرًا إِذَا فَاضَ الْحَجِيْجُ إِلٰى مِنًى * فَيْضًا كَمُلْتَطَمِ الْفُرَاتِ الْفَائِضِ

إِنْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ * فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّيْ رَافِضِيٌّ

অর্থাৎ হে আশ্বারোহী, তুমি মুহাস্‌সাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যুষে যখন হাজীদের স্রোত ফোরাত নদীর উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর– যদি কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক আমিও রাফেযী।

قَوْلُهُ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, রিসালত ও কুরআনকে ভ্রান্ত আখ্যাদানকারী এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জবাব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গাম্বরের মু'জিযা ও জাদুকরের জাদু –এ দুই এর মধ্যে কোনোটিই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গাম্বরগণের নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিযা দান করেন। এতে পয়গাম্বরের কোনো এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জাদুকরদের জাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু জাদু ও মু'জিযার মধ্যে এবং জাদুকর ও পয়গাম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবি করে, তার হাতে কোনো জাদুও সফল হতে দেন না, নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্তই তার জাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাজিল করেন।

কুরআন পাকও এক মুজেযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম ﷺ -এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মু'জিযা উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী কোনো মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহি ও রিসালত সম্পর্কিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ : তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো গুনাহ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে- ১. বর্তমানে যে গুনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। ২. অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। ৩. ভবিষ্যতে সে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো ফরজ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাজা করতে হবে। গুনাহ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোনো ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোনো হক হলে যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারো গিবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যই আল্লাহর ওয়াস্তে গুনাহ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গুনাহ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গুনাহ থেকে তওবা করাই শরিয়তের কাম্য। কিন্তু কোনো বিশেষ গুনাহ থেকে তওবা করলেও আহলে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গুনাহ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গুনাহ বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا الخ : পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুযূল : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করেছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ইবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ সন্দেহের জবাব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থি হয়ে থাকে। কাজেই কোনো সময় কোনো মানুষের দোয়া বাহ্যত কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিজিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। -[তাফসীরে কাবীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যারা কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) বলেন, আমরা যখন বনূ-কুরায়যা, বনূ-নুযায়ের ও বনূ কায়নুকার অগাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হুরায়স (রা.) বলেন, সুফফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী]

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ : আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিজিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারো মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বণ্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্যক জানেন কার জন্য কোন নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারো কাছ থেকে কোনো নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরি নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হবো। কারণ এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তাভাবনা করে। আর আল্লাহ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থি নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোনো ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা-আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধনসম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য : এখানে খট্‌কা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জবাব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধনসম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ফলে কোনোরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

দুনিয়াতে ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো না কেন? এখন এ আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভালো ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হতো না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে মন্দের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا : [মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।] ভূপৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহর সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে 'নিরাশ হওয়ার পর' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতিমিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহর কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদবির থেকে নিরাশ হওয়া বুঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

قَوْلُهُ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ : অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دابة বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্টবস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনো মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূপৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহর তাওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারো কোনো কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

অনুবাদ :

৩০. وَمَآ اَصَابَكُمْ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ بَلِيَّةٍ وَشِدَّةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ اَىْ كَسَبْتُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَعَبَّرَ بِالْاَيْدِىْ لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ مِّنْهَا فَلَا يُجَازِىْ عَلَيْهِ وَهُوَ تَعَالٰى اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يُّثْنِىَ الْجَزَاءَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا غَيْرُ الْمُذْنِبِيْنَ فَمَا يُصِيْبُهُمْ فِى الدُّنْيَا لِرَفْعِ دَرَجَاتِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আপতিত হয়, এখানে ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে তা তোমাদের কর্মেরই ফল। অর্থাৎ তোমাদের হাতের উপার্জন পাপের কারণে। উক্ত আয়াতে পাপসমূহকে হাতের উপার্জন বলা হয়েছে, কেননা অধিকাংশ পাপসমূহ হাত দ্বারা সংঘটিত হয়। এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ এর উপর শাস্তি দেওয়া হয় না। আল্লাহ তা'আলা বড়ই মেহেরবান, তিনি পরকালে কোনো অপকর্মের শাস্তি পুনরায় দেওয়া থেকে পবিত্র। আর নিরাপরাধ ঈমানদার দুনিয়াতে যেসব বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়, তা পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে হয়।

৩১. وَمَآ اَنْتُمْ يَا مُشْرِكِيْنَ بِمُعْجِزِيْنَ اللّٰهَ هَرَبًا فِى الْاَرْضِ ج فَتَفُوْتُوْنَهُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ يَدْفَعُ عَذَابَهُ عَنْكُمْ ـ

৩১. হে মুশরিকগণ! তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহকে অক্ষম করতে পার না যাতে তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারী নেই। যিনি তোমাদের থেকে তা দূর করে দিবেন।

৩২. وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ السُّفُنِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ كَالْجِبَالِ فِى الْعِظَمِ ـ

৩২. আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে বাতাসের বেগে বেয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজসমূহ পাহাড়ের ন্যায় বৃহৎ জাহাজ।

৩৩. اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ يَصِرْنَ رَوَاكِدَ ثَوَابِتَ لَا تَجْرِىْ عَلٰى ظَهْرِهِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ هُوَ الْمُؤْمِنُ يَصْبِرُ فِى الشِّدَّةِ وَيَشْكُرُ فِى الرَّخَاءِ ـ

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, ফলে এসব জলযানসমূহ সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। ফলে এসব সমুদ্রে চলবে না নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্যে যারা কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩৪. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ عَطْفٌ عَلٰى يُسْكِنْ اَىْ يُغْرِقْهُنَّ بِعَصْفِ الرِّيْحِ بِاَهْلِهِنَّ بِمَا كَسَبُوْا اَىْ اَهْلُهُنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ لا مِنْهَا فَلَا يُغْرِقُ اَهْلَهُ ـ

৩৪. অথবা তিনি চাইলে তাদের কৃতকর্মের পাপসমূহের কারণে সেগুলোকে ধ্বংসও করে দিতে পারেন। يُوْبِقْ-এর আতফ يُسْكِنْ -এর উপর অর্থাৎ তিনি সে জাহাজগুলোকে তাদের যাত্রীসহ বাতাসের তীব্রগতি দ্বারা ডুবিয়ে দিতে পারেন। এবং তিনি অনেক পাপীদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। ফলে তিনি জাহাজবাসীকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন না।

৩৫. وَيَعْلَمَ بِالرَّفْعِ مُسْتَانِفٌ وَبِالنَّصْبِ مَعْطُوفٌ عَلَى تَعْلِيلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ يُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا ط مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ مَهْرَبٍ مِنَ الْعَذَابِ وَجُمْلَةُ النَّفْىِ سُدَّتْ مَسَدَّ مَفْعُوْلَىْ يَعْلَمُ اَوِ النَّفْىُ مُعَلِّقٌ عَنِ الْعَمَلِ.

৩৫. যারা আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের শাস্তি থেকে পলায়নের কোনো জায়গা নেই। مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ না-বোধক বাক্যটি يَعْلَمَ ফে'লের দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত অথবা نَفِىْ টি يَعْلَمَ-কে আমল থেকে রহিত করে দিয়েছে। يَعْلَمَ পেশবিশিষ্ট অবস্থায় স্বতন্ত্র বাক্য ও নসববিশিষ্ট অবস্থায় উহ্য ফে'লের উপর আতফ অর্থাৎ يُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ

৩৬. فَمَا اُوْتِيْتُمْ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ مِنْ اَثَاثِ الدُّنْيَا فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا ثُمَّ يَزُوْلُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

৩৬. হে ঈমানদার ও অমুসলিমগণ বস্তুত তোমাদের দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা এ দুনিয়ার কতিপয় অস্থায়ী ভোগের সামগ্রী মাত্র। এটার দ্বারা তোমরা দুনিয়াতে কিছুদিন ভোগ করবে অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে পুণ্য থেকে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।

৩৭. وَيُعْطَفُ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ مُوْجِبَاتِ الْحُدُوْدِ مِنْ عَطْفِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ج يَتَجَاوَزُوْنَ.

৩৭. اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ বাক্যটি পূর্বের اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর উপর আতফ যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল গুনাহ যেসব পাপ দণ্ড ওয়াজিব করে থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়। اَلْفَوَاحِشَ-এর আতফ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ-এর উপর عَطْفُ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ

৩৮. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ اَجَابُوْهُ اِلٰى مَا دَعَاهُمْ اِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَةِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص اَدَامُوْهَا وَاَمْرُهُمُ الَّذِىْ يَبْدُوْ لَهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ يُشَاوِرُوْنَ فِيْهِ وَلَا يَعْجَلُوْنَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَمَنْ ذُكِرَ صِنْفٌ.

৩৮. এবং যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে অর্থাৎ তাদের প্রতি দাওয়াতকৃত তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ কবুল করে এবং নামাজ কায়েম করে, সর্বদা নামাজ আদায় করে। পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে, অর্থাৎ যখন তাদের সম্মুখে কোনো কাজ উপস্থিত হয়, তখন তারা পরামর্শ করে ও দ্রুত করে না। এবং তারা খরচ করে আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর আনুগত্যে। এখানে উল্লিখিত গুণাবলি মুমিনদের একটি দলের।

٣٩. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ الظُّلْمُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ صِنْفٌ اَىْ يَنْتَقِمُوْنَ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ بِمِثْلِ ظُلْمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى :

৩৯. এবং যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে যখন তারা আক্রান্ত হয় জুলুমের শিকার হয়। মুমিনদের আরেক দল হলো, তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের উপর কৃত অত্যাচারের সমপরিমাণ যারা তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তাদের থেকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আগত আয়াতে বলেন– جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

٤٠. وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج سُمِّيَتِ الثَّانِيَةُ سَيِّئَةً لِمُشَابَهَتِهَا لِلْاُوْلٰى فِى الصُّوْرَةِ وَهٰذَا ظَاهِرٌ فِيْمَا يُقْتَصُّ فِيْهِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاِذَا قَالَ لَهٗ اَخْزَاكَ اللّٰهُ فَيُجِيْبُهٗ اَخْزَاكَ اللّٰهُ فَمَنْ عَافَ عَنْ ظَالِمِهِ وَاَصْلَحَ الْوُدَّ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اَىْ اَنَّ اللّٰهَ يَاجِرُهٗ لَا مُحَالَةَ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ اَىِ الْبَادِئِيْنَ بِالظُّلْمِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمْ عِقَابُهٗ .

৪০. আর মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দই। এখানে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রতিশোধকে سَيِّئَةً তথা মন্দ বলা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্যে এটাও প্রথমটির ন্যায়। এটা ঐ জাতীয় প্রতিশোধের মধ্যে স্পষ্ট, যেখানে কিসাস নেওয়া হয়। আর অনেকে বলেছেন দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কেউ তোমাকে বলে, اَخْزَاكَ اللّٰهُ তথা আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন, তখন তুমিও তার জবাবে বলবে, اَخْزَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকেও অপদস্থ করুন। কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় তার প্রতি জুলুমকারীকে এবং আপস করে অর্থাৎ তার প্রতি জুলুমকারীদের সাথে ভালোবাসা ও মহব্বতের সাথে আপস করে ক্ষমা করে দেয় তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রথম জুলুমকারীদের পছন্দ করেন না এবং তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হবে।

٤١. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اَىْ ظُلْمِ الظَّالِمِ اِيَّاهُ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ مُؤَاخَذَةٍ .

৪১. নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর অর্থাৎ জালিম তার উপর জুলুম করার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের উপর কোনো অভিযোগ ধরপাকড় নেই।

٤٢. اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط بِالْمَعَاصِىْ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

৪২. অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٤٣. وَلَمَنْ صَبَرَ فَلَمْ يَنْتَصِرْ وَغَفَرَ تَجَاوَزَ اِنَّ ذٰلِكَ الصَّبْرَ وَالتَّجَاوُزَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ اَىْ مَعْزُوْمَاتِهَا بِمَعْنَى الْمَطْلُوْبَاتِ شَرْعًا .

৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা ক্ষমা ও ধৈর্য হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ সাহসিকতার কাজ অর্থাৎ শরিয়তসম্মত উত্তম কাজ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ : এ ইবারতের উদ্দেশ্য হলো مَآ اَصَابَكُمْ -এর সম্বোধন থেকে কাফেরদেরকে বের করা কেননা পৃথিবীতে কাফেরদের উপর যে বিপদাপদ পতিত হয় তা تَعْجِيْلُ بَعْضِ عَذَابٍ -এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ শাস্তি পরকালে হবে। আর পৃথিবীতে মুমিনগণের উপর যেই বিপদাপদ নিপতিত হয় এটা হয়তো গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে, অথবা মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ : এর মধ্যে مِنْ مُّصِيْبَةٍ টা مَا -এর بَيَانٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ : যদি مَآ اَصَابَكُمْ -এর মধ্যে مَا -কে شَرْطِيَّة মানা হয় তবে مَآ اَصَابَكُمْ টা جَوَاب شَرْط হবে। আর যদি مَا -কে مَوْصُوْلَه বলা হয় তবে তা مُبْتَدَأ مُتَضَمِّنْ بِمَعْنَى شَرْطٍ হবে, আর فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ এটা মুবতাদার খবর হবে। আর যেহেতু مُبْتَدَأ مُتَضَمِّنْ شَرْطٍ হয়েছে এজন্য তার খবরের উপর فَاء প্রবিষ্ট হয়েছে এক কেরাতে بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ এটা فَاء ব্যতীত রয়েছে। ঐ সুরতে মুবতাদা খবরের তারকীবই উত্তম। এ সুরতে شَرْط وَجَزَاء বলে فَاء -কে উহ্য মানা جَائِز-

قَوْلُهُ اَىْ كَسَبْتُمْ مِّنَ الذُّنُوْبِ : فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ -এর তাফসীর كَسَبْتُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِعْل -এর সম্পাদনকারী ذَات হয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু فِعْل -এর সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিক অংশ এবং দখল হাতের হয়ে থাকে এজন্য فِعْل -এর নিসবত রূপকভাবে হাতের দিকেই করা হয়ে থাকে।

ذُنُوْب দু প্রকার– ১. সেই গুনাহ যার শাস্তি পৃথিবীতেই আপদ-বিপদের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়। ২. সেই গুনাহ যাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এরপর এ ব্যাপারে পৃথিবীতে কিংবা পরকালে কোনোরূপ ধরপাকড় করা হয় না যে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় তার সংখ্যা, যাকে ধরপাকড় করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ তাই যে গুনাহের শাস্তি পৃথিবীতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার শাস্তি পুনরায় আর দেবেন না এবং যেগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তারও শাস্তি পুনরায় প্রদান করা হবে না। হযরত আলী (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াত খুবই আশাব্যঞ্জক।

قَوْلُهُ هُوَ تَعَالٰى اَكْرَمُ : এর সম্পর্ক بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ -এর সাথে হয়েছে, কাজেই উচিত ছিল যে, এটাকে وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ -এর উপর مُقَدَّمْ করে فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ -এর সাথে মিলিয়ে নেওয়া।

قَوْلُهُ مُشْرِكِيْنَ : বর্তমান নুসখাতে يَا مُشْرِكِيْنَ রয়েছে। অথচ صَحِيْح হলো يَا مُشْرِكُوْنَ যেমনটি حَاشِيَةُ الْجَمَلِ-এর নুসখায় রয়েছে। কেননা মুনাদাটা رَفَع -এর উপর مَبْنِى হয়ে থাকে। কাজেই مَرْفُوْعٌ بِالْوَاوِ -এর সুরতে يَا مُشْرِكُوْنَ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ مُعْجِزِيْنَ : অর্থাৎ فَارِّيْنَ مِنْ عَذَابِهٖ

قَوْلُهُ الْجَوَار : رَسْمُ الْخَطِّ-এর হিসেবে يَاء -কে উহ্য করে। কেননা এটা অতিরিক্ত। جَوَارٍ শব্দটি جَارِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রবাহিত নৌকা, চলমান নৌকা।

একটি সংশয় ও তার জবাব : বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, اَلْجَوَارِ এটা اَلسُّفُنِ -এর উহ্য مَوْصُوْف -এর সিফত হয়েছে। যেমনটি আল্লামা মহল্লী (র.) اَلسُّفُنِ উহ্য মেনে উহ্য মাওসূফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উহ্য ইবারত হলো– اَلسُّفُنِ الْجَوَارِ কিন্তু এখানে اَلسُّفُنِ মাওসূফকে উহ্য করা জায়েজ নয়। কেননা مَوْصُوْف -কে সে সময় পর্যন্ত উহ্য করা জায়েজ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত صِفَتْ মওসূফের সাথে خَاصْ না হয়। এ কারণেই مَرَرْتُ بِمَاشٍ বৈধ নয়। কেননা مَاشٍ টা হলো صِفَتْ عَامْ কোনো مَوْصُوْف -এর সাথে خَاصْ নয়। তবে مَرَرْتُ بِمُهَنْدِسٍ এবং مَرَرْتُ بِكَاتِبٍ বলা যেতে পারে। অথচ مُهَنْدِسٌ এবং كَاتِبٌ -ও সিফাত; কিন্তু তাদের مَوْصُوْف উহ্য রয়েছে। কেননা এটা صِفَات خَاصَّه -এর অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত হলো اَلْجَرْىُ এটা اَلسُّفُنُ -এর সাথে خَاصْ নয়। কাজেই اَلسُّفُنُ -কে উহ্য করা জায়েজ না হওয়া উচিত।

এ সংশয়ের জবাব এই যে, مَوْصُوْف উহ্য করা সে সময় হয় যখন صِفَتْ -এর উপর إِسْمِيَتْ প্রাধান্য না পায়। আর যখন إِسْمِيَتْ গালিব হয়ে যায়, তখন مَوْصُوْف -কে উহ্যকরণ বৈধ হয়ে যায়। যেমন- أَبْرَقُ এটা সিফত। অনেক বেশি উজ্জ্বল বস্তুকে أَبْرَقُ বলা হয়। কিন্তু এখন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর নাম হয়ে গেছে, যা উজ্জ্বল পদার্থ। কাজেই এখন তার مَوْصُوْف -কে উহ্য করা জায়েজ হবে। এমনিভাবে أَبْطَحُ -এর অর্থ হলো প্রশস্ত এবং (سنگریزہ والا ہونا) প্রস্তরময় হওয়া।
কিন্তু এখন তাতে إِسْمِيَتْ প্রাধান্য পাওয়ায় নির্দিষ্ট একটি উপত্যকার অর্থে হয়ে গেছে। কাজেই এর مَوْصُوْف -কে উহ্য করা জায়েজ রয়েছে। এমনিভাবে مُنَقّٰى -এর অর্থ হলো পরিষ্কারকৃত। এটা صِفَتْ কিন্তু এর উপর إِسْمِيَتْ প্রাধান্য লাভ করেছে। এর مَوْصُوْف হলো مُوَيْز পূর্ণ নাম مُوَيْز مُنَقّٰى যা সাধারণত ঔষধে ব্যবহার হয়। কিন্তু এখন তার مَوْصُوْف -কে উহ্য করে উহ্য مُنَقّٰى বলে। অথচ এর مَوْصُوْف -কে অধিকাংশ মানুষ জানেই না। অনুরূপভাবে اَلْجَوَار শব্দটি যা جَارِيَةٌ -এর বহুবচন, সিফাত হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রবাহিত, চলন্ত। কিন্তু এখন তার উপর إِسْمِيَتْ প্রাধান্য লাভ করেছে। যার কারণে নৌকাকে جَارِيَة বলতে লাগল। কাজেই এর مَوْصُوْف -কে উহ্য করা যায়। যেমনটি মুফাসসির (র.) اَلسُّفُنُ উহ্য মেনে مَوْصُوْف -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَظْلَلْنَ يَصِرْنَ : এটা ظَلَّ হতে مُضَارِعْ -এর جَمع مُؤَنَّث غَائِبْ -এর সীগাহ فِعْل نَاقِصْ অর্থ- তারা হয়ে যাবে। يَظْلَلْنَ -এর তাফসীর يَصِرْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ظَلَّ টা মুতলাকান صَارَ -এর অর্থে হয়েছে। অন্যথায় ظَلَّ -এর মূল অর্থ হলো- দিনে কোনো কাজ হওয়ার সংবাদ দেওয়া। যেমন- بَاتَ -এর অর্থ হলো রাতে কোনো কাজ হওয়ার সংবাদ দেওয়া।

قَوْلُهُ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : এর তাফসীর وَهُوَ الْمُؤْمِنُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, যিনি উল্লিখিত দুটি সিফাতের বাহক তিনি পরিপূর্ণ মুমিন, মনে হয় যেন ঈমানের দুটি অংশ রয়েছে। একটি হলো صَبْر ; আর অপরটি شُكْر ; সবরের অর্থ হচ্ছে গুনাহের উপর সবর করা। আর شُكْر -এর অর্থ হলো ওয়াজিবসমূহকে আদায় করা।

قَوْلُهُ بِاَهْلِهِنَّ : بَاء টা مَعَ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ যদি তিনি চান তবে নৌকাগুলোকে তার আরোহীসহ ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

قَوْلُهُ اَىْ اَهْلِهِنَّ : এটা كَسَبُوْا -এর وَاوْ -এর তাফসীর যার দ্বারা নৌকার আরোহীগণ উদ্দেশ্য, যা سِيَاقْ দ্বারা বুঝা যায়। يُوْبِقْهُنَّ এটা إِيْبَاقٌ থেকে [বাবে إِفْعَالٌ] مُضَارِعْ -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। আর هُنَّ হলো মাফঊলের যমীর; অর্থ- তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে শেষ করে দিবেন।

قَوْلُهُ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْهَا : এটা عَفْوٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ যা مَجْزُوْم হয়েছে। জমহুর يَعْفُ -কে جَوَاب شَرْط -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَجْزُوْم পড়েছেন।

قَوْلُهُ مِنْهَا : অর্থাৎ اَلسُّفُنُ বা اَلذُّنُوْبُ অর্থাৎ কতিপয় নৌকাকে ডুবিয়ে দেন না, বা কতিপয় নৌকা আরোহীদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ : يَعْلَمَ -এর মধ্যে رَفْع এবং نَصْب উভয় কেরাতই রয়েছে। جُمْلَه مُسْتَانِفَه হওয়ার কারণে رَفْع হবে। অর্থাৎ هُوَ يَعْلَمُ আর نَصْب হবে ডুবে যাওয়ার ইল্লতের উপর আতফ হওয়ার কারণে, অর্থাৎ يُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ অর্থাৎ তিনি যদি চান তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতেন যেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যাতে তারা জানে বা প্রকাশ করে যারা আমার আয়াতের ব্যাপারে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়।

قَوْلُهُ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ : এখানে مَا لَهُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مِنْ مَحِيْصٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ আর مِنْ টা অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ : تَعْلِيْق এটা اَفْعَال قُلُوْب -এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। تَعْلِيْق শাব্দিকভাবে আমল বাতিল করাকে বলে। تَعْلِيْق عَمَل -এর জন্য শর্ত হলো فِعْل قَلْب টা إِسْتِفْهَامْ বা نَفِىْ বা لَام اِبْتِدَاء -এর পূর্বে পতিত হওয়া। যেমন এখানে فِعْل قَلْب হলো يَعْلَم আর يَعْلَمَ টা দুই মাফঊলকে চায়।

قَوْلُهُ فَمَا أُوتِيتُمْ : এখানে مَا হলো شَرْطِيَّة আর أُوتِيتُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল صَدَارَت كَلَام -এর কারণে مُقَدَّمٌ হয়েছে। أُوتِيتُمْ -এর مُخَاطَبٌ -এর যমীর প্রথম মাফউল যা নায়েবে ফায়েল হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ شَيْءٍ : এটা مَا -এর বয়ান হয়েছে। কেননা এতে إِبْهَامٌ বা অস্পষ্টতা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : এখানে জবাবে শর্তের উপর فَا এসেছে। আর مَتَاعٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ فَهُوَ مَتَاعٌ

قَوْلُهُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ : এখানে مَا عِنْدَ اللّٰهِ টা মাওসূল সেলাহ মিলে মুবতাদ হয়েছে। আর خَيْرًا হলো তার খবর। আর لِلَّذِيْنَ الخ এটা أَبْقٰى -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ الخ : এর আতফ হয়েছে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর উপর। বাক্যটি لَامْ হরফে জারের অধীনে হওয়ার কারণে محلا مجرور হয়েছে।

قَوْلُهُ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ : এখানে كَبَائِرَ দ্বারা সর্বপ্রকার বড় গুনাহ উদ্দেশ্য, আর فَوَاحِشَ দ্বারা বিশেষ ধরনের বড় গুনাহ উদ্দেশ্য, যার উপর حُدُوْد এবং قِصَاص প্রয়োগ করা হয়।

قَوْلُهُ مِنْ عَطْفِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ : এটা দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে।

সংশয় : প্রত্যেক বড় গুনাহকেই তো كَبَائِرَ বলে, যার মধ্যে فَوَاحِشَ-ও অন্তর্ভুক্ত, এরপরও এটাকে পুনরায় উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল?

নিরসন : এটা عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ -এর অন্তর্গত। এটা مَعْطُوْف -এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়। এটাকে عَطْفُ بَعْضٍ عَلَى الْكُلِّ -ও বলা হয়। যেমন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -এর মধ্যে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ : এখানে مَا -টি অতিরিক্ত ফারসিতে বলা হয় چون بخشم مى آيند ايشان مى آمرزند অর্থাৎ যখন তিনি রাগান্বিত হন তখন তিনি ক্ষমা করে দেন। إِذَا টা يَغْفِرُوْنَ -এর ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। مَا হলো অতিরিক্ত এবং يَغْفِرُوْنَ হলো هُمْ -এর খবর। বাক্য হয়ে يَجْتَنِبُوْنَ -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে। যা اَلَّذِيْنَ -এর صِلَه হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ এ সুরতে جُمْلَه اِسْمِيَّه -এর আতফ جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর উপর আবশ্যক হবে।

অন্য একটি তারকীব এভাবেও হতে পারে যে, هُمْ টা غَضِبُوْا -এর মধ্যস্থ যমীরের تَاكِيْد হয়েছে। এ সুরতে يَغْفِرُوْنَ জবাবে শর্ত হবে। আবুল বাকা (র.) বলেন, هُمْ মুবতাদা আর يَغْفِرُوْنَ তার খবর। এরপর বাক্য হয়ে জবাবে শর্ত হয়েছে। কিন্তু এটা صَحِيْح নয়। কেননা যদি إِذَا -এর জবাব হয় তবে فَا হওয়া জরুরি। যেমন তুমি বলবে- إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو يَنْطَلِقُ কিন্তু عَمْرٌو يَنْطَلِقُ বলা জায়েজ নয়। [جَمَلْ -]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا : এর আতফ পূর্বের الذين মাওসূলের উপর হয়েছে। মুফাসসির (র.) اِسْتَجَابُوْا -এর তাফসীর أَجَابُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتَجَابُوْا -এর মধ্যে سِيْن এবং تَا অতিরিক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়ামতসমূহ সে সকল লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর হুকুমের উপর লাব্বাইক বলে থাকেন।

قَوْلُهُ أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ : এখানে أَمْرُهُمْ মুযাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা شُوْرٰى হলো তার খবর بَيْنَهُمْ হলো তার ظَرْف

قَوْلُهُ شُوْرٰى : এটা شَاوَرَتْهُ [বাবে مُفَاعَلَه]-এর মাসদার بُشْرٰى এবং ذِكْرٰى -এর ওযনে অর্থ পরামর্শ করা।

(فَتْحُ الْقَدِيْرِ : شَوْكَانِي، لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ وَيَبْغُوْنَ يَعْمَلُوْنَ : মুফাসসির (র.) يَبْغُوْنَ -এর তাফসীর يَعْمَلُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِغَيْرِ الْحَقِّ টা تَاسِيْس -এর জন্য হয়েছে, তাকিদের জন্য নয়। কেননা بَغْيٌ টা نَاحَقّ -ই হয়ে থাকে তার পরে بِغَيْرِ الْحَقِّ বলাটা পূর্বের বাক্যের তাকিদ হবে। আর যদি يَبْغُوْنَ -কে يَعْلَمُوْنَ -এর অর্থে নেওয়া হয় তবে بِغَيْرِ الْحَقِّ টা تَاسِيْس -এর জন্য হবে। আর تَاسِيْس টা تَاكِيْد হতে উত্তম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ : এটা عَزِيْمَةٌ হতে নির্গত যা রুখসতের বিপরীত। অর্থাৎ সবর ও ক্ষমা করা মোস্তাহাব। তবে সমতার ভিত্তিতে প্রতিশোধ নেওয়াও জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ : হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে, অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গুনাহের শাস্তি দেন না; বরং যেসব গুনাহের শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গুনাহের কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোনো গুনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গুনাহ হয়ে গেলে তা অন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (র.) 'দাওয়ায়ে শফী' গ্রন্থে লিখেন, গুনাহের এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোনো গুনাহ হতে পারে না। তারা যদি কোনো কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী (র.) হযরত আলী (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهُ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গুনাহ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না; বরং গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। "আইন অনুযায়ী" বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গুনাহ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোনো আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও গুণাবলি লক্ষ্য করুন-

প্রথম গুণ- عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না।

দ্বিতীয় গুণ- اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ যারা কবীরা গুনাহ হতে মহাপাপ বিশেষত অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে।

কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সমস্ত গুনাহই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গুনাহকে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গুনাহ সাধারণ কবীরা গুনাহ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বুঝানের জন্য فَوَاحِشَ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলোকে فَوَاحِشَ তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা এগুলোর কু-প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানবসমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ- وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা কারো ভালোবাসা অথবা কারো প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ

ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারো প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমতো ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ– اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ : اِسْتِجَابَةٌ -এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরজ কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরজ কর্মসমূহের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরজ কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তাওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামাজ পড়ে।

পঞ্চম গুণ– وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিয়ত কোনো বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে اَمْرٌ শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষায় اَمْرٌ শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনেরা উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে ঢালাও এখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। ইমাম জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শ সাপেক্ষে কাজে তাড়াহুড়া না কারার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা : খতীব বাগদাদী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোনো ব্যাপারের সম্মুখীন হই যাতে কুরআনের কোনো ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোনো ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন– اَجْمِعُوْا لَهُ الْعَابِدِيْنَ مِنْ اُمَّتِىْ وَاجْعَلُوْهُ بَيْنَكُمْ شُوْرٰى وَلَا تَقْضُوْهُ بِرَاْىٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ এর জন্যে আমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারো একক মতে ফয়সালা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোনো কোনো ভাষ্যে فُقَهَاء এবং عَابِدِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকহবিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীস ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন– مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ اِلَّا هُدُوْا لِاَرْشَدِ اَمْرِهِمْ অর্থাৎ যখন কোনো সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূপৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভালো। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে, তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী]

ষষ্ঠ গুণ- وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ অর্থাৎ তারা আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরজ জাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাজের সাথে জাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাজের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের জন্য মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচবার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী]

সপ্তম গুণ- وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ অর্থাৎ তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান-সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমালঙ্ঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। সীমালঙ্ঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে- وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি তার ঠিক ততটুকু ক্ষতিই কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্য তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না।

আয়াতে যদিও সমান-সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে- فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু-আয়াতে এরই আরো বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা : হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরো বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে। কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী (র.) এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দুটিই অবস্থাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য দু-আয়াতে খাঁটি মুমিন ও সৎকর্মীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُونَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না; বরং তখনো ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُونَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোনো সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

٤٤. وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اَىْ اَحَدٍ يَلِىْ هِدَايَتَهٗ بَعْدَ اِضْلَالِ اللّٰهِ اِيَّاهُ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ اِلَى الدُّنْيَا مِّنْ سَبِيْلٍ ج طَرِيْقٍ .

অনুবাদ :

৪৪. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে গোমরাহ করার পর তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারবে না। পাপাচারীরা যখন আজাব পর্যবেক্ষণ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আফসোসের সাথে বলবে, আজ এখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?

٤٥. وَتَرٰهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا اَىِ النَّارِ خٰشِعِيْنَ خَائِفِيْنَ مُتَوَاضِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهَا مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط ضَعِيْفِ النَّظْرِ مُسَارَقَةً وَمِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ اَوْ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِتَخْلِيْدِهِمْ فِى النَّارِ وَعَدَمِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْحُوْرِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِى الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنُوْا وَالْمَوْصُوْلُ خَبَرُ اِنَّ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ دَائِمٍ هُوَ مِنْ مَقُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪৫. আপনি তাদেরকে দেখবেন, যখন তারা অপমানে অবনত হয়ে যাবে তারা অর্ধনির্মিলিত দৃষ্টিতে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকবে مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ -এর مِنْ অব্যয়টি اِبْتِدَاء বা ب -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুমিনগণ বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে সর্বদা জাহান্নামের আজাবে প্রবেশ করিয়ে এবং তাদের জন্যে প্রস্তুতকৃত হুরসমূহ থেকে বঞ্চিত করে। অর্থাৎ যদি তারা ঈমান আনত এ সমস্ত নিয়ামত তারা অর্জন করত। اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا টি صِلَه ও مَوْصُوْل মিলে اِنَّ -এর খবর। জেনে রাখ, নিশ্চয় জালেমরা কাফেররা স্থায়ী আজাবে থাকবে। এটা আল্লাহর উক্তি।

٤٦. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ يَدْفَعُ عَذَابَهٗ عَنْهُمْ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ط طَرِيْقٍ اِلَى الْحَقِّ فِى الدُّنْيَا وَاِلَى الْجَنَّةِ فِى الْاٰخِرَةِ .

৪৬. তাদের আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, যারা তাদেরকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ তাদের থেকে আজাবকে দূর করবে আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে দুনিয়াতে সঠিক পথে পৌছার কোনো রাস্তা নেই। এবং পরকালেও জান্নাতে পৌছার কোনো রাস্তা নেই।

٤٧. اِسْتَجِيْبُوا لِرَبِّكُمْ اَجِيْبُوْهُ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَةِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط اَىْ اَنَّهٗ اِذَا اَتٰى بِهٖ لَا يَرُدُّهٗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ تَلْجَئُوْنَ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ اِنْكَارٍ لِذُنُوْبِكُمْ.

৪৭. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে তাওহীদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের সাথে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিন কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে. অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস আসার পর কেউ তা ফিরাতে পারবে না। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না । যেখানে তোমরা আশ্রয় নেবে। এবং তোমাদের জন্যে কোনো অস্বীকারকারী থাকবে না। যিনি তোমাদের পাপসমূহ অস্বীকার করবে।

٤٨. فَاِنْ اَعْرَضُوْا عَنِ الْاِجَابَةِ فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط تَحْفَظُ اَعْمَالَهُمْ بِاَنْ تُوَافِقَ الْمَطْلُوْبَ مِنْهُمْ اِنْ مَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نِعْمَةً كَالْغِنٰى وَالصِّحَّةِ فَرِحَ بِهَا ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ الضَّمِيْرُ لِلْاِنْسَانِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ سَيِّئَةٌ بَلَاءٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اَىْ قَدَّمُوْهُ وَعُبِّرَ بِالْاَيْدِىْ لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ لِلنِّعْمَةِ.

৪৮. যদি তারা তার ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। যাতে আপনি তাদের আমলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যেন তাদের আমলসমূহ তাদের থেকে প্রত্যাশিত আমলসমূহের ন্যায় হয়। আপনার দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌছে দেওয়া। এ হুকুম জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বের এবং আমি যখন মানুষকে আমার রহমত নিয়ামত যেমন– প্রাচুর্য ও সুস্থতা আস্বাদন করাই, তখন সে আনন্দিত হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোনো অনিষ্ট ঘটে তখন মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরি করে। تُصِبْهُمْ -এর هُمْ সর্বনাম মানবজাতির দিকে ফিরেছে। قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -এর অর্থ قَدَّمُوْهُ অর্থাৎ তারা যা পেশ করে এবং এখানে তাদের হাতসমূহকে তাদের সত্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে, কেননা মানুষের অধিকাংশ কাজসমূহ হাত দ্বারা সংঘটিত হয়।

٤٩. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنَ الْاَوْلَادِ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন, যাকে চান তাকে কন্যাসন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্রসন্তান দান করেন।

٥٠. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ اَىْ يَجْعَلُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط فَلَا يَلِدُ وَلَا يُوْلَدُ لَهٗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِمَا يَخْلُقُ قَدِيْرٌ عَلٰى مَا يَشَآءُ.

৫০. আবার যাকে চান তাকে পুত্র-কন্যা উভয়টাই দান করেন এবং যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সন্তান জন্মদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর সৃষ্টিজীব সম্পর্কে ক্ষমতাশীল তাঁর ইচ্ছার প্রতি।

৫১. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّوْحِي اِلَيْهِ وَحْيًا فِي الْمَنَامِ اَوْ بِالْاِلْهَامِ اَوْ اِلَّا مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ بِاَنْ يُّسْمِعَهُ كَلَامَهُ وَلَا يَرَاهُ كَمَا وَقَعَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ اِلَّا اَنْ يُّرْسِلَ رَسُوْلًا مَلَكًا كَجِبْرَئِيْلَ فَيُوْحِيَ الرَّسُوْلُ اِلَى الْمُرْسَلِ اِلَيْهِ اَيْ يُكَلِّمُهُ بِاِذْنِهِ اَيِ اللّٰهِ مَا يَشَاۤءُ ط اِنَّهُ عَلِيٌّ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثِيْنَ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ.

৫১. কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহির মাধ্যমে তার কাছে ওহি প্রেরণ করা হবে স্বপ্ন বা ইলহাম দ্বারা অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, যেমন পর্দার অন্তরালে বান্দাকে তাঁর বাণী শুনানো হবে; কিন্তু তিনি তাকে দেখবেন না। যেমন– হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এভাবে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে। অথবা তিনি কোনো দূত ফেরেশতা যেমন– হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতিতে দূত নির্দিষ্ট প্রাপকের নিকট ওহি পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ, পার্থিব সকল গুণাবলি থেকে প্রজ্ঞাময়, তাঁর কারিগরিতে।

৫২. وَكَذٰلِكَ اَيْ مِثْلَ اِيْحَائِنَا اِلٰى غَيْرِكَ مِنَ الرُّسُلِ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رُوْحًا هُوَ الْقُرْاٰنُ بِهِ تَحْيَى الْقُلُوْبُ مِّنْ اَمْرِنَا ط اَلَّذِيْ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ تَعْرِفُ قَبْلَ الْوَحْيِ اِلَيْكَ مَا الْكِتٰبُ الْقُرْاٰنُ وَلَا الْاِيْمَانُ اَيْ شَرَائِعُهُ وَمَعَالِمُهُ وَالنَّفْيُ مُعَلِّقٌ لِلْفِعْلِ عَنِ الْعَمَلِ وَمَا بَعْدَهُ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ اَيِ الرُّوْحَ اَوِ الْكِتَابَ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهِ مَنْ نَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِنَا ط وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ تَدْعُوْ بِالْمُوْحٰى اِلَيْكَ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ.

৫২. এমনিভাবে অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! অন্যান্য রাসূলগণের মতো আমি আপনার নিকট আমার নির্দেশে রূহ অর্থাৎ কুরআন যা দ্বারা অন্তরসমূহ জীবিত হয় প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি যা ওহি প্রেরণ করেছি তা হলো কুরআন, যাতে মানুষের অন্তরসমূহ জিন্দা হয়। আপনি ওহি নাজিলের পূর্বে জানতেন না কিতাব কুরআন কি? এবং জনতেন না ঈমান কি? অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধান জানতেন না। اِسْتِفْهَامٌ তার পূর্বের উল্লিখিত ফে'লকে আমল থেকে রহিত করে দিয়েছে। বা তার পরবর্তী বাক্য দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু আমি একে অর্থাৎ রূহ বা কিতাবকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি আপনার কাছে প্রেরিত ওহির দ্বারা সরল পথ ইসলাম ধর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।

৫৩. صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَّخَلْقًا وَّعَبِيْدًا اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ تَرْجِعُ.

৫৩. আল্লাহর পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই রাজত্ব, সৃষ্টি ও দাসত্ব সব হিসেবে শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَحَدٍ يَلِىْ : এটা مِنْ وَلِيٍّ -এর তাফসীর। অর্থাৎ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ يَلِىْ هِدَايَتَهُ بَعْدَ اِضْلَالِهِ এ সুরতে مِنْ بَعْدِهِ -এর যমীর اِضْلَالٌ -এর দিকে ফিরবে এবং এটাও সম্ভব যে, بَعْدِهِ -এর যমীর আল্লাহর দিকে ফিরবে। আর بَعْدِ اللّٰهِ টা سِوَى اللّٰهِ অর্থে হবে। সেই সুরতে অনুবাদ হবে– আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক থাকবে না।

قَوْلُهُ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ : এটা جُمْلَه حَالِيَه এবং رُوْيَتٌ দ্বারা رُوْيَت بَصَرِيَه উদ্দেশ্য এবং এর مُخَاطَبْ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে رُوْيَتْ -এর যোগ্যতা থাকবে।

قَوْلُهُ مَرَدٍّ : এটা رَدٌّ হতে ظَرْف زَمَان وَمَكَانٌ অর্থ– ফিরিয়ে আনার সময় বা ফিরিয়ে আনার স্থান।

قَوْلُهُ عَلَيْهَا : প্রশ্ন. عَلَيْهَا -এর মধ্যে هَا، যমীরের مَرْجِعْ কি? যদি পূর্বে উল্লেখ না থাকে তবে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হচ্ছে। আর যদি পূর্বে উল্লিখিত اَلْعَذَابَ -এর দিকে ফিরে তবে যমীর এবং مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ হয় না। কেননা عَذَابَ হলো পুংলিঙ্গ এবং هَا، যমীর হলো স্ত্রীলিঙ্গ।

উত্তর. هَا، যমীরের مَرْجِعْ হলো نَارْ যেমনটি ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। اَلْعَذَابَ শব্দটি দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে কাজেই কোনো বিপত্তি থাকে না। (جَمَلْ)

قَوْلُهُ تَرَاهُمْ : এখানে تَرٰى দ্বারা رُوْيَت بَصَرِىْ উদ্দেশ্য। আর يُعْرَضُوْنَ এবং خَاشِعِيْنَ উভয়টি هُمْ যমীর থেকে جُمْلَه হয়ে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الذُّلِّ : এটা خَاشِعِيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الطَّرْفِ : طَرْف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চক্ষু। কেউ কেউ মাসদারী অর্থ তথা দেখা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। প্রথম অর্থই ব্যাখ্যাকারের ইবারতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। طَرْف خَفِىْ লজ্জাবনত দৃষ্টিকে বলা হয়। چشم نیم باز، چشم ضعیف، چشم بیمار . এ সকল শব্দ দ্বারা প্রায় একই مَفْهُوْم আদায় করা হয়।

بمژگان سیاه کردی ہزاراں رخنہ درتیم * بیا کاز چشم بیمارت ہزاراں درد برد چینم

কবি লজ্জাবনত দৃষ্টিকে چَشْم بِيْمَار দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন পাপীদেরকে দোজখের সামনাসামনি করা হবে তখন লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণে চোখসমূহ পরিপূর্ণরূপে খুলতে সক্ষম হবে না; বরং চোখের কিনারা দ্বারা আড় চোখে দেখবে।

قَوْلُهُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهَا : এখানে اِلَيْهَا -এর যমীরও اَلْعَذَابَ হতে নির্গত مَفْهُوْمُ النَّارِ -এর দিকে ফিরবে। مِنْ طَرْفٍ -এর মধ্যে مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّه অথবা بَاء، অর্থে হয়েছে। بَاء، অর্থে হওয়াটাই অধিক সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا : এটা اِنَّ -এর খবর আর اَلْخٰسِرِيْنَ হলো اِنَّ -এর اِسْم -

قَوْلُهُ بِتَخْلِيْدِهِمْ فِى النَّارِ وَعَدَمِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْحُوْرِ : এখানে لَفّ نَشْر مُرَتَّبْ হয়েছে بِتَخْلِيْدِ اَنْفُسِهِمْ -এর সম্পর্ক اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ -এর সাথে হয়েছে। আর عَدَمُ وُصُوْلِهِمْ -এর সম্পর্ক اَهْلِيْهِمْ -এর সাথে হয়েছে। আর পরিবারের সম্পর্কে ক্ষতির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেই হুর ও গিলমান তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এখন তারা তা থেকে বঞ্চিত হবে। আবার কেউ কেউ এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন যে, اَهْل দ্বারা পৃথিবীর اَهْل বা পরিবার-পরিজন উদ্দেশ্য হবে। তাদের ব্যাপারে ক্ষতির সুরত এই হবে যে, তা জান্নাতে অন্যকে দিয়ে দেওয়া হবে। (حَاشِيَه جَلَالَيْن) মুফাসসির (র.) هُوَ مِنْ مَقُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلَا اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ এটা আল্লাহ তা'আলার مَقُوْلَه বা উক্তি এবং মুমিনের উক্তির সত্যায়ন। আবার কেউ কেউ এই বাক্যকে মুমিনগণের কথার تَتِمَّه বলেছেন।

قَوْلُهُ لَا يَرُدُّهُ : এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مِنَ اللّٰهِ এটা مَرَدَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আবার يَاْتِىَ -এর সাথেও এর تَعَلُّقْ করা জায়েজ।

قَوْلُهُ إِنْكَارٌ لِذُنُوْبِكُمْ : এ ইবারতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نَكِيْر টা খেলাফে কিয়াস أَنْكَرَ -এর মাসদার হয়েছে। অর্থাৎ অপরাধীদের পক্ষে স্বীয় অপরাধকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। কেননা صَحِيْفَةُ أَعْمَالٍ তথা আমলনামাতে তাদের কার্যবিবরণী সংরক্ষিত রয়েছে এবং অপরাধীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

قَوْلُهُ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا : এ বাক্যটি শর্তের জবাব উহ্যের ইল্লত অর্থাৎ شَرْط إِنْ أَعْرَضُوْا হলো আর فَلَا تَحْزَنْ জবাবে শর্ত উহ্য রয়েছে- إِنَّا مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا অর্থাৎ মুশরিকদের বিমুখ থাকার কারণে চিন্তিত হবেন না। কেননা আমি আপনাকে তাদের রক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করিনি, আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। অর্থাৎ অহেতুক তাদের চিন্তায় পড়ে থাকবেন না যে, তাদের আমল তাদের থেকে প্রার্থিত আমল অনুপাতে হয় কিনা?

قَوْلُهُ الضَّمِيْرُ لِلْاِنْسَانِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. تُصِبْهُمْ -এর যমীর إِنْسَانٌ-এর দিকে ফিরেছে। এখন যমীর ও مَرْجِعْ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য হয় না। কেননা যমীর হলো বহুবচন আর مَرْجِعْ হলো একবচন।

উত্তর. إِنْسَانٌ শব্দটি শব্দ হিসেবে যদিও একবচন; কিন্তু جِنْس হওয়ার ভিত্তিতে বহুবচন, কাজেই বহুবচনের যমীর নেওয়া বৈধ হয়েছে- এবং فَرِحَ -কে مُفْرَدٌ নেওয়া হয়েছে إِنْسَانٌ -এর শব্দের হিসেবে।

قَوْلُهُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ : এখানে إِسْمُ ضَمِيْر -এর স্থানে إِسْمُ ظَاهِرْ নেওয়া হয়েছে। মূলে ছিল فَإِنَّهُ كَفُوْرٌ ইমাম কারখী (র.) বলেন, এ বাক্যটি جَوَابُ شَرْط ; কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, এ جَوَابُ টা উহ্যের ইল্লত। উহ্য ইবারত হলো- وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ نَسِيَ النِّعْمَةَ رَأْسًا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ নِسِيَ النِّعْمَةَ رَأْسًا জবাবে শর্ত উহ্য রয়েছে فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ نَسِيَ النِّعْمَةَ رَأْسًا জবাবে শর্তের ইল্লত।

قَوْلُهُ فَلَا يَلِدُ وَلَا يُوْلَدُ لَهُ : فَلَا يَلِدُ -এর সম্পর্ক إِمْرَأَةٌ -এর সাথে অর্থাৎ যদি বন্ধ্যা নারী হয় তবে لَا يَلِدُ বলা হবে। কিন্তু এ সুরত تَلِدُ তথা تَاءٌ -এর সাথে হওয়া উচিত। তবে বলা যায় যে, مَنْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে مُذَكَّرٌ নেওয়া বৈধ। কোনো কোনো নুসখায় تَلِدُ -ও রয়েছে, যা অধিক সমীচীন। আর وَلَا يُوْلَدُ -এর সম্পর্ক ঐ সুরতের সাথে হবে যখন عُقْم তথা বন্ধ্যাত্ব পুরুষের সাথে হয়। আর মিসবাহগ্রন্থে রয়েছে যে, لَا يُوْلَدُ لَهُ উভয় সুরতেই বলা যায় عُقْم বা বন্ধ্যাত্ব চাই পুরুষের মধ্যে হোক বা নারীর মধ্যে হোক। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَلَا يَرَاهُ : এ ইবারতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে حِجَابٌ -এর لَازِمْ مَعْنٰى অর্থাৎ عَدَمُ رُؤْيَتْ উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহর জন্য পর্দা বা হেজাব অসম্ভব; বরং حِجَابٌ বান্দার সিফত।

قَوْلُهُ مَا الْكِتَابُ : إِسْتِفْهَامِيَّةٌ مَا হলো মুবতাদা আর اَلْكِتَابُ তার খবর। বাক্যটি উহ্য মুযাফের সাথে হয়েছে। অর্থাৎ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ جَوَابَ مَا الْكِتَابُ অর্থাৎ আপনি সেই প্রশ্নের জবাবও জানতেন না যে, কিতাব কি? -[جُمَلْ]

قَوْلُهُ أَيْ شَرَائِعُهُ وَمَعَالِمُهُ : এ ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা।

প্রশ্ন. রাসূল ﷺ তো নবুয়তের পূর্বেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন এবং হেরাগুহায় শরিকহীন একক আল্লাহর ইবাদত করতেন। এরপরও তার সম্পর্কে "আপনি ঈমান সম্পর্কে অনবগত ছিলেন" বলার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَحْكَامْ ও শরিয়ত এবং এর বিস্তারিত বিবরণ। যে সম্পর্কে তিনি ওহি আসার পূর্বে অনবগত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মুমিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর إِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আজাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا বাক্যের মর্ম তাই।

قَوْلُهُ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ : এখান থেকে إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে- يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ অর্থাৎ মানবসৃষ্টিতে কারো ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি জ্ঞানেরও কোনো দখল নেই। পিতামাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র; কিন্তু সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোনো দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই কাউকে কন্যাসন্তান, কাউকে পুত্রসন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন; তার কোনো সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যাসন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদিদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগভী ও কুরতুবী (র.) প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা আপনি হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একথা সত্য নয় যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-ও সামনাসামনি কথা শুনেননি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়াজ শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। যথা-

প্রথম উপায় : وَحْيًا অর্থাৎ কোনো বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ أَلْقَى فِي رُوعِي বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গাম্বরগণের স্বপ্নও ওহি হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গাম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায় : أَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোনো কথা শোনা। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তাই رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জবাব لَنْ تَرَانِي বলে দেওয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোনো বস্তু নয়, যা আল্লাহ তা'আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোনো বস্তুই ঢাকতে পারে না; বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতি আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যত ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর

উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরিউক্ত নীতির পরিপন্থি নয়। কেননা সে কথাবার্তা এ জগতে নয়, আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায় : أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রমুখ কোনো ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গাম্বরকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কুরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরিউক্ত বিবরণে وَحْيٌ শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহর সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহির একটি প্রকার বলে গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহিও দুরকম। কখনো ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনো মানুষের আকৃতিতে।

قَوْلُهُ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ : এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারো সাথে হয়নি, হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি যে ওহি প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এ নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহি প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলুন ইহুদিদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোনো মানুষ এমনকি কোনো রাসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ওহির মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলগণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহির পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রাসূল ও নবী করেন, তাঁকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর সৃষ্টি করেন। তাঁর মন-মানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহি অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মুমিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চরিত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পয়গাম্বরগণের বিরোধিতা করে তাঁদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে; কিন্তু কোনো পয়গাম্বরকে বিরোধীরা এ দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতোই প্রতিমা পূজা করতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. হা-মীম আল্লাহ তা'আলাই এর মর্মার্থ সম্পর্কে অধিক অবগত।

٢. وَالْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْمُبِيْنِ ۙ اَلْمُظْهِرِ طَرِيْقَ الْهُدٰى وَمَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الشَّرِيْعَةِ ـ

২. শপথ ঐ কিতাবের কুরআনের যা হেদায়েতের রাস্তা ও শরিয়তের জরুরি বিধানাবলি সুস্পষ্টকারী।

٣. اِنَّا جَعَلْنٰهُ اَوْجَدْنَا الْكِتَابَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا بِلُغَةِ الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ تَعْقِلُوْنَ تَفْهَمُوْنَ مَعَانِيَهٖ ـ

৩. আমি একে এই কিতাবকে আরবি কুরআন আরবি ভাষার কুরআন করেছি, যাতে তোমরা হে মক্কাবাসী! বুঝ এর অর্থসমূহ বুঝ।

٤. وَاِنَّهٗ مُثْبَتٌ فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ اَصْلِ الْكِتَابِ اَىِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لَدَيْنَا بَدَلٌ عِنْدَنَا لَعَلِيٌّ عَلَى الْكِتٰبِ قَبْلَهٗ حَكِيْمٌ ط ذُوْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ ـ

৪. নিশ্চয় এ কুরআন আমার কাছে লওহে মাহফূযে সমুন্নত পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উপর অটল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। لَدَيْنَا টি عِنْدَنَا থেকে بَدَل -

٥. اَفَنَضْرِبُ نُمْسِكُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ صَفْحًا اِمْسَاكًا فَلَا تُؤْمَرُوْنَ وَلَا تُنْهَوْنَ لِاَجَلِ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۙ ـ

৫. আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এই উপদেশনামা কুরআন প্রত্যাহার করে নেব যাতে তোমাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করা না হয়। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

٦. وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ـ

৬. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের নিকট আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি।

٧. وَمَا كَانَ يَاْتِيْهِمْ اَتَاهُمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ كَاسْتِهْزَاءِ قَوْمِكَ بِكَ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ لَهٗ ﷺ ـ

৭. এবং তাদের নিকট এমন কোনো নবী আসেনি যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। যেমন আপনর গোত্র আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উক্ত বাক্যটি নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলা হয়েছে।

٨. فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ مِنْ قَوْمِكَ بَطْشًا قُوَّةً وَمَضٰى سَبَقَ فِىْ اٰيَاتٍ مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ صِفَتُهُمْ فِى الْاِهْلَاكِ فَعَاقِبَةُ قَوْمِكَ كَذٰلِكَ

৮. সুতরাং যারা তাদের চেয়ে তোমার গোত্র থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; পূর্ববর্তীদের এই উদাহরণসমূহ বিভিন্ন আয়াতে অতীত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্যে তাদের অবস্থা বর্ণনা হয়েছে। অতএব আপনার সম্প্রদায়ের অবস্থাও তাই হবে

٩. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى النُّوْنَاتِ وَ وَاوُ الضَّمِيْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ اٰخِرُجَوَا بِهِمْ اَىِ اللّٰهُ ذُو الْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ زَادَ تَعَالٰى .

৯. তোমরা যদি ঐসব লোকদের জিজ্ঞাসা করো কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন لَئِنْ-এর ل শপথের জন্যে অবশ্যই তারা বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহই। لَيَقُوْلُنَّ আসলে لَيَقُوْلُوْنَنَّ ছিল। পরস্পর কয়েকটি ن একত্র হওয়ার نُوْنُ الرَّفْعِ -কে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। অতঃপর দুটি সাকিন একত্র হওয়ার দরুন و -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

١٠. اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا فِرَاشًا كَالْمَهْدِ لِلصَّبِىِّ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا طُرُقًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ج اِلٰى مَقَاصِدِكُمْ فِىْ اَسْفَارِكُمْ .

১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন যেমন শিশুর জন্যে দোলনাকে বানিয়েছেন এবং তাতে করেছেন তোমাদের জন্যে পথ যাতে তোমরা ভ্রমণে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌছ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও। ذُو الْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ থেকে الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ পর্যন্ত মুশরিকদের কথার জবাব সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তবুও আল্লাহ তা'আলা اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ থেকে وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন।

١١. وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ج اَىْ بِقَدْرِ حَاجَتِكُمْ اِلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلْهُ طُوْفَانًا فَاَنْشَرْنَا اَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ج كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ هٰذَا الْاِحْيَاءِ تُخْرَجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِكُمْ اَحْيَاءً .

১১. যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে এবং প্লাবন ও তুফানের আকৃতিতে প্রেরণ করেনি। অতঃপর তার সাহায্যে আমি মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছি। তেমনিভাবে অর্থাৎ এই জীবন দানের ন্যায় তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে তোমাদের কবর থেকে।

١٢. وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الْاَصْنَافَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ السُّفُنِ وَالْاَنْعَامِ كَالْاِبِلِ مَا تَرْكَبُوْنَ حُذِفَ الْعَائِدُ اِخْتِصَارًا وَهُوَ مَجْرُوْرٌ فِى الْاَوَّلِ اَىْ فِيْهِ مَنْصُوْبٌ فِى الثَّانِىْ .

১২. এবং যিনি সবকিছুর যুগল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে যেমন উটকে তোমাদের যানবাহন রূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যাবর্তনকারী যমীরকে সংক্ষেপকরণের জন্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং প্রথম প্রত্যাবর্তনকারী যমীর (عَائِدْ اَوَّلْ) হলো মাজরূর অর্থাৎ مِنَ الْفُلْكِ -এর মধ্যে যমীর হলো فِيْهِ অর্থাৎ تَرْكَبُوْنَ فِيْهِ আর দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনকারী যমীর عَائِدْ ثَانِىْ হলো মানসূব অর্থাৎ اَلْاَنْعَامْ -এর মধ্যে যমীর হলো ، অর্থাৎ تَرْكَبُوْنَهُ -

١٣. لِتَسْتَوُا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ذُكِرَ الضَّمِيْرُ وَجُمِعَ الظَّهْرُ نَظَرًا لِلَفْظِ مَا وَمَعْنَاهَا ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ لا مُطِيْقِيْنَ ـ

১৩. যাতে তোমরা তার পিঠে আরোহণ করো স্থিরতার সাথে। এখানে ظُهُوْرِهٖ -এর যমীরকে একবচন পুংলিঙ্গ আর ظُهُوْر -কে বহুবচন আনা হয়েছে مَا শব্দটির শাব্দিক ও অর্থগত উভয় দিকে লক্ষ্য করে। অতঃপর তোমরা যখন তার উপর ঠিকঠাকভাবে আরোহণ কর তোমাদের পালনকর্তার নিয়ামত স্মরণ করে বল, পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিসকে অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা এদেরকে আয়ত্তে আনার উপর সক্ষম ছিলাম না।

١٤. وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ لَمُنْصَرِفُوْنَ ـ

১৪. আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

١٥. وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ط حَيْثُ قَالُوْا الْمَلٰئِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ لِاَنَّ الْوَلَدَ جُزْءُ الْوَالِدِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ اِنَّ الْاِنْسَانَ الْقَائِلَ ذٰلِكَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ط بَيِّنٌ ظَاهِرُ الْكُفْرِ ـ

১৫. এবং তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকেই কোনো কোনো বান্দাকে আল্লাহর অংশ বানিয়ে দিয়েছে। যেমন তারা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। কেননা সন্তান পিতারই অংশ আর ফেরেশতাগণ আল্লাহরই বান্দা। বাস্তবিক মানুষ এ জাতীয় উক্তিকারী স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ প্রকাশ্য কুফরকারী।

তাহকীক ও তারকীব

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ : زُخْرُف অর্থ– গিলটি করা বস্তু, স্বর্ণের প্রলেপ, সজ্জিত, সৌন্দর্য, যখন زُخْرُف-কে কথার সাথে ব্যবহার করা হয় তখন অর্থ হয়– মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছে– زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا অর্থাৎ সুসজ্জিত প্রতারণার কথাবার্তা।

قَوْلُهٗ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ : এখানে وَاو টি হলো قَسَمِيَّةٌ جَارَّةٌ আর اَلْكِتَابُ الْمُبِيْنُ মাওসূফ সিফাত মিলে مَجْرُوْر এখন جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে اُقْسِمُ উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। ফে'ল তার فَاعِل এবং مُتَعَلِّقْ -কে নিয়ে قَسَم হয়েছে। আর اِنَّا جَعَلْنَاهُ হলো جَوَابُ قَسَم ‐

قَوْلُهٗ اَوْجَدْنَا الْكِتَابَ : মুফাসসির (র.) جَعَلْنَاهُ -এর তাফসীর اَوْجَدْنَا الْكِتَابَ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন. جَعَلَ টা কুরআনের مَجْعُوْل হওয়াকে বুঝায় এবং مَجْعُوْل মখলূক বা সৃষ্টজীব হয়ে থাকে। কাজেই এর দ্বারা কুরআনের مَخْلُوْقٌ হওয়া আবশ্যক হয়, যা হলো মু'তাযেলাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ আল্লাহ তা'আলা আলো ও আঁধারকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদার পরিপন্থি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে كَلَامٌ نَفْسِيٌّ আল্লাহর সিফাত হওয়ার কারণে غَيْرِ مَخْلُوْق এবং قَدِيْم

উত্তর. জবাবের সারকথা হলো, جَعَلَ টা خَلَقَ -এর সাথে খাস নয়; বরং পবিত্র কুরআনেও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– بَعَثَ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا আর جَعَلَ টা قَالَ অর্থেও ব্যবহার

হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا অর্থাৎ মুশরিকরা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে কাউকে তাঁর অংশ বলেছে অথবা অংশ হওয়ার বিশ্বাস রেখেছে। আবার جَعَلَ টা صَيَّرَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً অর্থাৎ আমি তাদের অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি। جَعَلْنَاهُ -এর তাফসীর اَوْجَدْنَاهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, جَعَلَ টা مُتَعَدِّيْ بِيَكْ مَفْعُوْلْ হয়েছে। আর তা হলো جَعَلْنَاهُ-এর মাফউলের যমীর, যার مَرْجِعْ হলো كِتَابْ আর كِتَابْ মাওসূফ সিফাত মিলে جَعَلْنَاهُ -এর মাফউলের যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। কতিপয় মুফাসসির جَعَلَ -কে صَيَّرَ -এর অর্থে নিয়ে , যমীরকে প্রথম মাফউলে বিহী এবং قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا মওসূফ সিফত মিলে দ্বিতীয় মাফউলে বিহী বলেছেন। তবে আল্লামা যমখশরী (র.) جَعَلَ -কে خَلَقَ অর্থে জায়েজ বলেছেন। আর এটা কুরআন مَخْلُوْقْ হওয়ার মু'তাযেলী বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ : এর আতফ جَوَابُ قَسَمٍ -এর উপর হয়েছে। এভাবে এটা দ্বিতীয় جَوَابُ قَسَمٍ আল্লামা মহল্লী (র.) مُثْبَتٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ এটা جَارْ ও مَجْرُوْرْ মিলে اِنَّ -এর খবর হয়েছে এবং اُمّْ الْكِتَابِ টা لَدَيْنَا হতে بَدَلْ হয়েছে। আর তা عِنْدَنَا অর্থে হয়েছে। আর لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ হলো اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর اُمّْ الْكِتَابِ অর্থ হলো اَصْلُ الْكِتَابِ তথা লৌহে মাহফূয।

قَوْلُهُ اَفَنَضْرِبُ : উহ্য হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর فَاءْ হলো عَاطِفَةٌ উহ্য ইবারত হলো- اَنُهْمِلُكُمْ فَنَضْرِبُ الخ যা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ হয়েছে। যার দিকে মুফাসসির (র.) শেষে لَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমাদের কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে কুরআন অবতরণের ধারা স্থগিত করব না; কুরআনের ধারা চালু রেখে কুরআন অবতরণ পরিপূর্ণ করব। যাতে করে তোমাদের উপর দলিল পূর্ণ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ نُمْسِكُ : মুফাসসির (র.) نَضْرِبُ -এর তাফসীর نُمْسِكُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, صَفْحًا টা نَضْرِبُ -এর مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হয়েছে এবং صَفْحًا টা اِمْسَاكًا -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ نُمْسِكُ اِمْسَاكًا

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ : নাফে (র.) اِنْ -কে شَرْطِيَّةٌ বলে হামযাকে كَسْرَةٌ -এর সাথে পড়েছেন।

প্রশ্ন. اِنْ شَرْطِيَّةٌ টা غَيْرُ مُحَقَّقْ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। অথচ মুশরিকদের শিরক مُحَقَّقْ ছিল। তাহলে এখানে কি করে اِنْ شَرْطِيَّةٌ বলা বৈধ হবে?

উত্তর. اِنْ شَرْطِيَّةٌ কখনো اَمْرِ مُحَقَّقْ -এর উপরও প্রবিষ্ট হয় مُخَاطَبْ -কে এই تَاثُرْ দেওয়ার জন্য যে, مُتَكَلِّمْ -এর শর্ত পতিত হওয়ার বিশ্বাস নেই; বরং সে শর্ত وُقُوْعْ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, এটা প্রকাশ করার জন্য এ ধরনের ফে'লের প্রকাশ হওয়া জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান থেকে مُسْتَبْعَدْ বা অসম্ভব।

আর আল্লামা বাকূন (র.) اِنْ كُنْتُمْ হামযা فَتْحْ -এর সাথে পড়েছেন এবং لَامْ تَعْلِيْلِيَّةٌ -কে উহ্য মেনেছেন। উহ্য ইবারত হলো- لِاَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ আমি কি এ কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় কুরআন অবতরণ বন্ধ করে দেব? অর্থাৎ আমি এরূপ করব না।

قَوْلُهُ كَمْ اَرْسَلْنَا : এখানে كَمْ টা হলো خَبَرِيَّةٌ যা اَرْسَلْنَا-এর مَفْعُوْلْ مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَتَاهُمْ : এখানে يَاْتِيْهِمْ-এর তাফসীর اَتَاهُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُضَارِعْ টা مَاضِيْ -এর অর্থে হয়েছে, আশ্চর্য ধরনের সুরতে اِسْتِحْضَارْ -এর উপর বুঝানোর জন্য مَاضِيْ -কে مُضَارِعْ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ اَشَدَّ مِنْهُمْ : এটা উহ্য মাওসূফের সিফাত। আর مَوْصُوْفْ হলো اَهْلَكْنَا -এর مَفْعُوْلْ আর بَطْشًا হলো تَمْيِيْز উহ্য ইবারত হলো- اَهْلَكْنَا قَوْمًا اَشَدَّ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ جِهَةِ الْبَطْشِ

قَوْلُهُ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ : এর মধ্যে وَاوْ হলো عَاطِفَةٌ এবং قَسَمِيَّةٌ আর اِنْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর لَيَقُوْلُنَّ হলো جَوَابْ قَسَمْ এবং جَوَابُ شَرْطِ উহ্য রয়েছে। جَوَابُ شَرْطِ টা جَوَابُ قَسَمْ -এর উপর দালালত করছে। قَسَمْ এবং شَرْطِ যখন একত্র হয়ে যায় তখন প্রথমটির جَوَابْ উল্লেখ হয়। এই প্রসিদ্ধ নীতির ভিত্তিতেই এখানে جَوَابُ قَسَمْ উল্লেখ রয়েছে এবং جَوَابُ شَرْطِ

উহ্য রয়েছে। جَوَابُ شَرْط উহ্য হওয়ার দ্বিতীয় قَرِيْنَة এখানে এটাও যে, মুফাসসির (র.) لَيَقُوْلُنَّ -এর মধ্যে نُوْن পড়ে যাওয়ার ইল্লত একাধিক نُوْن -এর একত্র হওয়া বলেছেন। যদি لَيَقُوْلُنَّ টা جَوَابُ شَرْط হতো তাহলে মুফাসসির (র.) حُذِفَتْ النُّوْنُ لِلْجَازِمِ বলতেন।

قَوْلُهُ زَادَ تَعَالٰى الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ : মুফাসসির (র.)-এর زَادَ تَعَالٰى বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুশরিকদের কথা اَلْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ -এর উপর শেষ হয়ে গেছে। اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ থেকে আল্লাহ তা'আলার কথা শুরু হচ্ছে। কেননা যদি এ বাক্যও মুশরিকদের হতো তবে তারা جَعَلَ لَنَا الْاَرْضَ مَهْدًا الخ বলত।

قَوْلُهُ الْاَصْنَافُ : এ শব্দ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْاَزْوَاجُ -এর অর্থ নির্ধারণ করা। কেননা এখানে اَزْوَاجٌ শব্দটি তার প্রসিদ্ধ অর্থ তথা জোড়া অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং সাধারণ اَقْسَامٌ এবং اَنْوَاعٌ তথা প্রকারভেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَنْشَرْنَا : এতে غَائِبٌ থেকে مُتَكَلِّمٌ -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ حَذْفُ الْعَائِدِ الخ : مَا تَرْكَبُوْنَ -এর مَا হলো اِسْمِ مَوْصُوْل আর تَرْكَبُوْنَ জুমলা হয়ে صِلَة : নীতিমালা হলো, যখন সেলাহ জুমলা হয় তখন তাতে একটি যমীর আবশ্যক হয়, যা مَوْصُوْل -এর দিকে ফিরে। এখানে তাকে اِخْتِصَارًا ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু مَا تَرْكَبُوْنَ -এর সম্পর্ক فُلْك এবং اَنْعَام উভয়ের সাথে হয়। এ কারণে যখন مَا تَرْكَبُوْنَ -এর تَعَلُّقٌ বা সম্পর্ক فُلْك -এর সাথে হবে তখন عَائِدٌ فِيْهِ যা উহ্য হবে। কেননা رَكِبْتُ فِى الْفُلْكِ বলা হয়; رَكِبْتُ الْفُلْكَ বলা হয় না। আর যখন তার সম্পর্ক اَنْعَام -এর সাথে হবে তখন عَائِدٌ মানসূব হবে। কেননা رَكِبْتُ الْاِبِلَ -এর ব্যবহার রয়েছে; رَكِبْتُ عَلَى الْاِبِلِ -এর ব্যবহার নেই।

قَوْلُهُ ذَكَّرَ الضَّمِيْرَ : মুফাসসির (র.) ظُهُوْرِه -এর ব্যাপারে বলতে চাচ্ছেন ظهوره -এর মধ্যে ه যমীর مُذَكَّر এবং ظُهُوْر বহুবচন নিয়েছেন; ظُهُوْر শব্দটি ظَهْر -এর বহুবচন, অর্থ– পিঠ, চতুষ্পদ পশুর পিঠ। এর ه যমীর দ্বারাও اَنْعَام উদ্দেশ্য, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই; যখন উভয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য একই। মুফাসসির (র.) এর জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, এই পার্থক্য হয়েছে مَا শব্দটির শব্দ এবং অর্থের মধ্যে পার্থক্যের কারণে। مَا শব্দটি শাব্দিকভাবে مُفْرَدٌ এ কারণে যমীরকে مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ নেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু অর্থগতভাবে বহুবচন, এ কারণে ظُهُوْرٌ -কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

সতর্কীকরণ : মুফাসসির (র.) যদি ذَكَّرَ الضَّمِيْرَ -এর পরিবর্তে اَفْرَدَ الضَّمِيْرَ বলতেন, তবে বেশি উত্তম হতো। কেননা جَمْعٌ-এর মোকাবিলায় مُفْرَدٌ আসে مُذَكَّرٌ নয়। যদি উভয় ক্ষেত্রে مَا -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হতো তবে عَلٰى ظُهُوْرِهَا হতো। আর যদি উভয় স্থানে শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হতো তবে ظَهْرِهٖ হতো।

قَوْلُهُ مُقْرِنِيْنَ : অর্থাৎ مُطِيْقِيْنَ مَاخُوْذٌ مِنْ اَقْرَنَ الشَّيْئَ اِذَا اَطَاقَهٗ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যুখরুফ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ, তবে হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী] এতে ৮৯ আয়াত, ৮৩৩ বাক্য এবং ৩,৪০০ অক্ষর রয়েছে।

ইবনে মরদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা যুখরুফ মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে ওহির কথা বলা হয়েছে, আর ওহি কিভাবে নাজিল হতো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে সূরার পরিসমাপ্তিতে। আলোচ্য সূরা শুরু করা হয়েছে ওহি তথা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দ্বারা। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, এ সূরার প্রারম্ভে "পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ" ঘোষণা দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর যারা তাঁকে বা পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্যে রয়েছে সতর্কবাণী।

আ'মালুল কুরআন : সূরা যুখরুফ লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করে পান করলে কফ কাশি দূরীভূত হয়।

–[তাফসীরে দুররুল নজম]

স্বপ্নের তাবির : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে সে সূরা যুখরুফ তেলাওয়াত করছে, তার অর্থ হবে ঐ ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সফল হবে, আর আখিরাতেও সে লাভ করবে উচ্চ মরতবা।

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ : এতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলিল হয়ে থাকে। এখানে কুরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলিল। কুরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরিয়তের বিধিবিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ [নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?] এতে বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরি হয় না; বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় : أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ [আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়?] উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম করো না কেন, আমি তোমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোনো দলের কাছে তাবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বেদীন অথবা পাপাচারী।

কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন-শাশ্বত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা হলো কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং তা قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন ও শাশ্বত। কেননা কুরআন আল্লাহর কালাম ও বাণী আর আল্লাহর ন্যায় আল্লাহর বাণী কুরআনও قَدِيْمٌ ও চিরন্তন। কিন্তু বাতিলপন্থি মুতাযিলা সম্প্রদায় দল বলে, কুরআন মাখলুক ও সৃষ্ট। তারা দলিল দিতে গিয়ে বলে যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে বলেন– إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুরআনকে বানিয়েছি আরবি ভাষায়। এতে তিনি কুরআনকে مَجْعُوْلٌ বলেছেন। আর مَجْعُوْلٌ একমাত্র مَخْلُوْقٌ হয়ে থাকে। আর সকল মাখলূক নতুন ও حَادِثٌ তাই কুরআনকে তারা حَادِثٌ বলে দাবি করে থাকে।

তাদের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, আল্লাহর কালাম বাস্তবিক ও প্রকৃতগত [نَفْسِيٌّ] হিসেবে ক্বাদীম ও চিরন্তন। অতএব আল্লাহর বাণীকে অন্যান্য শাব্দিক ও জাহেরী কথাবার্তার সাথে সমতুল্য করা যাবে না। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে جَعَلَ -এর অর্থ صَيَّرَ ও خَلَقَ -এর অর্থে নয়। অতএব তাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সঠিক নয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট حَضْرَمَوْتُ শহরের এক বাসিন্দা এসে বললেন, আপনি আমাকে বলুন, কুরআন আল্লাহর বাণীসমূহের একটি বাণী, নাকি আল্লাহর সৃষ্টের কোনো সৃষ্ট বা মাখলূক? তিনি (রা.) বলেন, এটা আল্লাহর বাণী এবং তুমি কি শোননি আল্লাহর বাণী– وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ؛ অতঃপর حَضْرَمِيْ লোকটি বললেন, আপনি কি আল্লাহর বাণী– إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا -এর মধ্যে চিন্তা করেননি? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার উত্তরে বললেন, এখানে جَعَلْنَاهُ অর্থ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ অর্থাৎ আল্লাহ এটা লওহে মাহফূযে আরবিতে লিখেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِنَّهُ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ : আলোচ্য আয়াতে اُمِّ الْكِتٰبِ অর্থ اَصْلُ الْكِتٰبِ অর্থাৎ যেখান থেকে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি নাজিলকৃত কিতাবসমূহ গৃহীত হয়েছে সেখান থেকে এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়ায় এ কিতাবকেই كِتٰبٌ مَّكْنُوْنٌ তথা গোপন ও সুরক্ষিত কিতাব বলা হয়েছে এবং সূরা বুরূজে এটাকে লওহে মাহফূয হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন ফলক যার লেখা মুছে যেতে পারে না এবং যা সব রকম হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। কুরআন সম্পর্কে اُمِّ الْكِتٰبِ-এ লিপিবদ্ধ আছে এ কথা বলে একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, আল্লাহ যুগে যুগে যত কিতাব নাজিল করেছেন সব কিতাবেরই দাওয়াত ছিল একই আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি। সব কিতাবেই একই সত্যকে ন্যায় ও সত্য বলা হয়েছে, ভালো ও মন্দের একই মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে, নৈতিকতা ও সভ্যতার একই নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব কিতাব যে দীন পেশ করেছে তা সর্বদিক দিয়ে একই দীন। আর তা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ ও উলূহিয়্যাতের কথা প্রমাণ করা।

قَوْلُهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানার পরিবর্তে দোলানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা একটা শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্যে তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। এটি তার কক্ষের উপর প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরছে এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তোমাদের স্রষ্টা তাকে এতটা সুশান্ত বানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আরামে তার উপর ঘুমাও অথচ ঝাঁকুনি পর্যন্ত অনুভব করো না। তোমরা তার উপর বসবাস কর কিন্তু অনুভব পর্যন্ত করতে পার না যে এটি মহাশূন্যে ঝুলন্ত গ্রহ আর তোমরা তাতে পা উপরে ও মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলছ। তোমরা এর পিঠের উপরে আরামে ও নিরাপদে চলাফেরা করছ অথচ এ ধারণা পর্যন্ত তোমাদের নেই যে, তোমরা বন্দুকের গুলির চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়িতে আরোহণ করে আছ। উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ : [তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।] যানুষের যানবাহন দু প্রকার। যথা− ১. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরি করে। ২. যার সৃষ্টিতে যানুষের শিল্পকৌশলের কোনো দখল নেই। 'নৌকা, বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বুঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ তা'আলার মহাঅবদান। চতুষ্পদ জন্তুর যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে সাধারণ সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, মানুষ লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টি।

قَوْلُهُ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ : [এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর।] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হলো সত্যিকার দাতা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহর দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্টজগতের নিয়ামতসমূহ মুমিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মুমিন আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু

সংবলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলাফেরার এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীন' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া : سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا [পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।] এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারির জন্তুর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারিতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে। -[তাফসীরে কুরতুবী] আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রওয়ানা হয়ে উপরিউক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বর্ণিত আছে- اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

-[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ : [আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব।] এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্র হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না।

قَوْلُهٗ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ : [নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাবে।] এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোনো সওয়ারি কাজে আসবে না।

قَوْلُهٗ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا : [তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে।] এখানে অংশ বলে সন্তান বুঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যাসন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরি হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে, কোনো প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহর মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

অনুবাদ :

১৬. اَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ وَ الْقَوْلُ مُقَدَّرٌ اَىْ تَقُوْلُوْنَ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ لِنَفْسِهٖ وَاَصْفٰكُمْ اَخْلَصَكُمْ بِالْبَنِيْنَ اللَّازِمُ مِنْ قَوْلِكُمُ السَّابِقُ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُنْكَرِ .

১৬. আল্লাহ তা'আলা কি তার সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যাসন্তান বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান? এ কথাটি তোমাদের পূর্বের কথা থেকে বুঝা যায়। اَمْ অব্যয়টি হামযায়ে ইনকার তথা অস্বীকারমূলক অর্থে ব্যবহৃত হামযার অর্থে এসেছে এবং কথাটি উহ্য অর্থাৎ اَتَقُوْلُوْنَ তথা তোমরা কি বল? এবং اَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ -এর আতফ اتَّخَذَ -এর উপর। বস্তুত এটা মুনকার তথা অশোভনীয়।

১৭. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا جَعَلَ لَهٗ شِبْهًا بِنِسْبَةِ الْبَنَاتِ اِلَيْهِ لِاَنَّ الْوَلَدَ يُشْبِهُ الْوَالِدَ الْمَعْنٰى اِذَا اُخْبِرَ اَحَدُهُمْ بِالْبِنْتِ تَوَلَّدَ لَهٗ ظَلَّ صَارَ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرَ مُغْتَمٍّ وَهُوَ كَظِيْمٌ مُمْتَلِئٌ غَمًّا فَكَيْفَ يُنْسَبُ الْبَنَاتُ اِلَيْهِ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ .

১৭. অথচ এসব লোকের অবস্থা এই যে, তারা রহমান তথা আল্লাহর জন্যে যে কন্যাসন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, কন্যাদেরকে তার দিকে নিসবত করে তাঁর شِبْهٌ তথা সদৃশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা সন্তান পিতার অনুরূপ হয়। যার অর্থ হলো, যখন তাদের ঘরে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো চিন্তাযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। তবুও সেই কন্যা সন্তানের নিসবত আল্লাহর দিকে কিভাবে করা হয়? আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র।

১৮. اَوْ هَمْزَةُ الْاِنْكَارِ وَ وَاوُ الْعَطْفِ لِجُمْلَةٍ اَىْ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَنْ يُّنَشَّؤُا اَىْ يُرَبّٰى فِى الْحِلْيَةِ الزِّيْنَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ مُظْهِرُ الْحُجَّةِ لِضُعْفِهٖ عَنْهَا بِالْاُنُوْثَةِ .

১৮. اَوْ -এর মধ্যে হামযা অস্বীকারমূলক অর্থ প্রদান করে এবং আতফের و জুমলার উপর আতফের জন্যে। অর্থাৎ তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা করে, যে অলঙ্কারে লালিতপালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম মহিলা হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতার দরুন দলিল প্রকাশ করতে অক্ষম।

১৯. وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ط اَشَهِدُوْا حَضَرُوْا خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ بِاَنَّهُمْ اِنَاثٌ وَيُسْئَلُوْنَ عَنْهَا فِى الْاٰخِرَةِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِقَابُ .

১৯. তারা ফেরেশতাগণকে যারা আল্লাহর খাস বান্দা, তাদেরকে স্ত্রীলোক গণ্য করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের এ দাবি ফেরেশতাগণ স্ত্রীলোক ছিল লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কিয়ামতের দিন এবং এর উপর শাস্তি দেওয়া হবে।

২০. وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ط اَىِ الْمَلٰئِكَةَ فَعِبَادَتُنَا اِيَّاهُمْ بِمَشِيَّتِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهَا قَالَ تَعَالٰى مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقُوْلِ مِنَ الرِّضَا بِعِبَادَتِهَا مِنْ عِلْمٍ ن اِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ط يَكْذِبُوْنَ فِيْهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمُ الْعِقَابُ بِهِ.

২০. এবং তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন যে, আমরা তাদের অর্থাৎ ফেরেশতাদের ইবাদত না করি তাহলে আমরা তাদের পূজা করতাম না। অতএব আমরা তাদের পূজা করা আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তিনি এতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ বিষয়ে ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে তাদের উক্তির বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। মিথ্যা বলে। অতএব এর বিনিময়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

২১. اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهِ الْقُرْاٰنِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ اَىْ لَمْ يَقَعْ ذٰلِكَ.

২১. আমি কি এর আগে কুরআনের আগে তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে পূজা করার অনুমোদন দেয়। অতঃপর তারা তা আঁকড়ে রেখেছে অর্থাৎ এমন হয়নি।

২২. بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ مِلَّةٍ وَاِنَّا مَاشُوْنَ عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُهْتَدُوْنَ بِهِمْ وَكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ غَيْرَ اللّٰهِ.

২২. বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এক মাজহাবে এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি তাদের বদৌলতে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করত।

২৩. وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا مُتَنَعِّمُوْهَا مِثْلَ قَوْلِ قَوْمِكَ اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ مِلَّةٍ وَاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُقْتَدُوْنَ مُتَّبِعُوْنَ.

২৩. এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোনো জনপদে কোনো সতর্কবাণী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা সুখী ব্যক্তিগণ বলেছে, তোমার গোত্রের উক্তির ন্যায় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একটি পন্থার অনুসরণ করতে দেখেছি এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি।

২৪. قُلْ لَهُمْ اَتَتَّبِعُوْنَ ذٰلِكَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَاءَكُمْ ط قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ اَنْتَ وَمَنْ قَبْلَكَ كٰفِرُوْنَ.

২৪. হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যে পথে চলতে দেখেছ আমি যদি তোমাদের তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তবুও কি তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের এ কথার অনুসরণ করবে। তারা বলত, তোমরা তুমি ও তোমার পূর্ববর্তীগণ যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করি।

২৫. قَالَ تَعَالٰى تَخْوِيْفًا لَهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اَىْ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ لِلرُّسُلِ قَبْلَكَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

২৫. আল্লাহ তাদেরকে ভয় প্রদর্শনমূলকভাবে বলেন, অতঃপর আমি তাদের আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اللَّازِمُ مِنْ قَوْلِكُمُ السَّابِقِ : قَوْل سَابِق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কার মুশরিকদের উক্তি- اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ অর্থাৎ ফেরেশতাকে যখন আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন এর দ্বারা একথা নিজে নিজেই আবশ্যক হয়ে গেল যে, ছেলে সন্তান তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। কাজেই মক্কার মুশরিকদের উক্তি- وَاَصْفَاكُمْ بِالْبَنِيْنَ -এরও যা তাদের পূর্বের উক্তির জন্য আবশ্যক, مُنْكَرٌ এবং مَذْمُوْمٌ হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِمَا ضَرَبَ : مَا مَوْصُوْلَةٌ দ্বারা بَنَاتْ উদ্দেশ্য ضَرَبَ অর্থ হলো جَعَلَ যেমনটি ব্যাখ্যাকার جَعَلَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। جَعَلَ -এর প্রথম মাফউল ، যমীর উহ্য রয়েছে। যা مَوْصُوْل -এর عَائِدْও অর্থাৎ ضَرَبَهُ আর مَثَلًا হলো দ্বিতীয় মাফউল, যা شِبْهًا অর্থে হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- جَعَلَ الْبَنَاتِ لَهُ شِبْهًا অর্থাৎ কন্যাদেরকে আল্লাহর দিকে নিসবত করে কন্যাদেরকে আল্লাহর সদৃশ করে দিল। কেননা সন্তান তো পিতার সদৃশ্যই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَوَ : এখানে হামযাটি اِنْكَار -এর জন্য হয়েছে। আর وَاوْ টি عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ -এর জন্য হয়েছে। بِجُمْلَةٍ -এর মধ্যে بَاءْ টি لَامْ অর্থে রয়েছে। بِجُمْلَةٍ টা عَطْف -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর مَعْطُوف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো يَجْعَلُوْنَ আর مَعْطُوف عَلَيْهِ ও উহ্য রয়েছে আর তা হলো يَجْتَرِئُوْنَ উহ্য ইবারত হলো

اَيَجْتَرِئُوْنَ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَنْ يَنْشَأُ فِى الْحِلْيَةِ

قَوْلُهُ يُنَشَّؤُ : এটা বাবে تَفْعِيل -এর تَنْشِئَةٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُول -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থ- সে লালনপালন পায়। এই অনুবাদ مِنْ -এর শব্দের হিসাব করার সুরতে। আর অর্থের হিসেবে অর্থ হবে- সে লালিত পালিত হয়।

قَوْلُهُ غَيْرُ مُبِيْنٍ مُظْهِرُ الْحُجَّةِ : مُبِيْن -এর তাফসীর مُظْهِرْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مُبِيْن টা এখানে اِبَان মুতা'আদ্দী হতে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَعَلُوْا الْمَلَائِكَةَ : এখানে جَعَلَ টা قَالَ ও حَكَمْ অর্থে হয়েছে। বলা হয়- جَعَلْتُ زَيْدًا اَعْلَمَ النَّاسِ অর্থাৎ যায়েদের ব্যাপারে আমি اَعْلَمُ النَّاسِ -এর হুকুম লাগিয়েছি।

قَوْلُهُ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ : شَاءَ -এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ عَدَمَ عِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ مَا عَبَدْنَاهُمْ

قَوْلُهُ اِنَّا مَاشُوْنَ عَلَى اٰثَارِهِمْ : এখানে مَاشُوْنَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلٰى اٰثَارِهِمْ টা مَاشُوْنَ উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ এবং اِنَّ -এর خَبَرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ : অর্থাৎ اَلْاَمْرُ كَمَا ذُكِرَ অর্থাৎ নারীরা সাধারণত দলিল-প্রমাণে অক্ষম ও দুর্বল হয়ে থাকে مَا اَرْسَلْنَا হলো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ ; اَتَتَّبِعُوْنَ এটা এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, হামযাটা উহ্য ফে'লের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর وَاوْ টা حَالِيَهْ হয়েছে। অর্থাৎ اَتَقْتَدُوْنَ بِاٰبَائِكُمْ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى الخ اَىْ بِدِيْنٍ لَاَهْدٰى وَاَصْوَبُ مِمَّا وَجَدْتُمْ الخ ইসমে তাফযীলের ব্যবহার اِرْخَاءُ عِنَانٍ এবং مُخَاطَبْ -এর কথা বড় করার ভিত্তিতে হয়েছে। অন্যথায় তাদের দীন ও পদ্ধতিতে শুরু থেকেই হেদায়েত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ : [যে অলংকার ও সাজসজ্জায় লালিতপালিত হয়] এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলঙ্কার ব্যবহার এবং শরিয়তসম্মত সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েজ। এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনীতে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

قَوْلُهُ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ : [এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।] উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোনো কোনো নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকে হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থি হবে না। কেননা অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ : অর্থাৎ যদি শিরক এত মন্দ কাজই হয় তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিরক করার শক্তি কেন দিয়েছেন? তাঁর যদি মর্জি হতো তবে তিনি আমাদেরকে এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কাফেররা ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলোক সাব্যস্ত করেছে, এরপর তাদের মূর্তি তৈরি করেছে এবং ঐ মূর্তিগুলোর পূজা করেছে, এতসব অন্যায়ের পর বলছে যে, যদি এটি অন্যায় হতো তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারতেন। যেহেতু তিনি আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখেননি এবং এসব গর্হিত কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আমাদের এহেন কর্মে রাজি আছেন।

তাদের এ ভিত্তিহীন উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ অর্থাৎ 'মূলত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে।'

যারা মূর্খ, নির্বোধ তারাই এমন ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অসুন্দর উক্তি করতে পারে। কেননা মানুষকে যে দুনিয়াতে ভালোমন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার কারণ হলো এই যে, আখিরাতে তাদেরকে ভালো কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং মন্দকাজের জন্যে শাস্তি দেওয়া হবে। যদি তাদের কর্মের স্বাধীনতা না থাকত এবং তারা যন্ত্রের ন্যায় কাজ করত, তবে ছওয়াব বা আজাবের প্রশ্নই উঠত না। তাই কাফেরদের এই উক্তি "শিরক যদি আল্লাহ পাকের এত অপছন্দনীয়ই হয় তাহলে কাফেরদের তার শক্তি কেন দিলেন?" -নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত। সত্যের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।

যদি কাফেরদের এ খোঁড়া যুক্তি মেনে নেওয়া হয়, তবে পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অপ্রিয়, অপছন্দনীয় কোনো কাজেই থাকবে না, দুরাত্মা পাপিষ্ঠরা তাদের সকল অন্যায় আচরণের পক্ষে এ যুক্তিই পেশ করবে।

قَوْلُهُ أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ : 'আমি কি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছে? অর্থাৎ কাফেরদের কুফর ও শিরকের পক্ষে তারা যে খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করেছে, তা তো ধোপে টিকল না। এখন জিজ্ঞাসা করি, তাদের অপকর্মের পক্ষে আল্লাহ পাকের প্রেরিত কোনো কিতাব রয়েছে কি, যা তিনি পবিত্র কুরআন নাজিল করার পূর্বে তাদেরকে দান করেছেন? আর একথা সর্বজনবিদিত যে, সারা পৃথিবীতে খুঁজেও তারা এমন দলিল হাজির করতে পারবে না। কুরআনে করীমের একাধিক স্থানে কাফেরদেরকে শিরকের পক্ষে দলিল পেশ করার জন্যে বারংবার তাগিদ করা হয়েছে; কিন্তু তারা তা পেশ করতে সর্বদা অক্ষম রয়েছে। যে সব আসমানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুগে নাজিল হয়েছে, সেগুলোতেও তাদের পূজা অর্চনার পক্ষে কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণই এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র সম্বল। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

بَلْ قَالُوْا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى آثٰرِهِمْ مُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ 'বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহকে একই পথে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিক পথ পাব'।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় তারা উপস্থিত ছিল না, একথা চির সত্য, দ্বিতীয়ত শিরক কুফরের পক্ষে তাদের নিকট কোনো কিতাব বা দলিল নেই, শুধু তাদের মূর্খ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের কারণেই তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকে। আর যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর, তাই সত্যের আহ্বানে তারা সাড়া দেয় না, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা তারা গ্রহণ করে না। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি তারা ঈমান আনে না বরং তাঁর বিরোধিতায় তারা তৎপর থাকে।

২৬. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ اَىْ بَرِئٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۙ

২৭. اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ خَلَقَنِىْ فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ يُرْشِدُنِىْ لِدِيْنِهِ ۔

২৮. وَجَعَلَهَا اَىْ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنْ قَوْلِهِ اِنَّنِىْ اِلَى سَيَهْدِيْنِ كَلِمَةً ۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهِ ذُرِّيَّتِهِ فَلَا يَزَالُ فِيْهِمْ مَنْ يُوَحِّدُ اللّٰهَ لَعَلَّهُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ يَرْجِعُوْنَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ اِلَى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَبِيْهِمْ ۔

২৯. بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ اَلْمُشْرِكِيْنَ وَاٰبَاءَهُمْ وَلَمْ اُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ الْقُرْاٰنُ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ مُظْهِرٌ لَهُمُ الْاَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ۔

৩০. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ الْقُرْاٰنُ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۔

৩১. وَقَالُوْا لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ مِنْ اَىْ مِنْهُمَا عَظِيْمٍ اَىْ اَلْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بِمَكَّةَ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ الثَّقَفِىُّ بِالطَّائِفِ ۔

অনুবাদ :

২৬. এবং আপনি স্মরণ করুন, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের দাসত্ব কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ আমি এটা থেকে পবিত্র।

২৭. তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন তাঁরই ধর্মের দিকে।

২৮. তিনি এ কথাটি অর্থাৎ তার উক্তি إِنَّنِىْ بَرِئٌ থেকে سَيَهْدِيْنِ পর্যন্ত জ্ঞাত কালিমায়ে তাওহীদ কে তার পরবর্তী তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অক্ষয় বাণীরূপে রেখে গেছে, অতএব সর্বদা তাদের মধ্যে একত্ববাদের বিশ্বাসী বিদ্যমান থাকবে যাতে তারা মক্কাবাসীগণ বর্তমান তাদের ধর্ম থেকে তাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের দিকে ফিরে আসে।

২৯. বরং আমি এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে মক্কার মুশরিকদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি। তাদের শাস্তির ব্যাপারে দ্রুত করিনি। অবশেষে তাদের নিকট সত্য কুরআন ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল তাদের নিকট আহকামে শরাইয়্যাহকে স্পষ্ট বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আগমন করেছেন।

৩০. যখন সত্য কুরআন তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা জাদু এবং আমরা একে অস্বীকারকারী।

৩১. তারা বলে, এই কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর মক্কার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং তায়েফের উরওয়া ইবনে মাসঊদ সাকাফীর উপর অবতীর্ণ হলো না?

٣٢. اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط اَلنُّبُوَّةَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ غَنِيًّا وَبَعْضَهُمْ فَقِيْرًا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بِالْغِنٰى فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ اَلْغَنِيُّ بَعْضًا اَلْفَقِيْرُ سُخْرِيًّا ط مُسَخَّرًا فِى الْعَمَلِ لَهُ بِالْاُجْرَةِ وَالْيَاءُ لِلنَّسَبِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اَىِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ فِى الدُّنْيَا.

৩২. তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত নবুয়ত বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে দুনিয়ার জীবনে যাপনের উপায়-উপকরণ বণ্টন করে দিয়েছি অতএব আমি তাদের মধ্যে কাউকে ধনী ও কাউকে ফকির করে দিয়েছি এবং এদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের উপর অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে ধনীরা অপরের গরীবদের সেবা গ্রহণ করতে পারে। ধনীরা গরিবদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাটাতে পারে। سُخْرِيًّا -এর মধ্যে ى নিসবতী এবং অন্য কেরাত মতে س -এর মধ্যে যের। তারা যে সম্পদ দুনিয়াতে অর্জন করছে আপনার রবের রহমত অর্থাৎ জান্নাত তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

٣٣. وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ بَدَلٌ مِنْ لِمَنْ سُقُفًا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَسُكُوْنِ الْقَافِ وَبِضَمِّهِمَا جَمْعًا مِنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ كَالدَّرَجِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ يَعْلُوْنَ اِلَى السَّطْحِ.

৩৩. সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী কুফরের উপর হয়ে যাওয়ার যদি আশঙ্কা না থাকত, তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরি করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় উঠে, সেই সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম রৌপ্য নির্মিত। لِبُيُوْتِهِمْ টি مِنْ থেকে بَدَلٌ এবং سُقُفًا -এর س ফাতাহ ও ق সাকিন বা উভয়টি পেশ -এর সাথে বহুবচন হিসেবে।

٣٤. وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا مِنْ فِضَّةٍ وَّ جَعَلْنَا لَهُمْ سُرُرًا مِنْ فِضَّةٍ جَمْعُ سَرِيْرٍ عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ.

৩৪. এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজাসমূহ দিতাম রৌপ্য নির্মিত এবং যে সিংহাসনের উপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য বানিয়ে দিতাম سُرُرٌ শব্দটি سَرِيْرٌ -এর বহুবচন।

٣٥. وَزُخْرُفًا ط ذَهَبًا اَلْمَعْنٰى لَوْلَا خَوْفُ الْكُفْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ اِعْطَاءِ الْكَافِرِ مَا ذُكِرَ لَاَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ لِقِلَّةِ خَطَرِ الدُّنْيَا عِنْدَنَا وَعَدَمِ حَظِّهِ فِى الْاٰخِرَةِ فِى النَّعِيْمِ.

৩৫. এবং স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। যার ভাবার্থ হলো, উল্লিখিত বস্তুসমূহ কাফেরদের দেওয়ার দরুন মুমিনদের ব্যাপারে যদি কুফরির আশঙ্কা না থাকত, তবে এসব জিনিস আমি কাফেরদেরকে দিতাম, আমার নিকট দুনিয়ার সম্পদের কোনো মর্যাদা না থাকার কারণে ও কাফেরদের জন্যে আখিরাতের নিয়ামতের কোনো মর্যাদা না থাকার কারণে।

وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَا بِالتَّخْفِيْفِ فَمَا زَائِدَةٌ وَبِالتَّشْدِيْدِ بِمَعْنَى إِلَّا فَإِنْ نَافِيَةٌ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا ثُمَّ يَزُوْلُ وَالْآخِرَةُ الْجَنَّةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ .

এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র, দুনিয়াতে উপভোগ করবে অতঃপর শেষ হয়ে যাবে। إِنْ অব্যয়টি مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ ও لَمَا তাশদীদবিহীন এবং مَا যায়েদাহ এবং তাশদীদের সাথে إِلَّا -এর অর্থে, অতএব إِنْ নাফিয়াহ আর আখিরাত জান্নাত আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই, যারা ভয় করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَرَاءٌ : এটা মাসদার, অর্থ- অসন্তুষ্ট হওয়া, ঘৃণা করা। মুফাসসির (র.) بَرِئٌ দ্বারা তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَرَاءٌ টি بَرِئٌ -এর স্থলে নিহত যা فَعِيْلٌ এখানে হয়েছে অসন্তুষ্টি প্রকাশকারী। মাসদার যখন সিফত হয় তখন وَاحِدٌ، تَثْنِيَةٌ، جَمْعٌ، مُذَكَّرٌ، مُؤَنَّثٌ সব একই ধরনের হয়।

قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ : এতে তিনটি সুরত হতে পারে, যথা–

১. مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ لٰكِنَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ এটা সেই সুরতে হবে যে, সে শুধু মূর্তিদেরই উপাসনা করে।

২. مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ এই সুরতে হবে, যখন আল্লাহর সাথে মূর্তিদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।

৩. إِلَّا টা صِفَتِىْ বা غَيْرُ অর্থে হবে, এটা যমখশরী (র.)-এর অভিমত।

قَوْلُهُ جَعَلَهَا اَىْ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ الْمَفْهُوْمِ الخ : প্রশ্ন اَىْ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ الخ বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো جَعَلَهَا -এর যমীরের مَرْجِعٌ কি? যদি كَلِمَةٌ হয় তবে পূর্বে উল্লেখ নেই।

উত্তর. كَلِمَةٌ পূর্বে যদিও উল্লেখ নেই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি– إِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ থেকে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ بَلْ هٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে بَلْ হলো إِضْرَابٌ اِنْتِقَالِىْ -এর জন্য। তাদের অনুসরণ না করার উপর ধমক হয়েছে। هٰؤُلَاءِ ইসমে ইশারার مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো সে সকল মুশরিক, যারা নবী করীম ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান ছিল।

قَوْلُهُ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ : এটা উহ্য উহ্য ইবারত হলো- بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ فَاشْتَغَلُوْا بِذٰلِكَ التَّمَتُّعِ حَتّٰى جَاءَهُمُ الخ -এর غَايَتْ।

قَوْلُهُ مَعَارِجَ : এটা مِيْمٌ মি'রাজ مِعْرَجٌ বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতসহ -এর বহুবচন। সিঁড়িকে مَعَارِجُ বলার কারণ হলো সিঁড়িতে লেংড়ার মতো আরোহণ করে থাকে। আর লেংড়াকে اَعْرَجُ বলে।

قَوْلُهُ سُرُرًا : এটা উহ্য ফে'লের মাফউল। যেমনটি মুফাসসির (র.) جَعَلْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। এর আতফ হয়েছে جَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ -এর উপর।

قَوْلُهُ زُخْرُفًا : এটা উহ্য جَعَلْنَا ফে'লের কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ جَعَلْنَا لَهُمْ مَعَ ذٰلِكَ زُخْرُفًا অথবা نَزْعِ خَافِضٍ -এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে উহ্য ইবারত এই ছিল যে– اَبْوَابًا وَسُرُرًا مِنْ فِضَّةٍ وَّمِنْ ذَهَبٍ এখানে مِنْ -কে ফেলে দেওয়ার কারণে زُخْرُفًا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ : إِنْ টা হলো نَافِيَةٌ আর كُلُّ ذٰلِكَ হলো মুবতাদা আর لَمَّا [তাশদীদসহ] إِلَّا অর্থে হয়েছে। مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তার খবর لَمَا -কে تَخْفِيْفٌ -এর সাথেও পড়া হয়েছে। সে সময় إِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ مُهْمَلَةٌ হবে, আর لَامٌ টা إِنْ مُخَفَّفَةٌ এবং نَافِيَةٌ -এর মাঝে পার্থক্যকারী হবে। আর مَا অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ وَالْاٰخِرَةُ : এখানে وَاوْ টি حَالِيَةٌ আর اَلْاٰخِرَةُ হলো মুবতাদা عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ উভয়ের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোনো দলিল নেই। বলা বাহুল্য সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যার সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর, তিনি কেবল তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন– اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।
এ থেকে আরো জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যানধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশঙ্কা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে না; বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরি হবে। সে মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং মুখে সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতাও ঘোষণা করেছেন।

قَوْلُهُ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ : [তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।] উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেননি; বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার অসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থি ছিল স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।
এ থেকে আরো জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্তুতিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কেও কুরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার অসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোনো সাম্ভাব্য উপায়ে সন্তানসন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরি, তেমনি পয়গাম্বরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়েখ আব্দুল্লাহ ওয়াহহাব শা'রানী (র.) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকারী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তাই এই যে, পিতা মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয় হলো– এই সহজ পদ্ধতির প্রতি আজকাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতামাতাই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রাসূল কোনো মানুষ হতে পারেন। কুরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করছে যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -কে কিরূপে রাসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতোই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কুরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হলো যে, কেবল মুহাম্মদ ﷺ -ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত যত পয়গাম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোনো মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোনো বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হলো না কেন? মুহাম্মদ ﷺ তো কোনো প্রভাবশালী বা ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী, হাবীব ইবনে আমর ছাকাফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।
–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী

মুশরিকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা দুটি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জবাব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জবাব এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জবাবের সারমর্ম এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই যে, আল্লাহ কাকে নবুয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয়তের বণ্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের অভিমত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুয়ত বণ্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্য নয়। নবুয়ত বণ্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা- অস্তিত্বও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বণ্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেননি; বরং এ কাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুয়ত বণ্টনের মতো মহান কাজ কিরূপে তোমাদরে হাত সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জবাব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরি।

قَوْلُهُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ الخ : **জীবিকা বণ্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন- نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মেটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জীবিকা বণ্টনের কাজ [সোশলিজমের ন্যায়] কোনো ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি? সেগুলো কিভাবে মেটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বণ্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতো অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনাআপনিই এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষীতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রপ্তানির' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রপ্তানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানি ও রপ্তানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন বণ্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বণ্টনের কাজ কোনো মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন? এর মাধ্যমে জীবিকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রয়োজন জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয়াদি সাধারণত স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে সোর্পদ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণত দিন কাজের জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোনো চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি; বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে? এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং এতে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারো মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণত কেউ জ্ঞান ও কারিগরির কোনো বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও

অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে। তাই ইরশাদ হচ্ছে– كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্র করে অপরের জন্য রিজিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও জাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূল্যোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনো ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ : সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য : وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আমি একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক এ অর্থে সামাজিক সাম্য কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন। আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি, তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টজীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েজ ও নাজায়েজের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোনো কোনো জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোনো কোনোটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনোটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বরে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গাম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনো ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোনো যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতি যুগে [পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে] যে সাম্যের দাবি করে, তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত? এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও

কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘণ্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরুদায়িত্বের সমান হতে পারে না। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘণ্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরের আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বণ্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্য প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বণ্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোনো মাপকাঠি আছে কি, যা দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানববুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানি ও রপ্তানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময়ে তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানি সমান হলে কেউ কারো কাজে আসত না। তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রপ্তানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তারা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত হালাল-হারাম ও জায়েজ নাজায়েজের সুদূরপ্রসারী বিধিবিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আচরণাবলি ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনো কোনো স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামি সাম্যের অর্থ : উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান। এ বিষয়ের কেনো অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে

অর্জন করবে, আর গরিব বেচারা তার অধিকার অর্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে. আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরিবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন– وَاللّٰهِ مَا عِنْدِيْ أَقْوٰى مِنَ الضَّعِيْفِ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ لَهٗ وَلَا عِنْدِيْ اَضْعَفُ مِنَ الْقَوِيِّ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামি সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি এবং ইজারাদারি ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া জাকাত, ওশর, খারাজ, ভরণপোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এতসবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তানসন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় : কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোনো বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গাম্বর করা হলো কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধনদৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা ধনদৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মশার একটি ডানার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্যও কোনো শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা আত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ ﷺ -এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

অনুবাদ :

٣٦. وَمَنْ يَعْشُ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ الْقُرْاٰنِ نُقَيِّضْ نُسَبِّبْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ لَا يُفَارِقُهُ.

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের কুরআনের স্মরণ থেকে গাফেল থাকে বিরত থাকে আমি তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, নিয়োজিত করে দেই যে তার বন্ধু হয়ে যায়। সে তার থেকে পৃথক হয় না।

٣٧. وَاِنَّهُمْ اَىِ الشَّيَاطِيْنَ لَيَصُدُّوْنَهُمْ اَىِ الْعَاشِيْنَ عَنِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْهُدٰى وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ فِى الْجَمْعِ رِعَايَةُ مَعْنٰى مَنْ.

৩৭. এবং শয়তানরাই এসব গাফেল মানুষকে হেদায়েতের রাস্তা থেকে বাধা দান করে এবং তারা মনে করে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে। مُهْتَدُوْنَ -কে বহুবচন এনেছে مَنْ -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে।

٣٨. حَتّٰى اِذَا جَاءَنَا الْعَاشِىْ بِقَرِيْنِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ لَهُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ اَىْ مِثْلَ بُعْدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ اَنْتَ لِىْ.

৩৮. অবশেষে যখন সে গাফেল ব্যক্তি তার বন্ধুসহ কিয়ামতের দিন আমার নিকট আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে "হায়, যদি আমার ও তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো" অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যত দূরত্ব সে পরিমাণ দূরত্ব হতো। يا অব্যয়টি সতর্ক করার অর্থে। কত জঘন্যতম সাথী সে। অর্থাৎ তুমি আমার জন্যে কতই জঘন্যতম সাথি।

٣٩. قَالَ تَعَالٰى وَلَنْ يَّنْفَعَكُمْ اَىِ الْعَاشِيْنَ تَمَنِّيْكُمْ وَنَدَمُكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَىْ تَبَيَّنَ لَكُمْ ظُلْمُكُمْ بِالْاِشْرَاكِ فِى الدُّنْيَا اَنَّكُمْ مَعَ قُرَنَائِكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ عِلَّةٌ بِتَقْدِيْرِ اللَّامِ لِعَدَمِ النَّفْعِ وَاِذْ بَدَلٌ مِنَ الْيَوْمِ.

৩৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে গাফেলরা! আজ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, তোমাদের আফসোস ও আরজু তোমরা যখন জুলুম করেছো। অর্থাৎ দুনিয়াতে শিরকের মাধ্যমে তোমাদের জুলুম যখন প্রকাশ হয়েছে নিশ্চয় তোমরা তোমাদের বন্ধুসহ আজাবে সমানভাবে শরিক থাকবে। এটা উহ্য ل -এর সাথে উপকার না হওয়ার কারণ বুঝাচ্ছে এবং اِذْ -টি اَلْيَوْمَ থেকে بَدَلٌ -

٤٠. اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ اَىْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

৪০. আপনি কি বধিরদের শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? অর্থাৎ তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।

٤١. فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ نَذْهَبَنَّ بِكَ بِاَنْ نُمِيْتَكَ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ.

৪১. অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তাদেরকে আজাব দেওয়ার পূর্বে আপনার মৃত্যু দান করি তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব আখিরাতে। اِمَّا শব্দটি اِنْ شَرْطِيَّة ও مَا যায়েদাহ দ্বারা যৌগিক। ن -কে م -এর মাধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

٤٢. أَوْ نُرِيَنَّكَ فِيْ حَيٰوتِكَ الَّذِيْ وَعَدْنَاهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ عَلٰى عَذَابِهِمْ مُقْتَدِرُوْنَ قَادِرُوْنَ.

৪২. অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে আপনার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই, তবুও তাদেরকে আজাব দেওয়ার উপর তাদের প্রতি আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

٤٣. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ ج أَيِ الْقُرْاٰنُ إِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْمٍ.

৪৩. অতএব আপনার প্রতি যে ওহি কুরআন নাজিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন।

٤٤. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ج لِنُزُوْلِهِ بِلُغَتِهِمْ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ.

৪৪. এ কিতাব আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক বড় একটি মর্যাদা এটা তাদরে ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার দরুন এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন এটার হক আদায়ের ব্যাপারে।

٤٥. وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اَىْ غَيْرِهِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ قِيْلَ هُوَ عَلٰى ظَاهِرِهِ بِأَنْ جُمِعَ لَهُ الرُّسُلُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ أُمَمُ مَنْ اَىْ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ وَلَمْ يَسْأَلْ عَلٰى وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأَمْرِ بِالسُّؤَالِ التَّقْرِيْرُ لِمُشْرِكِيْ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَا كِتَابٌ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ.

৪৫. আপনার পূর্বে যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের জন্যে আমি কি কোনো উপাস্য স্থির করেছিলাম? বর্ণিত আছে যে, এটা তার প্রকাশ্য অর্থ মতো। অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রে সকল নবীকে একত্র করা হয়েছে। অন্য বর্ণনা মতে, এখানে উদ্দেশ্য দুই আহলে কিতাব থেকে কোনো এক উম্মত। উভয় বর্ণনার কোনো মত অনুযায়ী তিনি [নবী করীম ﷺ] প্রশ্ন করেননি। কেননা জিজ্ঞাসা করার হুকুম থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশ মুশরিকদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো কিতাব ও রাসূল আসেননি, যিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনার আদেশ দেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَعْشُ : يَدْعُوْ دَعَا -এর মতো عَشْوًا، عَشْيًا، يَعْشُوْ، عَشَا বাবে نَصَرَ থেকে مَاضِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ বিরত থাকা, বিমুখ থাকা مَنْ يَعْشُ অর্থ– যে বিমুখ থাকবে।

قَوْلُهُ نُقَيِّضْ : এটা جَوَاب شَرْط আর يَعْشُ হলো فِعْل شَرْط যা مَجْزُوْم হওয়ার কারণে শেষের وَاوْ পড়ে গেছে। আর ضَمَّة টা তা বুঝাচ্ছে। আর مَنْ হলো حَرْف شَرْط আর نُقَيِّضْ টা বাবে تَفْعِيْل হতে مُضَارِعْ -এর جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ– আমরা مُقَدَّرْ করে দিচ্ছি, কারণ বানিয়ে দিচ্ছি।

قَوْلُهُ إِنَّهُمْ : এখানে هُمْ -এর مَرْجِعْ হলো শয়তান। শয়তান যেহেতু جِنْس এজন্য যমীরকে বহুবচন আনা হয়েছে। আর যেখানে যমীরকে مُفْرَدْ নেওয়া হয়ে সেখানে شَيْطَانْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে নেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে। مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এই তিন স্থানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। -[صَاوِيْ]

قَوْلُهُ بِقَرِيْنَةٍ : অর্থাৎ مَعَ قَرِيْنَةٍ

قَوْلُهُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ : يَا টা تَنْبِيْه -এর জন্যও হতে পারে যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিতও করেছেন। আবার يَا টা نِدَائِيَّه -ও হতে পারে مُنَادٰى উহ্য হবে। অর্থাৎ يَا قَرِيْنُ ، لَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ الخ

قَوْلُهُ تَمَنِّيْكُمْ وَنَدَمُكُمْ : এটা جُمْلَه مَعْطُوْفَه হয়ে يَنْفَعُكُمْ -এর فَاعِل হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبَيَّنَ لَكُمْ ظُلْمُكُمْ : এ ইবারত দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে।

সংশয় : ظُلْم তথা কুফর ও শিরক পৃথিবীতে হয়েছে। কেননা اِذْ টা مَاضِيْ -এর জন্য ظَرْف আর اَلْيَوْمَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতের দিন যা اِذْ থেকে بَدَل হয়েছে; কাজেই مَاضِيْ কিভাবে حَال থেকে بَدَل হতে পারে?

নিরসন : تَبَيَّنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ظُلْم -এর প্রকাশ আর এটা কিয়ামতের দিনই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ : **আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ :** আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ অর্থাৎ কুরআন ও ওহি থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -[কুরতুবী]

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে খুব ভালো কাজ করছে। -[কুরতুবী]

এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মতো লেগেই থাকে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ : এ আয়াতের দুরকম তাফসীর হতে পারে- ১. যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমার থেকে দূরে থাকত! কেননা, তখন তোমরা সবাই আজাবে শরিক থাকবে। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ-এর অর্থ হবে لِاَنَّكُمْ

২. দ্বিতীয় সম্ভাব্য তাফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আজাবে শরিক হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরিক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয়; কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারো দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আজাবে শরিক হওয়া কোনো উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ হবে يَنْفَعُ ক্রিয়ার কর্তা।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ : **সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয় :** ইরশাদ হচ্ছে- وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ [এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।] ذِكْر -এর অর্থ এখানে সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দোয়া করেছিলেন- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ -[তাফসীরে কাবীর] কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের বদৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং এতে পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারো কারো মতে কুরাইশ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনর পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ।

قَوْلُهُ وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا : [আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গাম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।] এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেওয়া হলো? কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর জবাবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা যদি মু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মি'রাজ রজনীতে সকল পয়গাম্বরের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গাম্বরগণের ইমামত শেষে তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গাম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তাওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

বর্তমান তওরাতে আছে যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউ নেই। -[এস্তেছনা ৩৫-৪]

শোন হে ইসরাঈল! খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা। -[এস্তেছন ৪-৬]

হযরত আশিইয়া (রা.)-এর সহীফায় আছে-

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোনো খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই । -[ইয়াহিয়া ৬-৫: ৪৫]

হযরত ঈসা (আ.)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে "হে ইসরাঈল, শোন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালোবাস।

-[মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬]

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন, এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহকে এবং ঈসা মসীহকে যাকে তুমি প্রেরণ করেছ চিনবে -[ইউহান্না ৩-১৭]

অনুবাদ :

৪৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ اَىِ الْقِبْطِ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ সহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কিবতীদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর তিনি বলেছিলেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার রাসূল।

৪৭. فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ الدَّالَّةِ عَلٰى رِسَالَتِهٖ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ۔

৪৭. অতঃপর তিনি যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ যা তাঁর রিসালতের উপর দলিল বহন করে উপস্থাপন করলেন, তখন তারা বিদ্রূপ করতে লাগল

৪৮. وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيَاتِ الْعَذَابِ كَالطُّوْفَانِ وَهُوَ مَاءٌ دَخَلَ بُيُوْتَهُمْ وَوَصَلَ اِلٰى حُلُوْقِ الْجَالِسِيْنَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَالْجَرَادُ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز قَرِيْنَتِهَا الَّتِىْ قَبْلَهَا وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ عَنْ كُفْرِهِمْ۔

৪৮. আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, আজাবের নিদর্শনসমূহ থেকে যেমন– তুফান ও জলোচ্ছ্বাস। এমন পানির সয়লাব যা তাদের ঘরে প্রবেশ করে ও তাদের গলা পরিমাণ পানি বৃদ্ধি পায়; সাতদিন পর্যন্ত পানি স্থির থাকে এবং পঙ্গপালের উপদ্রব ইত্যাদি। তাই হতো তুলনামূলক বৃহৎ পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা। আমি তাদেরকে আজাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে। তাদের কুফর থেকে বিরত থাকে।

৪৯. وَقَالُوْا لِمُوْسٰى لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ اَىِ الْعَالِمُ الْكَامِلُ لِاَنَّ السِّحْرَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ عَظِيْمٌ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج مِنْ كَشْفِ الْعَذَابِ عَنَّا اِنْ اٰمَنَّا اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ اَىْ مُؤْمِنُوْنَ۔

৪৯. যখন তারা আজাব দেখত তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলত, হে জাদুকর বড় জ্ঞানী, কেননা তাদের নিকট জাদুই বড় জ্ঞান। তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয়ে প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। অর্থাৎ যদি আমরা ঈমান গ্রহণ করি আমাদের থেকে আজাব দূর করার ওয়াদা আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বনকারী অর্থাৎ ঈমান গ্রহণকারী।

৫০. فَلَمَّا كَشَفْنَا بِدُعَاءِ مُوْسٰى عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ وَيُصِرُّوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ۔

৫০. অতএব যখন আমি হযরত মূসার দোয়ায় তাদের থেকে আজাব সরিয়ে দিতাম, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করত ও তাদের কুফরির উপর বহাল থাকত।

৫১. وَنَادٰى فِرْعَوْنُ اِفْتِخَارًا فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ اَىْ مِنَ النِّيْلِ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَىْ تَحْتَ قُصُوْرِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ط عَظَمَتِىْ۔

৫১. ফেরাউন গর্বের স্বরে তার সম্প্রদায়কে ঘোষণা করলো হে আমার জনগণ! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এবং এই নদীগুলো যেমন নীলনদ কি আমার অধীনে আমার দালানের নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা আমার বড়ত্ব দেখতে পাচ্ছ না?

৫২. أَمْ تُبْصِرُونَ وَحِينَئِذٍ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا أَيْ مُوسَى الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ضَعِيفٌ حَقِيرٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ يُظْهِرُ كَلَامَهُ لِلُثْغَةِ بِالْجَمْرَةِ الَّتِي تَنَاوَلَهَا فِي صِغَرِهِ.

৫২. তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ এই মূসা থেকে, যে হীন ও নগণ্য দুর্বল, তুচ্ছ। এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না। বাল্যকালে তাঁর মুখে যে তোতলামি সৃষ্টি হয় তার কারণে।

৫৩. فَلَوْلَا هَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ جَمْعُ أَسْوِرَةٍ كَأَغْرِبَةٍ جَمْعُ سِوَارٍ كَعَادَتِهِمْ فِيمَا يُسَوِّدُونَهُ أَنْ يُلْبِسُوهُ أَسْوِرَةَ ذَهَبٍ وَيُطَوِّقُوهُ طَوْقَ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ مُتَتَابِعِينَ يَشْهَدُونَ بِصِدْقِهِ.

৫৩. তার কাছে কেন স্বর্ণের বালা পাঠানো হলো না? যদি তিনি তাঁর নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হন। أَسَاوِرُ শব্দটি أَسْوِرَةٌ -এর বহুবচন। যেমন أَسْوِرَةٌ শব্দটি سِوَارٌ -এর বহুবচন। যেমন তাদের রীতি ছিল যে, যাকে তারা নেতা নির্বাচিত করত তাকে তারা স্বর্ণের বালা ও হার ইত্যাদি পরিধান করাত। অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? যারা একের পর এক তার সত্যবাদিতার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে।

৫৪. فَاسْتَخَفَّ اسْتَفَزَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فِيمَا يُرِيدُ مِنْ تَكْذِيبِ مُوسَى إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.

৫৪. অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল যা সে তাদের নিকট কামনা করল অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করা। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

৫৫. فَلَمَّا آسَفُونَا أَغْضَبُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.

৫৫. অতঃপর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।

৫৬. فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا جَمْعُ سَالِفٍ كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ أَيْ سَابِقِينَ عِبْرَةً وَّمَثَلًا لِلْآخِرِينَ بَعْدَهُمْ يَتَمَثَّلُونَ بِحَالِهِمْ فَلَا يُقْدِمُونَ عَلَى مِثْلِ أَفْعَالِهِمْ.

৫৬. অতঃপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীতলোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে। سَلَفٌ টি سَالِفٌ -এর বহুবচন যেমন- خَدَمٌ টি خَادِمٌ -এর বহুবচন। পরবর্তীলোক যেন তাদের ন্যায় কর্মের অনুসরণ না করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এ কাহিনী বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সূরা ত্বা-হা এবং সূরা কাসাসে বিস্তারিতভাবে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে, আয়াতের অর্থ হলো এই–

فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لِتُؤْمِنَ بِهِ وَتُرْسِلَ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِأٰيٰتِنَا : فَا টা হলো আতেফা এর مُقَدَّرٌ -এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَنْكُثُوْنَ : এটা বাবে نَصَرَ -এর نَكْثٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ- ভাঙতে থাকে, ভেঙে দেওয়া।

قَوْلُهُ سَلَفًا : মুফাসসির (র.) سَالِفٌ -এর বহুবচন বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, سَلَفًا মাসদার নয় যে, ব্যাখ্যার / তাবীলের প্রয়োজন পড়বে; বরং سَلَفًا এটা سَالِفٌ -এর বহুবচন, যেমন خَدَمٌ এটা خَادِمٌ -এর বহুবচন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا الخ : হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিশর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোনো কাজে আসল না; বরং সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হলো, তেমনি মক্কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ : [এবং সে কথার শক্তি রাখে না] যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামি দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে "কথা বলার শক্তি" বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বুঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা হযরত মূসা (আ.) দলিল-প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা- জওয়াব করে দিয়েছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ : এর দু-রকম অনুবাদ হতে পারে- ১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল। (طَلَبَ مِنْهُمُ الْخِفَّةَ فِيْ مُطَاوَعَتِهِ) ২. সে তার সম্প্রদায়কে বেকুব পেল। (وَجَدَهُمْ خَفِيْفَةَ أَحْلَامِهِمْ)

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا : এটা أَسَفٌ থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ- অনুতপ্ত। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো- "অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল।" অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণত এভাবে করা হয়- যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ তা'আলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে- তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٥٧. وَلَمَّا ضُرِبَ جُعِلَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً حِيْنَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ رَضِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ اٰلِهَتُنَا مَعَ عِيْسٰى لِاَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِذَا قَوْمُكَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْهُ مِنَ الْمَثَلِ يَصُدُّوْنَ يَضِجُّوْنَ فَرَحًا بِمَا سَمِعُوْهُ.

৫৭. এবং যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হলো. অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অবতীর্ণ হয় তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আমাদের মাবুদও ঈসা (আ.)-এর সাথে জাহান্নামে হবে। কেননা আল্লাহ ব্যতীত তাঁরও উপাসনা করা হতো। তখনই আপনার সম্প্রদায় মুশরিকগণ এই দৃষ্টান্ত শুনে হট্টগোল শুরু করে দিল। অর্থাৎ তারা যা শুনেছে তাতে তারা হৈচৈ শুরু করে দিল।

٥٨. وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ط اَىْ عِيْسٰى فَنَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ اٰلِهَتُنَا مَعَهُ مَا ضَرَبُوْهُ اَىِ الْمَثَلَ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً ط خُصُوْمَةً بِالْبَاطِلِ لِعِلْمِهِمْ اَنَّ مَا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ فَلاَ يَتَنَاوَلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ج شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ.

৫৮. এবং তারা বলল, আমাদের উপাস্যরা উৎকৃষ্ট নাকি সে? অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)। আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আমাদের মাবুদ জাহান্নামে ঈসার সাথে থাকবে। তারা আপনার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্য এ উদাহরণ পেশ করেছে। অনর্থক দলিলবিহীন বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ কথা বলে। নতুবা তারা অবগত যে, مَا শব্দটি জ্ঞানহীন প্রাণীর জন্যে আসে অতএব আল্লাহর বাণী اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ-এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) শামিল নয়। বস্তুত তারা হলো এক বিতণ্ডকারী সম্প্রদায় অধিক বিতর্ককারী।

٥٩. اِنْ هُوَ مَا عِيْسٰى اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ وَجَعَلْنٰهُ لِوُجُوْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَبٍ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ ط اَىْ كَالْمَثَلِ لِغَرَابَتِهِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَا يَشَاۤءُ.

৫৯. তিনি ঈসা আমার বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। আমি তাকে নবুয়তের নিয়ামত দান করেছিলাম এবং তাকে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের জন্য আমার অসীম ক্ষমতার একটি নমুনা বানিয়েছি। অর্থাৎ অলৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায় আশ্চর্য পদ্ধতিতে তার জন্মলাভ দ্বারা আল্লাহর কুদরতের দলিল পেশ করা যায়, যারা চায় তাদের জন্য।

٦٠. وَلَوْ نَشَاۤءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَدَلَكُمْ مَلٰۤئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ بِاَنْ نُهْلِكَكُمْ.

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতে পারি যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অর্থাৎ এভাবে যে, তোমাদেরকে ধ্বংস করে।

٦١. وَاِنَّهٗ اَىْ عِيْسٰى لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ تَعْلَمُ بِنُزُوْلِهٖ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِلْجَزْمِ وَوَاوُ الضَّمِيْرِ لِاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ تَشُكُّنَّ فِيْهَا وَ قُلْ لَهُمْ اتَّبِعُوْنِ ط عَلَى التَّوْحِيْدِ هٰذَا الَّذِىْ اٰمُرُكُمْ بِهٖ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

৬১. নিশ্চয় তিনি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে কিয়ামতের ইলম অর্জন হবে। অতএব সে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না। تَمْتَرُنَّ -এর নূনে ই'রাবী জযম দানকারী অব্যয় لَا -এর কারণে আর وَاوْ যমীর দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। تَمْتَرُنَّ অর্থ تَشُكُّنَّ তথা সন্দেহ করা এবং আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আমার অনুসরণ কর তাওহীদের উপর। এটাই আমি তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিচ্ছি সরল-সোজা পথ।

٦٢. وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ يَصْرِفَنَّكُمْ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ الشَّيْطٰنُ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে তা থেকে আল্লাহর দীন থেকে বিরত না রাখে। নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন শত্রুতার ক্ষেত্রে।

٦٣. وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالشَّرَائِعِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ بِالنُّبُوَّةِ وَشَرَائِعِ الْاِنْجِيْلِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ج مِنْ اَحْكَامِ التَّوْرٰىةِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ فَبَيَّنَ لَهُمْ اَمْرَ الدِّيْنِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

৬৩. হযরত ঈসা (আ.) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ মু'জিযা ও আহকামে শরিয়ত নিয়ে আগমন করে বললেন, আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে নবুয়ত ও ইঞ্জিলের হুকুম নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করছ যেমন– তাওরাতের ধর্মীয় হুকুম আহকাম ইত্যাদি। তার কিছু বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করব। অতঃপর তিনি তাদের কাছে দীনের আহকাম বর্ণনা করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

٦٤. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের রব। তাঁরই ইবাদত কর। এটা সরল-সোজা পথ।

٦٥. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ج فِىْ عِيْسٰى اَهُوَ اللّٰهُ اَوِ ابْنُ اللّٰهِ اَوْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِمَا قَالُوْهُ فِىْ عِيْسٰى مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ مُّؤْلِمٍ.

৬৫. অতএব বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী পরস্পর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে মতপার্থক্য করল। কেউ বলেছে, তিনি খোদা। কেউ বলেছে, তিনি খোদার পুত্র। আবার কেউ বলেছে, তিনি তিন খোদার একজন। অতএব যারা জুলুম কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক দিনের আজাব। তারা ঈসার ব্যাপারে। وَيْلٌ শব্দটি শাস্তিমূলক শব্দ।

٦٦. هَلْ يَنْظُرُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَىْ مَا يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَدَلٌ مِنَ السَّاعَةِ بَغْتَةً فَجْأَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ مَجِيْئِهَا قَبْلَهُ ـ

৬৬. এখন এসব লোক অর্থাৎ মক্কার কাফেররা কি শুধু এ জন্যই অপেক্ষমাণ যে অকস্মাৎ তাদের উপর কিয়ামত এসে যাবে। تَاْتِيَهُمْ টি اَلسَّاعَةَ থেকে بَدَلٌ এবং তারা কিয়ামত আসার পূর্বে টেরও পাবে না।

٦٧. اَلْاَخِلَّاءُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِى الدُّنْيَا يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ الْمُتَحَابِّيْنَ فِى اللّٰهِ عَلٰى طَاعَتِهِ فَاِنَّهُمْ اَصْدِقَاءُ ـ

৬৭. সেদিন কিয়ামদের দিন সব বন্ধুরাই দুনিয়াতে পাপের মধ্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণ একে অপরের শত্রু হবে, يَوْمَئِذٍ -এর সম্পর্ক بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর সাথে তবে আল্লাহভীরুগণ নয়। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর আনুগত্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। তারা কিয়ামতের দিন একে অপরের সাথে শত্রুতা রাখবে না; বরং তারা পরস্পর বন্ধুই থাকবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ : অর্থাৎ شُبِّهَ ابْنُ مَرْيَمَ لِاَصْنَامِ মুফাসসির (র.) ضُرِبَ -এর তাফসীর جُعِلَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, ضُرِبَ টা جُعِلَ অর্থে مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হয়েছে। প্রথম মাফঊল হলো اِبْنُ مَرْيَمَ যা نَائِبِ فَاعِلْ হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাফঊল হলো مَثَلًا আর اِذَا হলো مُفَاجَاتِيَه আর قَوْمُكَ হলো مُبْتَدَأ আর مِنْهُ টা يَصُدُّوْنَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর يَصُدُّوْنَ টা বাক্য হয়ে خَبَرٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَصُدُّوْنَ : صَادٌ বর্ণে যের সহ এটা বাবে ضَرَبَ হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ- সে চেঁচামেচি করে, শোরগোল করে -[لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ] খুশিতে হৈ-হুল্লোড় করে। -[اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ] আবার কেউ কেউ يَصُدُّوْنَ -এর صَادٌ বর্ণে পেশ দিয়ে পড়েছেন, সে সময় এটা صُدُوْدٌ হতে নির্গত হবে। অর্থ হবে- সে বিরত থাকে, মুখ ফিরিয়ে রাখে।

قَوْلُهُ اِلَّا جَدَلًا : এটা مَا ضَرَبُوْا -এর مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ اللّٰهُ : এটা খ্রিস্টানদের ইয়াকূবিয়া সম্প্রদায়ের উক্তি বা মতাদর্শ।

اَوْ اِبْنُ اللّٰهِ : এটা খ্রিস্টানদের مَرْقُوْسِيَه সম্প্রদায়ের মতাদর্শ।

اَوْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ : এটা খ্রিস্টনাদের তৃতীয় গোত্র مَلْكَانِيَه সম্প্রদায়ের মতাদর্শ। -[جَمَلٌ]

قَوْلُهُ اَلْاَخِلَّاءُ : এটা خَلِيْلٌ -এর বহুবচন, অর্থ- বন্ধু।

قَوْلُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ : যদি اَلْاَخِلَّاءُ-কে مَعْصِيَةٌ -এর সাথে مُقَيَّدْ করা হয় যেমনটি মুফাসসির (র.) করেছেন, তখন اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ টা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে। কেননা আল্লাহভীরুগণের বন্ধুত্ব গুনাহের কারণে হয় না। এ সুরতে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى -এর جِنْس থেকে হবে না। আবার কেউ কেউ اَخِلَّاءُ থেকে مُطْلَقًا বন্ধু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এই সুরতে আল্লাহভীরুগণও مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ বলা হবে।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ : অর্থাৎ يَوْمَئِذٍ -এর সম্পর্ক عَدُوٌّ -এর সাথে হয়েছে। কেননা يَوْمَئِذٍ টা عَدُوٌّ -এর ظَرْف مُقَدَّمْ হয়েছে।

প্রশ্ন. عَدُوٌّ টা صِفَتْ صِيْغَه হওয়ার কারণে عَامِلْ ضَعِيْف ; এটা সেই সময় আমল করে যখন তার مَعْمُوْل তারতীবের সাথে তথা তার পরে আসে অথচ এখানে يَوْمَئِذٍ যা عَدُوٌّ -এর ظَرْف হয়েছে তা مُقَدَّمْ হয়েছে। কাজেই عَدُوٌّ টা عَامِلْ ضَعِيْف হওয়ার কারণে يَوْمَئِذٍ -এর মধ্যে আমল করবে না।

উত্তর. ظُرُوْف -এর মধ্যে যেহেতু وُسْعَتْ বা প্রশস্ততা রয়েছে, তাই مُقَدَّمٌ হওয়া সত্ত্বেও عَامِل ضَعِيْف - ও আমল করতে পারে।
সংশয় : ظَرْف টা مُقَدَّمٌ হওয়া ব্যতীতও عَمَلْ এবং مَعْمُوْل -এর মধ্যে مُبْتَدَأ ثَانِيْ তথা بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ -এর দ্বারা فَصْل রয়েছে।
নিরসন : মুবতাদা -এর فَصْل ও আমলের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ : এসব আয়াতের শানে নুযূলে তাফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন- يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا خَيْرَ فِيْ أَحَدٍ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ হে কুরাইশগণ! আল্লাহ ব্যতীত যারাই ইবাদত করা হয় তার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। কুরাইশরা বলল, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কুরআন পাকের إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ [তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।] আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আব্দুল্লাহ ইবনুযযিবা'রা [যে তখনো কাফের ছিল] বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জবাব রয়েছে। তা এই যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে এবং ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-এর পূজা করে। অতএব তাঁরা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরিক কুরাইশরা খুবই আনন্দিত হলো। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছামিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রিস্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জবাবে আল্লাহ তা'আলা এমন আয়াত নাজিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জবাব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট। কেননা যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহর কোনো আদেশ বলে করেনি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এরও বাসনা ছিল না, কুরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কুরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খ্রিস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন? প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জবাব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই, তারা হয়তো নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী। কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন- শয়তান, ফেরাউন, নমরূদ প্রমুখ। হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তিনি কোনো পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রিস্টানরা তাঁর কোনো নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না; বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রিস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতের পরিপন্থি ছিল। তিনি সর্বদা তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা, ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে কাফেরদের আরো একটি আপত্তির জবাব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)] তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জবাব সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থি ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ : এটা খ্রিস্টানদের সে বিভ্রান্তির জবাবে, যার ভিত্তিতে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর

প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়, কেননা হযরত আদমকে পিতামাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এ পর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ : [এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।] এর দু-রকম তাফসীর করা হয়েছে। প্রথম তাফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আ.) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আকাশ থেকে অবতরণ কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ : [এবং যাতে আমি তোমাদের কোনো কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।] বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোনো কোনো বিধিবিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ.) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। 'কোনো কোনো' বলার কারণ এই যে, কোনো কোনো বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

প্রকৃত বন্ধুত্ব তা-ই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয় : اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ [আল্লাহভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।] এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেজ ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল, ইয়া আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। অতএব, হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জবাবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরস্কার ও ছওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ একত্র হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দকাজে উৎসাহ দিত এবং ভালোকাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনো আপনার কাছে হাজির হবো না। অতএব, হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে হেদায়েত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুর মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ একত্র হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। যে দুজন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফজিলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহর ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার উস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহভক্তদের প্রতি এবং মুসলিম বিশ্বের সকল মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

অনুবাদ :

٦٨. وَيُقَالُ لَهُمْ يٰعِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ج

৬৮. এবং তাদেরকে বলা হবে হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আজ কোনো ভয় নেই এবং কোনো দুঃখও তোমাদের স্পর্শ করবে না।

٦٩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَعْتٌ لِعِبَادِيْ بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ج

৬৯. যারা আমার আয়াতসমূহ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তারা ছিল মুসলমান। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا টি عِبَادِيْ -এর সিফত।

٧٠. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ مُبْتَدَأٌ وَأَزْوَاجُكُمْ زَوْجَاتُكُمْ تُحْبَرُوْنَ تُسَرُّوْنَ وَتُكْرَمُوْنَ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ .

৭০. তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ জান্নাতে প্রবেশ কর সানন্দে أَنْتُمْ মুবতাদা تُحْبَرُوْنَ খবর।

٧١. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ بِقِصَاعٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ج جَمْعُ كُوْبٍ وَهُوَ إِنَاءٌ لَا عُرْوَةَ لَهُ لِيَشْرَبَ الشَّارِبُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ تَلَذُّذًا وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج نَظَرًا وَأَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ج

৭১. তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পেয়ালাসমূহ أَكْوَابٍ শব্দটি كُوْبٌ -এর বহুবচন। كُوْبٌ এমন পাত্র যেখানে লোটা বা বদনার ন্যায় হাতল ও নালা থাকে না, যাতে পানকারী যেদিক দিয়ে ইচ্ছা পানি পান করতে পারে। আর সেখানে রয়েছে মনে যা চায় এবং দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী জিনিসমূহ। আর তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।

٧٢. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৭২. পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ।

٧٣. لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا أَيْ بَعْضُهَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا يُؤْكَلُ يُخْلِفُ بَدَلَهُ .

৭৩. তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে, তা থেকে তোমরা আহার করবে। যা খাওয়া হবে, ত্বরিত তার পরিবর্তে আরেকটি উৎপন্ন হবে।

٧٤. إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা, তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আজাব ভোগ করবে।

٧٥. لَا يُفَتَّرُ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ج سَاكِتُوْنَ سُكُوْتَ يَأْسٍ .

৭৫. তাদের আজাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় নীরব পড়ে থাকবে।

٧٦. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ .

৭৬. আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুমকারী।

٧٧. وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ هُوَ خَازِنُ النَّارِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط لِيُمِتْنَا قَالَ بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ مُقِيْمُوْنَ فِي الْعَذَابِ دَائِمًا .

৭৭. তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালেক! জাহান্নামের প্রহরী তোমার পালনকর্তা যেন আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন আমাদেরকে মৃত্যু দেন এক হাজার বৎসর পর সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। আজাবে সর্বদা অবস্থান করবে।

٧٨. قَالَ تَعَالٰى لَقَدْ جِئْنٰكُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ بِالْحَقِّ عَلٰى لِسَانِ الرَّسُوْلِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ.

৭৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের মক্কাবাসীদের নিকট ন্যায় ও সত্য রাসূলগণের ভাষায় পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্ম অপছন্দকারী।

٧٩. اَمْ اَبْرَمُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَحْكَمُوْا اَمْرًا فِىْ كَيْدِ مُحَمَّدِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ مُحْكِمُوْنَ كَيْدَنَا فِىْ اِهْلَاكِهِمْ.

৭৯. তারা মক্কার কাফেররা কি কোনো পদক্ষেপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষতি সাধনের জন্যে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তাহলে আমিও তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি।

٨٠. اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ مَا يُسِرُّوْنَ اِلٰى غَيْرِهِمْ وَمَا يَجْهَرُوْنَ بِهِ بَيْنَهُمْ بَلٰى نَسْمَعُ ذٰلِكَ وَرُسُلُنَا الْحَفَظَةُ لَدَيْهِمْ عِنْدَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ذٰلِكَ.

৮০. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ অর্থাৎ যেসব কথা তারা গোপনে বলে ও যেসব কথা তারা পরস্পর প্রকাশ্যে বলে শুনি না? হ্যাঁ আমি এগুলো শুনি এবং ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করেন।

٨١. قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ق فَرْضًا فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ لِلْوَلَدِ لٰكِنْ ثَبَتَ اَنْ لَا وَلَدَ لَهُ تَعَالٰى فَانْتَفَتْ عِبَادَتُهُ.

৮১. বলুন, মেনে নিলাম যদি দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তবে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সন্তানের ইবাদতকারী। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো সন্তান নেই। অতএব তার ইবাদতও করা হয় না।

٨٢. سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكُرْسِىِّ عَمَّا يَصِفُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ الْكِذْبِ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ اِلَيْهِ.

৮২. তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। তারা সন্তানের নিসবত দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা বলে।

٨٣. فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا فِىْ بَاطِلِهِمْ وَيَلْعَبُوْا فِىْ دُنْيَاهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ فِيْهِ الْعَذَابَ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ.

৮৩. অতএব আপনি তাদেরকে বাতিল ধ্যান-ধারণা ও ক্রীড়া-কৌতুকে তাদের দুনিয়াতে ডুবে থাকতে দিন অতএব তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করানো হবে তাদের ঐদিন যার আজাব সম্পর্কে ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। এবং এটা কিয়ামতের দিন।

٨٤. وَهُوَ الَّذِىْ هُوَ فِى السَّمَاۤءِ اِلٰهٌ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِسْقَاطِ الْاُوْلٰى وَتَسْهِيْلِهَا كَالْيَاۤءِ اَىْ مَعْبُوْدٌ وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط وَكُلٌّ مِنَ الظَّرْفَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهٗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِىْ تَدْبِيْرِ خَلْقِهٖ الْعَلِيْمُ بِمَصَالِحِهِمْ .

৮৪. তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে। اَلسَّمَاۤءِ اِلٰهٌ -এর মধ্যে দুই হামযা বহাল রেখে এবং প্রথম হামযা বিলুপ্ত করে দ্বিতীয় হামযা তাসহীল ى -এর ন্যায় অর্থাৎ উপাস্য এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। উভয় ظَرْف -এর প্রত্যেকটি পরবর্তী اِلٰهٌ -এর সাথে সম্পর্কিত এবং তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর সৃষ্টির পরিকল্পনায়। সর্বজ্ঞ তাদের কল্যাণ সম্পর্কে।

٨٥. وَتَبٰرَكَ تَعَظَّمَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج مَتٰى تَقُوْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالتَّاۤءِ وَالْيَاۤءِ .

৮৫. অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা, যাঁর মুঠিতে জমিন ও আসমানসমূহ এবং জমিন আসমানে যা কিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের বাদশাহী এবং তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান কখন তা সংঘটিত হবে? এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ ফে'লটি ى ও ت উভয়রূপে সাথে পড়া বৈধ।

٨٦. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِهٖ اَىِ اللّٰهِ الشَّفَاعَةَ لِاَحَدٍ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ اَىْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ بِقُلُوْبِهِمْ مَا شَهِدُوْا بِهٖ بِاَلْسِنَتِهِمْ وَهُمْ عِيْسٰى وَعُزَيْرٌ وَالْمَلٰۤئِكَةُ فَاِنَّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

৮৬. তিনি আল্লাহ ব্যতীত তারা মক্কার কাফেররা যাদের পূজা করে তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যা তারা মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং এরা ঈসা, উযাইর এবং ফেরেশতাগণ। অতএব তারা মুমিনদের সুপারিশ করবে।

٨٧. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ وَوَاوُ الضَّمِيْرِ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৮৭. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্য বলবে আল্লাহ। لَئِنْ -এর ل শপথের জন্যে, لَيَقُوْلُنَّ -এর نُوْن اِعْرَابِىْ ও واو যমীর বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আল্লাহর ইবাদত থেকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

٨٨. وَقِيْلِهٖ اَىْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ ﷺ وَنَصَبُهٗ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اَىْ وَقَالَ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ م

৮৮. এবং তাঁর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা নিশ্চয় এই সম্প্রদায় বিশ্বাস স্থাপন করে না। قِيْلِهٖ উহ্য ফে'লের মাসদার তথা مَفْعُوْل مُطْلَقْ হিসেবে مَنْصُوْب হবে অর্থাৎ قَالَ قِيْلَهٗ

٨٩. قَالَ تَعَالَى فَاصْفَحْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ط مِنْكُمْ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يُؤْمَرَ بِقِتَالِهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ.

৮৯. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন তোমাদের প্রতি সালাম। এবং এটা জিহাদের নির্দেশের পূর্বের হুকুম তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। তাদের প্রতি ধমকমূলক এ রকম বলা হয়েছে تَعْلَمُوْنَ টি ي ও ت উভয়ভাবে পড়া বৈধ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَا عِبَادِ : মূলে ছিল يَا عِبَادِىْ অর্থ– হে আমার বান্দাগণ! عِبَادِ টা উহ্য يَائے مُتَكَلِّمْ -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর এটা উহ্য مُصْحَفْ اِمَامْ -এর رِعَايَتْ -এর কারণে; এই ইযাফত تَشْرِيْف -এর জন্য হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাউকেও নিজের বলে দেওয়া অনেক বড় ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপার। আর এতে বান্দার চিত্তাকর্ষণও হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يَا عِبَادِىْ : এর يَاء -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে। يَاء উহ্য করে। يَاء -কে সাকিন করে। يَاء -কে যবর দিয়ে। এ আয়াতে نِدَا চারটি বিষয়ের উপর সংবলিত। যথা– ১. نَفِى خَوْف ২. نَفِى حُزْن ৩. জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার বিধান. ৪ খুশির সুসংবাদ تُحْبَرُوْنَ -এর মধ্যে।

قَوْلُهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ : رَفْع এবং জমহুরের তিন কেরাত। خَوْف হলো মুবতাদা. خَوْف নাকেরাটা نَفِى -এর অধীনে হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আর عَلَيْكُمْ হলো মুবতাদার খবর يَوْمْ হলো ظَرْف যা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ تُحْبَرُوْنَ : অর্থাৎ تُسَرُّوْنَ ; تُحْبَرُوْنَ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর حَبْرٌ হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ তোমাদের সম্মান করা হবে। তোমাদের খুশি করা হবে। এমন খুশি যার প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠবে। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, تُحْبَرُوْنَ অর্থ হলো– تُكْرَمُوْنَ اِكْرَامًا مَا يُبَالَغُ فِيْهِ

قَوْلُهُ بِصِحَافٍ : এটা صَحْفَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– থালা, বাসন, গামলা, এত বড় বাসন, যাতে একসাথে পাঁচ ব্যক্তি আহার করতে পারে। কিসায়ী (র.) বলেন যে, সবচেয়ে বড় বাসন হলো جَفْنَةٌ এরপর اَلْقَصْعَةُ যাতে দশজন মানুষ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পারে। এরপর اَلْمِكْيَلَةُ যাতে দুজন বা তিনজন পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পারে।

[لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِى]

قَوْلُهُ اَكْوَابٌ : এটা كُوْبٌ -এর বহুবচন। এমন লোটাকে বলে যাতে হাতল এবং নলা থাকে না।

قَوْلُهُ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا : এখানে تِلْكَ হলো মুবতাদা اَلْجَنَّةُ মাওসূফ اَلَّتِىْ হলো مَوْصُوْل আর اُوْرِثْتُمُوْهَا সেলাহ, মওসূল ও সেলাহ মিলে জুমলা হয়ে اَلْجَنَّةُ -এর সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর হয়েছে মুবতাদার।

প্রশ্ন. اُوْرِثْتُمُوْهَا -এর সামঞ্জস্যের চাহিদা ছিল تِلْكُمُوا الْجَنَّةُ বলা। অর্থাৎ تِلْكَ -কে বহুবচন নেওয়া।

উত্তর. تِلْكَ -কে جَمْع নেওয়ার পরিবর্তে مُفْرَدْ নেওয়ার মধ্যে হিকমত হচ্ছে। تِلْكُمْ বহুবচন নেওয়ার ক্ষেত্রে জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন সম্মিলিতভাবে হতো। আর مُفْرَدْ নেওয়ার সুরতে প্রত্যেক জান্নাতিকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যা খুবই ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপার।

قَوْلُهُ لَا يُفَتَّرُ : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَفْتِيْرٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل مَنْفِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– কম করা হবে না, হালকা করা হবে না।

قَوْلُهُ نَادَوْا يَا مٰلِكُ : এটা مُحَقَّقُ الْوُقُوْعِ হওয়ার কারণে مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ : এটা আল্লাহ তা'আলার كَلَامٌ -ও হতে পারে। এতে মক্কার মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং মুশরিকদের জাহান্নামে অবস্থানের ইল্লত। আল্লামা মহল্লী (র.)-এর নিকট এটাই অগ্রগণ্য। আবার এটা জাহান্নামের দারোগা মালেক ফেরেশতার উক্তি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুরতে সম্বোধন ব্যাপকভাবে জাহান্নামবাসীদেরকে হবে। আর عِلَّتٌ -এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

قَوْلُهُ اَبْرَمُوْا : এটা اِبْرَامٌ মাসদার হতে مَاضِيْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ অর্থ– তারা সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করল।

قَوْلُهُ الْعَرْشِ الْكُرْسِيِّ : মুফাসসির (র.)-এর عَرْشٌ -এর তাফসীর كُرْسِيِّ দ্বারা না করাই উচিত ছিল। কেননা এটা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট বা সর্বজনবিদিত যে, আরশ এবং কুরসি উভয়টি পৃথক পৃথক বস্তু।

قَوْلُهُ يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ : এর তাফসীর يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর পরিবর্তে يَوْمَ الْمَوْتِ দ্বারা করা হলে অধিক ভালো হতো। কেননা মুশরিকদের خَوْضٌ فِي الْبَاطِلِ এবং لَعِبٌ فِي الدُّنْيَا -এর চূড়ান্ত ফয়সালা মৃত্যুর উপর হয়ে যায় কিয়ামতের দিনে নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الظَّرْفَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ : ظَرْفَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِي السَّمَاءِ এবং فِي الْاَرْضِ এবং مَا بَعْدَ দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় স্থানে اِلٰهٌ যা مَاْلُوْهٌ তথা মাবুদ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ : অর্থাৎ يَدْعُوْنَهُمْ -هُمْ হলো উহ্য মাফঊল।

قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ الخ : এখানে الَّذِيْنَ টা يَمْلِكُ -এর ফায়েল, যদি الَّذِيْنَ দ্বারা মুতলাকভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ উদ্দেশ্য হয় তবে সেই সুরতে اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ টা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। যেমনটি মুফাসসির (র.)-এর ইবারতের চাহিদা। অথবা الَّذِيْنَ দ্বারা বিশেষভাবে اَصْنَامٌ উদ্দেশ্য। তখন সেই সুরতে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হবে।

قَوْلُهُ اَيِ الْكُفَّارُ : এখানে الْكُفَّارُ টা يَدْعُوْنَ -এর وَاوٌ -এর তাফসীর হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَحَدٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে اَلشَّفَاعَةَ -এর মাফঊল উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : এখানে যমীরটা অর্থের হিসেবে مَنْ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ : এখানে لَامِ قَسَمٌ হয়েছে لَيَقُوْلُنَّ টা جَوَابِ قَسَمٌ হয়েছে এবং নিয়ম অনুপাতে جَوَابِ شَرْط উহ্য রয়েছে। কেননা قَسَمٌ এবং شَرْط যখন একত্র হয়ে যায় তখন প্রথমটির جَوَابٌ উল্লিখিত হয় এবং দ্বিতীয়টির جَوَابٌ উহ্য থাকে।

قَوْلُهُ وَقِيْلِهِ اَيْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ : এটা মুযাফ এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ উভয়ের তাফসীর অর্থাৎ قِيْل টা قَوْل অর্থে হয়েছে। আর مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ।

قَوْلُهُ نَصَبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ : এখানে قِيْل টা قَالَ -এর মাসদারের মধ্য হতে একটি মাসদার। অর্থাৎ قِيْلِهِ টা قَالَ উহ্য ফে'লের মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ يَا رَبِّ : মুফাসসির (র.)-এর قَالَ يَارَبِّ -এর স্থলে قَالَ قِيْلَهٗ يَا رَبِّ বলাটা অধিক স্পষ্ট ছিল।

–[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ سَلَامٌ : এটা سَلَامٌ مُتَارَكَتٌ [বিচ্ছেদের সালাম] যেমনটি বক্তা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অন্যথায় عَلَيْكُمْ হতো। সালামে তাহিয়্যাহ নয়। আর سَلَامٌ হলো মুবতাদা মাহযূফের খবর। উহ্য ইবারত হলো– اَمْرِيْ سَلَامٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ : আলোচ্য আয়াতে اَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীকে বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার সহপাঠি ও বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থ শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মুমিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে।

قَوْلُهُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ : [যদি দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদত করতাম।] এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোনো পর্যায়ে সম্ভব; বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোনো শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলিল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাবাদীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েজ ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

قَوْلُهُ وَقِيْلِهِ يَا رَبِّ اِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ : এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গজব নাজিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' ও 'শফীউল মুযনিবীন' রূপে প্রেরিত রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রাসূল ﷺ -এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলি কষ্ট পেয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তাফসীর অনুযায়ী وَقِيْلِهِ -এর এক আয়াত পূর্বে اَلسَّاعَةُ শব্দের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। এ আয়াতের আরো কয়েকটি তাফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত وَاو অক্ষরটি কসমের অর্থ বুঝায় এবং اِنَّ هٰؤُلَاءِ কসমের জবাব। এসব তাফসীর রুহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَقُلْ سَلَامٌ : পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলিল ও আপত্তির জবাব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জবাব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন" -এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোনো অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়; বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা অথবা سَلَامٌ বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ.

٢. وَالْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْمُبِيْنِ لا الْمُظْهِرِ لِلْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ.

٣. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اَوْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَزَلَ فِيْهَا مِنْ اُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ مُخَوِّفِيْنَ بِهٖ.

٤. فِيْهَا اَيْ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَوْ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ يُفْرَقُ يُفْصَلُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ لا مُحْكَمٍ مِنَ الْاَرْزَاقِ وَالْاٰجَالِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِيْ تَكُوْنُ فِي السَّنَةِ اِلٰى مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

٥. اَمْرًا فَرْقًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ الرُّسُلَ مُحَمَّدًا اَوْ مَنْ قَبْلَهٗ.

٦. رَحْمَةً رَاْفَةً بِالْمُرْسَلِ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّكَ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمْ الْعَلِيْمُ بِاَفْعَالِهِمْ.

অনুবাদ :

১. হা-মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। কুরআনের হালালকে হারাম থেকে স্পষ্টকারী।

৩. নিশ্চয় আমি একে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে, এটা লাইলাতুল ক্বদর বা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত। এতে উম্মুল কিতাব সপ্ত আসমানে অবস্থিত লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। অর্থাৎ এটা দ্বারা ভয় প্রদর্শনকারী।

৪. এ রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরে বা শাবানের ১৫ তারিখের রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় যথা রিজিক, মৃত্যু ইত্যাদি যা চলতি বৎসর থেকে আগামী বৎসরের সেই রাত পর্যন্ত হবে ফয়সালা স্থিরীকৃত হয়।

৫. তা স্থিরীকৃত হয় আমারই আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী, রাসূলদেরকে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পূর্ববর্তীদেরকে।

৬. রহমত স্বরূপ যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, তাদের কথাবার্তা– সর্বজ্ঞ তাদের কর্মসমূহ সমূহ।

٧. رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ بِرَفْعِ رَبُّ خَبَرٌ ثَالِثٌ وَبِجَرِّهٖ بَدَلٌ مِنْ رَّبِّكَ اِنْ كُنْتُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مُّوْقِنِيْنَ بِاَنَّهٗ تَعَالٰى رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَايْقَنُوْا بِاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُهٗ .

৭. তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এদের উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সবকিছুর পালনকর্তা رَبِّ শব্দটি رَفْع-এর সাথে هُوَ-এর তৃতীয় খবর অথবা رَبِّ টি جَر-এর অবস্থায় مِنْ رَّبِّكَ থেকে بَدَل হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা ঈমানদার হও এ কথার উপর যে, তিনিই আসমান ও জমিনের পালনকর্তা, তাহলে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর নিশ্চয় মুহাম্মদ তাঁর রাসূল।

٨. لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ .

৮. তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের পালনকর্তা।

٩. بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِنَ الْبَعْثِ يَلْعَبُوْنَ اِسْتِهْزَاءً بِكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ .

৯. এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পুনরুত্থানের ব্যাপারে ক্রীড়া-হাসি তামাশা করে চলেছে। হে মুহাম্মদ আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। অতএব তিনি তাদের প্রতি বদদোয়া করে বলেন– اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ الخ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুর্ভিক্ষের ন্যায় তাদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দিয়ে।

١٠. قَالَ تَعَالٰى فَارْتَقِبْ لَهُمْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ فَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَاشْتَدَّ بِهِمُ الْجُوْعُ اِلٰى اَنْ رَاَوْا مِنْ شِدَّتِهٖ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

১০. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতএব আপনি তাদের ব্যাপারে সেদিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। অতএব, দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে এবং মক্কাবাসী অধিক ক্ষুধার্ত হবে। তারা অধিক ক্ষুধার কারণে আসমান ও জমিনের মধ্যখানে ধোঁয়ার ন্যায় দেখতে থাকবে।

١١. يَّغْشَى النَّاسَ ط فَقَالُوْا هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

১১. তা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর তারা বলবে এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٢. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ مُصَدِّقُوْنَ بِنَبِيِّكَ .

১২. হে আমাদের মালিক! আমাদের কাছ থেকে এই আজাব সরিয়ে নাও, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী। আপনার নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।

١٣. قَالَ تَعَالٰى اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى اَيْ لَا يَنْفَعُهُمُ الْاِيْمَانُ عِنْدَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۙ بَيِّنُ الرِّسَالَةِ .

১৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করারই সুযোগ কোথায়? অর্থাৎ আজাব আসার সময় ঈমান আনয়ন কোনো উপকারে আসে না। অথচ তাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল স্পষ্ট রিসালতের অধিকারী রাসূল এসেছিলেন।

١٤. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ اَىْ يُعَلِّمُهُ الْقُرْاٰنَ بَشَرٌ مَّجْنُوْنٌ.

১৪. অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো শিখানো কথা বলে, অর্থাৎ কোনো মানুষ তাকে কুরআন শিখায় উন্মাদ।

١٥. اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ اَىِ الْجُوْعِ عَنْكُمْ زَمَنًا قَلِيْلًا فَكُشِفَ عَنْهُمْ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ٭ اِلٰى كُفْرِكُمْ فَعَادُوْا اِلَيْهِ.

১৫. আমি এই আজাব কিছুটা সরিয়ে দেই অর্থাৎ তোমাদের থেকে ক্ষুধার আজাব কিছু দিনের জন্যে দূর করে দেই অতএব, তাদের থেকে ক্ষুধার কষ্ট সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ তাদের পূর্বের কুফরির দিকে ফিরে যাবে অতঃপর তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরেছে।

١٦. اُذْكُرْ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ج هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ مِنْهُمْ وَالْبَطْشُ الْاَخْذُ بِقُوَّةٍ.

১৬. আপনি উল্লেখ করুন সেদিনের কথা যেদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করব, এটা বদরের দিন নিশ্চয় আমি এদের কাছ থেকে সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণকারী اَلْبَطْشُ বলা হয় কঠোরভাবে পাকড়াও করাকে।

١٧. وَلَقَدْ فَتَنَّا بَلَوْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ مَعَهُ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ هُوَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرِيْمٌ لا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

১৭. এবং তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে ফেরাউনসহ পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছেও আল্লাহর একজন সম্মানিত রাসূল হযরত মূসা (আ.) আগমন করেছিলেন।

١٨. اَنْ اَىْ بِاَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ مَا اَدْعُوْكُمْ اِلَيْهِ مِنَ الْاِيْمَانِ اَىْ اَظْهِرُوْا اِيْمَانَكُمْ بِالطَّاعَةِ لِىْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ ط اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ عَلٰى مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ.

১৮. এ মর্মে যে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! যে ঈমানের দিকে আমি আহ্বান করছি তা কবুল কর। অর্থাৎ আমার আনুগত্যে ঈমানকে প্রকাশ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। যা দ্বারা আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে তদ্বিষয়ে।

١٩. وَاَنْ لَّا تَعْلُوْا تَتَجَبَّرُوْا عَلَى اللّٰهِ ط بِتَرْكِ طَاعَتِهٖ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ بُرْهَانٍ مُّبِيْنٍ ج بَيِّنٍ عَلٰى رِسَالَتِىْ فَتَوَعَّدُوْهُ بِالرَّجْمِ.

১৯. আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করো না তাঁর আনুগত্য ছেড়ে নাফরমানি করে আমি তোমাদের কাছে নিজের রিসালতের উপর প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। কিন্তু তারা তাকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করার ধমকি দিয়েছে।

٢٠. فَقَالَ وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ بِالْحِجَارَةِ.

২০. অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পার সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে পানাহ চেয়ে নিয়েছি।

٢١. وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ تُصَدِّقُوْنِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ فَاتْرُكُوْا اِذْ اَيْ فَلَمْ يَتْرُكُوْهُ

২১. এবং যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করো, তাহলে আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে থাক ; অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক; কিন্তু তারা তা থেকে ফিরে আসেনি

٢٢. فَدَعَا رَبَّهٗ اَنَّ اَيْ بِاَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ مُشْرِكُوْنَ ـ

২২. অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় শিরককারী।

٢٣. فَقَالَ تَعَالٰى فَاَسْرِ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَوَصْلِهَا بِعِبَادِيْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۙ يَتْبَعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ ـ

২৩. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি আমার বান্দা বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে রাতেই বের হয়ে পড়, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে ; ফেরাউন ও তার গোত্র তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। اَسْرِ সীগাহটিতে هَمْزَه قَطْعِي বা هَمْزَه وَصْلِي উভয় ধরনের পড়া যাবে।

٢٤. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اِذَا قَطَعْتَهٗ اَنْتَ وَاَصْحَابُكَ رَهْوًا ط سَاكِنًا مُّتَفَرِّجًا حَتّٰى يَدْخُلَهُ الْقِبْطُ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ فَاطْمَاَنَّ بِذٰلِكَ فَاُغْرِقُوْا ـ

২৪. যখন তুমি ও তোমার সাথিগণ সাগর পার হবে তখন তুমি সাগরকে শান্ত খোলা থাকতে দাও। অতঃপর কিবতীরা এতে প্রবেশ করবে। নিঃসন্দেহে ওরা নিমজ্জিত বাহিনী। উক্ত বাণীতে তিনি শান্ত হয়েছেন, অতএব তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

٢٥. كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَّعُيُوْنٍ ۙ تَجْرِيْ ـ

২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনা যা প্রবাহিত।

٢٦. وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ مَجْلِسٍ حَسَنٍ ـ

২৬. ও কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ সুরম্য স্থান।

٢٧. وَّنَعْمَةٍ مُتْعَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ نَاعِمِيْنَ ـ

২৭. আরো কত নিয়ামত সামগ্রী যাতে তারা নিমগ্ন থাকত। এসব কিছুই তারা সাথে নিতে পারেনি; বরং তারা চলে যাওয়ার পর এসবই বিরান হয়ে পড়ে রইল

٢٨. كَذٰلِكَ قف خَبَرُ مُبْتَدَاٍ اَيِ الْاَمْرُ وَاَوْرَثْنٰهَا اَيْ اموالهم قَوْمًا اٰخَرِيْنَ اَيْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ ـ

২৮. এমনিই হয়েছিল كَذٰلِكَ শব্দটি উহ্য اَلْاَمْرُ মুবতাদার খবর। এবং আমি আরেক জাতিকে বনী ইসরাঈলকে এসব কিছুর তাদের সম্পদসমূহের উত্তরাধিকারী করেছিলাম,

٢٩. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَبْكِيْ عَلَيْهِمْ بِمَوْتِهِمْ مُصَلَّاهُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَمَصْعَدُ عَمَلِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ مُؤَخَّرِيْنَ لِلتَّوْبَةِ ـ

২৯. তাদের অবস্থায় উপর ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী, কিন্তু ঈমানদারগণের মৃত্যুর পর তাদের নামাজের স্থান তাদের মৃত্যুর উপর ক্রন্দন করে এবং আকাশে তাদের নেক আমল যাওয়ার রাস্তাও ক্রন্দন করে। আর তারা অবকাশপ্রাপ্ত নয়। তাদেরকে তওবার জন্যে কোনো অবকাশ দেওয়া হয়নি।

তাহকীক ও তারকীব

وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ : এখানে وَاوْ টি قَسَمْ আর اَلْكِتَابِ হলো مُقْسَمْ بِهِ আর اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ হলো جَوَاب قَسَمْ

قَوْلُهُ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ : এটা جَوَاب قَسَمْ -এর ইল্লত। কেউ কেউ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ -কে جَوَاب قَسَمْ বলেছেন। আর اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ -কে قَسَمْ এবং جَوَاب قَسَمْ -এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة বলেছেন, তবে প্রথমটিই উত্তম।

قَوْلُهُ فِيْهَا يُفْرَقُ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة হয়েছে। আর فِيْهَا টা يُفْرَقُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ অথবা لَيْلَةٍ -এর সিফাত, আর মাঝে اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ হলো جُمْلَة مُعْتَرِضَة -

قَوْلُهُ فَرْقًا : মুফাসসির (র.) اَمْرًا -এর তাফসীর فَرْقًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَمْرًا টা يُفْرَقُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ بِغَيْرِ لَفْظِهِ হওয়ার কারণ مَنْصُوْب হয়েছে যেমন قُمْتُ وُقُوْفًا এবং قَعَدْتُ جُلُوْسًا এবং اَنْزَلْنَاهُ -এর যমীরে ফালে থেকে حَالْ হওয়াও বৈধ রয়েছে। উহ্য ইবারত হবে– اَنْزَلْنَاهُ حَالَ كَوْنِنَا اٰمِرِيْنَ অথবা اَنْزَلْنَاهُ -এর مَفْعُوْل হতেও حَالْ হতে পারে। উহ্য ইবারত হবে– اَنْزَلْنَاهُ حَالَ كَوْنِهٖ مَاْمُوْرًا بِهٖ এবং مَفْعُوْل لَهٗ হওয়াও বৈধ রয়েছে। এর عَامِلْ হবে اَنْزَلْنَا উহ্য ইবারত হবে– اَنْزَلْنَاهُ لِاَمْرِ الْخَلْقِ –[صَاوِيْ]

قَوْلُهُ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ : এতে পাঁচটি সুরত রয়েছে–

১. مَفْعُوْل لَهٗ হবে এবং তার আমেল হবে হয়তো اَنْزَلْنَا অথবা اَمْرًا অথবা يُفْرَقُ অথবা مُنْذِرِيْنَ

২. رَحْمَةً টা উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ رَحِمْنَا رَحْمَةً

৩. رَحْمَةً টা اَلْمُرْسِلِيْنَ -এর মাফঊল হবে।

৪. مُرْسِلِيْنَ -এর যমীর থেকে حَالْ হবে অর্থাৎ ذَوِيْ رَحْمَةٍ

৫. اَمْرًا থেকে بَدَلْ হবে।

قَوْلُهُ فَايْقَنُوْا : ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ -এর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। আর جُمْلَه شَرْطِيَّة টা খবরসমূহের মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَه হয়েছে। কেননা لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যটি اِنَّ -এর চতুর্থ খবর হয়েছে।

–[اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ]

قَوْلُهُ دُخَانٍ : ধোঁয়া, বহুবচনে اَدْخِنَةٌ ; আয়াতে যেই ধোঁয়ার উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, এই ধোঁয়া নবুয়তকালে প্রকাশ পেয়েছে। হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এটা কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে প্রকাশ পাবে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) প্রথম উক্তিটি গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ اَدُّوْا اِلَيَّ : এখানে اَنْ টি مُفَسِّرْ -ও হতে পারে। কেননা مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ টা قَوْل رَسُوْل -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে আর اَنْ টা مَصْدَرِيَه হওয়াও বৈধ। এ সুরতে اَنْ টা তার مَدْخُوْل সহ نَزْع خَافِضْ -এর কারণে মাসদারের তাবীল হয়ে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ بِاَنْ اَدُّوْا اِلَيَّ আর جَارْ ও مَجْرُوْر টা جَاءَهُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে এটাও বৈধ যে, এটা اَنْ مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ হয়েছে। এর যমীরে শান উহ্য রয়েছে। আর اَدُّوْا اِلَيَّ বাক্য হয়ে তার খবর হয়েছে।

عِبَادَ اللّٰهِ মুনাদা মুযাফ, হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। عِبَادَ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে قِبْط ; আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন যে, عِبَادَ اللّٰهِ টা اَدُّوْا اِلَيَّ -এর مَفْعُوْل بِهٖ হবে। আর তারা হলো বনী ইসরাঈল। আর اَدُّوْا اِلَيَّ অর্থের ক্ষেত্রে اَرْسِلُوْهُمْ مَعِيْ অর্থে হবে। এর تَائِيْد বা সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, সূরা শু'আরাতে এসেছে– اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ আল্লামা মহল্লী (র.) اَدُّوْا -এর তাফসীর مَا اَدْعُوْكُمْ اِلَيْهِ مِنَ الْاِيْمَانِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ হলো مَصْدَرِيَّة আর اَدَاءٌ অর্থ হলো قَبُوْلُ الدَّعْوَةِ কিন্তু এটা তাদের নিকট যারা اَمْر -এর উপর اَنْ مَصْدَرِيَّة হওয়া বৈধ বলে থাকেন। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ عِبَادَ اللّٰهِ : ব্যাখ্যাকার مَا اَدْعُوْكُمْ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَدُّوْا -এর মাফঊল উহ্য রয়েছে عِبَادَ হলো مُنَادٰى আর حَرْف نِدَا يَا উহ্য রয়েছে। আর عِبَادَ اللّٰهِ দ্বারা قِبْط উদ্দেশ্য, অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন যে, عِبَادَ اللّٰهِ টা اَدُّوْا -এর মাফঊল। উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈল অর্থাৎ اَرْسِلُوْا مَعِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ

قَوْلُهُ اُتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا : এটা رَهَا يَرْهُوْ -এর মাসদার, অর্থ– অবস্থান করা, থামা, বসতি গ্রহণ করা। কেউ কেউ রাস্তার প্রশস্ততা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম বুখারী (র.) সূরা حٰمٓ -এর তাফসীরে বলেন رَهْوًا অর্থ শুকনো রাস্তা। উদ্দেশ্য হলো এই যে, সমুদ্রকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ো না; বরং সেই সময় পর্যন্ত এই অবস্থায়ই ছেড়ে দাও যে, ফেরাউনের সর্বশেষ সৈন্যটিও তাতে প্রবেশ করে ফেলে। আবদ ইবনে হুমাইদ অন্য পদ্ধতিতে মুজাহিদ (র.) থেকে رَهْوًا-এর অর্থ مُنْفَرِجًا বলেছেন যার অর্থ প্রশস্ত ও বিস্তৃত। আল্লামা মহল্লী (র.) رَهْوًا -এর তাফসীর سَاكِنًا مُنْفَرِجًا দ্বারা করে رَهْوًا -এর উভয় অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَىِ الْاَمْرُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে كَذٰلِكَ الْاَمْرُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুখান প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় ৩ রুকূ' ৫৯ আয়াত রয়েছে। এ সূরার বাক্য সংখ্যা ৩৪৬ এবং এতে অক্ষর হলো ১, ৪৩১ টি।

এ সূরার ফজিলত : ইবনে মারদুবিয়া হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জুমা রাতে অথবা জুমার দিনে সূরা আদদুখান তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতে একটি মহল তৈরি করেন।

বায়হাকী অন্য একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে হামিম আদ দুখান এবং সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে সকালে সে এমন অবস্থায় জাগ্রত হবে যে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী এবং বায়হাকী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা হামিম আদ দুখান রাত্রিকালে তেলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে।

–[তাফসীরে রূহুল মাআনী– খ. ২৫, পৃ. ১১০ তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ২৭ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (র.)- খ. -৬, পৃ. ২৮৯]

এ সূরার আমল : ইমাম তিরমীযী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সূরা দুখান, সূরা গাফের এবং আয়াতুল কুরসী সন্ধ্যাকালে পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তার হেফাজত করা হবে। দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এতটুকু সংযোজিত হয়েছে, যে উপরিউক্ত আমল করবে, সে কোনো প্রকার মন্দ কিছু দেখাবে না। –[ইতকান]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর যারা কুরআনে কারীমের সত্যতায় বিশ্বাস করেনি, এমন অপরাধীর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে, আর একথাও ঘোষণাও করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এক বরকতময় রজনীতে।

قَوْلُهُ حٰمٓ. وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিষয়ে গুণ বর্ণিত হয়েছে। كِتَابٌ مُبِيْنٌ [সুস্পষ্ট কিতাব] বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাজিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা।

قَوْلُهُ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে শবে কদর বুঝানো হয়েছে, যা রমজান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাজিল হয়। সূরা কদরে اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক শবে-কদরে নাজিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে কদরকেই বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাজিল করেছেন, তা সবই রমজান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাজিল হয়েছে। হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ রমজানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, যাবূর বারো তারিখে, ইঞ্জিল আঠারো তারিখে এবং কুরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কুরআন শবে কদরে নাজিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লাওহে মাহফূয থেকে সমগ্র কুরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাজিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কুরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে কদরে দুনিয়ার আকাশে নাজিল করা হতো।

−[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত ইকরিমা (র.) প্রমুখ কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণ কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থি। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এবং اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কুরআন শবে বরাতে নাজিল হয়েছে। তবে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শা'বানের পনেরো তারিখকে শবে বরাত অথবা 'লায়লাতুস্সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এখানে উল্লিখিত গুণও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا -এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিজিক দেওয়া হবে। মাহদভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলি তাদের কাছে অর্পণ করা হয়। −[তাফসীরে কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিজিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ দিয়েছেন শবে বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআন অবতরণ যে রমজান মাসে হয়েছে, তা কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত কোনো কোনো রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর (র.) অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) শবে বরাতের ফজিলত স্বীকার করেন না। তবে কোনো কোনো মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফজিলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاۤءُ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। **প্রথম উক্তি** এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা (রা.) ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। **দ্বিতীয় উক্তি** এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদদোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃতজন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধূম্র দৃষ্টিগোচর হতো। এ উক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের। **তৃতীয় উক্তি** এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধূম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আব্দুর রহমান আ'রাজ প্রমুখের। −[কুরতুবী]

প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ−

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা ইবনে উসাইদ বলেন, একবার রাসূল ﷺ উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না। যথা− ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ২. দুখান তথা ধূম্র ৩.

দাব্বা ৪. ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৬. দাজ্জালের আবির্ভাব ৭. পূর্বে ভূমিধস ৮. পশ্চিমে ভূমিধস ৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস ১০. আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রি যাপন করতে আসবে অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নি থেমে যাবে।
–[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আবূ মালেক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি– ১. ধূম্র. যা মুমিনকে কেবল একপ্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্র পথে বের হতে থাকবে। ২. দাব্বা [ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার] এবং ৩. দাজ্জাল। ইবনে কাসীর (র.) এমনি ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন–

هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَتَرْجُمَانِ الْقُرْاٰنِ وَهٰكَذَا قَوْلُ مَنْ وَافَقَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مَعَ الْأَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِيْ أَوْرَدُوْهَا مِمَّا فِيْهِ مُقْنِعٌ وَدَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلٰى أَنَّ الدُّخَانَ مِنَ الْاٰيَاتِ الْمُنْتَظَرَةِ مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْاٰنِ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ وَعَلٰى مَا فَسَّرَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ إِنَّمَا هُوَ خَيَالٌ رَأَوْهُ فِيْ أَعْيُنِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْجُوْعِ وَالْجُهْدِ وَهٰكَذَا قَوْلُهُ تَعَالٰى يَغْشَى النَّاسَ أَيْ يَتَغَشَّاهُمْ وَيَعُمُّهُمْ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا خَيَالِيًّا يَخُصُّ أَهْلَ مَكَّةَ لِمُشْرِكِيْنَ لَمَا قِيْلَ فِيْهِ يَغْشَى النَّاسَ.

কুরআনের শ্রেষ্ঠ তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই. তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দুখান' বা ধূম্র কিয়ামতের ভবিষৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীরে উল্লিখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে ঘিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يَغْشَى النَّاسَ থেকে বোঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।

হযরত আব্দুল্লাহ হযরত মাসউদ (রা.)-এর উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদের প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েজ ওয়াজ করেছেন। তিনি يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই বললেন, এক ধূম্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনেদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসরূক বলেন, ওয়ায়েজের এ কথা শুনে আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন, ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ -কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবাকর্মের কোনো বিনিময় চাই না এবং আমি কোনো কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলাই জানেন। নিজে কোনো কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শোনাই। কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরিকেই আঁকড়ে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! এদের উপর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হতো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মতো দেখত। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলে বৃষ্টি হলো। তখন إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ আয়াত নাজিল হলো। অর্থাৎ আমি কিছুদিনের জন্য তোমাদের থেকে আজাব প্রত্যাহার করে

নিচ্ছি কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাস্তবে তা-ই হলো, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ আয়াতটি নাজিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদর যুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরো বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম। -[ইবনে কাসীর]

দুখান অর্থ- মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ- সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে- وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ : চাঁদ অর্থ- চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া যা اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ- বদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থ- فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়। যথা- ১. আকাশে ধূম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে। ২. মুশরিকরা আজাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। ৩. তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে। ৪. তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্য কিছুদিনের জন্য আজাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং ৫. আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়ার এবং তা দূর হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তাফসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কুরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তাফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না; বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে কাসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদের তাফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাসীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীরে বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ অথচ কিয়ামতে কাফেরদের থেকে কোনো সময় আজাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছুদিনের জন্য আজাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আজাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরিই করতে থাকবে। কুরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অন্য এক আয়াতে আছে- وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

২. দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كَشْفُ عَذَابٍ -এর মানে যদিও আজাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আজাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে; কিন্তু কিছুদিন আমি তা পিছিয়ে দেব। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে اِنَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ বলা হয়েছে। অথচ তাদের আজাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আজাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল একেই كَشْفُ عَذَابٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কিয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোনো খটকা দেখা দেয় না এবং এ তাফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى -এর অর্থ হবে কিয়ামত দিবসের পাকড়াও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীরে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে, এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরি হয় না যে, কিয়ামতের দিন আরো প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কুরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপর তাদের উপর যে কোনো আজাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

هُمَا دُخَانَانِ مَضٰى وَاحِدٌ وَالَّذِيْ بَقِيَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ اِلَّا بِالزُّكْمَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيَشُقُّ مَسَامِعَهُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِنْدَ ذٰلِكَ الرِّيْحَ الْجَنُوْبَ مِنَ الْيَمَنِ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ

অর্থাৎ ধূম্র দুটি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে [অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়]। আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়েমেনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কুরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তাফসীরের কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

قَوْلُهُ وَإِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُوْنِ : [তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।] رجم শব্দের অর্থ- প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ- কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা ফেরাউনের সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

قَوْلُهُ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا : [সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।] হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না। যাতে ফেরাউন শুষ্ক ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِيْنَ : [আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।] সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিশরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তাফসীরে এর জবাবও দেওয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ [অতঃপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।] উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোনো সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোনো সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দুটি দ্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার দিয়ে তার রিজিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌঁছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

হযরত শোরায়াহ ইবনে ওবাইদ (রা.)-এর বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য কোনো ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোনো কাফেরের জন্য ক্রন্দন করে না। -[ইবনে জারীর]

হযরত আলী (রা.)-ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জবাব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ; আধুনিক বিজ্ঞানও ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরি নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

অনুবাদ :

٣٠. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ اِسْرَاءِ يْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ قَتْلَ الْاَبْنَاءِ وَاسْتِخْدَامِ النِّسَاءِ ـ

৩০. আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি অর্থাৎ ছেলে সন্তানকে হত্যা করা ও মেয়ে সন্তানদেরকে খাদেমা বানানো ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করেছি।

٣١. مِنْ فِرْعَوْنَ ط قِيْلَ بَدَلٌ مِنَ الْعَذَابِ بِتَقْدِيْرِ مُضَافٍ اَىْ عَذَابِ وَقِيْلَ حَالٌ مِنَ الْعَذَابِ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

৩১. যা ফেরাউনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি করা হতো مِنْ فِرْعَوْنَ টি উহ্য مُضَافٌ সহ عَذَابِ থেকে بَدَلٌ অর্থাৎ مِنْ عَذَابِ فِرْعَوْنَ এবং অনেকে বলেন, এটা عَذَاب থেকে حَالٌ নিশ্চয় ফেরাউন ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

٣٢. وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ اَىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى عِلْمٍ مِنَّا بِحَالِهِمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ اَىْ عَالَمِىْ زَمَانِهِمْ اَىِ الْعُقَلَاءِ ـ

৩২. আমি তাদেরকে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের অবস্থার উপর আমার অবগত হওয়ার দরুন বিশ্বাবাসীদের উপর তাদের যুগের সকল জ্ঞানীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

٣٣. وَاٰتَيْنٰهُمْ مِنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ فَلْقِ الْبَحْرِ وَالْمَنِّ وَالسَّلْوٰى وَغَيْرِهَا ـ

৩৩. এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। [প্রকাশ্য নিয়ামত যেমন, সাগর চিরে রাস্তা হয়ে যাওয়া ও মান্না-সালওয়া ইত্যাদি।

٣٤. اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَيَقُوْلُوْنَ ـ

৩৪. এই লোকেরা মক্কার কাফেররা বলেই থাকে–

٣٥. اِنْ هِىَ مَا الْمَوْتَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا الْحَيٰوةُ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى اَىْ وَهُمْ نُطَفٌ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ بِمَبْعُوْثِيْنَ اَحْيَاءً بَعْدَ الثَّانِيَةِ ـ

৩৫. এটিই হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু অর্থাৎ নুতফা থাকা অবস্থায়। এমন কোনো মৃত্যু নেই যার পরে পুনরুত্থান হবে। এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার পর।

٣٦. فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اَحْيَاءً اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اِنَّا نُبْعَثُ بَعْدَ مَوْتَتِنَا اَىْ نُحْيَا ـ

৩৬. যদি তোমরা সত্যবাদী হও, এ দাবিতে যে, আমরা আমাদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবো তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জীবিত নিয়ে এসো!

٣٧. قَالَ تَعَالٰى اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ هُوَ نَبِىٌّ اَوْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْاُمَمِ اَهْلَكْنٰهُمْ ز لِكُفْرِهِمْ وَالْمَعْنٰى لَيْسُوْا اَقْوٰى مِنْهُمْ فَاُهْلِكُوْا اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ـ

৩৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওরা শ্রেষ্ঠ, নাকি তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ? তুব্বা একজন নবী ছিলেন বা সৎকর্মী পুরুষ ছিলেন। আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের কুফরির কারণে। এর অর্থ হলো তারা ওদের চেয়ে শক্তিশালী নয় অতঃপর তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।। নিশ্চয় ওরা ছিল অপরাধী।

٣٨. وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ بِخَلْقِ ذٰلِكَ حَالٌ .

৩৮. আমি আসমানসমূহ, জমিন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু খেল-তামাশার ছলে সৃষ্টি করিনি। لٰعِبِيْنَ শব্দ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ

٣٩. مَا خَلَقْنٰهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ اَىْ مُحِقِّيْنَ فِىْ ذٰلِكَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَّتِنَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ .

৩৯. আমি এগুলোকে যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি অর্থাৎ আমি এগুলোর সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাবান। যাতে এগুলো আমার কুদরত ইত্যাদির উপর দলিল হয় কিন্তু তাদের মক্কার কাফেরদের অধিকাংশই বোঝে না।

٤٠. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ اللّٰهُ فِيْهِ بَيْنَ الْعِبَادِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لا لِلْعَذَابِ الدَّائِمِ .

৪০. নিশ্চয় ফয়সালার দিন কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন তাদের সবারই নির্ধারিত সময় চিরস্থায়ী আজাবের জন্যে।

٤١. يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى بِقَرَابَةٍ اَوْ صَدَاقَةٍ اَىْ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الْعَذَابِ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ لا يُمْنَعُوْنَ مِنْهُ وَيَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمِ الْفَصْلِ .

৪১. সেদিন কোনো বন্ধুই কোনো বন্ধুর উপকারে আসবে না অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা তাদের কোনো আজাব দূর করতে পারবে না। এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। শাস্তি থেকে বিরত রাখতে পারবে না। يَوْمَ শব্দ পূর্বের يَوْمَ الْفَصْلِ থেকে بَدَلٌ।

٤٢. اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ط وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَاِنَّهُ يَشْفَعُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِاِذْنِ اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ فِىْ اِنْتِقَامِهِ مِنَ الْكُفَّارِ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ .

৪২. তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তারা ছাড়া এবং তারা হলেন ঈমানদারগণ। কেননা তারা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ একে অপরের জন্যে সুপারিশ করবে। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী কাফেরদের প্রতি শাস্তি দেওয়ার উপর দয়াময় ঈমানদারদের প্রতি।

তাহকীক ও তারকীব

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ; এর দ্বারা রাসূল ﷺ -এর সান্ত্বনা উদ্দেশ্য। لَقَدْ -এর মধ্যে لَامٌ টি উহ্য قَسَمٌ -এর جَوَابٌ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ فِرْعَوْنَ : এটি حَرْفُ جَارٍّ -এর পুনরাবৃত্তির সাথে مِنَ الْعَذَابِ হতে بَدَلٌ হয়েছে এবং كَائِنًا বা صَادِرًا বা وَاقِعًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে عَذَابٌ থেকে حَالٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ صَادِرًا مِنْ فِرْعَوْنَ

قَوْلُهُ كَانَ : كَانَ -এর اِسْمٌ যা هُوَ উহ্য রয়েছে এবং عَالِيًا হলো তার খবর। আর مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ টা كَانَ -এর দ্বিতীয় খবর।

قَوْلُهُ اَىْ عَالِمِىْ زَمَانِهِمْ اَىِ الْعُقَلَاءِ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ মূলত একটি সংশয়ের নিরসন করা, যা اِخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

সংশয় : এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানী-গুণীদের উপর বনী ইসরাঈলদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অথচ প্রকাশ্য নস كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নিরসন : বনী ইসরাঈলদের তৎকালীন যুগের জ্ঞানীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল জ্ঞানী-গুণীদের উপর নয়। মুফাসসির (র.) عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -এর তাফসীর اَلْعُقَلَاءُ দ্বারা করার পরিবর্তে اَلثَّقَلَيْنِ দ্বারা করলে বেশি ভালো হতো। কেননা عُقَلَاءُ -এর মধ্যে দানব ও ফেরেশতা সকলেই অন্তর্ভুক্ত। অথচ বনী ইসরাঈলগণ ফেরেশতা থেকে উত্তম নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الْاٰيٰتِ : এটা اَلْمُبِيْنُ -এর بَيَانٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে فَوَاصِلُ -এর رِعَايَتٌ -এর কারণে مُقَدَّمٌ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ : এটা بَلٰٓؤٌا -এর তাফসীর; بَلٰٓؤٌا -এর মূল অর্থ হলো পরীক্ষা ও যাচাই বাছাইকরণ। আর যেহেতু নিয়ামত রহমত, স্বাচ্ছন্দ্য, কঠোরতো, কষ্ট, খারাপ অবস্থা, ভালো অবস্থা উভয় সুরতেই হয়ে থাকে এ কারণেই মুফাসসির (র.) بَلٰٓؤٌا -এর অনুবাদ نِعْمَتٌ দ্বারা করেছেন। -[صَاوِيْ]

قَوْلُهُ اَلْمَنَّ : এটা إِسْمُ ; অর্থ- একজাতীয় শিশিরের খামির। তীহ উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত বনী ইসরাঈলীদের খাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ গাছের পাতায় তা জমিয়ে দিতেন।

قَوْلُهُ سَلْوٰى : এটা একটি ছোট পাখি, যাকে بَتِيْر বলা হয়। কামূস গ্রন্থে এর একবচন سَلْوَاةٌ লিখা হয়েছে। صِحَاحٌ -এ আখফাশ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এর একবচন শোনা যায়নি। এরূপ জানা যায় যে, এর একবচন ও বহুবচন একই রূপের হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ هٰٓؤُلَاءِ : এটা নিকটবর্তীর জন্য إِسْمُ إِشَارَةٍ। কাফেরদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার জন্য إِسْمُ إِشَارَةٍ قَرِيْبٌ -এর ব্যবহার করেছেন।

قوله قوم تبع : এটা تُبَّعٌ حِمْيَرِيْ ; তার কুনিয়ত হলো আবূ কুরাইব, তার নাম সা'আদ। আনসারী বনী হীরা তার দিকেই নিসবতকৃত حِيْرَةٌ কূফার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : এর আতফ হয়েছে قَوْمُ تُبَّعٍ -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ : [আমি বনী ইসরাঈলকে জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।] এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরি হয় না। কেননা এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বুঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কুরআনে হযরত মারইয়ামকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোনো বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلٰى عِلْمٍ [জেনেশুনে] -এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ : [আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলি দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।] এখানে লাঠি, দীপ্তময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মু'জিযা বুঝানো হয়েছে। بلاء শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : [তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।] এই আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট বিধায় কুরআন পাক এর কোনো জবাব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায়?

-[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা : أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ [তারা শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায়?] কুরআনে দু-জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে। এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে কোনো বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়; বরং এটা ইয়েমেনের হিমযারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়েমেনের পশ্চিমাংশকে

রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই تُبَّعٌ শব্দের বহুবচন تَبَابِعَه ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবেয়ায়ে-ইয়েমেন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীর (র.)-এর বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বুঝানো হয়েছে, যার নাম আসআদ আবূ কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব। যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদিনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদিনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদিনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদিনার দুজন ইহুদি আলেম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না। কারণ এটা শেষ পয়গাম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদি আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়েমেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য তখন ইহুদি ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে : শুধু তুব্বা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, تُبَّعٌ -কে খারাপ বলো না, সে ভালো মানুষ ছিল। রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে বলেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে, আমি জানি না তুব্বা নবী ছিলেন কিনা? তুব্বা দারে আবী আইয়ূব রাসূল ﷺ -এর জন্য বানিয়ে ছিলেন এবং অসিয়তনামাতে লিখেছিলেন যে, শেষ নবী যখন আগমন করবেন তখন এই ঘর ও আমার বার্তা তার সম্মুখে পেশ করবে। কাজেই সেই বার্তা/ চিঠি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌঁছে দেন। সেই চিঠিতে এই কবিতাও লিখিত ছিল যে,

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَ أَنَّهُ ٭ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ بَارِى النَّسَمِ
فَلَوْ مُدَّ عُمْرِى إِلَى عُمْرِهِ ٭ كُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ

ইবনে ইসহাকের মতে চিঠির বিষয়বস্তু এরূপ ছিল–

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَأَنَا عَلَى دِيْنِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَىْءٍ وَأَمَنْتُ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا وَنَعِمْتُ وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ أَبِيْكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ خَتَمَ الْكِتَابَ وَنَقَشَ عَلَيْهِ. لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَكَتَبَ عُنْوَانَهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَبِيِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تُبَّعٍ أَوَّلٍ. –(لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِ)

قَوْلُهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : [আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।] উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যেবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান না থাকলে সৃষ্টির সকল কাণ্ডকারখানাই পণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর মাহাত্ম্যের পরিপন্থি। চতুর্থত সৃষ্টিজগৎ চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

অনুবাদ :

٤٣. اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ هِيَ مِنْ اَخْبَثِ الشَّجَرِ الْمُرِّ بِتِهَامَةٍ يُنْبِتُهَا اللّٰهُ فِي الْجَحِيْمِ .

৪৩. নিশ্চয় জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ, এটা অধিক তিক্ত নিকৃষ্ট একটি গাছ যা তিহামা অঞ্চলে জন্মে। আল্লাহ তা'আলা এটা জাহান্নামে উৎপন্ন করবেন।

٤٤. طَعَامُ الْاَثِيْمِ ج اَيْ اَبِيْ جَهْلٍ وَاَصْحَابِهِ ذَوِي الْاِثْمِ الْكَثِيْرِ .

৪৪. পাপীর অর্থাৎ আবূ জাহল ও অধিক পাপের অধিকারী তার সঙ্গীদের খাদ্য হবে।

٤٥. كَالْمُهْلِ ج اَيْ كَدُرْدِيِّ الزَّيْتِ الْاَسْوَدِ خَبَرٌ ثَانٍ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ بِالْفَوْقَانِيَّةِ خَبَرٌ ثَالِثٌ وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ حَالٌ مِنَ الْمُهْلِ .

৪৫. গলিত তামার মতো অর্থাৎ কালো আলকাতরার ন্যায় পেটের ভিতরে ফুটতে থাকবে। كَالْمُهْلِ দ্বিতীয় খবর। تَغْلِيْ শব্দটি تَا -এর সাথে তৃতীয় খবর এবং يَغْلِيْ শব্দটি ي -এর সাথে اَلْمُهْلِ থেকে حَالٌ -

٤٦. كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ الْمَاءِ الشَّدِيْدِ الْحَرَارَةِ .

৪৬. যেমন ফুটে প্রচণ্ড গরম পানি।

٤٧. خُذُوْهُ يُقَالُ لِلزَّبَانِيَةِ خُذُوا الْاَثِيْمَ فَاعْتِلُوْهُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا جُرُّوْهُ بِغِلْظَةٍ وَشِدَّةٍ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۙ وَسَطِ النَّارِ .

৪৭. এবং জাহান্নামে নিযুক্ত ফেরেশতাদের বলা হবে একে ধর অর্থাৎ পাপিষ্ঠদের ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। فَاعْتِلُوْهُ -এর ت যের বা পেশযোগে অর্থাৎ তাকে শক্ত ও কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যাও।

٤٨. ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ط اَيْ مِنَ الْحَمِيْمِ الَّذِيْ لَا يُفَارِقُهُ الْعَذَابُ فَهُوَ اَبْلَغُ مِمَّا فِيْ اٰيَةٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ .

৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির আজাব। অর্থাৎ এমন গরম পানি যা থেকে আজাব পৃথক হয় না। এই অর্থ অধিক সুন্দর ঐ অর্থ থেকে, যা يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ الخ আয়াত থেকে নেওয়া হয়।

٤٩. وَيُقَالُ لَهُ ذُقْ ج اَيِ الْعَذَابَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ بِزَعْمِكَ وَقَوْلِكَ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا اَعَزُّ وَاَكْرَمُ مِنِّيْ .

৪৯. এবং বলা হবে যে, তুমি স্বাদ গ্রহণ কর অর্থাৎ আজাবের নিশ্চয় তোমার ধারণায় তুমিতো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। তোমার দাবি, কথা, মক্কার দুই পাহাড়ের মধ্যখানে আমার চেয়ে বড় সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত কেউ নেই।

٥٠. وَيُقَالُ لَهُمْ اِنَّ هٰذَا الَّذِيْ تَرَوْنَ مِنَ الْعَذَابِ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ فِيْهِ تَشُكُّوْنَ .

৫০. এবং তাদেরকে বলা হবে যে, নিশ্চয় এই শাস্তি যা তোমরা দেখছ ঐ শাস্তি যা সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।

٥١. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ مَجْلِسٍ اَمِيْنٍ يُؤْمَنُ فِيْهِ الْخَوْفُ .

৫১. নিশ্চয় পরহেজগার লোকেরা নিরাপদ শান্তির জায়গায় থাকবে যাতে ভয় ইত্যাদি থেকে নিরাপদ হয়।

٥٢. فِىْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَعُيُوْنٍ ج

৫২. মনোরম উদ্যান ও নির্ঝরণীসমূহে।

٥٣. يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ اَىْ مَا رَقَّ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَمَا غَلُظَ مِنْهُ مُتَقٰبِلِيْنَ ج حَالٌ اَىْ لَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى قَفَا بَعْضٍ لِدَوَرَانِ الْاَسِرَّةِ بِهِمْ .

৫৩. তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমি বস্ত্র, সামনাসামনি হয়ে বসবে। مُتَقَابِلِيْنَ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ তাদের আসনস্থল গোলাকার হওয়ার দরুন কেউ কারো পিঠ দেখবে না।

٥٤. كَذٰلِكَ قف يُقَدَّرُ قَبْلَهُ الْاَمْرُ وَزَوَّجْنٰهُمْ مِنَ التَّزْوِيْجِ اَوْ قَرَنَّاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ بِنِسَاءٍ بِيْضٍ وَاسِعَاتِ الْاَعْيُنِ حِسَانِهَا .

৫৪. এরূপই হবে كَذٰلِكَ -এর পূর্বে اَلْاَمْرُ উহ্য রয়েছে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব।

٥٥. يَدْعُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْخَدَمَ فِيْهَا اَىِ الْجَنَّةِ اَنْ يَاْتُوْا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مِنْهَا اٰمِنِيْنَ ج مِنْ اِنْقِطَاعِهَا وَمَضَرَّتِهَا وَمِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ حَالٌ .

৫৫. তারা সেখানে জান্নাতে খাদেমদেরকে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে তা শেষ হয়ে যাওয়া, তার ক্ষতি ইত্যাদির আশঙ্কা হতে মুক্ত থেকে শান্ত মনে। اٰمِنِيْنَ টি يَدْعُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ -

٥٦. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج اَىِ الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا بَعْدَ حَيٰوتِهِمْ فِيْهَا قَالَ بَعْضُهُمْ اِلَّا بِمَعْنٰى بَعْدَ وَوَقٰيهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ .

৫৬. তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত অর্থাৎ প্রথম মৃত্যু যা দুনিয়াতে তাদের হায়াতের পর দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেছেন, اِلَّا শব্দটি بَعْدَ -এর অর্থে। এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন।

٥٧. فَضْلًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى تَفَضُّلًا مَنْصُوْبٌ بِتَفَضَّلَ مُقَدَّرًا مِنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

৫৭. তোমার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহাসাফল্য। فَضْلًا মাসদার; অর্থাৎ تَفَضُّلًا এবং উহ্য تَفَضَّلَ দ্বারা মানসূব।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ . ٥٨ ৫৮. আমি আপনার ভাষায় এটাকে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। যাতে আরববাসী আপনার কাছে এটা শুনে বুঝে। যাতে তারা স্মরণ রাখে। নসিহত কবুল করে ঈমান গ্রহণ করে। কিন্তু তারা তবুও ঈমান আনেনি।

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ . ٥٩ ৫৯. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন তাদের ধ্বংসের এবং তারাও অপেক্ষা করছে। তোমার ধ্বংসের। এ হুকুম জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বের।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ : এখানে شَجَرَتَ শব্দটি تَائِے مَجْرُوْرَة -এর সাথে হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য স্থানে تَائِے مُدَوَّرَة -এর সাথে এসেছে وَقْف -এর অবস্থায় ، এবং ة ت উভয়টি পড়া হয়েছে।

قَوْلُهُ زَقُّوْمٍ : এটা একটি জংলী উদ্ভিদ, চামেলির মতো তাতে ফুল আসে। এটা জাহান্নামিদের খাদ্য, উর্দুতে تهوہڑ এবং হিন্দিতে ناگ پھن বলা হয়। এর স্বাদ তিক্ত বিস্বাদ।

مُجَرَّبْ نُسْخَه [পরীক্ষিত ঔষধ] : زَقُّوْم এমন গাছকেও বলা হয় যার ফল খেজুরের মতো হয়। এর তৈল পাকস্থলীর ঠাণ্ডা বায়ু নিঃসরণে খুবই উপকারী। কাঁশি রোগের জন্য বিস্ময়কর ফলপ্রদ। জোড়াসমূহের ব্যথা, সায়্যাটিকা, গেটে বাত এবং কাটিদেশে আটক বায়ু নিঃসরণে দ্রুত ক্রিয়াশীল ও খুবই উপকারী।

সেবন বিধি : প্রতিদিন সাত দিরহাম পরিমাণ তিন দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। এই ঔষধ দ্বারা বিকলাঙ্গ এবং মাজুরগণও আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো হয়ে যায়।

قَوْلُهُ تِهَامَةٍ : মক্কা মোয়াজ্জমা ও হিজাজের দক্ষিণ এলাকাকে নিসবতের জন্য তেহামা বলা হয়। এর বহুবচনে تِهَامُوْنَ ، تِهَامِيُّوْنَ আসে।

قَوْلُهُ كَالْمُهْلِ : অর্থ– গলিত ধাতু। دردی অর্থ– গাদ। তলানি তৈল ইত্যাদির গাদ, কালো তেল, তারকুল।

قَوْلُهُ طَعَامُ الْأَثِيْمِ : এটা إِنَّ -এর প্রথম খবর আর كَالْمُهْلِ হলো দ্বিতীয় খবর। تَغْلِيْ শব্দটি ت সহ তৃতীয় খবর। আর ي -এর সাথে হলে اَلْمُهْلِ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ : এতে يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ -এর তুলনায় অধিক মুবালাগা হয়েছে। প্রথম আয়াতে শাস্তিকে মাথার উপর প্রবাহিত করার হুকুম হয়েছে। মনে হয় যেন পানি এতই গরম যে, তা নিজেই শাস্তি হয়ে গেছে। কাজেই এখন তা হতে حَرَارَتْ বা উষ্ণতা পৃথক হবে না। কেননা حَرَارَتْ টা এখন صِفَتْ থাকেনি; বরং নিজেই মাওসূফ হয়ে গেছে। এতে অধিক মুবালাগা রয়েছে এটা বলা থেকে যে, তার উপর গরম পানি ঢেলে দাও। এখানে পানি মাওসূফ আর গরম হলো তার সিফাত। আর সিফাতটা মাওসূফ হতে পৃথক হতে পারে।

قَوْلُهُ قَرَنَّاهُمْ : এটা সেই সন্দেহের জবাব যে, زَوَّجْنَا টা مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِه হয়েছে; অথচ এখানে তার সেলাহ بِحُوْرٍ عِيْنٍ -এর ب . জবাব হলো এই যে, زَوَّجْنَا হলো قَرَنَّا অর্থে, কাজেই তার সেলাহ ب . নেওয়া বৈধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কুরআন পাকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

قَوْلُهُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ : যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা সাফফাতে কিছু জরুরি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نُزُلٌ বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضِيَافَةٌ অথবা مَأْدُبَةٌ বলা হয়। কুরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল। কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরো লাঞ্ছিত করার জন্য ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ : এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি। যথা– ১. উত্তম বাসগৃহ ২. উত্তম পোশাক ৩. আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী ৪. সুস্বাদু খাদ্য ৫. এসব নিয়ামতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং ৬. দুঃখকষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতিদের জন্যে প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রধান গুণ।

قَوْلُهُ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ : এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমিবস্ত্র।

قَوْلُهُ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ : تَزْوِيْج -এর অর্থ কাউকে অন্যের যুগল করে দেওয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতি পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথানিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না; কিন্তু সম্মানার্থে এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতি পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোনো মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামিদের জন্যও। কিন্তু সেটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতিরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরো বৃদ্ধি করে দেবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

১. হা-মিম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَاٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهٗ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمِ فِىْ صُنْعِهٖ .

২. কিতাব কুরআন এর অবতরণ পরাক্রান্ত, তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তাঁর কর্মে আল্লাহর পক্ষ থেকে। تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ মুবতাদা مِنَ اللّٰهِ খবর।

٣. اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ فِىْ خَلْقِهِمَا لَاٰيٰتٍ دَالَّةٍ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ وَوَحْدَانِيَّتِهٖ تَعَالٰى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ط .

৩. নিশ্চয় নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে অর্থাৎ এ দুয়ের সৃষ্টির মধ্যে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। যা আল্লাহর কুদরত ও একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে।

٤. وَفِىْ خَلْقِكُمْ اَىْ خَلْقِ كُلٍّ مِّنْكُمْ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةٍ اِلٰى اَنْ صَارَ اِنْسَانًا وَ خَلْقِ مَا يَبُثُّ يُفَرِّقُ فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ هِىَ مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ .

৪. আর তোমাদের সৃষ্টিতে অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে বীর্য থেকে অতঃপর জমাট রক্ত অতঃপর এক টুকরো মাংস থেকে পরিপূর্ণ একজন মানুষরূপে সৃষ্টি করাতে এবং পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীবজন্তু সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলি রয়েছে কিয়ামতের উপর বিশ্বাসীদের জন্য। دَابَّةٌ বলা হয় যা ভূমিতে বিচরণ করে। যেমন– মানুষ ইত্যাদি।

٥. وَ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَهَابِهِمَا وَمَجِيْئِهِمَا وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ مَطَرٍ لِاَنَّهٗ سَبَبُ الرِّزْقِ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ تَقْلِيْبِهَا مَرَّةً جَنُوْبًا وَّمَرَّةً شِمَالًا وَّبَارِدَةً وَّحَارَّةً اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ الدَّلِيْلَ فَيُؤْمِنُوْنَ .

৫. আর দিবারাত্রির পরিবর্তনে অর্থাৎ দিবারাত্রির আগমন ও গমনে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিজিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বৃষ্টিকে রিজিক বলা হয়েছে। কেননা এটা রিজিকের কারণ। অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে কখনো উত্তর দিকে ও কখনো দক্ষিণে, কখনো ঠাণ্ডা ও কখনো গরম নিদর্শনাবলি রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে যারা দলিল-প্রমাণাদি বুঝে অতঃপর ঈমান আনে।

٦. تِلْكَ الْاٰيٰتُ الْمَذْكُوْرَةُ اٰيٰتُ اللّٰهِ حُجَجُهُ الدَّالَّةُ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهٖ نَتْلُوْهَا نَقُصُّهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ج مُتَعَلِّقٌ بِنَتْلُوْ فَبِاَیِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ اَیْ حَدِيْثِهٖ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَاٰيٰتِهٖ حُجَجِهٖ يُؤْمِنُوْنَ اَیْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَیْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَفِیْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ.

৬. এগুলো উল্লিখিত নিদর্শনাবলি আল্লাহর আয়াত অর্থাৎ আল্লাহর ঐ দলিলসমূহ যা তাঁর একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে। যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। بِالْحَقِّ -এর সম্পর্ক نَتْلُوْ -এর সাথে। অতএব, আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন ও তাঁর আয়াতের পর তারা মক্কার কাফেররা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ ঈমান আনবে না। এবং অন্য কেরাত মতে يُؤْمِنُوْنَ -টা تَاء -এর সাথে تُؤْمِنُوْنَ -

٧. وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ كَذَّابٍ اَثِيْمٍ لَا كَثِيْرِ الْاِثْمِ.

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর অধিক পাপকারীর জন্যে। وَيْلٌ আজাব সংক্রান্ত শব্দ।

٨. يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ عَلٰى كُفْرِهٖ مُسْتَكْبِرًا مُتَكَبِّرًا عَنِ الْاِيْمَانِ كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ.

৮. সে আল্লাহর আয়াতসমূহ কুরআন যা তার সামনে তেলাওয়াত করা হয় শুনে। অতঃপর ঈমান থেকে অহংকারবশত ফিরে কুফরির উপর অবিচল থাকে, যেন সে আয়াতসমূহ শুনেনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন!

٩. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا اَیِ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا نِ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ط اَیْ مَهْزُوًّا بِهَا اُولٰٓئِكَ اَیِ الْاَفَّاكُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ط ذُوْ اِهَانَةٍ.

৯. যখন সে আমার কুরআনের কোনো আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের অর্থাৎ ঠাট্টাকারীদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। مُهِيْنٌ অর্থ- ذُوْ اِهَانَةٍ

١٠. مِنْ وَّرَآئِهِمْ اَیْ اَمَامِهِمْ لِاَنَّهُمْ فِی الدُّنْيَا جَهَنَّمُ ج وَلَا يُغْنِیْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا مِنَ الْمَالِ وَالْفِعَالِ شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَیِ الْاَصْنَامِ اَوْلِيَآءَ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

১০. তাদের পিছনে অর্থাৎ সামনে, কেননা তারা তো দুনিয়াতে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে সম্পদ ও আমল থেকে তা তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মূর্তিসমূহকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা কোনো কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

١١. هٰذَا اَیِ الْقُرْاٰنُ هُدًى ج مِنَ الضَّلَالَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ حَظٌّ مِّنْ رِّجْزٍ اَیْ عَذَابٍ اَلِيْمٌ مُّوْجِعٌ.

১১. এটা অর্থাৎ কুরআন সৎপথ প্রদর্শনকারী গোমরাহি থেকে আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ : এটা হলো মুবতাদা আর مِنَ اللّٰهِ টা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে তার খবর হয়েছে। আর الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ এ উভয়টি اَللّٰهِ-এর সিফত হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, تَنْزِيلُ الْكِتَابِ এটা هٰذَا উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে । আর مِنَ اللّٰهِ টা تَنْزِيلُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَاٰيَاتٍ : اٰيَاتٍ টা اِنَّ-এর اِسْم হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এটা সর্বসম্মতিতে كَسْرَه -এর সাথে পঠিত। তবে আগত আয়াত لَاٰيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ এবং اٰيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ এতে رَفْع এবং نَصْب উভয়টিই বৈধ রয়েছে। رَفْع এজন্য যে اٰيَاتٌ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرٌ আর فِيْ خَلْقِكُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمٌ আর نَصْب এজন্য যে, اٰيَاتٌ টা প্রথম اٰيَاتٌ -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে, যা اِنَّ -এর اِسْم আর فِيْ خَلْقِكُمْ টা فِي السَّمٰوَاتِ-এর উপর যা اِنَّ -এর খবর হয়েছে। এতে একটি عَامِلٌ -এর দু'টি مَعْمُوْل -এর উপর عَطْف হয়েছে, যা সর্বসম্মতিতে জায়েজ। [صَاوِيْ]

قَوْلُهُ وَخَلْقِ مَا يَبُثُّ : ব্যাখ্যাকার خَلْقِ মুযাফ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এর عَطْف হয়েছে خَلْقِكُمْ -এর উপর। আবার مَا يَبُثُّ -এর আতফ خَلْقِكُمْ -এর كُمْ যমীরের উপর হওয়াও বৈধ রয়েছে। তবে এটা তাদের নিকটই জায়েজ যারা যমীরে মাজরূর এর উপর হরফে জরের পুরাবৃত্তি ব্যতীত عَطْف জায়েজ বলে থাকেন।

قَوْلُهُ وَفِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : এখানে فِيْ -কে স্পষ্ট করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে فِيْ উহ্য রয়েছে। যেমন- قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। [صَاوِيْ]

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيَاتُ : এটা মুবতাদা ও খবর আর نَتْلُوْهَا টা حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُوْنَ : দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ -এর মধ্যে هَمْزَه টা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْلٌ : এটা শাস্তি এবং জাহান্নামের উপত্যকা উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ كَاَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا : كَاَنْ টা মূলে كَاَنَّ ছিল। مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ যমীরে শান উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كَاَنَّهٗ বাক্যটি হয়তো مُسْتَانِفَه হবে বা حَالٌ হবে। [صَاوِيْ]

قَوْلُهُ اِتَّخَذَهَا هُزُوًا : প্রশ্ন. اِتَّخَذَهَا-এর যমীর شَيْئًا -এর দিকে ফিরেছে যা مُذَكَّرٌ কাজেই তার প্রতি مُؤَنَّثْ -এর যমীর ফিরানো সহীহ নয়।

উত্তর. অর্থের হিসেবে مُؤَنَّثْ -এর যমীর ফিরানো বৈধ। কেননা شَيْئًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اٰيَاتٌ -

দ্বিতীয় জবাব : اٰيَاتِنَا -এর দিকে ফিরানোও বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَيْ اَمَامِهِمْ : এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَرَاءِ টা اَمَام এবং خَلْق উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা জাসিয়াহ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : একটি আয়াত ব্যতীত এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ, ৬৪৪ বাক্য ও ২৬০০ অক্ষর রয়েছে। সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে- قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদিনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হলো বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তাওহীদ, রিসালত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলিলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরীয়া'ও বলা হয়। ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা জাসিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়াহ হযরত জোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরাতুশ শরিয়া মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরিয়া'ও বলা হয়।

–[তাফসীরে দুররুল মানসূর, খ. ৬, পৃ. ৩৮]

সূরা জাসিয়ার আমল : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সূরা জাসিয়া' লিপিবদ্ধ করে যদি তার দেহে বেঁধে রাখা হয়, তবে সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নবজাত শিশু হেফাজতে থাকে।

স্বপ্নের তাবির : যে ব্যক্তি এ সূরাকে স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে, তার মধ্যে দুনিয়া-ত্যাগী ভাব সৃষ্টি হবে এবং সে পরহেজগার হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে এমন গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে যা মানবজীবনের সাফল্যের কারণ হয়। এরপর একথা ঘোষণা করা হয় যে, কুরআনে কারীমকে আরবি ভাষায় সহজ করে নাজিল করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, এরপরও যদি কেউ হেদায়েত কবুল না করে তবে তা সে ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ প্রেক্ষিতেই সূরা জাসিয়ার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সৃষ্টিজগতে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ : এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তাওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্বান পাঠকবর্গ ইমাম রাযীর তাফসীরে কাবীরে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তাওহীদের দলিল। এ বিশ্বাস কোনো না কোনো দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী। কারণ সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেককে কষ্ট দেওয়া পছন্দ করে না, তাদের জন্য হাজারো দলিল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ : [মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ।] কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোনো রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ সম্পর্কে এবং কোনো রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়। –[কুরতুবী]

আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শব্দ ব্যক্ত করেছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ একজন হোক অথবা তিনজন।

قَوْلُهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ : وَرَاءَ শব্দটি আরবিতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশি এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। যারা পেছনে অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবনযাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ পরে জাহান্নাম আসছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অনুবাদ :

١٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ السُّفُنُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ بِاِذْنِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا بِالتِّجَارَةِ مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

১২. তিনি আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٣. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ مِنْ شَمْسٍ وَّقَمَرٍ وَّنَجْمٍ وَّمَاءٍ وَّغَيْرِهٖ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّشَجَرٍ وَّنَبَاتٍ وَّاَنْهَارٍ وَّغَيْرِهَا اَىْ خَلَقَ ذٰلِكَ لِمَنَافِعِكُمْ جَمِيْعًا تَاكِيْدٌ مِّنْهُ ط حَالٌ اَىْ سَخَّرَهَا كَائِنَةً مِّنْهُ تَعَالٰى اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا فَيُؤْمِنُوْنَ .

১৩. এবং তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যা আছে নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও পানি ইত্যাদি থেকে ও যা আছে ভূমণ্ডলে জীবপ্রাণী, গাছপালা ও নদীনালা থেকে। অর্থাৎ এসব কিছুই তাদের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সবই তার পক্ষ থেকে جَمِيْعًا তাকীদ, مِنْهُ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ এই অধীনস্থ করে দেওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে এমন গোত্রের জন্যে যারা চিন্তা করে অতঃপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।

١٤. قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ وَقَائِعَهٗ اَىْ اِغْفِرُوْا لِلْكُفَّارِ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْاَذٰى لَكُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِجِهَادِهِمْ لِيَجْزِىَ اَىِ اللّٰهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنَ الْغَفْرِ لِلْكُفَّارِ اَذَاهُمْ .

১৪. আপনি ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদেরকে, যারা আল্লাহর দিনসমূহের অবস্থা থেকে ভয় করে না। অর্থাৎ তোমরা ক্ষমা করে দাও কাফেরদেরকে, তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কষ্টসমূহ এবং এই নির্দেশ জিহাদের হুকুম আসার পূর্বে। যাতে আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পুরাপুরি বিনিময় দিতে পারেন। কাফেরদেরকে তাদের ক্ষমার বিনিময়ে।

١٥. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ج عَمِلَ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز اَسَاءَ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ تَصِيْرُوْنَ فَيُجَازِى الْمُصْلِحَ وَالْمُسِىْءَ .

১৫. যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই তা করছে আর যে অসৎকাজ করছে তা তার উপরই বর্তাবে। তোমাদের সবাইকে স্বীয় মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে অতএব সৎকর্মপরায়ণ ও অসৎ ব্যক্তিদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

١٦. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ وَالْحُكْمَ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ وَالنُّبُوَّةَ لِمُوْسٰى وَهَارُوْنَ مِنْهُمْ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ الْحَلَالَاتِ كَالْمَنِّ وَالسَّلْوٰى وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ج عَالَمِيْ زَمَانِهِمُ الْعُقَلَاءِ۔

১৬. আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, তাওরাত রাজত্ব জনগণের উপর রাজত্ব ও নবুয়ত তাদের মধ্যে মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিজিক হালাল রিজিক যেমন– মান্না ও সালওয়া ইত্যাদি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বিশ্বজাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্বও দান করেছিলাম তাদের সময়কালের জ্ঞানীদের উপর।

١٧. وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ج اَمْرِ الدِّيْنِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَبَعْثِهٖ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا فِيْ بِعْثَتِهٖ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ اَيْ لِبَغْيٍ حَدَثَ بَيْنَهُمْ حَسَدًا لَهٗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۔

১৭. আমি আরো দিয়েছিলাম তাদেরকে দীন সংক্রান্ত বিষয়াবলি অর্থাৎ হালাল, হারাম ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের উপর মতভেদ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ তাদের মতভেদের কারণ শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি হিংসা ও জেদ হিসেবে। নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমার প্রভু তাদের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা দুনিয়ায় মতবিরোধ করেছে।

١٨. ثُمَّ جَعَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى شَرِيْعَةٍ طَرِيْقَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ اَمْرِ الدِّيْنِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فِيْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ۔

১৮. অতঃপর হে মুহাম্মদ ﷺ আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ পদ্ধতির উপর রেখেছি। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন ও সেসব লোকদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবেন না, যারা কিছুই জানে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার পরিণাম সম্পর্কে।

١٩. اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا يَدْفَعُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ شَيْـًٔا ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ج وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

১৯. এরা আপনার থেকে আল্লাহর কোনো আজাব কখনো সরাতে পারবে না। নিশ্চয় জালিমগণ কাফেররা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেজগার তথা ঈমানদারগণের বন্ধু।

২০. هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ مَعَالِمُ يَتَبَصَّرُوْنَ بِهَا فِى الْاَحْكَامِ وَالْحُدُوْدِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ .

২০. এই কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার এটা দ্বারা তারা আহকাম ও দণ্ডবিধির হুকুম শিক্ষা করে; এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়েত ও রহমত।

২১. اَمْ بِمَعْنَى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا اكْتَسَبُوْا السَّيِّاٰتِ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِىَ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَآءً خَبَرٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط مُبْتَدَأٌ وَمَعْطُوْفٌ وَالْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِ وَالضَّمِيْرَانِ لِلْكُفَّارِ الْمَعْنٰى اِحْسِبُوْا اَنْ نَّجْعَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ فِىْ خَيْرٍ كَالْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ فِىْ رَغَدٍ مِنَ الْعَيْشِ مُسَاوٍ لِعَيْشِهِمْ فِى الدُّنْيَا حَيْثُ قَالُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَئِنْ بُعِثْنَا لَنُعْطٰى مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ مَا تُعْطَوْنَ قَالَ تَعَالٰى عَلٰى وَفْقِ اِنْكَارِهِ بِالْهَمْزَةِ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ فَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ عَلٰى خِلَافِ عَيْشِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْمُؤْمِنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فِى الثَّوَابِ بِعَمَلِهِمُ الصَّالِحَاتِ فِى الدُّنْيَا مِنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ اَىْ بِئْسَ حُكْمًا حُكْمُهُمْ هٰذَا .

২১. যারা অপকর্ম করেছে কুফর ও পাপাচারের মাধ্যমে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মতো করে দেব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? اَمْ অস্বীকারমূলক হামযা তথা هَمْزَةُ اِنْكَارٍ -এর অর্থে। سَوَآءً খবরে মুকাদ্দম এবং مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ মুবতাদা হয়ে مَعْطُوْف এবং পূরো জুমলাটি ك থেকে بَدَل এবং مَحْيَاهُمْ-مَمَاتُهُمْ উভয়ের যমীর কাফেরের দিকে ফিরবে। আয়াতের অর্থ হলো, এ কাফের সম্প্রদায় কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে আখিরাতে ঈমানদারদের মতো সুখে রাখব অর্থাৎ সুখ-শান্তির জীবনে তারা মুমিনদের সমান হবে! কেননা তারা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে বলেছিল যে, যদি আবার জীবিত করে আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়, তাহলে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখা হবে যেমন তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَمْزَةٌ কে اِنْكَارِىْ মানার ক্ষেত্রে তাদের ফয়সালা, দাবি কতইনা মন্দ। অর্থাৎ বাস্তব এমন নয়, বরং তারা পরকালে আজাবে লিপ্ত থাকবে দুনিয়াতে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে এবং ঈমানদারগণ দুনিয়াতে তাদের কৃত সৎআমল যেমন- নামাজ, জাকাত ও রোজা ইত্যাদির পরিবর্তে আখিরাতে ছওয়াব ও সুখপ্রাপ্ত হবে। مَا يَحْكُمُوْنَ -এর মধ্যে مَا টি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ : এখানে وَاوْ টি হলো عَاطِفَةْ পূর্বের বাক্যের উপর এ বাক্যের আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ جَمِيْعًا : এটা مَا থেকে حَالْ হয়েছে এবং مِنْهُ টা سَخَّرَهَا -এর هَا যমীর থেকে حَالْ হয়েছে অর্থাৎ سَخَّرَهَا كَائِنَةً مِنْهُ تَعَالٰى আল্লামা মহল্লী (র.) جَمِيْعًا-কে مَا مَوْصُوْلَهْ -এর তাকিদ বলেছেন, যা سَخَّرَهَا -এর মাফউল সম্ভবত এটা আল্লামা মহল্লী (র.)-এর وَهْم হয়েছে। যদি جَمِيْعًا টা مَانے مَوْصُوْلَهْ -এর তাকিদ হতো তবে جَمِيْعَهُ বলা হতো সম্ভবত আল্লামা মহল্লী (র.) এ ক্ষেত্রে ইবনে মালেকের অনুসরণ করেছেন। তিনি ব্যতীত جَمِيْعًا -এর মাধ্যমে তাকিদ কম ব্যবহার হয়েছে। কাজেই কুরআনকে এর উপর مَحْمُوْلْ করা উত্তম নয়।

قَوْلُهُ مِنْهُ : এটা حَالْ হয়েছে অর্থাৎ سَخَّرَهَا كَائِنَةً مِنْهُ تَعَالٰى

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : উল্লিখিত বাক্যটি ক্ষমা করার ইল্লত। আর قَوْمًا দ্বারা قَوْمٌ مُؤْمِنٌ উদ্দেশ্য। আর مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষমা করার আমল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেওয়াকে ক্ষমা করে দেওয়ার হুকুম করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। এই বিধান জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল।

আয়াতের অন্য অর্থ : قَوْمًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের সম্প্রদায় আর مَا كَسَبُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের অনুচিত ও গর্হিত কার্যাবলি, যা মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার সুরতে করতেছিল। আর جَزَاءْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাস্তি। উদ্দেশ্য এই যে, হে মুমিনগণ! তোমরা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করো না, আমিই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। প্রথমটি অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا : قُلْ -এর مَقُوْلَهْ তথা اِغْفِرُوْا টি جَوَابُ اَمْرٍ তথা يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ -এর দালালত করার কারণে উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- قُلْ لَهُمْ اِغْفِرُوْا يَغْفِرُوْا আর لِيَجْزِيَ উহ্য اَمْرٌ তথা اِغْفِرُوْا -এর ইল্লত। আল্লামা মহল্লী (র.) مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -এর তাফসীর مِنَ الْغَفْرِ لِكُفَّارٍ اِذَا هُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْكِتٰبَ : বনী ইসরাঈলের কিতাব হলো তিনটি। যথা- যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল। কিন্তু যেহেতু এগুলোর মধ্যে তাওরাত হলো মূল যা অন্য কিতাবের দ্বারা যথেষ্ট করে। এ কারণেই এখানে তাওরাতের উপর নির্ভর করেছেন।

قَوْلُهُ الْعُقَلَاءُ : যদি মুফাসসির (র.) اَلْعُقَلَاءُ -এর পরিবর্তে اَلثَّقَلَيْنِ বলতেন, তবে ভালো ও যথোপযুক্ত হতো। কেননা اَلْعُقَلَاءُ -এর মধ্যে ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। অথচ ফেরেশতাগণ আসমানি কিতাবের مُكَلَّفْ নন। তাফসীরে বায়যাভীর ইবারত হলো- وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ حَيْثُ اٰتَيْنَاهُمْ مَا لَمْ نُؤْتِهِ اَحَدًا غَيْرَهُمْ ; কাযী বায়যাভীর উক্তি- حَيْثُ اٰتَيْنَاهُمْ الخ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَالَمِيْ زَمَانِهِمْ -এরও প্রয়োজন নেই। কেননা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল فَضَائِلْ -এর মধ্যে خُصُوْصِيَّتْ বর্ণনা করা, যা বাস্তবে অন্যদের অর্জিত ছিল না। আর جُزْئِيْ فَضِيْلَتْ দ্বারা كُلِّيْ فَضِيْلَتْ প্রমাণিত হয় না। যেমন- বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবীর আগমন ঘটা, সমুদ্র বিদীর্ণ করে রাস্তা করে দেওয়া, তাদের শত্রু ফেরাউনের নিমজ্জিত হওয়া, মান্না সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া, একটি পাথর হতে বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হওয়া। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রতিদানের হিসেবে ফজিলত উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَبِعْثِهِ مُحَمَّدٍ : এর আতফ اَلَّذِيْنَ -এর উপর অর্থাৎ اَمْرِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ

قَوْلُهُ تَبْغِيْ حَدَثَ : এতে দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম হলো بَغْيًا টা মতবিরোধের ইল্লত। আর দ্বিতীয় হলো বনী ইসরাঈলের মাঝে মতবিরোধের কারণ তাদের পরস্পর হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি ছিল।

قَوْلُهُ هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ : প্রশ্ন. هٰذَا মুবতাদা যা একবচন, আর بَصَائِرُ হলো বহুবচন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই
উত্তর. هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসংখ্য আয়াত ও বিভিন্ন প্রমাণাদি কেননা অর্থের দিক থেকে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ : এর সম্পর্কে لَا تَتَّبِعُوْنَ -এর সাথে।

قَوْلُهُ مَعَالِمُ : এটা مَعْلَمٌ -এর বহুবচন। ঐ চিহ্নকে বলা হয়, যার দ্বারা রাস্তার দিকনির্দেশনা জানা যায়। অর্থাৎ আয়াতসমূহ আহকামের প্রতি দিকনির্দেশনা করে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ : এটা حَسِبَ -এর ফায়েল আর أَنْ نَجْعَلَهُمْ الخ বাক্যটি حَسِبَ -এর দুই মাফঊলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ سَوَاءً : سَوَاءٌ টা رَفْع -এর সাথে مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ মুবতাদার خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর ইমাম কেসায়ী (র.) سَوَاءً -কে كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর যমীরে মাজরূর থেকে حَالٌ হওয়ার ভিত্তিতে নসবের সাথে পড়েছেন। অথবা এ কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে যে, এটা حَسِبَ তৃতীয় মাফঊল। আবার কেউ কেউ نَجْعَلَهُمْ-এর মাফঊল হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ : এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَمْ حَسِبَ -এর হামযাটা اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ -এর জন্য হয়েছে। এটা উচিত ছিল যে, মুফাসসির (র.) لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ -কে سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -এর উপর مُقَدَّمٌ করতেন। কেননা এ বাক্যটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ...........وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ : কুরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قَوْلُهُ قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ : [আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।] এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর (রা.) -এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসাছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আব্দুল্লাহ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রা.) এ বিষয়টি অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আব্দুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। -[তাফসীরে কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

সনদ খোঁজাখুঁজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ প্রমাণিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাজিল হয়েছিল, অতঃপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ

ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় পুনরায় একই আয়াত নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার [বারবার অবতরণ] বলা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতে اَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারাদি। اَيَّامٌ শব্দটি ঘটনাবলি ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবিতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনাযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরিকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহর ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাটো ধরাপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ-কারবারের ছোটখাটো বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নযূল যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয় তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْكِتٰبَ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ : এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়। যথা– ১. বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমর্থন এবং ২. তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোনো ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

পূর্ববর্তী উম্মতদের শরিয়তের বিধান আমাদের জন্য : ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ [এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরিকার উপর রেখেছি।] এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন– তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধিবিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যেই এক ও অভিন্ন। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গাম্বরের শরিয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই "ধর্মের এক বিশেষ তরিকা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরিয়ত মুহাম্মদীর বিধানাবলিই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের একপ্রকার এই যে, কুরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কুরআন পাক অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের কোনো বিধান প্রশংসাছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরিয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এ বিধান শরিয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্যই পালনীয় হবে।

অনুবাদ :

٢٢. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ لِيَدُلَّ عَلٰى قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَالطَّاعَاتِ فَلَا يُسَاوِىْ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ .

২২. আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন, بِالْحَقِّ টি خَلَقَ -এর সাথে সম্পর্কিত যাতে এটা তাঁর কুদরত ও একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের চাই পাপকাজ হোক বা সৎকাজ ইত্যাদির যথাযথ বিনিময় পায়। অতএব কাফের মুমিনের সমান হয় না। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

٢٣. اَفَرَءَيْتَ اَخْبِرْنِىْ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ مَا يَهْوَاهُ مِنْ حَجَرٍ بَعْدَ حَجَرٍ يَرَاهُ اَحْسَنَ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ مِنْهُ تَعَالٰى اَىْ عَالِمًا بِاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الضَّلَالَةِ قَبْلَ خَلْقِهِ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ فَلَمْ يَسْمَعِ الْهُدٰى وَلَمْ يَعْقِلْهُ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشٰوَةً ط ظُلْمَةً فَلَمْ يَبْصُرِ الْهُدٰى وَيُقَدَّرُ هُنَا الْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ لِرَاَيْتَ اَىْ اَيَهْتَدِىْ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَىْ بَعْدَ اِضْلَالِهِ اِيَّاهُ اَىْ لَا يَهْتَدِىْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ تَتَّعِظُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الذَّالِ .

২৩. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, তার প্রতি যে নিজের খেয়াল-খুশিকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? অর্থাৎ যে পাথরকে একের পর এক পছন্দ করে তাকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়। আল্লাহ তাকে জেনেশুনে পথভ্রষ্ট করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ জানে যে, সে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন অতএব সে হেদায়তের বাণী শুনে না ও বুঝে না। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা অন্ধকার। ফলে সে হেদায়ত দেখে না। এখানে رَأَيْتَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل অর্থাৎ اَيَهْتَدِىْ উহ্য। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? অর্থাৎ আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করার পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে অর্থাৎ কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করবে না। তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না। উপদেশ গ্রহণ কর না। تَذَكَّرُوْنَ -এর একটি ت -কে ذ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

٢٤. وَقَالُوْٓا اَىْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ مَا هِىَ اَىِ الْحَيٰوةُ اِلَّا حَيَاتُنَا الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰى اَىْ يَمُوْتُ بَعْضٌ وَيَحْيٰى بَعْضٌ بِاَنْ يُوْلَدُوْا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ج اَىْ مُرُوْرُ الزَّمَانِ قَالَ تَعَالٰى وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقُوْلِ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ .

২৪. তারা কিয়ামত অস্বীকারকারীরা বলে, আমাদের এই পার্থিব দুনিয়া ছাড়া আর কোনো জীবনই নেই, আমরা মরি ও বাঁচি অর্থাৎ কেউ মৃত্যুবরণ করে আর জন্মের মাধ্যমে জীবিত হয়। এবং আমাদেরকে কিছুই ধ্বংস করে না কিন্তু দহর অর্থাৎ কালের আবর্তনই আমাদের যা কিছু ধ্বংস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের নিকট এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِنَا عَلَى الْبَعْثِ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اَحْيَاءً اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَنَّا نُبْعَثُ . ٢٥

২৫. তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ কুরআন যা পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর কুদরতের প্রতি দলিল বহন করে পাঠ করা হয়। بَيِّنَاتٌ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত নিয়ে এসো। নিশ্চয় আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ حِيْنَ كُنْتُمْ نُطْفًا ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اَحْيَاءً اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْقَائِلُوْنَ مَا ذُكِرَ لَا يَعْلَمُوْنَ . ٢٦

২৬. আপনি বলুন আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জীবন দান করেন যখন তোমরা বীর্য ছিলে। অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ উল্লিখিত বক্তাগণ তা বোঝে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ اَخْبِرْنِيْ : এতে سَبَبْ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা رُؤْيَتْ হলো سَبَبْ اِخْبَارْ কাজেই رُؤْيَتْ হলো سَبَبْ আর اِخْبَارْ হলো তার مُسَبَّبْ এবং এটা مَجَازْ হিসেবে اِطْلَاقْ হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامْ টা اَمْرْ -এর অর্থে হয়েছে এবং جَامِعْ طَلَبْ হয়েছে। কেননা اَمْرْ এবং اِسْتِفْهَامْ উভয়টা طَلَبْ -এর মধ্যে مُشْتَرِكْ -

قَوْلُهُ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ : এখানে عَلٰى عِلْمٍ টা اَضَلَّهُ -এর ফায়েল اَللّٰهُ হতেও حَالٌ হতে পারে এবং ، যমীরে মাফঊল থেকেও حَالٌ হতে পারে। মুফাসসির (র.) ফায়েল থেকে حَالٌ বলে এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় عِلْمٍ اَزَلِيٌّ -এর কারণে তার গোমরাহ হওয়াকে জানার কারণে তাকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন।

আর যারা عَلٰى عِلْمٍ -কে اَضَلَّهُ -এর যমীর থেকে حَالٌ বলেছেন তাদের নিকট উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বুঝা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ اَضَلَّهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْحَقِّ এতে কঠোর তিরস্কার রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقُوْلِ : ذٰلِكَ الْمَقُوْلُ দ্বারা আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের উক্তি- وَمَا يُهْلِكُنَا الدَّهْرُ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের নিকট তাদের এই কথার কোনোই দলিল নেই। আকলী দলিলও নেই, নকলী দলিলও নেই; বরং তারা অনুমান-নির্ভর কথা বলে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য : উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভালো বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না; বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথম

আয়াতে দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে আল্লাহদ্রোহী ও খেয়ালখুশির অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরিয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব যদি ইজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোনো চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবনযাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকুরি ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না, তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভালো, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই। যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও, কিন্তু দুনিয়াতে এর কোনো প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব সাধুতা ও অসাধুতা পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভালো ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে- وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভালো ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

قَوْلُهُ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ : [অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে-। বলা বাহুল্য, কোনো কাফেরও তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কুরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারো আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েজ নাজায়েজের পরওয়া করে না, আল্লাহ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে খেয়াল-খুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় এ বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন-

سوده گشت از سجده راه بتان پیشانیم * چند بر خود تهمت دین مسلمانی نهم

এতে খেয়াল-খুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেয়াল-খুশিকে স্বীয় ইমাম ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়াল-খুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবূ ওমামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশি। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশির পেছনে ছেড়ে

দেয় এবং তারপরেও আল্লাহর কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তস্তরী (র.) বলেন, তোমাদের খেয়াল-খুশি তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক।

–[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ : دَهْرٌ শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনো দীর্ঘ সময়কালকে دَهْرٌ বলা হয়। কাফেররা দলিলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ কোনো খোদায়ী আদেশ নয়; বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় : কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগৎ ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা দহর দ্বারা যে শক্তিকে ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ তা'আলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহাকালকে গালি দিয়ো না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আল্লাহই। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহর শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোনো কিছু নয়। এতে জরুরি হয় না যে, দহর আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে দহর বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٧. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْدَلُ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ الْكَافِرُوْنَ اَىْ يَظْهَرُ خُسْرَانُهُمْ بِاَنْ يَّصِيْرُوْا اِلَى النَّارِ ـ

২৭. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের যাবতীয় রাজত্ব আল্লাহ তা'আলার জন্যে যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থিরা অর্থাৎ কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে . يَوْمَئِذٍ টি يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ থেকে بَدَلْ অর্থাৎ সেদিন তাদের লোকসান প্রকাশ হবে তাদের জাহান্নামে প্রবেশের মধ্য দিয়ে।

٢٨. وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ اَىْ اَهْلَ دِيْنٍ جَاثِيَةً نف عَلَى الرُّكَبِ اَوْ مُجْتَمِعَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ط كِتَابِ اَعْمَالِهَا وَيُقَالُ لَهُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاؤُهٗ ـ

২৮. আপনি প্রত্যেক উম্মতকে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের দেখবেন নতজানু অবস্থায় বা একত্র অবস্থায়। পড়ে থাকবে, প্রত্যেক উম্মতকে তাদের কর্মসমূহের আমলনামা দেখতে বলা হবে। আর তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার প্রতিফল দেওয়া হবে।

٢٩. هٰذَا كِتٰبُنَا دِيْوَانُ الْحَفَظَةِ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ نُثْبِتُ وَنَحْفَظُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

২৯. এই হচ্ছে আমার কিতাব সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের বিবরণী যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলবে, তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ করতাম।

٣٠. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط جَنَّتِهٖ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ ـ

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে জান্নাতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য।

٣١. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا نف فَيُقَالُ لَهُمْ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ الْقُرْاٰنُ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ تَكَبَّرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ كَافِرِيْنَ ـ

৩১. অপরদিকে যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে বলা হবে তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ কুরআন পঠিত হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। নাফরমান জাতি।

٣٢. وَاِذَا قِيْلَ لَكُمْ اَيُّهَا الْكُفَّارُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ لا اِنْ مَا نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا قَالَ الْمُبَرِّدُ اَصْلُهٗ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ اِنَّهَا اٰتِيَةٌ ـ

৩২. হে কাফেররা যখন তোমাদেরকে বলা হতো, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই اَلسَّاعَةُ টি رَفْع ও نَصْب উভয়ভাবে পড়া যাবে তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কিয়ামত কি? আমরা কেবল কিছু ধারণাই করতে পারি। মুবাররাদ বলেন- مَا نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا মূলত اِنْ نَّحْنُ اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا ছিল। এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই যে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

٣٣. وَبَدَا ظَهَرَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا فِى الدُّنْيَا اَىْ جَزَاؤُهَا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَىِ الْعَذَابُ .

৩৩. কিয়ামতের দিন তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের মন্দকর্মগুলো যা তারা দুনিয়াতে করেছে অর্থাৎ এটার প্রতিদান পাবে এবং যে আজাব নিয়ে তারা হাসিঠাট্টা করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে।

٣٤. وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ نَتْرُكُكُمْ فِى النَّارِ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ز اَىْ تَرَكْتُمُ الْعَمَلَ لِلِقَائِهٖ وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْهَا .

৩৪. বলা হবে, আজ তোমাদেরকে ভুলে যাব তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। যেভাবে তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে অর্থাৎ এ দিনের সাক্ষাতের জন্যে কোনো আমল করনি। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই আজাবকে বাধা দানকারী নেই।

٣٥. ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج حَتّٰى قُلْتُمْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ مِنْهَا مِنَ النَّارِ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ اَىْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ اَنْ يُّرْضُوْا رَبَّهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ لِاَنَّهَا لَا تَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ

৩৫. এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে কুরআনকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। ফলে তোমরা বলতে যে, কোনো পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ নেই সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না يُخْرَجُوْنَ -কে مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل উভয়ভাবে পড়া যায়। ও তাদের কোনো ওজর আপত্তি কবুল করা হবে না। অর্থাৎ তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হবে না যে, তারা তওবা ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নেবে। কেননা ঐদিন এটা কোনো উপকারে আসবে না।

٣٦. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ عَلٰى وَفَاءِ وَعْدِهٖ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقِ مَا ذُكِرَ وَالْعَالَمُ مَا سِوَى اللّٰهِ وَجُمِعَ لِاخْتِلَافِ اَنْوَاعِهٖ وَرَبِّ بَدَلٌ .

৩৬. অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে উত্তম প্রশংসা তার জন্যে তিনি মিথ্যুকদের ব্যাপারে তার ওয়াদা পূরণ করার কারণে। যিনি আসমানসমূহের মালিক, যিনি জমিনের মালিক, তিনি মালিক সারা জাহানের তিনি উল্লিখিত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকেই عَالَمْ বলা হয় এবং عَالَمْ -এর বিভিন্ন প্রকারকে শামিল করার জন্যে عٰلَمِيْنَ বহুবচন আনা হয়েছে। আর رَبِّ শব্দটি আল্লাহ থেকে بَدَلٌ -

٣٧. وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ الْعَظَمَةُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط حَالٌ اَىْ كَائِنَةٌ فِيْهِمَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تَقَدَّمَ .

৩৭. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সমস্ত গৌরব ও মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই। فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অবস্থাবোধ পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ তিনি আসমান ও জমিনে হওয়াটা সর্বাবস্থায় তাঁর জন্যে গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটার ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ : এটা يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ হতে بَدَلْ হয়েছে تَاكِيْد -এর জন্য। আর يَوْمَ تَقُوْمُ টা يَخْسَرُ -এর ظَرْف হয়েছে। আর يَوْمَئِذٍ-এর মধ্যে تَنْوِيْن টা مُضَافْ اِلَيْه -এর পরিবর্ত হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– اِذَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ

قَوْلُهُ اَىْ يَظْهَرُ خُسْرَانُهُمْ : এটা হলো সেই উহ্য প্রশ্নের জবাব যে, বাতিলপন্থিদের ক্ষতিগ্রস্ততা তো عِلْمِ اَزَلْ -তে নির্দিষ্ট এবং আবশ্যক, তাহলে পুনরায় ঐ দিনের ক্ষতিগ্রস্ততার কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

উত্তর. বাতিলপন্থিদের ক্ষতিগ্রস্ততা যদিও رُوْزِ اَزَلْ থেকেই নির্দিষ্ট কিন্তু তার প্রকাশ সেদিন হবে যখন তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

قَوْلُهُ جَاثِيَةً : এটা جَثْوٌ বা جَثْىٌ হতে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ। অর্থ– রানের উপর উপবেশনকারী। এখানে جَاثِيَةٌ টা বহুবচনের স্থানে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– قَائِمَةٌ - جَمَاعَةٌ

قَوْلُهُ نَسْتَنْسِخُ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالْ -এর اَلْاِسْتِنْسَاخُ মাসদার হতে মুযারে -এর جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ; অর্থ– আমরা সংরক্ষণ করি। বাবে فَتَحَ হতে نَسْخًا মাসদার অর্থ দূর করা, বদলে দেওয়া, রহিত করা লেখা, নকল করা।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصَبِ : অর্থাৎ اَلسَّاعَةُ -এর উপর رَفْع -এবং نَصَبْ উভয় বৈধ। মুবতাদা হওয়ার কারণে رَفْع হবে। لَا رَيْبَ فِيْهَا বাক্য হয়ে মুবতাদার খবর। আর اِنَّ -এর اِسْم -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে نَصَبْ হবে।

قَوْلُهُ قَالَ الْمُبَرِّدُ اَصْلُهُ اِنْ نَحْنُ اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا : **প্রশ্ন.** ظَنًّا মাসদার تَاكِيْد -এর জন্য হয়েছে। আর যেই মাসদার تَاكِيْد -এর জন্য হয় সেটা اِسْتِثْنَاءْ مُفَرَّغْ হতে পারে না। অথচ এখানে ظَنًّا মাসদারটা اِسْتِثْنَاءْ مُفَرَّغْ হয়েছে। কেননা এর দ্বারা একই জিনিসের اِثْبَاتْ এবং তারই نَفِىْ করা আবশ্যক হচ্ছে; যা জায়েজ নয়। এটা এরূপ যেমন কেউ বলল– مَا ضَرَبْتُ اِلَّا ضَرْبَةً আর এটা اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ হওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।

উত্তর. মুফাসসির (র.) نَحْنُ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যার কারণে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর مُغَايِرْ হয়ে গেছে। এজন্য نَفِىْ -এর مَوْرِدْ [মিসদাক] উহ্য রয়েছে। আর তা হলো نَحْنُ এবং اِثْبَاتْ -এর মিসদাক (مَوْرِدْ) نَظُنُّ ظَنًّا আর اِلَّا টি যদিও مُؤَخَّرْ হয়েছে কিন্তু তাকদীরীভাবে مُقَدَّمْ হয়েছে। আয়াত থেকে সেই حَصَرْ বুঝা যাচ্ছে। নিজের জন্য ظَنْ -এর اِثْبَاتْ এবং ظَنْ ব্যতীত অন্যগুলোর نَفِىْ হয়েছে। আর সমষ্টিগতভাবে مَاعَدَا -এর মধ্যে يَقِيْن -ও রয়েছে– এবং يَقِيْن -এরই نَفِىْ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু মুতলাকান مَاعَدَا الظَّنِّ -এর نَفِىْ টা يَقِيْن -এর نَفِىْ -এর মধ্যে মুবালাগা করার জন্য হয়েছে। আর এ কারণেই যে, মুশরিকরা স্বীয় উক্তি وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ দ্বারা مَا نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا -এর তাকিদ করেছেন।

قَوْلُهُ جَزَاءُ هَا : উহ্য মুযাফ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, ظُهُوْرُ سَيِّئَاتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ظُهُوْرُ جَزَاءْ سَيِّئَاتْ আর نِسْيَانْ -এর তাফসীর تَرْك দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, نِسْيَانْ দ্বারা لَازِمْ অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা মানুষের থেকে نِسْيَانْ তথা ভুল করার অপরাধকে মার্জনা করে দেওয়া হয়েছে। আর نِسْيَانْ টা আল্লাহর জন্য مُحَالْ আর تَرْك টা نِسْيَانْ -এর জন্য আবশ্যক।

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمْ : অর্থাৎ ذٰلِكَ الْعَذَابُ الْعَظِيْمُ بِسَبَبِ اَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا আর ذٰلِكَ -এর مَرْجِعْ হলো عَذَابْ আর بِاَنَّكُمْ -এর মধ্যে بَاءْ হলো سَبَبِيَّةْ -এর জন্য।

قَوْلُهُ لَا يُسْتَعْتَبُوْنَ : اِسْتِعْتَابٌ যা বাবে اِسْتِفْعَالْ -এর মাসদার তা হতে এটা مُضَارِعْ -এর جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনাই করা হবে না। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন যে, তাদের ওজর কবুল করা হবে না। আল্লামা মহল্লী (র.) প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এটা اَلْكِبْرِيَاءْ থেকে حَالْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً : جَثُوٌ -এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كُلَّ اُمَّةٍ [প্রত্যেক দল] শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে, কোনো কোনো আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গাম্বর ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই এতে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসীকে বুঝানো হয়েছে। كُلٌّ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَاثِيَةً -এর অর্থ করেছেন নামাজে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোনো খটকা থাকে না। কেননা এটা আদবের বসা, ভয়ের নয়।

قَوْلُهُ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে- اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا .... وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ : 'আর তাদেরকে বলা হবে, যেভাবে তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনিভাবে আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব। আর তোমাদের আবাসস্থল হলো দোজখ এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'

কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা : অর্থাৎ কাফের মুশরেকদেরকে সেদিন বলা হবে, দুনিয়ার জীবনে কিয়ামতের দিনের কথা বললে তোমরা তার প্রতি বিদ্রূপ করতে, এমনকি তোমরা কখনো একথা স্মরণ করনি যে, অবশেষে তোমাদেরকে একদিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে, জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে তোমরা কিয়ামতের দিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলে। যেভাবে সেদিন তোমরা এ সত্যকে ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনিভাবে আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই যে, তোমাদেরকে দোজখের শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যে সাহায্য করতে পারে।

এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করবেন, "আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে সন্তানসন্ততি দান করিনি? আমি কি তোমাদের জন্যে উট, অশ্ব প্রভৃতিকে অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাদের জন্যে তোমাদের বাড়ি-ঘরে আরাম-আয়েশে জীবনযাপনের সুযোগ দান করিনি?" তখন বান্দারা আরজ করবে, "অবশ্যই হে পরওয়ারদেগার! ঐ সমস্ত কিছু তোমার নিয়ামতই ছিল, যা আমরা ভোগ করেছি।" এরপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, যেভাবে দুনিয়াতে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিল, আজ আমি তোমাদেরকে সেভাবে ভুলে থাকব। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু), পারা ২৫, পৃ. ৬৮]

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ .... وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে যে, তাদের আবাসস্থল হবে দোজখ, আর এ আয়াতে তাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে-

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ কাফেরদেরকে দোজখের শাস্তি এজন্যে দেওয়া হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিদ্রূপ করেছিল এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, তারা ভেবেছিল, দুনিয়ার জীবন চিরদিন ভোগ করবে, কখনো তাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে না; কিন্তু অতি অল্প সময়ের

মধ্যেই মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের সে জীবনের অবসান ঘটেছে এবং আখিরাতের এ জীবনে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর তা হলো দোজখের শাস্তি। আর এ শাস্তি থেকে তারা কখনো রেহাই পাবে না এবং তওবা করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের কোনো সুযোগ থাকবে না। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নির্ভর করছে ঈমান ও নেক আমলের উপর, আর মৃত্যুর মাধ্যমে আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই তখন আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার কোনো পথ খোলা থাকবে না।

قَوْلُهُ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আসমান জমিনের প্রতিপালক, আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু লাভ করেছে অস্তিত্ব, তাঁরই আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তিনিই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। অতএব, সমস্ত প্রশংসা শুধু এক আল্লাহ পাকের জন্যেই। বান্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর বন্দেগিতে মশগুল থাকা।

قَوْلُهُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাজত্ব আসমান-জমিনে, একমাত্র তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অহংকার শুধু তাঁরই সাজে, আর কারো নয় এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি প্রজ্ঞাময়, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।